



জ্যোতি বসু : শতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি

এই বছর, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ, আমাদের দেশের প্রবাদপ্রতিম কয়েকজন কমিউনিস্ট নেতার জন্মশতবর্ষের বার্তা বহন করে নিয়ে এসেছে। স্মরণে-অনুধ্যানে, জীবন ও জীবনচর্যার অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণে, বার বার শতবর্ষের এই কালপুরুষেরা মরণ-সাগরপারে অমর হয়ে, বর্তমান ও আগামীর পথিকদের প্রেরণা ও পাথেয় হয়ে থাকবেন। মানুষ ও সকল প্রাণীর জীবনই নশ্বর, কেবল ‘কীর্তির্ষস্য স জীবতি’। সমাজ-প্রগতির ধারায় যাঁরা অবিরাম চলিষু ও কর্মের সাধনাকে অব্যাহত রাখেন, তাঁদের প্রয়াণ ঘটলেও এক অনশ্বর স্মৃতি ও অনিবার্ণ দীপশিখার বিকিরণে তাঁরা বেঁচে থাকেন। এই সময়ে তেমনই একজন কমিউনিস্টের জীবন-অশ্বেষায় আমরা ব্রতী হয়েছি। জন্ম-শতবর্ষের এই প্রহরে আমরা তাই অন্যতম কমিউনিস্ট ব্যক্তিত্ব জ্যোতি বসুর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

১৯১৪ থেকে ২০১০—ছিয়ানব্বই বছরের একটি জীবন। অপার বিস্ময়ে প্রশ্ন জাগে—‘নূতন উষার স্বর্ণদ্বার—খুলিতে বিলম্ব কত আর?’ অবিশ্বাসীরা যতই সন্দিহান হোন না কেন, এই জটিল সময়ের মাঝে দাঁড়িয়েও আমরা অবশ্যই ঘোষণা করে যাবো—‘জীবন নিজেকে প্রতিষ্ঠা করবেই’—লেনিন। আমরা বিশ্বাস করি জননেতা, কমিউনিস্ট জ্যোতি বসু যে নতুন সমাজ, মানবতার নির্যাসে গড়ে ওঠা নতুন পৃথিবীর স্বপ্নের অন্যতম রূপকার ছিলেন, ‘সূর্য নিভে গেলেও একটি বিশ্বাসের বলয় সেই স্বপ্নের বর্ণময় অভিযাত্রায় এখনও মানুষকে পথ দেখাবে। নিজের যাপিত জীবনে সনিষ্ঠ অনুশীলন, তীক্ষ্ণ ধীশক্তি ও তত্ত্বকে বাস্তবে প্রয়োগে তাঁর অনবদ্য ভূমিকার কথা জন্মশতবর্ষে বিশেষ করে মনে পড়ছে। জ্যোতি বসু যেমন পশ্চিমবঙ্গের নন, সারা ভারতেরই অন্যতম রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব (Statesman, নিছক Politician নন) এবং জনপ্রিয় নেতা ছিলেন, তাঁর জীবিতাবস্থাতেই তার বহু প্রমাণ রয়েছে। ব্যক্তি জ্যোতি বসুর সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবন এবং চরিত্রমহিমা নিয়ে অনেকেই লিখেছেন এবং লিখবেন। তাঁর জীবন

নিয়ে অনেক গবেষণা হবে। তাঁর মেধা ও আশ্চর্য স্মৃতিশক্তির ধারক মস্তিষ্কের ওপর বিজ্ঞানসম্মত চুলচেরা বিশ্লেষণ করবেন। ‘বজ্রাদপি কঠোরানি কোমলৈ কুসুমাদপি’—এই বিরল চরিত্রের অধিকারী মানুষটি ‘কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা’ অর্জন করেছিলেন—সে-সব বিষয় ঐতিহাসিকেরা প্রাধান্য করবেন। একজন কমিউনিস্ট হিসেবে তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন—“Marxism is not a dogma, but a guide to action.” তাই বাস্তব অবস্থার বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণের মধ্য দিয়েই তাঁর সংগ্রামী জীবন পরিষদীয় (Parliamentary) এবং পরিষদ বহির্ভূত (Extra-Parliamentary) কর্মকাণ্ডকে সমন্বিত করে, শ্রেণি-সংগ্রাম ও অপরাপর গণ-আন্দোলনকে নতুন নতুন বিকাশের ধারায় গড়ে তোলার কাজে ব্যাপৃত ছিল।

ব্যক্তিগত সুখ-শান্তির ভোগসর্বস্ব হাতছানিতে তিনি কখনই আত্মসমর্পণ করেননি। কারালাঞ্ছনা, আত্মগোপন করা এবং একটি যথার্থ মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টি গড়ে তোলার সমস্ত প্রয়াসে তাঁর জীবনে কোনো দ্বিচারিতা এবং ফাঁকি ছিল না। ১৯৪৬ সালে এই রাজ্যে বিধায়ক নির্বাচিত হওয়া থেকে একাদিক্রমে অনেক বছর (মাঝে ১৯৭২ সালের কদম্ব গণতন্ত্রঘাতী নির্বাচনের কথা বাদ দিলে) কখনও বিরোধী দলনেতা, কখনও উপমুখ্যমন্ত্রী (যুক্তফ্রন্ট সরকার) এবং দীর্ঘদিন ধরে বামফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তিনি কেবল অসাধারণ পরিশীলিত অথবা সহজিয়া বোধগম্য ভাষায় বাগ্মিতারই পরিচয় রাখেননি, একজন দক্ষ প্রশাসক হিসেবে বুর্জোয়া-জমিদার রাষ্ট্রব্যবস্থায় সীমাবদ্ধ সাংবিধানিক ক্ষমতার মধ্য দিয়েও নানা ধরনের জানাভিমুখী উন্নয়নের মধ্য দিয়ে পশ্চিমবঙ্গকে গোটা দুনিয়ার কাছেই একটি মডেল হিসেবে চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন। বারবার কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজনা্য অপরাপর রাজ্যগুলিকে সামিল করার এক ঐতিহাসিক ভূমিকা তিনি পালন করেছেন। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের একজন যথার্থ বরেণ্য অধিনায়ক হিসেবে জ্যোতি বসুকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সমস্ত বিরোধী দলগুলি প্রস্তাব পাঠালেও নিজের রাজনৈতিক দল সিপিআই(এম) কেন্দ্রীয়ভাবে এই প্রস্তাব নামঞ্জুর করে। তখনও জ্যোতি বসু পার্টি-শৃঙ্খলার প্রতি আনুগত্য জানিয়েই প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সুযোগ প্রত্যাখ্যান করেন। আবার স্বেচ্ছায় মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে সরে এসে নতুন প্রজন্মের কাছে ত্যাগ ও তিতিষ্কার বার্তা জানানালেন।

জন্মশতবর্ষের এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে আমরা জ্যোতি বসুর জীবন ও কর্মকাণ্ডের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করছি। আজ সবদিক থেকেই শোষিত মানুষ আক্রান্ত। আর এই আক্রমণের মুখে দাঁড়িয়ে জ্যোতি বসুর জীবন ও মতাদর্শগত আয়ুধে শাণিত হয়ে অকুতোভয়ে আলোর পথযাত্রীদের এগিয়ে যেতে হবে। যে ইতিহাসে ‘পতন-অভ্যুদয় বন্ধুর পস্থা’ আছে, সেই ইতিহাসেরই একজন কালপুরুষ হিসেবে তিনি সারা জীবন মানুষের সঙ্গে থেকেছেন, পথ দেখিয়েছেন মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রজ্ঞা ও প্রায়োগিকতার সফল রূপকার হিসেবে। আদর্শ কমিউনিস্টের অন্যতম প্রতিভূ জ্যোতি বসুর জন্মশতবর্ষে ‘নতুন চিঠি’-র পক্ষ থেকে আমরা তাঁর কয়েকটি মূল্যবান সাক্ষাৎকারের অংশবিশেষকে উপস্থাপন করছি।



জ্যোতি বসুর সঙ্গে সাক্ষাৎকার

২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯

নতুন চিঠি : তৃতীয় বিকল্প তো নির্বাচনের পরেই গড়ে উঠবে— একথাই আপনারা বলছেন। এ সম্ভাবনা কতটা?

জ্যোতি বসু : আমরা তো মনে করি তার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। এবারেও নির্বাচনের ফলে সংসদ ত্রিশঙ্কু হবে বলেই আমাদের মনে হয়। সেই অবস্থায় আমরা যদি একটা তৃতীয় মোর্চা তৈরি করতে পারি তবে সরকার গড়ার একটা প্রচেষ্টা করা যেতে পারে।

এবার একটা সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন—তৃতীয় ফ্রন্ট যদি গড়ে ওঠে এবং আপনার কাছে আবার প্রধানমন্ত্রী হবার প্রস্তাব আসে তাহলে সে

সম্পর্কে আপনারা দৃষ্টিভঙ্গি কী হবে?

হ্যাঁ, সে সম্পর্কে যাঁরা বিদেশ থেকে আসেন তাঁরা সহ সবাই একই প্রশ্ন বারে বারে করেন। আমি আগেও বলেছি, এখনও বলছি—এবারে যখন বিজেপি সরকার পড়ে গেল তখন আমার শরীর খারাপ ছিল। তাও যদি দায়িত্ব নিতে হত আমি রাজি হয়েছিলাম। আমার পার্টিও রাজি হয়েছিল। আমাদের মধ্যেই দু-একটা দল—যেমন সমাজবাদী দল বললেন, কংগ্রেসের সরকার হলে আমরা সমর্থন করতে পারব না। তখন আমি আমাদের বন্ধুদের, যাঁরা যুক্তফ্রন্টের মধ্যেও ছিলেন, জিজ্ঞাসা করলাম, তাহলে বিকল্পটা কী? সরকার তো ভেঙে গেছে, সরকার তো নেই এখন, একটা সরকার তো গড়া দরকার। ওঁরা আমাকে বললেন, আপনি প্রধানমন্ত্রী হবেন এবং

আমাদের যুক্তফ্রন্ট হবে। তখন আমি বললাম, এটা তো একটা অসম্ভব কথা বলে আমার মনে হচ্ছে। আমি যা কথা বলে বুঝেছি, কংগ্রেস তো সমর্থন করবে না। কংগ্রেস সমর্থন না করলে কী করে বিকল্প গড়া যাবে? এসবের পর আমি বললাম, ঠিক আছে আমার শরীর খারাপ, আমি চুপ করে আছি, আপনারা যান কংগ্রেসের কাছে। এর পরে তাঁরা কংগ্রেসের কাছে যান। তার পর কী হল তা এখন জেনে গেছে সবাই। কংগ্রেস বলল যে ওদের ওয়াকিং কমিটির সিদ্ধান্ত নতুবা কোনও তৃতীয় মোর্চা বা যুক্তফ্রন্টকে ওরা সমর্থন করবে না। কাজেই দেখা গেল নির্বাচনই হচ্ছে একমাত্র উপায়।

□

এবার একটু বর্ধমান জেলার প্রশ্নে আসি। এখানে দুর্গাপুর-আসানসোল শিল্পাঞ্চল, খনি-অঞ্চলের পরিস্থিতি তো ভয়াবহ। মমতাদেবী তৃণমূল কংগ্রেসের যে ইশতাহার প্রকাশ করেছেন তাতে তিনি ‘বেঙ্গল প্যাকেজ’-এর কথা বলেছেন। এর মধ্যে কি এই সমস্যার কথা আছে? এ সমস্যা সম্পর্কে আপনারাই বা বক্তব্য কী?

আপনার কাছে তো দেখছি বেঙ্গল প্যাকেজের বইটা আছে। তা আপনি একটু দেখে নেবেন। উনি তো নিজের লেখাপড়া সম্বন্ধে যেমন অসত্য বলেন তেমনই অসত্য কথা কথা এর মধ্যে আছে। আমি মেদিনীপুরে গিয়েছিলাম। উনি সেখানে গিয়ে বলেছেন ৫০০০ কোটি টাকার যে প্রকল্প হচ্ছে অর্থাৎ ভারতের মধ্যে সবচেয়ে বড় পেট্রোকেমিকেল কমপ্লেক্স, তার জন্য নাকি ২০০০ কোটি টাকা আমাদের জোগাড় করে দিয়েছেন। এখন কী করব? একজন মহিলা যদি এমন অসত্য কথা বলেন! এখানেও এসেছিলেন, কী বলেছেন আমি জানি না। এখানে ৫৬টা কয়লা খনি বন্ধ হবার কথা। তা ওদের মন্ত্রী আমাকে বলেছিলেন, আপনাদের সঙ্গে কথা হবে। এতগুলো হয়তো বন্ধ করা হবে না। এখন তো উনি ইলেকশন নিয়ে ব্যস্ত ওড়িশায়। তা মমতাদেবীর এ ব্যাপারে কী করার আছে? উনি তো এইসব শিল্পসমস্যা নিয়ে কোনওদিন কিছু বলেননি। বিদ্যুৎ নিয়ে বসেছিলেন কলকাতার বিদ্যুৎ অফিসের সামনে। এখন আবার শুনছি ৯০টা খনি বন্ধ হবে। তার মানে আমাদের এক লাখ লোক কাজ হারাবে। বিদেশ থেকে বিজেপি সরকার সব জিনিস আমদানি করেছে। যেমন অস্ট্রেলিয়া থেকে কয়লা আমদানি করেছে। বিজেপি সরকার স্বদেশির কথা বলে বিদেশিদের সুবিধা করে দিচ্ছে। কংগ্রেসের আমল থেকেই রাষ্ট্রায়ত্ত্ব শিল্পগুলোকে দুর্বল করে দেবার চেষ্টা চলছে। বিজেপির অর্থনীতি একই। ওরাও এ সম্পর্কে একমত। সাত-আটটা এ ধরনের রাষ্ট্রায়ত্ত্ব শিল্প আছে, তাছাড়া একটা সার কারখানা আছে দুর্গাপুরে। এখন শুনছি যে সেখানে কোনও কাজ হচ্ছে না। রুগ্ন হয়ে যাচ্ছে। বন্ধ হয়ে যাবে। কংগ্রেস সরকার সবচেয়ে বড় সার কারখানা বন্ধ করে দিয়েছিল। এভাবেই আমাদের এখানে চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ অর্ডার পাচ্ছে না বলে আমার কাছে অভিযোগ করেছে। বর্তমান পশ্চিমবাংলায় কেন্দ্রীয় সরকারের তিনটি ওয়াগন ফ্যাক্টরি আছে। ওঁরা অভিযোগ করেছেন আমার কাছে, আমি দিল্লিতে চিঠিও লিখেছি যে এদের কেন অর্ডার দেওয়া হচ্ছে না। এছাড়াও একটা আছে প্রাইভেট সেক্টরে। সবাই অর্ডার পাওয়া দরকার। না হলে রুগ্ন হয়ে যাবে। তারপর ইস্কা নিয়ে আজ অবধি কিছুই হল না। ডানলপের মতো একটা বিখ্যাত কারখানা বন্ধ হয়ে গেল। আমাদের তো টাকা-পয়সা নেই, করতে পারি না। সবই কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে। তা আমি অর্থমন্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছিলাম। আমি ওঁদের বলেছিলাম এটা যখন আপনাদের নীতি যে আপনারা রুগ্ন কারখানা অধিগ্রহণ করবেন না, এটা তো রুগ্ন নয়। যাই হোক এ নিয়ে তর্ক করার

দরকার নেই। আইনানুসারে আমরা অধিগ্রহণ করতে পারি না। কেন্দ্রীয় সরকার পারে। আপনারা শুধু অধিগ্রহণ করে আমাদের হাতে ছেড়ে দিন, তারপর আপনারা আমরা দুজনে মিলে দেখি চালাতে পারা যায় কিনা। তারপর ভালো কোনও সংস্থা যারা এটা চালাতে পারবে খুঁজে বার করা যায় কিনা। এমন একটা টায়ার ফ্যাক্টরি আমরা খুঁজে বেরও করেছিলাম। পরে প্রধানমন্ত্রী আমাকে বললেন যে ওটা বি-আই-এফ-আর’ এ আছে। বি. আই. এফ. আর যা করে তাই হবে। আমরা ওটা অধিগ্রহণ করব না। এটা অতি আশ্চর্য ঘটনা। অথচ এখানে আমাদের প্রতিরক্ষাবিভাগের জন্য দরকারি নানা জিনিস তৈরি হয়। যেমন এরোপ্লেনের টায়ার ইত্যাদি এরা তৈরি করে। তা জর্জ ফার্নান্ডেজ সে ব্যাপারে আমাকে বলেছিলেন, টায়ারগুলো তৈরি হয়ে পড়ে আছে, ওগুলো আমরা নিতে চাই। আমি বলেছিলাম, ঠিক আছে আপনি লোক পাঠান। কোনও অসুবিধা হবে না। তবে ওদের মাইনে-টাইনেগুলো দিয়ে দেবেন। আমরা আমাদের নিয়ম অনুযায়ী দুবছর ধরে বন্ধ কারখানার শ্রমিকদের মাসে ৫০০ টাকা করে দিই। ওটা কিছুই নয়। ওঁরা আরও অনেক বেশি রোজগার করতেন। এখন খুবই দুর্দশার মধ্যে আছেন। জর্জ ফার্নান্ডেজ অফিসার পাঠিয়ে টায়ার নিয়ে গেলেন। কোনও গোলমাল হয়নি। কিন্তু মাইনে আজ পর্যন্ত কেউ পায়নি। এইসব কথা কি ওরা বলছেন? এই যে ‘প্যাকেজ’ বলছেন, ওদের এসব প্যাকেজ বলবার কোনও অধিকার নেই। অনেকে এটা জানেন না, কংগ্রেস যখন এক ছিল, যখন রাজীব গান্ধি বেঁচে ছিলেন, তখন কংগ্রেসের কিছু নেতা আমাকে বললেন, আমাদের পশ্চিমবাংলাকে তো বিভিন্ন ক্ষেত্রে বঞ্চিত করা হচ্ছে। তা আপনি আমাদের নিয়ে যান না কেন রাজীব গান্ধির কাছে? পেট্রোকেমিকেল, ইলেকট্রনিক্স, কম্পিউটার বা এইসব আধুনিক শিল্প নিয়ে কথা চলছিল। আমি বললাম যে এ তো খুব ভালো কথা। এতে আমার কোনও আপত্তি নেই, রাজনৈতিক পার্থক্য যাই থাকুক না কেন। আমি ওদের মিটিং-এ ডাকলাম। পাঁচ মিনিটের মধ্যে মমতা, তারপর দাশমুন্সি, অজিত পাঁজা বেরিয়ে গেলেন। ওঁরা বললেন, পশ্চিমবাংলার যা হবার হোক, তা নিয়ে আমরা চিন্তিত নই। আপনার সঙ্গে আমরা রাজীবের কাছে যাব না। অবশ্য ওরা ঠেকাতে পারেনি। রাজীব আমাকে নিয়েই পেট্রোকেমিক্যালস্-এর শিলান্যাস করেছিলেন। পরে ৫০০০ কোটি টাকা দেন। ওদের এসব প্যাকেজ-ট্যাকেজ বলার কী মূল্য আছে। মানুষকে ফাঁকি দেওয়া আর কি। মানুষ অনেক মসয় ফাঁকিতে পড়েন। কী করা যাবে! তাঁদের কাছে ফিরে ফিরে যেতে হবে। বোঝাতে হবে। তাঁরা নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকেই বুঝবেন। আসলে ওঁরা বুঝছেন, শুধু হিংসাত্মক কার্যকলাপ করে মানুষের সমর্থন পাওয়া যায় না। এই যে বোম-টোম দিয়ে পুলিশকে মেরে রাইটার্স বিল্ডিং দখল করব—এইসব করলে ভোট-ঠোট পাওয়া কঠিন আছে। সেজন্মেই এখন ওই প্যাকেজের কথা বলছেন।

১৩ আগস্ট, ২০০০

আপনি বলেছেন, কৃষিক্ষেত্রে আমরা যেমন এগিয়েছি, শিল্পায়নের ক্ষেত্রেও আমরা শিঘ্রই সারা ভারতে তেমন এগিয়ে যাব। তা হলদিয়া তো আমাদের সামনে নতুন সম্ভাবনা খুলে দিয়েছে। হলদিয়ার ডাউনস্ট্রিম প্রজেক্ট নিয়ে কী রকম সাড়া পাওয়া যাচ্ছে?

খুবই ভাল। খুব সাড়া আসছে, সাড়া পাচ্ছি। কিন্তু জমি পাবার একটু অসুবিধা হচ্ছে। আইন-কানুন নানা রকম আছে। সেগুলো

আমরা দেখছি বসে। আর অনেক দরখাস্ত আসছে আমাদের কাছে, এসেছে। শুধু হলদিয়ার জন্য নয়, সারা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়ই এগুলো হবে।

দুর্গাপুরে একটা হবে শোনা যাচ্ছে?

দুর্গাপুরে হবে। বাঁকুড়ায় হবে। আরো বিভিন্ন জেলায় হবে। উত্তরবঙ্গেও হতে পারে। কাঁচামাল নিয়ে এসে জিনিসপত্র তৈরি হবে। চাকরির সম্ভাবনা অনেক বেড়েছে। প্রায় ১ লক্ষের ওপর চাকরি পাবে বেকার ছেলে-মেয়েরা। আমাদের জেলায় আসানসোল, দুর্গাপুর এবং তিনটে জায়গায় যে সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে, সেই সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে ফাস্ট-কাম ফাস্ট-সার্ভ নীতি নেওয়া হয়েছে। তবে জমির ব্যাপারে সমস্যা আছে। এটা নিয়ে একটা মিটিং করা হয়েছে যাতে সমস্যার তাড়াতাড়ি সমাধান করা যায়।

ইলেকট্রনিক্স প্রযুক্তির ব্যবহারেও নাকি সচেষ্ট হয়েছেন? সিলিকন ভ্যালির মতো একটা কিছু গড়ে তোলার চেষ্টা হচ্ছে নাকি আমাদের রাজ্যে?

হ্যাঁ একটা বিরাট অগ্রগতি হয়েছে—আমরা এটা করেছিলাম প্রথমে ৯৯ একর জমির ওপর। এখন হচ্ছে ১৫০ একর জমির ওপর। দেশি-বিদেশি ইলেকট্রনিক্স শিল্পের নগরী গড়ে উঠছে বিধাননগরের কাছেই। প্রায় ১ লক্ষ ছেলে-মেয়ে এসবে কাজ করছে এবং এ ব্যাপারে খুব ভাল ফল তারা করছে।

প্রশ্ন উঠেছে, তৃণমূল কংগ্রেস এত টাকা-পয়সা কোথা থেকে পাচ্ছে? ওদের তো তেমন সংগঠন নেই বা পার্টি-লেভির মতো নিয়মিত আয়ের কোনও উৎস নেই?

আমরা তো বলেছি তদন্ত করার জন্য। আর তদন্ত করেই বা কী করে পাবে? একবার তো মার্কিন রাষ্ট্রদূত ময়নিহান একটা বইয়ে লিখেছিলেন—তিনি না বললে আমরা তো জানতাম না—যে কেরল এবং পশ্চিমবাংলায় ১৯৭১ সালে তারা টাকা দিয়েছিলেন কংগ্রেস দলকে। যাতে করে কমিউনিস্টদের অগ্রগতি না হয়। তা এই ক'বছরে যে কাউকে কিছু দেয়নি তো আমরা বলতে পারছি না। আমাদের হাতে তো প্রমাণও নেই তেমন কিছু। কিন্তু নিশ্চয় ওরা খরচা করছে যাতে আমাদের আটকানো যায় বা আমাদের অগ্রগতি যাতে ব্যাহত হয়। এজন্য কে কাকে কী দিচ্ছে তো আমরা বলতে পারবো না। তবে এটাও ঠিক যে বিজেপি-রই একজন নেতা যিনি সভাপতি হয়েছিলেন, আমি দেখলাম তিনি নাকি দূরদর্শনে বলেছেন, আমরা কোথায় টাকা পাই আমরা জানি, কিন্তু তৃণমূল কোথায় এত টাকা পাচ্ছে? এটা তো তিনিও বলেছেন।

২৯ সেপ্টেম্বর, ২০০১

আমাদের রাজ্যে গত নির্বাচনে শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই তিনটি বিষয়ে মূলত গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। ষষ্ঠ বামফ্রন্ট ক্ষমতায় এসেছে। এখন শিল্পের বিষয়ে আমাদের রাজ্যে কতটা সম্ভাবনা আছে বলে আপনি মনে করেন?

১৯৯৪ থেকে এ-রাজ্যে শিল্পভাবনা শুরু হয়েছে। দিল্লির থেকে যে বাধাগুলো ছিল যেমন, লাইসেন্স প্রথা, মাশুল সমীকরণ—বাইরের এবং ভিতরের চাপে এগুলি ধীরে ধীরে কাটতে শুরু করে। তারপর ৪৮ হাজার কোটি টাকার আবেদন আসে আমাদের কাছে পুঁজি নিয়োগ করবার। তার মধ্যে ১৭ হাজার কোটি টাকার নির্মাণকার্য হয়ে গেছে গত বছর পর্যন্ত। এখনও নির্মাণের কিছু কাজ চলছে। ভারবর্ষের অর্থনীতির এখন খুবই দুরবস্থা। এই সরকার রাষ্ট্রায়ত্ত্ব যা কিছু আছে সব বন্ধ কিংবা বিক্রি করে দেবে ঠিক

করেছে। এ অবস্থা সত্ত্বেও আমি মনে করি মাঝারি শিল্প, ক্ষুদ্র শিল্প—যেখানে খুব বেশি মানুষ কাজ করে—এর সম্ভাবনা এখনো আমাদের এখানে আছে। যদিও এটারও বাধা আসছে। কারণ কেন্দ্রীয় সরকার নীতি গ্রহণ করেছে যে এক হাজার চারশোর বেশি জিনিস আসবে বাইরে থেকে। শুষ্ক ছাড়া এসব জিনিস আসবে বিদেশ থেকে। এতে ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্পে ক্ষতি হবে। তা সত্ত্বেও আমি বলবো, এখানে অবস্থাটা উৎসাহব্যঞ্জক। কারণ এখানে সুবিধা দেওয়া হচ্ছে শিল্পপতিদের। এখানে পশ্চিমবাংলার বাইরে থেকে, বিদেশ থেকে অনেকেই আসছেন শিল্প প্রতিষ্ঠার কারণে।

এখনকার শিল্পে কর্মসংস্থানের সুযোগ খুব থাকে না। জবলেস গ্রোথ হয়। সেক্ষেত্রে ভারত বা পশ্চিমবঙ্গ কতটা উপকৃত হবে বলে আপনি মনে করেন?

বড় শিল্প যেমন হলদিয়া। হলদিয়া তো পাঁচ-ছটা হবে না। আজকাল আধুনিক প্রযুক্তিতে বড় শিল্পে কর্ম-সংস্থান তেমন হয়ও না। সেইজন্য আমরা বেশি নজর দিচ্ছি স্বনিযুক্তিতে, ছোট এবং মাঝারি শিল্পের দিকে। যেমন পেট্রোকেমিক্যাল—সেখানে কত লোক কাজ করে? ৮০০ বা হাজার। কিন্তু তার অনুসারী শিল্প, ছোট এবং মাঝারি প্রকল্প—তা যেমন প্রায় সাড়ে চারশো পাঁচশো অনুমোদন পেয়ে হয়ে গেছে। সেখানে বেশি কর্মসংস্থান হবে।

স্বনিযুক্তি প্রকল্পের কথা এখন বেশি বলা হচ্ছে। এখানে ব্যাক্সের একটা ভূমিকা আছে। আপনি কি মনে করেন এখানে ব্যাক্স সঠিক ভূমিকা পালন করছে?

ব্যাক্স এক্ষেত্রে আমাদের খুবই বাধা দিয়েছে। আমরা আশা করেছিলাম ব্যাক্স যথার্থ সাহায্যকারী ভূমিকা নিলে এখানে চার লাখ/পাঁচ লাখ লোক কর্মে নিযুক্ত হবে। এক্ষেত্রে মূল অপরাধ ব্যাক্সের। ওদের শতকরা ৭৫ ভাগ দেওয়ার কথা ঋণ হিসাবে, আর সরকারের ২৫ ভাগ অনুদান। ওদের দায়িত্ব, যারা উদ্যোগ নিতে চাইছে তাদের পথ-নির্দেশ করা। তাই ব্যাক্সের সাথে বারবার সরকারকে আলোচনায় বসতে হচ্ছে।

পাশাপাশি ব্যাক্সের একাজে অনীহার জন্য সমবায় ব্যাক্সগুলোকে শক্তিশালী করার চেষ্টা চলছে। এক্ষেত্রে সমবায় ব্যাক্সের ভূমিকা খুবই ভাল। তবে সবটা তো সমবায় ব্যাক্স দিয়ে হবে না। অন্যদেরও এগিয়ে আসতে হবে। স্বনিযুক্তি প্রকল্প অর্থাৎ সেন্স হেল্প গ্রুপ যাতে তাড়াতাড়ি রূপায়িত করা যায় এজন্য গোটা বিষয়টা এক মন্ত্রকের আওতায় আনা হয়েছে। এতে কাজটা করা সুবিধা হবে।

এখানে শিল্পপতিদেরও কিছু কিছু অভিযোগ শোনা যায়—যেমন জমির চরিত্র বদল খুবই সময়সাধ্য ব্যাপার। বিদ্যুৎ যোগাযোগ তাড়াতাড়ি পাওয়ার সমস্যা ইত্যাদি—এ সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কী?

এসব অভিযোগ কিছু কিছু আছে। সবটা সত্যি নয়। আমাদের অভিজ্ঞতায় এসব কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করা হচ্ছে। এসব ব্যাপারে সময় যাতে নষ্ট না হয় তা দেখা হচ্ছে। তাই তো বলা হয়েছে—ইতিবাচক অভিজ্ঞতায় আরো শক্তিশালী বামফ্রন্ট আমরা করতে চাই।

পশ্চিমবঙ্গে সেলস ট্যাক্সের হার খুব বেশি—এ অভিযোগও আছে।

দিল্লিতে এ-বিষয়ে একটা কমিটি হয়েছে। এ রাজ্যের অর্থমন্ত্রী ওই কমিটির দায়িত্বে আছেন। শিল্প স্থাপনের বিষয়ে একটা অসম প্রতিযোগিতা আছে। রাজ্যে রাজ্যে এ বিষয়ে এক-এক রকম চিত্র—তাই সমস্ত বিষয়টাতে একটা সামঞ্জস্য যাতে আনা যায় ওই কমিটি সে-বিষয়ে কাজ করছে।



শিল্পায়নে জোর দিতে গিয়ে ট্রেড ইউনিয়ন কাজকর্মে কিছু শর্ত অবধারিতভাবে নেমে আসছে—এতে মতাদর্শগত কোনো আপস করতে হচ্ছে বলে কি আপনি মনে করেন?

আমাদের নীতি তো পরিষ্কার। আমরা বলেছি—স্ট্রাইক করার যে নীতি, যে অধিকার ব্রিটিশ আমল থেকে শ্রমিকরা আদায় করে এসেছেন—এ অধিকার তাদের রাখতে হবে। স্ট্রাইকের অধিকার যদি তারা ছেড়ে দেন—তাহলে আমাদের দিকে ও যারা শ্রমিকশ্রেণির বন্ধু তাদের দিকেও কেউ তাকাবে না। এটা হচ্ছে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা। আমরা শ্রমিকদের বোঝাচ্ছি—এ অধিকার আপনারা ছাড়বেন না। কিন্তু এটা হচ্ছে আপনাদের শেষ অস্ত্র। আপনারা মালিকদের সঙ্গে আলোচনা করবেন, আলোচনা করে মিটে যদি যায় তাহলে ভাল। আপনারা দাবিপত্র পেশ করবেন। ওখানে না মিটলে সরকারের শ্রমদপ্তরের কাছে আসবেন। সরকার বিষয়টা দেখবেন। এভাবে আমরা বহু বিরোধ মিটিয়েছি। ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে, পাট-চা শিল্পে বহু বিরোধের মীমাংসা এভাবে করা হয়েছে। কোনো স্ট্রাইক না করেই সেগুলো মেটানো গেছে।

শ্রমিককেও আমরা বলি উৎপাদনশীলতার বিষয়টিও আপনাদের দেখতে হবে। আবার মালিককেও বলি, শ্রমিকদের দূরে ঠেলে রাখবেন না, তাদের কাছে ডাকবেন। শ্রমিকদের সঙ্গে আপনাদের কথা বলতে হবে। উৎপাদনশীলতা যাতে বজায় থাকে সেক্ষেত্রে ওদের পরামর্শ যদি কিছু থাকে শুনতে হবে। তাদের বোঝাতে হবে, কোথা থেকে টাকা আসছে। কী করলে এটা রুগ্ন হয়ে যাবে। কী করলে এটা চালু থাকবে, এসব।

একটা সময় আমাদের এখানে ঘেরাও বলে একটা আন্দোলন চালু হয়েছিল। ৭৭ সালে আমরা ক্ষমতায় আসার পর আমি এবং তখন পার্টি-সম্পাদক ছিলেন প্রমোদ দাশগুপ্ত, একটি বিবৃতি দিই—ঘেরাও কোনো ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের অংশ নয়।

ঘেরাও কখনো করা উচিত নয়। হাতিয়ার আছে স্ট্রাইক। আপনারা করবেন। আপনারা দাবিপত্র দেবেন। সমাবেশ করবেন। কিন্তু আটকে রাখবেন না মানুষকে। বিশেষ করে মালিকদের আত্মীয়-স্বজনকে। তাদের বাড়িতে গিয়ে হামলা করবেন না। এটা এখনো বলা হচ্ছে।

দুর্গাপুরের অবস্থা এখন ভয়বহ সকলেই জানেন। কলকারখানা যে-ভাবে বন্ধ হচ্ছে কোথায় এর শেষ বোঝা যাচ্ছে না। এই পরিস্থিতিতে লাগাতার আন্দোলনের পথে যাওয়া ছাড়া শ্রমিকদের আর কি কোনও উপায় আছে?

লাগাতার আন্দোলনের ফলে যদি দাবি মিটে যেত তাহলে কোনো সমস্যা ছিল না। হোক না এক বছর ধরে স্ট্রাইক। বিলেতেও শ্রমিকরা এক বছর লাগাতার ধর্মঘট করেছিল লেবার পার্টির আমলে। কিন্তু তাতে কোনো লাভ হয়নি। কথা হচ্ছে আমরা প্রতিবাদ করবো, দাবি করবো, স্ট্রাইক করবো, কথা বলবো সরকারের সঙ্গে—এইসব করার মধ্যে শ্রমিকদের নিজেদেরও বুঝতে হবে আমরা কোন্ পথে লাভবান হব। সেইজন্য লাগাতার আন্দোলনই একমাত্র কথা নয়—আমাদের ওপরে আঘাত আসছে সুতরাং আমরা আন্দোলন করবো। এরকম তো বহুবারই হয়েছে, এই দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানাতেই হয়েছে—স্ট্রাইক হয়েছে, বারো দিন স্ট্রাইক হয়েছে, গুলি চলেছে, লাঠি চলেছে, লোক মরেছে—তার থেকে শক্তিশালী সংগঠন তৈরি হয়েছে। সেইজন্য ঠিক করতে হবে—কতটা আমরা যাবো। কতটা দাবি-দাওয়া আমরা পেশ করবো।

□

আপনার রাজনৈতিক জীবনের স্মরণীয় ঘটনা কী?

স্মরণীয় যদি বলতে হয় তবে যেটা আমি অনেক জায়গাতেই বলি তা হচ্ছে আমরা যেটা এখানে করেছি—সংসদীয় গণতন্ত্রে, ভারতবর্ষে তো বটেই। গোটা পৃথিবীতে এরকম নজির নেই যে নটা বামপন্থী দল মিলে সরকার চালাচ্ছে। বামফ্রন্ট ২৪ বছর ধরে চলছে। মানুষ আমাদের সাহায্য করছে সরকার তৈরি করতে এবং সরকার চলছে। এর থেকে বড় কথা আর হয় না। আমরা যখন রাজনীতি শুরু করি স্বাধীনতার পরে আমরা তো কল্লনাই করতে পারিনি।

আপনার ব্যক্তিগত জীবনের কোনো স্মরণীয় ঘটনা?

সেরকম তো অনেক ঘটনাই আছে—কোনটা বলবো! তবে, একটা ঘটনার কথা আমি বলবো—যেটা রাজনৈতিক নয়, আমার খুবই ভাল লেগেছিল। সেটা হচ্ছে যে আমি যখন সরকারে ছিলাম, আমাদের কাছে একটা আবেদন এল বিলেতের শেক্সপীয়র সোসাইটি থেকে। তাঁরা বললেন, আপনারা যদি রবীন্দ্রনাথের একটা মূর্তি দেন তাহলে আমরা তা প্রতিষ্ঠা করবো শেক্সপীয়রের জন্মস্থানে। এখানে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ মানুষ আসেন কবিকে শ্রদ্ধা জানাতে।

তা যেদিন অনুষ্ঠান করে রবীন্দ্রনাথের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হলো সেদিন আমি এবং বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সেখানে উপস্থিত ছিলাম। এটা আমার খুব ভালো লেগেছিল এই কারণে যে রবীন্দ্রনাথ শেক্সপীয়রকে বলেছিলেন বিশ্বকবি। আর আমরা রবীন্দ্রনাথকে বলি বিশ্বকবি—এই দুজনকে এক জায়গায় পাওয়ার বিষয়টা—আমার খুবই ভালো লেগেছিল।

অবসর সময়ে আপনি কী করেন?

অবসর থাকুক না থাকুক আমি কিছু না কিছু বইপত্র পড়ি। তা নভেল হতে পারে, সাহিত্য হতে পারে। ইংরাজি বাংলা যা-পাই। নোবেল পুরস্কার পাওয়া বই বা এদেশি বিদেশি ভাল যা লেখা-লেখি হচ্ছে। ঘুমুতে যাওয়ার আগে আমাকে পড়তেই হয়। পড়লে ঘুমটা ভাল হয়।

শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

পশ্চিমবঙ্গ তথা পূর্ব ভারতের প্রাচীনতম অগ্রণী সমবায় ব্যাঙ্ক

দি বর্ধমান সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লি.

হেড অফিস : জি.টি. রোড, বর্ধমান

টেলিফোন : ২৫৬০৩৫৫, ২৬৬৩১৬১, ২৬৬২১৭৫, ২৬৬৩১৬২, ২৬৬৩১৩২, ২৬৬২১৬৯

ফ্যাক্স : ০৩৪২-২৬৬২১৬৩ || ওয়েবসাইট : www.burdwanccb.in

RTGS, NEFT ও ATM পরিষেবা সহ আমাদের অন্যান্য পরিষেবা

- আমানতে সর্বাধিক সুদ
- মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী, ইন্সকো কর্মচারী ও দুর্গাপুর ইন্সপাত কারখানার কর্মচারীদের বেতন বিতরণ
- ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেট, ক্রিষাণ বিকাশ পত্র ও জীবন বীমার পলিসি বন্ধকী ঋণ
- সহজ শর্তে ও কম সুদে ব্যক্তিগত ঋণ
- যানবাহন ক্রয় ঋণ
- সহজ শর্তে ও কম সুদে গৃহনির্মাণ ঋণ
- সমস্ত শাখার মাধ্যমে CBS পরিষেবা
- কর্মচারী ঋণদান সমিতির (ECCS) মাধ্যমে স্বল্প/মধ্য/দীর্ঘমেয়াদী ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকল্পের ঋণের সুযোগ নিন।



দি বর্ধমান সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লি.

এই জেলার মানুষের ঘরের ব্যাঙ্ক

সমবায় ব্যাঙ্কে টাকা রাখুন এবং জেলার উন্নয়নে সামিল হোন

Sl. No. 180

বিজয় পাল স্মরণে

নিরুপম সেন

স্বাধীনতা সংগ্রামী, কমিউনিস্ট, জননেতা বিজয় পালের জন্মশতবর্ষ উদযাপিত হচ্ছে। রাজনৈতিক দল হিসেবে তিনি সি পি আই(এম)-এর নেতা ছিলেন। তার জন্য আমরা যারা সি পি আই(এম) দলের কর্মী, আমাদের একটি গর্ববোধ আছে। আমরা গর্ব অনুভব করি এইরকম একটি মানুষ আমাদের পার্টিকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। সি পি আই(এম)-কে গড়ে তুলতে তাঁর সমগ্র জীবনকে সমর্পণ করেছেন। বিজয় পাল শুধুমাত্র একটি রাজনৈতিক দলের নেতা ছিলেন না। তিনি ছিলেন একটি মূল্যবোধের প্রতীক। আমাদের দেশে শ্রমজীবী মানুষের মুক্তির জন্য এক নিবেদিত প্রাণ। কৈশোরের দিনে এক যুবক হাওড়ার ফুটবলের মাঠ ছেড়ে সবারমতীর আশ্রম ধরে কানপুরের শ্রমিক বস্তিতে এসে মুক্তির মন্ত্রের দীক্ষা নিয়েছিলেন। কোনো পুরস্কারের প্রত্যাশা ছিল না তাঁর। সেখান থেকে নিজের জেলা হাওড়ায় নয়, কাজ করতে এলেন আসানসোলার শ্রমিক বস্তিতে শ্রমিক সংগঠনে। সেই থেকে সেই মানুষটি আসানসোলার মানুষ হয়ে রয়ে গেলেন। যখন তিনি কানপুরে ছিলেন তখন তিনি কানপুরের মানুষ। যখন তিনি সবারমতীতে গান্ধীজির আশ্রমে ছিলেন তখন তিনি গান্ধীজির প্রিয় শিষ্য। সেই মানুষটি যখন আসানসোলে এলেন, সবাই মনে করে, তিনি আসানসোলার মানুষ। বিজয় পাল কোনো অন্য গ্রহের মানুষ ছিলেন না। এই মানুষটি সারা দেশ জুড়ে তাঁর কর্মকাণ্ডের ব্যাপ্তি ও বিস্তৃতি ঘটিয়েছিলেন।

আজকে বড় সঙ্কটের মুখোমুখি আমরা। রাজনৈতিক মূল্যবোধের সঙ্কট। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের স্রোতধারার মধ্য দিয়ে ভারতীয় রাজনীতি পরিপুষ্ট হয়েছে। সেই স্রোতধারায় যে সন্তানেরা স্বাধীনতার ভারতবর্ষে রাজনৈতিক সংগ্রাম পরিচালনা করেছেন তাঁরা যে মূল্যবোধকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, আজকে আমাদের দেশে সেই মূল্যবোধ সবথেকে ভয়ঙ্কর রূপে আক্রান্ত হয়েছে। গোটা দেশেই রাজনৈতিক কর্মীদের মধ্যে মতের পার্থক্য থাকবে, পথের পার্থক্য থাকবে—এটা স্বাভাবিক। আমাদের দেশের কীভাবে ভালো হবে? আমাদের দেশের মানুষ কীভাবে সুখে জীবনযাপন করবে? মুক্তির প্রকৃত অর্থ কী! মুক্তি বলতে কী বোঝায়! স্বাধীনতা বলতে আমরা কী বুঝি? শুধু ইংরেজদের আমাদের দেশ থেকে চলে যাওয়াই কি আমাদের স্বাধীনতার একমাত্র লক্ষ্য ছিল, না কি আরো কোনো লক্ষ্য ছিল? আমাদের স্বাধীনতার অন্তর্নিহিত অর্থ কী? স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে যারা সেদিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন, তাঁদের সেই স্বাধীনতার একটা ব্যাপকতর অন্তর্নিহিত অর্থ ছিল।

সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে যদি দেশ মুক্তি পায়, তাহলে দেশের মানুষের মুক্তি কীভাবে হবে এবং দেশের মানুষকে কীভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে? স্বাধীনোত্তরকালে তাই নিয়ে নানান বিতর্ক



হয়েছে, নানান মতপার্থক্য হয়েছে। কিন্তু সেই মত এবং পথের ভিন্নতা সত্ত্বেও ফল্গুধারার মতো একটা মূল্যবোধ তাকে পরিচালিত করেছে। মূল্যবোধের সেই ফল্গুধারা সাম্রাজ্যবাদী আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে, আমাদের দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল। স্বাধীনতার পরে কালক্রমে যত দিন গেছে, যত বয়স বেড়েছে, প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের কাছে সেই মূল্যবোধ ক্ষয় পেতে পেতে এমন একটা জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে যখন বারবার সেই মুখগুলি, বারবার বিজয়দাদের মুখ ভেসে ওঠে।

সেই মানুষটি, গায়ে খন্ডরের পাঞ্জাবি আর লং-ক্লথের পাজামা। নভেম্বরের সন্ধ্যায় গায়ে কোট, গলায় একটি মাফলার। হাতে একটি লাঠি। বিজয়দা টুকটুক করে চলেছেন। আপকার গার্ডেনের পার্টি অফিস, পার্টি অফিসের পিছনে ছোট্ট একটি ঘর। অফিসটাতে বামাপদবাবু বসে থাকতেন, সুনীলদা বসে কাগজ পড়তেন না হয় লিখতেন, পিছনের ঘরটিতে বিজয়দা। একের পর এক মানুষ আসছেন বিজয়দার কাছে। বিজয়দা কথা বলছেন তাঁদের সঙ্গে। একটি ছোট্ট কাঠের খাটে কখনও তিনি আধশোয়া অবস্থায়, কখনো বসে, আর সামনে একটি কাঠের হাতলছাড়া চেয়ার। সেই চেয়ারে বসে কথা বলতেন একের পর এক মানুষ। মানুষ আসছেন, যাচ্ছেন। আমরা এসেছি, পাঁচ মিনিট কথা বলব বিজয়দার সঙ্গে। বিজয়দার সময় নেই। দু-মিনিট কথা বলতে না পেরে অনেক সময় বিরক্ত হয়েছি। বিজয়দা কথা বলে চলেছেন মানুষের সঙ্গে। বিজয়দা খাবার সময় পাচ্ছেন না, অসুস্থ শরীর। আমাদের ক্রোধ হচ্ছে বিজয়দার

প্রতি। চিকিৎসক বলেছেন নিয়ম করে খান। বিজয়দার খাবার সময় নেই। কখন খাবেন ঠিক নেই। দুটো আড়াইটে তিনটে বিজয়দা কথাই বলে চলেছেন একের পর এক মানুষের সঙ্গে। এই ছিল তাঁর নিয়মিত দিনচর্চা।

আমরা রেগে গিয়ে বিজয়দাকে অনেক কথা বলেছি, তিনি আমাদের বলছেন, মানুষের জন্যই তো আমাদের কাজ। এইসব মানুষ এসেছেন আমাদের কাছে, তাদের সঙ্গে কথা বলবো না? তাঁদের দুঃখের কথা, তাঁদের সমস্যার কথা যদি আমরা না শুনি, আমরা যদি তাঁদের জন্য কিছু না করি, তাহলে এই মানুষগুলোর কাছে আমরা যাব কী করে? আরো অনেক কথা। বিকেল বেলায় বিজয়দাকে আপকার গার্ডেনে পাওয়া যাচ্ছে না। লাঠি নিয়ে টুকটুক করে বিজয়দা চলে গেছেন। কোথায় গেছেন বিজয়দা? বিজয়দাকে কোথায় পাওয়া যাবে? রবীন্দ্রা বললেন, চলে যাও রেলপাড়ে, গিয়ে দেখো কোনো বস্তিতে। সত্যি একদিন গেলাম। একটি বস্তিতে উঠোনে একটা দড়ির খাটিয়ায়, বিজয়দা তাদের মধ্যে আছেন। সেখানে বসে গল্প করছেন। চারপাশে সেই বস্তিবাসী মানুষ।

বিজয়দাকে এভাবেই আমরা দেখছি, চিনেছি। ছেলেবেলায় যখন কমিউনিস্ট মতাদর্শে দীক্ষিত হয়েছি, তখন যাঁদের সান্নিধ্যে রাজনীতির প্রথম পাঠ, সেসব মানুষগুলোর মধ্যে বিজয়দা অন্যতম। বিনয় চৌধুরীর কথা আপনারা জানেন। সুবোধ চৌধুরীর কথা আপনারা জানেন। হরেকৃষ্ণ কোণ্ডারের কথা জানেন। রবীন সেন, সুনীল বসুরায়ের কথা জানেন—এঁরা একটা প্রজন্ম। যে প্রজন্মকে দেখে আমরা সেদিন কমিউনিস্ট আন্দোলনে এসেছিলাম। এবং সেই সব মানুষ তাঁরা একটা মূল্যবোধকে আমাদের সামনে উপস্থাপিত করেছিলেন। এবং এই মূল্যবোধ যে শুধুমাত্র তাঁদের মধ্যেই ছিল তা বলবো না। আমি আজকে একথা বলতে চাই না যে কেবলমাত্র যাঁরা কমিউনিস্ট পার্টি করেছেন তাঁদের মধ্যেই একটা মতাদর্শ ছিল, কিন্তু আরো অনেকে ছিলেন, যাঁরা হয়তো কমিউনিস্ট পার্টিতে ছিলেন না। কিন্তু তাঁরাও কতগুলো সাধারণ মূল্যবোধ নিয়ে চলতেন।

এই আসানসোল শহরে দেখেছি কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠিত নেতা ছিলেন ডা. জি আর মিত্রকে। দেখেছি বিজয় পালের সঙ্গে তাঁর গভীর বন্ধুত্ব। দেখেছি কীভাবে পরস্পর পরস্পরকে শ্রদ্ধা করতেন। বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতেন, আলাপ করতেন। তাঁদের মত ছিল আলাদা, পথও আলাদা। তাঁরা সম্পূর্ণ বিপরীত পথে হাঁটতেন। তাঁরা দুজনে দু-ভাবে দেশকে মুক্ত করার কথা ভেবেছেন। তাঁরা দুজনে দু-ভাবে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা ভেবেছেন। তার জন্য তাঁরা তর্ক করেছেন, সম্মুখ সমরে নেমেছেন, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। তীব্র তীক্ষ্ণ সে লড়াই। সে বিতর্ক মানুষ শুনেছে, উপলব্ধি করেছে। কিন্তু এইসব বিতর্কের মধ্যে অসুঃসলিলা ছিল এক মূল্যবোধ— বহুত্ববাদের প্রতি এক গভীর শ্রদ্ধা, ভালোবাসা।

গণতন্ত্রের কতগুলো অন্তর্নিহিত শর্ত আছে, অন্যথায় গণতন্ত্র টিকতে পারে না। সংখ্যালঘুর মত ও পথের মর্যাদা গণতন্ত্রের অন্যতম বড় শর্ত। আজ আমাদের দেশ এমন একটা সময়ের মধ্যে দিয়ে চলেছে যেখানে সংখ্যালঘুর অস্তিত্বই বিপন্ন। আজকে তারা নিজেদেরকে বিপদে ভাবেছে। শুধু ধর্মের প্রশ্নে নয়, রাজনৈতিক পথের ক্ষেত্রে, চিন্তার ক্ষেত্রে, জাতের ক্ষেত্রে—যে-কোনো ক্ষেত্রেই চারিদিকেই আমাদের এই মৌলিক স্তম্ভ আক্রান্ত। আজ আক্রান্ত শুধু ব্যবস্থাটাই নয়, আক্রান্ত হচ্ছে সেই মূল্যবোধগুলি। সেই পরমত সহিষ্ণুতা—যা ছিল আমাদের পরম সম্পদ—তা আর আমাদের মধ্যে নেই।

আমরা কীভাবে আমাদের কথা মানুষের কাছে নিয়ে যাবো? কীভাবে মানুষকে জয় করে নিয়ে অসবো? মানুষকে জোর করে

পদানত করা যায়, কিন্তু মানুষকে জোর করে জয় করা যায় না। রাজনৈতিক দলের যদি লক্ষ্য হয় মানুষকে জয় করা, তাহলে মানুষকে জয় করার জন্য মানুষের কাছেই যেতে হবে। মানুষের সুখ-দুঃখের সাথী হতে হবে। মানুষের সুখ- দুঃখকে সঙ্গে নিয়েই তার সংগ্রাম। রাজনৈতিক ময়দানে মানুষের সঙ্গে থেকে মানুষকে জয় করে নিতে হবে।

বিজয়দা শুধুমাত্র সি পি আই(এম)-এরই নেতা ছিলেন না। একথা আসানসোলের মানুষ মনে করেন না। বিজয়দার সার্থকতা সমগ্র জীবনের অনুশীলনের মধ্যে। বিজয়দা শুধুমাত্র কমিউনিস্ট পার্টির নেতা হিসেবেই কর্মীদের কাছে পরিচিত বা গৃহীত হন নি। বিজয়দা সমগ্র আসানসোলের মানুষের কাছে নিজেকে নেতা হিসেবে পরিগণিত করতে পেরেছিলেন।

আজকের দিনে এটাই একটা বড় চ্যালেঞ্জ আমাদের সকলের সামনে। যে নিজস্ব গণ্ডি, সেই গণ্ডির বাইরে আমরা বেরোতে পারছি কিনা। সেই বৃত্তকে অতিক্রম করে সমগ্র শ্রমজীবী মানুষের কাছে পৌঁছতে হবে। এবং সকলের কাছে মানুষ হিসাবে আমাদের পরিগণিত হতে হবে। বিজয়দা আমাদের সামনে সেই শিক্ষাটাই বারবার দিতে চেয়েছেন। বিজয়দার জীবন থেকেই তো আমাদের শিখতে হবে। সেই মূল্যবোধ, সেই গুণাবলী, যাকে আয়ত্ত করার মধ্যে দিয়ে আমাদের সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

মানুষকে দুভাবে লড়াই করতে হয়। এক—সমাজের সকলকে নিয়ে একটা সংগ্রাম। সমাজের নিপীড়িত, শোষিত, সাধারণ গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ, তাদের দাবি-দাওয়া, সমস্যা, সুখ-দুঃখকে কেন্দ্র করে এক ধরনের লড়াই, আন্দোলন, সংগ্রাম। আর একটা লড়াই আমাদের নিজের সঙ্গে নিজেকে করতে হয়। কেমন করে আমি আমার সর্বস্ব দিয়ে যে বৃহত্তর সংগ্রাম হচ্ছে সেই সংগ্রামে নিজেকে নিবেদিত করতে পারি। আজকের দিনে সেই সংগ্রাম প্রতিদিন আমাকে নিজের সঙ্গে করতে হয়। আমরা কি সত্যিই সেই কাজ সেই ভাবে করতে পারছি? আমরা যদি সেই কাজটা ঠিক মতন করতে পারি, তাহলে বিজয়দার উত্তরাধিকার সঠিকভাবে বহন করতে পারবো। সেই মূল্যবোধের উত্তরাধিকার। আজকে এই সময়ে আমাদের কাছে মানুষের চাহিদা সব থেকে বেশি। এটাই মানুষ আমাদের কাছে চায়।

আমরা দীর্ঘদিন সরকারে থেকেছি। মানুষ কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। দলে দলে মানুষ এসে জড়ো হয়েছিলেন। প্রাণ দিয়েছিলেন, জীবন দিয়েছিলেন, আত্মত্যাগ করেছিলেন। সেসব কাহিনি তো আমরা জানি। কত মানুষ জীবন দিয়েছেন— কত স্বপ্ন নিয়ে, কত আশা নিয়ে। কিন্তু সেই জায়গায়, তাকে ধরে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার যে কাজ, একজন কমিউনিস্ট কেমন হবেন, একজন রাজনীতিক ব্যক্তিত্ব কেমন হবেন, এ সম্পর্কে মানুষের মধ্যে যে প্রত্যাশা সৃষ্টি হয়েছিল, সেই প্রত্যাশায় কোনো আঘাত পেয়েছে কিনা—এটাই এখন আমাদের সামনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কঠিন এবং কঠোর প্রশ্ন।

বিজয়দার জন্মশতবর্ষে দাঁড়িয়ে তাঁর জীবনচর্চা নিয়ে আমাদের অনুশীলন করতে হবে। সেই অনুশীলন যদি আমরা করতে পারি তাহলে মানুষকে আমরা লড়াইয়ের ময়দানে দাঁড় করাতে পারবো। আজ চারদিকে মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে। অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি সর্বত্রই এই আক্রমণ। এত ক্ষুধার্ত মানুষের বাস আমাদের দেশে। এর জন্য আইন করতে হচ্ছে। কিন্তু সেই আইনে আমাদের দেশের মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা কতখানি আসবে তা আমরা জানি না। আমাদের দেশ দ্রুত এগিয়েছে, অথচ আমাদের দেশে পৃথিবীর সব থেকে বেশি ক্ষুধার্ত মানুষের বসবাস। সব থেকে

বেশি শিশু অপুষ্টিতে ভোগে। আমাদের দেশেই সব থেকে বেশি মা যারা রক্তগর্ভতায় ভোগেন, সন্তান প্রসব করতে গিয়ে মারা যান। এ স্বাধীনতার জন্য কি বিজয়দারা লড়াই করেছিলেন? আবার এই দেশেই আমরা কেমন ভাবে নিজেদের ক্ষত-বিক্ষত করছি। কোথাও জাতের নামে, কোথাও ধর্ম ও সম্প্রদায়ের নামে, আবার কোথাও রাজনৈতিক হানাহানিতে লিপ্ত হচ্ছি। এক রাজনৈতিক দল অন্য রাজনৈতিক দলের উপর অক্রমণ করছে। গণতন্ত্রের সবকিছু স্তম্ভ আক্রান্ত হচ্ছে। আইনসভা আক্রান্ত। বিচার ব্যবস্থা আক্রান্ত। আক্রান্ত প্রশাসন। নিরপেক্ষতা আজকে মানুষের কাছে উপহাসের বস্তুতে পরিণত হয়েছে।

আজকে সব কিছুই অর্থ দিয়ে খরিদ করা যাচ্ছে। রাজনৈতিক নেতারা বিক্রি হয়ে যাচ্ছেন। নির্বাচিত সাংসদরা, বিধায়করা, কাউন্সিলাররা, কমিশনাররা বিক্রি হয়ে যাচ্ছেন। এ এক অদ্ভুত পরিমণ্ডল তৈরি হয়েছে, যে পরিমণ্ডলে আমাদের মূল নৈতিক মূল্যবোধগুলি ধ্বংস হচ্ছে।

এটা শুধু উপর দিকেই হচ্ছে তা নয়, ক্রমশ মানুষের গভীরে প্রবেশ করছে। এটা যদি ঘটতে থাকে, তাহলে এর বিপদ মারাত্মক হতে পারে। এই কারণেই মূল্যবোধের প্রশ্ন—একুশ শতকে আমাদের লড়াইয়ে নতুন করে চ্যালেঞ্জ হয়ে সামনে এসেছে। এ এক এমন ব্যবস্থা যে-ব্যবস্থায় মানুষকে আত্মকেন্দ্রিক করে গড়ে তোলার জন্য সর্বগ্রাসী আয়োজন। যেখানে সন্তান পিতাকে অস্বীকার করে। পরিবার পরিজনকে অস্বীকার করে। এখানে সমগ্র সমাজকে একত্রিত করা দূরের কথা, ছোট-ছোট পরিবারগুলো ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। এক চরম আত্মকেন্দ্রিকতা গোটা সমাজকে গ্রাস করছে। মানুষকে বোঝানো হচ্ছে আগে তুমি বাঁচো, তারপর অন্যের বাঁচার কথা তুমি চিন্তা করবে। আর তোমার বাঁচার জন্য তুমি যে পথই গ্রহণ করবে সেই পথই ন্যায্য। মানুষের সামাজিক সত্তা, মানুষ যে একটা সমাজবদ্ধ জীব, বন্য প্রাণীর সঙ্গে মানুষের মৌলিক পার্থক্য রয়েছে—সেই পার্থক্যকে ভুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। মনে হচ্ছে মানুষের মধ্যে যে জাস্তব স্পৃহা আছে—সেই জাস্তব স্পৃহাকে, সেই স্পিরিটকে, জাগিয়ে তোলার আহ্বান আজকে দিকে দিকে দেওয়া হচ্ছে। এর মধ্যেই আত্মকেন্দ্রিকতা, মূল্যবোধের সংকট, আমাদের রাজনৈতিক জীবনে ভয়ঙ্কর সংকট হিসাবে গ্রাস করছে। যা থেকে আমরা কেউ মুক্ত থাকতে পারছি না।

এইরকম একটা সময়, এইরকম একটা মুহূর্তে, এমন কিছু মানুষের কথা আমাদের বারবার মনে করা দরকার, স্মরণ করা দরকার, নতুন প্রজন্মের কাছে নিয়ে যাওয়া দরকার। তাদের কাছে

বলা দরকার, তাঁরা তাঁদের সমগ্র জীবনকে কিসের জন্য ব্যয় করেছেন। কী তাঁরা মনে করেছিলেন? তাঁদের জীবনের সার্থকতা কোথায়? যদি সেই কাজটা আমরা ঠিক ভাবে করতে পারি, তাহলে জন্মশতবর্ষ পালন সার্থক হবে। বিজয়দা এই পথেরই সন্ধান করেছিলেন। তিনি গান্ধিজীর কাছেও গিয়েছিলেন সেই পথেরই সন্ধানে। তিনি মার্কসবাদের আদর্শে দীক্ষিত হয়েছিলেন। শ্রমিকদের মধ্যে, কৃষকদের মধ্যে মুক্তির সম্ভাবনাকে খুঁজে পেয়েছিলেন। ফলে তাদেরকে ঘিরেই তাঁর স্বপ্ন, তাদেরকে ঘিরেই তাঁর কর্মচাঞ্চল্য, তাদেরকে ঘিরেই তাঁর সমগ্র জীবন নির্বাহ করেছিলেন। তাঁর নিজের পরিবার—সংসার অবহেলিত হয়েছে। তাদের দিকে তাকান নি। বিজয়দার সংসার আছে, বিজয়দার স্ত্রী কোথায় থাকেন, তাঁর মেয়ে কীভাবে মানুষ হচ্ছে, এসব তো অনেকে জানতেনই না। কারণ বিজয়দা সে দিকে সময় দেবার কোনো সময়ই পাননি। এক বৃহত্তর সংসারের জন্য তিনি তাঁর সমগ্র জীবনকে নিবেদন করেছিলেন। সেই নিবেদিতপ্রাণ মুক্তিকামী মানুষটি, তিনি শুধু আসানসোলার রূপকার নন। তিনি একটি সময়ের প্রতীক, যুগের প্রতীক, একটি আদর্শের প্রতীক। মুক্তির সন্ধানে এক অক্লান্ত পথিক। সেই মানুষটির জন্য আমাদের সমগ্র শ্রদ্ধা—শুধু শ্রদ্ধা নয়, আমাদের অনুসন্ধিৎসা।

সেই পথচলাকে ঘিরেই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।

তিনিই একথা বলতে পারেন—

মৃত্যুর অন্তরে পশি অমৃত না পাই যদি খুঁজে,
সত্য যদি নাহি মেলে মিথ্যা সাথে যুঝে
পাপ যদি নাহি মরে যায় আপনার প্রকাশ লজ্জায়
অহঙ্কার যদি নাহি মরে
আপনার অসহ্য সজ্জায়
তবে ঘরছাড়া হবে অন্তরের কী আশ্বাস হবে
মরিতে ছুটিছে শত শত
প্রভাত আলোর পানে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রের মতো ।
বীরের এ রক্তস্রোত মাতার এ অশ্রুধারা
এর যত মূল্য সে কি ধরার ধুলায় হবে হারা?
স্বর্গ কি হবে না কেনা, বিশ্বের ভাণ্ডারী শুধিবে না এত ঋণ
রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবে না দিন?...

এ কথা মাথায় রেখেই আজকে বিজয়দার এই জন্মশতবর্ষে আমরা যেন সেই চর্চা করতে পারি, সেই অনুশীলন করতে পারি—যার মধ্য দিয়ে সত্যি সত্যি আমরা আমাদের নিজেদের চলার পথ আমরা খুঁজে নিতে পারি। আমরা যেন আগামী দিনে সত্যি সত্যি বিজয়দার সেই উত্তরাধিকার বহন করতে পারি, তার যোগ্য হয়ে উঠতে পারি। তার জন্যে আমাদের যে লড়াই সেই লড়াই যদি আমরা করতে পারি, তবেই বিজয়দার জন্মশতবর্ষ পালন সার্থক হবে।

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

রায়না গ্রাম পঞ্চায়েত

রায়না, বর্ধমান

পল্টু মালিক
উপ-প্রধান

মাধবীলতা ধারা
প্রধান

Sl. No. 197

- ডেঙ্গু, এনসেফালাইটিস ও ম্যালেরিয়া সম্পর্কে সচেতন হোন
- বাড়ির আশেপাশে জল জমতে দেবেন না। নিজের এলাকা পরিষ্কার রাখার চেষ্টা করুন।
- চৌবাচ্চা, জলের ট্যাঙ্ক, কুলার এবং বাড়ির অন্যান্য জলাধারের জল জমিয়ে রাখবেন না।
- মশার কামড় থেকে বাঁচতে গা-ঢাকা পোষাক পরুন।
- মশারি ব্যবহার করুন।
- পৌরসভার পক্ষ থেকে মশা মারার তেল স্প্রে করা হচ্ছে। দেওয়া হচ্ছে ব্লিচিং পাউডার।
- নিজের বাড়ির জঞ্জাল যত্রতত্র না ফেলে নির্ধারিত ভ্যাটে/ডাস্টবিনে ফেলুন। নর্দমার মধ্যে কোনে আবর্জনা ফেলবেন না।
- তীব্র জ্বর, মাথা ব্যথা, মাংসপেশি ও গাঁটে ব্যথা, খিঁচুনি সহ কোনোরকম অস্বাভাবিকতা দেখা দিলে দেরি না করে তৎক্ষণাত চিকিৎসা কেন্দ্রে রোগীকে নিয়ে যেতে হবে।

রানিগঞ্জ পুরসভা কর্তৃক প্রচারিত



সৈনিক থেকে সেনাপতি

অরিন্দম কোঙার

সিংহবিক্রম

সারা জীবন সিংহবিক্রমে লড়ে গেছেন, লড়াই পরিচালনা করেছেন এমন একজন জননেতা হরেকৃষ্ণ কোঙার। শেষ পর্যন্ত মাত্র ৫৯ বছর বয়সে রণভূমিতেই তিনি তাঁর গাণ্ডিব নামিয়ে রাখেন ১৯৭৪ সালের ২৩ জুলাই। মৃত্যু হয় দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগে কলকাতায়। তখন পশ্চিমবঙ্গে আধা-ফ্যাসিবাদী সন্ত্রাস। খুন, জখম, জেল, এলাকাচ্যুতি, নারী-নির্যাতন, স্কুল-কলেজে ভাঙচুর নিত্যকার ঘটনা। তারই মাঝখানে হরেকৃষ্ণ কোঙারের মরদেহ নিয়ে শোকমিছিল। সন্ত্রাসের বাঁধ-ভেঙে প্রিয়জন হারানোর বিয়োগ-ব্যথা নিয়ে সংগ্রামের আহ্বানে গলা মিলিয়ে, সংগ্রামের ময়দানে পায়ে পা মিলিয়ে, হাতে হাত ধরে লক্ষ লক্ষ মানুষের শোকমিছিল। শোকমিছিল তো নয়, লড়াইয়ের দীপ্ত ঘোষণা। কী সেই লড়াই, কী তার ঘোষণা? লড়াই জীবনজয়ের। ঘোষণা জোট বাঁধার। এখানে কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নেই। জোট বাঁধতে হবে, লড়াই করতে হবে, লড়াইয়ে জিততে হবে, প্রয়োজনে প্রাণ দিতে হবে। ১৯৬০ সালে সে দেশের ওয়ার্কার্স পার্টির কংগ্রেসে যোগ দিতে হরেকৃষ্ণ কোঙার ভিয়েতনাম গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র গিয়েছিলেন। সেখানকার অভিজ্ঞতা জেনে ও প্রবাদপ্রতিম নেতা হো চি মিনের সঙ্গে আলোচনা করে যে শিক্ষা হরেকৃষ্ণ কোঙার বারে বারে তুলে ধরতেন, তা হচ্ছে, “বহু অভিজ্ঞতার বিনিময়ে মানুষ লড়াইতে সামিল হয়। সশস্ত্র প্রতিরোধ দেওয়ালে রাইফেল আঁকার মতো সোজা নয়। ‘লড়ব ও মরব’ এই মনোভাবে উদ্দীপিত হলেও

সেইমত প্রস্তুত হলে তবেই জনগণ বিপ্লবী পরিস্থিতিতে সফলভাবে কাজে লাগাতে পারে। সত্যিই লেনিনের এই কথা আমরা কেবল পড়েছি, হৃদয়ঙ্গম করিনি। মরতে প্রস্তুত হলেই মানুষ লড়তে পারে। আর লড়তে শিখলে তবে বাঁচবে। নিজেরা বাঁচতে যারা পাগল তারা বাঁচতে জানে না। জীবনকে ভালোবাসতে যে জানে, সে শত্রুকে ঘৃণা করতেও জানে। স্ত্রী, স্বজন, পরিজন ও জনগণের প্রতি ভালোবাসাই মানুষকে ন্যায় সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করে। যে শত্রুকে ঘৃণা করতে অক্ষম সে জনগণকে ভালোবাসতেও অপারক।” (ভিয়েতনামের শিক্ষা ও স্মৃতি)

হরেকৃষ্ণ কোঙারের জন্ম ১৯১৫ সালের ৫ আগস্ট। বর্ধমান জেলার রায়না থানার কামারগড়িয়া গ্রামে। বন্যা-কবলিত গ্রামে কৃষক পরিবারে। কৃষি থেকে কিছু অর্থ সংগ্ৰহ করে সেই পুঁজি নিয়ে বাবা শরৎচন্দ্র কোঙার তাঁর সেজদার সঙ্গে প্রথমে চব্বিশ পরগনা জেলার পানিহাটিতে ও তারপর এককভাবে চলে যান বর্ধমান জেলার মেমারিতে। ব্যবসা শুরু করেন। বাড়ি করেন মেমারির সন্নিকটে দক্ষিণ রাধাকান্তপুর গ্রামে। মেমারি তখন ছিল একটা ব্যবসাকেন্দ্র, গঞ্জ। বর্তমানে মেমারি পৌর শহর হয়েছে আর মেমারি পৌর এলাকার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে দক্ষিণ রাধাকান্তপুর। পেশাগতভাবে শরৎচন্দ্র কোঙারের পরিবার হয়ে ওঠে ব্যবসাদার পরিবার। অর্থবান পরিবার। সেই পরিবারের বড় ছেলে হরেকৃষ্ণ কোঙার লড়াইয়ের ময়দানে আসেন মেমারি বিদ্যাসাগর স্মৃতি বিদ্যামন্দিরের নবম শ্রেণির ছাত্র থাকাকালীন স্বাধীনতা সংগ্রামের আইন অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে এবং ৬ মাস জেলে

আটক থেকে। সালটা ১৯৩০। সেই শুরু। মৃত্যুশয্যায় যখন তিনি অসংলগ্ন কথাবার্তা বলছেন, তখনও মৃত্যুর আগের দিন, ২২ জুলাই শেষ কথা, “রেলওয়ে স্ট্রাইকের তাৎপর্য আমাদের বুঝতে হবে। এটা বোঝার প্রয়োজন আছে যে ...।” উল্লেখ্য, ১৯৭৪ সালের ৮ মে থেকে ২৮ মে দেশের ২০ লক্ষ রেলকর্মী দেশব্যাপী ধর্মঘট করেন। ১৯৩০ সাল থেকে ১৯৭৪ সাল—হরেকৃষ্ণ কোঙারের সংগ্রামী জীবন ছিল আইন অমান্য আন্দোলনে, জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী আন্দোলনে, কমিউনিস্ট আন্দোলনে সমৃদ্ধ। জেল, সশ্রম কারাদণ্ড, বিনা বিচারে বন্দি, আন্দামানের সেলুলার জেলের ছোট্ট কুটুরি, আত্মগোপন, চলাচলে নিষেধাজ্ঞা, দৈহিক আক্রমণ—এইসব বাধা অতিক্রমে অবিচল সংগ্রামের নেতা হরেকৃষ্ণ কোঙার। পরাধীনতা, শোষণ-বঞ্চনা, নির্যাতন-নিপীড়ন অবসানে নিবেদিত প্রাণ।

সৈনিকের গর্ব

ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ মুজফ্ফর আহমদ। হরেকৃষ্ণ কোঙার মনে করতেন, “... সারা জীবনের সাধনার মধ্য দিয়ে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত গণ-মুক্তির এক বিপ্লবী বাহিনী সৃষ্টি করে গেছেন, তিনিই হলেন আমাদের শ্রদ্ধেয় মুজফ্ফর আহমদ—আমাদের সকলের প্রিয় কাকাবাবু। অন্যান্য অনেকের মত আমি নিজেও নিজেকে কাকাবাবুর সৃষ্ট সেই বাহিনীর একজন সৈনিক মনে করে গর্ববোধ করি” (কাকাবাবুর কথায় যা মনে আসে) সেই সৈনিকই তো হয়ে উঠেছিলেন সেনাপতি। সেনাপতি গণ-আন্দোলন পরিচালনায়, সেনাপতি বুর্জোয়া-জমিদার রাষ্ট্র কাঠামোয় রাজ্য সরকারের দপ্তর পরিচালনায়। মার্কসবাদী-লেনিনবাদী শিক্ষায় রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলে বিপ্লবের লক্ষ্যে হরেকৃষ্ণ কোঙার মনে করতেন, “নেতৃত্বের কাজ শুধু সঠিক নীতি নির্ধারণই নয়, সেই নীতিকে জনগণের নীতিতে পরিণত করা, সেই মতো জনগণকে সংগঠিত করা ও তাদের সংগ্রাম পরিচালনা করা।” (ভিয়েতনাম ও ভারত) সাংগঠনিক পরিকল্পনায়, মাঠে-ঘাটে আন্দোলন পরিচালনায়, বলায় ও লেখায় সত্যিই তিনি হয়ে উঠেছিলেন এক সেনাপতি।

হরেকৃষ্ণ কোঙার যখন অসুস্থ হয়ে নার্সিংহোমে আস্তে আস্তে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন, তখন মানুষের উদ্বেগ এবং তাঁর মৃত্যুর পর বাঁধাভাঙা শোকমিছিল বুঝিয়ে দিয়েছিল তিনি জনগণের মধ্যে কতটা স্থান করে নিতে পেরেছিলেন। সেই সময়ে একটা সুপরিচিত বাংলা সংবাদ-সাপ্তাহিক ছিল ‘বাঙলা দেশ’। এই সাপ্তাহিকের এক সাংবাদিক লিখেছেন, “ভাগ্যিস্ তিনি দেবতা হন নি। হলে পরে



আমরা কিশোরের জীবনের শরিক এই অপরূপ মানুষটিকে হারালাম। শহরের পালিশ করা ভদ্রতার বাতাবরণে তিনি মানুষ হননি। তাই মাপ করে, মনের প্যাঁচ গোপন করে, মুখে মিষ্টি হেসে কথা বলতে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন না। মনের ভাব গোপন না করে যা বলার সোজাসুজি তা-ই বলতে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন। একে দোষ বলব না গুণ বলব তা জানি না। কিন্তু এ জন্যই তিনি ভারতবর্ষের কোটি কোটি কৃষকের আপনজন ছিলেন। তারা হরেকৃষ্ণ কোঙারের মধ্যে আপনজনের প্রতিচ্ছবি দেখতে পেত। আবার এই মানুষটিকেই দেখেছি তথাকথিত শিক্ষিতদের সামনে পাকা চার ঘন্টা ধরে চোস্ত ইংরেজিতে বক্তব্য রাখতে। অথচ প্রচলিত অর্থে তিনি উচ্চশিক্ষিত ছিলেন না। স্বদেশে, বিদেশে বহু জায়গায় তিনি পরদেশী ভাষায় কেবল জনসভা নয়, গভীর তত্ত্ব ও তথ্যনিষ্ঠ বক্তব্যও রেখেছেন—মানুষ অবাক হয়ে শুনেছে, অবাক হয়ে শুনেছে বিরোধী শত্রুপক্ষও।” (মেহনতী মানুষের আপনজন হরেকৃষ্ণ কোঙার) হরেকৃষ্ণ কোঙার সম্পর্কে এইরকম নানা বিবরণ, বিশ্লেষণ, অভিজ্ঞতা আছে, যার থেকে এক দক্ষ রাজনৈতিক সেনাপতির পরিচয় পাওয়া যায়।

যুক্তফ্রন্ট সরকার

পশ্চিমবঙ্গে প্রথম অকংগ্রেসি সরকার গঠিত হয় ১৯৬৭ সালে। এই যুক্তফ্রন্ট সরকার স্থায়ী হয় প্রায় ৯ মাস। আবার যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হয় ১৯৬৯ সালে। ১৯৬৯-৭০ সালে স্থায়িত্ব প্রায় ১৩ মাস। প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারকে কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকার ভেঙে দেয় আর দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙে যায়। ভেঙে দেওয়া বা ভেঙে যাওয়ার কারণ একই—শ্রেণি সংঘাত। যুক্তফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী বাংলা কংগ্রেসের নেতা আর বাংলা কংগ্রেস বুর্জোয়া-জমিদারদের দল। উপমুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু এবং ভূমি ও ভূমি রাজস্ব মন্ত্রী হরেকৃষ্ণ কোঙার ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র নেতা আর সি পি আই(এম) শ্রমিক শ্রেণির পার্টি। জ্যোতি বসু প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে অর্থ ও পরিবহন এবং দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে স্বরাষ্ট্র দপ্তরেরও মন্ত্রী ছিলেন। ১৪টা বাম ও অ-বাম দল নিয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়েছিল। ১৯৬৭ সালে নির্বাচনের পর যুক্তফ্রন্টের ১৮-দফা কর্মসূচি স্থির হয়েছিল আর ১৯৬৯ সালে নির্বাচনের আগে যুক্তফ্রন্টের ৩২-দফা কর্মসূচি তৈরি হয়েছিল। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) তার পার্টি কর্মসূচি অনুযায়ী সরকারে অংশগ্রহণ করেছিল এবং সেই কর্মসূচির নির্দেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে যুক্তফ্রন্ট সরকারের কর্মসূচি রূপায়ণে আন্তরিক ছিল। হরেকৃষ্ণ কোঙারের মতে, “১৯৬৭ সালে প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন এবং ১৯৬৯ সালে আরো উন্নত পর্যায়ের যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠা কৃষক আন্দোলনের দুর্বীর অগ্রগতির অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করলো। পশ্চিমবঙ্গে সংগঠিত শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলন কংগ্রেসকে পরাজিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে বলেই এখানে যুক্তফ্রন্ট সরকারের চরিত্র ছিল সংগ্রামী। এই সব আন্দোলনের নেতা ও সংগঠক মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি ছিল যুক্তফ্রন্টের প্রধান শক্তি। এই সরকার জনগণের মনে অলীক আশা সৃষ্টি করে নাই; জনগণের সংগ্রামের উৎসমুখ খুলে দিতে সাহায্য করেছিল মাত্র। গণ-আন্দোলনের বিরুদ্ধে পুলিশের অত্যাচার বন্ধ করে এই সরকার এক তাৎপর্যপূর্ণ ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছে।” (কৃষক আন্দোলনের কঠিন সমস্যা) সুতরাং সরকারের ভেতরে ও বাইরে শ্রেণি সংঘাত অনিবার্য ছিল আর শ্রেণি সংগ্রাম, শ্রেণি সংঘাত কোথাও কোথাও শ্রেণি সংঘর্ষে পরিণত হয়েছিল যা অস্বাভাবিক ছিল না।

এই যুক্তফ্রন্ট ও যুক্তফ্রন্ট সরকারের অভিমুখ কী? এইরকম একটা প্রশ্নে ১৯৭৩ সালে হরেকৃষ্ণ কোণ্ডার দেখান যে, “গণ-সংগ্রামের জন্য ও তার প্রয়োজনে যুক্তফ্রন্ট, কিন্তু মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মতে যুক্তফ্রন্ট কোন স্থিতিশীল ধারণা নয়। জনগণের বিভিন্ন শ্রেণি ও স্তরের বিশেষ ঐক্যের একটা পার্টিগত প্রতিফলন হল যুক্তফ্রন্ট। যুক্তফ্রন্টের একটা বিশেষ রূপ অবস্থা নির্বিশেষে স্থায়ী হতে পারে না। অবস্থার পরিবর্তনে তার চরিত্রও পরিবর্তিত হয়। যুক্তফ্রন্ট সরকার ছিল সংগ্রামের হাতিয়ার। তাই, সঠিকভাবেই গণ-সংগ্রামের কোন ছোটখাটো ক্রটি বিচ্যুতি হয় না, তা নয়। কোটি কোটি মানুষ সংগ্রামে নামলে এরকম হতে বাধ্য।” (গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের বৈপ্লবিক তাৎপর্য)

১৯৭৪ সালে হরেকৃষ্ণ কোণ্ডারের জীবনাবসান হয়। ১৯৭৫ সালে দেশে আভ্যন্তরীণ জরুরি অবস্থা জারি হয়। স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের জন্য ব্যাপকতম মঞ্চ গড়ে ওঠে। ১৯৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়। যুক্তফ্রন্ট সরকার ছিল সংগ্রামের হাতিয়ার। আর বামফ্রন্ট সরকার হয় সংগ্রামের সহায়ক শক্তি। ১৯৭৮ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) বিকল্প শক্তি হিসাবে বাম ও গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গড়ে তোলার আহ্বান জানায়। দেখা যাচ্ছে হরেকৃষ্ণ কোণ্ডারের ভাবনা বাস্তব রূপ নিচ্ছে।

সম্ভ্রাসের মাঝখানে

১৯৭০ সালের ১৬ মার্চ যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙে যায়। প্রতিবাদে ১৭ মার্চ রাজ্যজুড়ে ধর্মঘট ও হরতাল পালিত হয়। কোথাও কোথাও রাজনৈতিক সংঘর্ষ হয়। অন্তত ২৫ জন মানুষ মারা যান। প্রায় সকলেই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র নেতা, কর্মী ও সমর্থক। বর্ধমান শহরে ৩ জন মারা যান যাঁরা কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত। সি পি আই(এম)- বিরোধীদের প্রচারে এই সংঘর্ষ ‘সাঁইবাড়ি ঘটনা’ হিসাবে পরিচিত। প্রচার বলে প্রচার! আক্ষরিক অর্থেই কুৎসা, রোমহর্ষক কাহিনী তৈরির বান ডেকে গিয়েছিল। এমনকী এই প্রচারে রাজ্যপালও জড়িত হয়ে গিয়েছিলেন। রাজ্যপাল তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে বর্ধমান সাঁই পরিবারে এসেছিলেন। রাজ্যপালের এই ভূমিকার সমালোচনা করে ২ এপ্রিল হরেকৃষ্ণ কোণ্ডার রাজ্যপালকে এক চিঠিতে লেখেন, “আমি এখনও মনে করি যে, আপনার বর্ধমানে গমন, যোভাবে আপনার সফর পরিচালিত হয় এবং আপনার গতিবিধি ও মন্তব্যগুলি আমাদের পার্টির বিরুদ্ধে কংগ্রেসের প্রচারকে জোরদার করতে সাহায্য করেছে। কুৎসা প্রচার বিমিয়ে আসছিল এবং জনগণকে তা বিভ্রান্ত করতে পারছিল না। এমনকি, অশোক সেন এম পি বা প্রফুল্ল সেনও তাঁদের সভায় বেশি লোক টেনে আনতে পারেননি। প্রচারটাকে উসকে দেবার জন্য কংগ্রেস আপনার সফরকে ব্যবহার করতে চেয়েছিল এবং কয়েকটা পকেট সংগঠন থেকে প্রতিনিধি পাঠাবার ব্যবস্থা হয়েছিল। আপনার সফর তাদের কৃতার্থ করেছে।” সেই দিনই অর্থাৎ ২ এপ্রিল হরেকৃষ্ণ কোণ্ডারের পরামর্শে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) বর্ধমান শহরে এক জনসভার আয়োজন করেছিল।

চারিদিকে সম্ভ্রাস। বোমা বর্ষণের মধ্যেই বিশাল সমাবেশ। সভাপতি বিনয় চৌধুরী। বক্তা জ্যোতি বসু, হরেকৃষ্ণ কোণ্ডার, কৃষ্ণচন্দ্র হালদার, ওয়ার্কাস পার্টির নেতা অধ্যাপক জ্যোতি ভট্টাচার্য। ২ দিন আগেই ৩১ মার্চ পাটনা রেলস্টেশনে জ্যোতি বসুকে খুন করার জন্য আততায়ী গুলি করে। গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। কিন্তু দুঃখজনকভাবে পার্টির ঘনিষ্ঠ দরদি এল আই সি ফিল্ড অফিসার সৈয়দ আলি ইমাম নিহত হন। বর্ধমানের ঘটনার কার্য-কারণ সম্পর্ক তুলে ধরে এই

জনসভায় হরেকৃষ্ণ কোণ্ডার বলেন, “কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি, জ্যোতি বসুর হাতে যদি একটা রিভলভার থাকতো পাটনা রেলস্টেশনে। ওই আততায়ী যখন গুলি করেছিল, ধরুন যদি তখন জ্যোতি বসু দুটো রিভলভারের গুলি করে ওই লোকটাকে ধরাশায়ী করে দিত। আর স্টেশনে যে কয়েক হাজার লোক জড়ো হয়েছিল, তারা যদি তাকে পিটিয়ে পিটিয়ে ছাতু করে দিত, অপরাধ কি জ্যোতি বসুর হতো? কেন? তার গুলিটা তো জ্যোতি বসুর বুকে লাগেনি। কিন্তু জ্যোতিবাবুর গুলিটা তার বুকে লাগলো কেন? অপরাধ কি তাঁর হতো? কী বলবেন আপনি? জ্যোতি বসু মরেননি আমাদের সৌভাগ্য। ভারতবর্ষের শ্রমিক-কৃষকের সৌভাগ্য। কংগ্রেসিদের দুর্ভাগ্য। জ্যোতিবাবু মরেননি। কবর রচনা করতে চেয়েছিলে, একটু চেষ্টা করে দেখবে।” উল্লেখ্য, ছাত্র পরিষদ বর্ধমানে পোস্টার দিয়েছিল যে, ‘বর্ধমান জ্যোতি বসুর কবরস্থান’। কীভাবে একটা ঘটনার সঙ্গে আর একটা ঘটনা যুক্ত করে দিলেন হরেকৃষ্ণ কোণ্ডার তাঁর বক্তৃতায় যাতে শ্রোতাদের বুঝতে অসুবিধা হলো না।

১৭ মার্চ ত্রিবেণীর কেশোরাম রেয়নে ৩জন সি পি আই(এম) কর্মী ও সমর্থক নিহত হন। তাঁদের একজন ট্রেড ইউনিয়ন নেতা ননী দেবনাথ। পূর্বোক্ত জনসভায় রাজ্যপালের বর্ধমানে সন্ত্রাসী সাঁই পরিবারে আসাকে তীব্র সমালোচনা করে হরেকৃষ্ণ কোণ্ডার বলেন, “কমরেড ননী দেবনাথ। তার মা নাই? তার বোন নাই? তাদের চোখে জল নাই? তাদের আপনাদের মতো বুক নাই? আমি তো জিজ্ঞাসা করেছি গভর্নরকে। বর্ধমানে গিয়েছিলে তুমি, হুগলি যাওনি। তফাৎটা কি এই যে ননী দেবনাথ কোন দিন চুরি করেনি? ননী দেবনাথ কোনো দিন রাস্তায় দাঁড়িয়ে কাউকে ছুরি মেরে খুন করেনি। ননী দেবনাথ সি পি এম মেরে গুণ্ডা হিসেবে জেলে কোনো দিন ছিল না। সেইজন্য গভর্নর সেখানে গেলেন না। না গিয়ে থাকলেন।” এই জনসভার আগেই ৩১ মার্চ বর্ধমানের ঘটনা নিয়ে কোণ্ডার রাজ্যপালকে একটা চিঠি দেন। রাজ্যপাল ১ এপ্রিল সেই চিঠির উত্তর দেন। তার জবাবে হরেকৃষ্ণ কোণ্ডার ২ এপ্রিল আর-একটা চিঠি দেন। প্রথম চিঠিতে তিনি লেখেন, “জনসভায় আমি বলেছি আমি আদৌ লজ্জিত নই। আমি এইজন্যে গর্বিত যে আমাদের লোকজনেরা আক্রমণের মুখে ভীড়ের মতো পালিয়ে যায় নি। আত্মরক্ষার জন্য কাজ করেছে। আপনি আমার মন্তব্যে আপত্তি করেছেন। ব্যক্তি হিসেবে আপনার যা-কিছু বলার অধিকার আছে, রাজ্যপাল হিসেবে আপনার মন্তব্যের অর্থ অন্য কিছু।” এখানে যে জনসভার উল্লেখ আছে, সেই জনসভা অনুষ্ঠিত হয় কলকাতার শহিদ মিনার ময়দানে ১৯৭০ সালের ২৯ মার্চ।

বর্ধমানের ঘটনা সম্পর্কে একতরফা অপপ্রচারের বিরুদ্ধে প্রকৃত তথ্য তুলে ধরতে হরেকৃষ্ণ কোণ্ডার খুবই সজাগ ছিলেন। বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় যশস্বী সম্পাদক ছিলেন। কোণ্ডার তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন। কিন্তু ‘দৈনিক বসুমতী’ পত্রিকায় বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের ‘সম্পাদকীয়’-র প্রতিবাদ করে এক দীর্ঘ পত্রে লেখেন, “পত্র এত লম্বা হয়ে গেল এই জন্য যে, আপনার সম্পাদকীয় পড়ে আমি ব্যথিত হয়েছি। আমি নিশ্চয়ই আশা করি না যে, আপনি আমাদের রাজনীতির সঙ্গে একমত হবেন বা আপনার স্বাধীন মত ব্যক্ত করবেন না। আমার মনে হয়েছে যে, আপনি একতরফা বিবরণ পড়ে ভুল ধারণা করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি কঠিন সঙ্কটের মধ্য দিয়ে চলেছে। আমাদের পার্টির বিরুদ্ধে পরিকল্পিতভাবে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। এই প্রবাহের মধ্যে আপনি জড়িয়ে পড়ুন এটা নিশ্চয় আপনিও চান না। আপনি একজন সাধারণ ‘সম্পাদক’ মাত্র নন।” এই চিঠিটা লেখেন ১৯৭০ সালের ২২ মার্চ, প্রকাশিত হয় ২৫ মার্চ।

সম্ভ্রাস পেরিয়ে

১৯৭০ সালের ১৬ মার্চ তো দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙে গেল। পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতির শাসন জারি হলো। গণতন্ত্রের উপর আক্রমণ বাড়তে লাগলো। সেই অবস্থায় ১৯৭০ সালে ‘নন্দন’ মাসিকের শারদ সংখ্যায় এক দীর্ঘ প্রবন্ধের উপসংহারে হরেকৃষ্ণ কোঙার লিখলেন, “পরিশেষে, সমস্ত মার্কসবাদী ও গণতান্ত্রিক কর্মীকে আবার স্মরণ করানো কর্তব্য বলে মনে করি যে, পশ্চিমবঙ্গের জনগণের সামনে প্রতিক্রিয়ার তীব্র আক্রমণের বিরুদ্ধে কঠিন প্রতিরোধ সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থিত হয়েছে। তাই, গতানুগতিকতা ও পুরাতন অভ্যাস চলবে না। কী করা দরকার তা আলোচনা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। তবে, এইটুকু বলতে পারি যে, অতি দ্রুত সমস্ত অংশের জনগণের রাজনৈতিক সচেতনতা বাড়াতে হবে, গণ-সংগঠনগুলিকে শক্তিশালী ও নতুন অবস্থার উপযোগী করতে হবে, জনগণের চেতনাকে অর্থনীতিবাদের গণ্ডির উর্ধ্বে তুলতে হবে, রাজনৈতিক সংগ্রামে অংশগ্রহণ করাতে হবে। তাদের দৈনন্দিন সংগ্রামের সঙ্গে, আশু রাজনৈতিক সাধারণ দাবিগুলিকেও যুক্ত করতে হবে। সর্বোপরি কঠিন সংগ্রামের জন্য যে রূপ সংগঠন ও কর্মীবাহিনী তৈয়ারী করা প্রয়োজন, তা গড়ে তুলতে হবে।” (সঙ্কট ও গণ-প্রতিরোধের পরিপ্রেক্ষিতে)

শেষ পর্যন্ত ১৯৭১ সালের ১০ মার্চ বিধানসভার নির্বাচন হলো। বামপন্থী দলগুলোর একা হলো না। তা সত্ত্বেও সি পি আই(এম)-এর জোট, সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রন্ট সবচেয়ে বেশি আসন পেল। সি পি আই(এম) একাই আসন পেল ২ জন সমর্থিত নির্দলসহ ১১৩। বর্ধমানের ঘটনা নিয়ে কুৎসা করা সত্ত্বেও, বর্ধমান শহরে সম্ভ্রাস চললেও বর্ধমান দক্ষিণ কেন্দ্রে বিজয়ী হলেন সি পি আই(এম) প্রার্থী বিনয় চৌধুরী, মেমারি কেন্দ্রে বিজয়ী হলেন মিথ্যা ভাবে এই ঘটনায় কারারুদ্ধ বিনয় কোঙার এবং তাও আবার ১৮,২০০ ভোটের বিরাট ব্যবধানে। একক বৃহত্তম দল। কিন্তু সরকার গঠনের ডাক পেল না। কংগ্রেস খড়ে-বড়ে জড়িয়ে একটা সরকার গঠন করলো, কিন্তু টিকলো না। রাষ্ট্রপতির শাসন। ১৯৭২ সালে নির্বাচন। নির্বাচন নয়, মেরে-ধরে, ছাপ্পা মেরে, কারচুপি করে ঘোষণা করা হলো কংগ্রেস জিতেছে। বরানগর কেন্দ্রে জ্যোতি বসু পরাজিত ৩৮,৯৮৭ ভোটের ব্যবধানে। কালনা কেন্দ্রে মিথ্যা মামলায় কারারুদ্ধ দিলীপ দুবে সি পি আই(এম) প্রার্থী এবং ভোট পান অর্থাৎ নামের পাশে সংখ্যাটা লেখা হয় ৯৫২ আর কংগ্রেস প্রার্থীর ৬২,৪৭৬। অথচ কালনা কেন্দ্রে কংগ্রেস হেরে আসছে ১৯৫৭ সালে যখন যুগ্ম আসন ছিল, তখন

থেকে। তারপর কেবল পশ্চিমবঙ্গ নয়, সারা দেশজুড়ে গণতন্ত্রের উপর আক্রমণ। অভ্যন্তরীণ জরুরি অবস্থা।

কিন্তু এত আক্রমণ, এত সম্ভ্রাসের মাঝখান থেকে মানুষ মাথা তুলে দাঁড়ালো, সম্ভ্রাস পেরলো। ১৯৭৭ সালে কেন্দ্রে অকংগ্রেসি সরকার হলো, পশ্চিমবঙ্গে হলো বামফ্রন্ট সরকার। মানুষ জিতল।

আর এই শিক্ষাই শাসকশ্রেণি ইতিহাস থেকে নিতে পারে না। ১৯৭১ সালের ৭ জুলাই। পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতির শাসন। কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকারের মন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় পশ্চিমবঙ্গ দেখভালের দায়িত্বে। আইন-শৃঙ্খলা, অরাজকতা নিয়ে সভা ডেকেছেন। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র পক্ষে জ্যোতি বসু ও হরেকৃষ্ণ কোঙার সভায় যোগ দেন এবং রাজ্যের নানা ঘটনা উল্লেখ করে একটা চিঠি দেন। সেই চিঠিতে লেখেন, “জনগণের বিরুদ্ধে দমন-পীড়ন ও হত্যাভিযান চালিয়ে এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সমাজবিরোধীদের ব্যবহার করে এখন আপনারা লক্ষ্য করছেন যে, আপনারদের দলের কর্মীরাও এর বলি হচ্ছেন। আমরা যদি বার বার ইতিহাসের শিক্ষাকে অনুধাবন করি, তবে এটা সকলের পক্ষেই ভাল।” (সম্ভ্রাস ও ব্যক্তি-হত্যার জন্য দায়ী কে?) এই চিঠিতে উনিশ শতকে ফ্রান্সের ঘটনা উল্লেখ করে তাঁরা দেখান যে, “তাই এতে বিস্ময়ের কিছু নেই যে, যে ছুরি এবং রিভলভার আমাদের কর্মীদের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হয়েছে, তা আজ আপনারদের কিছু কর্মী ও নেতাদের বিরুদ্ধেও ব্যবহৃত হচ্ছে। আপনারদের ও অন্যান্য পার্টির যে-সমস্ত নেতা ও কর্মী গুপ্তঘাতকদের ছোরা ও রিভলভারের শিকার হয়েছেন, তাঁদের জন্য আমরা দুঃখিত। কিন্তু ইতিহাস থেকেও সরকার শিক্ষা নিতে ব্যর্থ হয়েছে।” ইতিহাসের শিক্ষা নিতে গেলে তো যারা সেই ইতিহাস তৈরি করে, সেই মানুষকে মর্যাদা দিতে হবে, সেটা শোষণশ্রেণি ও তার সরকারের পক্ষ থেকে সম্ভব নয়। আসলে ইতিহাস তো তাদের মৃত্যু পরোয়ানা লিখে দিয়েছে। কিন্তু সেই পরোয়ানায় স্বাক্ষর করতে হবে। আর সেইখানেই আমাদের দায়িত্ব। সেই দায়িত্ব পালনে প্রেরণা যোগাচ্ছেন জ্যোতি বসু, হরেকৃষ্ণ কোঙার প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

মনে রাখতে হবে, কাকাবাবু সৃষ্ট শোষণ-মুক্তি বাহিনীর সৈনিক থেকে সেনাপতি হয়ে উঠেছিলেন হরেকৃষ্ণ কোঙার। আমরা দু-একজন হয়তো সেনাপতি হতে পারি, কিন্তু কম-বেশি দক্ষ সৈনিক হতে পারি সকলেই। হরেকৃষ্ণ কোঙারের জন্মশতবর্ষে সেই শ্রদ্ধার্থ্য আমাদের রইলো।

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

পুরীর সফেন সমুদ্র উপভোগ করার জন্য

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় সমবায় ঋণদান সমিতি লিঃ-এর

হোটেল ও হলিডে হোম

আপনারদের জন্যই

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় সমবায় ঋণদান সমিতি লি.

রাজবাটি, বর্ধমান-৭১৩১০৪, দূরভাষ : ২৬৩৪৯৭৫, এক্সটেনশন : ২৪৩

Sl. No. 198

কিছু দেখা, কিছু শোনা

প্রসঙ্গ হরেকৃষ্ণ কোঙার

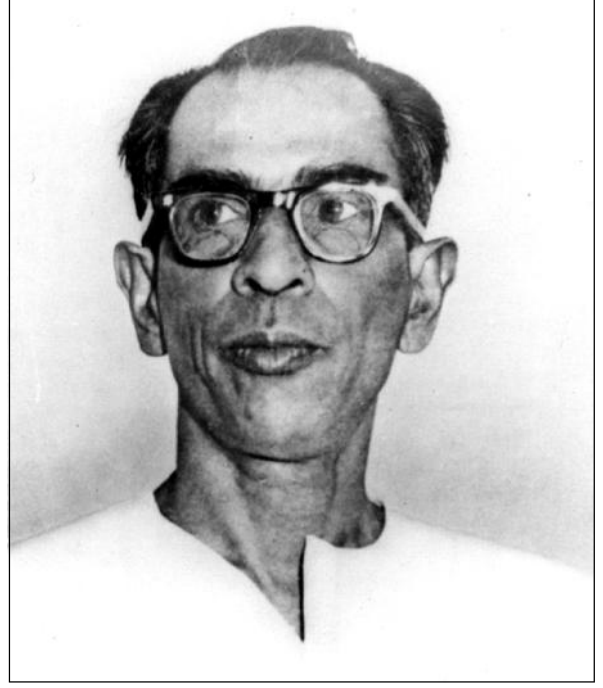
অভিজিৎ কোঙার

দুঃসংবাদ

১৯৭৪ সাল। সেই বছরেই আমি উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছি। তখন পরীক্ষার তিন বা সাড়ে তিন মাস পর ফল প্রকাশিত হতো। ছাত্র আন্দোলনের টুকরো কর্মী। মাঝে মাঝেই যুব কংগ্রেস বা ছাত্র পরিষদের মিছিলে না বেরোনোর জন্য বা ভারতের ছাত্র ফেডারেশন-এর গোপন সভা করা বা সদস্য সংগ্রহের গোপনীয়তা ফাঁস হয়ে যাওয়ায় আমি এবং আমার সহপাঠী ও সহকর্মীরা মারধোর খাওয়ায় অভ্যস্ত হয়ে উঠছি। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র মেমারির কর্মী শৈলেন্দ্রনাথ পাল (সকলের কাছে ‘গোরা’ নামে পরিচিত) বললো—“কয়েকদিন আমার দিদির বাড়ি ঘুরে আসি চল।” বাড়িতে কথা বলে গোরাদার সঙ্গে তার বড়দির বাড়ি হুগলি জেলার পুইনান চলে গেলাম। দিন তিনেক হৈ হৈ করে কাটিয়ে ২৩ জুলাই দুপুরে খাওয়ার পর আমি ও গোরাদা বাসপথে মেমারি আসছিলাম। গোরাদা আঝাপুরে নেমে গেল আমাদের পার্টি নেতা ও আঝাপুর স্কুলের জনপ্রিয় প্রধান শিক্ষক রামকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় (রামুকাকা)-র সঙ্গে দেখা করার জন্য। রামুকাকা তখন আধা-ফ্যাসিস্ত সন্ত্রাসের কারণে মেমারি-ছাড়া হয়ে নানা জেলার নানা আশ্রয়ে কাটিয়ে আঝাপুর গ্রামের সর্বস্তরের অভিভাবকদের অনুরোধ ও নিরাপত্তা দেওয়ার আশ্বাসে আঝাপুর স্কুলে আবার যোগ দিয়েছেন। আমি মেমারি চকদিঘি মোড়ে নেমে বাড়ির পথেই মুখে মুখে খবর পেলাম কৃষ্ণ আন্দোলনের প্রবাদপ্রতিম সংগঠক হরেকৃষ্ণ কোঙার বিকাল ৬টা নাগাদ প্রয়াত হয়েছেন।

তখন তো মোবাইলের যুগ ছিল না, ভূমি ফোনের যুগ। সেই মাধ্যমে বাড়িতে আসার পর মৃত্যু সংবাদটি পেলাম। কলকাতা পার্ক সার্কাসের কিস্তার নার্সিং হোমে হরেকৃষ্ণ কোঙার ভর্তি হয়েছিলেন ২৩ এপ্রিল। ভর্তির পর শল্যচিকিৎসা, ছুটি, আবার ভর্তি, আবার শল্যচিকিৎসা—এইভাবে ককট রোগে মাত্র তিন মাসেই সব শেষ। সন্ধ্যা ৬টার ট্রেনে কলকাতা রওনা দিলাম।

পশ্চিমবঙ্গের বিদ্বন্ত অবস্থার মতো আমাদের পরিবারের অবস্থাও তখন বিদ্বন্ত। বাবা (বিনয় কোঙার) তখন মিথ্যা কেসে জেলে বন্দি, দাদা (সুকান্ত কোঙার) মিথ্যা কেসের আসামি হয়ে বাড়ি ছাড়া। বড়দা (অরিন্দম কোঙার) তখন সন্ত্রাসকে উপেক্ষা করে মেমারি বিদ্যাসাগর স্মৃতি বিদ্যামন্দিরে শিক্ষকতা করছেন। এশিয়ার মুক্তিসূর্যের দাপট হতে কর্মীদের রক্ষা করতে আমার মা (মহারানি কোঙার) ও দিদিরা তখন লড়াই-এর ময়দানে।



জনশ্রোত

আধা-ফ্যাসিবাদী সন্ত্রাসের কারণে তখন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) আইনে না হলেও বাস্তবে নিষিদ্ধ। ছাত্র-যুব-মহিলা-সরকারি কর্মচারী-বিভিন্ন স্তরের শিক্ষক-শ্রমিক সহ নানা বামপন্থী সংগঠন ও কর্মীরা আক্রান্ত।

আজকের মতো তখন দূরদর্শনের কোনো বেসরকারি সংবাদ চ্যানেল ছিল না। কেবলমাত্র সরকারি চ্যানেলে নির্দিষ্ট সময়ে সংবাদপাঠ এবং বেতার সংবাদ। পার্টির গোপন সাংগঠনিক কাঠামোর মাধ্যমে সারা দেশে দ্রুত মৃত্যু সংবাদ ছড়িয়ে পড়লো। মেমারি হতে কলকাতা যাওয়ার পথে ট্রেনে, বাসে মানুষের মধ্যে আলোচনা তাঁর জনপ্রিয়তাকে জানান দিচ্ছিল।

আমরা গিয়ে দেখি অসংখ্য মানুষ তখন পার্টি অফিসে এসে গেছেন। সারা রাত আসা যাওয়া চলতেই থাকলো। সেদিন রাতে মৃতদেহ নার্সিংহোম থেকে এনে ঠাণ্ডাঘরে রাখা হলো। পরদিন সকাল ৮টায় আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের পার্টির রাজ্য দপ্তরে আনা হল। পরদিন সকাল হতে শুধুই মানুষ আর মানুষ। ব্যক্তিগত ও সংগঠনগত শ্রদ্ধাঞ্জলি চলমান। আদুল গায়ে খালি পায়ে লুঙ্গি পরা ক্ষেতমজুর বা চাষি হতে সমাজের সর্ব অংশের নারী-পুরুষের সমাগম। লক্ষ লক্ষ মানুষের হাহাকার বা ছলছল চোখ স্বজন হারানোর বেদনাকে জানান দিচ্ছিল, অথচ এদের কারোর সঙ্গে তাঁর রক্তের সম্পর্ক নেই।

একটু বেলার দিকে জেল হতে মিথ্যা কেসের আসামি বিনয় কোঙারকে পুলিশের গাড়িতে পুলিশি প্রহরায় শেষ দর্শনের জন্য আনা হলো। অতি অল্প সময়ে শ্রদ্ধাঞ্জলিপনের পরই পুলিশ বিনয় কোঙারকে জেলে নিয়ে যাওয়ার জন্য রাস্তায় দাঁড়ানো পুলিশ ভ্যানের দিকে নিয়ে যাওয়ার পথে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখলাম। শোকাহত জনগণের প্রতিবাদী মনন পুলিশের হাত হতে বিনয় কোঙারের ছিনিয়ে নিতে উদ্যত। ক্রমশ তা ঝড়ের গতি নেওয়ায় পুলিশ দিশেহারা। আমিও বাবাকে কাছে পাওয়ার আশায় তাদের সুরে সুর মিলিয়ে সক্রিয় হয়ে উঠেছিলাম। এমন সময় আকস্মিক পুলিশের কালো ভ্যানের পা-দানির উপর দাঁড়িয়ে বিনয় কোঙারের উদাত্ত

ভাষণ—“কমরেড, পুলিশের হাত হতে আজকে মুক্ত করা অতি সহজ কাজ। এর মধ্যে কোনো বিপ্লবীয়ানা নেই, আছে হঠকারিতা। আন্দোলনের মাধ্যমে সেই পরিস্থিতি গড়ে তুলুন যেদিন আমার মতো হাজার হাজার বন্দিকে শাসক শ্রেণি জেল হতে মুক্তি দিতে বাধ্য হবে। সেটাই হবে যথার্থ কাজ।” দেখলাম মস্তমুণ্ডের মতো ঐ মানুষগুলিই শ্লোগান তুললো— ‘কমরেড হরেকৃষ্ণ কোঙার লাল সেলাম, সমস্ত রাজবন্দিদের মুক্তি চাই।’ কালো গাড়ি গেলো চলে।

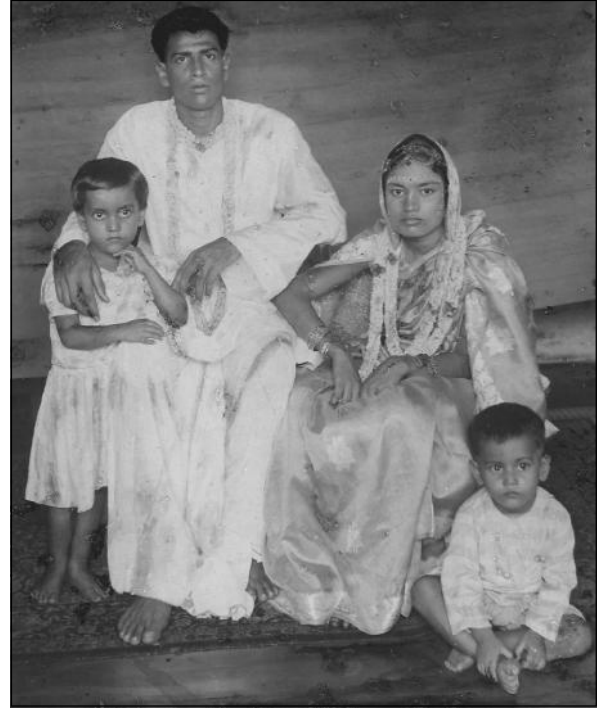
২৪ জুলাই বিকাল ৩টায় পার্টি অফিস হতে কয়েক লক্ষ মানুষের জনপ্লাবন নিয়ে শোক মিছিল সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করে কেওড়াতলা শ্মশানে পৌঁছায়। রাজ্যব্যাপী আধা-ফ্যাসিবাদী সম্ভ্রাসকে উপেক্ষা করে সর্ববৃহৎ শোকমিছিল। শোনা যায় শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের প্রয়োজনে দুপুরের পর অনেকেই আর ফুলমালা পাননি।

পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে তাঁর স্মরণে মিছিল-সমাবেশ হয়েছিল। সম্ভ্রাসের পরিবেশে ২৫ জুলাই নিমাই নদীর নেতৃত্বে মেমারিতে শোকমিছিল হয়েছিল। মৃত্যুর পরদিন মেমারির ব্যবসায়ীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে দোকান বন্ধ রাখেন। আগস্ট মাসের কোনো একদিন মেমারি ইছাপুর মাঠে স্মরণসভার আয়োজন করা হয়। সভাপতি শ্রদ্ধেয় শিক্ষক জগন্নাথ মোহন্ত, বক্তা সোমনাথ চ্যাটার্জী। কেন্দ্র হতে আসা একটি মিছিল সমাবেশ নিকটবর্তী স্থানে কংগ্রেস কর্মীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। তবে ঘৃণ্য এই কাজ জনসভা বানচাল করতে পারেনি।

আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়া

১৯১৫ সালের ৫ আগস্ট বর্ধমান জেলার রায়না থানার কামারগড়িয়া গ্রামে হরেকৃষ্ণ কোঙারের জন্ম। বাবা শরৎচন্দ্র কোঙার এবং মা সত্যবালা দেবী। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে এমন একটা ধারণা গভীর ভাবে ছড়িয়ে আছে যে কোঙার পরিবার ছিল জমিদার। কিন্তু এটা ঠিক নয়। শরৎ কোঙার ব্যবসার মাধ্যমে বিশাল সম্পদশালী হলেও তিনি জমিদার ছিলেন না, ছিলেন জোতদার।

প্রাথমিক স্কুলে পাঠ গ্রাহে। প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে হরেকৃষ্ণ কোঙার মেমারি বিদ্যাসাগর স্মৃতি বিদ্যামন্দিরে পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তি হন। কিন্তু নবম শ্রেণির মেধাবী ছাত্র শ্রী কোঙার ১৯৩০ সালে অল্প বয়সেই পরাধীনতার গ্লানি হতে মুক্ত হতে আইন অমান্য আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। স্বাধীনতা সংগ্রামী ও ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের নেতা বিনয় চৌধুরীর ভাষায় : “১৯৩০ সাল। তখন আমি আইন অমান্য আন্দোলনের জন্য যে স্বেচ্ছাসেবক শিবির হয়েছিল তার দায়িত্বে আছি। একদিন দুপুরে কংগ্রেস অফিসে এসে দেখি একটি বছর ১৫ বয়সের ছেলে অফিসের বারান্দার খুঁটি প্রাণপণ শক্তিতে আঁকড়ে দাঁড়িয়ে আছে, আর একজন বয়স্ক ব্যক্তি তাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছেন। ছেলেটির মুখে চোখে এমন একটা দৃঢ় সংকল্পের ছাপ ফুটে উঠেছে যে অনেকেই তা নজরে পড়ে। খবর নিয়ে জানলাম এই ছেলেটি মেমারি স্কুলের সেরা ছাত্র হরেকৃষ্ণ কোঙার। সেদিন কংগ্রেসের বয়স্ক নেতারা হরেকৃষ্ণকে বুঝিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দেন।” যাকে ধরে টানা হ্যাচড়া হচ্ছে তিনি তো হরেকৃষ্ণ কোঙার, কিন্তু যিনি নাছোড়বান্দা তিনি কে? তিনিই তাঁর পিতা শরৎ কোঙার। ছেলের আইন অমান্যে যোগ দিতে বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার খবর পেয়ে তিনি তৎক্ষণাৎ উদ্ধারে বর্ধমান চলে এসেছেন। ছেলের দৃঢ় মানসিকতার কারণে ছেলের স্থান হল একতলা বাড়ির ছাদের চিলেকোঠা ঘরে। সিঁড়ির দরজায় তালা-চাবি এবং তা বাবার নিয়ন্ত্রণে। খাওয়া ও বিশেষ প্রয়োজনে কড়া নজরে তালা খোলা ও আবার বন্দি। কিন্তু পাহাড়ি নদী দুর্বীর, তাকে আটকায় সাধ্য কার? কয়েকদিনের মধ্যে গোপনে সংগ্রহ করা কাপড়ের সঙ্গে কাপড়



বেঁধে দড়ির মতো করে তা ধরে চিলে কোঠার ঘর হতে বাড়ির বাইরে পিছনের দিকে বাগানে নেমে দে ছুট। সোজা বর্ধমান এবং আইন অমান্য করে ৬ মাসের সাজা নিয়ে বর্ধমান জেলে বন্দি। জেলেই বিনয় চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর পরিচয়।

জেলমুক্তির পর ১৯৩২ সালে মেমারি বিদ্যাসাগর স্মৃতি বিদ্যামন্দির হতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে হরেকৃষ্ণ কোঙার ম্যাট্রিক পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। তারপর তিনি কলকাতার বঙ্গবাসী কলেজে ভর্তি হন। তাঁর বাবা ভাবলেন, ভালোই হলো। বর্ধমান ছাড়লে আর নিশ্চয়ই আন্দোলন-সংগ্রামে জড়াবে না। কিন্তু উল্টোটাই হল। ১৯৩২ সালেই সেপ্টেম্বর মাসে স্বদেশি ডাকাতির মামলায় গ্রেপ্তার এবং মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলে বন্দি হলেন। ১৯৩৩-এর জানুয়ারিতে ঘোষিত বিচারের রায়ে কম বয়সের কারণে তাঁর মৃত্যুদণ্ড না হয়ে ৬ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয় এবং এস এস মহারাজা জাহাজে তিনি আন্দামানের কুখ্যাত সেলুলার জেলে প্রেরিত হলেন। এই জাহাজেই তার সঙ্গে সতীশ পাকড়াশির পরিচয়। ছোট ছোট এক একটি সেল-এ একজন বন্দি। ১৯৩২-৩৮ সালে আন্দামানের সেলুলার জেলে মোট বন্দি ৩৮০ জনের মধ্যে হরেকৃষ্ণ কোঙার ছিলেন কনিষ্ঠতম। এই জেলে টাঙানো বন্দি তালিকায় ১০৬ নং-এ রয়েছে তাঁর নাম ও ছবি। ৩০২ নং ক্রমিকে আছে সুবোধ চৌধুরী, যিনি আমাদের বর্ধমানের খালুইবিল মাঠের ভাড়া বাসায় সংগঠনের কাজে প্রায়ই আসতেন এবং আমরা সুবোধ মামা বলে সম্বোধন করতাম। ঠিক তার পরেই ৩৩০ নং ক্রমিকে আছেন সুবোধ রায়, যিনি আমৃত্যু আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের রাজ্য অফিসে দায়িত্ব পালন করতেন এবং অফিসে গেলেই সুবোধ জ্যেষ্ঠের হাত হতে অকৃত্রিম স্নেহের পরশ হিসাবে চারটি বিস্কুট পেতাম। নিজেদের জীবন তুচ্ছ করে যারা কেবলমাত্র দেশকে ভালোবাসতে গিয়ে এত অত্যাচারে পিষ্ট হয়েও মাথা নত করেননি তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে যায়। মিছিল, মিটিং করতে গিয়ে আমরা যখন হুমকি, মারধোর, কেসের সম্মুখীন হয়ে নিজেদের মহাত্মাগী হিসাবে গর্ববোধ করি ও পাঁচজনের কাছে প্রশংসা পেতে চোখস আচরণ করি,

তখন এই মানুষগুলির আত্মত্যাগ দেখে অনুভূত হয়—আমরা কত আহাম্মক। আন্দামান সেলুলার জেলে বন্দি অবস্থায় হরেকৃষ্ণ কোঙার গোপনে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ অধ্যয়ন করতে থাকেন এবং এখানেই তিনি মনে প্রাণে কমিউনিস্ট আদর্শ গ্রহণ করেন। জেলে নিরঞ্জন সেনগুপ্ত, নারায়ণ রায়ের সান্নিধ্যে এসে কমিউনিস্ট কনসলিডেশনে যোগ দেন। ১৯৩৮ সালের প্রথম দিকে জেল থেকে মুক্ত হয়েই তিনি কলকাতা আসেন এবং কমরেড মুজফ্ফর আহমদ ও কমরেড আব্দুল হালিমের সাহচর্যে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন ও সদস্যপদ পান।

কিছুদিন কলকাতা ও হাওড়ায় শ্রমিক আন্দোলনে যুক্ত থাকার পর ১৯৩৯-৪০ সালে বর্ধমানে ঐতিহাসিক ক্যানেল কর বন্ধের আন্দোলনে যোগ দেন। তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে সর্বশ্রেণির মানুষের সমর্থন এই আন্দোলনের পিছনে এমনভাবে সংগঠিত হয়েছিল যে ত্রোক করা গরুও সরকারের পক্ষে নিলাম করা সম্ভব হয়নি।

এই আন্দোলনের সময় ১৯৪০ সালে ব্রিটিশ সরকারের নির্দেশে শ্রী কোঙার প্রথমে আসানসোল, বার্নপুর এলাকা থেকে এবং পরে বর্ধমান জেলা থেকে বহিস্কৃত হন। তবে তিনি তা মান্য না করে জেলাতে গোপনে কাজ করতে থাকেন এবং একবার গ্রেপ্তার হয়ে কয়েকমাস জেলবন্দি থাকেন।

একদিকে মেধাবী ছাত্র অন্যদিকে ক্রমশ সম্পদশালী হয়ে ওঠা পিতা—এই দুয়ের মাঝে এই সমাজে প্রতিষ্ঠা বলতে যা বোঝায় সেই নিশ্চিত জীবনে থাকাই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু শ্রী কোঙার সেই নিশ্চিত ব্যক্তি জীবন ছেড়ে শ্রেণিবিভক্ত সমাজে শোষিত মানুষের মুক্তির স্বার্থে অনিশ্চিত জীবনকেই বেছে নিয়েছিলেন। পিতা হিসাবে শরৎ কোঙার এতে ক্ষুব্ধ ছিলেন। কোনোভাবেই ছেলেকে নিয়ন্ত্রণে না আনতে পেরে ভেবেছিলেন পুত্রের বিয়ে দিলে হয়তো জেলবন্দি না হয়ে গৃহবন্দি হবে। সেই ভাবনায় নিজপছন্দে ১৯৪০ সাল নাগাদ কলকাতা ১২ বি, বাদুড় বাগান লেন-এর বাসিন্দা ব্রজেশ কুমার দাঁ-র কন্যা বিভারানি-র সঙ্গে বিয়ের যোগাযোগ করেন। বাবার চাপে পুত্র রাজি হলেন, তবে তিনটি শর্ত—১) পার্টি তহবিলে দেড় হাজার টাকা দিতে হবে, ২) বিয়েতে পণ নেওয়া চলবে না, ৩) যিনি পাত্রী হচ্ছেন তাঁর সঙ্গে বিয়ের আগে একবার কথা বলতে দিতে হবে। তৃতীয় শর্তের কারণ নববধূকে নিজ অনিশ্চিত জীবন সম্পর্কে জ্ঞাত করা। সব শর্তই পিতাকে মেনে নিতে হয়েছিল কিন্তু বাবার ইচ্ছাপূরণ হয়নি। উপরন্তু যাকে দিয়ে তিনি ছেলেকে সংসারী করবেন ভেবেছিলেন সেই নববধূও শুরুতেই তার পথসাথী হয়ে উঠলেন এবং শ্বশুরের দেওয়া ৫০ভরি সোনোও পার্টির স্বার্থে দফায় দফায় বিক্রি করে দেন। রাজনীতি-বিবর্জিত একটি সাধারণ পরিবার হতে আসা এক কন্যাকে এইভাবে গৃহকোণ হতে বিশ্বলোকে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা দেওয়া হরেকৃষ্ণ কোঙারের বিস্ময়কর প্রতিভার জানান দেয়।

অজয় নদের ৯টি ইউনিয়ন বোর্ডের এলাকায় বারবার বাঁধ ভাঙায় মানুষের জীবন দুর্বিষহ হতো। তীরবর্তী মানুষদের নিত্য বছরের সর্বনাশ রুখতে ১৯৪৩-৪৪ সালে দ্বিতীয় পর্যায়ের অজয় বাঁধ সংস্কারের দাবিতে দুর্বীর আন্দোলনে তাঁর গভীর ভূমিকা ছিল। ১৯৪৪ সালে তিনি গ্রেপ্তার হন এবং জামিনের শর্ত অনুযায়ী বর্ধমান শহরের বাইরে যাওয়া নিষিদ্ধ হয়। ১৯৪৬ সালে আসানসোলের কোলিয়ারি এলাকায় নির্বাচনী কাজ করতে গিয়ে শত্রুর আক্রমণে তার পা ভাঙে। ১৯৪৬-৪৭ সালে দ্বিতীয় পর্যায়ের ক্যানেল কর আন্দোলনে তিনি যোগ্য ভূমিকা নেন। এই সময়েই তিনি ডাকাতির অভিযোগে অভিযুক্ত হন।

বড় পুত্রকে কোনোভাবেই নিয়ন্ত্রণে আনতে না পেরে পিতা শরৎ কোঙার একটু হতাশ হলেন, আবার ছোট পুত্র বিনয়

কোঙার-এরও ঐ একই পথে চলার প্রবণতা। তখন তিনি এক নতুন তত্ত্ব খাড়া করলেন যাতে ছেলেদের ফেরানো যায়। গরিবিয়ানার মুক্তিকে তিনি ঠাওড়ালেন গরিবদের উপকার করা। তাই তিনি বলতে লাগলেন আরে, গরিবদের যদি উপকার করতে চাও তাহলে দুহাত ভরে অর্থ উপার্জন করে গরিবদের সেবা করতে হবে। তিনি ঠিক করলেন যে গরিবদের উপকার করতে মেমারিতে হাসপাতাল করে দেবেন। সেই সূত্রে তিনি তৎকালীন সরকারের কাছে প্রস্তাব পাঠালেন। ১৯৪৬ সালে প্রয়োজনীয় জমি এবং তৎকালীন সময়ে ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা দিয়ে তিনি নিজ মায়ের নামে গোলাপ সুন্দরী দেবী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন—আজ যা মেমারি হাসপাতাল হিসাবে পরিচিত।

স্বাধীনতার পর ১৯৪৮ সালের ২৬ মার্চ কমিউনিস্ট পার্টি বে-আইনি ঘোষিত হওয়ার দিনই বর্ধমান পার্টি অফিস হতে তিনি গ্রেপ্তার হন। ৩ মাস পর মুক্তি পেয়েই আত্মগোপন। আত্মগোপন অবস্থায় ১৯৫০ সালে বর্ধমান কৃষকসংসারের পশ্চে ফায়ার ব্রিগেড অফিস সংলগ্ন চত্বরে কর্মিসভা চলাকালীন পুলিশ ঘিরে ফেলে। সঙ্গে থাকা রিভালভার হতে গুলি চালাতে চালাতে পালিয়ে যাওয়ার মত আসে। কিন্তু হরেকৃষ্ণ কোঙার বলেন, এতে নিজের জীবনহানির সম্ভাবনা থাকবে, কারণ পুলিশের বিরুদ্ধে গুলি চালিয়ে এতজনের পালানো সম্ভব নয়। অন্ধকারে পাঁচিল উপকে বিচ্ছিন্ন ভাবে পালানোর চেষ্টা হোক। রিভালভার কুয়োয় ফেলে সেই চেষ্টায় সর্ববিজয় হাজার, হরেকৃষ্ণ কোঙার পালাতে সক্ষম হলেও সৈয়দ শাহেদুল্লাহ (আমাদের মটর মামা), তার স্ত্রী রাবেয়া মামিমা, জ্যাঠাইমা (বিভা কোঙার) প্রমুখ গ্রেপ্তার হন।

১৯৫২ সালে আউশগ্রাম এলাকায় শত্রুদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে তাঁর কয়েকটি দাঁত ভেঙে যায় ও কান জখম হয়। ১৯৫৩ সালে কলকাতায় খাদ্য মিছিলে সামিল হওয়ার জন্য কর্মীদের নিয়ে তিনি হাওড়া স্টেশনে নামা মাত্র গ্রেপ্তার হন। ১৯৫৭ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে তিনি গ্রেপ্তার হন।

১৯৬২ সাল, চীন ভারত সীমান্ত সংঘর্ষ। তৎকালীন অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের একাংশ পাশাপাশি দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধের পরিবর্তে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে এই বিরোধ মেটানোর কথা বলার জন্য শাসক পার্টি জাতীয় কংগ্রেসের কাছে ‘চীনের দালাল’ হিসাবে চিহ্নিত হন। দেশদ্রোহিতার অভিযোগে হরেকৃষ্ণ কোঙার ভারত রক্ষা আইনে গ্রেপ্তার হন। সেই সময় বিনয় কোঙারও বর্ধমান মোবারক বিল্ডিং-এর পার্টি অফিসে আক্রান্ত হয়ে গ্রেপ্তার হন।

সে সব দিনের কথা আজ খুব মনে পড়ে। তখন আমি খুব ছোট এং তখনও স্কুলে ভর্তি হইনি। দিদিরা ছোট ও বর্ধমান শহরের নামজাদা বালিকা বিদ্যালয়ের নিচু ক্লাসের ছাত্রী। প্রতিদিন স্কুল ছুটির পর বাড়ি ফিরে কাঁদতে কাঁদতে বলতো—মা, কাল থেকে আর স্কুলে যাবো না। বলোনা—বাবা ও জ্যাঠামশাই কী করে? কেন তারা জেলে? স্কুলের সবাই আমাদের দেখিয়ে বলে—এরা চীনের দালাল। আমাদের টিফিন কেড়ে খেয়ে নেয়, ফেলে দেয় ইত্যাদি। অর্থাৎ কংগ্রেস সরকার দেশের সাধারণ মানুষকেও প্রভাবিত করতে পেরেছিল। এতবড় আক্রমণের মোকাবিলা করে যে কমিউনিস্ট পার্টি এগিয়েছে সে পার্টি আজকের আক্রমণও কাটিয়ে উঠবে। চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষ সম্পর্কে পার্টির মূল্যায়ন যে সঠিক ছিল তার প্রমাণ রাজীব গান্ধির প্রধানমন্ত্রিত্বের সময় দুই দেশ পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমেই সমস্যা মিটিয়ে নেয় এবং কেন্দ্রীয় সরকার এটাকে সীমান্ত সংঘর্ষ বলেই ঘোষণা করে। হরেকৃষ্ণ কোঙার এক বছর জেলে কাটিয়ে ১৯৬৩ সালে মুক্তি পান।

১৯৬৪ সাল, আবার ভারত রক্ষা আইনে তিনি গ্রেপ্তার হন। এই বন্দিত্বের সময় তাঁর পিতা ১৯৬৫ সালের ৫ জুন মেমারির বাড়িতে মারা যান। দমদম সেন্ট্রাল জেল হতে পুলিশ পাহাড়ায় হরেকৃষ্ণ কোণ্ডার-কে আনা হলো। সারা বাড়ির চারপাশে গুচ্ছাকারে নজরদারি পুলিশের কথা আজও মনে পড়ে। বাড়ি হতে তাঁকে আবার বর্ধমান জেলে পাঠানো হলো। আর ভাই বিনয় কোণ্ডার-কে বহরমপুর সেন্ট্রাল জেল হতে পুলিশ পাহাড়ায় বাড়িতে আনা হলো মৃত্যুর দুদিন পর এবং তাঁকেও তারপর বর্ধমান জেলে পাঠানো হলো। ১৯৬৬-র জুন মাসে দুই ভাই বর্ধমান জেল হতে মুক্তি পেলেন।

সংগঠনের সিঁড়ি বেয়ে

নানা আন্দোলনের ঘট পেরিয়ে ১৯৩৮ সালে হরেকৃষ্ণ কোণ্ডার কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হন। ১৯৫৩ সালের ১৭-২১ ডিসেম্বর কলকাতার মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে অনুষ্ঠিত অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির ষষ্ঠ সম্মেলন হতে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সদস্য হন। এ একই হলে ১৯৫৬ সালের ১৬-২১ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত সপ্তম রাজ্য সম্মেলন থেকে রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য হন। ১৯৫৮ সালের অমৃতসর কংগ্রেসে তিনি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হন। ১৯৬১ সালের ৭-১৬ এপ্রিল অনুষ্ঠিত বিজয়ওয়াড়া কংগ্রেস হতে গঠিত জাতীয় পরিষদে পশ্চিমবঙ্গ হতে নির্বাচিত ১২ জন সদস্যের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম।

১৯৬৪ সালে দক্ষিণপন্থী আক্রমণ হতে পার্টিকে রক্ষা করায় তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। জেলে বন্দি থাকাকালীন ঐ বছর নবগঠিত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলী ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হন এবং আমৃত্যু তা ছিলেন। তিনি বামপন্থী বিদ্যুতির হাত হতে পার্টিকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে প্রথম সারির ভূমিকা নেন।

১৯৫৪ সাল থেকে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত তিনি পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কৃষকসভার সম্পাদক ছিলেন। ১৯৬৮ সালে তিনি এই সংগঠনের সম্পাদক পদ ছেড়ে সভাপতি হন এবং আমৃত্যু তা ছিলেন। ১৯৫৪ সাল থেকে তিনি সারা ভারত কৃষকসভার কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সদস্য হন। আত্মগোপনে থাকাকালীন ১৯৬৮ সালে তিনি এই সংগঠনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক হন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ঐ পদে ছিলেন।

সংগ্রামের পথ বেয়েই তিনি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি হয়ে ১৯৬০ সালে ভিয়েতনাম ওয়ার্কাস পার্টির কংগ্রেসে যোগদান করেন। তারপর যান চীন। ১৯৭০ সালে যান সাইপ্রাসের নিকোশিয়ায়, ১৯৭১ সালে ইতালির রোমে, ১৯৭২ সালে চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রাগে। ১৯৭৩ সালে আন্তর্জাতিক কৃষি, বন ও বাগিচা শ্রমিক ইউনিয়নের প্রশাসনিক সভায় যোগ দিতে জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের বার্লিনে যান।

ভূমি, কৃষি, ভূমি সমস্যা, ভূমি সংস্কার ইত্যাদি সম্পর্কে তার জ্ঞানের খ্যাতি শুধু দেশে নয়, বিদেশেও ছিল। কৃষক আন্দোলনের আর এক পুরোধা কমরেড আবদুল্লাহ রসুল তাকে ‘ভূমি সংস্কার বিশেষজ্ঞ’ বলতেন। তাঁর ভাষায় “ কমরেড কোণ্ডার যে ভূমিসংস্কারের সমস্যাকে সঠিকভাবে বোঝেন, সারা ভারতের সমস্ত রাজ্যের কংগ্রেসি ভূমি রাজস্ব মন্ত্রীরা তা বোঝেন না—একথা কলকাতায় এবং দিল্লির সরকারি দপ্তরেও অজানা ছিল না।” তাই ভারত সরকারের উদ্যোগে ১৯৭৩ সালে পাটনায় অনুষ্ঠিত ভূমিসংস্কার রূপায়ণ বিষয়ক আলোচনাচক্রে বক্তা হিসাবে হরেকৃষ্ণ কোণ্ডার ডাক পান। মুসৌরিতে ভারত সরকারের স্বরস্ট্র বিভাগের স্টাফ কলেজের নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত আই এ এস অফিসার ক্যাডারদের

কাছে ভারতের ভূমি সমস্যা সম্পর্কে আমন্ত্রিত ভাষণে সাড়া ফেলে দেন। প্রতিক্রিয়াশীল কংগ্রেস সরকারের এই শিক্ষা শিবিরে একজন কটর বিরোধী নেতাকে এই স্বীকৃতি দেওয়ার তাৎপর্য কম ছিল না। মুসৌরিতে চার বার আলোচক হিসাবে ডাক পান।

সংসদীয় পথের ব্যবহার

শুধু সংগঠনের কাজেই নয়, প্রশাসনিক কাজেও তিনি অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। কমিউনিস্ট পার্টির লক্ষ্যকে সামনে রেখে সংসদীয় সংস্থাকে কীভাবে ব্যবহার করতে হয় তার এক নতুন দিগন্ত তিনি দেখিয়েছিলেন।

১৯৫৭ সাল হতে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত তিনি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্য অর্থাৎ বিধায়ক ছিলেন। সেই সূত্রেই ১৯৬৭ এবং ১৯৬৯ অর্থাৎ দুটি যুক্তফ্রন্ট সরকারের তিনি ভূমি ও ভূমিরাজস্ব মন্ত্রী ছিলেন। অল্প স্থায়িত্বের দুটি সরকারের সময় তিনি মন্ত্রী হিসাবে ভারতের সংবিধানের প্রতি দায়বদ্ধতার মাঝেই বেনামি ও খাস জমি উদ্ধারে কৃষক আন্দোলনের যে জোয়ার এনেছিলেন তা ঐতিহাসিক। এই শ্রোত ধরেই তো ৩৪ বছরে বামফ্রন্ট সরকার ভূমি সংস্কারের কাজকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। আজকের তথাকথিত মা-মাটি-মানুষের সরকার যখন ঐ কাজকে ‘জমি চুরি’ বলে তখন আমরা বুঝি অতদিন আগে হরেকৃষ্ণ কোণ্ডার ঠিক জায়গাতেই আঘাত দিয়েছিলেন। স্বল্প সময়ে সীমাবদ্ধ ভূমিসংস্কারের কাজটি আমলাতন্ত্রের উপর নির্ভর না করে কৃষক ও ক্ষেতমজুরদের সংগঠিত করার মধ্য দিয়েও যে কার্যকরী করা যায় তা তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন। বস্তুত বামফ্রন্ট সরকারের সময়ে তার এই শিক্ষাকেই অনেকাংশে লঘু করা হয়েছে।

বলায়-লেখায়

হরেকৃষ্ণ কোণ্ডার অনন্য বক্তা ছিলেন, যা সর্বজনবিদিত। প্রকাশ্য ময়দানে বা বিধানসভার ভিতরে তাঁর বক্তৃতা ছিল অসাধারণ। বিধানসভার অভ্যন্তরে তাঁর বক্তৃতার নথিগুলি পড়লে তার সহজ-সরল, কিন্তু গভীর তাৎপর্যময়তার প্রকাশ দেখি। এখন অনেকেরই বক্তৃতার সময় শ্রোতাদের ওঠা-বসা, যাওয়া-আসা, নড়া-চড়া, নিজেদের মধ্যে গল্প করা ইত্যাদি দেখতে অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছি এবং এর কারণ হিসাবে বক্তার দক্ষতার দিক না দেখে শ্রোতাদের নানা সমালোচনা করি। কিন্তু হরেকৃষ্ণ কোণ্ডার যখন বক্তা, তখন শ্রোতাদের উঠে যাওয়া তো দূরের কথা, নড়াচড়াও দেখা যেত না। ঘন্টার পর ঘন্টা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শ্রোতাদের তিনি বসিয়ে রাখতে পারতেন। মটর মামার (কমরেড সৈয়দ শাহেদুল্লাহ)-র ভাষায় তিনি ছিলেন ‘সমকালীন যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বক্তা’।

তার বক্তৃতার ভাষা ছিল সহজ-সরল। শ্রোতাদের গড়ন অনুযায়ী বক্তৃতা দিতেন। শিক্ষার সুযোগ না পাওয়া গরিবদের কাছে আমরা যখন বলি—‘সর্বহারার শৃঙ্খল ছাড়া হারাবার কিছু নেই’, তখন তিনি বলতেন, ‘ন্যাংটার নেই বাটপারের ভয়’। তিনি বাংলা, হিন্দি, ইংরাজি—তিন ভাষাতেই সাবলীল ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের কোনো সভায় সর্বভারতীয় নেতা হিন্দি বা ইংরাজিতে বক্তৃতা দিলে তার অনুবাদনের দায়িত্ব পড়তো তাঁর উপর। আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতায় এ ব্যাপারে কিছু কথা জানাবো।

১৯৬৯ সাল, বড়শুলে কৃষকসভার সর্বভারতীয় সম্মেলন। আমার বড়দি দীপা তখন গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের কর্মী। সংগঠনের মেমারি ইউনিটের তহবিল সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সম্মেলন নিকটবর্তী স্থানে খাবারের স্টল করা হয়েছে। আমি তখন ছোট, কিন্তু পড়াশুনায় ফাঁকি দেওয়ার উদ্দেশ্যে আমিও ঐ স্টলে জুটে গেলাম। প্রকাশ্য সমাবেশে বিশাল জমায়েতের সামনে তাঁর বক্তব্য আমি

শুনেছিলাম। বিশেষ কিছু না বুঝলেও টানটান উত্তেজনা লক্ষ্য করেছিলাম।

ভূমিরাজস্ব মন্ত্রী থাকাকালীন তাঁর ভাষণ—“আমি মন্ত্রী, শপথ নিয়েছি আদালত ও সংবিধান মেনে চলার। কিন্তু আপনারা, লক্ষ লক্ষ কৃষকরা মন্ত্রী নন, শপথ নেননি। আদালতে কলমের ডগায় জমি দখলে ইনজাংশন জারি হয়েছে, আপনারা হাজারো লাঙলের ফলা দিয়ে জমিকে ইনজাংশন মুক্ত করুন ও ন্যায় বিচারকে প্রতিষ্ঠা করুন।” রাষ্ট্র সম্পর্কে এত সহজ ব্যাখ্যা অনবদ্য।

দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের ভূমিরাজস্ব মন্ত্রী হরেকৃষ্ণ কোণ্ডারের জমিদারদের জমি ধরে টানাটানি এই সরকারের মুখ্যমন্ত্রী কংগ্রেস ছেড়ে আসা বাংলা কংগ্রেসের অজয় মুখার্জী মেনে নিতে পারলেন না। যে-কোনো সময় পদত্যাগ করে সরকার ফেলার ছমকি তিনি দিচ্ছেন। এই পটভূমিতে ১৯৭০ সালের ১৫ মার্চ, ব্রিগেডে সি পি আই(এম)-এর ডাকে ২৫ লক্ষ মানুষের সমাবেশ হয়। পরদিন ১৬ মার্চ অজয় মুখার্জী পদত্যাগে সরকার ভেঙে যায়। প্রতিবাদে ১৭ মার্চ বাংলা বন্ধ এবং সর্বত্র সকালেই মিছিল। বর্ধমান শহরের মিছিলে ঘটলো এক আক্রমণের ঘটনা যা ব্যাপক প্রচারে সাঁইবাড়ির ঘটনা হিসাবে পরিচিত।

সাঁইবাড়ির ঘটনা কোনো আক্রমণের ঘটনা নয়, এটা ছিল আক্রমণ প্রতিরোধের ঘটনা। কিন্তু কংগ্রেস ও পুলিশের যৌথ তীব্র আক্রমণ বর্ধমান শহর সহ গোটা জেলায় নেমে আসে। আর বুর্জোয়া পত্র-পত্রিকা ও রেডিওর মাধ্যমে প্রকৃত ঘটনাকে আড়াল করে সি পি আই(এম)-বিরোধী কুৎসার ঝড় শুরু হয়। রামনারায়ণ গোস্বামী, বিনয় কোণ্ডার সহ বহুজনকে মিথ্যা কেসের আসামি ও জেলবন্দি করা হয়, যাঁরা সেদিন বর্ধমান শহরেই ছিলেন না। এহেন পরিস্থিতিতে ৩ এপ্রিল বিকালে বর্ধমান টাউন হল ময়দানে সি পি আই(এম)-এর ডাকে জনসভা। বক্তা হরেকৃষ্ণ কোণ্ডার ও জ্যোতি বসু। জনসভা বানচালে কংগ্রেসের সবরকম প্রচেষ্টাকে পরাহত করে বিশাল সমাবেশে হরেকৃষ্ণ কোণ্ডারের ভাষণ আজও গায়ে কাঁটা দেয়। ভাষণের শুরু এইভাবে — “আজ বর্ধমান শহরে যখন প্রবেশ করছি তখন শহরের দেওয়ালে কিছু পোস্টার দেখলাম— বর্ধমান, সি পি এমের কবরস্থান। তা তোমরা যে কজন এই পোস্টার মেরেছো তারা যদি একজায়গায় জড়ো হও, আর আজকের এই সভায় যে মানুষেরা এসেছে তারা যদি শুধু থুতু দেয় তাহলেই তোমাদের কবর রচনা হয়ে যাবে। তা বলে আপনারদের আমি বলবো না যে কংগ্রেস দেখলে আপনারা থুতু দেবেন, কারণ শ্রমিক কৃষকরা কখনও অসভ্যতা করে না, অসভ্যতা করে তারাই, দিন যাদের শেষ হয়ে এসেছে।” মুহূর্তের মধ্যে বিপুল হাততালি। দ্বিধাগ্রস্ত মানুষ যেন যুক্তি খুঁজে পেয়ে সতেজ হয়ে গেলো।

তখন ব্রিটেনে ভারতের প্রাক্তন হাইকমিশনার আইনজ্ঞ শান্তিস্বরূপ ধাওয়ান। তিনি সাঁইবাড়ির ঘটনার পর ব্যাপক ফলাও করে এই বাড়িতে এসেছিলেন পরিবারের সকলকে সমবেদনা জানাতে। তার কাব্যিক কাহিনি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। অথচ ১৭ মার্চ অর্থাৎ এই একই দিনে ছগলির ত্রিবেণীতে কংগ্রেসি ঘটকরা শ্রমিক নেতা ননী দেবনাথ-কে প্রকাশ্যে নৃশংসভাবে খুন করে কারখানার জলস্ত বয়লারে ফেলে দিয়েছিল, যাতে আগুনে বলসে মৃতদেহ আর না পাওয়া যায়। কিন্তু রাজ্যপাল সেখানে যাননি। এই সভাতেই সেই ঘটনার উল্লেখ করে ‘ননী দেবনাথের মা নেই, তার বোন নেই, তার মায়ের চোখের জল নেই’—হরেকৃষ্ণ কোণ্ডারের কণ্ঠে এই আবেগময় উচ্চারণ শ্রোতাদের চোখে আনে জল এবং পরবর্তী সময়ে প্রতিবাদের আগুন হয়ে ওঠে। বক্তৃতা চলাকালীন মঞ্চের পিছন দিক অর্থাৎ টাউন স্কুল হতে কংগ্রেসি মস্তানদের ব্যাপক

বোমাবাজিও সভার তাল কাটতে পারেনি।

হরেকৃষ্ণ কোণ্ডারের লেখার হাতও ছিল খুব শক্তিশালী। সারা দেশ জুড়ে বক্তৃতার সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যসহ সারা দেশের নানা পত্রিকায় তাঁর প্রভাবশালী লেখা বের হতো। দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রী থাকাকালীন তিনি ৩৬এ, বেনিয়াপুকুর রোড (বর্তমানে যে রাস্তাটি তাঁর নামেই) ঠিকানার একটি ভাড়াবাড়িতে (সরকারি বাড়ি নেননি) থাকতেন। স্কুলের ছুটি পেলে মাঝে মাঝে জেঠু ও জ্যাঠাইমার আদর খেতে এই বাসায় যেতাম। ছোট বয়সে গাড়ি চাপার লোভে দিনের বেলায় আমি জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গী হয়ে যেতাম। তাঁর সঙ্গে মহাকরণ, বিধানসভা, আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের পার্টি অফিস সহ নানা জায়গায় অনাবিল আনন্দে ঘুরতাম। সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রমের পর রাতে বাড়ি ঢুকে আগে নিজের সাদা ধুতি-পাঞ্জাবি সহ সব পোষাক সাবান জলে ডুবিয়ে দিতেন। তারপর রাতের আহার সেরে কাচাকাচির পর পড়তে বসতেন। একদিকে পড়া, অন্যদিকে লেখা চলছে। গভীর রাত পর্যন্ত পড়াশুনা করতেন। কিন্তু ঘরের কারো যাতে কোনো অসুবিধা না হয় সে ব্যাপারে সতর্ক থেকে পড়ার জন্য এমন টেবিল ল্যাম্প ব্যবহার করতেন যাতে টেবিল ছাড়া কোনো দিকে আলো না ছড়ায়। গভীর রাতে শুয়ে খুব দ্রুত ঘুমিয়ে যেতেন এবং পরদিন আবার সকাল করেই উঠে পড়তেন। খুব দ্রুত প্রস্তুত হয়ে হালকা খাবার খেয়ে বেরিয়ে পড়তেন।

কর্মীদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল খুব আত্মিক। দোষ বা ত্রুটি দেখলে কড়া ধমক দেওয়ার পরই সে খেয়েছে কি-না, তার সুবিধা-অসুবিধার কথাও জেনে নিতেন। এই জাতীয় টুকরো টুকরো কিছু ঘটনা আজও মনে পড়ে।

অঙ্গীকার

ছিন্ন ছিন্ন ভাবে এই মানুষটির সাম্রাধিপ্য পাওয়ার কারণে আফশোস রয়েই গেল। কষ্টটা আরো বাড়ে যখন তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্কের কথা কেউ বলে। তখন বড় লজ্জা হয়। তখন বলতে ইচ্ছা হয়—ওনাকে দেখে সেই ভাবনায় আমাকে দেখবেন না, তাহলে কষ্ট পাবেন। নিজের ঘর, নিজের বিছানা ছেড়ে দু-একদিন বাইরে থাকলেই মনের ভিতর টনটন করে, অথচ এই মানুষরা বছরের পর বছর বাড়ি ছেড়ে এবং জেলে কাটিয়েছেন। সংগঠন গড়ে তুলতে শত শত মাইল সাইকেল চেপে ঘুরেছেন। আর আজ আমরা সামান্য দূরত্বে যেতেই মটর সাইকেল ছাড়া ভাবতেই পারি না। মা (কমরেড মহারানি কোণ্ডার)-র কাছে শুনেছি— কোনো রাতে জ্যাঠামশাই যদি মেমারির বাড়ি আসতেন তাহলে আহার সেরে বাড়িতে এসে চিলেকোঠার ঘরে আশ্রয় নিতেন।

গত শতাব্দীর সাতের দশকে তাঁর মৃত্যুর পর প্রয়াত বাসব দাশগুপ্ত বলেছিলেন—“খবরের কাগজে রোজ বহু নেতার কথা দেখি। দূর থেকে তাঁরাও ঘামতেল মাখা প্রতিমার মতোই আলোকিত। তাঁদের ঘিরে কিংবদন্তীর পসরা। এখন শৈশব কৈশোরের উঠোন পার হয়ে যৌবনে এসে বুঝি—চাদিকে অনেক পদাধিকারবলে নেতা রয়েছেন, কিন্তু নেতা হওয়ার হক আছে এমন নেতা প্রায় বিরল। এমন একজন বিরল নেতা ছিলেন কমরেড হরেকৃষ্ণ কোণ্ডার। জনগণেশ যাঁকে সম্মানে ভালোবাসার অধিনায়কের আসনখানি দেখিয়ে বলেছেন—‘হে বীর পূর্ণ করে’।”

কোণ্ডার পরিবারের একজন সদস্য হিসাবে আমি মনে করি রাজনীতিতে যে উচ্চ ও স্বচ্ছ মান তিনি গড়ে তুলেছিলেন, তার দিকে এগোনোর প্রচেষ্টা এবং পরিবারে রাজনীতির যে ধারা তিনি তৈরি করেছিলেন বংশপরম্পরায় তা বজায় রাখাই এখন আমাদের পরিবারের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ।

With best compliments of

RITUSHREE

...for perfect colour printing at affordable price

54/1, Kachari Road, Burdwan, Ph : 0342-3290718

Sl. No. 45

হরেকৃষ্ণ কোঙার

স্মৃতির সরণীতে শতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি

বীরেন ঘোষ

ষাটের দশকের শেষের দিকে হরেকৃষ্ণ কোঙারের সান্নিধ্যে আসার দুর্লভ সুযোগ হয়েছিল একজন সাধারণ সিপিআই(এম) কর্মী হিসেবে। সেই সময়ের কিছু অবিস্মরণীয় স্মৃতি তাঁর জন্মশতবর্ষে শ্রদ্ধার্থী হিসেবে নিবেদন করছি।

“স্থানীয় এম.এল.এ. হরেকৃষ্ণ কোঙার সহ সমস্ত রাজবন্দীদের মুক্তি চাই”, “ডি.আই.আর ছিঁড়ে ফেলো, পুড়িয়ে ফেলো”—১৯৬৬ সালে ছাত্র আন্দোলনের কর্মী হিসেবে বন্দীমুক্তি আন্দোলনে যোগ দিয়ে এই শ্লোগান তুলে কালনা শহরের রাস্তায় মিছিলে হাঁটার মধ্য দিয়ে এই মহান নেতার নামে সাথে পরিচিত হয়েছিলাম। মিছিলে হাঁটার মধ্য দিয়ে তাঁর সাথে একাত্মতা বোধ করেছিলাম, আগ্রহ বেড়েছিল তাঁকে আরও জানবার। তারপর বিভিন্ন কর্মসূচিতে হরেকৃষ্ণ কোঙারকে দূর থেকে দেখেছি। বন্ধুতা শুনেছি। আরও আগ্রহ বেড়েছে।

১৯৬৬ সালের সম্ভবত মে মাসে কালনার পূর্ব সাতগাছিয়াতে সি পি আই (এম)-এর সদস্যদের একটি সাধারণ সভায় হরেকৃষ্ণ কোঙার উপস্থিত থাকবেন। মহাদেব ব্যানার্জী-র (শহিদ) নির্দেশ মতো ধাত্রীগ্রাম থেকে আমি ও প্রয়াত শক্তি দাস সভায় যাবার জন্য যে বাসে ধাত্রীগ্রাম থেকে কালনায় যাচ্ছিলাম, সেই বাসেই উনি বর্তমান থেকে (অথবা মেমারি) কালনার সভায় যাচ্ছিলেন। উনি বাসের ড্রাইভারের কেবিনে ছিলেন, আমরা পিছনের গেটে উঠেছিলাম। কালনায় নেমে পৃথক বাসে (কালনা ব্যান্ডেল রুটে) সভায় যেতে হবে। আমরা কালনায় নেমে চা-টিফিন খেতে গিয়ে নির্ধারিত বাস ফেল করে প্রায় ৪০-৪৫ মিনিট দেরিতে পরের বাসে নির্দিষ্ট স্টপেজে নেমে সভায় যাই। সভাকক্ষে ঢুকতেই কমরেড হরেকৃষ্ণ কোঙার বললেন, “তোমরা তো আমার সাথে একই বাসে কালনায় এসেছো, এত দেরিতে মিটিং-এ এলে কেন?” আমরা শ্রদ্ধামিশ্রিত বিস্ময়ে হতবাক। আমাদের মতো অল্পবয়সী অত্যন্ত সাধারণ অচেনা কর্মীদের প্রতি তাঁর মতো বড় মাপের নেতার সতর্ক দৃষ্টি আমাদেরকে আশ্চর্য করেছিল।

১৯৬৭ সালের ডিসেম্বরের কোনো এক শীতের সকালে বিধানসভা নির্বাচনে কালনা কেন্দ্রে নমিনেশন দাখিলের জন্য বর্তমান থেকে বাসে কালনা যাবার পথে ধাত্রীগ্রাম বাজারে (স্টপেজে বাস



দাঁড়ানোর সময়ে) তাঁকে বাসে দেখতে পেয়ে বাসের জানালা দিয়ে চা খেয়ে যাবার জন্য আদ্যর জানাই। তাতে সাড়া দিয়ে তিনি বাস থেকে কয়েক মিনিটের জন্য নেমে আসেন। গরম চায়ের গ্লাসে চুমুক দিয়ে হাতে একটা সিগাড়া নিয়ে খেতে খেতে বাসে উঠে পড়লেন। সেই আন্তরিকতার স্মৃতি এখনও আমাদের মনে ও সেই দোকানদারের মনেও অমলিন রয়েছে। সাধারণ কর্মীদের সাথে এমনই ছিল কেস্তদার আন্তরিকতার বন্ধন।

১৯৬৭-র নির্বাচনের সময় ধাত্রীগ্রাম বাজারে নির্বাচনী জনসভা। বক্তা হরেকৃষ্ণ কোঙার। সভার দিন সকাল থেকে অব্যোহাে বৃষ্টি। দুপুরের দিকে মহাদেবদা (ব্যানার্জী) হরেকৃষ্ণ কোঙার ও নাদনঘাট কেন্দ্রের (সেই বছরই নাদনঘাট

বিধানসভা নামে নতুন কেন্দ্র হয়) প্রার্থী সুবোধ ভাওয়ালকে নিয়ে ধাত্রীগ্রামে আসেন। বৃষ্টির জন্য লোক জমায়েত হবে না বলে আমরা সভা বাতিলের প্রস্তাব দিই। কেস্তদা বললেন, লোকজন কমবেশি হোক, সভা বাতিল করো না। সে রকম হলে আমি পথসভা করবো। সর্বভারতীয় নেতা পথসভায় বক্তব্য রাখবেন, আমরা নতুন শিক্ষা পেলাম। বিকালে যদিও সেই সভায় জমায়েত ভালোই হয়েছিল।

নির্বাচনী প্রচারের সময়ে ধাত্রীগ্রামে একটি ছোট্ট মেয়ে কেস্তদাকে ফুল দিয়ে প্রণাম করেছিল। কেস্তদা তাকে ডেকে পকেট থেকে দুটো লজেন্স দিয়েছিলেন। প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রী হবার পর সেই বাচ্চা মেয়েটি তাঁকে লজেন্স দেবার কথা মনে করিয়ে দিয়ে প্রণাম জানিয়ে চিঠি লিখেছিল। হরেকৃষ্ণ কোঙার মন্ত্রীর প্যাডে নিজের হাতে লিখে চিঠির উত্তর দিয়ে ভালো করে লেখাপড়া করার কথা বলেছিলেন। সেই কিশোরী কন্যা বর্তমানে বর্তমান শহরের একটি বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষিকা। শিশুকালের সেই ঘটনা আজও তাঁর মনে স্মৃতি হয়ে আছে।

১৯৬৮ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকার ভাঙার পর রাষ্ট্রপতি শাসনের নামে গ্রামে গ্রামে পুলিশি অত্যাচারের বিরুদ্ধে বড়বহরকুলি গ্রামে জমি দখলের আন্দোলনে জোতদার-পুলিশের সশস্ত্র আক্রমণের প্রতিবাদে বৈদ্যপুরে প্রতিবাদসভা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তা ছিলেন হরেকৃষ্ণ কোঙার। হাজার হাজার মানুষের মিছিলে শ্লোগানে সভাস্থলের সব রাস্তা উত্তাল। লাঠির মাথায় লাল বাণা লাগিয়ে আদিবাসী ক্ষেতমজুরদের দৃপ্ত মিছিল। পুলিশ মিছিল আটকে

খেতমজুরদের হাত থেকে লাঠি কেড়ে নিচ্ছে। ঝাঙাগুলো মাটিতে ফেলে দিচ্ছে। ওই রাস্তাতেই হরেকৃষ্ণ কোঙার আসছেন সভায়। পুলিশের সামনে গাড়ি থামিয়ে দূততার সাথে পুলিশকে ধমকে মিছিলের ঝাঙা সহ লাঠি ফেরৎ দিতে বললেন। দূততার সামনে নতিস্বীকার করে পুলিশ ঝাঙাসহ লাঠি ফেরৎ দিতে বাধ্য হয়। বিজয় আনন্দে, প্রতিবাদে, প্রতিরোধে দৃপ্ত মিছিলে উত্তাল জনসভার মাঠ। হাজার কণ্ঠের শ্লোগান : কমরেড হরেকৃষ্ণ কোঙার জিন্দাবাদ।

১৯৬৯ সালের বিধানসভা নির্বাচন। নাদনঘাট কেন্দ্রের প্রার্থী প্রয়াত মনসুর হবিবুল্লাহ। সম্ভবত ১৯৬৮ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বরে মহাদেব ব্যানার্জীর সাথে হরেকৃষ্ণ কোঙার ও মনসুর হবিবুল্লাহ ধাত্রীগ্রাম রেলস্টেশনে নামেন। নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী আমরা স্টেশন থেকে তাঁদের নিয়ে আসার জন্য হাজির হই। তখন যাতায়াতের রিক্সা ইত্যাদি ছিল না। তাঁদের নিয়ে স্টেশন থেকে হাঁটতে হাঁটতে ধাত্রীগ্রাম বাজারের দিকে আসতে রাস্তায় চা খাবার কথা হলে কেস্তদা বলেন, “তোমরা যেখানে চা খাও, আড্ডা দাও, সেই দোকানে চলো!” তখন প্রায় জায়গায় নির্দিষ্ট চায়ের দোকানে পার্টিকর্মীদের ঠেক বা আড্ডা থাকতো। সেই মতো প্রায় মাইল খানেক হেঁটে ধাত্রীগ্রাম বাজারে এসে খাবার দোকানের বাঁশের মাচায় বসে চা খাওয়া হল। স্থানীয় সিপিআই(এম) কর্মীদের সাথে এমনভাবেই একাত্ম হতেন, তাঁদের গুরুত্ব দিতেন কেস্তদা। সেই দোকানদার দীর্ঘদিন গর্বভরে বলে বেড়াতেন, “জানিস, হরেকেষ্ট কোঙার এই মাচায় বসে চা খেয়ে গেছেন।” পরবর্তীতে হরেকেষ্টদার মৃত্যুতে শ্রদ্ধা জানাতে সেই চা-দোকানদার সেদিন তাঁর দোকান বন্ধ রেখেছিলেন।

১৯৭১ সালে সম্ভবত এপ্রিল মে মাসে সিপিআই(এম) জেলা কমিটির উদ্যোগে কালনা-পূর্বস্থলী যুক্তভাবে একটি জরুরি কর্মীসভার আয়োজন করে ধাত্রীগ্রামের বাধাগাছি গ্রামে। বক্তা ছিলেন হরেকৃষ্ণ কোঙার। জেলা কমিটির পক্ষে উপস্থিত ছিলেন বিনয় কোঙার, রামনারায়ণ গোস্বামী, মহাদেব ব্যানার্জী, কাশীনাথ হাজারা চৌধুরী প্রমুখ। সম্ভাসের আবহাওয়ায় কালনা শহরে সভা করার সুযোগ ছিল না। বাধাগাছি গ্রামে প্রায় গোপনে সভা হয়েছিল। বিভিন্ন এলাকা থেকে কর্মীরা নানা পথ ঘুরে নানা কৌশলে ওই সভায় হাজির হয়েছিলেন। একদিকে তখন পার্টিকর্মীরা প্রতিদিন আক্রান্ত হচ্ছেন, অন্যদিকে বাংলাদেশ যুদ্ধের পটভূমিকা। এই পরিস্থিতিতে পার্টিকর্মীদের কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা হয়েছিল। সভাস্থলে পার্শ্ববর্তী গ্রামকালনা গ্রাম থেকে প্রাচীন পার্টিদরদি কোবাদ চাচা এসেছিলেন হরেকেষ্ট কোঙারের সাথে পরিচিত হবার আর্জি নিয়ে। সভার শেষে কেস্তদার সাথে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিতে বয়স্ক মানুষটি কেস্তদার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে যেতেই তাঁকে দু-হাতে আলিঙ্গনাবদ্ধ করলেন কেস্তদা। আবেগে তখন কোবাদ চাচা কাঁদছেন। দু-জনার নানা কথা হল। তারপর থেকে কোবাদচাচা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সিপিআই(এম)-এর সাথে থেকে নানাভাবে আমাদের সাহায্য করে গেছেন। আধাফ্যাসিস্ত সম্ভাসের সময় তাঁর পরিবার আক্রান্ত হয়েছে। বাগানের বড় বড় গাছ, গোয়াল থেকে গরু নিয়ে চলে গেছে মস্তানরা। শত অত্যাচারেও তিনি পার্টির প্রতি অবিচল থেকেছেন। গর্বভরে বলতেন, আমি হরেকেষ্ট কোঙারের শিষ্য। এ-রকম অসংখ্য মানুষ হরেকৃষ্ণ কোঙারের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে পার্টির শক্তি বাড়িয়েছেন।

১৯৭১ সালের ২ জুলাই মহাদেব ব্যানার্জীর হত্যার খবর পেয়ে কলকাতা থেকে ছুটে এসেছিলেন হরেকৃষ্ণ কোঙার। হাজার হাজার মানুষের শোকমিছিল আটকানোর জন্য প্রশাসন কালনা শহর জুড়ে

১৪৪ ধারার সাথে কারফিউ জারি করে। নির্লজ্জ প্রশাসনের সেই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে শহিদের মরদেহ নিয়ে হাজার হাজার মানুষের প্রতিবাদী মিছিলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন হরেকৃষ্ণ কোঙার।

১৯৭১-৭২ সালে আধাফ্যাসিস্ত সম্ভাসের কারণে এলাকা ছাড়ার পর কলকাতায় হরেকৃষ্ণ কোঙারের সাথে প্রায় নিয়মিত যোগাযোগ গড়ে ওঠে।

১৯৭৪ সালে গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় কলকাতায় পার্ক সার্কাসে কিস্বার নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন অবস্থায় প্রায় প্রতিদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যেতাম।

মনে আছে, সেদিন কিস্বার নার্সিংহোমে কেস্তদা পেটের নিচে বালিশ দিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে দুরারোগ্য ক্যান্সারের অসহ্য যন্ত্রণাকে আড়াল করে কথাবার্তা বলছিলেন। জিজ্ঞাসা করেছিলাম, উপুড় হয়ে শুয়ে আছেন কেন? খুব কষ্ট হচ্ছে? মুখে স্নান হাসি ছড়িয়ে কষ্টটাকে হজম করে বলেছিলেন, “না।” অব্যক্ত এক যন্ত্রণা নিয়ে প্রিয় নেতাকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানিয়ে ফিরে এসেছিলাম।

জুলাই মাসের শেষের সেই দিনগুলোতে প্রায় প্রতিদিন আনাগোনা ছিল কিস্বার নার্সিংহোমে। সারা রাজ্য থেকে কমরেডরা প্রতিদিন নার্সিংহোমের ভিড় করতেন প্রিয় নেতাকে দেখতে। নার্সিংহোমের আনাচেকানাচে শুধু হা-ছতাশ, উদ্বেগ আর দীর্ঘশ্বাস। নার্সিংহোম চত্বরে আমাদের মতো কত ঘরছাড়া কমরেডদের সাথে দেখা হতো, পরিচয় হতো কলকাতার বেলেঘাটা, কসবা, হালতু, টালিগঞ্জ-এর ঘরছাড়াদের সাথে। তাঁদের সাথে কালনার ঘরছাড়াদের একটাই আকুতি—“কেস্তদা ভালো হয়ে উঠুন।”

শেষের দিকে কোনো একদিন আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে বন্দি বিনয় কোঙার প্যারোলে আসবেন নার্সিংহোমে দাদাকে দেখতে। তার আগের দিন আমরা নার্সিংহোমে দেখা করতে যেতেই কেস্তদা সতর্ক করলেন—“কাল জেলখানা থেকে বিনয় আসবে, পুলিশ নার্সিংহোম ঘিরে রাখবে। অনেক আই.বি. অফিসাররা থাকবে। কাল যেন কালনার কমরেডরা নার্সিংহোমের ধারে কাছে না থাকে। পুলিশ গ্রেপ্তার করতে পারে।” মৃত্যুর কাছাকাছি দাঁড়িয়ে রোগযন্ত্রণাকে উপেক্ষা করে কমরেডদের রক্ষার জন্য সতর্ক নজরদারি, সঠিক নির্দেশ আর আর কাছে পাব? সেদিন মনে হয়েছিল তিনি যেন বলছেন—“আমি মৃত্যুর চেয়ে বড়। এই শেষ কথা বলে, যাব আমি চলে...”

শেষের সেদিন ঘনিয়ে এল। উদ্বেগ আর অব্যক্ত কান্নায় নার্সিংহোমের বাতাস ভারি হয়ে উঠেছে। প্রবাদপ্রতিম কমিউনিস্ট নেতা হরেকৃষ্ণ কোঙারের জীবনাবসান ঘটলো। আমরা হারালাম আমাদের নেতা তথা নির্ভরযোগ্য আপনজন, অভিভাবক কেস্তদাকে।

কমরেড হরেকৃষ্ণ কোঙারের মরদেহ নিয়ে সেই রাতেই কিস্বার নার্সিংহোম থেকে আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে সিপিআই(এম)-এর রাজ্য দপ্তরে যাওয়ার জন্য নীরব শোকমিছিলে পা মেলালাম।

পরদিন ২৫ জুলাই লালপতাকা আর ফুলে ফুলে ঢাকা মরদেহ নিয়ে হাজার হাজার মানুষের শোকমিছিল আলিমুদ্দিন স্ট্রিট থেকে কেওড়াতলায় অন্তিম যাত্রা। স্মরণীয় সেই ঐতিহাসিক শোকমিছিলে পা মিলিয়ে শেষ অভিবাদন জানিয়েছিলাম। প্রিয় নেতা হরেকৃষ্ণ কোঙারের শেষযাত্রার হাঁটা এক পদাতিক হিসেবে আজও স্মৃতির সরণিতে বাঙ্য় হয়ে আছে ইন্টারন্যাশালের সুর—

শেষ যুদ্ধ শুরু আজ কমরেড

এসো মোরা মিলি একসাথ,

গাও ইন্টারন্যাশনাল

মিলাবে মানবজাত...

স্মরণ বিভাগে হরেকৃষ্ণ কোঙারের ছবিগুলি পাঠ কোঙারের সৌজন্যে প্রাপ্ত

সুবোধ চৌধুরী : সংগ্রামের জীবন্ত ইতিহাস

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়



১৯২৪ সাল। কাটোয়ার কাশীরাম দাস বিদ্যায়তন গমগম করছে। প্রধান শিক্ষক শ্রীচণ্ডীদাস মজুমদার মহাশয়ের ঘরে প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষকদের মধ্যে কিছু আলোচনা হচ্ছিল। আড়ি পেতে ১০ বছরের সপ্তম শ্রেণির এক ছাত্র শুনলো কাটোয়া হরিসভায় কে এক নেত্রী এসেছেন, বিলাতি কাপড় পোড়ানো হবে। তখন স্বদেশী আন্দোলনের যুগ। কাটোয়া ছিল স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম পীঠস্থান। দেশ জুড়ে চলছে বিদেশি পণ্যবর্জনের ডাক। আন্দোলন পরিচালনার উদ্দেশ্যে কলকাতা থেকে নেতৃবৃন্দ আসতেন। সেদিনও এক নেত্রী এসেছিলেন। হরিসভার সমাবেশে বিদেশি কাপড় পোড়ানো শুরু হল। কাশীরাম দাস বিদ্যায়তনের সেই ছাত্রটিও হাজির। ছাত্রটি তার একমাত্র সার্টটি আগুনে ছুড়ে দিলো। আর কাঁচার খুঁটটি গায়ে দিয়ে বোর্ডিং-এ ফিরে এসে ধমক খেলো। স্বদেশী চিন্তার সেইখানেই উন্মেষ।

এই বালকটিই হচ্ছে বিখ্যাত বিপ্লবী, দেশপ্রেমিক, কমিউনিস্ট, জনগণের জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণ সুবোধ চৌধুরী। জন্ম ১৯১৪ সালে

বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত অগ্রদ্বীপ গ্রামে। গ্রামটিকে ভাগ করে দিয়েছে গঙ্গা। ওপারে নদিয়া জেলার দিকেই বাড়ি ছিল সুবোধ চৌধুরীর। তখন উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার কথা চিন্তা করাই কঠিন। বনজঙ্গলে ঘেরা গ্রাম, গ্রামে কোনো প্রাথমিক বিদ্যালয়ই ছিল না। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষার কোনো পরিবেশই ছিল না। অজ পাড়াগাঁ। ১৯২১ সালে পিতা গগন চৌধুরী ও মাতা চারুবালা চৌধুরী পুত্র সুবোধকে কাটোয়ার কাশীরাম দাস বিদ্যায়তনে তখনকার সপ্তম (বর্তমান চতুর্থ) শ্রেণিতে ভর্তি করেন এবং বোর্ডিং-এ থাকার ব্যবস্থা করেন।

ঐ ঘটনার খবর চলে গেল অগ্রদ্বীপে। পিতা-মাতা ছেলের ভবিষ্যত লেখাপড়া সম্পর্কে চিন্তিত হয়ে পড়লেন। ১৯২৪ সালে বালক সুবোধের তখনকার চতুর্থ (বর্তমান সপ্তম)-শ্রেণির পড়া শেষ হল। মামা নগেন্দ্রনাথ সর্বাধিকারী থাকতেন চট্টগ্রামে, কাজ করতেন পাহাড়তলির ইবি রেলওয়ে ওয়ার্কশপে। মামার কাছে খবর গেল। ১৯২৫ সালে মামা এসে ভাগ্নেকে চট্টগ্রামে নিয়ে গেলেন ও পাহাড়তলির রেলওয়ে হাইস্কুলে ভর্তি করে দিলেন।

চট্টগ্রামে পড়াশুনার সময় ১৯২৬ সালে তাঁর প্রথম যোগাযোগ হয় ‘যুগান্তর’ দলের চট্টগ্রাম শাখা (সূর্য সেনের দল)-র সঙ্গে। পড়াশুনার সাথে সাথে করতেন শরীরচর্চা। সুস্থ সবল শরীর সুস্থ মনের আধার।

১৯২৮ সালে কিশোর সুবোধ ১৪ বছর বয়সে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে চট্টগ্রাম কলেজের বিজ্ঞান বিভাগে প্রথম বার্ষিক শ্রেণিতে ভর্তি হলেন। প্রবেশিকা পরীক্ষা দেওয়ার পর ‘সদরঘাট ক্লাব’-এ আলাপ হয় বিপ্লবী গণেশ ঘোষের সঙ্গে। তিনি ১৯২৮ সালে কিশোর সুবোধকে নিয়ে গেলেন বিপ্লবী সূর্য সেনের কাছে। নানা পরীক্ষা ও প্রশিক্ষণের পর তিনি যোগ দিলেন ‘ইণ্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি’তে, দেশের মুক্তির জন্য সংগ্রামে।

তখন প্রস্তুতি চলছিল চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখলের। কিশোর সুবোধের উপর দায়িত্ব পড়লো অস্ত্রালিয়ারি ফোর্স হেডকোয়ার্টার্স-এর পর্যবেক্ষণ রিপোর্ট সংগ্রহ করার। সুবোধ দক্ষতার সাথে সঠিক সময়ে সংগ্রহ করে দিলেন সেই পর্যবেক্ষণ রিপোর্ট।

সেদিন ১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল। বিপ্লবী সূর্য সেন (মাস্টারদা)-এর নেতৃত্বে ঘোষিত হল চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহ। এই দিনই দখল হল ব্রিটিশের চট্টগ্রাম-অস্ত্রাগার। এই সংগ্রামে বাছাই করা বিপ্লবীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ১৬ বছরের তরুণ সুবোধ চৌধুরী। চট্টগ্রাম শহর হতে ব্রিটিশ বিতাড়ন শুরু হল। অস্ত্রাগার পুনরুদ্ধার করার জন্য বিদেশি ব্রিটিশ সরকারও বিশাল সৈন্য সমাবেশ করলো। অকুতোভয় বাংলার দামাল ছেলেরাও প্রতিরোধে প্রস্তুত জালালাবাদ পাহাড়ে—হাতে তাদের ব্রিটিশের নিকট থেকে দখল

করা অন্ত। নেতৃত্বে বিপ্লবী মাস্টারদা। ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেলস ও সুর্মাভালি লাইট হর্স রেজিমেন্ট প্রতি-আক্রমণ শুরু করলো জালালাবাদ পাহাড়ে। সে এক অসম লড়াই—বিশাল সজ্জিত শক্তিশালী সুশিক্ষিত সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে কয়েকজন আত্মত্যাগী দেশপ্রেমিকের। শহিদ হলেন নরেশ রায়, ত্রিপুরা সেন সহ বিপ্লবীগণ। এই লড়াইয়ে অংশগ্রহণকারী সুবোধ চৌধুরীকে নির্দেশ দেওয়া হল নতুন ফ্রন্ট খোলার—ইউরোপিয়ান ক্লাব ও কলোনি আক্রমণের। শুরু হল সংগ্রাম, জালালাবাদ পাহাড়ের কাছে ব্রিটিশ বাহিনীর সঙ্গে। এই লড়াই -এ শহিদ হলেন স্বদেশ রায়, রজত সেন, দেবু গুপ্ত, মনোরঞ্জন সেন। ধরা পড়লেন সূর্য সেন, গণেশ ঘোষ, তারকেশ্বর দস্তিদার, অনন্ত সিংহ। ১৯৩০ সালের ৬ মে কালারপোলে আত্মগোপনে থাকা অবস্থায় ধরা পড়লেন সুবোধ চৌধুরী ও ফণী নন্দী। ১৯৩১-৩২ সাল ধরে চলল ব্রিটিশের একতরফা বিচার। ফাঁসির আদেশ হল সূর্য সেন ও তারকেশ্বর দস্তিদারের। বাকিদের হল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ। বিপ্লবী সুবোধ চৌধুরীর বয়স তখন ১৮। সময়টা ১৯৩২ সালের আগস্ট। শেষ হল স্বাধীনতার জন্য বিপ্লবী ধারার সংগ্রাম। সুবোধ চৌধুরীর জীবনে শুরু হল আর এক সংগ্রাম।

সেই সময় দেশের মুক্তি আন্দোলনের নানা ধারার সংগ্রামীদের পাঠানো হতো আন্দামান সেলুলার জেলে, দ্বীপান্তরে। নানা ধারার সংগ্রামের সবলতা-দুর্বলতা-সীমাবদ্ধতা নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা চলত সংগ্রামীদের। অনুসন্ধান চলত নতুন পথের। সশস্ত্র সংগ্রামের মূল্যায়ন হতো, আলোচনা হতো এই সংগ্রামের সীমাবদ্ধতা নিয়ে। রাশিয়া মুক্তি লাভ করেছে ১৯১৭ সালে—শুরু হয়েছে লেনিনের নেতৃত্বে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। ফলে সাম্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব তখন সারা বিশ্বে। ভারতও সেই প্রভাব থেকে বাদ পড়েনি। সাম্যবাদী চিন্তা-ধারার কিছু বিপ্লবীও বন্দি ছিলেন আন্দামানে। সাম্যবাদ সম্পর্কে চর্চাও হতো জেলে। নারায়ণ রায়, খোকা রায়ের সাথে অনেক বিপ্লবীই মার্কসবাদ, শ্রমিক-কৃষকের মুক্তি, শ্রমিক-কৃষকের আন্দোলন, রাশিয়ায় সমাজবাদী আন্দোলন, কমিউনিস্ট পার্টি প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করতেন। গঠিত হল ‘কমিউনিস্ট কনসলিডেশন’। সুবোধ চৌধুরী আলোচনায় অংশগ্রহণ করতেন, কিন্তু কনসলিডেশনে যোগ দেননি। ঐ বিপ্লবীদের কাছ থেকে বই নিয়ে পড়তেন। পছন্দ করা অংশগুলি লিখে রাখতেন। এইসময় আলাপ হয় ‘স্বদেশি ডাকাতি’র অভিযোগে আন্দামানে নির্বাসিত বর্ধমান জেলার হরেকৃষ্ণ কোঙারের সঙ্গে। আলাপ ধীরে ধীরে পরিণত হয় গভীর বন্ধুত্বে। আন্দামানেই সুবোধ চৌধুরীর সঙ্গে পরিচয় হয় মানিকগঞ্জ মামলার সমর ঘোষ ও কুমিল্লার বিরাজ দেবের।

১৯৩৮ সালে শুরু হল দেশব্যাপী তুমুল বন্দি-মুক্তি আন্দোলন। সঙ্গে সঙ্গে মুক্তি সাপেক্ষে রাজবন্দিদের দ্বীপান্তর থেকে ফিরিয়ে আনার দাবিও উঠলো। স্বয়ং রীব্রজনাথ সমর্থন করলেন এই আন্দোলন। মূলত ছাত্র-ফেডারেশনের নেতৃত্বে এই আন্দোলন তীব্রতর হয়। বন্দিরাও জেলে অনশন ধর্মঘট করেন। অনশনের জন্য বন্দিদের শারীরিক অবস্থা খারাপ হয়। শেষে দেশের জনগণের তরফ থেকে গান্ধিজী ও মুজফ্ফর আহমদ প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের অনুরোধে বন্দিরা অনশন ভঙ্গ করেন। আন্দোলনের চাপে ব্রিটিশ শাসক বাধ্য হল আন্দামানের রাজবন্দিদের নিজ নিজ রাজ্যের কারাগারে নিয়ে আসতে। কিন্তু বন্দিরা থেকেই গেল। সুবোধ চৌধুরীকে প্রথমে পাঠানো হয় আলিপুর জেলে—পরে ঢাকা জেলে। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের সামনের সারিতে ছিল বাংলা। এবার ঝড় উঠলো বন্দিমুক্তি আন্দোলনের—১৯৪৬ সালে। ১৯৪৬

সালের ২৪ জুলাই বিধানসভার মস্তিষ্কগুলির কাছে রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তির দাবিতে হল বড় মিছিল। আন্দোলনের চাপে মুক্ত হলেন আন্দামানের বীর বন্দিরা।

দিনটা ছিল ৩১ আগস্ট, ১৯৪৬। ঢাকা জেল থেকে অন্যান্য দেশপ্রেমিক বিপ্লবীদের সঙ্গে মুক্ত হলেন বীর বিপ্লবী সুবোধ চৌধুরী।

দু-একজন ব্যতিরেকে জেলবন্দিদের মধ্যে সকলেই ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থক। জেলগেটে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক পি সি যোশী অভ্যর্থনা জানালেন বাংলার বীর সন্তানদের, যাঁরা রক্তের অক্ষরে রচনা করেছেন ভারতের মুক্তি আন্দোলনের একটি গৌরবময় অধ্যায়। শ্রী যোশী অন্যান্য মুক্ত দেশপ্রেমিকদের সঙ্গে সুবোধ চৌধুরীর হাতে দিলেন কমিউনিস্ট পার্টির সভ্যকার্ড। বিপ্লবী অভিনন্দন আর আলিঙ্গন দিয়ে তাঁরা পরস্পরকে অভ্যর্থনা জানালেন।

শুরু হল সুবোধ চৌধুরীর জীবনের আর এক সংগ্রামী অধ্যায়। বিভিন্ন জেলা থেকে দেশপ্রেমিকদের সংবর্ধনা দেওয়ার দাবি উঠলো রাজ্যদপ্তরে। ১৯৩৫ সালে ৫ অক্টোবর সৈয়দ শাহেদুল্লাহ ও কয়েকজনের নেতৃত্বে কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়েছে। বর্ধমান জেলা কমিটি সিদ্ধান্ত নিল বীর বিপ্লবীদের সংবর্ধনা দেওয়ার। বিনয় চৌধুরী ও সৈয়দ শাহেদুল্লাহ (মটরদা)-র নেতৃত্বে আয়োজন। সঙ্গে আছেন শহিদ শিবশঙ্কর চৌধুরী (কালোদা) সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। সমস্ত মুক্ত বন্দিদের সর্বত্র পাঠানো সম্ভব নয় দেখে, এঁদের কয়েকটি গ্রুপে ভাগ করা হয়। বর্ধমানে যে গ্রুপটি আসে, তার নেতৃত্বে ছিলেন অম্বিকা চক্রবর্তী। বলা বাহুল্য, এই গ্রুপেই ছিলেন সুবোধ চৌধুরী। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে জড়ো হয়েছেন কর্মীরা। আন্দামানের পুরানো সাথী হরেকৃষ্ণ কোঙারের সঙ্গে মিলিত হলেন সুবোধ চৌধুরী। এই সভাতেই কাটোয়া মহকুমা থেকে এসেছিলেন শশাঙ্ক চট্টোপাধ্যায় ও শান্তব্রত চট্টোপাধ্যায়। সুবোধ চৌধুরীর সঙ্গে এঁদের আলাপ করিয়ে দিলেন বিপ্লবী সুকুমার সেনগুপ্ত, যিনি মেদিনীপুরে ম্যাজিস্ট্রেট হত্যা মামলায় বন্দি হলেও বাড়ি ছিল বর্ধমান জেলার কেতুগ্রামে। দুজনের মধ্যে ছিল গভীর বন্ধুত্ব। কাটোয়ার কর্মীদের কাছে সুবোধ চৌধুরী খবর নিলেন কাটোয়ার আন্দোলনের। বিশেষ করে অগ্রদ্বীপের কর্মী শান্তদ্বীপের কাছে অগ্রদ্বীপের খোঁজ নিলেন। কাটোয়ার সংগঠন, অগ্রদ্বীপের জমিদার মল্লিকদের অত্যাচার, গরিব জনগণের দুর্দশা, গ্রামের ভয়াবহ অবস্থা সম্পর্কে কিছু কিছু জানলেন—সবটা জানা হল না। গ্রামের প্রতি টান বাড়লো।

১৯৪৭ সালের গোড়ার দিকে সুবোধ চৌধুরী দেখা করলেন মুজফ্ফর আহমদের সঙ্গে। শ্রমিক সংগঠনে কাজ করার ইচ্ছার কথা প্রকাশ করলেন। মুজফ্ফর আহমদ তাঁকে আসানসোলে যেতে বললেন। কিন্তু দু-দশক গ্রামের বাইরে। আগেই শুনেছেন গ্রামের দুরবস্থার কথা। মন টানলো গ্রাম, গ্রামের মানুষ, আত্মীয়স্বজন। ঠিক করলেন কিছু দিন গ্রামে ঘুরে আসানসোল যাবেন। চলে গেলেন অগ্রদ্বীপ। বহু গ্রামের মানুষ দেখা করতে এল তাঁর সঙ্গে। শুনলেন গ্রামের মানুষের অনাহার অর্ধাহারের জীবন, জমিদার ও পুলিশের অত্যাচার বঞ্চনা, অশিক্ষা, কৃষকের উপর মহাজনদের দাপট-এর কথা। মা-বোনের ইজ্জত জমিদারদের পায়ের তলায়। অন্ধকারময় এক জীবন। এই জীবনযাত্রণা ও মানুষের বাঁচার আকুতি তাঁকে একটার পর একটা সংগ্রামে যুক্ত করে ফেললো। মানুষও ভরসা পেল, জীবন বাজি রেখে যে অকুতোভয় মানুষটা বন্দুক হাতে সাহেবদের সঙ্গে লড়াই করেছে, সে-ই অত্যাচারী জমিদারের হাত থেকে পারবে তাদের রক্ষা করতে।

সুবোধ চৌধুরী গ্রামে বসেই বুঝলেন যে এই বঞ্চিত, নিপীড়িত মানুষদের সংগঠিত করতে হলে প্রথম প্রয়োজন এদের মধ্যে শিক্ষার

আলো জ্বালা। শিক্ষার আলোই বাড়ায় চেতনা। তখনই তারা খুঁজে নেয় এই অন্ধকারময় জগৎ থেকে বাইরে আসার পথ। উদ্যোগ নিলেন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের। প্রমাদ গুনলো জমিদার মল্লিকরা। সুবোধ চৌধুরী আঘাত করেছেন সমস্যার ভিত্তে। বাধা এল। প্রচণ্ড বাধা। তখন জেলা বোর্ডের ভাইসচেয়ারম্যান আবুল হায়াত সাহেবের সাহায্যে বিদ্যালয় স্থাপনের অনুমোদন মিললো। ফেপে গেল জমিদার মল্লিকরা। শুরু হল প্রতি-আক্রমণ। গ্রামের চাষি ও দুগ্ধজীবী দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে সংঘাত তৈরির প্রয়াস শুরু হল, চাপানো হতে লাগলো মিথ্যা মামলা। আরও গভীরভাবে মানুষের সংগ্রামে যুক্ত হয়ে গেলেন সুবোধ চৌধুরী। তাঁর আর আসানসোল যাওয়া হল না।

তখন অগ্রদীপে দু'ধরনের পেশা ছিল, চাষ ও গরু পালন। জমিদার প্রজাদের জমি বিলি করতেন 'উঠবন্দি' শর্তে। চাষি যখন ডাঙ্গা, ডহর, অকৃষিযোগ্য জমিকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কৃষিযোগ্য জমিতে রূপান্তর ঘটাতেন—'ডাকলে সাড়া দিত সেই জমি'। তখনই জমিদার মলিকরা গোয়ালাদের দিয়ে গরু নামিয়ে দিতেন জমিতে—খাইয়ে দিতেন ফসল। চাষিদের মাথায় পড়তো হাত। কৃষকেরই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে ধারাবাহিক বিরোধ মারদাঙ্গা লাগিয়ে রাখার এটাই ছিল কৌশল জমিদারদের।

সুবোধ চৌধুরী শুরু করলেন কৃষক ঐক্য রক্ষা করার সংগ্রাম। জমিদারদের উল্ক্ষানিতে অনুগত গোয়ালাদের দিয়ে কৃষকের ফসল নষ্ট করার বিরুদ্ধে জনমত সংগঠিত করতে থাকলেন। পাশে পেলেন শশাঙ্ক চট্টোপাধ্যায় ও শান্তরত চট্টোপাধ্যায়কে। গৌরী ঘটককেও পেলেন সাথী হিসাবে। যদিও গৌরী ঘটক তাঁর আগেই কমিউনিস্ট পার্টিতে যুক্ত হয়েছে। ১৬ জনকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করলেন সুবোধ চৌধুরী। তাঁরা অগ্রদীপ ও নদীয়ার পাশ্ববর্তী গ্রামগুলিতে জমিদার ও ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে জনমত সংগঠিত করতে লাগলেন। কিছুদিনের মধ্যেই ফসল নষ্টকারী কিছু গরুকে নিয়ে কৃষকরা চললেন জমিদারের কাছে ফসল রক্ষার আবেদন জানাতে। নেতৃত্বে সুবোধ চৌধুরী। কৃষকের অভিযোগ মানলেন না জমিদারগণ। তাড়িয়ে দিলেন কৃষকদের। আরও জোরদার করে তুললেন কৃষকদের উপর আক্রমণ। জমিদারের লেঠেলরা কৃষকদের আক্রমণ করলো। মাথা ফাটল কমিটির ১৬ জনের একজন মহাদেব বিশ্বাসের। কাটোয়া হাসপাতালে ভর্তি করাতে হলো মহাদেবকে। সেই সময় প্রগতিবাদী লেখক সম্মেলনে কাটোয়ায় এসেছিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি হাসপাতালে দেখতে গেলেন মহাদেবকে। জমিদারদের নিপীড়নের কথা শুনে তিনি মন্তব্য করেন, "এতদিন ওরা মেরেছে, এবার আমাদের মার দেওয়ার পালা এসেছে।"

প্রথম থেকেই জমিদাররা চালাচ্ছিল কৃষকদের উপর মার ও মিথ্যা মামলা। মামলা-মোকদ্দমার জন্য তখন উকিল মেলা কঠিন। খরচও খুব। কৃষকদের হয়রানি বাড়ছিল। জমিদার জ্ঞান মল্লিক ছিলেন অনারারি (সাম্মানিক) হাকিম। তিনিও প্রভাব খাটাতেন। এই সময় সুবোধ চৌধুরীর স্কুলজীবনের বন্ধু অ্যাডভোকেট নিকুঞ্জ ঘোষ এগিয়ে এলেন। চাষিরা খানিকটা স্বস্তি পেল। না হলে এই হয়রানি বন্ধ হওয়া কঠিন ছিল।

অগ্রদীপের পরিস্থিতি তখন ভয়ানক। জমিদাররা দুগ্ধজীবীদের উপরও আক্রমণ শুরু করলো—বন্ধ করে দিল গোচারণভূমি। এতদিন কৃষক ছিল ভুখা—একন গাভীও হল ভুখা। অবস্থার সুযোগ নিয়ে দুগ্ধজীবীদের সংগঠিত করার উদ্যোগ নিলেন সুবোধ চৌধুরী ও কমিটি। দায়িত্ব দিলেন ঘোষপাড়ার সুশীল চক্রবর্তীকে। ১৯৪৭ সালে একসঙ্গে মিছিল করে ফসল রক্ষা ও গোচারণ ভূমির দাবিতে

মহকুমা শাসকের নিকট ডেপুটেশন দিলেন কৃষক ও দুগ্ধজীবীরা। নেতৃত্বে সুবোধ চৌধুরী ও অন্যান্য কর্মীরা। কৃষক ও দুগ্ধজীবীদের জমায়েতেও বক্তব্য রাখলেন তাঁরা।

১৯৪৭-এর ১৫ আগস্ট স্বাধীন হল দেশ। আর ১৯৪৮ সালে কমিউনিস্ট পার্টি হল বে-আইনি। এতদিন জমিদারদের রক্ষা করছিল ব্রিটিশ পুলিশ, এখন জমিদারদের রক্ষা করতে লাগলো স্বাধীন দেশের পুলিশ। জমিদার মল্লিক বাড়িতে বসলো পুলিশ ক্যাম্প, আর দেশের জন্য যারা বন্দুক হাতে তুলে নিয়েছিল, তাদের যেতে হল আত্মগোপনে। সমাবেশের দুই সংগঠক গৌরী ঘটক ও সুশীল চক্রবর্তীকে রাস্তা থেকে পুলিশ থেপ্তার করলো। বন্দি থাকাকালীন সুশীল চক্রবর্তী দমদম জেলেই প্রয়াত হন। পার্টি যখন বে-আইনি, সুবোধ চৌধুরী ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ তখন আত্মগোপনে। জেলা থেকে পাঠানো হল মেমারির নেতা সুশীল রায়কে। তিনি 'রবি রায়' নাম নিয়ে অগ্রদীপ এলাকায় কাজ করেন।

সুবোধ চৌধুরী আত্মগোপনে ছিলেন 'অনিলবাবু' নাম নিয়ে। সংগঠনকে মজবুত করার উদ্দেশ্যে, বিপ্লবী পার্টি গড়ার লক্ষ্যে গ্রাম থেকে গ্রাম চষে বেড়াতেন তিনি। কিন্তু যোগাযোগ রাখতেন কর্মীদের সঙ্গে, তাঁদের ভরসা দিতেন, আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতেন। জেলে থাকা মাছের মতো তিনি মানুষের সুখ-দুঃখ-সংগ্রামে একাত্ম হয়ে থাকতেন। মানুষের দৈনন্দিন সমস্যা, এমনকি ব্যক্তিগত সমস্যাকে বৃহত্তর সামাজিক সমস্যার পটভূমিতে বিচার বিশ্লেষণ করে বৃহত্তর সামাজিক সংগ্রামে উদ্ধত করেছেন তাঁদের। সুবোধ চৌধুরীর সাংগঠনিক ক্ষমতা, আত্মদান ও দরদি মন আবাল বৃদ্ধ বনিতার কাছে তাঁকে করে তুলেছিল 'সুবোধদা'।

তখন আন্দোলন তুঙ্গে। জমিদার-পুলিশের যোথ অত্যাচারও তুঙ্গে। সিদ্ধান্ত হল, একটা সভা হবে অগ্রদীপে। ঠিক হল, সুবোধ চৌধুরী ও শান্তশ্রী চট্টোপাধ্যায় সভায় বক্তব্য রাখবেন। দুজনই তখন আত্মগোপনে ও দুজনের নামেই বুলছে থেপ্তারি পরোয়ানা। অকুতোভয় সুবোধ চৌধুরী বক্তৃতা দিতে যাচ্ছেন—সঙ্গে কৃষকগণ। গ্রামের ক্যাম্পে থাকা পুলিশের সঙ্গে কৃষকদের বাধলো লড়াই। কৃষকেরা কেড়ে নিলেন দুটো রাইফেল। লড়াইয়ের সময় যুবকমী সুশীল পালের গলা ক্ষতবিক্ষত হল বেয়নেটের আঘাতে। তিনি মারা গেলেন। অগ্রদীপ ও কাটোয়া মহকুমার কৃষক আন্দোলনের প্রথম শহিদ সুশীল পাল। সুবোধ চৌধুরীর সাথী নদীয়া জেলার ঘোলায় মণি কর্মকার আত্মগোপন অবস্থায় কালিকাপুর থেকে পুলিশের হাতে ধরা পড়লেন। কিন্তু প্রচণ্ড অত্যাচার করেও তাঁর মুখ থেকে একটি কথাও বের করতে পারেনি পুলিশ। প্রচণ্ড অসুস্থ হওয়ায় তাঁকে বর্ধমান জেলে পাঠানো হয়। সেখানেই তিনি মারা যান।

এই ঘটনার পর জমিদার-পুলিশ প্রত্যেক কৃষক পরিবারে নামিয়ে আনলো বীভৎস আক্রমণ। প্রায় সব পুরুষই গ্রামছাড়া। অনেকে থেপ্তার হয়ে জেলে। বন্দিদের আট-দশ মাস জেলে ও হাজতে কাটাতে হল। কিছু বৃদ্ধ, শিশু ও মহিলা গ্রামে ছিল। বাড়িতে প্রতিদিনই পুলিশি হানা, সঙ্গে রিজার্ভ ফোর্স। ঘরের জিনিসপত্র সব তছনছ। খাবার চালটুকুও নেই। পুরুষেরা পাশের নদীয়া জেলার বিভিন্ন গ্রামে লুকিয়ে। মহিলারা পুরুষদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন, খবরাখবর দিতেন। রাত্রে মাঠে কৃষকসভার মিটিংও হতো। আন্দোলনের মধ্যেই কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে উঠছে, গরিব কৃষকের ঘর থেকেও স্বামী-স্ত্রী উভয়েই পার্টির সদস্য হচ্ছেন। অসম্ভব পরিশ্রম করছেন সুবোধ চৌধুরী, শান্তশ্রী চট্টোপাধ্যায় ও অন্যান্য কর্মীরা। ঐ আন্দোলনেরই আর এক নেতা সৌরী ঘটকের লেখা উপন্যাস 'কমরেড' এই সংগ্রামের এক জীবন্ত ছবি।

সময়টা একই। অগ্রদ্বীপে দুগ্ধজীবীরা জমিদারের অত্যাচারে তখন আত্মগোপনে গ্রামের কৃষকদের সঙ্গে। সুবোধ চৌধুরীর নেতৃত্বে সংগ্রাম কৃষক ও দুগ্ধজীবীদের একাত্ম করে দিয়েছে। দুগ্ধজীবীদের গ্রামে না থাকার সুযোগে জমিদাররা তাদের সব গরু পুলিশ ও লাঠিয়াল দিয়ে নিয়ে গেল কাটোয়ায় নিলামে তোলার জন্য। এক একটি গরুর দাম নামিয়ে আনল ৫/৬ টাকা। কিন্তু খরিদার কই? কেউই আর এগিয়ে এলেন না গরু কিনতে— অগ্রদ্বীপের কৃষকের আন্দোলনের প্রভাব এতই ছিল গভীর।

পার্টি বেআইনি হওয়ার পর নদীয়ার অনেক কর্মী বর্ধমানে আশ্রয় নিতেন। সেই রকমই নদীয়ার এক কর্মী নবদ্বীপের দেবী বসু গ্রামে গেছেন আশ্রয়ের জন্য। তাঁর ভাষায়, “একরাতে মাটিয়ারির কাছে বুনোদের গ্রামে গেছি। ওরা অনেক ঘুরিয়ে একটা কুঁড়েঘরের মধ্যে নিয়ে এল। এক কোণে কে একজন বসে আছেন। অতি সামান্য আলোয় চেনা যায় না। চুপি চুপি বললেন, পাশে আসুন। রাত্রি পৌনে তিনটায় রওয়ানা হব। কাছে গিয়ে দেখি সুবোধদা। সেই সাধারণ পরিচয় থেকে ঘনিষ্ঠ পরিচয়। একদিন গভীর রাতে মেড়তলা থেকে ফিরছি, দুধারে ঘন জঙ্গল। সুবোধদা হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন, বাঘ। বাতাসে বাঘের গন্ধ পেলাম, দূর থেকে দেখি আগুনের ভাটার মতো জ্বলজ্বলে দুটো চোখ। কি করা যায়? ঠিক হল সুবোধদা হাতের টর্চটা জ্বালাবেন এবং আমি আমার হাতের ছাতাটা একবার খুলবো। আবার বন্ধ করেই খুলবো। এইভাবে ভীষণ চিৎকার করে বাঘটার দিকে ছুটে এগিয়ে যাবো। তাই হলো। বাঘটা জোর একটা ডাক দিয়ে পাশের জঙ্গলে লাফিয়ে পড়ে চলে গেল। পিছনে পুলিশ, সামনে বাঘ।” এই হচ্ছে সুবোধ চৌধুরীর জীবনের প্রকৃত ছবি— “পিছনে স্বাধীন দেশের কংগ্রেস, সামনে জমিদার”।

ঐ সময় অগ্রদ্বীপের কৃষক আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন গোপীনাথ বিশ্বাস, পরুল বিশ্বাস, গৌর বিশ্বাস, কালী পাল, কালী কাপুর, বৃন্দাবন ব্যানার্জী, গয়ারাম রায় প্রমুখ। একই সময়ে আত্মগোপনে থাকাকালীন অগ্রদ্বীপের কৃষক আন্দোলনের এক সভায় বক্তব্য রাখেন হরেকৃষ্ণ কোঙার।

স্বাধীন দেশ। বে-আইনি পার্টি। সেই সময় জেলা সম্পাদক বিনয় চৌধুরী। পার্টিতে অতি বামপন্থী বৌক। রাজ্য পার্টির নির্দেশ এল বর্তমান অবস্থায় রাজ্য পার্টির সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে পারে এমন জেলা কমিটির দরকার। জেলা কমিটির সভা হল বর্ধমান সদর থানার সড্ডা গ্রামে। প্রাদেশিক সদস্য গোপেন চক্রবর্তী এসে সভায় উপস্থিত থাকলেন। প্রাদেশিক কমিটির সদস্যের নির্দেশ অনুসারে নেতৃত্বের দায়িত্ব থেকে অপসারিত হলেন হরেকৃষ্ণ কোঙার ও সৈয়দ শাহেদুল্লাহ। জেলা পার্টি দু-ভাগ হল কাজের এলাকার ভিত্তিতে। শিল্পাঞ্চল নিয়ে নবগঠিত আসানসোল জেলা কমিটির সম্পাদক হলেন বিনয় চৌধুরী। সমগ্র কৃষক অঞ্চল নিয়ে গঠিত বর্ধমান জেলার সম্পাদক হলেন সুবোধ চৌধুরী—অগ্রদ্বীপের বীরত্বপূর্ণ কৃষক সংগ্রাম পরিচালনার জন্য। যদিও কাজের ধারা অনুযায়ী হরেকৃষ্ণ কোঙার ও সৈয়দ শাহেদুল্লাহ জেলা কমিটির সভায় যোগ দিতেন আমন্ত্রিত সদস্য হিসাবে। সুবোধ চৌধুরী ছিলেন আজীবন জেলা সম্পাদক। পরবর্তীকালে প্রতি নির্বাচনেই তিনি জেলা সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের বিপ্লববাদী ধারার নেতাদের মতো সুবোধ চৌধুরীও বয়স, জীবিকা নির্বিশেষে মানুষকে আপন করে নিতে পারতেন। তাঁর সংস্পর্শে যারা পার্টিতে এসেছেন তাঁর আর তাঁকে ছেড়ে যাননি।

সুবোধ চৌধুরী তখন আত্মগোপনে। কমিউনিস্ট পার্টি সিদ্ধান্ত করলো কাটোয়া কেন্দ্রের প্রার্থী হবেন সুবোধ চৌধুরী। সেটা ছিল ১৯৫২ সাল। প্রথম সাধারণ নির্বাচন। আত্মগোপনে থেকেও সুবোধ

চৌধুরী জিতলেন ২০০০-এরও বেশি ভোটে। পরে ১৯৫৭-এর নির্বাচনে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সুবোধ চৌধুরী পরাজিত হলেও ১৯৬২ ও ৬৭ -র নির্বাচনে তিনি কাটোয়া কেন্দ্র থেকেই বিধানসভায় নির্বাচিত হন।

পার্টি কর্মসূচি ছাড়াই চলছিল পার্টি ১৯৫১ সাল থেকে। শাসক শ্রেণির চরিত্র, বিপ্লবের চরিত্র, বিপ্লবের স্তর প্রভৃতি নিয়ে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে পার্টির অভ্যন্তরে চলছিল বিরোধ। কর্মসূচিহীন, রাজনৈতিক প্রস্তুত-নির্ভর পার্টি কাজ চালাচ্ছিল। তখন জ্যোতি বসু রাজ্য সম্পাদক। স্থির হল রাজ্য সম্মেলন হবে বর্ধমানে। সুবোধ চৌধুরী তখন জেলা সম্পাদক। টাউন হলে অনুষ্ঠিত হল কর্মী ও পার্টিবন্ধুদের সভা। সভায় উপস্থিত জ্যোতি বসু ও প্রমোদ দাশগুপ্ত। ঐ সভায় গঠিত হল অভ্যর্থনা কমিটি। ১৯৬১ সালে হল রাজ্য সম্মেলন। সম্মেলন থেকে প্রমোদ দাশগুপ্তই হলেন রাজ্য সম্পাদক। সুবোধ চৌধুরীর দক্ষ নেতৃত্বে সম্মেলন সাফল্যমণ্ডিত হল।

১৯৬২ সালে ভারত-চীন সীমান্ত সংঘর্ষের সময় আক্রান্ত হয় বর্ধমান শহরে মুবারক বিল্ডিং-এ অবস্থিত জেলা কমিটির অফিস। অফিস রক্ষা করতে গিয়ে আহত ও গ্রেপ্তার হলেন অনেক জেলা নেতা ও কর্মী। ঐ সময় ডাক্তার জাতীয় পরিষদের বেশিরভাগ নেতৃত্বই আত্মসমর্পণকারী অবস্থান গ্রহণ করেন। চিনকে চিহ্নিত করেন আক্রমণকারী হিসাবে। এমনকি তাদের রাজনৈতিক লাইনের বিরোধীদের পুলিশে ধরিয়ে দেন।

আগে থেকেই কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরে চলছিল তীব্র মতাদর্শগত সংগ্রাম। সংশোধনবাদ-বিরোধী সংগ্রামে সুবোধ চৌধুরী ছিলেন সামনের সারিতে। ক্ষুরধার যুক্তি, অবিচল নিষ্ঠায় তুলে ধরেন মার্কসবাদের আদর্শ। মাঠের সংগ্রামে সুবোধ চৌধুরী ছিলেন যেমন সাবলীল ও দক্ষ, মতাদর্শগত সংগ্রামেও সুবোধ চৌধুরী ছিলেন সমান সাবলীল ও দক্ষ।

সপ্তম কংগ্রেস-পূর্ব জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল বান্দপুর্বে ১৯৬৪ সালে। ঐ সম্মেলনে সুবোধ চৌধুরী পুনরায় জেলা সম্পাদক নির্বাচিত হলেন। ১৯৬৪ সালে সপ্তম কংগ্রেসেই গৃহীত হয় পার্টি কর্মসূচি। সংশোধনবাদের সঙ্গে পার্টির বিভাজন ঘটলো। যাত্রা শুরু হল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র। কিন্তু সপ্তম কংগ্রেসে মতাদর্শগত অবস্থান চূড়ান্ত করা সম্ভব হয়নি। নকশাল বাড়ির আন্দোলন প্রেরণা পায় চিনা নেতৃত্বের অবস্থান থেকে। প্রয়োজন হয়ে পড়ে পার্টি প্লেনাম করার। দায়িত্ব পড়ে বর্ধমান জেলার উপরে। ১৯৬৮ সালে বর্ধমান শহরের টাউন হলে অনুষ্ঠিত হল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র প্রথম প্লেনাম। চূড়ান্ত হয় পার্টির মতাদর্শগত অবস্থান। দক্ষিণপন্থী বিচ্ছৃতি ও বামপন্থী সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে সুবোধ চৌধুরী ছিলেন সমান অবিচল। সুবোধ চৌধুরীর নেতৃত্বে দক্ষতার সঙ্গে জেলা পার্টির উদ্যোগে প্লেনাম সফল হয়।

পার্টির শক্তির ও দক্ষতার আর একটি পরীক্ষা হয় পরের বছরই। সর্বভারতীয় কৃষক সম্মেলনের দায়িত্ব পড়ে বর্ধমান জেলার উপর। সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৬৯ সালে বড়শুলে। ছোট এলাকা বড়শুল। তেমন পরিকাঠামো ছিল না। বিশাল সংখ্যক প্রতিনিধি, সমস্ত জেলাটাই নেমে এসেছিল বড়শুল সম্মেলনে নানা রকম সাহায্য নিয়ে। সফল্যমণ্ডিত হল সম্মেলন। তারপরেই ঐতিহাসিক সমাবেশ। নড়ে উঠেছিল সারা পশ্চিমবঙ্গ। সেই কঠিন সংগ্রামে সমস্ত জেলাটাকে সঙ্গে নিয়ে দক্ষতার সঙ্গে নেতৃত্ব দিলেন সেনাপতি সুবোধ চৌধুরী। পর পর দুটি সর্বভারতীয় কর্মসূচি নেওয়া এবং সাফল্যের সঙ্গে সংগঠিত করার মতো সাহস ও বলিষ্ঠতার অধিকারী ছিলেন সুবোধ চৌধুরী।

১৯৭০ সালের ১৭ মার্চ পতন ঘটলো দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের। সারা রাজ্য জুড়ে ধর্মঘটের ডাক। অভূতপূর্ব সাড়া ধর্মঘটে। মানুষ পথে। বর্ধমান শহর জুড়ে মিছিল। মিছিলে প্ররোচনাকে কেন্দ্র করে সাঁইবাড়ি ঘটনা। সুবোধ চৌধুরী সহ অনেক নেতা-কর্মীর নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা। অনেকে গ্রেপ্তার হলেন। অনেকের নাম ঢুকিয়ে দেওয়া হলো তালিকায়। সুবোধ চৌধুরী আত্মগোপনে গেলেন। জেলা জুড়ে আক্রমণ বাড়ছে। রাস্তাঘাটে হচ্ছে খুন। বর্ধমান শহরেই খুন হলেন ১৭ জন। পুলিশের সাথে রাস্তায় খুনে কংগ্রেসি বাহিনী। আধা-সামরিক বাহিনীকেও নামানো হয়েছে সম্ভ্রাস দমনের নামে। শত শত কর্মী জেলে। বাড়ি ঘর লুণ্ঠ হচ্ছে। হাজার হাজার কর্মী এলাকাছাড়া। প্রতিরোধ রোধ করার জন্য চলছে চিরগনি তল্লাশি। আত্মগোপন অবস্থাতেই নেতৃত্ব দিচ্ছেন সুবোধ চৌধুরী। কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন। জেলা ছেড়ে যেতে চাইলেন না। এরকম অবস্থায় তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। উচ্চ রক্তচাপের চিকিৎসা চলছিল নিয়মিত। মানুষের উপর বীভৎস অত্যাচার, সহকর্মী হারানোর বেদনা নিয়ে চলতে গিয়ে মস্তিস্কে রক্তক্ষরণ হল। রাজ্যে রাখা নিরাপদ মনে না করায় রাজ্য কমিটি সুবোধ চৌধুরীকে পাঠিয়ে দিলেন বিহারের দ্বারভাঙ্গায়। সেখানেও অসুস্থ শরীর নিয়ে বার বার ডেকে পাঠাতেন দায়িত্বপ্রাপ্ত ছাত্র-কর্মীদের। বিহারের পার্টি নেতৃত্ব তাঁর নিরাপত্তা সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হওয়ায় সুবোধ চৌধুরীকে স্থানান্তরিত করা হল পাটনায়। দায়িত্বে এক অবসরপ্রাপ্ত সেনা অফিসার। তিনিও আর বেঁচে নেই। বিনয় চৌধুরী ও হরমোহন সিংহ তাঁর পুনরায় অসুস্থ হওয়ার খবর পেয়ে পাটনায় দেখতে গেলেন ২৬ জুলাই ১৯৭১। সুবোধ চৌধুরী রাজ্যে ফিরে যাওয়ার জন্য আকুতি জানান। সুবোধ চৌধুরী তখন থাকতেন পাটনার নিকটবর্তী পটিবলপুর (রাজগীর) গ্রামে। পার্টির সঙ্গে পরামর্শক্রমে স্থির হয় সুবোধ চৌধুরীকে আনতে পাটনায় যাবেন

বিনয় চৌধুরী ও হরমোহন সিংহ। ১৯৭২ সালের ২৭ আগস্ট। পাটনা যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে তাঁরা কলকাতা পার্টি অফিসে প্রমোদ দাশগুপ্তের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। জানালেন আজ তাঁরা পাটনা যাচ্ছেন। —“আর যাবার প্রয়োজন নেই। রেডিওগ্রাম এসেছে কাল রাতে। সুবোধবাবু মারা গেছেন”, বললেন প্রমোদ দাশগুপ্ত। তখন বিয়োগব্যথায় বিধুর তাঁর সহকর্মীরা। আর স্বাধীন দেশের পুলিশ খুঁজে বেড়াচ্ছে ভাতার থানার পালনা গ্রামের শ্মশানে সদ্য কোনো মৃতদেহ দাহ হয়েছে কিনা।

সুবোধ চৌধুরীর আর জেলায় ফেরা হলো না। স্বাধীন দেশের দেশপ্রেমিক, স্বাধীনতা সংগ্রামী ও কমিউনিস্ট নেতা জনগণের প্রতি উৎসর্গীকৃত প্রাণ নিজের ঘরে ফিরতে পারলেন না। সমাপ্তি ঘটলো সংগ্রামের এক জীবন্ত ইতিহাসের। কিন্তু সংগ্রামের সমাপ্তি ঘটেনি। সংগ্রাম চলমান। শোষণ-ভিত্তিক সমাজের পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত মানুষের সংগ্রাম চলবে—এই ছিল আজীবন বিপ্লবী সুবোধ চৌধুরীর আহ্বান।

তথ্যসূত্র

১. কমরেড সুবোধ চৌধুরী—মদন ঘোষ ‘আমাদের পূর্ব সূরীরা’
২. বর্ধমান জেলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের অতীত প্রসঙ্গ—সৈয়দ শাহেদুল্লাহ।
৩. সুবোধ চৌধুরী— শশাঙ্ক শেখর চট্টোপাধ্যায় : কমরেড সুবোধ চৌধুরী, স্মৃতিরক্ষা কমিটি, ১৯৮০, কাটোয়া, বর্ধমান
৪. কমরেড সুবোধ চৌধুরী : ডাঃ হরমোহন সিংহ, ঐ।
৫. সংগঠক কমরেড সুবোধ চৌধুরী : ডাঃ হরমোহন সিংহ, সুবোধ চৌধুরী স্মরণিকা, ২৬ আগস্ট, ১৯৮৮, সুবোধ স্মৃতিভবন, কাটোয়া, বর্ধমান।
৬. অবিস্মরণীয় সুবোধদা : দেবী বসু (নবদ্বীপ) — ঐ

শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

সমুদ্রগড় সার্ভিস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লি.

(শাখা : সিংহজুলী)

পোঃ : সমুদ্রগড়, জেলা : বর্ধমান, ফোন : ০৩৪৫৪-২৬৬২৫৬, ২৬৬৫২২

আমাদের পরিষেবা

- ন্যায্য দরে ভেজালহীন সারের ব্যবস্থা।
- ব্যাঙ্কে সকল প্রকার ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা।
- কম সুদে চাষিদের ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা।
- অভাবী চাষিদের পাট ক্রয়।
- মিনি ডিপের সাহায্যে সেচের ব্যবস্থা।
- হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ও অ্যান্ডুলেস পরিষেবা।

কৃষি ও কৃষকদের স্বার্থবাহী প্রকল্প রূপায়ণে এই সমবায় সর্বদা সজাগ

আব্দুল হামিদ সেখ

ম্যানেজার

SI. No. 34

ত্রিলোকচন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েত

পোঃ পানাগড় বাজার, জেলা বর্ধমান, ডাকসূচক : ৭১৩১৪৮, দূরভাষ : (০৩৪৩)২৫২৪৩০৭

গ্রামের রাস্তাঘাট নির্মাণ, একশো দিনের কাজ, শৌচাগার, ইন্দিরা আবাস নির্মাণ, জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধীকরণ প্রভৃতি কর্মসূচি রূপায়ণে ত্রিলোকচন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েত ধারাবাহিক সাফল্য অর্জন করে চলেছে। এই সাফল্যের মূল মন্ত্র গ্রামবাসীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা। আগামী দিনেও এই সহযোগিতাকে পাথেয় করে আমরা গ্রামোন্নয়নের পথে এগিয়ে যাব।

মহঃ মুরশিদ আলি
উপপ্রধান

কাজল বাউরী
প্রধান

শতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি

দেবেন্দ্র কুমার লাহিড়ী



রবি কবি এক কবিতায়
লিখেছেন—

আজি হতে শত বর্ষ পরে
কে তুমি পড়িছ বসি আমার
কবিতাখানি
কৌতূহল ভরে।

আজ আমি বর্ধমান জেলার
দুই সুসন্তানের প্রতি শতবর্ষ
পূর্তির শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাতে কলম
ধরেছি। একজন হরেকৃষ্ণ
কোঙার, পৈতৃক নিবাস দামোদর
নদ পেরিয়ে কামারগোড়ে। আর

একজন সুবোধ চৌধুরী, ভাগীরথী তীরে অগ্রদ্বীপের সন্তান।

বর্ধমান কংগ্রেস অফিস। খড়ের চাল, বাঁশের খুঁটি। বাড়ি
থেকে পালিয়ে এক তরুণ দেশের স্বাধীনতার লড়াই করবে বলে
কংগ্রেস অফিসে উঠেছে। বাবার বড় ছেলে। বাবা সম্পদশালী
ব্যবসায়ী। মা-মরা বড় ছেলেকে ঘিরে তাঁর অনেক স্বপ্ন। ছেলেকে
বিলেত পাঠিয়ে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষের মতো মানুষ করবেন।
সেই ছেলে কিনা সব ছেড়ে দেশোদ্ধারে মেতেছে? ছেলের এই
হঠকারিতা স্বপ্নালু কোন বাপের সহ্য হয়? বাপ নিজেই একদিন
তখনকার কংগ্রেস অফিসে এসে ছেলেকে পাকড়াও করলেন—
“বাড়ি তোকে যেতেই হবে। তোকে বিলেত পাঠাবার ব্যবস্থা
করেছি। বাড়িঘর ছেড়ে এখানে এত কষ্ট করে আছিস কেন? আমার
সঙ্গে ঘর চল।” ছেলে খুঁটি শক্ত করে ধরে বলে চলল, “বাবা, আমি
যাব না, আপনি একা ফিরে যান। বিন্দু তো রইল আপনার কাছে।”
ইতোমধ্যে ঘরের ভিতর থেকে বিজয় ভট্টচার্য বেরিয়ে এসে
ছেলেটির হাত চেপে ধরেছেন। Tug of war-এ বাবা হেরে
গেলেন। ক্ষোভে দুঃখে তিনি উম্মা প্রকাশ করে বললেন, “আপনারা
খদ্দরখারীরা কচি কচি ছেলেদের মাথাগুলো খাচ্ছেন। ওরা
রাজনীতির কী বোঝে? যত সব ছেলেধরার দল।” সোজা বর্ধমান
স্টেশন মুখে হাঁটা দিলেন। হতাশার গ্লানি নিয়ে বামুনডাঙ্গার
বাড়িতে ফিরলেন। এতদিন মনে যে স্বপ্ন পুষে রেখে এসেছেন তা
ভেঙে যেতে তাঁর মন বেদনায় ব্যথিত হয়ে উঠলো। এই পিতা শরৎ
কোঙার, আর ছেলে কৃষক আন্দোলনের প্রবাদ প্রতিম অবিসংবাদী
নেতা হরেকৃষ্ণ কোঙার।

ছেলে বাপের ইচ্ছা অনুযায়ী লন্ডনে যায় নি বটে, তবে
বিদেশে গিয়ে আন্তর্জাতিক নেতার খ্যাতি অর্জন করেছে। সে
গিয়েছে চীনে, সে গিয়েছে ভিয়েতনামে। দুই দেশের রাষ্ট্রনায়করা
ভারতীয় কমিউনিস্ট নেতাকে নিজ নিজ দেশে আন্তরিক

আতিথেয়তায় সংবর্ধিত করেছেন।

শরৎ কোঙার বড়ছেলেকে ত্যাজ্যপুত্র করেননি, কিন্তু প্রবল
অভিমানবশত ছেলের বিলাতে পড়ানোর যে টাকা জমিয়ে
রেখেছিলেন সে সমস্ত টাকা দিয়ে মেমারিতে হাসপাতাল তৈরি করে
দিলেন। বাপ-ব্যাটায় বিচ্ছেদ ঘটলেও হরেকৃষ্ণের প্রতি স্নেহবৎসল
বাবার অন্তরে ফল্গুধারার মতো অদৃশ্য স্নেহধারা বইত। আমি তার
প্রমাণ পেয়ে বিস্মিত হয়েছিলাম। ১৯৫৭ সালের বিধানসভা
নির্বাচন। আমার স্ত্রী রেবা মাসাধিককাল ঘর ছেড়ে মেমারিতে
নির্বাচনী প্রচারে কালনা কেন্দ্রের গ্রামগুলিতে বিভা কোঙারের
(হরেকৃষ্ণ কোঙারের স্ত্রী) সহচরী হয়ে ঘুরছে। বাড়িতে দুটি মেয়ে
স্কুলছাত্রী আর এক ভাইপো স্কুলছাত্র। আমি ডেলি প্যাসেঞ্জারি করে
কিশোরকণা স্কুলে হেডমাস্টারি করি। সবাই ভোট নিয়ে ব্যস্ত।
কোনো পার্টি অফিস থেকে মেমারির খবর পাচ্ছি না। বিভাদির
তৈতুলতলার বাসা বন্ধ। একদিন সকালে মেমারি স্টেশনে নেমে
বামুনডাঙ্গার শরৎ কোঙারের বাড়িতে হাজির হয়ে এক সবলদেহী
লম্বা প্রৌঢ়ের মুখোমুখি হলো। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, “বিভাদির
সঙ্গে দেখা হবে?” —“বড় বৌমারা দূর গায়ে গেছেন, আজ ফিরতে
রাত হবে বলে গেছে। তুমি কে বাবা?” —“আমি রেবা লাহিড়ীর
খোঁজ নিতে এসেছিলাম।” —“তুমি নিশ্চিত থাকতে পার। ওরা
আমার বাড়ির অতিথি। কেবল জন্য খুব পরিশ্রম করছে। আমি
দুবেলা ওদের দেখভাল করছি।” —“নিশ্চিত হলাম। আপনি
অনুমতি দিলে রানি কৌয়ারের সঙ্গে দেখা করে দোষ স্বাালন করে
যাই।” দারোয়ানকে ডেকে শরৎবাবু নির্দেশ দিলেন, “এঁকে
অন্দরমহলে ছোট বৌমার কাছে নিয়ে যা।”

আমি বিনয় কোঙারের দেখা পেলাম। বিনয়দা একটি জনসভায়
যোগদানের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। কেবলদার ভোটের পরিস্থিতি কীরকম
ভাবছেন জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন, “দাদা নিশ্চিত জিতবেন।
তবে মেমারি শহরে ভোট কম পাব আমরা। বাবাকে দিয়ে দাদার
পক্ষে বলানো যাচ্ছে না। বাবা মুখ ফুটে একবার দাদার পক্ষে ভোট
দেওয়ার কথা বললে মিরাকেল ঘটে যাবে। আপনি একটু দেখুন না,
আমরা বলে বলে হয়রান হয়ে গেছি।”

বাড়ি ফিরে আসার সময়ে শরৎবাবুকে অনুরোধ করে এলাম—
“আপনার আশীর্বাদ পেলে হরেকৃষ্ণদা নিশ্চয়ই জয়ী হবেন।
আপনার গৌয়ার ছেলে, আপনাকে না জানিয়ে ভোটে লড়ছে।
আপনি মেমারির সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। আপনার ছেলের জয়ের
অর্থ আপনার জনপ্রিয়তার জয়। কেবলদা নিমিত্ত মাত্র। আপনার
সম্মান বজায় রেখে পৌচদের আড্ডায় ‘শুনেছি ছেলোটা আমাকে না
জানিয়ে ভোটে দাঁড়িয়েছে’ এই সংবাদ দিলেই আপনার না-বলা
কথা ওঁরা বুঝে ফেলাবেন। ওঁরাই এক কান থেকে দশ কানে ছড়িয়ে

দেবেন কেষ্টদাকে ভোট দেবার বার্তা।

সপ্তাহ খানেক পরে বিনয় কোঙার খবর দিয়েছিলেন, “আশ্চর্য ব্যাপার, বাবা মুখ খুলতে শুরু করেছেন।” পুত্র-বৎসল পিতার অন্তরে ফল্গুধারার মতো স্নেহধারা বইছিল। মনস্তাত্ত্বিক বাধা অপসারিত হতেই তা প্রকাশিত হল। ভোটের ফল প্রকাশ হলে দেখা গেল মেমারি শহর এলাকায় হরেকেষ্টদা বিপুল ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন।

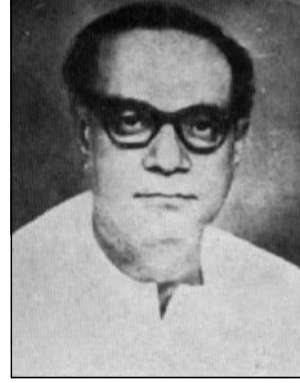
হরেকেষ্টদার স্বদেশী ডাকাতির গল্প শুনেছি বিপদবরণ রায়ের মুখে। দলের তহবিল তখন প্রায় শূন্যে পৌঁছেছে। টাকার বিশেষ প্রয়োজন। বিপদদার পিসেমশাই মোটা টাকা তুলে এনে বাড়িতে রেখেছেন। তখন ঠিক হল পরদিন অমাবস্যার রাতে ঐ টাকা ডাকাতির ভান করে নিয়ে আসতে হবে। বিপদদা, হরেকেষ্টদা ও অন্যান্য কয়েকজন ডাকাতির মেক-আপ নিয়ে নিশুতি রাতে পাচিল টপকে নির্দিষ্ট জায়গা থেকে টাকার থলি নিয়ে একে একে পাঁচিল টপকে ওধারে পৌঁছে গেছেন। বিপদ হল বিপদদাকে নিয়ে। একে মোটা মানুষ, তার উপর বুলস্তু পা পিসি ধরে আছেন শক্তি করে। পাঁচিলের অন্যদিক থেকে জনা ৪/৫ টানছে অন্য পা-টা। বিপদদার তখন সসেমিরা অবস্থা। পিসিরও তখন ছুঁচো-গেলার অবস্থা। তিনি চেষ্টাতে পারছেন না, কারণ ভাইপোকে চিনতে পেরেছেন তিনি। অবশেষে বাইরের ওরা টানাটানিতে জয়ী হলেন। পাঁচিলের বাইরে পড়া মাত্র ছুটে পালিয়েছিলেন সবাই। বিপদদার সর্বস্ব ছিড়ে গিয়েছিল।

দিন পনের পর পিসির বাড়ি গেলে তিনি বললেন, “তুই তো চাইতে পারতিস। রাতে ডাকাতি করতে এলি কেন? দেখা কোথায় লেগেছে।” সন্মুখে মলম লাগিয়ে বলেছিলেন, “ঘুগাফেরে বলবি না কাউকে। আমি থানা পুলিশ জানাতে নিষেধ করেছি।” এইসব অজ্ঞাতনামা অথচ পূজনীয়া মহিলারা অন্তরালে থেকে স্বদেশের জন্য কত ত্যাগ স্বীকার করেছেন তা ভাবলে বিস্ময়মিশ্রিত শ্রদ্ধা জাগে। আপাত গভীর এই মহিলাটি ছিলেন দিলখোলা। তেঁতুলতলার বাসায় গিয়ে বার বার তার পরিচয় পেয়েছি। কখনও আমার নাম ধরে ডাকেননি। ‘এই যে মাস্টার’—এটাই ছিল স্নেহমাখা সম্বোধন।

১৯৫৭-র বিধানসভা নির্বাচন। বর্ধমান দক্ষিণ কেন্দ্রে বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী পার্টি প্রার্থী। ভোটের আগের দিন শেষ রাতে দরজায় ধাক্কা দিয়ে হরেকেষ্টদা ডাকছেন, “মাস্টার ওঠো। আমরা জরুরি কাজে এসেছি।” ঘুম চোখে দরজা খুলে দিতেই দুজনে অনেকটা মাথা নিচু করে ঘরে ঢুকে বললেন, “দেখো, কাকে সঙ্গে এনেছি। ইনি গণেশ ঘোষ। মাস্টার, তোমার কয়জন ভলান্টিয়ার চাই গণেশদাকে বলো।” আমার সামনে দাঁড়িয়ে তখন চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহের বিদ্রোহী বীর। নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। ধাতস্থ হতে কিছু সময় লাগল। এমনকি বসার অনুরোধ করতে ভুলে গিয়েছিলাম। লজ্জিত হয়ে বললুম, “৭০ জন তাগড়াই স্বেচ্ছাসেবক চাই।” গণেশ ঘোষ আশ্বাস দিলেন, “আপনাকে সেনর্যালের ৭০জন ভলান্টিয়ার দেওয়া হবে। অনেক জায়গায় যেতে হবে। এখন বসলে দেরি হবে।” উষার অরুণ আলোয় দু’জন বেরিয়ে গেলেন। আমার মনের পটে সে ছবি অক্ষয় হয়ে রইল।

হরেকেষ্টদা গ্রামের মানুষের মনের কথা পড়তে জানতেন। গ্রামের মানুষের প্রধান জীবিকা কৃষিকাজ। কৃষি সমস্যা ছিল তাঁর নখদর্পণে। মেঠো কথায় সহজ সরল ভাবে চাষের সমস্যা (বেনামি জমি দখলে রেখে চাষ, বর্গা জমি চাষ, লাঙল যার জমি তার শ্লোগান) তিনি হাজার হাজার শ্রোতার কাছে ঘন্টার পর ঘন্টা তুলে

ধরেছেন। কর্জনার সভার কথা এতকাল পরেও চোখের সামনে ভাসছে। ঘন্টা দেড়েক বক্তৃতা দেবার পর জোরে বৃষ্টি নামল। হাজার বিশেক মানুষ ঠায় বসে থেকে ভিজল, কেউ সভাস্থল ছেড়ে নড়েনি। তাঁর বক্তৃতার এমন চৌম্বক আকর্ষণী ও জনমনমোহিনী ক্ষমতা ছিল। বক্তৃতা শেষ করে মঞ্চ থেকে আমাদের দেখতে পেয়ে কাছে আসতে নির্দেশ দিয়ে বললেন, “একদম ভিজ়ে গেছ। আমার গাড়িতে বাড়ি ফিরবে।” এই মানুষটির সঙ্গে শেষ দেখা হল না। ঘর-ছাড়া আমি তখন ‘কাজলাদিদি’র গ্রাম জমশেরপুরে প্রধান শিক্ষক হিসাবে আত্মগোপন করে আছি। আমার সহ-শিক্ষক স্থানীয় সি পি এম নেতা সম্মার সময়ে দুঃসংবাদ দিলেন, “মাস্টারমশাই, আপনাদের বর্ধমান জেলার জননেতা হৃদেষ্ণ কোঙার প্রয়াত হয়েছেন।” চাটীকে (রাঁধুনি) দুটি রুটি করতে বলেছিলাম। তাও মুখে তুলতে পারি নি। রাতে দু-চোখের পাতা এক করতে পারি নি। শুধু মনে হচ্ছিল, বন্ধু হো চি মিন-এর পাঠানো ঔষধও রোগ সারাতে ব্যর্থ হল।



বিল্লবী সুবোধ চৌধুরী ঘরের লোক বনে গিয়েছিলেন। আমার ও রেবার শ্রদ্ধেয় দাদা। অগ্রদ্বীপের সন্তান, ১৯১৪ সালে জন্ম। দেশমুক্তির সংগ্রামের শপথ রক্তাক্ষরে লিখে চট্টগ্রামে মাস্টারদা সূর্য সেনের দলের অসম সাহসী সৈনিকে পরিণত হয়েছিলেন। ইতিহাস প্রসিদ্ধ জালালাবাদ পাহাড়ে ইংরেজ সেনাদের রাইফেলের ও কামানের বিরুদ্ধে শুধুমাত্র পিস্তল নিয়ে অসম লড়াই করেছিলেন। বাংলার তারুণ্য সে সময় মরনজয়ী বীরদের বীরত্বগাথায় মুগ্ধ হয়ে ভেবেছিল দ্বিতীয় হলদিঘাট ও থার্মপোলির যুদ্ধ হয়েছে। টেগরার বুকুর রক্তে পাহাড় লাল হয়েছে। সুবোধ চৌধুরী আহত হয়েছেন। তবুও মাস্টারদা (সূর্য সেন) দৃঢ় বিশ্বাস করেছেন, পরাধীনতার অন্ধকার কেটে যাবে, স্বাধীনতার সূর্যোদয় শীঘ্রই দেখা যাবে উষার রক্তিম আকাশে।

দীর্ঘকাল কারাবাসের পর মুক্তি পেয়ে সুবোধ চৌধুরী কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। আমি যখন বর্ধমানে শিক্ষকতা করি তিনি তখন জেলা সম্পাদক। আমার পার্টি সদস্যপদের ফর্ম তিনি পূরণ করে আমার সহি করিয়ে নিয়েছিলেন। সাঁইবাড়ির ঘটনায় কংগ্রেসিরা তাঁর নাম জড়িয়ে দেয়। তিনি আমার বাড়িতে গোপনে অনেকদিন থেকেছেন। রাস্তার চৌমাথায় আই বি ওয়াচারদের দীর্ঘ সন্দেহজনক উপস্থিতির কথা পার্টিকে জানাতেই সুবোধদার নিরাপত্তার স্বার্থে অন্যত্র গোপনে সরিয়ে দেওয়া হয়। পরে তাঁকে বিহারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। পাটনায় আত্মগোপনে থাকা অবস্থায় ১৯৭১-এর ২৬ আগস্ট তাঁর জীবনাবসান হয়।

সুবোধদা চলে যান, কিন্তু রেখে যান লালবাগুর আদর্শ। আগামী প্রজন্ম প্রেরণা ও শক্তি পায় সুবোধদাদের মতো দেশপ্রাণ, সর্বত্যাগী নেতার কাছ থেকে। কবি ঠিকই বলেছেন, ‘তোমার পতাকা যারে দাও তারে বহিবারে দাও শক্তি।’

সুবোধদা হরেকৃষ্ণদার প্রতি শতবর্ষের বিনম্র আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই।

সৈয়দ শাহেদুল্লাহ স্মরণে

বাসন্তী সরকার

সৈয়দ শাহেদুল্লাহ (মটরদা) এক বিদগ্ধ ব্যক্তি। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর প্রতিভা ছিল অনন্যসাধারণ। বর্ধমান জেলার এক বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। রাজনীতির অঙ্গনেই শুধু তাঁর অবস্থান সীমায়িত ছিল না। সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, সাংবাদিকতা প্রভৃতি বিভিন্ন দিকেই তাঁর অবাধ যাতায়াত ছিল। বিভিন্ন ভাষায় সবিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। বাংলা সাহিত্য, ইংরাজি সাহিত্য, উর্দু, হিন্দী প্রভৃতি বিষয়ে প্রখর জ্ঞানী ছিলেন।

এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে তাঁর জন্ম। মাতৃকুলের দিক থেকে তাঁর দেহে মুর্শিদাবাদের নবাব বংশের রক্ত ছিল, আবার পিতৃকুলের দিক থেকেও ঔজ্জ্বল্য কম নয়। বর্ধমান জেলার মন্তেশ্বরে বিরাট অবস্থা, জমিজমা-জায়গির তদুপরি পূর্ববঙ্গে প্রচুর ভূসম্পত্তি জমিদারি।

ছাত্র হিসাবে অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। কলেজে পাঠরত অবস্থায় রাজনীতির সংস্পর্শে আসেন। জেলা কংগ্রেসের বিপ্লবী গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পৃক্ত হন। প্রয়াত বিনয় কৃষ্ণ চৌধুরী, কালোদা (প্রয়াত শহিদ শিবশঙ্কর চৌধুরী), হরেকৃষ্ণ কোঙার প্রমুখ মহান বিপ্লবীদের সঙ্গে সংযুক্ত হন। স্বামী বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিপ্লবী ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ও জননেতা বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়ের সান্নিধ্যে আসেন এবং সাম্যবাদে দীক্ষিত হন। রাজনৈতিক আন্দোলনে, গণআন্দোলনে সামিল হন।

ক্যানেল কর আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। কৃষক আন্দোলনে, শিক্ষক আন্দোলনে, সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের বিভিন্ন সমস্যা জনিত বিষয়ে তাঁর প্রতিবাদী চরিত্র জনমানসে প্রতিষ্ঠিত হয়। অচিরেই তাদের আপন মানুষ হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেন। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন, সাধারণ মানুষকে সংঘবদ্ধ করেন। পুরস্কার স্বরূপ নির্যাতন ভোগ করতে হয়, জেলে যেতে হয়। এমনকি বছবার দৈহিক নির্যাতনও ভোগ করেন।

তিনিই প্রথম বর্ধমান জেলা কমিউনিস্ট পার্টির (সংযুক্ত পার্টি) সম্পাদক নির্বাচিত হন। তিনি পার্টিনেতা হিসাবে অত্যন্ত দক্ষ সংগঠক, সর্বোপরি কৃষকনেতা রূপে সার্থকতা লাভ করেন। শুধু বর্ধমান জেলাতেই নয়, জেলার বাইরেও বিভিন্ন স্থানে তাঁর কাজকর্মের পরিধি বিস্তৃত হয়। নির্বাচনী সংগ্রামে নিজেকে সার্থকভাবে প্রস্তুত করে বর্ধমানের মহারাজের বিরুদ্ধে কংগ্রেস প্রার্থী বিজয় ভট্টাচার্যের সমর্থনে প্রচার করেন। যদিও বর্ধমান মহারাজ বিজয়ী হন। বর্ধমান মিউনিসিপ্যালিটি পরিচালনার কাজেও তাঁর ভূমিকা ছিল। শহরের মানুষ তাঁকে ভোট দিয়ে মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার নির্বাচিত করেন।

ইতিমধ্যে জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে থেকে কমিউনিস্ট পার্টির কাজের পর্যায়ে ছেদ ঘটে। দেশ স্বাধীন হয়। কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনি ঘোষিত হয়। অবশ্য ব্রিটিশ আমলেও পার্টি নিষিদ্ধ ছিল।



মটরদা অনেকবার পুলিশের কাছে ধরা পড়েন, শারীরিক অত্যাচার ভোগ করেন। কঠিন অসুখে শয্যাশায়ী হন এবং কলশ্রুতিতে স্বাস্থ্য একেবারেই ভেঙে যায়।

১৯৫০ সালে পার্টি বেআইনি অবস্থা থেকে মুক্ত হয়। ইতিমধ্যে জেলা বোর্ড নির্বাচন আসন্ন হয়। মূলত মটরদারই উদ্যোগে জেলা ফরওয়ার্ড ব্লক (নেতৃত্বে সুবিমান ঘোষ), গান্ধিপন্থী প্রজা সমাজতন্ত্রী (P.S.P) দল (নেতৃত্বে দাশরথী তা ও মৃত্যুঞ্জয় প্রামাণিক) ও কমিউনিস্ট পার্টির কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে সংযুক্ত প্রগতিশীল গ্রুপ তৈরি হয়, নাম দেওয়া হয় U.P.B.। জেলা বোর্ড নির্বাচনে কংগ্রেস পরাভূত হয়, U.P.B. বিজয়ী হয়।

১৯৪৮ সালে আমি প্রাথমিক শিক্ষকতায় ব্রতী হই। রায়নার প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতা তথা প্রতিষ্ঠাতা পাঁচুদা আমাকে মটরদার কাছে নিয়ে যান এবং পরিচয় করিয়ে দেন। মটরদা আমাকে প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির কাজে অংশ নেবার জন্য পরামর্শ দেন। সেই মতো শিক্ষক আন্দোলনের কাজে সামিল হই। এই সুবাদে তাঁর

সঙ্গে আমার পরিচয় ক্রমশ দৃঢ় হয়। আমি খুব সৌভাগ্যবান ছিলাম। মটরদা আজীবন আমাকে প্রভূত সাহায্য করেছেন। শিক্ষক সমিতির কাজকর্ম বোঝার জন্য, সাংগঠনিক কৌশল রপ্ত করার জন্য শিক্ষাও দেন। মূলত তাঁর সাহায্যে ও প্রেরণায় জেলা সমিতির ও কেন্দ্রীয় সমিতির কর্মী হিসাবে, এবং সর্বোপরি রাজনীতিতে, যৎসামান্য কিছু শিক্ষা পাই। তবে অনেক ভুল-ত্রুটি ও ত্রুটি-দুর্বলতাও ছিল, যার জন্য আমার অজ্ঞানতা ও অকর্মণ্যতা দায়ী।

জেলাবোর্ড নির্বাচনে (১৯৫০) U.P.B.-র ম্যানিফেস্টো তৈরির জন্য আমরা কয়েকজন শিক্ষক কর্মী প্রাথমিক শিক্ষক সম্মেলনে (রায়না-খণ্ডঘোষ) নেতৃবৃন্দের কাছে জোরালো দাবি জানাই। ঐ সম্মেলন দাশরথিদা, সুবিমানদা, মৃত্যুঞ্জয়বাবু এবং মটরদা উপস্থিত ছিলেন। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত দাশুদা ও সুবিমানদা ম্যানিফেস্টোতে সই করে প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। আলুদা (প্রয়াত শিবপ্রসাদ দত্ত) U.P.B.-র সম্পাদক ছিলেন। তিনি ছাপাখানায় উপস্থিত থেকে অতি দ্রুত ছাপাবার কাজ সম্পন্ন করেন। এই প্রসঙ্গ তাঁর লেখা বিখ্যাত গ্রন্থে উল্লেখিত আছে।

১৯৫২ সালে প্রথম সাধারণ নির্বাচন হয়। U.P.B. ফ্রন্ট কিছুটা ভাঙাচোরা অবস্থায় তখনও ছিল। বর্ধমান শহরে বিনয়দা মহারাজার বিরুদ্ধে প্রার্থী ও দাশুদা চকদিঘির জমিদারের বিরুদ্ধে দাঁড়ান। আমাকে মূলত বর্ধমান কেন্দ্রের কাজে নিযুক্ত রাখা হয়, তবে মধ্যে মধ্যে বাড়ির কেন্দ্র রায়নাতেও যেতে হয়। তখন সুবোধদা জেলা সম্পাদক, কেস্তদা (হরেকৃষ্ণ কোঙার), কালোদা (শহিদ শিবশঙ্কর চৌধুরী) আন্ডারগ্রাউন্ডে। মটরদার উপর জেলার নির্বাচন পরিচালনার মূল দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল। পণ্ডিত নেহেরু (প্রধানমন্ত্রী) বর্ধমান টাউন স্কুল মাঠে কংগ্রেস প্রার্থী রাজার পক্ষে এবং আমাদের বিনয়দার বিপক্ষে বক্তৃতা দেন। ঠিক তার পরের দিনই বক্ষিমবাবুকে টাউন হল ময়দানে পণ্ডিত নেহেরুর জবাবে বলার জন্য আনা হয়।

টাউনস্কুল মাঠে পণ্ডিত নেহেরুকে কিছু প্রশ্ন করার জন্য কয়েকজনকে মটরদা নির্বাচিত করেছিলেন। তাঁর মধ্যে আমিও ছিলাম। নেহেরুর লেখা ‘Discovery of India’ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে প্রশ্নগুলি প্রস্তুত করেন। আমাদের দিয়ে রিহার্সেল করান। কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি নিষেধ করেন। আইনজীবী শৈলেশ ব্যানার্জী, মথুরাদা (প্রয়াত মথুরা ঘোষ), সন্তোষ দা (প্রয়াত সন্তোষ খাঁ), অতুল সেন (কবিরাজ মথুর সেনগুপ্তের পুত্র), ফকির বাবু (প্রয়াত ফকির রায়) প্রমুখদের তাঁরা বলেন, এতে শহরবাসীর মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে। আমরা অবশ্য প্রশ্ন না করলেও ঐ জনসভায় যোগ দিই। সভার শেষে বাড়ি ফিরে যাওয়া ব্যক্তিদের পরের দিনের টাউন হল মাঠে বক্ষিমবাবুর মিটিংয়ের হ্যাণ্ডবিল বিলি করি। ঐ হ্যাণ্ডবিলের নামকরণ ছিল ‘পণ্ডিত নেহেরুর জবাবে বক্ষিম মুখার্জী’।

ঐ দিন রাত্রে আমানুদা এসে বলেন, “দাদা আপনাকে ডাকছেন, চলুন।” গেলাম, উনি বললেন, “কাল সকালেই এখানে চলে এসো, তোমাকে কাটোয়া যেতে হবে, বলে দেব কোথায় যাবে।” পরদিন সেই মতো গেলাম। উনি একটি বড় খাম গেঞ্জির ভিতর রাখলেন, আমানুদা সরু দড়ি দিয়ে ভাল করে বাঁধলেন। উপরে জামা, সোয়েটার ইত্যাদি যথারীতি ছিল। বলাবাহুল্য তখন শীতকাল। ট্রেনের (B.K. Rly) টাইম, ফেরার সময় সব বুঝিয়ে বলা হল। বলা হল, কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলতে হবে শিক্ষক সমিতির কাজে নৃসিংহ প্রসাদ ঘোষের কাছে যাচ্ছি। তিনি জেলার অন্যতম শিক্ষকনেতা। আসলে চিঠিটা দিতে হবে শশাঙ্ক চ্যাটার্জীকে। বাড়ি কোথায় চায়ের দোকানে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিতে হবে।

শুধুমাত্র তার হাতেই বুক থেকে খুলে চিঠি দিতে হবে। যদি তিনি বাইরে থাকেন, অপেক্ষা করতে হবে। বর্ধমান স্টেশন অভিমুখে আমি চললাম। আমানুদা এগিয়ে দিতে এলেন। আমি ফ্লোড প্রকাশ করলাম, আমার বক্ষিমবাবুর বক্তৃতা শোনা হবে না, কাল ফিরতে রাত্রি ৭টা হয়ে যাবে। তখন তো মিটিং শেষ। আমানুদা আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, “তাতে কী, মিটিং শেষ হলই বা, আপনাকে বক্ষিমবাবুর সঙ্গে চাক্ষুষ দেখা করিয়ে দেব, কথা বলিয়ে দেব, আপনার সঙ্গে দেখা না করিয়ে ওনাকে ছাড়বোই না।” আমি হেসে বললাম, “আমি এতই শিশু আমাকে চুষিকাঠি দিয়ে ভোলানো হচ্ছে?” তিনি অবশ্য বললেন, “না, না, ভোলাচ্ছি না, সত্যি বলছি।”

যাইহোক, B.K. Rly-এর বর্ধমান স্টেশনে গেলাম। খামটা চকিতে একবার দেখেছিলাম (যখন মটরদা সেটা গেঞ্জির নিচে বাঁধছিলেন)। খামে লেখা ছিল, মনে হচ্ছে “অনুগ্রহ নারায়ণ সিংহ খুলিবেন।” হয়তো সুবোধদার ছদ্মনাম, তখন তো তিনি আন্ডারগ্রাউন্ডে। কেস্তদার চিঠি নিয়ে যেতাম। ওঁর ছদ্মনাম ছিল ‘রাজেন’।

যথাযথ ভাবেই আমি কাটোয়ার আতুরঘাটে গঙ্গার ধারে শশাঙ্কদার বাড়ি পৌঁছাই। তাঁকে চিঠি দিলাম। তিনি থাকতে বললেন, আমার অক্ষমতা জানালাম। ওখানে চা-বিস্কুট খেয়েই বর্ধমানের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম। টিফিন বা দুপুরে ভাত খাইনি। তবে কাটোয়া রেলস্টেশনে এসে একটা পাউরুটি ও দুবার চা খাই। ট্রেন ছাড়লো।

ঠিক মনে নেই, সম্ভবত গলসি বা ভাতার এলাকায় এক ভদ্রলোক, উজ্জ্বল চেহারা, ধবধবে সাদা জামাকাপড়, শোয়েটার, চাদর পরিহিত, কামরায় ঢুকলেন। কিছু সাদা কাগজ হাতে নিয়ে পড়ে পড়ে বলতে লাগলেন। কামরায় সিট কিছু ফাঁকাই পড়ে ছিল, তবুও তিনি দাঁড়িয়ে। প্রথমে মনে করি হকার প্রচার করছেন। পরে বুঝলাম, প্রচার বটে তবে তথাকথিত হকার নন। তিনি হ্যাণ্ডবিলে যা পড়ছেন এবং বিলি করছেন তা ‘মতামত’ প্রাপ্তাহিক কাগজের উদ্ধৃতি মাত্র। তখন আমি ‘মতামত’ পত্রিকার এজেন্ট, রিপোর্টার ও লেখক। পত্রিকার প্রচ্ছদে সম্পাদকের নাম প্রমথ ভৌমিক ছাপা হত বটে, তবে আসল সম্পাদক অন্যজন ছিলেন। প্রকাশনার ঠিকানা সিদ্ধেশ্বর চন্দ্র লেন মুদ্রিত থাকত। সেই জায়গায় একটা ঘর ছিল বটে, সেখানে অল্প কিছু পত্রিকার একজন মানুষও থাকতেন। বউবাজার স্ট্রিট ও আমহার্স্ট স্ট্রিটের সংযোগস্থলের নিকট সিদ্ধেশ্বর চন্দ্র লেন। আমি সেখানে দুবার পত্রিকার কাজে যাই।

প্রচারক আমার সিটের কাছে এসেও প্রচারকার্য চালান। দুই বৃদ্ধ মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন। তাঁরা খুব জোরালো ভাবে প্রচারকের বক্তব্য সমর্থন করছিলেন। বলাবাহুল্য, সেটা ছিল নির্বাচনী আবেদন। প্রসঙ্গক্রমে বৃদ্ধদ্বয়ের কাছে জানা গেল তাঁরা গলসি নির্বাচনী কেন্দ্রের ভোটার। শোনা মাত্র প্রচারক বৃদ্ধদের প্রণাম করে তাঁদের আশীর্বাদ প্রার্থনা করলেন, বললেন তিনি গলসি বিধানসভা কেন্দ্রে বামপন্থী প্রার্থী। এবার আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল, উনিই কৃষ্ণচন্দ্র হালদার। এবার আমিই অগ্রণী হয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ পরিচয় করলাম। এক রিক্সায় এলাম। তবে মটরদা তখন মোবারক বিল্ডিংয়ে (জেলা অফিসে) ছিলেন না। আমি পার্কাসরোড গিয়ে সমুদয় জানালাম। কিছু টাকা বেঁচে যায়, ফেরৎ দিলাম। মটরদা বিস্মিত হয়ে বললেন, “তুমি দুপুরে খাওনি?” বললাম, “কিছু খেয়েছি।”

ওখান থেকে ফিরে হোটেল খেয়ে নিলাম। তখন মোবারক বিল্ডিংয়ে ‘বেঙ্গল বোর্ডিং ও হোটেল’ ছিল। রাত্রে কিছু কাজকর্ম করিনি, ক্লান্ত ছিলাম, শুয়ে পড়ি। আমি তখন জেলা অফিসে

থাকতাম। যথারীতি সকলে ঘুম থেকে উঠেছি, আমানুদা হস্তদস্ত হয়ে এসে বললেন, “তাড়াতাড়ি আমাদের বাড়ি চলুন, দাদা ডাকছেন। কাল ভালো ভাবে আপনার রিপোর্টিং নিতে পারেন নি, আপনার বিশ্রামের দরকার ছিল বলে।” চা না খেয়েই ওঁর সঙ্গে গেলাম। ঐ দিন আমানুদা আমাকে ওঁদের বাড়ির উপরে বারান্দার ছাদে নিয়ে গেলেন। সেখানে মটরদা, বঙ্কিমবাবু ও ভাবী চেয়ারে বসে কথাবার্তা বলছিলেন। ভাবী আমাকে তাঁর চেয়ারে বসতে বলে চলে গেলেন। সামান্য পরে অনেক খাবার সহ ফিরে এলেন। সকলের সঙ্গে আমাকেও প্রচুর খেতে দিলেন। চা ছিল না, কফি খাবার সুযোগ হল। তখন কফির তেমন চলন ছিল না। বেশ খুশিই হলাম। খেতে খেতে আমানুদা বঙ্কিমবাবুকে দেখিয়ে বললেন, “কী, ললিপপ, চুম্বিকাঠি দিয়ে ভোলাচ্ছি না তো? সত্যি কথা রেখেছি তো?” উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইলাম। মটরদা ও ভাবী মনে হয় সব জানতেন, খুব হাসলেন। বঙ্কিমবাবুকে সব বোঝালেন। উনি কাছে ডাকলেন। বসলাম, পরিচয় নিলেন। আমিও B.K. Rly-তে কেষ্ট হালদার মশাইয়ের কথা বললাম। সকলে খানিকটা অমূল্য সময় উপভোগ করলাম। শ্রদ্ধেয় বঙ্কিমবাবু অনেক গল্প করলেন, প্রচুর আনন্দ পেলাম।

১৯৫২ সালে বর্ধমান ও রায়না কেন্দ্রে আমরা বিজয়ী হই। বর্ধমানের মহারাজা এবং চকদিঘির জমিদার পরাজিত হন।

মটরদার নির্দেশ ও উৎসাহে পঞ্চাশের দশকে প্রাথমিক শিক্ষকদের আন্দোলনের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে ওঠে। ১৯৫৪ সালে গুডফ্রাইডের ছুটিতে রায়না থানার সেহারা বাজারে বর্ধমান জেলা প্রাথমিক শিক্ষক সম্মেলন মটরদার নির্দেশে, কৌশলে ও তৎপরতার ফলেই বিরাট সাফল্য লাভ করে। কলকাতার বউবাজারে কবি-লেখক-শিল্পীদের নিয়ে একটা সম্মেলনে মটরদা আমাকে প্রতিনিধি হিসাবে যোগদানের ব্যবস্থা করে দেন।

আর একটি স্মরণীয় ঘটনায়ও মটরদার কল্যাণহস্তের স্পর্শ ছিল। ইংল্যান্ডের কমিউনিস্ট পার্টির চেয়ারম্যান হ্যারি পলিট কলকাতায় এসেছিলেন। তিনি পশ্চিমবাংলায় তরুণ পার্টি কর্মীদের নিয়ে আলোচনা বৈঠক করেন। মটরদা আমাকে ঐ আলোচনাসভায় যাবার জন্য নির্দেশ দেন। আমি তাঁকে বললাম, “আমি কী করে যাব? আমার তো অভিজ্ঞান নেই।” “তার মানে? তুমি আমার কাছে শুকুন্ডলা কাহিনী ফাঁদলে!” প্রত্যুত্তরে বললাম “আমি— পার্টি সদস্য নই।” তিনি বললেন, “সে ব্যবস্থা আমি করব। তুমি আমার কাছ থেকে একটা চিঠি নিয়ে যাবে। আমি সব বলে দেব।” নির্দিষ্ট দিনের আগের রাতে তাঁর বাড়ি গেলাম, তিনি একটা চিঠি লিখে দিলেন এবং খামে ভরে এঁটে দিলেন, বললেন, “এই চিঠিটা জলি-কে দেবে। আমি কমরেড জলি কাউলের সঙ্গে দেখা করতে চাই, বলে অনুরোধ করলে তুমি নিশ্চয়ই সহযোগিতা পাবে।” সভার নির্ধারিত সময়ের দেড় ঘণ্টা আগেই আমি হলের কাছের রাস্তায় হাজির হই। অল্প কিছু ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। একজন বেশ সুশ্রী, তিনি খুব চঞ্চলতার সঙ্গে ঘোরাঘুরি করছিলেন। আমি তাঁর কাছেই গেলাম। বললাম, “আমি কমরেড জলি কাউলের সঙ্গে দেখা করতে চাই, আপনি একটু সাহায্য করবেন?” তিনি বললেন, “কেন?”—“তাঁরজন্য একটা চিঠি আছে, আমি তাঁকে দেব।” ভদ্রলোক বললেন, “কে পাঠিয়েছেন বলতে পারবেন?” বললাম, “বর্ধমানের কমরেড সৈয়দ শাহেদুল্লাহ সাহেব পাঠিয়েছেন।” তিনি বললেন, “দেন চিঠি, আমিই জলি কাউল।” চিঠি দিলাম। তিনি আগ্রহের সঙ্গে নিলেন, পড়লেন। তখনও একঘণ্টা দেরি আছে। তিনি আমাকে হলের ভিতর নিয়ে একবারে সামনের আসনেই বসালেন। যথাসময়েই কমরেড পলিট এলেন, সভা অনুষ্ঠিত হল,

প্রচুর তরুণ-তরুণী, যুবক-যুবতীর উপস্থিতি দেখে কমরেড পলিট অভিভূত হন। পরে মটরদার কাছে শুনেছিলাম, জলি কাউল তদানীন্তন সময়ে কলকাতা জেলা পার্টির সম্পাদক ছিলেন।

একবার কাটোয়ার আতুরহাটে মটরদা গঙ্গার ধারে একটি বাড়িতে আমাদের কয়েকজনকে রাজনৈতিক ক্লাশে যোগ দিতে আহ্বান জানিয়েছিলেন। সেই মতো আমরা উপস্থিত হই। মটরদা একটা আরামকেন্দারায় আধশোয়া অবস্থায় গঙ্গার দিকে চেয়েছিলেন। আমাদের বললেন, “দেখ, গঙ্গার ধারে বসে এই সুন্দর বাতাস উপভোগ করতে পারলে, আর কিছুই প্রয়োজন হয় না।” আমার এক বন্ধু কৌতুক করে বললেন, “এখানে এসে আপনার কি শ্রীচৈতন্যদেবের ভাব এসে গেল!” মটরদা শুনে কিছুটা সময় গুম হয়ে গেলেন। তারপর বললেন, “শ্রীচৈতন্যদেব সম্বন্ধে কতটুকু জানো? সেই সময়কার গৌড়া ব্রাহ্মণ্যবাদের কটর সামাজিক অবস্থায় জন্মেও তিনি আচণ্ডাল কোল দিয়েছেন, মন খুলে কথা বলেছেন, অবাধ মেলামেশা করেছেন। নিজে উচ্চ ব্রাহ্মণকুলের সন্তান হয়েও Declasse হরে গেয়েছিলেন। তাঁর বিবাহে সকল অস্ত্রাজনদের প্রতিগৃহে গিয়ে নিজে নিমন্ত্রণ করে আসেন এবং তাঁরা (হরিজনেরা) এসে পাত পেতে খেয়ে যান। আজ থেকে পাঁচশো বৎসর আগের গৌড়া সমাজপতিদের কঠোর অনুশাসনকে তিনি উপেক্ষা করেছিলেন।”

আমার কিছু লেখালেখির আগ্রহ মাঝে মধ্যে ঘটতো। সেই মতো কিছু কিছু লেখা সাহস করে একদিন মটরদাকে দেখাই। তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়েন। কিছু কিছু ভ্রুটি, ভ্রান্তি ও অসম্পূর্ণতা সংশোধন করে দেন। আমাকে বৈষ্ণব সাহিত্য পদাবলী পড়ার জন্য উপদেশ দেন। বলেন, “বৈষ্ণব পদাবলী না পড়লে বাংলা সাহিত্যে সম্যক জ্ঞান অর্জন করা কিছুতেই সম্ভব হবে না।”

পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গেও মটরদা অনেক আলোচনা করেন। সেই সময়ে অতবড় বিপ্লবী আর কেউ ছিলেন না। যেমন তিনি বাল্যবিধবা বিবাহ প্রবর্তন করেন, তেমনি নারীশিক্ষায় প্রথম উদ্যোগী হন। যাঁরা সমাজে নীচ পতিত বলে ঘৃণা ভোগ করতেন, অস্পৃশ্য ছিলেন—তাঁদের তিনি যত্ন করে নিজের মঙ্গলহাতের স্পর্শে সেবা করতেন—চিকিৎসার ওষুধ দিতেন। ক্ষুধার্তকে নিজের হাতে খাওয়াতেন। পরাধীন আমলে ইংরাজ সাহেবদের অন্যায়ের জোরালো প্রতিবাদ করেছেন—সাহেবের টেবিলের উপর নিজের চটিশুদ্ধ পদযুগল তুলে দিয়ে। আমাকে তিনি চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা ‘বিদ্যাসাগর চরিত’ বইটি পড়ে নেবার জন্য উপদেশ দেন।

বিবেকানন্দ সম্বন্ধেও মটরদার অনুরূপ অভিমত প্রকাশ পায়। তিনি বলেছিলেন, স্বামী বিবেকানন্দের গৈরিক বসন সরিয়ে মানুষ নরেন্দ্রকে খোঁজো। যিনি নিজে নররূপী নারায়ণ প্রত্যক্ষ করে বলেছিলেন ‘জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর’। গীতা পাঠের চেয়ে ফুটবল খেলতে আহ্বান জানিয়েছিলেন। তথাকথিত অস্পৃশ্য শ্রেণির মানুষদের আপন ভাই ও রক্ত বলে সাহসী ঘোষণা করেছিলেন। তিনিই প্রথম বলেন, ‘India needs socialism’। প্রসঙ্গত তিনি আমাকে প্রখ্যাত সাংবাদিক সতেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়ের লেখা ‘বিবেকানন্দ চরিত’ বইটি পড়ে নিতে বলেন।

গান্ধিজি সম্বন্ধে তুলনায় অনাগ্রহী থাকলেও মটরদা গান্ধিজির কিছু কিছু বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দিকের উল্লেখ করেছেন। ঐ প্রসঙ্গে তিনি ঋষি দাশের লেখা ‘গান্ধিচরিত’ গ্রন্থটির নাম বলেন।

মটরদা আমার প্রতি খুব স্নেহশীল ছিলেন। মাঝেমাঝেই চিঠি দিতেন এবং চিঠি লিখতে বলতেন। দুবার আমার পত্র দিতে বা

পৌছাতে বিলম্ব হওয়ায় Reply card-এ চিঠি দেন। তাঁর লেখা অনেক মূল্যবান চিঠি আমার কাছে ছিল একটা ফাইলের মধ্যে। ১৯৭২ সালে শিব চতুর্দশীর রাতে ভৈরববাহিনী অনেক কিছু নিয়ে যায়। বাড়ির পরিজনের পরনের কাপড় ছাড়া আর কিছু ছিল না। মটরদার অনেক চিঠি, বিনয়দার ও কেশদার চিঠি (ওঁদের অল্প চিঠি ছিল) তখনই হয়।

বর্ধমানের বাড়ি ছেড়ে কলিকাতার বেকবাগানের (পার্কসার্কাস) লোয়ার রেঞ্জে বাড়িতে অবস্থান কালে আমি অনেকবার মটরদার কাছে গেছি, আলোচনা অনেক হয়েছে। তিনি সেখান থেকেও আমাকে চিঠিপত্র দেন। যদিও শারীরিক কারণে তাঁর লেখায় খুব কষ্ট হতো।

মটরদার সঙ্গেই শুধু না, তাঁর পরিবারের আরও অনেকের সঙ্গেই পরিচয় গড়ে ওঠে। ভাবী প্রয়াতা রাবেয়া বেগম তো স্নেহময়ী ছিলেন, তাঁর কাছ থেকে প্রচুর স্নেহ ও যত্ন পেয়েছি। ঐ বাড়িতে তখন মনসুর সাহেব থাকতেন না। তাঁর উপর পূর্ব পাকিস্তানের পার্টির ও কৃষক আন্দোলনের দায়িত্বভার ছিল। তবে তাঁর স্ত্রী পার্কাসরোডের বাড়িতে থাকতেন এবং পার্টির কাজকর্মে অংশ নিতেন। অবশ্য আমার সঙ্গে সরাসরি কোনও কথাবর্তা হয়নি। সৈয়দ আমানুল্লাহ ছিলেন মটরদার কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ছাত্র হিসাবে প্রতিভাবান ছিলেন। কলেজ জীবনে ছাত্র আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন এবং পরে পার্টিকর্মী ছিলেন। তাঁর সঙ্গে আমার প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বয়সে, জ্ঞানে বড় হলেও বন্ধুর মতন ব্যবহার করতেন। মটরদার

প্রয়াণের পরেও আমার মটরদার পরিজনদের সঙ্গে পরিচয়ের বন্ধন ছিল হয়নি।

আমার কৈশোরে সৈয়দ শাহেদুল্লাহকে দেখেছি আমি। তখন তাঁর যুবা বয়স, অত্যন্ত সুন্দর চেহারা। তবে সেটা শুধুই দেখা। পরে ১৯৫০ সাল থেকে প্রত্যক্ষভাবে তাঁর সান্নিধ্য লাভ করি। আমৃত্যুকাল আমার সঙ্গে যোগাযোগ বিদ্যমান ছিল। তাঁর কাছ থেকে বহু অমূল্য উপদেশ, অত্যন্ত মূল্যবান শিক্ষা, বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান লাভের সৌভাগ্য ঘটে। কিন্তু আমার দুর্বলতার, ত্রুটি ও ভ্রান্তির জন্য যথাযথ ভাবে তা কার্যকরী করিতে পারিনি—মূলত আমার অক্ষমতা ও অযোগ্যতাই তার জন্য দায়ী। বহু বৎসরের মেলামেশা, সাহচর্য, নৈকট্য আমাকে আত্মিক বন্ধনে আবদ্ধ করেছিল। প্রসঙ্গত, তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ‘বর্ধমান জেলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের অতীত প্রসঙ্গ’-এ আমার নাম তিনি একাধিকবার উল্লেখ করেছেন। এটা আমার মহান প্রাপ্তি।

আমার বয়স হয়েছে। ৮৪ বৎসরের বৃদ্ধ, বার্ধক্যজনিত নানা জটিল ব্যাধির শিকার। সে কারণে স্মৃতিও ফাঁকি দিচ্ছে—সকল কথা মনে পড়ে না। চেষ্টা করেও পারি না। স্মৃতির অতল তল থেকে কখনও কখনও টুকরো টুকরো ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। কিন্তু যথাযথভাবে হৃদিস পাবার আগেই মিলিয়ে যায়। কিন্তু মননে কিছুটা রেশ থেকে যায়।

শত বৎসরের জ্ঞানতপস্বী, নিঃস্বার্থ ও নিরলস সংগ্রামী মহান ত্যাগী এই প্রবীণ মনীষীকে মনের মণিকোঠায় রেখে দিয়েছি।

With best compliments of

M/S. DEEP ASSOCIATES

CONTRACTORS, SUPPLIERS & ENGINEERS

Regd. Office

Shankar Plaza, 2nd Floor, S.P. Mukherjee Road, Murgasol More,
Ushagram, Asansol-713303, Ph. 0341-2275107

Local Office

Manik Chand Thakur Sarani, Hirapur, Burnpur-713325, Burdwan, Ph. 9434182054

Sl. No. 103

জনগণের আস্থা অর্জনে বামপন্থীরা

অমল হালদার

গত লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি লাভবান হবার পর থেকে আমাদের রাজ্যেও বিজেপির প্রসার বৃদ্ধির জন্য কর্পোরেট হাউস পরিচালিত মিডিয়া গ্রুপের তৎপরতা বৃদ্ধি লক্ষ্যণীয়। বামপন্থীদের ফলাফল দেখে বামপন্থার ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও তাঁরা যথেষ্ট উল্লসিত। তাই বামপন্থীদের অপ্রাসঙ্গিক করার চেষ্টা চলছে। রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসীন। শিল্প, কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান ইত্যাদি ক্ষেত্রগুলি যেমন আক্রান্ত তেমনি ভয়ঙ্করভাবে আক্রান্ত এই রাজ্যে গণতন্ত্র। তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতি মানুষের দ্রুত মোহভঙ্গ হচ্ছে। রাজ্যের কর্পোরেট মিডিয়া ভালো মতো জানে কংগ্রেস এখন শক্তিহীন অতএব বুর্জোয়াদের অপর একটি রাজনৈতিক দল বিজেপি-ই পারে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরোধী অংশকে কাছে টানতে, সেই কারণে প্রচারমাধ্যমের বড় অংশের প্রচেষ্টার অন্ত নেই। রাজ্যে বামপন্থী শক্তির অগ্রগতি মানে ওদের সর্বনাশ। তাই বামপন্থীদের প্রতি সুর আরও চড়াও—সভা, সমাবেশ সহ যে-কোনো আন্দোলনের সংবাদ চেপে যাও। জনগণের কাছে যেন বামপন্থীদের বার্তা কোনোভাবেই না পৌঁছায়। মূল্যবৃদ্ধি, মহিলাদের উপর আক্রমণ ও জীবন-জীবিকার নানা ইস্যু নিয়ে প্রশাসনের নানা হুঁশিয়ারি সত্ত্বেও সাম্প্রতিককালে প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে সংগ্রামের ময়দানে বামপন্থীরা। কিন্তু প্রচারমাধ্যমে তার স্থান নেই।

বর্তমান রাজ্য সরকারের আমলে পঞ্চায়েত ও পৌরসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। জেলা প্রশাসনের নিরলস ভূমিকা পালন ও ব্যাপকতর সন্ত্রাসের পটভূমিতে নির্বাচনে ভোট লুট, গণনার কারচুপি ছিল নজিরবিহীন। জনমতের বাস্তব চিত্র এই নির্বাচনে খুঁজে পাওয়া ছিল অসম্ভব। লোকসভা নির্বাচনকে ঘিরে জনগণের মধ্যে আশংকা ছিল কিন্তু প্রাথমিকভাবে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের কিছু পদক্ষেপ আশান্বিত করে, অনেকের ধারণা ছিল নির্বাচন অব্যাহত ও সৃষ্টভাবে সম্পন্ন হবে। নির্বাচনে যথেষ্ট সংখ্যক কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকবে, কেন্দ্রীয় নির্বাচনী পর্যবেক্ষকরাও সক্রিয় থাকবেন, জনগণ তাঁদের মতামত স্বাধীনভাবে প্রয়োগ করতে পারবেন। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। তৃতীয় দফা ভোটের দিন সকাল থেকেই শুরু হল তৃণমূল দুষ্কৃতীদের ব্যাপক তাণ্ডব। পোলিং এজেন্টদের উপর আক্রমণ, বুথে ঢুকতে বাধাদান, ভোটারদের বুথে যেতে বাধা, পাড়ায় পাড়ায় ভীতিপ্রদর্শন, পৌর ও পঞ্চায়েত নির্বাচনের মতোই মোটর সাইকেল বাহিনীর তাণ্ডব, সব কিছুই হল প্রশাসনের নাকের ডগায়। নির্বাচন কমিশনকে জানালেও কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হল না। অব্যাহত শুরু হয়ে গেল ভোট লুট, ভোটের নামে প্রহসন। পুলিশ প্রশাসনের সাহায্যে গ্রামাঞ্চলে একটির পর একটি বুথ বেলা ৯টার মধ্য দখল হয়ে গেল। যদি ভোটের ফলাফলের দিকে একটু ফিরে তাকানো হয় তাহলেই আমাদের বক্তব্যের সত্যতা খুঁজে পাওয়া যাবে। কোনো কোনো বুথে ১, ২, ৫,

৮, ১০ কিংবা একটু বেশি সংখ্যায় বামপন্থীদের অনুকূলে ভোট প্রায় এক হাজার বুথে। অতি বড় শত্রুও বিশ্বাস করে না এত কম ভোট বামপন্থীরা পেতে পারে। নির্বাচন কমিশন ঠুটো জগন্নাথ—আক্রান্ত সাধারণ ভোটার—অবাধ বুথ দখল সত্ত্বেও বর্ধমান জেলায় বামপন্থীরা ভোট পেয়েছে ৩১.১৮ শতাংশ। সমগ্র গ্রামাঞ্চলে এই হার ৩৬ শতাংশের বেশি। বিপর্যয়কর এই ফলাফলের পিছনে যে রিগিং, নির্বাচন কমিশনের গভীর ষড়যন্ত্র, রাজ্য প্রশাসনের নিরলস পক্ষপাতদুষ্ট ভূমিকা এবং বিগত তিন বছরের লাগাতার সন্ত্রাসের পরিবেশ, এই নির্বাচনে জনমতের যে প্রকৃত প্রতিফলন হয়নি তা একদিন আরও স্পষ্ট হবেই। এটা সত্য যে, এই ধরনের ভোট লুটের বিরুদ্ধে নির্বাচনী সংগঠনকে জোরদার করার যে দরকার ছিল তা আমরা বামপন্থীরা পারিনি। আমরা নির্বাচন কমিশনের প্রতি একটু বেশি আস্থা প্রকাশ করেছিলাম। জনগণ সঙ্গে থাকলে অনেক কঠিন কাজ সহজ হয়, জনগণ সঙ্গে না থাকলে অনেক সহজ কাজ কঠিন হয়। ক্রমাগত আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জনগণকে সঙ্গে রাখতে হবে। জনগণের আস্থা অর্জন করতে হবে। তবেই ভবিষ্যতে এই ধরনের রাজনৈতিক সংগ্রামে সুশৃঙ্খল, শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

বিগত বিধানসভা নির্বাচনের পর বর্ধমান জেলাতেই ১৮ জন সিপিআই(এম) সদস্য শহিদ হয়েছেন। শহিদের তালিকায় জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য থেকে সাধারণ পার্টিকর্মী আছেন। বাদ পড়েননি মহিলা কর্মীরাও। অপরাধীদের বিচার হবে কিনা সন্দেহ দানা বাঁধছে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পুলিশ আজও ঘাতকদের গ্রেপ্তার করেনি। মিথ্যা মামলায় কয়েক হাজার কর্মী হয় গ্রেপ্তার কিংবা এলাকা ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন। এমনকি তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কেউ মারা গেলে আমাদের কর্মীদের রেহাই নেই। তিন বছরে প্রায় শতাধিক মহিলা কর্মী জেলে গেলেন। ঘরবাড়ির উপর আক্রমণ, লুটতরাজ প্রতিদিনকার ঘটনা, পার্টি অফিসগুলি বন্ধ। কাঁকসা জোনাল কমিটির দপ্তরে আক্রমণ হল, সিপিআই(এম) জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য বীরেশ মণ্ডল, জোনাল কমিটির সম্পাদক অলোক ভট্টাচার্য সহ জোনাল নেতৃবৃন্দ আক্রান্ত হলেন। আক্রান্ত হলেন জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য তাপস চ্যাটার্জি। খণ্ডঘোষ জোনাল কমিটির সম্পাদক দেশবন্ধু হাজারা আক্রান্ত হলেন, আঘাত এতটাই গুরুতর যে আজও তিনি স্বাভাবিকভাবে হাঁটাচলা করতে পারেন না। একই দিনে মারাত্মকভাবে আক্রান্ত হলেন খণ্ডঘোষ এলাকায় নুর আলম, এখনও শয্যাশায়ী। সাধারণ কর্মীদের সাথে নেতৃত্বও আক্রান্ত হচ্ছেন, নেতৃত্ব জেলে যাচ্ছেন। এত আক্রমণ সত্ত্বেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে মনোবলে চিড় ধরতে পারেনি। প্রতিটি কর্মসূচিতে মানুষ আরও বেশি অংশগ্রহণ করছেন। গত ৬ থেকে ৮ আগস্ট, ২০১৪ তিনদিন ব্যাপী

অবস্থান কর্মসূচি পালিত হল বর্ধমান শহরের বীরহাটা সংলগ্ন পার্বতী শাখার মাঠে। প্রশাসন বিজয় তোরণের কাছে ‘ম্যাডেলনা পার্কে’ অনুমতি দেয়নি। কিছুদিন আগে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের জনসভার জন্য হাউসিং মাঠের অনুমতি দেওয়া হয়নি। সেই সভাটি অনুষ্ঠিত হয় হারাধনপল্লীতে। এবারও প্রশাসনের এই নির্লজ্জ আচরণের প্রতিবাদ করেছেন বর্ধমান শহর সহ জেলার অন্যান্য এলাকার মানুষ। নানাভাবে আমাদের বার্তা দিয়েছেন। এই অন্যায় বরদাস্ত করা যায় না। এত প্রতিহিংসা সত্ত্বেও তিন দিনের এই কর্মসূচি ব্যাপক সাফল্য লাভ করে। হাজার হাজার মানুষ অবস্থান কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। অবস্থানমঞ্চকে মাতিয়ে দেয় লোকশিল্পী ও গণসঙ্গীত শিল্পীরা। বর্ধমান শহরের মানুষ জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত মানুষদের খাবারের ব্যবস্থা করে। ১৫ হাজারের বেশি পরিবার এই খাবার তৈরি করে স্বেচ্ছাসেবকদের হাতে তুলে দেয়। মানুষের এই বিপুল সাড়া বর্ধমান শহরের কর্মীদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে।

পশ্চিমবাংলায় বিগত লোকসভা নির্বাচনে বামপন্থীদের আসন সংখ্যা কমে যাওয়ায় কেউ বিস্মিত, কেউ বেদনাক্লান্ত, আবার কেউ খুবই উদ্বিগ্ন। অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন যে হয়নি এটা তাঁরা বোঝেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে একটাই প্রশ্ন—পশ্চিমবাংলায় কি এই রাজত্বে কোনো নির্বাচন অবাধ হবে না? এত অন্যায়, এত অত্যাচার, এত মিথ্যাচার কতদিন সহ্য করবে মানুষ? পরিবর্তনের এই চেহারা দেখে কিছু মানুষ ভাবতে শুরু করেছেন, এই যদি রাজ্যের হাল হবে বুঝতাম তাহলে পরিবর্তনপন্থীদের পাতা ফাঁদে পা দিতাম না। অনেক সময় দেখি কিছু টিভি চ্যানেলে কয়েকজন মানুষ ৩৪ বছরের বামফ্রন্ট শাসনের সমালোচনা করেন। তাঁদের চোখে ইতিবাচক কোনো ঘটনা নজরে আসে না। বর্তমান প্রজন্মের অনেক যুবকও এইসব আলোচনা শুনে কিছুটা বিভ্রান্ত হন। বামফ্রন্টের প্রথম যুগ থেকে যাঁরা বামফ্রন্টের শাসনকাল প্রত্যক্ষ করেছেন তাঁদের মধ্যে এই বিভ্রান্তি অপেক্ষাকৃত কম।

কয়েকদিন আগে প্রয়াত জ্যোতি বসুর জন্মশতবার্ষিকীর একটি কর্মসূচিতে বক্তব্য রেখেছেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ প্রভাত পট্টনায়ক। তিনি বলেন, এই পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতির ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে জ্যোতি বসুর আমলে। ইতিহাসের ঘটনাবলী তুলে ধরে বলেন, ইংরেজদের এক বড় উপনিবেশ ছিল আয়ারল্যান্ড। তারপরেই অবিভক্ত বাংলা ছিল ব্রিটিশদের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ উপনিবেশ। লর্ড

কর্নওয়ালিসের আমলে ‘চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত’ জমিদারতন্ত্রকে শক্তিশালী করেছিল। পরিণতিতে বাংলার কৃষকের উপর নেমে এসেছিল ভয়ঙ্কর জুলুম, অত্যাচার। এই অবিভক্ত বাংলায় দুর্ভিক্ষ, ছিয়াত্তরের মর্মান্তিক, কারও অজানা নয়। ক্ষুধার জ্বালায় হা অন্ন, হা অন্ন করে মানুষ কৈঁদে বেড়াতো, অনাহারে মানুষের মৃত্যু ছিল দৈনন্দিন ঘটনা। বিখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক মৃণাল সেন তাঁর ‘কোরাস’, ‘আকালের সন্ধান’ চলচ্চিত্রে এই দৃশ্য তুলে ধরেছেন। এই বাংলায় কোনো সেচের সুযোগ ছিল না। ইংরেজ সরকার বলতো যে, এমনিতেই বন্যায় ডুবে যায় সমগ্র বাংলা, এখানে সেচের ব্যবস্থা করার দরকার নেই। ইংরেজ রাজত্বে এই বাংলার মতো দুঃখ-কষ্ট আর কোনো রাজ্যের এতটা ছিল না। পরে দেশ স্বাধীন হবার পর কংগ্রেস রাজত্বেও খাদ্য সমস্যার সমাধান হয়নি।

উনিশশো ঊনষাট সালের খাদ্য আন্দোলনে পুলিশের লাঠিতে ৮০ জন মানুষের মৃত্যু হয়। ছেঁষাট্টা সালেও শুরু হয় খাদ্য আন্দোলন। শহিদ হন নুরুল ইসলাম, আনন্দ হাইত। সত্তরের দশকেও দেখা গেছে একটি ‘জি-আর’-এর জন্য বিডিও অফিসে ধর্না, ভাদ্র মাসে গ্রামে গ্রামে তালের মাড়ি, দুটো শামুক, গুগলি ছিল গরিবদের সম্বল। মেদিনীপুরে বানবন্যা হলে হাজার হাজার মানুষ ভিক্ষা করতে আসতো বর্ধমান জেলার গ্রামে গ্রামে। এই কালরাত্রির অবসান হল বামফ্রন্ট আমলের শুরুতেই। সাতাত্তর সালে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর ভূমিসংস্কার, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, সমবায়ের মাধ্যমে কৃষকের ঋণ সহ নানা উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে কৃষিতে দ্রুত অগ্রগতি ঘটতে শুরু হল। ১৯৮০ থেকে ৯০ সালের মধ্যে এক দশকে পশ্চিমবাংলা কৃষিতে দেশের মধ্যে ১৬ নং স্থান থেকে এক নম্বরে পৌঁছে গেল।

একই কথার পুনরাবৃত্তি করেছেন প্রাক্তন আই এ এস এবং বর্তমান তৃণমূল সাংসদ দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি তাঁর ‘Land Reform in West Bengal: Remembering Hare Krishna Konar and Benoy Chaudhury’ প্রবন্ধে হরেকৃষ্ণ কোণার ও বিনয় চৌধুরীকে স্মরণ করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন, ১৮৮১-১৯৮১ যুক্ত বাংলায় ও পরে পশ্চিমবাংলায় কৃষিতে ছিল গভীর সঙ্কট। এই সঙ্কট থেকে পশ্চিমবঙ্গ পরিত্রাণ পেতে শুরু করে ১৯৮৩ সাল থেকে। কৃষির এই উন্নয়ন উল্লেখ্য গতিতে হয়। তিনি তাঁর প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন, ১৯৭০-৮০ সালে চালের বার্ষিক উৎপাদন হয় ১.২২ শতাংশ। আর এই উৎপাদন ১৯৮০-৯০ দশকে বেড়ে দাঁড়ায়



৬.৪১ শতাংশ।

স্বাভাবিকভাবে পণ্ডিত ব্যক্তির মনে করেন ১৯৮০-৯০ দশকেই কৃষিতে এই উন্নয়ন নিয়ে এসেছে বাংলার নবজাগরণ। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে কৃষিতে প্রতিদিনই অগ্রগতি ঘটছে। খাদ্য সংকটের জন্য পশ্চিমবাংলায় কোনো আন্দোলন ৩৪ বছরে হয়নি। খাদ্যে স্বয়ম্ভরতার যে ভিত বামফ্রন্ট গড়ে দিয়ে গেছে তাকে অবলম্বন করেই আজ আর খাদ্যসমস্যা নেই। অতি বড় শত্রুও এ-সত্য অস্বীকার করতে পারেন না। কথায় আছে—ভাদ্র মাসে রাজার ভাগুর ফুরিয়ে যায়। ভাদ্র মাস একটা সময় ছিল গরিবদের কাছে যন্ত্রণার। সেই ভাদ্রমাসেই গ্রামের এক খেতমজুর তাঁর জমানো টাকায় জমি কিনছে কোনো এক চাষির। পরিস্থিতির এই ব্যাপক পরিবর্তন কি নজরে আছে?

শুধু কৃষিতে উন্নতি নয়, বামফ্রন্টের আমলেই শিক্ষার প্রসার ঘটলো। গ্রামের গরিব পাড়ায় শিক্ষার আলো—মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, গ্র্যাজুয়েট—এসব আগে কল্পনা করা যেত? আজ খোঁজ নিলে দেখা যাবে কল্পনাই আজ বাস্তবে পরিণত হয়েছে। সাক্ষরতা অভিযান শুরু হবার পর মেয়েদের পড়াশোনার আগ্রহ বাড়লো। মেয়েরা লেখাপড়া শিখলে তাঁর সন্তান নিরক্ষর হয় না। এই সাক্ষরতা অভিযান প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছে গ্রামবাংলার মানুষকে।

যাঁরা সমালোচনা করেন, তাঁদেরও জানা উচিত কৃষির ভিতর উপর শিল্প গড়ার পরিকল্পনার সাথে সাথে শুরু হয় প্রতিক্রিয়ার শক্তির গভীর চক্রান্ত। পশ্চিমবাংলার এই সর্বনাশ সেদিন সবাই বুঝতে পারেনি। আজ পশ্চিমবাংলার কৃষি যেমন ধ্বংসের পথে, শিল্পকারখানারও ভবিষ্যৎ অন্ধকার। একটার পর একটা কারখানা বন্ধ

হচ্ছে। যতই সিঙ্গাপুর ভ্রমণ করে শিল্পসম্ভাবনার কথা বলা হোক, সিঙ্গুরের পাপ তাঁর হাত থেকে মোছা যাবে না। অনিশ্চিত কর্মসংস্থান, এস এস সি, টেট নিয়ে ছিনিমিনি খেলা—প্রতিদিনই যুবকদের ক্রোধ বাড়ছে। এই যন্ত্রণার মাশুল গুনতে হবেই।

তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতি ক্ষোভ যত বাড়ছে, কর্পোরেট মিডিয়া প্রতিদিনই তার প্রচারের মাধ্যমে বিজেপি-কে তুলে ধরার চেষ্টা করছে। এবার বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেটের যা অভিমুখ তাতে সারা দেশে শ্রমজীবী মানুষের উপর আক্রমণ আরও তীব্র হবে। গ্রামের গরিবরা আক্রান্ত হবে। সব যন্ত্রণাকে ভুলিয়ে দেবার জন্য ব্যবহার করা হবে উগ্র সাম্প্রদায়িকতাকে। ইতিপূর্বে এই সরকার আসার পর গুজরাটে ১৭টি স্থানে, উত্তরপ্রদেশে ৭টি স্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার রক্ত ঝরেছে। আমাদের রাজ্যেও আর এস এস-এর তৎপরতা বেড়েছে। বাড়ছে বিশ্ব হিন্দুপরিষদের তৎপরতা। যেভাবে তাদের নেতৃত্ব বক্তব্য রাখছেন তার ফলে সরাসরি ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ আক্রান্ত হচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই সাম্প্রদায়িকতার বিপদ সম্পর্কে প্রতিদিনই জনগণকে সতর্ক করতে হবে। এই মুহূর্তে আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল বামপন্থী নীতি ও আদর্শকে জনগণের সামনে তুলে ধরার জন্য বামপন্থীদের প্রচার পত্রিকাকে অনেক বেশি পরিমাণে বিক্রয় ও পড়ানোর ব্যবস্থা করা। আমরা বামপন্থীরা কর্মসূচি নিয়ে রাস্তায় আছি, কিন্তু প্রচারমাধ্যম তাদের শ্রেণিস্বার্থে বামপন্থী মতাদর্শের কোনো প্রচার করবে না। স্বাভাবিকভাবে বামপন্থী কর্মীদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করার প্রয়োজনেই পত্রিকাকে গুরুত্ব দিতে হবে।

With best compliments of

LACHIPUR COLLIERY (R) EMPLOYEES' CO-OPERATIVE CREDIT SOCIETY LTD.

(Regd. No. 314)

Lachipur Colliery, P.O. Kajoragram
Dist. Burdwan, PIN : 713338, Phone : 0341-2379394

Sl. No. 96

With best compliments of

*A
Well Wisher*

BURNPUR

Sl. No. 47

লোকসভা নির্বাচন ২০১৪

কিছু শিক্ষা, কিছু করণীয়

রথীন রায়

২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব ফেলবে। দেশব্যাপী অতি দক্ষিণপন্থী শক্তি, বিজেপি-র উত্থান হয়েছে, যারা ধর্মের ভিত্তিতে বিভাজনের মাধ্যমে সমর্থন বাড়ায়। স্বাভাবিকই শ্রমজীবী মানুষের উপর আর্থিক শোষণ তীব্র হবে এবং এর বিরুদ্ধে মেহনতি মানুষের প্রতিরোধের হাতিয়ারগুলি অর্থাৎ মানুষের স্বার্থে কাজ করে এমন সব সংগঠনের উপর আক্রমণও তীব্রতর হবে।

স্বাধীনতার পরবর্তীকালে বামপন্থীদের এত খারাপ ফল কখনও হয়নি। একমাত্র ব্যতিক্রম ত্রিপুরা, যেখানে বামপন্থার প্রতি সমর্থনের উর্ধ্বগতি বজায় আছে। যদিও পশ্চিমবঙ্গে অস্বাভাবিক পরিস্থিতি তথাপি জনসমর্থন হ্রাসের লক্ষণ পরিলক্ষ্য। সমস্ত দেশে যেখানে কংগ্রেস পর্যুদন্ত, কেবলমাত্র কিস্তি জনসমর্থন বাড়িয়েছে এবং বামপন্থীদের কমেছে। ভারতের সমস্ত রাজ্যে সমর্থন কমেছে।

অথচ কংগ্রেস সরকারের দুর্নীতি বিষয়গুলি, খাদ্যদ্রব্য সহ সমস্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি, উদারবাদী অর্থনীতির সামগ্রিক কুপ্রভাব, সাম্রাজ্যবাদের কাছে ক্রমাগত আত্মসমর্পণ প্রভৃতি বিষয়গুলি বামপন্থীরা বিশেষ করে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্ক্সবাদী) জনসমক্ষে নিয়ে আসে এবং সাধ্যমতো আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করে। কিন্তু একই দক্ষিণপন্থী আর্থিক নীতির সমর্থক ভারতীয় জনতা পার্টি সারা দেশে আক্রমণাত্মক প্রচার চালিয়ে এবং বামপন্থীদের সাংগঠনিক দুর্বলতা, আঞ্চলিক বুর্জোয়া দলগুলির সুবিধাবাদী অবস্থান, কংগ্রেসের প্রতি সাধারণ মানুষের ঘৃণা কাজে লাগিয়ে দক্ষতার সাথে বহু বছর পর সংসদে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে। জনসমর্থন মাত্র ৩৫ শতাংশ নিয়েই সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ। এ কারণেই বামপন্থীদের দাবি সংবিধান সংশোধন করে অনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা।

|| ২ ||

সিপিআই(এম)-এর গণভিত্তি হ্রাস পাওয়ার কয়েকটি কারণ নির্দিষ্ট করা হয়েছে। দশম পার্টি কংগ্রেসে লক্ষ্য স্থির হয়েছিল বাম ও গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গড়ে তোলার। এই ফ্রন্ট শ্রেণিভিত্তিক ফ্রন্ট। কার্যত রণনীতিরই অঙ্গ। পরবর্তীকালে সাম্প্রদায়িকতার বিপদ লক্ষিত হলে ধর্মনিরপেক্ষতাকে সংযুক্ত করা হয়। বাম গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ ফ্রন্ট গড়ার কথা বিবেচিত হয়। বিগত সমস্ত পার্টি কংগ্রেসে কেন্দ্রীয় সরকারগুলির জনবিরোধী নীতিসমূহ ও উদারীকরণের বিরুদ্ধে এবং সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে প্রতিহত করতে সিপিআই(এম)-এর নিজস্ব শক্তিবৃদ্ধির উদ্যোগের সাথে অন্য বামদল এবং এইসব নীতির বিরুদ্ধে যারা সামিল হতে চায় তাদের নিয়ে দেশব্যাপী গণআন্দোলন সংগঠিত

করার আহ্বান জানানো হয়েছিল। সংগ্রামের মধ্য দিয়েই নীতিভিত্তিক ফ্রন্ট গড়ে উঠবে যা প্রকৃত বিপ্লবের সন্ধান দেবে। এই কাজ করা হয়নি অথবা ব্যর্থ হয়েছে। স্বাধীন শক্তি না বাড়িয়ে নির্বাচনে অন্যান্য সুবিধাবাদী স্থানীয় বুর্জোয়া দলগুলির সাথে জোট বাঁধার রাজনীতি ক্ষতিকারক প্রমাণিত হয়েছে। সিপিআই(এম) ও সাধারণভাবে বামপন্থীদের স্বাধীন শক্তি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে। তাই কৌশলগত লাইনের পর্যালোচনা প্রয়োজন।

পার্টির নেতৃত্বে গড়ে ওঠা গণসংগ্রাম পার্টির রাজনৈতিক প্রভাব বাড়তে সাহায্য করছে না। গণসংগ্রাম গড়ে তোলায় দুর্বলতা আছে। না আছে ধারাবাহিকতা, না আছে ব্যাপকতা ও গভীরতা। অল্প সংখ্যক যা আন্দোলন হচ্ছে তা অর্থনীতিবাদের গণ্ডি অতিক্রম করছে না। সাম্প্রতিক একটি উদাহরণ উল্লেখ করা যেতে পারে। ইস্পাত শিল্পে জাতীয় স্তরে একটি চুক্তিতে আর্থিক দাবি-দাওয়া আদায়ের সাথে ধর্মঘট বা কর্মবিরতি করা হবে না বলা হয়েছে। সিআইটিইউ এই ধরনের চুক্তির অন্যতম স্বাক্ষরকারী। দেশের অন্যান্য রাজ্যেও শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র আন্দোলন হয়েছে, যেমন রাজস্থান, হিমাচল প্রদেশ প্রভৃতি। কিন্তু তার কোনো প্রভাব নির্বাচনে পার্টির পক্ষে আসেনি।

অনেক ক্ষেত্রে গণসংগঠনের স্বাধীন কর্মধারাই থাকছে না। পার্টির লেজুড়বৃত্তিতে পরিণত হচ্ছে। গণসংগঠনের গণচরিত্র থাকছে না। পার্টির নেতৃত্ব অপেক্ষা কর্তৃত্ব বেশি প্রকট। জনগণের মধ্যে পার্টির কাজ করার কৌশল আয়ত্ত করতে ব্যর্থতা অস্বস্তিকর। চটজলদি সমাধানের দিকেই ঝোঁক বেশি। অপরদিকে পার্টিসদস্যদেরও গণসংগঠনের সাধারণ সদস্যদের মতো অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করার ঝোঁকও প্রবল। Trade Union is the School of Communism—এই ধারণার চূড়ান্ত অবক্ষয় ঘটছে।

সংগঠিত শিল্প অথবা অসংগঠিত শিল্পে, শ্রমিকদের রাজনীতি সচেতন করে পার্টিতে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে ট্রেডইউনিয়নগুলির খুবই দুর্বলতা থেকে যাচ্ছে। শাসকশ্রেণির নীতির ফলে সংগঠিত শিল্প-শ্রমিকের সংখ্যা ক্রমাগত কমেছে, অসংগঠিত শ্রমিকের সংখ্যা বাড়ছে। এঁদের সংগঠিত করায় যথেষ্ট দুর্বলতা রয়েছে। দুর্বলতা রয়েছে পার্টি গড়ে তোলার।

কৃষক মহিলা ছাত্র—সব ক্ষেত্রেই একই ধরনের দুর্বলতা। রাজস্থানে চাষের জলের দাবিতে, বিদ্যুতের মাসুল বৃদ্ধির বিরুদ্ধে ব্যাপক কৃষক আন্দোলন হয়। কিন্তু তার প্রভাব ভোটে বামপন্থীদের প্রতি সমর্থনে প্রতিফলিত হয়নি। হিমাচল প্রদেশে ছাত্র আন্দোলনে ধারাবাহিক সাফল্য সত্ত্বেও নির্বাচনে তার প্রভাব পড়ছে না।

বহু আলোচনা সত্ত্বেও গণসংগঠনসমূহের সদস্যদের রাজনীতি-সচেতন করার প্রয়াস দুর্বল। গণসংগঠনের নেতৃত্বের

মধ্যেও প্রয়োজনীয়তার উপলব্ধিতে ঘাটতি থাকছে।

আড়াই দশক ধরে চলা উদারনীতির ফলে শ্রেণিগুলির মধ্যে বিভাজন ও স্তরভেদ তৈরি হয়েছে। ভোগবাদ ও বিনোদন, আত্মকেন্দ্রিকতা ও দায়বদ্ধহীনতা যুক্তিবাদকে পেছনের দিকে ঠেলে দিয়েছে। বিষয়গুলি শ্রেণিবিন্যাসে, মননশীলতায় কতখানি ক্ষত তৈরি করেছে গভীরভাবে বুঝে ওঠা যায়নি। ফলে অনেক শ্লোগানই কার্যকারিতা হারিয়েছে। সামগ্রিকভাবে চর্চা ও বিশ্লেষণ প্রয়োজন। পরিস্থিতির উপযোগী নতুন নতুন শ্লোগান তৈরি করা প্রয়োজন—যা সমাজের সর্বস্তরের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে।

|| ৩ ||

পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থীদের অবস্থানের অবনতি ঘটেছে। ভোটের প্রাপ্ত হার অনুযায়ী বামফ্রন্ট পেয়েছে ২৯.৬১ শতাংশ। তৃণমূল পেয়েছে ৩৯.৩৬ শতাংশ, কংগ্রেস ৯.৫৮ শতাংশ এবং বিজেপি পেয়েছে ১৬.৮৪ শতাংশ। এই হিসাব যদি জনমতের প্রকৃত প্রতিফলন বলে ধরে নেওয়া হয় তাহলেও তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ৬১ শতাংশ মানুষ ভোট দিয়েছেন।

বামফ্রন্টের এত খারাপ ফলের অন্যতম কারণ যদিও রিগিং ও সন্ত্রাস কিন্তু একমাত্র কারণ নয়। পরিকল্পিত রিগিং ও সর্বত্র সন্ত্রাসের মাধ্যমে অন্তত ৭ থেকে ১০ শতাংশ ভোট বেশি পেয়েছে। তা না হলে পশ্চিমবঙ্গে ফলাফল অন্যরকম হতে পারতো। স্বীকার করাই কর্তব্য যে বামপন্থীরা তাদের হারানো জমি পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়নি, তৃণমূলের ৩ বছরের অপশাসন সত্ত্বেও। অনেক বিষয় এই সময়ে সামনে এসেছে যা নিয়ে ধারাবাহিক আন্দোলন সংগঠিত করার সুযোগ ছিল কিন্তু করা যায়নি। সদিচ্ছা থাকলেও একাধিক কারণে বাস্তবতা ছিল না। সমাজের প্রায় সবস্তরের আক্রান্ত মানুষের আস্থা পুনরুদ্ধার করা যায়নি।

|| ৪ ||

ভারতে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অগ্রবর্তী ঘাঁটি (advanced outpost) পশ্চিমবঙ্গের উপর শাসকশ্রেণির এই ভয়ানক আক্রমণের কারণ কী? কমিউনিস্টরা ৩৪ বছরের বামফ্রন্ট সরকারকে ব্যবহার করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে যায়নি। পুঁজিবাদেরই সেবা করেছে। বিকল্প চিন্তাকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছে মাত্র।

উইকিলিক্‌সে যে তথ্য ফাঁস হয়েছে তার মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণ একটি হল ভারতে নিযুক্ত মার্কিন কূটনীতিকরা মার্কিন প্রশাসকদের বার্তা দিয়েছে—বামপন্থীদের বিরুদ্ধে তৃণমূল নেত্রীকে ‘কালটিভেট’ করা যেতে পারে। কারণ ইতিমধ্যেই উগ্র কমিউনিস্ট বিদ্রোহী, হিংস্র নৈরাজ্যবাদী স্থানীয় দলটি শাসকশ্রেণি ও বুর্জোয়া সংবাদমাধ্যমে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিল। পশ্চিমবঙ্গে জাতীয় দল হিসেবে বিজেপি-র অস্তিত্ব প্রায় ছিলই না। কংগ্রেসকে দিয়ে হবে না। অতীতের কার্যকলাপে জনমানসে তাদের ভাবমূর্তি বলে কিছু নেই। সুতরাং দেশি-বিদেশি সমস্ত প্রতিক্রিয়ার শক্তি তৃণমূল কংগ্রেসের পেছনে সমবেত ছিল পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী আন্দোলনের অন্যতম শক্তিশালী ঘাঁটিকে আক্রমণ করার জন্য। দেশে বামপন্থাকে অপ্রাসঙ্গিক করার যে চক্রান্ত চলছে, পশ্চিমবঙ্গকে আক্রমণের লক্ষ্যস্থল করা সেই উদ্দেশ্যেই।

আংশিক ভূমি সংস্কার : বামফ্রন্ট সরকার ৩৪ বছরের সময়কালে যে কাজগুলি করার চেষ্টা করেছে তার মধ্যে অন্যতম হল আংশিক ভূমি সংস্কার। কংগ্রেসের সিলিং আইনই কার্যকর করার চেষ্টা করা হয়েছে। পরবর্তীকালে সামান্য কিছু সংশোধন করা হয়। পশ্চিমবঙ্গে

যে সংস্কার তা আমূল ভূমি-সংস্কার নয়। কিন্তু যেটুকু হয়েছে তার তাৎপর্য গভীর। সব ভূমিহীন কৃষক যেমন জমি পায়নি, আবার যারা সামান্য জমি পেয়েছে তা দিয়ে তার দারিদ্র্য দূর হয়নি। গ্রামাঞ্চলের লক্ষ লক্ষ গরিব কৃষক, ভূমিহীন কৃষক দরিদ্র, জাতপাত, নিরক্ষতার জগদ্বল পাথরকে সরিয়ে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মূল শ্রোতে সামিল হয়েছে। লেনিন বলেছিলেন, কৃষকের মুক্তির সমস্যা আসলে শ্রমিকশ্রেণির মিত্র সংগ্রহের সমস্যা। শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী গড়ে তোলার চেষ্টা হয়েছে। শ্রমিকশ্রেণি তার মিত্র সংগ্রহ করবে আর প্রতিক্রিয়ার শক্তি মধুমাখিয়ে চাটবে—এরকম ভাবাটা শ্রান্তি।

জনগণের ক্ষমতায়ন : বামফ্রন্ট সরকারের ৩৪ বছরে যে কাজটি করতে পেরেছে তা হল জনগণের ক্ষমতায়ন। বৃহৎ বুর্জোয়া পরিচালিত বুর্জোয়া রাষ্ট্রে যেখানে পুঁজির কেন্দ্রীভবনের সাথে ক্ষমতারও দ্রুত কেন্দ্রীকরণ ঘটছে সেই পরিস্থিতিতে একটি অঙ্গরাজ্যে সীমাবদ্ধ ক্ষমতা নিয়ে বামপন্থী সরকার সাফল্যের সাথে জনগণের ক্ষমতায়ন করতে সক্ষম হল অনেক প্রতিকূলতা অতিক্রম করে। ত্রিস্তর পঞ্চায়েতি ব্যবস্থার সাফল্য নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ঘটল, জনগণই যার পরিচালক। গণতন্ত্র শুধু প্রসারিত হল তাই নয়, জনগণের অংশগ্রহণকারী গণতন্ত্রে (participatory democracy) পরিণত হল। পরবর্তী পরিস্থিতিতে পঞ্চায়েতের উপর আক্রমণ শুরু হয়েছে। ক্ষমতা আবার আমলাদের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদী, একচেটিয়া পুঁজি, সামন্তপ্রভুরা সবাই গণতন্ত্রকে ভয়ও করে আবার ঘৃণাও করে। বামফ্রন্ট সরকার এই সব শ্রেণিস্বার্থ বিরোধী কাজ করবে আর প্রতিক্রিয়া শক্তি বদলা নেবে না, এরকম ভাবা অবাস্তব।

শ্রমিক-মালিক বিরোধে পুলিশ নিরপেক্ষ থাকবে : চৌত্রিশ বছরে বামফ্রন্ট সরকার রাষ্ট্রের একটি দমনমূলক বাহুকে কম আক্রমণাত্মক করতে বলেছিল—পুলিশ রাষ্ট্রযন্ত্রের অঙ্গ। মালিকদেরই রাষ্ট্র। অথচ বলা হল পুলিশ নিরপেক্ষ থাকবে। চৌত্রিশ বছর ধরে পূর্ণ না হলেও অনেকাংশেই সফল হয়েছিল পুলিশকে নিরপেক্ষ রাখতে। পটপরিবর্তনের পর পুলিশের ভূমিকা আমরা দেখতে পাচ্ছি। শাসক পাটির হাতে আক্রান্তদেরই জমিন-অযোগ্য মামলায় জড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। ধর্মণের অভিযোগও নেওয়া হয় না। বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বাসস্থান থেকে উৎখাত করা হচ্ছে। চাকরিতে যেতে দেওয়া হচ্ছে না। নির্বাচনে পুলিশের ভূমিকা আমরা সবাই দেখেছি।

ধর্মীয় মৌলবাদের বিরুদ্ধে : ধর্মীয় মৌলবাদের বিরুদ্ধে কমিউনিস্টরা আদর্শগত দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করে। মনে করে যে ধর্মকে রাজনীতির সাথে যুক্ত করা গর্হিত অপরাধ। ধর্মনিরপেক্ষতা বিস্তৃত হলে দেশের সংহতি ও অস্তিত্বই বিপন্ন হবে। সংখ্যালঘুর স্বার্থরক্ষা করা কমিউনিস্টদের ‘অ্যাসিড টেস্ট’। সংখ্যালঘু, ধর্মীয় অথবা ভাষাগত, জাতিসত্তাগত অথবা রাজনৈতিক সব ধনের সংখ্যালঘুর বক্তব্যের প্রতি মর্যাদা দেওয়ার নামই গণতন্ত্র। ভারতে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে নীতিনিষ্ঠ অবস্থান বামপন্থীরাই গ্রহণ করে এসেছে। ২০১৪ লোকসভা নির্বাচনে যে উগ্রহিন্দুত্ববাদী দল ক্ষমতায় এলো, বাবারি মসজিদ ভাঙার পর সেই দলকে জ্যোতি বসু বলেছিলেন—‘বর্বর’। কংগ্রেস চিরকালই ভোট জেতার স্বার্থে নরম সাম্প্রদায়িকতা করেছে। পশ্চিমবঙ্গে বর্তমান শাসকদলের নেত্রী বিভিন্ন রকমের অবাঞ্ছিত আচরণ করে চলেছেন শুধুমাত্র ভোট পাওয়ার জন্য।

বামপন্থীদের সাম্প্রদায়িকতার বিষয়ে নীতিনিষ্ঠ অবস্থান গ্রহণ

শাসকশ্রেণির পছন্দ নয়। পুঁজিবাদের গর্ভসজ্জাত সংখ্যাগুরু ধর্মীয় মৌলবাদ এবং সংখ্যালঘুর ধর্মীয় মৌলবাদ উভয়ই কমিউনিস্টদের আক্রমণ করে।

জাতিসত্তার মর্যাদা বৈচিত্র্যময় ভারতে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। মর্যাদা বিয়িত হলে সংহতি বিনষ্ট হয়। বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতা প্রকট হয়। হিন্দু হিন্দু হিন্দুস্থান—শ্লোগানে দেশকে ঐক্যবদ্ধ রাখা যায় না।

স্বাধীনতার পর ভাষার ভিত্তিতে রাজ্যগুলি পুনর্গঠিত হয়। কিন্তু যত পুঁজির একচেটিয়াভবন ঘটতে থাকে, রাজ্যের ক্ষমতা হ্রাস করে সব ক্ষমতা দিল্লিতে কেন্দ্রীভূত হতে থাকে। রাজ্যের হাতে অধিক ক্ষমতার দাবিতে অ-কংগ্রেসি মুখ্যমন্ত্রীদের অনেকগুলি মিটিং ইত্যাদি জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত হয়। দেশব্যাপী জনমত গড়ে ওঠে। সারকারিয়া কমিশন গঠন করতে বাধ্য হয় কেন্দ্রীয় সরকার। রাজ্যগুলির সাথে আয়-বন্টনের জন্য অর্থ কমিশন গঠিত হয়। বামফ্রন্ট সরকারই সম্পদের সুযম বন্টনের পক্ষে ধারাবাহিক আন্দোলন করেছে। তখন বা এখন যারা রাজ্য সরকার চালাচ্ছে তারা সহযোগিতা করেনি। বিরোধিতা করেছে। এখন বামপন্থীদের দেখানো পথকেই মান্যতা দিয়ে অশালীন চিংকার চোঁচামেচি করেছে। সম্পদের সুযম বন্টনের দাবি কখনোই বৃহৎ পুঁজিনিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্র মেনে নেয় না। তাই বামফ্রন্ট সরকার তাদের না-পসন্দ।

বামফ্রন্ট সরকারের শিল্পাভাবনা : একচেটিয়া পুঁজি পরিচালিত রাষ্ট্রে শিল্প স্থাপনে পুঁজিবাদীদের রাজনৈতিক দলগুলি বাধা সৃষ্টি করে এমন নিজের গোটা পৃথিবীতে নেই। শিল্প শ্রমিকরা স্থাপন করে না, পুঁজিপতিরাই করে। পশ্চিমবঙ্গে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম কাণ্ডে এ-রকম অভাবনীয় বিষয়ই ঘটেছে। নৈরাজ্যের হিংস শক্তি তৃণমূল কংগ্রেসের সাথে হাত মিলিয়েছিল বৃহৎপুঁজির দুই দল—কংগ্রেস ও বিজেপি, সঙ্গে অতিবাম মাওবাদীরা এবং তথাকথিত সুশীলসমাজ ও কর্পোরেট নিয়ন্ত্রিত সমস্ত সংবাদমাধ্যম।

আপরাধ কী? পশ্চিমবঙ্গে ভূমি-সংস্কার ও পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সাফল্যের ভিত্তির উপর শিল্পায়ন ঘটানোর উদ্যোগ। তখন কেন্দ্রীয় সরকারের ‘লুক ইন্স’ নীতি ঘোষিত হয়েছিল। সিঙ্গুরে প্রায় সমাপ্ত গাড়ির কারখানা নৈরাজ্য সৃষ্টি করে বন্ধ করে দেওয়া হলো। কোথাও কোনো সমালোচনা নেই। বামবিরোধী সব শক্তি প্রতিক্রিয়ার শক্তি উল্লাসে আটখানা হল। নন্দীগ্রামে কেমিক্যাল হাব তৈরি কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচনায় আনামাত্র জমি অধিগ্রহণের কোনো উদ্যোগ নেওয়ার আগেই অবরুদ্ধ করে দেওয়া হল। কোনো জমি অধিগ্রহণ করা হবে না ঘোষণা সত্ত্বেও দিনের পর দিন অবরুদ্ধ করে রাখা হল।

বৃহৎ পুঁজি পরিচালিত বুর্জোয়া-জমিদার রাষ্ট্রে একটি অঞ্চলকে মুক্তাঞ্চল করে রাখা হল দীর্ঘদিন। মাওবাদ দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার প্রধান বিপদ বলে প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন। সেই মাওবাদীদের সাথে নিয়ে সমস্ত প্রতিক্রিয়ার শক্তি নন্দীগ্রামকে মুক্তাঞ্চল করেছে। রাষ্ট্রের কোনো প্রতিনিধি সেখানে ঢুকতে পারবে না। নৈরাজ্যের শক্তি ছাড়া—তা সে তৃণমূলী সুশীল সমাজের লোক হোক অথবা তৃণমূলের নেতারা হোক। এ হেন অবস্থায় যখন মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নেতা-কর্মীরা খুন হচ্ছে প্রতিদিন, এলাকা থেকে বিতাড়িত হচ্ছেন শত শত সমর্থক, রায়তি জমির ধান, পুকুরের মাছ লুণ্ঠ হচ্ছে বন্দুকের ডগায়—সেই আক্রান্ত মানুষকেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চিদাম্বরম আখ্যা দিলেন ‘হার্মাদ’। নন্দীগ্রামে গুলিতে কিছু মানুষের মৃত্যুতে সরকারের প্রধানের হাড় হিম হয়ে যায়। এক কিশোরীকে ধর্ষণ করে গাছে ঝুলিয়ে দিলে হাড় হিম হয় না। মৃত্যু সব সময়ই দুঃখজনক।

বামফ্রন্ট সরকার সিবিআই-অনুসন্ধানের নির্দেশ দিয়েছিল। যেসব পুলিশ অফিসার এই ঘটনার সাথে যুক্ত ছিল এবং যে ডেপুটি

ম্যাজিস্ট্রেট গুলি চালানোর আদেশ দিয়েছিলেন—তাদের কাউকেই সিবিআই-এর সামনে হাজির হতে দেননি বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী। আসল সত্য ফাঁস হয়ে যাওয়ার ভয়ে? চিত্রনাট্য খুবই সুগঠিত।

বামফ্রন্ট সরকারের শিল্পাভাবনা ছিল সঠিক এবং বৈজ্ঞানিক। প্রথমত, ভূমি-সংস্কারের ফলে জমির কেন্দ্রীভবন ভেঙে গিয়েছে। অন্যান্য রাজ্যের মতো বৃহৎ জমির মালিক আর নেই বললেই চলে। বিকেন্দ্রীকৃত জমি, পঞ্চায়েত ব্যবস্থা এবং বামফ্রন্ট সরকারের কৃষকদরদি ভূমিকা ও কৃষকের নিজের জমিতে চাষ করার আনন্দ ও উদ্যোগে কৃষিতে অকল্পনীয় উন্নতি হয়। খাদ্যে ঘাটতি রাজ্য উদ্ধৃত রাজ্যে পরিণত হয়। দেশে ধান উৎপাদনে প্রথম, সবজি উৎপাদনে দ্বিতীয়, মাছ উৎপাদনে প্রথম, পাট উৎপাদনে প্রথম হয়। পশুপালন সহ কৃষি উৎপাদনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রভূত উন্নতি হয়। সরকারি প্রচেষ্টায় বিবিধ ব্যবস্থায় সেচসেবিত জমির পরিমাণ বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। একফসলি জমি দো-ফসলি কোথাও কোথাও তিন-ফসলি জমিতে পরিণত হয়। পশ্চিমবঙ্গ চাষনীতির রাজ্যে পরিণত হয়।

দ্বিতীয়ত, কৃষির এই অগ্রগতিকের আরও উন্নত ধারাবাহিক রাখতে গেলে জমির আর বিভাজন হবে অবৈজ্ঞানিক। ভূমি-সংস্কার নয়, প্রাকৃতিক কারণেই জমির বিভাজন বাড়বে। ক্রমাগত বিভাজন বন্ধ করার জন্যই প্রয়োজন শিল্পায়ন।

তৃতীয়ত, ইতিমধ্যেই কৃষিতে পুঁজির অনুপ্রবেশ ঘটেছে। কৃষিতে যন্ত্রীকরণ যথেষ্টই শুরু হয়েছে। এই যন্ত্রীকরণ ভবিষ্যতে ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হবে। কৃষিতে এখনই উদ্বৃত্ত মানুষ। ভবিষ্যতে উদ্বৃত্ত মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। এই উদ্বৃত্ত মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা সরকারের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। শিল্প ব্যতীত আর কোনো বিকল্প নেই। শহর-গ্রামের লক্ষ লক্ষ যুবকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতেই হবে। না হলে কর্মহীন হতাশাগ্রস্ত যুবকেরা লুপ্তপনে পরিণত হবে। যার দগদগে লক্ষণ আমরা বাংলায় দেখতে পাচ্ছি। সাম্রাজ্যবাদীরা, প্রতিক্রিয়ার শক্তিগুলি এদেরকেই ব্যবহার করবে গণতান্ত্রিক আন্দোলন ধ্বংস করতে। বাংলায় শত শত বর্ষ ধরে গড়ে ওঠা সংস্কৃতি মানবিক মূল্যবোধ—সব আক্রান্ত হবে। ইতিমধ্যেই তার লক্ষণ শুরু হয়েছে। সেই জন্যই বামফ্রন্ট সরকারের শিল্পায়নের কর্মসূচি সঠিক ছিল।

শিক্ষাক্ষেত্রে : শিক্ষাক্ষেত্রে বামফ্রন্ট সরকারের সাফল্যও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির গাত্রদাহের কারণ হল। একদিকে সর্বজনীন শিক্ষার প্রবর্তন, উচ্চশিক্ষার প্রসার ও মানোন্নয়ন ঘটে। প্রাথমিক বিদ্যালয়হীন সমস্ত গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন, ষষ্ঠশ্রেণি পর্যন্ত সব ছাত্রছাত্রীকে পুস্তক প্রদান, তাদের জন্য পোষাক, ছাত্রীদের জন্য সাইকেল প্রদান এবং দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক করা এবং সাক্ষরতা-আন্দোলন শিক্ষা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করলো। —একটি আন্দোলনে পরিণত হল। হাজার হাজার বছর ধরে যাদের শিক্ষার অঙ্গনে প্রবেশাধিকার ছিল না—সেই বাউরি-বাগদি-দুলে-রইদাস-সাঁওতাল ঘরের ছেলেমেয়েরা দলে দলে স্কুলগুলিতে লেখাপড়া করতে শুরু করল। সব প্রথম প্রজন্মের ছাত্র। বর্ণাশ্রম ধর্মের কারণে শিক্ষার অধিকার থেকে এরা বঞ্চিত ছিল। অর্গল খুলে যাবার ফল পাওয়া গিয়েছে হাতেনাতে। ১৯৭৭ সালে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দিয়েছিল ৩ লক্ষের কিছু বেশি ছাত্রছাত্রী। ২০১১ সালে সেখানে পরীক্ষা দিয়েছে ১১ লক্ষের বেশি ছাত্রছাত্রী। এইসব ছাত্রছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার জন্য নতুন নতুন কলেজ স্থাপিত হয়েছে, স্থাপিত হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ও। যদিও এইসব বিশ্ববিদ্যালয়গুলি তাদের সময়েই স্থাপিত বলে বর্তমান তৃণমূল সরকার মিথ্যাচার করে। উৎকর্ষের উপরও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং গণতন্ত্রীকরণ করা হয়েছিল সমস্ত শিক্ষাব্যবস্থাকে। শিক্ষা ব্যবস্থায় সত্তরের দশকের

অরাজকতাকে কাটিয়ে উঠে সুস্থ স্বাভাবিক এবং শৃঙ্খলায় আনা সম্ভব হয়েছিল। শিক্ষাঙ্গনে বর্তমান পরিস্থিতি ভয়াবহ। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরা যেন মাস্টার রোলে নিযুক্ত। অধ্যক্ষরা মার খাচ্ছেন। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্কুল—সর্বত্র গণতান্ত্রিক কাঠামোকে ভেঙে দেওয়া হয়েছে। টাকা নিয়ে ছাত্র ভর্তি, সর্বত্র শাসকদলের দাঙ্গাগিরি, সর্বত্র নৈরাজ্য ব্যভিচার সন্ত্রাস, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে এবং বাইরে ছাত্রীদের ধর্ষণ নিয়মে পরিণত হচ্ছে। শিক্ষা ব্যবস্থাকে গভীর অন্ধকারের পথে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে যা আগামী প্রজন্মের পক্ষে খুবই বিপজ্জনক। অপরদিকে চলছে শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণের কর্মকাণ্ড। এলিটিস্ট এডুকেশনেই শুধুমাত্র রাষ্ট্রের গুরুত্ব। শিক্ষাক্ষেত্রে এই যাদের দৃষ্টিভঙ্গি—বামফ্রন্টের শিক্ষানীতি তাদের অপছন্দ হবে এতে আর বিচিত্র কী?

প্রান্তিক মানুষের সুরক্ষা : বামফ্রন্ট সরকারের আরও অনেক কর্মকাণ্ডের উল্লেখ করা যেতে পারে যাতে বিকল্প শ্রেণি-দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়েছে। প্রান্তিক মানুষের সামাজিক সুরক্ষা দেওয়া বামফ্রন্ট সরকারই শুরু করে। ক্ষেতমজুরদের ভবিষ্যনিধি প্রকল্প, নির্মাণ শ্রমিক, বিড়ি ও অন্যান্য পেশায় নিযুক্ত অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের নানা ধরনের সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পগুলি চালু করতে পেরেছিল। গ্রামের গরিবদের বাসস্থানের সমাধানের জন্য বাস্তু জমির পাট্টা, শহরের গরিব মানুষের বাসস্থানের সমাধানে শহরের খাস জমির ৯৯ বছরের লিজ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি হয়েছিল। এছাড়াও অনেক বিষয়ের উল্লেখকে দীর্ঘায়িত করা হল না। বর্তমান রাজ্য সরকার বিগত তিন বছরে প্রান্তিক মানুষের জন্য নতুন কোনো প্রকল্প গ্রহণ করার অবকাশ পায়নি। আর কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ১০০ দিনের কাজের প্রকল্প গুটিয়ে ফেলতে চাইছে।

|| ৫ ||

আমাদের দেশে বামপন্থাকে অপ্রাসঙ্গিক করার যে চক্রান্ত চলছে সেটা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদী তত্ত্ব অনুযায়ী সমস্ত ঘটনা প্রবাহের আনুপূর্বিক সম্পর্ক থাকতে বাধ্য। সোভিয়েত ইউনিয়ন সহ সমাজতান্ত্রিক শিবিরের সাময়িক বিপর্যয়ের পর শক্তির ভারসাম্য সাম্রাজ্যবাদের অনুকূলে চলে যায়। সম্পদ, কাঁচামালের উৎস এবং বাজার সাম্রাজ্যবাদের দখলে চলে যায়। সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি অধিকতর মুনাফার জন্য পৃথিবীময় দাপিয়ে বেড়াতে থাকে। হাজির করা হয় একমেরু বিশ্বের তত্ত্ব। নয়া উদারবাদকে হাতিয়ার করে সাম্রাজ্যবাদ লুণ্ঠনের জাল আরও বিস্তৃত ও দৃঢ় করেছে। আমাদের দেশে কর্পোরেট দুনিয়াও উদারবাদী অর্থনীতিকে হাতিয়ার করে সম্পদের পাহাড় তৈরি করেছে। এতসব সত্ত্বেও পুঁজিবাদ সুখে নেই। উদ্ভবের পর থেকে এত সংকটে কোনোদিন পড়েনি পুঁজিবাদ। উৎপাদনের উপকরণের নিরন্তর বিকাশের ফলে অতি অল্প শ্রমিক দিয়ে বিপুল পরিমাণ উৎপাদনই শুধু হচ্ছে তাই নয়, বৈচিত্র্য ও গুণে উৎকর্ষ লাভ করেছে। ভোগবাদী সমাজ তা লুফে নিচ্ছে। উদারবাদী অর্থনীতি সমাজের মধ্যবিত্ত অংশের কলেবর স্ফীত করলেও প্রান্তিক মানুষের সংখ্যা বিপুলভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে,—যাদের নির্দিষ্ট কোনো আয় নেই। কোনোমতে গ্রাসাচ্ছাদন করে, বিপুল পরিমাণ ভোগবস্তুর বাজারে ঢোকার ক্ষমতা নেই। ফলে বাজার ক্রমশ সঙ্কুচিত হচ্ছে। পুঁজিবাদের সংকট বাড়ছে। একদিকে সম্পদের কেন্দ্রীভবন, অপরদিকে বিপুল সংখ্যক প্রান্তিক মানুষ। পুঁজির সাথে শ্রমের দ্বন্দ্ব, সাম্রাজ্যবাদের সাথে তৃতীয় বিশ্বের জনগণের দ্বন্দ্ব, ভোগের সাথে ক্ষুধার দ্বন্দ্ব বাড়তে বাধ্য। এই দ্বন্দ্ব সমাধানের একমাত্র পথ তীব্র শ্রেণি-সংগ্রাম। সাম্রাজ্যবাদীরা এই সত্য বোঝে, তাই নব্বই-এর দশক থেকে যখন নয়া উদারীকরণের নীতি

চাপিয়ে দেওয়া হতে থাকল, একই সঙ্গে বাজারে একটি তত্ত্বও হাজির হল—তার নাম উত্তর আধুনিকতা।

উত্তর আধুনিকতার তত্ত্ব বলছে শ্রেণি বলে কিছু নেই, তাই শ্রেণিসংগ্রামেরও কোনো প্রয়োজন নেই। উপরিকাঠামোয় অবস্থানকারী নাগরিক সমাজের বুদ্ধিজীবীরা যেমন—শিল্পী, সাহিত্যিক, চিকিৎসক, সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ ইত্যাদি সমাজের অভ্যন্তরে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান করে দিতে পারে। তাদের মতামত নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে। পশ্চিমবঙ্গে সুশীল সমাজের ভূমিকা আমরা টের পেয়েছি। প্রতিভা কুশলতা শুধুমাত্র কায়িক শ্রম না করা মানুষেরই আছে। গহন ধরিত্রীর বুকে ঠোঁকর মেরে কয়লা তুলে আনে যারা, যারা তাপ ও আলোর যোগান দেয়, তাদের প্রতিভা ও কুশলতা নেই। কুশলতা নেই সেইসব মানুষের যারা দলা দলা মাটি পাথরকে গলিয়ে হাজার ডিগ্রিরও বেশি তাপে বাকবাক ইস্পাতে পরিণত করে, যারা খড়-মাটি-কাদা দিয়ে মনমুগ্ধকর সব মূর্তি তৈরি করে, যারা অসীম ধৈর্যে দৃষ্টিনন্দন অলংকার তৈরি করে, অথবা যারা জলকাদায় ছন্দোবদ্ধভাবে কষ্টকর ধান রোয়ার কাজ করে—তাদের প্রতিভা বা কুশলতা নেই, কারণ তারা কায়িক পরিশ্রম করে। আসলে শ্রমকে এরা ঘৃণা করতে শেখায়।

আর্থিক সংকট যত গভীরতর হচ্ছে, সমস্যা-জর্জরিত মানুষকে বোঝানো হচ্ছে আদিম কৌমগোষ্ঠীতে ভাগ হয়ে যাও। কেননা তোমার দুঃখের জন্য পুঁজিবাদ দায়ী নয়, দায়ী অপর কোনো গোষ্ঠীর মানুষ, যে সুযোগে ভাগ বসেছে। পৃথিবী জুড়ে এখন সত্তার রাজনীতির নামে শোষিত মানুষেরা পরস্পর বিবদমান। আফ্রিকার কিছু দেশ ভাগই হয়ে গেল রক্তাক্ত সংঘর্ষের ফলে। আমাদের দেশেও এর প্রবল প্রভাব। মহারাষ্ট্রে বিহারিরা মার খাচ্ছে। রেলে চাকরির ইন্টারভিউ দিতে গিয়ে বাঙালিরা মার খাচ্ছে। বোড়ো-অসমিয়া অথবা বাঙালি গোষ্ঠীর মধ্যে উত্তরপূর্বের সব রাজ্যেই বিবাদ চলছে। হিন্দিবলয়ে শ্রেণি-শোষণের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম নয়, জাতপাতের ভিত্তিতে জনমত বিভাজিত হচ্ছে। ‘আইডেনটিটি পলিটিক্স’-এ পশ্চিমবঙ্গ বাদ যাচ্ছে না। পাহাড়, কামতাপুরি, খেঁটার কোচবিহার প্রভৃতি তারই লক্ষণ। ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ক্ষেত্রে মৌলবাদী চিন্তা ও সত্তার রাজনীতি মিলিত আকার নিচ্ছে।

পুঁজিবাদী শোষণের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ গণপ্রতিরোধ যাতে না গড়ে ওঠে, সেজন্যই প্রতিক্রিয়ার এই প্রচেষ্টা।

এক মেরুর বিশ্বতত্ত্ব খারিজ করে বহুমেরুর বিশ্ব ইতিমধ্যেই দৃশ্যমান। যেমন BRICS (ব্রাজিল, রাশিয়া, ইন্ডিয়া, চীন ও দক্ষিণ আফ্রিকা), যারা আই.এম.এফ.-এর বিকল্প একটি ব্যাঙ্ক গঠন করার উদ্যোগ নিয়েছে। দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলিতে নির্বাচনে মার্কিন তাবদার দলগুলি পরাজিত হচ্ছে, উদারবাদী অর্থনীতির বিকল্প অর্থনীতি নিয়ে চলার চেষ্টা করছে। সমাজতান্ত্রিক চীনের অর্থনীতি সাম্রাজ্যবাদীদের চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে। ইউরোপের উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে উদারবাদী অর্থনীতির বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বে ব্যাপক ধর্মঘটগুলি সংগঠিত হচ্ছে। খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ‘তোমরা এক, আমরা নিরানব্বই’ ধ্বনি তুলে ‘অকুপাই ওয়াল স্ট্রিট’ আন্দোলন অনেকগুলি শহরে বিস্তৃত হয়েছিল।

আমাদের দেশেও আর্থিক সংকট ঘনীভূত হচ্ছে। ১০ বছর ধরে উদারীকরণের নীতি অনুসরণ করতে গিয়ে কংগ্রেস জনবিচ্ছিন্ন হয়েছে। বিজেপি মাত্র ৩৫ শতাংশ জনসমর্থন নিয়ে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েছে। ক্ষমতায় এসেই জনস্বার্থ-বিরোধী পদক্ষেপগুলি নিতে শুরু করেছে। ফলে জনবিচ্ছিন্নতা বাড়বে এবং মানুষের প্রতিরোধ আন্দোলনও বাড়বে। সেক্ষেত্রে ওরা সাম্প্রদায়িক মেরুকের রাস্তাতেই যাবে। তার বিরুদ্ধেও ব্যাপক মঞ্চ গড়ে তুলতে হবে।

সম্ভ্রাস, রিগিং সত্ত্বেও ৬১ শতাংশ মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে। তৃণমূলের লুপ্তনরাজের বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হচ্ছে। মিথ্যা ও প্রতারণা এবং ভীতি প্রদর্শনের দ্বারা এই ক্ষোভকে বেশি দিন দমিয়ে রাখা যাবে না। নতুন ও জটিল পরিস্থিতিতে আত্মবিশ্বাস ও সাহসের সাথে, মতাদর্শে অবিচল থেকে বুদ্ধিমত্তার সাথে আশু এবং ধারাবাহিক কাজ করে যেতে হবে।

আশু কাজগুলি :

১. জনগণের সাথে সিপিআই(এম)-এর বিচ্ছিন্নতা মাথায় রেখে গণকাজ্যক্রম বাড়াতে হবে। মানুষের সাথে সম্পর্ক তৈরি করতে গেলে স্থানীয় বিষয়ে আদায়যোগ্য দাবিতে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। পানীয় জলের জন্য, মশা মারার জন্য (এখন এনসেফেলাইটিস, ডেঙ্গু মহামারীর আকার নিচ্ছে), নর্দমা পরিষ্কার, রাস্তার আলো, রাস্তা মেরামতি, স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অব্যবস্থা, ১০০ দিনের কাজের দাবি বকেয়া মজুরি প্রদান, বার্ষিকভাতা, বিধবা ভাতা নিয়মিত প্রদান, বিদ্যুৎ সংযোগ ও বিদ্যুতের দাম ইত্যাদি অসংখ্য বিষয় আছে যা নিয়ে মানুষের কাছে যাওয়া যায়। প্রয়োজনে বাগা ছাড়াই আন্দোলন গড়ে তোলা যায়।

২. অসংগঠিত শিল্প শ্রমিকদের সর্বনিম্ন মজুরি ১০ হাজার টাকার দাবিতে, সমকাজে সমবেতন, নিয়োগপত্র, বামফ্রন্ট সরকার প্রবর্তিত সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পগুলি যথাযথ প্রয়োগ এবং অন্যান্য অংশের অসংগঠিত শিল্প শ্রমিকদের ক্ষেত্রে সুযোগগুলি প্রসারিত করার দাবিতে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। কয়েক বছর আগে কেন্দ্রীয় ট্রেডইউনিয়নগুলির ডাকে দেশব্যাপী অসংগঠিত শিল্পশ্রমিকদের ধর্মঘট প্রায় সাধারণ ধর্মঘটের চেহারা নিয়েছিল। পরবর্তীকালে প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত দাবিগুলির ন্যায্যতা স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু কিছু করেননি। ট্রেড ইউনিয়নগুলিও কিছু করেনি।

৩. ব্যাঙ্ক ও বিমা শিল্পে বিদেশি পুঁজির অংশীদারিত্ব বাড়ানো, লাভজনক রাষ্ট্রায়ত্ত্ব শিল্পের শেয়ার বিক্রি করে দেওয়া, রেল-প্রতিরক্ষা, টেলিযোগাযোগে প্রত্যক্ষ বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগ, খুচরো পণ্যে প্রত্যক্ষ বিদেশি পুঁজির অনুপ্রবেশ ইত্যাদির বিরুদ্ধে প্রচার ও আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। শ্রম-আইন মালিক পক্ষকে আরও সুবিধা দেওয়ার লক্ষ্যে সংশোধন করা হচ্ছে। এর প্রতিরোধ করতে হবে।

৪. রেলের ভাড়া ও মাসুল বৃদ্ধির বিরুদ্ধে, প্রতি মাসে পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি ও খাদ্যদ্রব্য সহ প্রতিটি নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রির আকাশছোঁয়া দামের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে।

৫. মূল্য নিয়ন্ত্রণ করতে কৃষিপণ্যের আগাম বাণিজ্য বন্ধ করতে হবে। সার সহ অন্যান্য কৃষি-উপকরণের উপর ছাঁটাই চলবে না।

৬. এ-বারের বাজেট আরও বেশি গরিব-বিরোধী। ১০০ দিনের কাজের প্রকল্প তুলে দেওয়ার চক্রান্ত হচ্ছে। কৃষি ও গ্রামোন্নয়নে ব্যাপক ছাঁটাই-এর প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। প্রচারের আলোয় এনে ব্যাপক জনমত গড়ে তোলা একান্ত প্রয়োজন।

৭. সাম্প্রদায়িক বিষয়কে এগিয়ে নিয়ে যাবার যে-কোনো প্রচেষ্টা, সাম্প্রদায়িক শক্তির তৎপরতা মোকাবিলায় পার্টিকে সদা সতর্ক থাকতে হবে এবং দ্রুত কর্মসূচি নিতে হবে। সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী এই কর্তব্য পালনে ব্যাপকতর ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক শক্তিকে সমবেত করার লক্ষ্যে কাজ করতে হবে।

৮. বাম-এক্যাকে শক্তিশালী করতে হবে। বামপন্থী মনোভাবাপন্ন গণসংগঠনগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে হবে। যৌথ আন্দোলন গড়ে তোলার উপর গুরুত্ব দিতে হবে।

৯. বামপন্থী গণতান্ত্রিক সুস্থ এবং মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডকে প্রসারিত করতে হবে। প্রয়োজনে উন্নত কৃৎকৌশলও ব্যবহার করতে হবে। বাম বুদ্ধিজীবী ও প্রগতিশীল ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়াতে হবে, সেতুবন্ধ রচনা করতে হবে।

১০. পার্টির মুখ্যপেক্ষী না থেকে গণসংগঠনগুলিকে নিজস্ব উদ্যোগ, নিজস্ব কর্মকাণ্ড বাড়াতে হবে। শ্রমজীবী মানুষের সব অংশের সমস্যাকে অনুধাবন করতে হবে এবং দাবিসনদে অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করতে হবে।

১১. প্রচারের গতানুগতিকতার অবসান ঘটাতে হবে। নতুনত্ব আনতে হবে। উদারীকরণের প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যেও স্তরভেদ বেড়েছে। স্বভাবতই দাবিদাওয়ার ভিন্নতা এসেছে। প্রচারে এই সব উপাদানগুলি মাথায় রাখতে হবে।

১২. বিভিন্ন আন্দোলন, নির্বাচনী সংগ্রামগুলির মধ্য দিয়ে বহু নতুন নতুন কর্মী এসেছে। এই কর্মীদের দ্রুত মার্কসবাদের প্রাথমিক জ্ঞানে সমৃদ্ধ করে পার্টি ও গণসংগঠনগুলির অভ্যন্তরে নিয়ে আসতে হবে। আবার দেখা যাবে অনেক পুরনো কর্মী পশ্চিমবঙ্গের সম্ভ্রাসমূলক পরিস্থিতিজনিত কারণে ভীত, তাঁদেরকে আপাতত পার্টির বন্ধু হিসেবে থাকার পরামর্শ দিতে হবে।

১৩. ত্রুটি সংশোধনের কাজ ধারাবাহিক ভাবে চালিয়ে যেতে হবে। এবং একই সঙ্গে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের অনুশীলন করে যেতে হবে। মতাদর্শগত ভিত্তি দৃঢ় না হলে শত্রুর বহুবিধ তীর আক্রমণের সময় মানসিক দুর্বলতা আসতেও পারে। সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

মনে রাখতে হবে আজকের সময়ে বামপন্থার কোনো বিকল্প নেই। শ্রমজীবী মানুষের পক্ষে মতাদর্শগতভাবে বামপন্থাই থাকে। শ্রেণিশোষণ থাকবে, শ্রেণিবিরোধ থাকবে না—তা হয় না।

আমরা এক কঠিন অন্ধকারময় পরিস্থিতিতে পথ হাঁটছি। আমাদের রাত্রির গভীর বৃন্ত থেকে ফুটন্ত সকাল ছিনিয়ে আনতেই হবে।

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

সমবায় আন্দোলন দীর্ঘজীবী হোক

বোরা-কণা উজিরহাটি মোগলমারি এস.কে.ইউ.এস. লি.

এলাকার কৃষকের সেবায় নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান

Sl. No. 195

With best compliments of

*A
Well Wisher*

Burnpur, Burdwan

Sl. No. 107

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

জয়-পরাজয়ে মুখ্য ভূমিকা ইচ্ছাশক্তির।
যে জয় চায় না সে জয়ী হয় না।

জনৈক শুভার্থী
ছোটদিঘারী

Sl. No. 108

আজকের পরিস্থিতি: শ্রমিকশ্রেণি ও মধ্যবিত্ত

আভাস রায়চৌধুরী

বামপন্থীরা এখন প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে পথ চলেছেন। দু-দশকের বেশি সময় আগে সোভিয়েত সমাজতন্ত্র ও পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় গোটা পৃথিবীর শোষণহীন সমাজপ্রত্যাশী জন অংশকে ভয়ঙ্করভাবে বিহ্বল করেছিল। আবার একই সাথে বিশ্বপুঁজিবাদী অর্থনীতি বিশ্বায়নের নামে ফাটকা পুঁজির চরিত্র লাভ করে সমাজ-অর্থনীতি-রাজনীতি ও সংস্কৃতির ভিত্তিকে আঘাত করেছে, পরিবর্তন করেছে, নতুন মূল্যবোধের নির্মাণ করেছে এবং করে চলেছে। বিগত শতকের নব্বইয়ের দশকে যখন একই সাথে এই ঘটনা দুটি ঘটছে তখন জন্মগ্রহণকারী শিশুরা আজ নবযৌবনের রোমাঞ্চিকতা ও উদ্যমে পরিপূর্ণ; জগৎকে দেখতে চায়, নতুন কিছু করতে চায়। এই যুব জনঅংশের চেতনা ও অভিজ্ঞতায় সোভিয়েত ও পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্রের বিজয় অনুপস্থিত; বিপরীতে বাইশ-তেইশ বছরে নয়া উদারনীতির লুটেরা আগ্রাসন, সেই অনুযায়ী চেতনা ও মূল্যবোধ নির্মাণের বৃন্তেই শেষব কৈশোর অতিক্রম করে নবযৌবনে উপস্থিত। ফাটকা পুঁজির অনিবার্য পরিণতিতে জীবনে সংকট ক্রমবর্ধমান, চেতনা নয়াউদারনীতির ছাঁচে ঢালা সুপারইন্ডিভিজুয়ালিজমে আচ্ছন্ন। সমাজতন্ত্রের উজ্জ্বল দিনগুলির অভিজ্ঞতা না থাকার কারণে আজকের সংকটের একমাত্র বিকল্পও যে সমাজতন্ত্র সে সম্পর্কেও প্রায় ধারণাহীন ও আস্থাহীন এই যুবজনঅংশের এক উল্লেখযোগ্য অংশ। শুধু যুবজনঅংশই নয়, সমাজে অন্যান্য প্রৌঢ় ও প্রবীণ জনঅংশেরও এই চেতনাধূসরতা বিদ্যমান। আবার বিপরীত দিকে যারা মনে করেন সমাজে মানুষে মানুষে পার্থক্য, শোষণ স্বাভাবিক এবং সমাজতন্ত্র বা শ্রমজীবী জনতার শাসন এখন অবাস্তব তারা বিশ্বব্যাপী বর্তমান অবস্থাকেই স্বাভাবিক, স্থায়ী ও একমাত্র বলে মনে করেন এবং সমাজতন্ত্র প্রত্যাশীদের যন্ত্রণা ও প্রতিকূলতায় উৎফুল্লবোধ করেন। এই দু-দশকের বেশি সময়ব্যাপী প্রতিকূলতার মধ্যে এ-দেশ এ-রাজ্যে বামপন্থীরা কিন্তু উল্লেখযোগ্য নির্বাচনী সাফল্য অর্জন করেছেন। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে এ-রাজ্য এ-দেশ বামপন্থীদের নির্বাচনী বিপর্যয়ে পুরনো ও বর্তমান প্রজন্মের বামকর্মীদের আবার মানসিক প্রতিকূলতা ও অস্থিরতায় উপস্থিত করেছে এবং বামকর্মীদের এক অংশ নিরুৎসাহিত। কর্পোরেট পোষিত ও পরিচালিত মেনইস্ট্রিম মিডিয়ার বড় অংশ বামকর্মীদের নিরুৎসাহকে লালন ও বিকৃত করতে চক্চকে ঢঙে ও উপাদানে নিত্যানতুন পসরা সাজাচ্ছে।

ষোড়শ লোকসভা নির্বাচনের পর এ-রাজ্য এ-দেশের পরিস্থিতির গুণগত পরিবর্তন হয়েছে। বিগত বিধানসভা নির্বাচনে ‘পরিবর্তন’-এর প্রস্তাবে আস্থাশীল জনগণ আজ উপলব্ধি করছেন

তাঁরা প্রতারণিত। আজ প্রমাণিত যে মিডিয়ার প্রচারে জনদরদি, কিঞ্চিৎ বাম ফ্লেভারে পরিবেশিত তৃণমূল কংগ্রেস আসলে এ-রাজ্যে দেশের শাসকশ্রেণির স্বার্থেরই পাহারাদার। অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক—সর্বত্র লুপ্তপন্যাস এবং রাজনৈতিক ও প্রশাসনিকভাবে স্বৈরাচারের অভিমুখেই চলেছে শ্রীমতীর সরকার। দেশব্যাপী কংগ্রেসবিরোধী ক্ষোভের বাস্তবতায় দেশের মানুষ কিন্তু আবার বিভ্রান্ত হলেন সেই মিডিয়া-নির্মিত ‘সুদিন’-এর প্রচারে। আমাদের রাজ্যও এই প্রভাবের বাইরে থাকলো না। এরই সাথে গোটা দেশের জনসমাজের মতোই আমাদের চেনা পরিবেশেও থাকা বসালো তীব্র সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ। বিধানসভা নির্বাচন পরবর্তীতে এখনও অব্যাহত তৃণমূল কংগ্রেসের তীব্র সন্ত্রাস, গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করে স্বৈরতন্ত্রের আবাহন। এখন তার সাথে যুক্ত হল সাম্প্রদায়িকতার নিশিডাক আর ‘দেশ বিক্রি না করার’ ঘোষণার আড়ালে দিল্লীশ্বরের বিদেশি কর্পোরেটদের কাছে দেশ বিক্রির ভিত্তিপ্তর স্থাপন। সব মিলিয়ে এখন আমরা, আমাদের সমাজ অর্থনীতি রাজনীতি সংস্কৃতি আরও তীব্র দক্ষিণপন্থী আক্রমণের সামনে উপস্থিত। অদূর ভবিষ্যতে শাসকশ্রেণির আক্রমণ হবে আরও তীব্র ও সুদূরপ্রসারী এবং জনজীবনে যন্ত্রণা ও সংকট হবে আরও ঘনীভূত। এখন এ অবেলায় নিরুৎসাহকে সঙ্গী করে সময় কাটানো কি প্রকৃত বামপন্থী কর্মীদের কোনো একজনকেও মানায়? এই প্রশ্নের প্রতি উত্তর হোক সহস্র কণ্ঠের মেঘমল্লারে—না, কখনোই না। প্রকৃত বামপন্থী, কমিউনিস্টদের এটাই তো এক উপযুক্ত সময় যখন নিজ শ্রেণি আর শ্রমজীবী জনগণের জন্য আজকের বিশ্বে এক অসম যুদ্ধে নেমে পড়ার। আমাদের প্রতিটি শহিদের রক্তবিন্দুর দাম মেটাতে হবে আমাদেরই, আমরা যারা লালবাণ্ডাকে বহন করছি। বাণ্ডা বহনের শক্তি অর্জন করতে হবে। কমরেড, মন খারাপের কালো মেঘটা সরিয়ে দাও। ওটা বড় ভয়ঙ্কর। আর লড়াইটা যেহেতু অসম, শত্রু যেহেতু দৈত্যাকার, তাই লড়াইতে নামার মানসিক জোর আর পরিস্থিতির বস্তুগত বিশ্লেষণ এ-দুয়ের দ্বন্দ্বিক মিলন গড়ে নেওয়া চাই সবার আগে।

২.

আজ, এ-দেশের সাড়ে ছয় দশকের সংসদীয় নির্বাচনে সবচেয়ে বিপর্যয়কর ফলাফলের প্রেক্ষিতে এদেশে কমিউনিস্টদের আশু লক্ষ্য জনগণের ভারত নির্মাণ কিংবা নির্বাচনে জনসমর্থন হ্রাসের কারণ অনুসন্ধান—মাত্রার পার্থক্য রয়েছে, কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই জৈব কেন্দ্রীয় উপাদানটি হল শ্রমিকশ্রেণি ও তার অনুসারী জনগণের সাথে সম্পর্ক ও তাদের উপর রাজনৈতিক প্রভাব গড়ে

তোলা। ষোড়শ লোকসভা নির্বাচনে দেশের প্রায় সর্বত্র কমিউনিস্ট ও বামপন্থীদের প্রতি জনসমর্থন কমেছে, বিশেষত তরুণ ও মধ্যবিত্ত জনঅংশের। এই তরুণ জনঅংশ শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত সব শ্রেণি ও অংশের মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আর নয়া উদারনীতি তার প্রাথমিক ‘প্রলুব্ধকরণ’ পর্বে গোটা দেশের সাথে আমাদের রাজ্যের শহর ও গ্রামে নব্যধনী ও শক্তিশালী মধ্যবিত্ত শ্রেণির জন্ম দিয়েছে। গ্রামবাংলার এক উল্লেখযোগ্য অংশ যাদের পূর্বসূরীরা কেউই বড় জোতদার কিংবা জমিদার পর্যায়ভুক্ত ছিলেন না, শিক্ষার বিস্তার ও নিয়ম অনুযায়ী নিয়োগপদ্ধতির সুফলে গ্রামে বেশ খানিকটা জমির মালিকানা কিংবা শহর-লাগোয়া গঞ্জে নতুন প্রভাবশালী জনঅংশের জন্ম দিয়েছে। এদের বড় অংশ সাধারণভাবে রাজনৈতিক দল নির্বিশেষে সচেতন কিংবা অবচেতনভাবে নয়া উদারনীতির উগ্র সমর্থক এবং এঁদের উল্লেখযোগ্য অংশ কখনো তথাকথিত পরিবর্তন কিংবা সুদিন প্রচারে আস্থা প্রকাশ করেন। বামপন্থার শ্রেণি বুনিন্যাদ শ্রমিকশ্রেণি ও সংলগ্ন অংশ কি নয়া উদারনীতির প্রভাব ও জীবনবোধে অভ্যস্ত হয়ে উঠছেন না? এই অংশের মধ্যে কি নিজ শ্রেণিবোধ ও রাজনীতি সম্পর্কে বাঁধন আলগা হচ্ছে না? অবশ্যই, এই বিপদের মধ্যে রয়েছেন কমিউনিস্ট ও বামপন্থীরা। তাই বাস্তব পরিস্থিতির বাস্তবসম্মত বিশ্লেষণের লেনিনীয় পদ্ধতিতে এ-দেশের কমিউনিস্টরা ভবিষ্যতের রাজনৈতিক কৌশল নির্ধারণ করতে উদ্যোগী হয়েছেন, পুনঃপরীক্ষার মুখোমুখি হয়েছেন।

এই কৌশল নির্ধারণে মধ্যবর্তী দু-দশক এ-দেশ ও এ-রাজ্যে আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে শ্রেণিগুলির পরিবর্তিত পারস্পরিক সম্পর্ক বাস্তব, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করে সৃষ্টিশীল অবস্থান নিতে হবে। উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টিতে শ্রমিকের মৌলিক ভূমিকাকে স্মরণে রেখেই শ্রমিকশ্রেণি ও শ্রমজীবী জনগণের ওপর দু-দশকের নয়া উদারনীতির প্রভাবকে খুঁটিয়ে বিচার করতে হবে। বিচার করতে হবে এবং আজকের দিনে বর্ধিত প্রভাব ও ভূমিকায় বস্তুগতভাবে চিহ্নিত করতে হবে মধ্যবিত্ত জনঅংশকে।

শিক্ষানবিশ নিবন্ধকার মনে করে এ-কাজগুলির বিকল্প কিছু নেই, তবে এখানে এসে কথার শেষ হলে চলার পথের ধ্রুবতারাকে মেঘাচ্ছন্ন আকাশে হারিয়ে ফেলার সম্ভাবনা থেকে যাবে। শিক্ষার সুযোগ, শিক্ষালাভ, বিশ্বের তথ্যভাণ্ডারে সহজে প্রবেশাধিকারের জোরে মধ্যবিত্ত অংশ সমাজে সব থেকে সরব। আমাদের দেশে ঔপনিবেশিক শাসনের গর্ভেই মধ্যবিত্ত অংশের জন্ম। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনযন্ত্রের পক্ষে এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে—দু-দিকেই এই অংশের ভূমিকা রয়েছে। আবার আমাদের বাংলাদেশে বামআন্দোলনের আঁতুড়ঘর ছিল মধ্যবিত্ত অংশ। শ্রমিকশ্রেণি, কৃষকসমাজ সহ সমাজের অন্যান্য শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামের সাথে মধ্যবিত্তের বড় অংশ আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন, আজও আছেন। তবে অধিকার আদায়ের সংগ্রামে জয়লাভ, দেশে জনকল্যাণকর অর্থনীতির প্রভাব, রাজ্যে তিন দশকের বেশি সময়ে বামফ্রন্ট সরকারের অবস্থানের সময়গুলিকে অতিক্রম করতে করতেই বিগত দু-দশকে নয়া উদারনীতির প্রভাব ও প্রচারে আজকের মধ্যবিত্তের বড় অংশের জীবনবোধ গুণগতভাবে পরিবর্তিত হয়ে গেছে, অবচেতনভাবেই এক উল্লেখযোগ্য অংশ নয়া উদারনীতির সমর্থক হয়ে গেছেন। এঁরা মনে করেন, বিশ্বাস করেন, শ্রমিকশ্রেণির জঙ্গি আন্দোলন আজকের দিনে অচল। কেউ কেউ মন্তব্য করেন বামপন্থী কিংবা কমিউনিস্টদের আর বিপ্লবের স্বপ্ন না দেখে যুগের হাওয়ায় তাল মেলানো উচিত। এই মতের অনেকেই বামপন্থার সমর্থক, মনেপ্রাণে বামপন্থীদের সফলতা দেখতে চান।

৩.

কর্পোরেটের মূনাফা সৃষ্টিতে বিশ্বব্যাপী এবং বিশেষত আমাদের দেশের ৩০ কোটির বাজার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই বাজারে জনগণের রুচি, মতামত সৃষ্টিতে কর্পোরেট মিডিয়া অত্যন্ত তৎপর, শক্তিশালী এবং সফল। মিডিয়ার প্রভাবে মধ্যবিত্তের জীবন নিয়ন্ত্রিত। অন্যান্য শ্রমজীবী মানুষও ভয়ঙ্করভাবে প্রভাবিত। রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ক্ষেত্রের শ্রমিক-কর্মচারী, সরকারি কর্মচারী, শিক্ষকসমাজ, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের উচ্চ আয়ের মানুষ এবং বিভিন্ন ছোটো ব্যবসার সাথে যুক্ত মানুষজন যাঁরা আজকের দিনের শহুরে মধ্যবিত্ত, এঁরাও পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উদ্বৃত্ত মূল্যসৃষ্টিতে ভূমিকা পালন করেন, অথচ সেই ভূমিকাবোধের বাইরে থেকে গিয়ে নয়া উদারবাদী ব্যবস্থারই সমর্থক হয়ে উঠছেন। এদের সাথে যুক্ত হবে গ্রামের নব্যধনী। কিন্তু সব মিলিয়ে কত শতাংশ অ-শোষক শ্রেণির এই জনঅংশ। এর বাইরে কোটি কোটি মাঝারি, ছোটো ও প্রান্তিক কৃষক, খেতমজুর, বর্গাদার, অসংগঠিত শ্রমিক, স্বনিযুক্ত শ্রমজীবীগণ এবং সর্বোপরি কোটি কোটি বেকার। এই উভয় অংশের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামই তো সময়ের দাবি। বামপন্থী আন্দোলন এই উভয় অংশের অ-শোষক শ্রেণিগুলির ঐক্য ও নয়া উদারনীতির বিরুদ্ধে সম্মিলিত সংগ্রাম চায়।

চাইলেই তো হয় না, সংগঠিত করতে হবে। আজকে সংগঠিত করার পথে অন্যতম বাধা নয়াউদারনীতির প্রতিক্রিয়া ও প্রভাবের ফলে মধ্যবিত্ত অংশের সাথে সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমিকশ্রেণি ও শ্রমজীবী জনগণের চিন্তার দূরত্ব তৈরি হচ্ছে এবং কখনো কখনো তা স্পষ্ট বিরোধিতার পর্যায়ে পৌঁছে যাচ্ছে। এখানে একটা ছোট্ট উদাহরণ—শেষ কেন্দ্রীয় বাজেটে আয়কর ছাড়ের উধ্বসীমা বাড়ানো হয়েছে এবং একই সাথে গ্রামোন্নয়ন ও ১০০ দিনের কাজের বরাদ্দ বিপুল পরিমাণে কমানো হয়েছে। অর্থাৎ গ্রামভারতের কোটি কোটি জনগণের কাছে জনবিরোধী এই কেন্দ্রীয় বাজেটের প্রতিবাদী আন্দোলন থেকে আয়কর ছাড় পাওয়া মধ্যবিত্ত অংশ দূরে চলে গেলেন। এই বাজেটেই প্রস্তাব করা হয়েছে প্রতিরক্ষা, রেল, কয়লা, ব্যাঙ্ক, বিমা সহ বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির বুনিন্যাদি ক্ষেত্রগুলি ক্রমশ কর্পোরেটের নিয়ন্ত্রণে চলে যাবে। উচ্চ আয়ের বেতনভোগী আপাত স্বার্থের জন্য তার পরের প্রজন্মের সামনে যে ঐ একই রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ক্ষেত্রের দরজা বন্ধ হয়ে যাবে সেই বোধ হারিয়ে যাচ্ছে। ফলে বামপন্থীদের বিশ্বাসনের নামে কর্পোরেটলুট-বিরোধী আন্দোলনের আবেদন ও প্রভাব এই অংশের কাছে হারিয়ে যাচ্ছে। বর্তমান সরকারি শ্রমআইন পরিবর্তন করার মধ্য দিয়ে শ্রমিকশ্রেণির অর্জিত অধিকার হরণ ও দরাদরির ক্ষমতাকে ধ্বংস করার চেষ্টা হচ্ছে।

বিশ্বায়নের ফলে সন্তায় শ্রমসংগ্রহের তাগিদে উন্নত দেশগুলির সার্ভিস সেক্টরে আউটসোর্সিং-এর ফলে শহুরে মধ্যবিত্ত যুব জনঅংশের জন্য কাজের নতুন সুযোগ হয়েছে। সব মধ্যবিত্ত যুবক যুবতীরা কাজ পাচ্ছেন বা উপকৃত হচ্ছেন তা বলা যাবে না, কিন্তু ওপরের দিকের এক অংশের লক্ষণীয় উন্নতি ও সাচ্ছন্দ্যে অন্যরা ভাবছেন তারাও অচিরেই উন্নতির শিখরে পৌঁছাবেন। বাস্তব হল উন্নত দেশগুলির সংকটের প্রভাবে এখন এই ক্ষেত্রেও সংকট বাড়ছে। কিন্তু বিশ্বায়নের সমর্থন গড়ে তোলার কাজে বিরামহীন, দক্ষ কর্পোরেট মিডিয়ার তীব্র আলো পড়ছে সাধারণ মানুষের চোখে, ফলে বইরে থেকে আসা তীব্র আলো চোখের প্রকৃত আলোকে ঝাপসা করে দিচ্ছে। বিশ্বায়নের পক্ষে ‘সম্মতি’ থেকে যাচ্ছে অটুট।

বিশ্বের অন্য প্রান্তের মতোই আমাদের দেশেও দু-দশকের নয়া উদারনীতির বিষয়ময় ফলে উজাড় হয়ে যাচ্ছে কৃষক, প্রান্তিক চাষি, খেতমজুর, বর্গাদার, ছোটো মাঝারি শিল্পের শ্রমিক, ঠিকা শ্রমিক, অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক কর্মচারী, প্রকল্পভিত্তিক কর্মী, স্বনিযুক্তি প্রকল্পে নিযুক্ত মানুষ, বেকারের কাজ পাবার সম্ভাবনা। অর্জুন সেনগুপ্ত কমিটির প্রতিবেদনে দেশের প্রায় ৮৪ ভাগ মানুষের দৈনিক খরচ করার ক্ষমতা ২০ টাকা বা তার কম, সম্পদশালীদের বিশ্ব তালিকায় বাড়ছে ভারতীয় পুঁজিপতিদের নাম, দ্রুত গতিতে বাড়ছে বিলিওনেয়ারের সংখ্যা। অর্থাৎ কর্পোরেট মিডিয়ার প্রচারের জোরালো আলোতেও শোষণ, দারিদ্র্য, অনাহার, অর্ধাহার, ছাঁটাই, বেকারি আর বৈষম্যের আঁধারকে ঢাকা যাচ্ছে না। কিন্তু সমস্যা হল এই আক্রান্ত মানুষগুলির চেতনায় নয়াউদারনীতির প্রভাব প্রবলভাবেই ক্রিয়াশীল। সব থেকে নেতির দিক হল মধ্যবিত্তের স্বার্থ আর শ্রমিকশ্রেণির স্বার্থের দ্বন্দ্ব আজ প্রকট হচ্ছে। আজকের আপাত সুখী জীবনের মধ্যবিত্ত অথবা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অবস্থান যে শ্রমজীবী জনতার সারিতেই হবে তা বোধের বাইরে থেকে যাচ্ছে। মধ্যবিত্তের আপাত প্রাপ্তিসুখ কিংবা গণতন্ত্রের অস্তিত্ব পুরোপুরি নির্ভরশীল শ্রমিকশ্রেণি ও শ্রমজীবী জনগণের সংগ্রামের শক্তি বিস্তারের ওপর।

মনে রাখতে হবে, মধ্যবিত্তের সাথে শ্রমজীবী জনতার স্বার্থের আপাত দ্বন্দ্ব দূর হওয়া সম্ভব তীর শ্রেণি ও গণআন্দোলনের মধ্য দিয়ে। এখানেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা কমিউনিস্ট পার্টির। শ্রমিকশ্রেণির প্রতি দায়বদ্ধতা আর আজকের মধ্যবিত্তের উচ্চাকাঙ্ক্ষা কী করে মেলাবে কমিউনিস্ট পার্টি? এখন শ্রমজীবী জনঅংশও নয়া উদারনীতির প্রভাবে প্রভাবিত। আবার যতই দোদুল্যমানতা কিংবা উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকুক, সমাজ পরিবর্তনে শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বে মোর্চার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান মধ্যবিত্ত। প্রশ্ন ওঠে সমাজতন্ত্র কিংবা জনগণের ভারত নির্মাণ কি শ্রমিকশ্রেণি ও শ্রমজীবী জনতার প্রতি দায়বদ্ধতা ছাড়া মধ্যবিত্তের উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রকাশক হতে পারে? না, কখনোই না। তা হলে আজকে সমাজতন্ত্র ও মার্কসবাদকে আকর্ষণীয় করতে যুগের সাথে তাল মেলানোর যে প্রস্তাব আসছে, তার কী হবে? অবশ্যই সমাজতন্ত্র, মার্কসবাদকে যুগের সাথে তাল মেলাতে হবে; সৃষ্টিশীল বিকাশ ঘটতে হবে। কিন্তু এ-যুগের আহ্বান তো আজও শোষণের উচ্ছেদ ঘটানো। সমাজে থেকে শোষণের চিরকালীন উচ্ছেদই তো মার্কসবাদী দর্শনের অনন্যতা। এই মৌলিক লক্ষ্যেই যাবতীয় সমন্বয়পযোগীকরণ, সৃষ্টিশীল বিকাশ। মার্কসবাদ চলতি বাজারের কোনো পণ্য নয়, পুঁজি-পণ্য সমাজের বিনাশক, মানবমুক্তির দিশা, সৃষ্টিশীল সমাজবিজ্ঞান। শ্রমিকশ্রেণিই যে সমাজের

অন্য অন্য শ্রেণিগুলিকে মুক্তি দিয়ে নিজের মুক্তি ঘটায়—এই ঐতিহাসিক পর্যবেক্ষণ এখনো পর্যন্ত অপ্রাস্ত। ফলে নয়াউদারনীতির মোহিনী আবেদনের বিপরীতে মধ্যবিত্তের জীবনে এই বোধ গড়ে তুলতেই হবে যে তাদের জীবনের সংকট ও সম্ভাবনা শ্রমিকের জীবনের সাথে আবদ্ধ।

কমিউনিস্টরা কি পরিস্থিতির শিকার হবে? এর চেয়ে মৃত্যু ভালো। একক ব্যক্তিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য প্রতিনিয়ত নিজেকে পুনর্নবীকরণ করতে হয়। কমিউনিস্টদের তো বটেই। কমিউনিস্টদের পুনর্নবীকরণ তত্ত্ব ও প্রয়োগ উভয় দিকেই। ব্যক্তিগতভাবে, সংগঠিতভাবে। বুর্জোয়ারা ‘ক্ষমতা’কে আড়ালে নিয়ে গিয়ে নিজ শ্রেণিক্ষমতা প্রয়োগ করে গণতন্ত্রের নামে। আবার সংকটে গণতন্ত্রকে বাতিল করে ‘ক্ষমতা’কে কেন্দ্রীভূত করে স্বৈরাচারের হাতে। আবার কখনো কখনো গণতন্ত্রের মধ্যেই দলব্যবস্থাকে দুর্বল করে একক ব্যক্তিকে নেতা বানিয়ে পরিত্রাতার ভূমিকার আড়ালে নিজ শ্রেণির ক্ষমতাকে সমর্পণ ও শোষিত জনগণকে বিভ্রান্ত করে শ্রেণিস্বার্থ রক্ষা করে। আমাদের দেশের সংসদীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসের এটাই প্রকৃতিচিত্র। আবার আমাদের দেশের সংসদীয় গণতন্ত্রের ভূমিকা এবং তাতে বামপন্থী ও কমিউনিস্টদের গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ ও ভবিষ্যতের দায়িত্ব রয়েছে। তবে শেষ বিচারে এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কিংবা জনগণের ভারত নির্মাণের পথে শাসক শ্রেণির আধিপত্য ও ক্ষমতার বিপরীতে শ্রেণি আধিপত্য নির্মাণে শ্রমজীবী জনতার ক্ষমতাকে তুল ধরতে হবে শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্বেই। এই বোধের ন্যূনতম বিচ্ছাতি আর চোরাবালিতে পা বাড়ানো একই।

বিশ শতকের সমাজতন্ত্রের বিজয় ও বিপর্যয় থেকে শিক্ষা নিয়ে সিপিআই(এম) একুশ শতকে সমাজতন্ত্র নির্মাণের লক্ষ্যে জনগণের ভারতনির্মাণের দিকে পথ চলছে। এই চলার পথে আমাদের পথ একান্তভাবেই আমাদের নিজস্ব। এবং অবশ্যই প্রবর্তারা মার্কসবাদ, লক্ষ্য শোষণমুক্তি নিশ্চিত করা। আমরা বলেছি জনগণের ভারতে সম্পদের সামাজিক মালিকানা প্রধান হলেও, তার যান্ত্রিক রূপায়ণ হবে না; আমরা বলেছি জনগণের ভারতে জনগণের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই সর্বোচ্চ ক্ষমতার আধার; মানুষের স্বাধীন মতামতের স্বীকৃতি হবে গণতন্ত্রের অন্যতম প্রকাশভঙ্গি। এগুলিই তো বুনিনাদি তত্ত্বের মধ্যে দৃষ্টিশীল বিকাশ, বৈজ্ঞানিক উপলব্ধির প্রায়োগিক রূপরেখা। এবং অবশ্যই এই সৃষ্টিশীলতা, বৈজ্ঞানিক উপলব্ধির মেরুদণ্ড, প্রাণভোমরা সমাজ থেকে শোষণের অবসান। এই সংগ্রামের নেতা শ্রমিকশ্রেণি, মধ্যবিত্ত তার অন্যান্য মিত্রদের অন্যতম।

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

সমবায় আন্দোলন দীর্ঘজীবী হোক

কুকুরা এস.কে.ইউ.এস. লি.

কুকুরা, অমিলা, বর্ধমান

গ্রামীণ অর্থনীতি বুনিনাদ সুদৃঢ় করতে সমবায়ী হোন।

Sl. No. 196

With best compliments of

UNITED SAW MILLS

TIMBER MERCHANT & GENERAL ORDER SUPPLIERS

G.T. Road, Main Gate, Durgapur-713203, Phone : 0343-2582381

Contact : AMIT SINGH, 9434647691, 7699999426

Sl. No. 177

চাই নতুন ভাবনা

পার্থ মুখার্জি

বর্তমানে আমরা এমন একটি যুগে বাস করছি যখন আন্তর্জাতিক ঐতিহাসিক কারণই সংসদীয় ব্যবস্থা জনগণের প্রধান এজেন্ডা হয়ে গেছে। আরও উন্নতস্তরের এজেন্ডা গঠন করতে গেলেও, বর্তমানের এজেন্ডার সর্বোচ্চ ব্যবহার জরুরি। সংগঠন, চেতনা ও ঐক্য সে ক্ষেত্রে প্রধান সূত্র হলেও, সেগুলির সঙ্গে নির্বাচনী রাজনৈতিক সংগ্রামকেও আধুনিকতায় সজ্জিত করা জরুরি।

২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের বহু আগে থেকেই দুটি প্রধান রাজনৈতিক দল বিজেপি ও কংগ্রেস যে প্রচারে নেমেছিল, তার খরচের বহর সাধারণভাবে সিপিআই(এম)-এর মতো পার্টির নাগালের বাইরে। সংঘ পরিবারের পক্ষ থেকে তোলা মোদী-হাওয়া, প্রচার মাধ্যমের সাহায্য একেবারে ঝড়ে পরিণত হয়। এবং সবাইকে অবাক করে এই প্রথম একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করল বিজেপি। এই হাওয়া বুঝতে আমরা সবাই ব্যর্থ কিনা বলা যায় না। কিন্তু মনের কোণে এই আশা ছিল আঞ্চলিক দলগুলিকে বাদ দিয়ে কেউ এককভাবে সরকার গড়তে পারবে না। কিন্তু তা মেলে নি। সাধারণভাবে এই আঞ্চলিক দলগুলি মান্যতা পেয়েছে সেখানে, যেখানে জনগণের মধ্যে কোনো ধোঁয়াশা ছিল না যে, তারা বিজেপি-কে সাহায্য করবে। যেমন এ.আই.এ.ডি.এম.কে. ও বিজু জনতা দল। ফলে আঞ্চলিক স্তরে অন্যান্য দলগুলি বহুমত সংগ্রহে ব্যর্থ হয়েছে। জনগণের মধ্যে সরকারের স্থিতিশীলতার বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছে। যদিও জনগণের এই রায়েই উদারনীতির প্রয়োগ অনেক সহজতর হয়ে উঠবে। তবে অচিরেই মানুষ যে ঘুরে দাঁড়াতে পারে সে নিয়ে কোনো সংশয় নেই। কিন্তু প্রশ্ন এই যে তারা বামপন্থায় যাবে, না অন্য শক্তির হাতে যাবে। দেশীয় জনতা যদি দক্ষিণপন্থায় যায় তা হলে এই ব্যর্থতা আমরা বামপন্থী হিসাবে এড়াতে পারবো না। আর তা দেশব্যাপী নেতৃত্বদানের দুর্বলতার কারণেই হবে।

ময়নিনহান লিখেছিলেন, “নয়া দিল্লির দূতাবাসকে পর্যালোচনা করে দেখতে বলেছিলাম সব দিক বিচার করে তারা যেন জানায় যে, গত ২৫ বছরের ভারতের রাজনীতিতে পা রাখার মতো কতটা জায়গা আমরা তৈরি করেছি। যা জানা গেল সেটা মোটেই আশানুরূপ নয়। ভারতের রাজনীতিতে সরাসরি হস্তক্ষেপ করে কমিউনিস্টদের নিশ্চিত জয় ঠেকানোর জন্য দুটি অঙ্গরাজ্যে নির্বাচনে রাজনৈতিক দলকে টাকা দিয়েছিলাম। একবার কেরালায় ও আর একবার পশ্চিমবঙ্গে। কংগ্রেস দলকেই দু-বার টাকা দিয়েছি। আমাদের কাছে তারা টাকা চেয়েছিল কমিউনিস্টদের হারানোর জন্য। তার মধ্যে একবার টাকা দিয়েছিলাম ইন্দিরা গান্ধীর হাতে, তিনি তখন দলের কর্মকর্তা।” আর একথা সকলের জানা ঐ সময়ে ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে বাম সরকারকে হটানোর জন্য আন্দোলন

করে রাজ্যে ব্যাপক নৈরাজ্য তৈরি করা হয়েছিল।

১৯৮২ সালে বামফ্রন্ট আবার ফিরে আসায় কংগ্রেসকে দিয়ে হবে না এই ভাবনায় একটি আঞ্চলিক দল খোলার কথা ভাবে আমেরিকা। রুশতেন গানিউলিন রচিত ‘দ্য সি.আই.এ. ইন আমেরিকা’ বইয়ের ১০১ পাতায় বলা হয়েছিল—“মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কূটনীতিক জর্জ ফোরম্যান নিজেকে আমেরিকার ট্রেড রিপ্রেজেন্টেটিভ পরিচয় দিয়ে তাঁকে প্রস্তাব দেন এক আঞ্চলিক দল গঠনের এবং মধ্য জানুয়ারি ১৯৮৫-তে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে দলটির নিজস্ব কর্মসূচি পেশ করার। এই নতুন দলটি আমেরিকান দূতাবাসের অধীনে নিরাপদে কাজ করবে। সমস্ত বামপন্থী ও সাধারণ এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বিকল্প হবে। এবং নতুন দলের খরচ তিনি বহন করবেন।” সে সময়ে সেটি মনে না হলেও পশ্চিমবঙ্গের কতকগুলি অংশে যেমন কোচবিহার, দার্জিলিং-এ কিছু সফলতা আসে। পরবর্তীতে কবীর সুমনের লেখায় স্পষ্ট হয়, তৃণমুলের সঙ্গে মার্কিন দূতাবাসের সম্পর্ক। পরবর্তীতে পিটার রিচার ডায়েরি, সি.বি.আই-এর তদন্তে পরিষ্কার আন্তর্জাতিক চক্রান্তের কথা। বিপুল পরিমাণের অস্ত্র আনার দাম ৩০ লক্ষ ডলার যা যে-কোনো দেশেরই পক্ষে ব্যয় করা সম্ভব। এইসব চক্রান্তের কথা সিপিআই(এম) প্রাথমিকভাবে গুরুত্ব দিয়ে ভাবলেও, পরবর্তী ক্ষেত্রে কি এই রকম মনোভাব দেখিয়েছে? পার্টির শ্রেণিভিত্তি কিছুটা নড়ে যাওয়ার পরও সাম্রাজ্যবাদ বা বিশ্বায়ন শব্দগুলি নিয়ে নিজেদের মধ্যে লঘু আলোচনা হয়েছে। এটা আলোচনা হতে পারে কীভাবে মানুষের কাছে রাখব? মানুষ কিন্তু এসব ভুলে মনের গভীর থেকে যদি সংসদীয় ব্যবস্থায় আচ্ছন্ন হয় তাহলে শ্রেণিভিত্তি নড়বেই।

১৯৭৭ সালের পর ৩৭ বছর অতিক্রান্ত। এই ৩৭-এর ৩৪ বছর রাজ্য সরকারের ক্ষমতায় থেকেছে বামফ্রন্ট। এর মধ্যে ২০০১ সালে বিধানসভা নির্বাচনে শত চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে। কিন্তু শ্রেণিভিত্তিক পুরনো শিকড় সমাজের ভিতরে দৃঢ় থাকার ফলে গণমাধ্যমে তীব্র কুৎসাকে পরাভূত করে জয়ী হয় বামফ্রন্ট। যদিও সেই নির্বাচনের পূর্বে কমিউনিস্ট আন্দোলনের কিংবদন্তী পুরুষ জ্যোতি বসুর আগাম ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়ানো ও তুলনায় নবীন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর এক নতুন বাতাস বয়ে আনে। মূল্যায়নে এই দিকটিকে উপেক্ষা করা যায় না। আবার ২০০১ সালের নির্বাচন থেকেই সামান্য হলেও নির্বাচকমণ্ডলীর মত দানে শ্রেণি, লিঙ্গ, সমাজ, সংস্কৃতি প্রভৃতি প্রভাব বিস্তার করে, যা আজকে আমরা বিশাল আকারে প্রত্যক্ষ করছি। ১৯৯৮-১৯৯৯-এ অনুষ্ঠিত লোকসভা নির্বাচনে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা দখলের প্রশ্নে প্রধান রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠীগুলির দুটি বড়ো রাজনৈতিক সংগ্রামে দক্ষিণপন্থী ভাবনার সাথে বাম ধারণার তীব্র সংঘাত

পরিলক্ষিত হয়। বামেরা বাইরে থেকে নীতিগুলিকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেছে। কিন্তু বাল যায় সেবারও জনগণের বড়ো অংশের সমর্থন মেলে নি।

বর্তমান লোকসভা নির্বাচনে বামেরদের ভরাডুবিতে অনেকেই মনে করছেন সিপিআই(এম)-এর অস্তিত্ব হয়তো বিপন্ন। এমন বিপন্ন অবস্থা বা তার চেয়েও খারাপ অবস্থা ১৯৬২-তে চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষের প্রেক্ষাপটে এসেছে। কিন্তু ১৯৬৫-তে কোরোসিন ও খাদ্যের দাবিতে আন্দোলন ১৯৬৭-তে যুক্তফ্রন্ট সরকারের জন্ম দিয়েছে। ফলে বিহ্বল হয়ে পড়া কমিউনিস্টদের কাজ নয়। বিভিন্ন ইস্যুকে নিয়ে রাস্তায় নেমে লড়াই-ই শেষ কথা। দুটি প্রধান ইস্যু খুব শীঘ্রই সামনে আসতে চলেছে—(১) উদারবাদের প্রয়োগ ও (২) সাম্প্রদায়িক রাজনীতি। একটি অর্থনৈতিক ও অন্যটি সামাজিক ও রাজনৈতিক।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে রাষ্ট্রকে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় বসানো হয়েছিল—ধনতন্ত্রের বিকাশের স্বার্থে। এই পর্যায়ে রাষ্ট্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। যুদ্ধবিন্দু ইউরোপকে গড়ে তুলতে হবে, বিপুল পরিমাণ পুঁজির দরকার, রাষ্ট্রকে সেখানে এগিয়ে আসতে হবে, রাষ্ট্র সেখানে ভারি শিল্প গড়ে তুলবে, পরিকাঠামো গড়ে তুলবে, বিপুল পরিমাণে অর্থ বিনিয়োগ করবে। দ্বিতীয়ত, সমাজতন্ত্রকে আটকাতে হবে, তার জন্য সামরিক শক্তিকে বাড়াতে হবে। সামরিক ব্যবস্থার একটা মৌলিক পরিবর্তন এল। এই পরিবর্তনের মূল বৈশিষ্ট্য হলো, সৈন্যসংখ্যা বাড়ানো নয়, উন্নত অস্ত্র বানাতে হবে। উন্নত অস্ত্র নির্মাণে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হবে—বিজ্ঞান গবেষণায়। এবং এটা করতে গিয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এক অসাধারণ, অস্বাভাবিক অগ্রসর আমরা লক্ষ্য করলাম। এই সব সম্ভব হয়েছিল, কারণ রাষ্ট্র এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। সমগ্র ধনতন্ত্রের বিকাশে ২০০ বছরের ইতিহাস যদি আমরা দেখি তাহলে দেখা যাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী দুই দশককে বলা হয়—ধনতন্ত্রের স্বর্ণযুগ। এই সময়ে পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটেছিল সবচেয়ে দ্রুততার সঙ্গে। এবং এটা হয়েছে কারণ রাষ্ট্র এখানে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। কিন্তু ৭০-এর দশকে এসে বিশ্ব পুঁজিবাদ নতুন করে একটা সংকটের মধ্যে প্রবেশ করল। যে সংকট থেকে বেরিয়ে আসার জন্য ৭০-এর দশকের শেষ থেকে নতুন প্রকরণে ধনতন্ত্রের পুরনো রাস্তায় যাওয়ার প্রয়োজন দেখা দিল। অবাধ প্রতিযোগিতাকে একটা নতুন মোড়কে উদারীকরণ, বেসরকারীকরণ, বিশ্বায়ন নাম দেওয়া হল।

৯০-এর আগে ও পরে, প্রাক-উদারীকরণ এবং উদারীকরণ-পরবর্তী এই দুটো পর্যায়ের কথা যদি আমরা ভাবি—একটা পর্যায়ে সরকারের কিছু ভূমিকার কথা ধনতন্ত্রের বিকাশে স্বীকৃত ছিল, আর একটা পর্যায়ে সরকারের ভূমিকাটা ক্রমশ গুটিয়ে নেওয়া হচ্ছে। বাজার যদি নিয়ামক শক্তি হিসাবে অর্থনৈতিক ভূমিকায় যায়, আর তখনও যদি সরকারের কাছে মানুষের অনেক প্রত্যাশা থাকে, সরকার তখন সেই প্রত্যাশা পূরণ করার জায়গায় থাকে না, কারণ তার ক্ষমতাটা সঙ্কুচিত হচ্ছে। বর্তমান মুক্ত বাণিজ্যের আবহে আমাদের দেশের বাজার উন্মুক্ত হয়ে গেছে বিদেশি ও বহুজাতিক সংস্থাগুলির কাছে। যে জিনিসগুলি রপ্তানি করার কথা ছিল সেইসব জিনিসের ওপরে আমেরিকা নতুন নতুন শর্ত চাপিয়েছে। শিশু শ্রমিকের অজুহাতে কার্পেট রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞা, ফাইটো-স্যানিটারির নাম করে নিষেধাজ্ঞা এনেছে কাপড় রপ্তানিতে। ফলে ডাবলু.টি.ও-তে চুক্তি করে আমাদের কী লাভ হল? ১৯৯৪ সালে ভারত সরকার এই চুক্তিতে সই করেছিল।

আমাদের সংবিধানের একটা সমস্যা হল যে, খুব গুরুত্বপূর্ণ

জিনিসও পার্লামেন্টকে না জানিয়ে এক্সিকিউটিভ অর্থাৎ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা করে ফেলতে পারে। এই চুক্তি সই করার কোনো যৌক্তিকতা ছিল না। তার আগে পর্যন্ত ভারত সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রী এবং কিছু সং আমলা এর বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। এস.পি. শুক্লার মতো কিছু লোক লড়াই করেছিলেন। কিন্তু সমস্ত প্রচেষ্টা জলাঞ্জলি দেওয়া হল, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার চুক্তিতে আমরা সই করে এলাম। অনেকে বলেন যে, চীনও তো সই করেছে। চীনের সই করা ও আমাদের সই করার মধ্যে তফাৎটা হচ্ছে যে, চীন অন্যকে নিজের শর্ত দিয়েছে, সেই শর্তগুলো অনুযায়ী তারা চলবে। আমেরিকা ও চীন উভয়েই জানে যে চীন যদি আইনটাকে নিজেদের মতো করে ব্যাখ্যা করে তাহলেও আমেরিকানরা কিছু করতে পারবে না। চীনের সঙ্গে আমাদের একটা মূল তফাৎ আছে। চীনের সঙ্গে আমেরিকার বাণিজ্য চীনের প্রতিবছর উদ্ভূত থাকে। আমাদের চিট্টা সম্পূর্ণ উল্টো। আমাদের বড়লোকেরা লালায়িত বিদেশি জিনিস পাওয়ার জন্য! কলকাতার আবহাওয়ায় ফরেন ওয়ালপেপার দিয়ে বড়লোকদের বাড়ি না সাজালে তাদের গরিমা থাকবে না। চীনের হাত মুচড়ে আমেরিকানরা এখনও পর্যন্ত বিশেষ কিছু করতে পারে নি, পারবে বলে মনে হয় না। আর আমাদের তো হাত মোচড়াবার কোনো দরকার নেই, আমাদের কর্তব্যবুদ্ধিরা তো হাত কচলেই আছেন বিদেশি প্রভুদের সামনে।

আমরা আমাদের সমস্ত বাজার খুলে দিয়েছি বিদেশিদের কাছে বা বহুজাতিকদের সামনে। বিপরীতে আমরা কিন্তু কিছু পাই নি। আমাদের যে সমস্ত জিনিস রপ্তানি করার ছিল প্রায় প্রত্যেকটা জিনিসের ওপরে আমেরিকানরা নতুন নতুন শর্ত আরোপ করছে। এখন কী বলছে? তোমাদের কার্পেট যেখানে তৈরি করো, সেখানে শিশু শ্রমিক নিযুক্ত করা হয়। বিদেশি ধনী দেশগুলির শিশু শ্রমিকদের প্রতি এমন ভয়ানক দরদ, কাজেই সেই কার্পেট তারা তাদের দেশে রপ্তানি করতে দেবে না। কারণ সেটা ফাইটো স্যানিটারি নামক যেসব নিয়মকানুন আছে, সেগুলি এর বিরুদ্ধে যাবে। এরকম করে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমরা কোনোরকম সুযোগ পাই না। এই ডাবলু.টি.ও. চুক্তিতে আমরা কেন সই করেছি তার উত্তর যদি পেতে হয়, তাহলে একটি কমিশন বসিয়ে তদন্ত করত হবে যে দিল্লির আভিজাত পল্লিতে যে সমস্ত মানুষ বসবাস করে এবং বোম্বেতে বড়লোক পাড়ায় যারা বসবাস করে, তাদের কত টাকা, এবং কোথা থেকে আসে। এমনকি প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের সঙ্গে যেসব বাঘা আমলারা জড়িত আছেন—যাদের প্রধানমন্ত্রীও ঘাঁটাতে সাহস করেন না—তাদের সমস্ত সম্পত্তি কোথা থেকে এসেছে।

পুঁজির মালিক ও তাদের মিত্রগোষ্ঠীর এই বিপুল বৈভবের পেছনে আছে দেশের বিপুল সংখ্যক জনগণের ঘাম-রক্তের সক্রিয় অধ্যায়। স্বাধীনতা-উত্তর সময়ে ভারতের শ্রমজীবী মানুষ সুখে ছিল না এই কথা সঠিক, আবার বর্তমানে দু-দশকে সে কষ্ট যে বহুগুণ বেড়েছে, এ নিয়েও কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। এই সময়কালে ভারতীয় জনতার অভিজ্ঞতা হয়েছে কর্মহীনতা, শ্রমজুরি থেকে বঞ্চনা, সামাজিক সুরক্ষার ব্যাপারে হ্রাস। পণ্য উৎপাদনের মজুরির হার ১৯৮০ সালে ৩০ শতাংশে, আর বর্তমানে ১০ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে। একই সময়ে মুনাফার পরিমাণ ৩০ শতাংশ থেকে বেড়ে হয়েছে ৬০ শতাংশ। শ্রমশক্তির ৯৩ শতাংশ অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক। তাদেরকে কেন্দ্র করেই চলছে অবাধে লুণ্ঠন। দেশের এই সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের দুর্দশায় ঘৃতাখতি দিচ্ছে মূল্যবৃদ্ধি। এককথায় নয়া উদারনীতির দুই দশক ভারতের শ্রমজীবী মানুষকে ছুঁড়ে ফেলেছে একচেটিয়া পুঁজির নিষ্পেষণ এবং ক্ষুধা ও দারিদ্রের যুগপাঠে।

যদিও নয়া আর্থিক উদারনীতির চরিত্র বুঝতে ভুল হয়নি বামপন্থীদের। ফলে ধারাবাহিক আন্দোলনে शामिल থেকেছে বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়নগুলি। ১৯৯১ সালের পর থেকে বিভিন্ন সময়ে আঞ্চলিক ও সর্বভারতীয় স্তরে আন্দোলন হয়েছে। এর ফলে অনেক ক্ষেত্রে শাসক শ্রেণিকে কিছুটা লাগাম পরাতে পারলেও তাদের বেকরোয়া মনোভাব কিন্তু থেকেই যাচ্ছে। বর্তমানে বিপদ আরো বেশি। তবে একথা উল্লেখ করা উচিত—অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশগুলির মতো ভারতীয় জনগণের কাছে বঞ্চনা কোনো নতুন ব্যাপার নয়। এখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ বাস করে এক নিদারুণ নিঃস্ব বৈষয়িক ও মানসিক বাতাবরণের মধ্যে। বিমানবন্দরে একটা কফির দাম ৬০ টাকা। যা অধিকাংশ গরিব মানুষের দৈনিক আয় নয়।

স্বাভাবতই প্রশ্ন জাগে, এ ধরনের বোঁক কি সবসময় ছিল? নাকি লগ্নিপুঞ্জির দাপটের পর প্রভাব বাড়লো। বিষয়টা যদি সত্যি হয় তাহলে বামপন্থী বুদ্ধিজীবী হিসাবে বিষয়টিকে ভালোভাবে কাটাছেঁড়া করা দরকার। এত যে লড়াই হল তার কোনো প্রভাব নির্বাচনী সংগ্রামে না পড়ে, কেন পুরনো দক্ষিণপন্থী ও আরও দক্ষিণপন্থী দলগুলি আবার ক্ষমতায় ফিরেছে। এক্ষেত্রে কি আমাদের উপলব্ধির কোনো দুর্বলতা রয়েছে? তা নিশ্চয়ই আছে। তা নাহলে ধারাবাহিক আন্দোলনের কোনো প্রভাব কেন পড়বে না? যে পুঁজিবাদ সাধারণ মানুষকে বঞ্চিত করছে তার সঠিক বিশ্লেষণ কি হচ্ছে? এ সম্পর্কে অনেক স্বচ্ছতা ও একাত্মতা থাকা দরকার। শুধু শীতঘুমে আচ্ছন্ন, আড়ষ্ট, গতিহীন বিশ্লেষণ আর গতানুগতিক মতামতে কোনো লাভ হবে না। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় ১৯৬১ সালে যখন আমেরিকায় গৃহযুদ্ধ শুরু হয় তখন ভারতে কাঁচামালের দর চড়চড়িয়ে বেড়ে যায়। কারণ ল্যাক্সাশায়ারের মিলগুলিতে আমেরিকান কাঁচাতুলোর আমদানি কমে যাওয়ায় ব্রিটেনকে ভারতের দ্বরস্থ হতে হয়। দক্ষিণাত্যের লাগোয়া মহারাষ্ট্রের খাদ্যশস্যের উপাদানের উপযোগী লক্ষ লক্ষ একর জমিতে তুলোর চাষ শুরু হয়। এ সময়ে অনেক বেশি মহাজনদের কাছ থেকে প্রচুর টাকা ধার করতে কৃষকরা বাধ্য হয়। কারণ জোয়ার চাষ অপেক্ষা তুলো চাষ অনেক ব্যয়বহুল। ফলে খাদ্যশস্যের দাম বাড়ানোয় তৎকালীন বোম্বাইতে শুরু হল নির্মম বিক্ষোভ। আমেরিকার গৃহযুদ্ধের শেষে পরিস্থিতি বদলানোয় ব্রিটেন পেল তুলোর যোগান। আর ভারতে খাদ্যশস্য ও তুলোচাষ মুখ খুবড়ে পড়লো। কৃষকদের কাছ থেকে মহাজনরা টাকা চাইলে দলবেঁধে মহাজনের কাছে বিক্ষোভ করে তারা ছিঁড়ে ফেলে ঋণপত্রের চুক্তি। শাসক একে ‘রায়ট’ আখ্যা দিল। আর এই রায়টের রিপোর্টের ওপর পাশ হল ডেকান এগ্রিকালচারিস্টস্ রিলিফ অ্যাক্ট (১৮৭৫)। চাষের জমি ঋণের দায়ে মহাজনের হাতে চলে যাবার প্রক্রিয়াকে নানাভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হল।

বিংশ শতকের ৭০-এ তুলোর উৎপাদনে বিক্ষোভ ও পরবর্তীকালে মন্দার ব্যাপারটিকে এই পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করা দরকার। এই ঘটনার ব্যাপ্তি অনেক বেশি। কারণ এই বিপর্যয় মহারাষ্ট্রে সীমাবদ্ধ নয়, অন্ধপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, কর্ণাটক, গুজরাত ও পাঞ্জাবেও এবার এই বিপর্যয়। ৭০-এর দশকে তুলোর দাম হু হু করে বাড়তে লাগল। নয়া নীতির কল্যাণে ভারত থেকে তুলোর রপ্তানি পুরোপুরি বিনিয়ন্ত্রিত হল। পরিস্থিতির চাপে কৃষক বাধ্য হলো লক্ষ লক্ষ হেক্টর জমিতে জোয়ার চাষ বন্ধ করে তুলোর চাষে নেমে পড়তে। মহাজনদের কাছ থেকে ঋণ নেওয়া বেড়ে গেল। কারণ ব্যাঙ্কের শর্তের কারণে ঋণ পেতে সমস্যা হচ্ছিল। ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সালের মধ্যে বিশ্বের বাজারে তুলোর দাম অর্ধেক নেমে এল, আর কৃষকরা আবদ্ধ হলেন সেই চেনা ঋণের ফাঁদে। কৃষকের হেনস্থার শেষ রইল না। কিন্তু আশ্চর্য ঘটনা, ১৭০ বছর আগেকার পূর্ব

পুরুষদের মতো দলবদ্ধভাবে এরা কেউ সেভাবে প্রতিবাদ করলো না। হেঁকে বললো না—দাম পরার জন্য দায়ী সরকারি নীতি। অসহায় আত্মসমর্পণ করে আত্মহত্যা করলো বা করছে কৃষক। ১৯৯৭ থেকে এখনও পর্যন্ত প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ কৃষক আত্মহত্যা করেছে। আত্মহত্যা তো প্রতিবাদ। কিন্তু তা তো সংগঠিত প্রতিবাদ নয়। কেন এমন হচ্ছে এর উত্তর খোঁজা কিন্তু জরুরি।

সব কিছু আলোচনায় একথা বলা খুবই জরুরি যে আধুনিক নগরায়ণ প্রক্রিয়ার অন্যতম ফসল হল সমাজের স্ট্যাটাস বা মর্যাদা বিষয়ক আকাঙ্ক্ষা ও তার তীব্র প্রসার। বর্তমান বিশ্বায়নের কালপর্বে, শ্রেণিকে অবদমিত করে মর্যাদার ধারণা গঠনের চেষ্টা সর্বব্যাপী। অন্যভাবে বলা যায় যে স্ট্যাটাস অর্জন ও প্রদর্শনের অন্তরঙ্গ পীঠস্থান হল আরবান বাস্তবতা ও মানসিকতা। স্ট্যাটাস চিরকাল ছিল অভিজাতদের বিশেষণ। এখন পারিপার্শ্বিক কারণে মধ্য আয়ের থেকে নিম্ন আয়ের মানুষের মধ্যেও স্ট্যাটাসের আকর্ষণ বেড়েছে। সবাই ছুটছে এর পিছনে। বামপন্থীরাও এর থেকে বিচ্ছিন্ন এ কথা বলার মতো জায়গাতেও আমরা নেই। এসব যেন খানিকটা উপলব্ধির মধ্যেই এসেছে। শ্রমজীবীদের স্বার্থবাহী নেতৃত্বের মধ্যে যখন এই স্ট্যাটাস অর্জনের চেষ্টা চলে তখন তাদের জীবনে এটিকে ‘এমবুজোয়ামেন্ট’ বলে উল্লেখ করা যায়। বাজার অর্থনীতির স্বার্থে যখন এর প্রসার ঘটছে তখন বুঝতে হবে এটা শুধু ভোগের জন্য নয়, রাজনৈতিক কনজামশানের জন্যও। ফলত বলা যায় এই স্ট্যাটাস বা স্ট্যাটাস যুগের অর্থ হল বামপন্থা-বিরোধী প্রসার।

বর্তমানে সবচেয়ে বড় লাভজনক ব্যবসা রিয়েল এস্টেট তথা জমি ও বাড়ির দালালি ব্যবসা। পাশাপাশি বেআইনি কয়লা ও লোহা তো রয়েছেই। আর এই কাজে সবসময় প্রয়োজন বিপুল সংখ্যক ক্ষমতাধর মস্তানদের। এর ফলে সংশ্লিষ্ট কাজে যুক্ত ব্যক্তিরা এদের বিভিন্ন কাজে নিয়োগ করে। যাদের অধিকাংশ এলাকার বসতিতে বাস করে। আজকাল মস্তানরাই এলাকার সবচেয়ে বেশি ক্ষমতাধর অংশ। এদের মাথায় যে ‘ডনরা’ রয়েছে তাদের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত রাজনৈতিক শক্তি। ফলে পেশিশক্তি ও অর্থশক্তিতে গরিব যুবকদের এদের নিজ নিয়ন্ত্রণে নেওয়াটাই প্রধান কাজ। ফলে একরকম ভয়ের পরিবেশ চলে। এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে বামপন্থী কর্মীরাও সেখানে জড়িয়ে পড়ছে। বাধ্য হয় নিজ মত ও পথ পরিবর্তনে। ৬০ ও ৭০ দশকে যে জমির আন্দোলন হয়েছে তা স্তিমিত। এই আন্দোলনের ফলে বিহার, অন্ধ্র প্রভৃতি রাজ্যে একসময় বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে যে শক্তি অর্জিত হয়েছিল। আধুনিক শক্তিগুলি সে জায়গা দখল করে নিয়েছে। আজ সেই অঞ্চলে রাজনীতির পৃষ্ঠপোষকরা এমন এক মস্তান বাহিনী তৈরি করে নিয়েছে যারা বামপন্থীদের সামান্যতম জমি দিতেও রাজি নয়।

৩৪ বছর সরকার চালিয়েছে বামপন্থীরা। সেই সরকারের শেষ দিকের তেমন কোনো সুখস্মৃতি গরিবদের মাঝে নেই। বর্তমান প্রজন্ম পূর্বসূরীদের লড়াই দেখে নি। ফলে দক্ষিণপন্থা মান্যতা পাচ্ছে। যেন বর্তমান প্রজন্মের মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত যুবকদের বাঁচতে হবে পুঁজিবাদের মধ্যেই। তাদের ধারণা, সমস্যা যা আছে তার জন্য সংস্কার আনতে হবে। আর সে সব সংস্কার আনার জন্য গণতন্ত্রের বিদ্যমান কাঠামোর মধ্যেই গড়তে হবে ডিমান্ড গ্রুপ। ডিমান্ড গ্রুপগুলোর মধ্যে থাকবে বিভিন্ন ডিসকোর্স—পরিবেশ থেকে সমকামীদের স্বীকৃতি আদায়—নানা বিচিত্র বিষয়ে হবে আন্দোলন। এইভাবে ক্রটি দূর করতে হবে। ফলে ‘অ্যানাদার ওয়ার্ল্ড’ নয় পুঁজিবাদী ব্যবস্থাই থাকবে। অথচ অতীতের যে কোনো সময়ের তুলনায় এখন অনেক বেশি করে প্রয়োজন হয়ে পড়েছে পুঁজিবাদের বিকল্প খোঁজা। কোনো প্রান্তিক ধরনের পরিবর্তন দিয়ে পরিস্থিতির

মান্যতা দেওয়া যাবে না। প্রয়োজন র‍্যাডিক্যাল আন্দোলন। আর তা হতে পারে রাজপথ থেকে, টি.ভি.-র পর্দায় নয়।

হাজারো প্রতিকূলতা পেরিয়েও এখনো বামপন্থাই ভারতে একটি বিকল্প রাজনৈতিক ধারা, একটি বিকল্প রাজনৈতিক ডিসকোর্স হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। পেছনে পড়ে আছে অনেক চড়াই-উতরাই, অনেক ভ্রান্তি ও বিচ্যুতি, সামনের পথও বন্ধুর, কুয়াশাচ্ছন্ন। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে লড়াই করার ঝাঙা ঐতিহাসিকভাবেই ন্যস্ত বামপন্থীদের হাতে। বামপন্থীরা হাজারো শহিদ এই আদর্শের জন্য প্রাণ দিয়েছেন ও দিচ্ছেন। মার্কসবাদীদের কাছে চটজলদি বিকল্প নেই। যা মার্কসবাদের চিরায়ত শব্দে লিপিবদ্ধ আছে, যা দিয়ে আজকের বাস্তবের মুখোমুখি হতে পারি, আমরা পেতে পারি বিশ্লেষণ করার পদ্ধতি ও কাজ চিহ্নিত করার তালিম। তাই প্রকৃত মার্কসবাদীরা ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে মার্কসবাদকে সজীব ও গভীরতার মধ্যে দেখতে চেয়েছেন। বর্তমানে বিশ্বায়নের দাপট সত্ত্বেও মানুষের মনে সে ধরনের স্ফোভ দানা বাঁধে নি। তাহলে প্রশ্ন, বামপন্থীদের কাউন্টার হেজিমনি বা বিপরীত আধিপত্য তৈরির কী হবে? যেখানে বামপন্থী শক্তি দুর্বল, আবার আঞ্চলিক দলগুলিও বিশ্বস্ত নয়? তাই অনেক বিতর্ক, পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে উঠতে হবে। আর ওপর থেকে সাহস যোগাতে হবে, পিছুটান

দিলে চলবে না। তবেই সর্বস্তরে নাড়াচাড়া বাড়বে।

আমাদের মতাদর্শ ওদের সম্পূর্ণ বিপরীত মতাদর্শ, সে জন্য সেটি আজ আক্রান্ত হচ্ছে। শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্ব আক্রমণের মুখে। শুধু বামপন্থার শত্রুরা আক্রমণ করছে তাই নয়, বামপন্থার মধ্যেও বিভ্রান্ত হয়েছেন অনেকে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিপ্লবে কল কারখানায় শ্রমিক তো ক্রমশ কমছে। নতুন প্রযুক্তিতে সমৃদ্ধ শ্রমিক এখন কারখানায়। তাদের মানান রেখেই শ্রমিকের চরিত্র বদলানোর কথা বলা হচ্ছে। শ্রমিকশ্রেণির চরিত্র যদি বদলে যায় তাহলে তো শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্বের ধরনও বদলে যায়। আর সমাজ পাল্টানোর কথাও থাকে না। মতাদর্শের এই দিক থেকে আমরা সত্যি আক্রান্ত। আসলে শ্রেণিসংগ্রাম অনিবার্য নয় এটাই বোঝানো হচ্ছে। তাই নতুন অঙ্গিকে ভাবতে হবে। বদলাতে হবে কিছু সাংগঠনিক কাঠামো। তাহলে মতাদর্শ যতই আক্রান্ত হোক না, বামপন্থীরা রক্তক্ষাত হয়েও পথভ্রষ্ট হবে না। শুধু চাই মতাদর্শগত দৃঢ়তা। মার্কসবাদ অচল, অনড় নয়। তাই সমাজ বদলাতে হলে, বদলাতে হবে নিজেদেরও।

তথ্যসূত্র

১. বঞ্চনার ভারত, উৎস পটনায়েক
২. বিশ্বায়ন ও ভারত, অমিয়কুমার বাগচী

With best compliments of

AVINABA CONSTRUCTION

Civil Contractor & General Order Supplier of
Building Materials, Earth moving work also done by JCB

Vill. P.O. Kalajharia, Via. Burnpur, Asansol, PIN 713325
Contact No. 9832142178, 923342178, E-mail : avinabaconstruction@gmail.com

Nabadwip Maji
Proprietor

Sl. No. 49

স্বাধীনতার স্বাদ

সুকান্ত কোণ্ডার

ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের ৬৭ বছর পেরিয়ে গেছে। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট যিনি জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁর বয়স এখন ৬৭ বছর পেরিয়েছে। সময়টা কম নয়। ভারতকে এখন শিশু রাষ্ট্র বলা যাবে না। স্বাধীনতা আমাদের আনন্দের, গর্বের। কিন্তু অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়া স্বাধীনতা কি সম্পূর্ণ হতে পারে? না, পারে না। স্বাধীনতার জন্য যাঁরা জীবন দিয়েছেন, জেল খেটেছেন, অত্যাচার সহ্য করেছেন, তাঁরা ভেবেছিলেন স্বাধীনতার পরে মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ হবে। অর্থাৎ মানুষ তার প্রয়োজনীয় খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের সুযোগ পাবে, পাবে সুস্থ সংস্কৃতি। এই চাহিদাগুলো কি মানুষের পূরণ হয়েছে? এর উত্তর ‘না’ আবার ‘হ্যাঁ’। মুষ্টিমেয় মানুষ তাদের প্রয়োজনের থেকে অনেক অতিরিক্ত ভোগ করতে পারে, বাকিরা অনেক কিছু থেকে বঞ্চিত। অর্থাৎ ভারতের মধ্যে দুটো ভারত। একটা দরিদ্রের ভারত, আর অন্যটা প্রাচুর্যের ভারত—যারা সংখ্যায় মাত্র ১০ ভাগ এবং সব কিছু ভোগ করতে পারে। অধিকাংশ মানুষ প্রকৃত স্বাধীনতার স্বাদ থেকে বঞ্চিত।

এবছরের ৩১ জুলাই লোকসভার একজন সাংসদ প্রশ্ন করেন যে গোটা দিল্লি জুড়ে হনুমানের অত্যাচার চলছে—সরকার কি তা জানেন? উত্তরে মন্ত্রী বলেন যে সরকার সমস্যা সম্পর্কে অবহিত এবং ইতিমধ্যেই বিজেপি পরিচালিত দিল্লি পৌরসভা ব্যবস্থা নিয়েছে। কী সে ব্যবস্থা? দিল্লি পৌরসভা ৪০ জন বেকার ছেলেকে নিয়োগ করেছে হনুমান তাড়াবার জন্য। এই ছেলেরা বাঁদর তাড়াবার জন্য মুখে কালি মেখে লেজ লাগিয়ে হাতে কলা নিয়ে হনুমান সেজে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াবে। সফল হলে স্থায়ী চাকরি—বাঁদর না হটলে চাকরি নট। ভাবতে লজ্জা হয় যে স্বাধীনতার এত বছর পরেও একটা বেকার ছেলেকে তার ও তার পরিবারের মুখে দুটো অন্ন তুলে দেওয়ার জন্য এই পেশা বেছে নিতে হয়। এরা কি স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছে?

দেশের লাখ লাখ মানুষ যখন বাসস্থানের অভাবে ফুটপাথ বা রেলস্টেশনে রাত কাটায় তখন ভারতে একজন অতি বৃহৎ ধনী মুম্বাই শহরে ১০০ কোটি ডলার (প্রায় ৬০০০ কোটি টাকা) খরচ করে ২৭ তলা একটি বাড়ি বানায়—যে বাড়িতে ৩টা হেলিপ্যাড, ৯টা এলিভেটর, ১৬৮টা গাড়ি পার্কিং-এর ব্যবস্থা ও ৬০০ জন পরিচারিকা আছে। বর্তমানে আই.এ.ওয়াই-প্রকল্পে গরিবদের বাড়ি তৈরির জন্য ৭০ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়। ভারতের একজন ধনী নিজ বাড়ি তৈরি করতে যে টাকা খরচ করেছে সেই টাকায় ৮,৫৭,০০০ টি ইন্দিরা আবাস যোজনার বাড়ি হয়ে যাবে। অর্থাৎ ভারতের একজন ধনীর বাড়ির মূল্য ৮,৫৭,০০০ গরিবের বাড়ির মূল্যের সমান। কী বৈষম্য—ভাবা যায়? এই গরিব মানুষের দল কি স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছে?

দেশের একজন ক্ষেতমজুর বা অসংগঠিত শ্রমিক যখন তার মেয়েকে অনেক কষ্ট করে লেখা পড়া শেখায়—মেয়ের স্কুলে যাওয়ার জন্য একটা ৩০০০ টাকা দামের সাইকেল কিনে দিতে পারে না—তখন ভারতের একজন অতি বৃহৎ ধনী তার স্ত্রীর জন্মদিনে ৩০০ কোটি টাকার (সাইকেলের দামের তুলনায় ১০ লাখ গুণ দাম) বেশি খরচ করে উড়োজাহাজ উপহার দেয়। এই গরিব মানুষগুলো উৎপাদন না করলে ভারত অচল হয়ে যাবে, অথচ এরাই সবকিছু থেকে বঞ্চিত। এরা কি স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছে?

ন্যাশনাল মেডিক্যাল জার্নাল অব ইন্ডিয়ায় তথ্য অনুসারে ভারতে অপুষ্টি এবং প্রয়োজনের তুলনায় কম খাদ্য ভক্ষণের কারণে বছরে ২৩ লাখ মানুষ নুতন করে টি.বি রোগের শিকার হয়, বছরে ২লাখ ৩০ হাজার মানুষের টি.বি-তে মৃত্যু হয়। ঠিক সেই সময়ে ভারতের মুষ্টিমেয় কিছু পরিবার উৎসব- আনন্দে কোটি কোটি টাকা খাবারের জন্য খরচ করে, অপচয় করে বিপুল পরিমাণ খাদ্য। খাদ্যের অভাবে টি.বি হওয়া মানুষগুলো কি স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছে? তারা পেয়েছে অল্প বয়সে মৃত্যুর স্বাধীনতা।

কয়েক বছর আগে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক গঠিত অর্জুন সেনগুপ্ত কমিটির রিপোর্ট অনুসারে দেশের শতকরা ৭৭ ভাগ মানুষ দিনে ২০ টাকা খরচ করতে পারে না। অন্য দিকে ধনীদের প্রতিকা ফোর্বস অনুসারে ভারতের সেরা ১০০ জন ধনীর সম্পত্তি মার্চ ২০১১-এর তুলনায় মার্চ ২০১২-তে (অর্থাৎ এক বছরে) ৫০ হাজার ৪০০ কোটি টাকা বেড়েছে। অর্থাৎ ১০০ জনের দিনে সম্পত্তি বৃদ্ধি পেয়েছে ১৩৮ কোটি টাকা বা দিনে প্রত্যেকের সম্পত্তি বেড়েছে ১ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা। কী বৈষম্য ভাবা যায়? এই ৭৭ ভাগ মানুষ যারা দিনে ২০ টাকা খরচ করতে পারে না, তাদের অর্ধেককেও দেওয়া হয়নি বি.পি.এল কার্ড। এই শতকরা ৭৭ ভাগ মানুষ কি স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছে?

স্বাধীনতার পরে যেটুকু সুযোগ-সুবিধা সাধারণ মানুষের জন্য দেওয়া হয়েছিল তা ধীরে ধীরে তুলে দেওয়া হচ্ছে ধনীদের স্বার্থে। কেরোসিন, পেট্রোল, ডিজেল, সার, রাস্তার গ্যাস, খাদ্য ইত্যাদিতে ভর্তুকি কমেছে বা কমানোর পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। অন্যদিকে অতি বৃহৎ ধনীদের বছরে ৫ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি কর ছাড় দেওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ ভর্তুকির অভিমুখ সাধারণ মানুষের থেকে ধনীদের দিকে ঘুরছে। ফলে ধনীরা আরো ধনী হচ্ছে, গরিবরা হচ্ছে আরো গরিব। নিজ নিজ কোম্পানির দেওয়া হিসাব অনুসারে ১৯৯০ সালে টাটার সম্পত্তির পরিমাণ ছিল ১০ হাজার ৯২২ কোটি টাকা, ২০১২-১৩ সালে তা বেড়ে হয়েছে ৫ লাখ ৮৩ হাজার ৫৫৪ কোটি টাকা (৫৩ গুণ)। এই একই সময়ে আশ্বানিদের রিলায়েন্স গোষ্ঠীর সম্পত্তি ৩১৬৭ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ৫ লাখ কোটি টাকা হয়েছে

(১৫৮ গুণ)। অন্যদিকে এই সময়ে দেশের অধিকাংশ মানুষ সম্পত্তি হারিয়েছে। প্রায় একই সময়ে ভারতের প্রায় ৩ লাখ কৃষক দেনা শোধ করতে না পেরে আত্মহত্যা করেছে (প্রতি ৩১ মিনিটে ১ জন)। এ হলো কৃষকের আত্মহত্যার স্বাধীনতা।

স্বাধীনতার পরে কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির কারণেই একদিকে মুষ্টিমেয় মানুষ প্রাচুর্যের পাহাড়ে বসে আছে, অন্যদিকে কোটি কোটি মানুষ দারিদ্রের সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছে। স্বাধীনতার পরে গঠিত মহলানবিশ কমিশন অনুসারে প্রত্যেক পরিবারে ৭৫ বিঘা জমি রেখে জমিদারদের বাকি জমি কেড়ে নিলে ৬ কোটি ৩০ লাখ একর জমি উদ্ধৃত হতো। এই জমি গরিবদের মধ্যে বিলি করলে, কৃষকের জমিতে সেচ পৌঁছে দিলে, সমবায় থেকে কম সুদে কৃষককে ঋণ দিলে, সম্ভব সার দিলে ও কৃষকের ফসলের উপযুক্ত দাম দিলে কৃষকের কেনবার ক্ষমতা বাড়তো। কৃষকের কেনবার ক্ষমতা বাড়লে দেশে শিল্পের বাজার তৈরি হতো এবং বেকারদের কাজ হতে পারতো। কেন্দ্রের কংগ্রেস বা বিজেপি-তৃণমূল সরকার সে পথে হাঁটেনি। এখনও পর্যন্ত মহলানবিশ কমিশনের হিসাবের শতকরা ১০ ভাগ জমিও বিলি হয়নি, সারা দেশে এখনও পর্যন্ত মোট কৃষিজমির অর্ধেকও সেচের ব্যবস্থা হয়নি। ভূমিসংস্কারের মাধ্যমে গরিবেরা যে জমি পেয়েছে তার বড় অংশ বাম-শাসিত রাজ্যে পেয়েছে। স্বাধীনতার পরে ধনীদের সুবিধা দেওয়া হয়েছে, সাধারণ মানুষের সর্বনাশ করা হয়েছে। বৈষম্যের এই নীতির কারণেই অনাহারে, বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু ঘটছে, কোটি কোটি বেকার তৈরি হচ্ছে। এই মানুষ-মারা নীতি মেনে নেওয়া যায় না—দরকার শোষণের অবসান ঘটানো—সমাজের পরিবর্তন করা। কংগ্রেস, বিজেপি ও তৃণমূল কংগ্রেস এই শোষণের সমাজকে টিকিয়ে রাখতে চায়। কমিউনিস্টরা চায় এই সমাজকে পরিবর্তন করতে। সেই চেতনায় মানুষকে জাগিয়ে তুলতে হবে।

অনেক লড়াই করে ও অত্যাচারের মোকাবিলা করে ১৯৭৭সালে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। তার আগে ১৯৬৭ ও ১৯৬৯ সালে ২ দফায় ২২ মাসের যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়। এই সরকার দুটিকে অবলম্বন করে আমাদের রাজ্যে গরিবদের মধ্যে তীব্র জমির আন্দোলন গড়ে ওঠে। এর মধ্য দিয়ে গরিবদের মধ্যে সি পি আই(এম)-এর ভিত শক্ত হয়। শাসক কংগ্রেস দল ভীত হয়ে পড়ে ও ১৯৭২ সালে মানুষের ভোটের অধিকার কেড়ে নেয়। ১৯৭৭ সালে রাজ্যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। আমাদের দেশে আর্থিক ও রাজনৈতিক উভয় দিক থেকেই রাজ্য সরকারের ক্ষমতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। রাজ্য সরকারকে কাজ করতে হয় কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির মধ্যে ও উদারনীতির মধ্যেই। ১৯৭৭ সালের আগে পর্যন্ত ২২ মাস বাদে বাকি সময়ে রাজ্য সরকার পরিচালনা করেছে কংগ্রেস দল। ১৯৭৭ সালের আগে পর্যন্ত আমাদের রাজ্য অত্যন্ত পিছিয়ে পড়া রাজ্য হিসাবে চিহ্নিত ছিলো। কিছু দুর্বলতা সত্ত্বেও রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার ৩৪ বছরে অনেক বিষয়ে রাজ্যকে সামনের সারিতে নিয়ে আসে। কিন্তু বুর্জোয়া প্রচারমাধ্যম সাফল্যগুলিকে গোপন করে বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে লাগাতার কুৎসা ও অপপ্রচার গড়ে তোলে। প্রচার চলে যে ৩৪ বছরে বামফ্রন্ট সরকার রাজ্যটিকে রসাতলে নিয়ে গেছে। কতগুলি ইস্যুকে ব্যবহার করে বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে লাগাতার কুৎসা চলে ও সেই সঙ্গে দেখানো হয় ব্যাপক প্রলোভন। এক অংশের মানুষ বিভ্রান্ত হয় ও ২০১১ সালের নির্বাচনে বামফ্রন্টের পরাজয় ঘটে, রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেস সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। বামফ্রন্টের পতন ঘটানোর জন্য রাজ্যের সমস্ত বিরোধী বাম-ডান দল ও শক্তি ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রচারমাধ্যমের সাহায্য নিয়ে বামফ্রন্টের বিরোধিতা করে। পরে রাজ্যের কংগ্রেস দল তৃণমূল

সরকার থেকে সরে আসে। ফলে বর্তমানে রাজ্যে চলছে তৃণমূল কংগ্রেসের একক সরকার।

ইতিমধ্যে রাজ্যের তৃণমূল সরকারের বয়স ৪০ মাস পেরিয়ে গেছে। রাজ্যজুড়ে চলছে অরাজকতা। দ্রুত মানুষের মোহমুক্তি ঘটছে। বামফ্রন্টকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য যে প্রচারমাধ্যমগুলি লাগাতার কুৎসা করেছে তাদের কেউ কেউ আজ তৃণমূলের পক্ষে লিখতে পারছে না, এদের বিরোধিতা করতে বাধ্য হচ্ছে। তৃণমূলের শূন্যস্থান যাতে বামেরা গ্রহণ করতে না পারে তার জন্য চলছে প্রচারের নূতন কৌশল। সে প্রচার হলো এই যে ৩৪ বছরে বামফ্রন্ট যে অন্যান্য কাজগুলো করেছে তৃণমূল সেই কাজগুলোই করছে। সুতরাং তৃণমূলের সঙ্গে বামেরদের কোনো ফারাক নেই। তাই তৃণমূলের বিকল্প বামফ্রন্ট নয়, অন্য কেউ। এ এক গভীর ষড়যন্ত্র। আমরা যদি বামফ্রন্ট সরকারের কাজের সঙ্গে তৃণমূল সরকারের কাজের তুলনা করি তাহলে প্রকৃত চিত্র ফুটে উঠবে। কয়েকটি দিক তুলে ধরা হলো—

৭০-এর দশকে কংগ্রেস দল বাংলার মানুষের গণতন্ত্রের স্বাদ বা স্বাধীনতার স্বাদ কেড়ে নিয়েছিল। ১৯৭৭ সালে গণতন্ত্র ফিরে আসে। বামফ্রন্ট বদলার রাজনীতি নেয় নি। শুধু সাধারণ মানুষ গণতন্ত্র ফিরে পায়নি, বামফ্রন্টের আমলে বিরোধীদের গণতন্ত্রও সুরক্ষিত ছিল। ২০১১ সালে তৃণমূল কংগ্রেস সরকারে আসার পরে ‘বদলা নয়, বদল চাই’ বললেও শুধু বামপন্থীদের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেয়নি, সমস্ত বিরোধীদল সহ সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেয়। আক্রমণের মূল লক্ষ্য বামপন্থীরা। ১৬১ জন বামপন্থীকর্মী খুন হয়েছে, প্রায় ৫০ হাজার কর্মী ঘর ছাড়া, কয়েক হাজার কর্মীকে মিথ্যা মামলায় জড়ানো হয়েছে। শ্রমিক-কৃষকের ধর্মঘট করার অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। ভোটের অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। সাধারণ আইনশৃঙ্খলা বিপন্ন।

বামফ্রন্ট আমলের প্রথম দিকে কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির কারণে বড় শিল্প করা যায় নি। কিন্তু তার মধ্যে হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যাল ও সল্টলেকে ইলেকট্রনিক্স কারখানা হয়। যখন বড় শিল্প হওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হলো তখন কারখানা যাতে গড়ে না ওঠে তার জন্য সক্রিয় বাধা দেওয়া হলো তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে। শতকরা ৮৫ ভাগ তৈরি সিঙ্গুরের কারখানা বাংলা থেকে গুজরাটে তড়িয়ে দেওয়া হলো। ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রে বামফ্রন্টের আমলে আমরা ভারতের মধ্যে প্রথম হই। বর্তমানে তৃণমূল কংগ্রেসের সরকারের আমলে নতুন কারখানা হওয়া দূরের কথা, ব্যাপকভাবে কারখানা বন্ধ হচ্ছে। রাজ্যে শিল্পের অবস্থা এমন যে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলির অনেক আসন ফাঁকা থাকছে, এমনকি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পর্যন্ত।

১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট যখন সরকারে আসে তখন রাজ্যের মাত্র শতকরা ২৮ ভাগ জমিতে সেচ পৌঁছে ছিল। ২০১১ সালে বামফ্রন্ট যখন পরাজিত হয় তখন শতকরা ৭২ ভাগ জমিতে সেচ পৌঁছায়। খাদ্যে ঘাটতি রাজ্য থেকে আমরা বামফ্রন্ট সরকারের আমলে উদ্ধৃত রাজ্যে পরিণত হই। চাল, সজি, মাছ, পাট উৎপাদনে আমরা ভারতের মধ্যে প্রথম হই। আর আলু উৎপাদনে হই দ্বিতীয়। বর্তমানে তৃণমূল সরকারের আমলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির পরিবর্তে কমছে। বামফ্রন্টের আমলে আমরা গরিবদের মধ্যে ৩৪ লক্ষ বিঘা জমি বিলি করি। বর্তমানে তৃণমূল সরকারের আমলে গরিবদের জমি কাড়ছে। ইতিমধ্যে ৩০,০০০ বিঘা জমি কেড়ে নেওয়া হয়েছে।

১৯৭৭ সালের আগে রাজ্যে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা বলে কিছু ছিল না। ১৯৭৮ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচন করে আমলাদের হাত থেকে গ্রামের মানুষের হাতে ক্ষমতা তুলে দেয় বামফ্রন্ট সরকার। তপশিলি জাতি-উপজাতি ও মহিলাদের জন্য আসন ও পদ সংরক্ষণ করা হয়

এবং তাদেরকেও পঞ্চায়েতের কাজের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। আগে গ্রামের উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ হতো কম পরিমাণ টাকা, বামফ্রন্ট সরকার পঞ্চায়েতের মাধ্যমে গ্রামের বরাদ্দ অনেক বাড়ায়। বর্তমানে তৃণমূল সরকারের আমলে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা আমলাদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে, পঞ্চায়েত দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হচ্ছে।

৭০-এর দশকের শিক্ষাক্ষেত্রে অরাজকতা, গণটোকাটুকির অবসান ঘটে বামফ্রন্টের আমলে। শিক্ষাক্ষেত্রে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসে। কংগ্রেস আমলে তপশিলি জাতি-উপজাতি সহ দরিদ্র পরিবারের ছেলেমেয়েরা শিক্ষার আড়িনায় প্রবেশ করতে পারতো না। বামফ্রন্ট সরকার তার অবসান ঘটায়। তৃণমূল সরকারের আমলে শিক্ষাক্ষেত্রে আবার অরাজকতা তৈরি হয়েছে।

৭০-এর দশকে মেয়েরা স্কুলের পরে বাড়ির বাইরে যেতে পারতো না। বামফ্রন্টের আমলে তার অবসান ঘটে। আজ তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের আমলে আমাদের রাজ্য নারী নির্যাতনে প্রথম। অত্যন্ত বিপজ্জনক বিষয় হলো রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নারী নির্যাতনের ঘটনাগুলিকে ‘সাজানো ঘটনা’, ‘ছোট ঘটনা’ বলে এগুলোকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন।

বামফ্রন্ট সরকারের আমলে দুর্নীতি ধরার জন্য বর্তমানের তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার বিশেষ অডিট টিম গঠন করে। কিছু না পাওয়ার সেই অডিট টিম তুলে দিতে হয়। আর আজ তৃণমূল কংগ্রেসের ৪০ মাসের রাজত্বে পঞ্চায়েত, পৌরসভাগুলি দুর্নীতির মুগয়াক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। ত্রিফলা আলো কেলেঙ্কারি, এস.জে.ডি.এ-তে দুর্নীতি সহ অসংখ্য দুর্নীতির ঘটনা ঘটেছে। সারদা কেলেঙ্কারি দেখিয়ে দিচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস দলটি কেমন।

‘সবার হাতে কাজ, সবার পাতে ভাত’ সহ বিভিন্ন নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিগুলি তৃণমূল কংগ্রেসকে ব্যঙ্গ করছে। তৃণমূল কংগ্রেসের দেওয়া হিসাব অনুসারে ২০১২ সালে সরকারিভাবে রেজিস্ট্রিকৃত বেকারের সংখ্যা ছিল ৭০ লক্ষ ৫০ হাজার। এর মধ্যে চাকরি পেয়েছে মাত্র ১৮৯৯ জন—যার মধ্যে মুসলিম-১০২ জন (৫.৩৭ ভাগ)। মুসলিমদের জন্য অসংখ্য প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, বাস্তবে কিছুই করা হয়নি। মূল্যবৃদ্ধি আকাশ ছোঁয়া, তৃণমূল সরকার নির্বিকার। বিগত ৪০ মাসে রাজ্য সরকার বিদ্যুতের দাম প্রায় দ্বিগুণ করেছে। ‘মেলা-উৎসব’-এর নামে জনগণের বিপুল পরিমাণ টাকা অপচয় করা হচ্ছে। পেশিশক্তির জোরে এই সরকার টিকে থাকতে চাইছে। গুন্ডামি ওদের দুর্বলতার পরিচয়। গুন্ডামি করে পৃথিবীর কোনো স্বৈরাচারী বেশি দিন টিকে থাকতে পারেনি, এরাও পারবে না।

দেশে বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষ শান্তিতে পাশাপাশি বাস

করবে, সেই পরিবেশ অনেক এলাকায় থাকছে না। মানুষের শ্রেণি-পরিচয়কে ভুলিয়ে দিয়ে পরিচিতিসত্তার নামে ধর্ম, ভাষা, সম্প্রদায়ের পরিচয়কে সামনে আনা হচ্ছে। এ সবই করা হচ্ছে শ্রেণি-এককে ধ্বংস করে শোষণের ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার জন্য।

মাত্র শতকরা ৩১ভাগ মানুষের সমর্থন পেয়ে বি.জে.পি দল কেন্দ্রে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে। একদিকে নরেন্দ্র মোদীকে উন্নয়নের প্রতীক হিসাবে তুলে ধরা হচ্ছে, অন্যদিকে আর.এস.এস-কে দিয়ে দাঙ্গা লাগানো হচ্ছে। সরকারি পরিসংখ্যান অনুসারে মোদী সরকারের ২ মাসের মধ্যে দেশে দাঙ্গা হয়েছে ১১৩ টা, মারা গেছেন ১৫ জন, আহত হয়েছেন ৩১৮ জন। ‘সুদিন আসছে’ শ্লোগানের ফানুস ৪ মাসের মধ্যেই ফেটে যাচ্ছে। রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থাকে ধ্বংস করা হচ্ছে। যে বিদেশি পুঁজিপতিরা তাদের দেশের অর্থনীতিকে ধ্বংস করছে তাদের উপরই নির্ভর করা হচ্ছে। রেল, প্রতিরক্ষা, বিমা ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ বাড়ানোর পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। ফলে দেশের নিরাপত্তা বিপন্ন হবে। রেলের যাত্রীভাড়া বাড়ানো হয়েছে শতকরা ১৪.২ ভাগ, পণ্যমাণ্ডল বাড়ানো হয়েছে শতকরা ৬.৫ ভাগ। সাধারণ বাজেটে প্রত্যক্ষ কর (যা মূলত ধনীরা দেয়) কমানো হয়েছে ২২,২০০ কোটি টাকা, অন্যদিকে পরোক্ষ কর (যা মূলত সাধারণ মানুষ বহন করে) বাড়ানো হয়েছে ৭,৫২৫ কোটি টাকা। কৃষিক্ষেত্রে, গ্রামীণ উন্নয়ন ও সামাজিক ক্ষেত্রে বরাদ্দ বিগত বছরের তুলনায় অনেক কমেছে। বোকা যাচ্ছে আম জনতার প্রতি এদের মনোভাব কী! কৃষিক্ষেত্রে বরাদ্দ ১৮,৭৮১ কোটি টাকা থেকে কমিয়ে ১১,৫৩১ কোটি টাকা করা হয়েছে, কমেছে ৭,২৫০ কোটি টাকা (শতকরা ৩৯ ভাগ)। গ্রামীণ উন্নয়নে বরাদ্দ ৫৬,৪৩৮ কোটি টাকা থেকে কমিয়ে মাত্র ৩,০৮২ কোটি টাকা করা হয়েছে, কমেছে ৫৩,৩৫৬ কোটি টাকা (শতকরা ৯৫ ভাগ)। সামাজিক ক্ষেত্রে বরাদ্দ ১,৯৩,০৪৩ কোটি টাকা থেকে কমিয়ে ৭৯,৪১১ কোটি টাকা করা হয়েছে, কমেছে ১,১৩,৬৩২ কোটি টাকা (শতকরা ৫৯ ভাগ)। এনরেগায় বরাদ্দ প্রকৃত অর্থে কমেছে। এই প্রকল্প থেকে অনেক গরিবকে বাদ দেবার ষড়যন্ত্র চলছে।

সাধারণ মানুষ ধীরে ধীরে বুঝতে পারছে যে আসলে ‘সুদিন’ ধনীদের এসেছে, আর সাধারণ মানুষের জন্য এসেছে ‘দুর্দিন’। লোকসভা নির্বাচনের পরে অল্প সময়ের মধ্যে বিভিন্ন রাজ্যে ২১টি বিধানসভা আসনের উপনির্বাচন হয়েছে। সেই নির্বাচনে বি.জে.পি ৬টি আসন হারিয়েছে। বিজেপি-র সাম্প্রদায়িক ও ধনীদের স্বার্থরক্ষাকারী অর্থনৈতিক নীতির বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এক্ষেত্রে আত্মতুষ্টির কোনো অবকাশ নেই।

With best compliments of

M/S. TARA SHAKTI RICE MILL

Paraj More, HN-2, Burdwan

BHUMI KONNA RICE

Raja Mukherjee : 08906507579, 09474170857

Joy Mukherjee : 09732142501, 08926527376

Raj Kumar Dutta : 08926757443

Sl. No. 159

শারদীয় প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

নির্মল গ্রাম পঞ্চায়েত গড়ার জন্য
নির্মল ভারত অভিযানে সহযোগী

কাঁকসা গ্রাম পঞ্চায়েত

দেবাশিস গাঙ্গুলী
উপ-প্রধান

নির্মল কাউর ভামরা
প্রধান

Sl. No. 87

পরিকল্পনা কমিশন সক্রিয় থাকুক জনস্বার্থে

হরিলাল নাথ

নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রে নতুন সরকার গঠনের পর প্রায় আড়াই মাস কেটে গেলেও পরিকল্পনা কমিশনের পুনর্গঠনের কাজে হাত দেওয়া হয়নি। কাউকে নিয়োগ করা হয়নি কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান পদে। সরকার পরিচালনায় এবং অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণে পরিকল্পনা কমিশনের যে আর কোনো প্রয়োজন নেই তা বোঝাতে পরিকল্পনা কমিশনকে বাদ দিয়েই তৈরি করা হয়েছে বাজেট এবং গ্রহণ করা হয়েছে একাধিক নীতি ও আইন সংশোধনের বিল।

দিল্লিতে সুবিশাল যোজনা ভবন দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু সেখানে নেই কমিশনের কোনো পদাধিকারী। কর্মীরা আছেন, কিন্তু তাঁদের কোনো কাজ নেই। পরিকল্পনা কমিশন নিয়ে এমন নীরবতা ও নিক্রিয়তা থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে একে বাঁচিয়ে রাখার উৎসাহ সরকারের নেই। সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিস্ট অনুশঙ্গে নব্য উদারবাদী রাষ্ট্র গঠনে বন্ধপরিকর মোদী বাহিনী মনে করছে তাদের অভীষ্ট পথে পরিকল্পনা কমিশনের প্রয়োজন নেই। শেষ পর্যন্ত সব জল্পনার অবসান ঘটিয়ে লালকেল্লায় স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে প্রধানমন্ত্রী পরিকল্পনা কমিশন তুলে দেবার কথা ঘোষণা করে দিয়েছেন।

যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে পরিকল্পনা কমিশন গঠিত হয়েছিল, বিগত ৬৪ বছরের যাত্রাপথে ক্রমাগত বিচ্যুতির ফলে এখন তা তলানিতে এসে ঠেকেছে। এতদসত্ত্বেও সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের অর্থনীতির বিজ্ঞাপন দিয়ে পরিকল্পনায় নেহরু-মহলানবিশের ভাবনার যে প্রকাশ ঘটেছিল তার কিছু অবশেষ এখনও টিকে আছে। মোদী সরকার সেই অবশেষটুকুকে নির্মূল করে দিয়ে নব্য উদারবাদী কাঠামোর সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ করে নতুন ব্যবস্থা চায়। সেজন্য কমিশনকে পুনর্গঠিত না করে তার মৃত্যুপরোয়ানা জারি করে দেওয়া হয়েছে।

ভারতের শাসকশ্রেণির সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত নব্য-উদারবাদীদের অভ্যন্তরেই পরিকল্পনা কমিশন নিয়ে মতভেদ আছে। একটা মত হল উন্নয়নের যে পথ গত দু-দশকে অনুসৃত হচ্ছে এবং নতুন সরকার নব্য-উদারবাদী পথে দ্রুত এগোতে চাইছে, সেখানে পরিকল্পনা কমিশনের কোনো ভূমিকা নেই। জাতীয় পুঁজির সঙ্গে বিশ্বায়িত পুঁজির সীমারেখা মুছে দিয়ে যে নব্য-উদারবাদী রাষ্ট্র গঠন করতে চায় মোদী বাহিনী, সেই রাষ্ট্রের চোখে উভয় পুঁজিই



হবে সমান। বৃহত্তর অর্থে বিশ্বায়িত পুঁজির চাহিদা পূরণে যদি সরকার অগ্রাধিকার দেয় তাহলে পরিকল্পনা কমিশন অপ্রাসঙ্গিক ও অপ্রয়োজনীয় হয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক।

অপর মত হল, বিশ্বায়িত পুঁজির স্বার্থে নব্য-উদারবাদী রাষ্ট্র গঠন মূল লক্ষ্য হলেও সেখানে পৌঁছাতে এখনো অনেক সময় লাগবে। আপাতত এই সন্ধিক্ষণে

পরিকল্পনা কমিশনের কিছু ভূমিকা থাকবে। বিশ্বায়িত পুঁজির কাছে ভারত রাষ্ট্রকে পুরোপুরি সমর্পণের আগে জনমতের চাপের মোকাবিলায় বিশ্বায়িত পুঁজির সঙ্গে দর কষাকষির কিছু সুযোগ থাকা জরুরি। এই কাজটা পরিকল্পনা কমিশনের মাধ্যমে করা যেতে পারে। সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনা নেহরুর আমলেই পরিত্যক্ত হয়েছে। পরে বাতিল হয়েছে নেহরু পরিকল্পনাও। এদেশে এখন নেই সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পরিকল্পনা, এমনকি জাতি রাষ্ট্রের পরিকল্পনাও। নব্য-উদারবাদী স্তরে পৌঁছাতে উল্লঙ্ঘন দিলে হিতে বিপরীত হতে পারে। তার জেরে জনমনে সঞ্চারিত ক্ষোভ প্রবল প্রতিরোধের জন্ম দিতে পারে। তাই পরিকল্পনা কমিশন থাকুক। তবে তাকে চালাতে হবে নব্য উদারবাদী পথেই।

স্বাধীনতার পর দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের অঙ্গীকার এবং পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে সেই পথে অগ্রসর হবার কথা ঘোষিত হয়েছিল। ভারত সমাজতান্ত্রিক দেশ না হলেও সোভিয়েত ইউনিয়ন চীন প্রভৃতি দেশের অনুসরণে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে পরিকল্পিত অর্থনীতির পথকে বেছে নিয়েছিল। এর পেছনে প্রধানত দুটি কারণ ছিল। প্রথমত, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে কংগ্রেসের মুখ্য ভূমিকা থাকলেও বামপন্থীদের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানের কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। তাই স্বাধীনতার পর দেশের রাজনৈতিক অবস্থার বাস্তবতা অনুধাবন করে নেহরু পরিকল্পনা কমিশন গঠন করে পরিকল্পিত অর্থনীতির পথে পা বাড়িয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর আমলেই তাঁর পথ থেকে নিজেই বিচ্যুত হতে শুরু করেন জাতীয় বুর্জোয়া ও জাতীয় পুঁজির চাপে তাদের স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে। তাই শুরুতে রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগে এবং মৌলিক ও ভারী শিল্পে রাষ্ট্রীয় প্রভাব বিস্তারে অগ্রাধিকার থাকলেও ধাপে ধাপে বেসরকারি পুঁজি গুরুত্ব পেতে শুরু করে। পরে ইন্দিরা গান্ধী ও রাজীব গান্ধীর আমলে অর্থনীতিতে নেহরুর ভাবনা মুছে গিয়ে জাতীয় পুঁজির সঙ্গে বিদেশি

পুঁজির ও কদর বাড়তে থাকে। আর নব্য-উদারনৈতিক সংস্কার চালু হবার পর অর্থনীতি থেকে রাষ্ট্রকে উৎপাটিত করে জাতীয় পুঁজির সঙ্গে বিশ্বায়িত পুঁজির সম্পর্ক তৈরি শুরু হয়। এখন জাতীয় পুঁজির বৃহদায়তন একাংশ এবং বিশ্বায়িত পুঁজির হাতেই দেশের অর্থনীতিকে সমর্পণ করার উদ্যোগ শুরু হয়েছে।

স্বাধীন ভারতের সাত দশকের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ধারণার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিচার করলে অনেকটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। এতদিন বুর্জোয়া জাতি রাষ্ট্রকে চিহ্নিত করা হতো সবশ্রেণির উর্ধ্ব সব শ্রেণির স্বার্থ রক্ষাকারী হিসেবে। কিন্তু এখন মনে করা হচ্ছে বুর্জোয়া জাতি রাষ্ট্র হল বিশ্বায়িত কর্পোরেট পুঁজির স্বার্থে নিবেদিত। যুক্তি হলো বিশ্বায়িত পুঁজির স্বার্থ মানে বাকি রাষ্ট্রেরও স্বার্থ। রাজনৈতিক অর্থনীতির এই পরিবর্তিত ধারণা থেকেই নেহরুর রাষ্ট্রভাবনায় বদল আনা হচ্ছে। এমনকি এটাও মনে করা হচ্ছে উদারনীতির পথে খণ্ড খণ্ড পরিবর্তন যথেষ্ট নয়, দরকার ভারত রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কাঠামোটাতেই বদলে ফেলে পূর্ণাঙ্গ নব্য-উদারবাদী রাষ্ট্র করা।

বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ প্রভাত পট্টনায়ক লিখেছেন, এ ধরনের একটা নব্য উদার রাষ্ট্র মানে নিছক কিছু নব্য উদারবাদী নীতি বা কর্মসূচি গ্রহণ নয়। এখানে শক্তিশালী হয়ে ওঠে বিশেষ কিছু প্রাতিষ্ঠানিক ও কাঠামোগত চেহারা। যেমন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের স্বায়ত্তশাসন, অর্থমন্ত্রককে সুপার মন্ত্রক রূপান্তর যাতে অন্য সব দপ্তরের ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে পারে ইত্যাদি। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ও অর্থমন্ত্রকের শীর্ষ পদে সেইসব ব্যক্তিদের নিয়োগ হচ্ছে যারা আই.এম.এফ.-বিশ্বব্যাঙ্ক বা বিশেষ কয়েকটি বিশ্বায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বর্তমান বা প্রাক্তন কর্মী। জনগণের দ্বারা নির্বাচিত রাজনৈতিক প্রতিনিধিদের থেকে আমলাদের ক্ষমতাবৃদ্ধি করা। এই আমলাদেরই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় বিশ্বায়িত পুঁজির স্বার্থরক্ষাকারী বিশ্ববিদ্যালয় বা বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। যুক্তি হাজির করা হয় রাজনৈতিক প্রতিনিধিরা দুর্নীতিগ্রস্ত। তাই মৌলিক অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের ওপর ভরসা করা যায় না। এটা আংশিক সত্য হলেও বাস্তব অভিজ্ঞতা হলো আমলারাও কোনো অংশে রাজনৈতিক প্রতিনিধিদের থেকে কম দুর্নীতিগ্রস্ত নয়। তার চেয়েও বড় সত্য হলো বেপরোয়া সংস্কার ও বেসরকারিকরণই ঢালাও দুর্নীতির উৎসমুখ খুলে দিয়েছে। কয়লা দুর্নীতি, টেলিকম দুর্নীতি ইত্যাদি তারই জ্বলন্ত নিদর্শন। এতে রাজনৈতিক প্রতিনিধি, আমলা, শিল্পপতি কেউই পিছিয়ে নেই। উল্টে তাদের মধ্যে গড়ে উঠেছে দুর্নীতির লক্ষ্যে গভীর অশুভ ঐক্য।

পট্টনায়কের মতে নেহরুর আমলে গড়ে ওঠা রাষ্ট্রব্যবস্থাকে পরিবর্তন করে নব্য-উদারবাদী রাষ্ট্র গড়ে তোলা সহজ কাজ নয়। এর জন্য প্রথমত দরকার অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার রাজনীতির গণ্ডি থেকে মুক্ত করা। তাতে যে-কোনো দল বা জোট ক্ষমতায় এলেও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কোনো প্রভাব পড়বে না। একই নীতি অনুসৃত হবে। ভারতে এই প্রক্রিয়া স্পষ্ট লক্ষ করা যাচ্ছে।

নব্য-উদারবাদী রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যদি বৃহৎ জাতীয় পুঁজি ও বিশ্বায়িত পুঁজির স্বার্থবাহী হয় তাহলে সেখানে অর্থনীতিতে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ যেমন অব্যঞ্জনীয় তেমনি পরিকল্পনা কমিশনই অপ্রাসঙ্গিক। বর্তমানে পরিকল্পনা কমিশনের ভবিষ্যৎ নিয়ে যে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে এটাই তার প্রেক্ষাপট। কিন্তু বামপন্থীরা রাষ্ট্রের এই রূপান্তরকে কোনো অবস্থাতেই মেনে নিতে পারে না। নব্য-উদারবাদের বিরুদ্ধে বামপন্থী অবস্থান আদর্শগত। কারণ এই ব্যবস্থা সমাজের অপরাপর সব অংশের অধিকার হরণ করে অল্পসংখ্যক মানুষের হাতে সম্পদ মজুত করে। অর্থাৎ সমাজে

ধনবৈষম্য ও সম্পদ বৈষম্যকে সর্বোচ্চ স্তরে নিয়ে যায়। বামপন্থীরা যেহেতু বৈষম্যের অবসান চান তাই নব্য-উদারবাদের বিরুদ্ধে তাদের লড়াই প্রশস্ত। নব্য-উদারবাদের অনুযায়ী যেহেতু পরিকল্পনা কমিশন আক্রান্ত তাই কমিশনকে রক্ষা এবং তার ঘোষিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পরিচালিত হওয়ার জন্যও বামপন্থীদের লড়াই চালাতে হবে।

প্রাক-স্বাধীনতা ও স্বাধীনতার ভারতে বামপন্থীদের প্রভাব এবং অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে উঠে আসার প্রেক্ষাপটে সংবিধান রচনা, পরিকল্পনা কমিশন গঠন ও তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঘোষণায় বামপন্থীদের পুরোপুরি অস্বীকার করার উপায় ছিল না। অংশত সেই কারণেই সংবিধানে ভারত রাষ্ট্রকে সমাজতান্ত্রিক বলে বিবেচিত করা হয়েছিল। তেমনি দেশে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের অর্থনীতি গড়ে তোলার অঙ্গীকার করা হয়েছিল। স্বাভাবিকভাবেই পরিকল্পনা কমিশন গঠন করে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নকে বামপন্থীরা স্বাগত জানিয়েছিল। পাশাপাশি যখনই ঘোষিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুতি নজরে এসেছে তখনই তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার জন্য যে খসড়া দলিল তৈরি করা হয়েছিল তাতে সামান্য পরিমাণে হলেও বিদেশি একচেটিয়া পুঁজি, নানা ধরনের ভারতীয় সামন্তপ্রভু এবং বৃহৎ ভারতীয় বাণিজ্যিক সংস্থার কায়েমি স্বার্থকে খর্ব করার কথা বলা হয়েছিল। সেজন্য পরিকল্পনার রূপায়ণ শুরু হওয়া মাত্র এই কায়েমি স্বার্থবাদীরা ক্ষোভে ফেটে পড়ে এবং এই পরিকল্পনা রূপায়ণের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে। পাশাপাশি এরা একে ব্যক্তিগত স্বার্থের মূলে কুঠারাত বলে চোঁচাতে থাকে। এরাই শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসের বিরুদ্ধে স্বতন্ত্র পার্টি গঠন করে। এই ঘটনা থেকে একটা বিষয় পরিষ্কার হয়ে যায় যে বুর্জোয়া-জমিদারদের নেতৃত্বে পরিচালিত কংগ্রেস দল ও সরকার সামান্য পরিমাণে হলেও জাতীয় স্বার্থরক্ষার চেষ্টা করেছে। আর এই কারণেই অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রতি সমর্থনে এগিয়ে এসেছিল। স্বতন্ত্র পার্টি ও অন্যান্য সংগঠনের যারা সামন্তপ্রভু তথা দেশি-বিদেশি একচেটিয়া পুঁজির হয়ে ওকালতি করছিল তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামেও সামনের সারিতে ছিল অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি।

এর অর্থ এই নয় যে সর্বক্ষেত্রে নেহরু সরকারকে সমর্থন করা। নেহরুর নেতৃত্বে পরিকল্পনা যারা রচনা করেছিলেন তাঁরা যেভাবে বুর্জোয়া ও সামন্তপ্রভুদের সঙ্গে সমঝোতার পথ অনুসরণ করছিলেন কমিউনিস্টরা তার তীব্র বিরোধিতা করেছিল। এমনকি পার্টির সর্বভারতীয় কংগ্রেসেও বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছিল। পার্টির চতুর্থ কংগ্রেসে গৃহীত এক প্রস্তাবে বলা হয় : “মূল পরিকল্পনা কাঠামোয় যে প্রস্তাব করা হয়েছিল তাতে প্রতিক্রিয়া অভিমুখী পরিবর্তন করা হয়েছে।”

প্রস্তাবে আরও বলা হয় : “পরিকল্পনার খসড়ায় তুলনামূলকভাবে প্রগতিশীল যে-সমস্ত প্রস্তাব ছিল সেগুলি আজ গুরুতর পরীক্ষার সম্মুখীন। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, ভূমি-সংস্কার সংক্রান্ত প্রস্তাবগুলির রূপায়ণের জন্য শক্তিশালী কৃষক আন্দোলন গড়ে তোলা না গেলে রাজ্য সরকারসমূহের ভেতরে ইতিমধ্যেই বাসা বেঁধে থাকা ভূস্বামী স্বার্থরক্ষাকারী শক্তিসমূহ এবং আমলাতন্ত্র ভূমি-সংস্কার সংক্রান্ত প্রস্তাবসমূহ রূপায়ণের ক্ষেত্রে গুরুতর অন্তর্ঘাত সৃষ্টি করতে সফল হয়ে থাকে।”

সেইজন্য প্রস্তাবে বলা হয়েছে, “মূল পরিকল্পনা কাঠামোর পুনরুদ্ধার ও পূর্ণ রূপায়ণের জন্য লড়াই করা, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রগতিশীল ভূমি-সংস্কারের প্রস্তাবগুলি রূপায়ণের জন্য লড়াই করা

এবং দেশের দ্রুত শিল্পায়নের স্বার্থে দ্বিতীয় পরিকল্পনার আরও অগ্রগতির জন্য লড়াই করা” অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে। “পরিকল্পনার জন্য সম্পদ সংগ্রহের ক্ষেত্রে এই পরিকল্পনায় যে-সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল পদক্ষেপের প্রস্তাব রয়েছে সেগুলির বিরুদ্ধে লড়াই করা, তাকে প্রতিরোধ করা এবং এ-ব্যাপারে জয়ী হওয়াটা একান্ত জরুরি। ঠিক অনুরূপভাবেই জরুরি হল জনগণের উদ্যোগ গড়ে তুলে সমাজকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলি থেকে সাধারণ মানুষের স্বার্থে সর্বোচ্চ সুবিধা আদায়ের জন্য নিরন্তর লড়াই চালিয়ে যাওয়া এবং সমাজকল্যাণমূলক প্রকল্প রূপায়ণের ক্ষেত্রে আমলাতান্ত্রিকতা, দুর্নীতি, স্বজনপোষণ ও অপচয় প্রতিরোধ করা।”

এই প্রস্তাবের সংযোজনীতে পরিকল্পনা প্রস্তাবের বিকল্প একগুচ্ছ প্রস্তাব পেশ করা হয়। এই প্রসঙ্গে ই এম এস নাসুদিরপাদ লিখেছেন, “যে শ্রেণিগত অবস্থানের ওপর ভিত্তি করে পরিকল্পনা রচিত হয় তাকে চ্যালেঞ্জ জানানোই হলো এই বিকল্প প্রস্তাবের লক্ষ্য। যদিও পার্টির পক্ষ থেকে কোনো বিকল্প পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়নি। তবুও পার্টি পরিকল্পনার শ্রেণিনিতিসমূহ কীভাবে পরিবর্তিত হওয়া উচিত তারই একটা রূপরেখা অঙ্কন করে। আর এ কাজ করতে গিয়ে পার্টি মনে করেছিল যে, ভারতের মতো পিছিয়ে পড়া দেশের অনগ্রসরতা কাটিয়ে ওঠার একমাত্র উপায় হলো সমগ্র পরিকল্পনা প্রক্রিয়াকে সাম্রাজ্যবাদ, একচেটিয়া পুঁজিবাদ ও সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা। পরিকল্পনা যাতে পুঁজিবাদী বিকাশের পথ ধরে না চলে এই সংগ্রাম সে বিষয়েও নিশ্চয়তা সৃষ্টি করবে।”

তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শেষ হবার পর থেকেই পরিকল্পনায় সঙ্কট ঘনীভূত হতে থাকে। এই সময় ১৯৬৮ সালে জাতীয় উন্নয়ন পর্যদের কাছে এক লিখিত নোট পাঠিয়েছিলেন নাসুদিরপাদ। মূলত চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা তিন বছর স্থগিত থাকার বিষয়টিই তিনি নোটে ব্যাখ্যা করেছিলেন। ওই নোটে সঙ্কটের পেছনে অন্যান্য অনেক কারণের পাশাপাশি উল্লেখ করেছিলেন, “দেশের বস্তুগত ও মানবসম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহারের দ্বারা অর্থনীতির অতি দ্রুত শিল্পায়ন এবং আর্থ-সামাজিক ক্রিয়াকলাপের সর্বক্ষেত্রে আধুনিকীকরণ করাই পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য। অথচ যে সমস্ত নীতি প্রণীত বা অনুসৃত হয়েছে তা এই লক্ষ্যের সঙ্গে যথেষ্ট সঙ্গতিপূর্ণ না হওয়াটাই পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার সঙ্কটের মূল কারণ।”

এই আলোচনা থেকে একটা বিষয় পরিষ্কার যে, ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার স্বর্ণযুগ বলতে যে সময়টাকে বোঝায় সেই সময় থেকেই মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থেকে তার বিচ্যুতি শুরু হয়েছে। পরবর্তীকালে তা আরও প্রকট হয়েছে। ১৯৯১ সালে উদারনীতি চালু হবার পর পরিকল্পনা কমিশন রূপান্তরিত হয় উদারনীতি রূপায়ণের হাতিয়ারে। জাতীয় স্বার্থে ও জনস্বার্থের বদলে কমিশনের কাজ হয়ে দাঁড়ায় দেশি-বিদেশি বৃহৎ পুঁজির স্বার্থবাহী প্রকল্প প্রস্তাব রচনা করা এবং সেইমতো পরামর্শ দেওয়া। এখন পুঁজির প্রতিনিধিত্বকারীরা মনে করছে পুঁজির স্বার্থে কমিশনের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। তাই মোদী সরকার একে গুটিয়ে ফেলার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে। এর বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে হবে বামপন্থীদের। পরিকল্পনা কমিশনকে রক্ষা করাই যথেষ্ট নয়, তার ঘোষিত মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে পুনরুদ্ধারের জন্যও লড়াই চালাতে হবে। এই লড়াই একাধারে জাতীয় স্বার্থে এবং জনস্বার্থে।

১৯৫০ সালের যে বাস্তব অবস্থার মধ্যে পরিকল্পনা কমিশন গঠিত হয়েছে সেই বাস্তবতা এখন নেই। ভারত রাষ্ট্র ও ভারতীয় সমাজে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। পুঁজিবাদী পথে ভারতীয় সমাজের বিকাশ অনেকটা এগিয়ে গেলেও সামন্ততন্ত্র থেকে তার বিচ্ছেদ হয়নি। তাই পরিকল্পনা কমিশন আগের মতোই অটুট থাকবে এমনটা ভাবার কারণ নেই। সময়ের সঙ্গে এবং পরিবর্তিত বাস্তবের সঙ্গে তাল রেখে তার কাঠামোগত ও কার্যক্রমগত পরিবর্তন অবশ্যই হবে। কিন্তু তাই বলে গোটা পরিকল্পনা ব্যবস্থা এবং পরিকল্পনা কমিশনটাই তুলে দিতে হবে তা সমর্থনযোগ্য নয়। কমিশন গঠনের পেছনে যে প্রধান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ঘোষিত হয়েছিল তার অন্যতম হলো দেশের প্রাকৃতিক ও মানবসম্পদের সুপরিচালিত ব্যবহার, আয় ও সম্পদের বন্টনে বৈষম্য এবং আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণ। মুক্তবাজার অর্থনীতি এই লক্ষ্য কোনোদিন পূরণ করতে পারেনি, আর পারবেও না। তাই পরিকল্পনা কমিশনের প্রয়োজন এখনো ফুরিয়ে যায়নি।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশের সুসংহত ও সামগ্রিক বিকাশের প্রক্রিয়া সাধারণত সমাজতান্ত্রিক দেশে অনুসৃত হয়ে থাকে। রুশ বিপ্লবের পর লেনিনের নেতৃত্বে রুশ দেশেই পরিকল্পিত অর্থনীতির এই বিশেষ মডেলটি পূর্ণাঙ্গ চেহারা নেয়। তার আগে অন্যান্য বুর্জোয়া দেশেও পরিকল্পনা ছিল। বিশেষ করে স্বাধীন-সার্বভৌম জাতিরাষ্ট্রে পরিকল্পনার গুরুত্ব ছিল। কিন্তু সুসংহত কাঠামো ও সুনিপুণ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তা কোনো মডেল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেনি। রুশ দেশে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির কার্যকর প্রয়োগ সম্ভব হয়েছে। এই পথেই অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে একটা অনুন্নত পশ্চাৎপদ দেশ আমেরিকার মতো বিশ্বের সর্বোন্নত দেশের সমকক্ষ হয়ে উঠেছিল। সব মানুষের ন্যূনতম সাধারণ চাহিদা পূরণ করেও বিজ্ঞান-প্রযুক্তির গবেষণা ও প্রয়োগে, শিল্প বিকাশে, শিক্ষা-সংস্কৃতি-সাহিত্য-ক্রীড়া ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রে অভাবনীয় অগ্রগতি ঘটিয়েছিল। পরবর্তীকালে পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশ—চীন, কিউবা, ভিয়েতনাম প্রভৃতি দেশ নিজ নিজ বাস্তবতার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে স্বল্প-মধ্য-দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার মাধ্যমে সামগ্রিক ও সংহত উন্নয়নের পথে এগিয়েছে। আজ চীনের যে অভাবনীয় অগ্রগতি, বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে আমেরিকাকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে, তার পেছনে পরিকল্পনা কমিশনের অবদান উপেক্ষা করার উপায় নেই।

বিকাশের একটা স্তর অতিক্রম করে ১৯৯৮ সালে চীন পরিকল্পনা কমিশন তুলে দিয়ে সমকালীন বাস্তবতার উপযোগী নতুন প্রতিষ্ঠান গঠন করেছে। চীনের অবস্থায় কত বছর পর ভারত পৌঁছাবে বা আদৌ পৌঁছাবে কি না তা স্পষ্ট নয়। তেমনই উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সৃষ্ট সম্পদের সুখম বন্টন এবং সমাজে আয়-বৈষম্য ও সম্পদ-বৈষম্য দূরীকরণে চীন যতটা সফল হয়েছে ভারত তার ধারে কাছেও পৌঁছাতে পারেনি। বরং উল্টো পথেই অনেকটা এগিয়ে গেছে। তাই পরিকল্পনা কমিশন তুলে দেবার পক্ষে চীনের উদাহরণ তামাম ভারতে সমর্থনযোগ্য নয়। নব্য উদারনীতি তথা মুক্তবাজার অর্থনীতিতে যেখানে রাষ্ট্রের কোনো ভূমিকা গ্রাহ্য হয় না, সেখানে পরিকল্পনা কমিশন অস্পৃশ্য হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। তাই নব্য উদারনীতির বিরুদ্ধে চলমান সংগ্রামে পরিকল্পিত অর্থনীতির ব্যবস্থাকে রক্ষা করার সংগ্রামকেও যুক্ত করে নিতে হবে।

With best compliments of

M/S PRAKASH CONSTRUCTION

FABRICATOR, ERECTOR, MECHANICAL, CIVIL CONTRACTOR
&
GENERAL ORDER SUPPLIER

Qr. No. L/32, Sagarbhangha Colony, Durgapur-713211
Phone : 2558523, Mobile : 9332017271, 9932653994

Sl. No. 172

With best compliments of

M/S SREE KHAITAN TRADERS

Hattala Road, Durgapur-713201

Sl. No. 177



তেভাগার ঐতিহ্য ও সমকালীন বাংলা

আমিনুল ইসলাম

বাংলার কৃষক আন্দোলনের ইতিহাসে তেভাগা আন্দোলন এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ফসলের ভাগ দেওয়ার শর্তে মালিকদের জমি যাঁরা চাষ করেন তাঁরা বর্গাদার বা ভাগচাষি। ফসলের অর্ধেক ভাগ পেতেন বলে উত্তরবঙ্গে এই ভাগচাষিরা আখিয়ার নামে পরিচিত। বর্গাদার-ভাগচাষিদের ওপর জমিদার, জোতদার ও পরগাছা জমির মালিকদের সীমাহীন শোষণ-পীড়ন, অবিচার, বঞ্চনা ও ব্যভিচারের বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশই ছিল এই গণআন্দোলনের উৎস। ভাগচাষির ক্ষেত্রে কোনোরকম আইনি সুযোগ-সুবিধা ছিল না। উৎপাদনের খরচ প্রধানত তাদেরই বহন করতে হতো। তা সত্ত্বেও বর্গাদার-আখিয়াররা পেত ফসলের অর্ধেক ভাগ, আর অর্ধেক ভাগ পেত মালিক। ১৯৪৬ সালে ধান কাটার সময় বর্গাদারেরা ফসলের ‘তেভাগা’ অর্থাৎ দুই-তৃতীয়াংশের দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। সরাসরি বর্গাদার-আখিয়ারদের স্বার্থ জড়িত থাকায় গ্রামবাংলায় সবচেয়ে বঞ্চিত ভূমিহীন খেতমজুর শ্রেণি এই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং আন্দোলন জঙ্গিরূপ ধারণ করে।

ভারতে ইংরেজ রাজত্বের শেষ লগ্নে কৃষক আন্দোলনের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয় কৃষকসভার নেতৃত্বে। ১৯৩৬ সালে গঠিত হয় সারা ভারত কৃষকসভা। লাল পতাকার নিচে বৈপ্লবিক চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কৃষকসভা গড়ে তুলতে চেষ্টা করে এক শ্রেণি-সচেতন কৃষক আন্দোলন। কৃষকসভার নেতারা বলতে থাকেন, স্বাধীনতা সংগ্রাম যদি জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায় তাহলে কৃষকদের সমস্যার সমাধানের কথা ভাবতে হবে। তারা এক নতুন ধরনের জাতীয় বিপ্লবের কথা বলতে শুরু করেন, কৃষি বিপ্লব হবে যার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এই চিন্তাধারা থেকে কৃষক সমস্যা

সমাধানের ভাবনা নিয়ে কৃষকসভার পক্ষ থেকে একটি বৈপ্লবিক গণতান্ত্রিক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়, যার মূল ধ্বনি ছিল জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ। তেভাগা এই নতুন ধরনের কৃষক আন্দোলনের এক উজ্জ্বল উদাহরণ। এই আন্দোলন ছিল মূলত বর্গাদার তথা ভাগচাষিদের ন্যায় অধিকার আদায়ের সংগ্রাম।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বছরগুলিতে ইংরেজ সরকারের পাশবিক শোষণনীতি বাংলার কৃষকের জীবনে নিয়ে এসেছিল ঘোর অন্ধকার—পঞ্চাশের মন্বন্তর ছিল এরই পরিণতি। সবার আগে ভাগচাষিরা, ভূমিহীনরা বিশেষ করে গরিব চাষিরা এই মন্বন্তরের শিকার হল। মন্বন্তরে চাষির দুর্দশার সুযোগ নিয়ে গ্রামাঞ্চলে এক ক্ষুদ্র শোষণ শ্রেণি—জোতদার-জমিদার-মহাজন—ফুলে ফেঁপে উঠল। গরিব চাষিরা নিজের জমি জোতদারের কাছে বিক্রি করে ভাগচাষি হিসেবে সেই জমি চাষ করতে লাগল। ফলে সমস্ত জমি-সম্পদ কেন্দ্রীভূত হল জোতদার ও জমিদারদের হাতে। এই অবিচারের বিরুদ্ধে কৃষকসভা ১৯৪৬-এর সেপ্টেম্বর মাসে আন্দোলন শুরু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

তেভাগা আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য—এটি ছিল রাজনীতি সচেতন আন্দোলন। কমিউনিস্ট পার্টি ছিল এই আন্দোলনের সংগঠক। আন্দোলনের কর্মসূচি ও কর্মকৌশল পার্টি কর্তৃক স্থিরীকৃত হয়েছিল। পার্টি-পরিচালিত আন্দোলন বলেই এই আন্দোলন কোনো আঞ্চলিক গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ থাকেনি। এক পার্টির নেতৃত্বে এক দাবি নিয়ে উত্তরবঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ, নিম্নবঙ্গের কৃষকেরা একসঙ্গে এক আওয়াজের ভিত্তিতে লড়াই চালাতে সক্ষম হয়েছিল। কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত আন্দোলন বলেই এতো শিক্ষিত নেতা ও ক্যাডার কৃষকদের সঙ্গে মিশে কৃষকদের মনে সাহস ও আত্মবিশ্বাস সঞ্চার

করতে পেরেছিল এবং কৃষকদের চেতনার মান উন্নয়নে সাহায্য করেছিল।

১৯৪৬ সালে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে উত্তরবঙ্গের দিনাজপুর, রংপুর, জলপাইগুড়ি জেলার অন্তর্গত দেড় হাজার মাইল জুড়ে, পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহ জেলার ৫০টি গ্রামে, পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলার ৩০টি গ্রামে এবং মধ্য ও দক্ষিণবঙ্গের যশোর জেলার ৫টি থানার তিন শত বর্গমাইল জুড়ে, ২৪ পরগণার বিশাল কাকদ্বীপ অঞ্চলে ও খুলনার ডুমুরিয়া থানায় তেভাগা আন্দোলন এক ব্যাপক গণসংগ্রামের রূপ নেয়।

বাংলার গ্রামগুলিতে ঢোল-নাকাড়া বেজে ওঠে, আর ধ্বনি ওঠে—‘আধি নয় তেভাগা’। হিন্দু-মুসলমান, সাঁওতাল, গুঁরাও কৃষকরা সজ্জবদ্ধ হয়ে ধান কেটে নিজ উঠোনে তোলে, অথবা মাঠেই ভাগ করে একভাগ মালিককে দিয়ে দুই ভাগ নিজ বাড়িতে নিয়ে যায়। দেখতে দেখতে এই তেভাগার আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে এগারোটি জেলায়। ষাট লক্ষ ভাগচাষি আন্দোলনে যুক্ত হয়। জেলায় জেলায় গানে গানে, স্লোগানে একটি সুরই শোনা যায়—‘জান দেব তো ধান দেব না’। উত্তরবঙ্গ থেকে সুন্দরবন, ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা তেভাগার ধ্বনিতে উত্তাল হয়ে উঠল। কে হিন্দু কে মুসলমান এই প্রশ্ন যেন মুছে গেল। দেশবাসী অবাক হয়ে গেল এই একতা দেখে। ধানের লড়াই একতার লড়াইতে পরিণত হল।

এই তেভাগার লড়াইকে প্রতিরোধ করে কৃষকের ঐক্য ভাঙতে এগিয়ে এসেছিল জমিদারের দালাল, জোতদার, তালুকদাররা। তাদের সঙ্গে নামল পুলিশ বাহিনী, সরকারি পদস্থ কর্মচারীরা। সমুচিত জবাব দিয়েছিল গ্রামের চাষিরা। তখনই বোঝা গিয়েছিল হিন্দু-মুসলমান ব্যবধান কৃত্রিম ব্যাপার। অর্থনৈতিক প্রশ্নে, জমির লড়াইতে দুইয়ের এক হতে সময় লাগে না। ধর্মের ভিত্তিতে জাতি গঠনের প্রশ্ন স্বাভাবিক নয়।

তেভাগা কৃষক আন্দোলনে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যকার ঐক্যবোধ ও সম্প্রীতিচেতনা ছিল বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কলকাতাসহ অন্যান্য জায়গা যখন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ক্ষত-বিক্ষত, তখন তেভাগার দাবিতে আন্দোলনরত গ্রাম-এলাকাগুলো ছিল হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের জীবন্ত প্রতীক, গণতান্ত্রিক মহলের আশা-ভরসার স্থল। তেভাগার প্রথম শহিদ সমিরুদ্দিন-শিবরাম বাংলার মাটিতে রক্ত দিয়ে প্রমাণ করে গেছেন, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে শোষিতরা সবাই এক। তাই তেভাগার দাবিগুলোর সাথে তেভাগা আন্দোলনের অন্যতম প্রধান স্লোগান ছিল—‘হিন্দু-মুসলমান ভাই ভাই, মেহনতি মানুষের জাতিভেদ নাই।’

সাম্প্রদায়িক বিভেদ থেকে মুক্তির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত কুমিল্লা জেলার হাসানাবাদ-গালিমপুরের কৃষকদের দাঙ্গাবিরোধী ঐক্য। নোয়াখালিতে যখন দাঙ্গার আগুন জ্বলে উঠেছে, দলে দলে হিন্দুরা গ্রাম ত্যাগ করছে, সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলিম লিগের গুণ্ডারা বাড়ি-ঘর লুট করছে, তখন হাসানাবাদ-গালিমপুরের হিন্দু-মুসলমান কৃষক রুখে দাঁড়িয়েছিল দাঙ্গাবাজদের বিরুদ্ধে। ১৯৩৩-৩৪ সাল থেকে উচ্ছেদ ও মহাজনি প্রথার বিরুদ্ধে এবং ভাগচাষি আন্দোলনের অভিজ্ঞতায় এই অঞ্চলের কৃষকরা রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছিল, শ্রেণিচেতনায় সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে উঠতে পেরেছিল। কৃষক সমিতির নেতৃত্বে প্রায় দশ হাজার হিন্দু-মুসলমান কৃষক যুবক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করেছিল। তারা গ্রামীণ অস্ত্রাদি নিয়ে রাতদিন পাহারা বসিয়েছিল। নোয়াখালি থেকে আসা চার হাজার হিন্দু উদ্বাস্তুদের আশ্রয় দিয়েছিল, তাদের জন্য রিলিফ কিচেন খুলেছিল। নোয়াখালির দাঙ্গাকারীরা হাসানাবাদে আক্রমণোদ্ভূত হলে তাদের আঘাত করে, নৌকা ডুবিয়ে দিয়ে ফিরে

যেতে তারা বাধ্য করেছিল। তেভাগা আন্দোলনের শিক্ষা কত উন্নত স্তরে পৌঁছাতে পারে হাসানাবাদের কৃষক নেতারা সেই পথ দেখিয়েছিলেন। সেই সময়ে গান্ধীজি নোয়াখালিতে শিবির স্থাপন করে মন পরিবর্তনের পরীক্ষা করছিলেন। তাঁর উপস্থিতিতে এবং সরকারি সশস্ত্র পুলিশের উপস্থিতিতে দাঙ্গা প্রশমিত হয়েছিল, কিন্তু মন পরিবর্তন হয়েছিল বলা যায় না। হাসানাবাদের কৃষক নেতারা নোয়াখালি গিয়ে গান্ধীজিকে হাসানাবাদ পরিদর্শন করে হিন্দু-মুসলমান কৃষকদের ঐক্যের সংগ্রাম দেখে যেতে অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু তিনি সময় করে উঠতে পারেননি। ১৯৪৬-এর ভয়ঙ্কর দাঙ্গার পর হাসানাবাদ-গালিমপুরে তেভাগা আন্দোলনের শিক্ষা ঐক্যের পথ দেখিয়েছে।

উল্লেখ্য, ১৯৪৬-এর আগস্ট মাসে কলকাতায় ও অন্যান্য স্থানে যে বীভৎস সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেখা দেয় তার ক্ষত তখনও বাংলার বুক থেকে শুকিয়ে যায়নি। এই পটভূমিতে কৃষকসভা নিঃশ্ব ও গরিব মুসলিম কৃষকদের এক বড় অংশকে তেভাগা আন্দোলনে সমবেত করতে সক্ষম হয়েছিল। সংগ্রামের ময়দানে সাম্প্রদায়িকতা প্রবেশ করতে পারে না—এটা তেভাগা আন্দোলন নতুন করে প্রমাণ করল।

উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির মধ্যে তেভাগা আন্দোলন সবচেয়ে বেশি তীব্র আকার ধারণ করেছিল দিনাজপুর জেলায়। এই জেলার ৩০টি থানার মধ্যে ২২টি থানাতেই তেভাগা আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষ করে চিরির বন্দর, খাঁপুর এবং ঠাকুরগাঁও মহকুমা তীব্র আন্দোলনের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়াল। এই জেলায় মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষেরা ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ। ফ্লাউড কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী এই জেলায় বর্গায় চাষ হতো ১৪ শতাংশ জমি। আর অধিকাংশ জমিদার ছিলেন মুসলমান। এই জেলায় ২৫ একরের বেশি জমির মালিকের সংখ্যা প্রায় বাইশ শো। তার মধ্যে তের শো হলেন মুসলমান। এঁরা অধিকাংশ মুসলিম লিগ নেতা। এঁদের এক-একজনের আধিয়ারের সংখ্যা ৭৫ থেকে ২২৫ জন।

দিনাজপুরে মুসলিম লিগ, কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভা প্রত্যেক দলেই রাজ্যস্তরে জমিদার ও জোতদারের উপস্থিতি ছিল ব্যাপক। ফলে সরকার শীঘ্রই আন্দোলন দমন করার জন্য গ্রামে গ্রামে সশস্ত্র পুলিশ পাঠানো, কৃষককর্মী ও নেতাদের গ্রেপ্তার শুরু করে। দিনাজপুর জেলার চিরির বন্দর ছিল কৃষকসভার নতুন ঘাঁটি। কৃষকনেতা শচীন্দ্র চক্রবর্তীর নেতৃত্বে এই অঞ্চলের রাজবংশী, সাঁওতাল ও মুসলমান খেতমজুর ও আধিয়াররা তেভাগা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। ১৯৪৭-এর ৪ জানুয়ারি চিরির বন্দরে তালপুকুর গ্রামে পুলিশ একটি কৃষক মিছিলের ওপর গুলি চালায়। তৎক্ষণাৎ গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান সমিরুদ্দিন ও শিবরাম। পুলিশ নিহত শহিদ সমিরুদ্দিনের স্ত্রী ও মুন্সি লাল মহম্মদের স্ত্রীর ওপর অকথ্য অত্যাচার চালায়। এই ঘটনার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল একজন মুসলিম খেতমজুরের প্রথম শহিদত্ববরণ এবং মুসলিম বর্গাদারদের ব্যাপক অংশগ্রহণ। ফলে রক্তঝরা মাঠে হিন্দু-মুসলিম আধিয়ার ও খেতমজুরের ঐক্য সুদৃঢ় হয়।

চিরির বন্দরে গুলি চালানোর ঘটনার কয়েকদিন পর, তৎকালীন ভূমিরাজস্ব মন্ত্রী ফজলুর রহমান সিরাজগঞ্জের এক সভায় ‘দ্য বেঙ্গল বর্গাদার টেম্পোরারি রেগুলেশন বিল’-এর আভাস দেন। ১৯৪৭-এর ২২ জানুয়ারি ‘ক্যালকাটা গেজেট’-এ বিলটি প্রকাশিত হয়।

এই বিলের খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে দিনাজপুর জেলায় মুসলিম বর্গাদারদের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য হারে বেড়ে যায়। মুসলিম লিগ এবং নবগঠিত মুসলিম ‘ন্যাশনাল গার্ড’-এর প্রচার

সত্ত্বেও বহু মুসলিম কৃষকসভায় যোগদান করেন। অনেকে সময় তাঁরা লিগের পতাকায় কাস্তে-হাতুড়ি এঁকে দেন। তরুণ মৌলবির গ্রামসভায় আন্দোলনের পক্ষে বক্তৃতা দেন। দিনাজপুরের আইনজীবী ও কৃষকসভার নেতা হাজি মহম্মদ দানেশ কোরান থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বিভিন্ন জায়গায় জোতদারি ব্যবস্থা এবং চড়া সুদ নেওয়ার কঠোর সমালোচনা করেন। ফলে বহু মুসলিম খেতমজুর ও আখিয়ার এই আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে।

দিনাজপুর জেলার পতিরাম (বালুরঘাট) থানার অন্তর্গত খাঁপুর (শহিদ তীর্থ) ছিল তেভাগা আন্দোলনের শক্ত ঘাঁটি। ১৯৪৭ সালের ১৯-২০ ফেব্রুয়ারি রাতে ভ্যানে করে একদল পুলিশ খাঁপুরের জমিদার অসিতমোহন সিংহরায়-এর বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালে, স্থানীয় কৃষকেরা প্রতিরোধ গড়ে তোলে। পুলিশ গুলি চালানো শুরু করলে, কৃষকেরা তার জবাবে তির ছুঁড়তে শুরু করে। সামনের সারিতে থেকে চিয়ার শাই শেখ লাঠি হাতে পুলিশকে আক্রমণ করেন। তখন পুলিশ তাঁকে গুলি করে হত্যা করে। শুধুমাত্র একদিনে খাঁপুরের এই ঘটনায় পুলিশের গুলিতে ২১ জন শহিদ হলেন।

কবির ভাষায় বিষয়টি আরো সংগ্রামী রূপ লাভ করে। কমিউনিস্ট নেতা কালী সরকার পরে রাজশাহী জেলে বসে এক দীর্ঘ জঙ্গ গান বাঁধেন ঐ লড়াইয়ের বর্ণনা দিয়ে। গানটি নাকি খাপড়ার নানকিং বিজয় উৎসবে গীত ও প্রশংসিত হয়। জঙ্গ গান মুসলমানদের মরহমের গান—কারবালা যুদ্ধের বর্ণনা দেওয়া হয় সেখানে। এক ধর্মযুদ্ধের জঙ্গি সুর অনায়াসে খাপ খেয়ে যায় আরেক যুদ্ধের গানে—

একে একে বলে যাই শোনের বন্ধুগণ—

খাঁপুর যুদ্ধের কথা করিব বর্ণন।।

১৩৫৩ সাল মাঘ মাসের শেষে

তেভাগার রণে কৃষক কুদিল সাহসে।।

ভালুকা বাঁশের ধনুক নিল হস্তেতে তুলিয়া

চোখা চোখা তীর নিল পৃষ্ঠেতে বাঁধিয়া

দলে দলে কৃষক সাজে বলে মার মার

কোমর বান্ধিয়া সবে হৈল তৈয়ার।।

যুটিযুটি আন্ধার রাতে ম্যাঘের ঝড়ে পানি

জালিমে এই রাতে বুঝি করিবে দুষমনি।।

পৃষ্ঠে বান্ধি ধনুক তীর চোঙ লইয়া করে

ভোলন্টি পাহারা দেয় পতিরামের মোড়ে।।

তারপর গ্রামে ট্রাকে চড়ে মিলিটারির প্রবেশ, প্রথমে ঝাঁটা হাতে মেয়ে ‘ভোলন্টি’-দের প্রতিরোধ, তারপর মিলিটারির সঙ্গে কৃষক সৈন্যের সম্মুখ যুদ্ধ, সেখানে নেতৃত্ব দেন কৃষক নেতা চিয়ারসাই—

ছুটিল চিয়ারসাই হস্তে মোটা লাঠি

জোয়ান মর্দ বাপের ব্যাটা ৩৮ ইঞ্চি ছাতি।।

দোহতিয়া বাড়ি মারে সৈন্যের মাথায়

বাপ ডাক ছাড়ি সৈন্য টলে পড়ে যায়।।

হঠাৎ লাগিল গুলি বাম কাঁধের পরে

ক্রোধ ভরে বাপের ব্যাটা যায় নিজ ঘরে

ঘর হতে চিয়ারসাই শাবল এক আনিল

সবলে ট্রাকের চাকা কাটিতে লাগিল।।

আর এক গুলি চিয়ারসাইয়ের বুকে ফোট

আনধার হইল দুনিয়াদারি চেতন গেল টুটে।।

এরপর একুশ শহিদের রক্তে লাল ঝাণ্ডা আরো লাল করে কারবালার যুদ্ধের মতোই খাঁপুর সংগ্রামের ট্রাজিক সমাপ্তি।

যাই হোক, দিনাজপুর জেলার তেভাগা আন্দোলনের অন্য একটি শক্তিশালী কেন্দ্র ঠাকুরগাঁ মহকুমা। এই অঞ্চলের আন্দোলন পরিচালনার দায়িত্ব পান প্রখ্যাত আইনজীবী ও কৃষকনেতা হাজি

মহম্মদ দানেশ ও ভুজেন পালিত। হাজি মহম্মদ দানেশ ব্যাখ্যা করেন যে, হিন্দু-মুসলমান বিভেদ নয়, কৃষক ঐক্যই তাদের শক্তি। ১৯৪৭ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি পুলিশ আবার ঠাকুরগাঁ পশ্চিম অঞ্চল ঠুনকিয়ায় গুলি চালিয়ে মুসলিম কমরেড সুকুরচাঁদ ও তাঁর স্ত্রী-সহ চারজন কৃষককে হত্যা করল। এই ঘটনার পর ২৫ ফেব্রুয়ারি কয়েক হাজার কৃষক ঠাকুরগাঁয়ে মিছিল করে যান। এই সময়ে পুলিশের গুলিতে নিহত হন হীরামন মহম্মদ (মুসলিম আখিয়ার)-সহ দুইজন রাজবংশী কৃষক। পূর্ব ঠাকুরগাঁ রাজবংশী কৃষকদের অন্যতম নেতা নিয়ামত আলি এই ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হন।

উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলায়ও বর্গাদারদের সংগঠিত করে তেভাগা আন্দোলন শুরু হয়। কিছুদিনের মধ্যেই আন্দোলন জেলার অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ে। জেলার দেবীগঞ্জ, বোদা ও পচাগড় থানার গ্রামগুলিতে তীব্র হয়ে উঠেছিল। জলপাইগুড়িতে ব্রিটিশ ভেদনীতির ফলে জমিদারদের বড়ো অংশ ছিল মুসলিম, আর কৃষকেরা প্রধানত ‘নিচু জাতের’ হিন্দু। কিন্তু তেভাগা আন্দোলন চলাকালীন জলপাইগুড়িতে একটিও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ঘটনা ঘটেনি। বর্তমান উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর মহকুমার অবিস্মরণীয় কৃষক নেতা বাচ্চা মুন্সি বোদা থানায় তেভাগা আন্দোলন সংগঠিত করেন। ১৯৪৬ সালের ২৩ নভেম্বর পচাগড়ে ড. রফিকুদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে বোদা ও পচাগড় থানার বিভিন্ন ইউনিয়নের কৃষকদের এক সভা হয়। উক্ত সভায় বাচ্চা মুন্সি তেভাগার পক্ষে বলিষ্ঠ বক্তব্য রাখেন। ফলে সভায় উপস্থিত হিন্দু-মুসলিম কৃষকদের মধ্যে বিপুল উদ্দীপনা দেখা দেয়।

চক্ষিণ-চবিশ পরগণার কাকদ্বীপ অঞ্চলে প্রায় ৭,০০০ হিন্দু, মুসলমান ও সাঁওতাল কৃষক আন্দোলন শুরু করে। কাকদ্বীপ কৃষক আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন কংসারি হালদার নামে এক স্থানীয় কমিউনিস্ট নেতা।

কংসারি হালদার লিখেছেন, “তেভাগার ডাক কাকদ্বীপ থানার একপ্রান্ত বুধাখালি থেকে শুরু করে লয়ালগঞ্জ, অন্যদিকে চন্দ্রনাগিড়ি, পাথরপ্রতিমা, রান্ধসখালি, বুড়াবুড়ি তট পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৪৬ সালে তেভাগা আন্দোলন বেরারলাট, ফটিকপুর, উকিলের লাটে বিস্তার লাভ করে। লয়ালগঞ্জের কৃষক গজেন মালী বুধাখালির কমরেড যতীন মাইতিদের সঙ্গে আন্দোলন শুরু করেন। কাকদ্বীপের বিভিন্ন দ্বীপে সেটা দাবানলের সৃষ্টি করে। কৃষকদের পাল্টা আক্রমণে বিভিন্ন লাট থেকে জোতদার এবং কর্মচারী কাকদ্বীপ ছেড়ে কলকাতা এবং মেদিনীপুর চলে যায়। কিন্তু বেরারলাটে কাছারি থেকে গুলি চালিয়ে বহু কৃষককে জখম করা হয়।”

মেদিনীপুরের নন্দীগ্রাম-মহম্মদপুরে কৃষক নারীবাহিনীর সশস্ত্র আক্রমণ পুলিশ ও গুণ্ডাবাহিনীর মোকাবিলায় নজির সৃষ্টি করে। কমরেড বিমলা মাজীর অতুলনীয় বীরত্ব এবং কৌশলের দরুন এটা সম্ভব হয়। পাঁশকুড়া এবং চক গোপালে পুলিশ বাহিনীকেও নারীরা ঝাঁটা-বটিপেটা করে। পাবনা ও ফরিদপুরেও কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে আন্দোলন শুরু হয়।

রংপুর জেলার কৃষক আন্দোলন জঙ্গি চরিত্র ধারণ করেছিল ডিমলা ও ডোমার থানায়। ডিমলা থানার কেন্দ্রস্থলে ছিল খগাখড়িবাড়ি। এটা ছিল প্রবল পরাক্রান্ত মুসলমান জোতদারদের আবাসস্থল। জোতদার যাদু মিঞা (মশিউর মহম্মান) ছিলেন ওইসব জোতদারদের প্রধান নেতা। তাদের ধারণা ছিল মুসলমান আখিয়ারেরা কোনোক্রমেই এই আন্দোলনে যোগ দেবে না। তা ছাড়া তাদের বাড়িগুলির চারপাশে বাস করত ‘পরজা’ আখিয়াররা।

তারা একান্তভাবে নির্ভরশীল ছিল জোতদারদের ওপর। কারণ তাদের ভিটাবাড়ি-হাল-বলদ সবকিছুর মালিক ছিল জোতদারেরা। ফলে মুসলমান আখিয়ার কৃষকেরা জোতদারদের প্রভাবে আন্দোলন থেকে সাময়িকভাবে দূরে সরে থাকলেও, ক্রমশ তারা জামসেদ চাটি, নয় মহম্মদ, বাচ্চা মহম্মদ, বিলায়েৎ আলি, রহিমউদ্দিন, কপিজউদ্দিন, তাহের মুন্সি ও কমরেড মকসেদ প্রমুখ গরিব মুসলিম আখিয়ার কৃষকনেতার নেতৃত্বে আন্দোলনে যোগদান করে। ফলে খগাখড়িবাড়ির মুসলমান জোতদারেরা আপসের কতাবার্তার অন্তরালে সশস্ত্র আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হতে লাগল। ১৯৪৭ সালের ১০ জানুয়ারি যখন যাদু মিঞার ধানকাটা বিষয়ে কর্মসভা চলছিল, সেই সময় যাদু মিঞার নেতৃত্বে ২৫-৩০ জনের একটি দল এসে আক্রমণ করে। এই ঘটনায় বাচ্চা মিঞা আহত হন এবং তৎনায়গ বর্মণ গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান। উত্তেজিত কৃষক-আখিয়াররা রণমূর্তি ধারণ করে জোতদারের বাড়ি আক্রমণ করতে উদ্যত হয়।

কৃষকরা জমিদারদের খামার ভেঙে শস্য নিয়ে গিয়েছিল। রংপুরের তেভাগা আন্দোলনের নেতা মণিকৃষ্ণ সেন লিখেছেন, আন্দোলন এত তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়েছিল যে আমরা সেই তৎপরতার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারিনি।

ডিমলায় ১৯৪৭-এর জানুয়ারিতে মুসলমান জমিদারের হাতে হিন্দু আখিয়ার তৎনায়গ বর্মণের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে কৃষকসভা নীলফামারীতে একটি কৃষক সমাবেশ আহ্বান করে। ডিমলা থেকে এক বিরাট কৃষক মিছিল যখন ডোমারে উপস্থিত হল তখন সেখানে কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম ও মধ্যাহ্নভোজের ব্যবস্থা হয়। মণি সেন লিখেছেন, “সহস্র লোকের একবেলা এক মুঠো খিচুড়ীর ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছিল।... তখনকার ডোমার জোতদার-প্রধান ও মুসলিম লিগের শক্তিশালী এক ঘাঁটি। ইতিমধ্যে গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়েছে এক সঙ্গে রান্না হিন্দু ও মুসলমান খাবে কি করে? নেতারা সমস্যা সমাধানে স্থানীয় নেতাদের সঙ্গে মিটিং-এ বসে গেলেন। সকলেরই গালে হাত। উপায় কি? হঠাৎ দিগন্ত কাঁপিয়ে শ্লোগান উঠলো—‘দাড়ি টিকি ভাই ভাই; লড়াইয়ের ময়দানে জাতিভেদ নাই।’ সমস্যা বিরাট, সমাধানও তড়িৎগতিতে এবং চূড়ান্ত। হৈ ছল্লোড়ের মধ্যে হিন্দু-মুসলিম গরীব কৃষক জনতা পাশাপাশি বসে, পরস্পরকে পরিবেশন করে; মহাত্মার সঙ্গে ক্ষুণ্ণবৃত্তি করলো।” খিচুড়ি রান্না ও খাওয়ার পর্ব শেষ করে মিছিল আবার রওনা হল গন্তব্যস্থলের দিকে। কৃষকদের শ্লোগান তথা শ্লোকটিতে ধরা থাকল তাদের মানবিক শুভবুদ্ধি, সংগ্রামী ঐক্য ও সংকট-মুহুর্তে নেতৃত্ব দেবার ক্ষমতার পরিচয়।

এই নীলফামারি কৃষক সমাবেশের প্রাক্কালেই তার আশেপাশে সৈয়দপুর প্রভৃতি অঞ্চলে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টি করা হয়েছিল। কমিউনিস্ট পার্টি ও কৃষকসভার সমাবেশ ভঙুল করার জন্যেই এই ষড়যন্ত্র। কিন্তু নীলফামারি কৃষক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছিল রংপুরের হাজার হাজার হিন্দু-মুসলিম ভাগচাষি, আখিয়ার ও ক্ষেত-মজুরদের উপস্থিতিতে এবং সেই সমাবেশে কৃষক নেতা দীনেশ লাহিড়ীর সভাপতিত্বে যে প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছিল তার সারমর্ম ছিল, গরিবের তেভাগা আন্দোলন নস্যাৎ করার চক্রান্তে হিন্দু-মুসলমান জোতদারের মিলিত ষড়যন্ত্র এই দাঙ্গা, হিন্দু কি মুসলমান একজন গরিব খুনের বদলা সাতটি (জোতদার), তেভাগা দিতে হবে, তৎনায়গ হত্যার বিচার চাই, ইত্যাদি।^৭ এরপর ওই অঞ্চলে দাঙ্গা থেমে যায়।

অপর এক কৃষক নেতা নুপেন ঘোষ একটি বিবরণ দিয়েছেন যাতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টি করে কীভাবে জোতদার শ্রেণি তেভাগা

আন্দোলন ধ্বংস করতে চেয়েছিল তার চিত্র পাওয়া যায়। শ্রীঘোষ তৎনায়গ হত্যার প্রতিবাদে ডিমলায় একটি কৃষকসভার প্রসঙ্গ উত্থাপন করে লিখেছেন, “সভার পূর্বে জনৈক জোতদারের চাকরের কাছ থেকে জানা যায় যে, তার আগের রাতে জোতদাররা ঠিক করেছেন জুম্মাঘরে শুয়োরের মাথা ও দেবস্থানে গোরুর মাথা রেখে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা সৃষ্টি করা হবে। আমি সেই সংবাদ সভায় প্রকাশ করে ঘোষণা করি যে, কোনো ধর্মস্থানে শুয়োর বা গরুর মাথা পাওয়া গেলে হিন্দু কৃষক হিন্দু জোতদারের মাথা ফাটাবে এবং মুসলমান কৃষক ফাটাবে মুসলমান জোতদারের। জনতা এই ঘোষণা সমর্থন করেন।”^৮

মণিকৃষ্ণ সেন তাঁর স্মৃতিচারণে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি রক্ষার একটি উৎকৃষ্ট বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন এবং এটি সমর্থন করেছেন অবনী লাহিড়ীও। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধতে পারে এই গুজবে ছোটো শহর হিন্দুপ্রধান নীলফামারির মধ্যবিত্তরা তটস্থ ছিলেন। কিন্তু মুসলিম চাষিতে ভর্তি বিরাট কৃষক মিছিল যখন শহরে ঢুকল বজ্রধ্বনি দিতে দিতে—‘তেভাগা আইন পাশ কর, দাঙ্গা বন্ধ কর, হিন্দু-মুসলমান এক হও, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক’ তখন শহরের মানুষও জয়ধ্বনি দিয়ে সমাবেশে যোগ দিতে এলেন।^৯

তেভাগা আন্দোলনে বাংলার নারী সমাজ বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম করেন। শুধু যে তাঁরা ভলান্টিয়ার ছিলেন তা নয়, তাঁদের মধ্যে কৌশলী নেতৃত্ব সৃষ্টি হয়েছিল। রাজবংশী মেয়ে ভাণ্ডনী, দিনাজপুর জেলার দীপেশ্বরী, জয়মণি, রোহিণী, শিখা বর্মণ, মতী বর্মণ, জয় বর্মণী; যশোহরের নমঃশূদ্র কৃষক রমণী সরলাদি—যিনি ৩০০ মহিলার ঝাঁটা বাহিনী সংগঠিত করেছিলেন; হাওড়ার লক্ষ্মীময়ী দাসী, হিরণ্ময়ী বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোরমা রায়; কাকদ্বীপের অহল্যা দাসী, চন্দনপাড়িতে সরোজিনী ও বাতাসী, বুধোখালিতে পাখি, সন্দেশখালিতে খুকী, কুস্তি হালদার; রানী সংকাইলের তাঞ্চনী, বীরগঞ্জের ফুলেশ্বরী, সেতাবগঞ্জের ভুত্থেরী, ফুলবাড়ির বুধমনি, যমুনা; দেবীগঞ্জের বুড়িমা, নড়াইলের সরলাবালা পাল প্রমুখ বীর নারীদের নেতৃত্বে হাজার হাজার কৃষক নারী জোতদার-জমিদারদের বিরুদ্ধে তেভাগা আন্দোলনে অংশ নেন। পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে এদের অনেকেই মৃত্যুবরণ করেন। কর্মীদের আশ্রয় দেওয়া ও পুলিশের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তাঁদের ঠেকানো, পলাতক কর্মীদের খাদ্য যোগানো এগুলোই ছিল মহিলাদের কাজ। ‘পুলিশ এলে ঝাঁটা মারো’—এই ছিল তাঁদের শ্লোগান। মুসলিম কৃষক নারীরাও এই আন্দোলনের শরিক হন। এই আন্দোলন প্রমাণ করে যে, বিপ্লবী মেয়েরা মুসলিম ঘরেও জন্মেছিল। কিন্তু সেই ঘর শহুরে মধ্যবিত্ত পরিবারের নয়, শতশত মুসলিম ভাগচাষিদের ঘর। তারা হিন্দু বোনদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গাঁহত, ‘হিন্দু-মুসলিম ভাই ভাই, আমরা রসিদের বিনিময়ে তিনভাগ চাই, এবং রসিদ ছাড়া ধান দেব না।’^{১০}

কৃষক তথা কমিউনিস্ট নেতা মণি সিং লিখেছেন, “একটি ঘটনা জ্বলজ্বল করিয়া মনে ভাসিতেছে। নিত্যানন্দকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। ভাগচাষী মুসলিমদের মেয়েরা গরীব হইলেও পর্দানসীন। ওদের মানবিক অবস্থা সম্বন্ধে আমরা ছিলাম সম্পূর্ণ অজ্ঞ। নিত্যানন্দকে গরু-পেটানোর জন্য ইহারাও বিস্কন্ধ হইয়া কাণ্ড করিতে পারে ইহা আমরা স্বপ্নেও কোনোদিন ভাবি নাই। এই সময় দুইজন সশস্ত্র পুলিশ খুব দাপাদাপি করিয়া এক গরীব কৃষকের বাড়ির এক গাছতলায় বিশ্রাম করিতেছিল। এমন সময় দুইটি মুসলমান যুবতী-বধূ বাহির হইয়া আসিল। তাহারা সামাজিক রীতিনীতি ভুলিয়া গেল, উচ্চস্বরে চিৎকার করিয়া নিজেদের ভাষায় বলিল, ‘ওরে বান্দীর পুতরা, আমাদের নুকেরে মারছস কেন? এই

দাও দিয়া জবো কইরা ফালাইবান।’ যুবতীদ্বয়ের দা আর রণমূর্তি দেখিয়া পুলিশ পুরুষদ্বয় যে যে-দিকে পারিল রাইফেল দুইটি ফেলিয়া ভেঁ দৌড়ে পলাইয়া গেল। যুবতীদ্বয় এই অবস্থার জন্য প্রস্তুত ছিল না, তাহারা হতভম্ব হইয়া সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল।”^৬

এ থেকে অনুমান করা অন্যায নয় যে, তেভাগা সংগ্রামকে তার নিজস্ব গতি অনুসারে চালাতে পারলে মুসলিম লিগের কৃষক গণভিত্তি বেশিদিন স্বাভাবিক বজায় রাখতে পারত না। বাস্তবে ঘটেছিলও তাই। ঠাকুরগাঁ-র অসংগঠিত এলাকার মুসলিম বর্গাদাররা প্রথমে কৃষক নেতা হাজি মহম্মদ দানেশের অনেক ভাষণ শুনেও সাড়া দেয়নি, পরে তারাই তেভাগা সংগ্রামের সাফল্য দেখে হাজি দানেশের কাছে এসে হাজির হল তেভাগা আদায়ের কাজে তাঁর ‘হুকুম’ নিতে! সংগঠিত কৃষক এলাকার চেহারা গোড়া থেকেই ছিল ভিন্ন, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে তেভাগার শ্রেণিসংগ্রাম ছিল জোঁকের মুখে নুনের ছিটের মতো। আর সম্প্রসারিত শ্রেণিসংগ্রামের জোয়ারের মুখে সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ খড়কুটোর মতো ভেসে যেতে শুরু করেছিল অসংগঠিত এলাকাতেও। জাতিগত ভেদাভেদের মূলেও প্রচণ্ড আঘাত দিয়েছিল তেভাগা আন্দোলন। ভেঙে দিয়েছিল ‘মুসলিম, নমঃশূদ্র, রাজবংশী, পৌণ্ড্র-ক্ষত্রিয়, মাহিয়া প্রভৃতি কৃষকের দুর্লভ্য সামাজিক ব্যবধান।’

তেভাগার সময় প্রখ্যাত মহিলা সংগঠক রানি দাশগুপ্ত তাঁর স্মৃতিচারণে লিখেছেন, “শুধু হিন্দু-মুসলমান এক নয়, জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ইতিপূর্বের কোনো পর্যায়েই গ্রামের বর্ণহিন্দু, রাজবংশী, বর্ণক্ষত্রিয়, নমঃশূদ্র, মাহিয়া, সাঁওতাল, কোল, মুণ্ডা, ওরাও প্রভৃতি জাতি উপজাতির কৃষকের দুর্লভ্য সামাজিক ব্যবধান দূর করা সম্ভব হয়নি। তেভাগা আন্দোলন এই ব্যবধানের বিলুপ্তি ঘটিয়েছিল।” এইভাবে নিম্নবর্ণীয় সমাজের রাজনৈতিক সক্রিয়তাকে স্পষ্ট করেছিল তেভাগা আন্দোলন।

ময়মনসিংহ জেলায় সংগঠিত আন্দোলনের ঐতিহ্য ছিল না বললেই চলে। কিন্তু সেখানে তেভাগার খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে জঙ্গি কৃষক বিদ্রোহ শুরু হয়ে যায়। পুলিশের যাবতীয় সতর্কবার্তা উপেক্ষা করে ময়মনসিংহ জেলার জামালপুর মহকুমায় বর্গাদাররা ক্ষেত থেকে সমস্ত ফসল তুলে নেয় ও কেবলমাত্র ছোটো জমিদারদের এক-তৃতীয়াংশ ফসল পাঠিয়ে দেয়। জেলার অধিকাংশ জোতদারই হিন্দু। কৃষকেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলেন রাজবংশী, আদিবাসী ও মুসলিম। এই জেলার অন্যতম নেতা মণি সিংহ-এর নেতৃত্বে তেভাগার দাবিতে কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা ও জামালপুর মহকুমায় আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। এই জেলায় মুসলিম লিগ নেতৃত্বের বিরোধিতার ফলে মুসলিম কৃষকদের সংগঠিত করার কাজ খুব দ্রুত সম্ভব হয়নি। তবে আলতাভ আলি, মৌলবি উজ্জল আলি, জহিরুদ্দিন মুন্সি প্রমুখেরা কৃষকসভার জেলাস্তরের নেতৃত্বে আসার ফলে মুসলিম কৃষকদের অংশগ্রহণ বাড়তে থাকে। ফলে তেভাগা আন্দোলন এই জেলায় শক্তিশালী হয়ে ওঠে। কিশোরগঞ্জ মহকুমার চাতলের বড়ো জোতদার ললিত বাগচি ও ফটিক বাগচি আন্দোলন দমন করতে পুলিশের আশ্রয় নেয়। পুলিশ ফজলুল আলি ও বক্সিকে গ্রেপ্তার করে।

বাংলার কমিউনিস্ট নেতা খোকা রায় ময়মনসিংহের তেভাগা আন্দোলন সম্পর্কে ১৯৪৭ সালে এক প্রবন্ধে লিখেছেন, তীব্র সাম্প্রদায়িক বিভেদ ও উত্তেজনার পটভূমিতে ময়মনসিংহের তেভাগা আন্দোলন এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। এই সাম্প্রদায়িক অশান্তি ও উত্তেজনা সত্ত্বেও এখানে তেভাগা সংগ্রামের মাধ্যমে অখণ্ড হিন্দু-মুসলিম সংহতি ও এক্য গড়ে ওঠে এবং এই সংগ্রাম ময়মনসিংহের চেহারা পালটে দেয়।

তেভাগা চাই, ফসল কেটে ঘরে তোল, দখল রেখে চাষ কর, টংক প্রথার উচ্ছেদ চাই, জান দেবো তো ধান দেবো না, বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ চাই প্রভৃতির দাবিতে কৃষকেরা গর্জে ওঠে। ১৯৪৬ নভেম্বরে সারা জেলায় তেভাগার লড়াই শুরু হয়ে যায়। কিশোরগঞ্জের চাতল ও বাঘাটা এলাকায় মাত্র একসপ্তাহ আগে জনৈকা মহিলা সাম্প্রদায়িক ও গুণ্ডাবাহিনীর হাতে নিহত হন। কিন্তু সাত দিনের মধ্যেই শতাধিক মুসলিম এবং ৪৭টি হিন্দু ভাগচাষি পরিবার জোতদারের অন্যায জুলুমের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। স্বল্পবিত্ত জোতদারেরা কৃষক সমিতির সঙ্গে একটা আপস মীমাংসায় পৌঁছতে বাধ্য হয়। চাতলের কৃষক সমিতি কৃষক ও জোতদারদের সমস্যা নিয়ে এক সালিশি বোর্ড গঠন করে। ফলে ছোটো ছোটো প্রায় ৫০জন জোতদার ভাগচাষিদের সঙ্গে আপস করে।

১৯৪৭ সালের এপ্রিল মাসে সারা বাংলা কৃষক সমিতির এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল যশোরের নড়াইলের দুর্গাপুর মাঠে। এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেছিলেন সারা বাংলা কৃষক সমিতির সভাপতি কে বি রায়। যশোর জেলার নড়াইলের তেভাগা আন্দোলন ছিল একটি ব্যতিক্রমধর্মী আন্দোলন। একমাত্র নড়াইলের কৃষকরা যে অর্থনৈতিক দাবির ওপর ভিত্তি করে লড়াই শুরু করেছিল, সেই লড়াইয়ে তারা বিজয়ও অর্জন করেছিল; যা দেশের অন্যান্য অঞ্চলের আন্দোলনকারী কৃষকদের জন্য ছিল বড় রকমের প্রেরণা। নড়াইলের তেভাগা আন্দোলনে আরও যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে মোদাসসের মুন্সী, নূর জালাল, অমল সেন, আব্দুল আজীজ, সৈয়দ নৌশার আলি, বামাচরণ গোলদার, ডা. ভোলানাথ বিশ্বাস, বটু দত্ত, হেমসুচরণ সরকার ও সরলা পালের নামও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নড়াইলের তেভাগা আন্দোলন এমন এক স্তরে এসে পৌঁছেছিল যে, ব্রিটিশের সশস্ত্র পুলিশ বা প্রশাসনের অন্যান্য শাখাগুলি তেভাগা অঞ্চলে কখনও ঢুকতে সাহস করত না। কারণ আন্দোলনের চাপে জোতদাররা ভাগ-চাষিদের দাবি মেনে নিতে শুরু করেছিল। দুই-একজন জোতদার বাদে আর সমস্ত জোতদাররা রসিদ দিয়ে এক-তৃতীয়াংশ ফসলের ন্যায্য ভাগ গ্রহণ করেছিল।

এই আন্দোলন সম্পর্কে অমল সেন উল্লেখ করেছেন : “প্রথম ধাপেই আন্দোলন আইন ভাঙার মোকাবেলায় হাজির হয়েছিল যৌথ ফসল কাটার অধ্যায়, আর তার আনুষঙ্গিক সাংগঠনিক প্রস্তুতির পালা। এরপর বর্ষার জলের মতো ছড়মুড় করে নেমেছিল সরকারবাদী অজস্র ধারায় ফৌজদারী ওয়ারেন্ট, ত্রেণক পরোয়ানা, জেল, টাউন জামিন, পুলিশের তাড়া, তার মধ্যে ফসল কাটা ও চাষ আবাদ করা—সে এক দিশেহারা অবস্থা। কিন্তু বুঝা গিয়েছিল কৃষকরা এ সংগ্রামকে নিজেরাই নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছিলেন। এক পর্যায়ে তেভাগা অঞ্চলের কোথাও পুলিশ দেখা মাত্র গ্রাম-গ্রামান্তরে সংকেত পৌঁছে যেতো মুহূর্তে, আর ৮/১০ মিনিটের মধ্যে দেখা যেতো পুলিশ দল অগণিত সশস্ত্র (আগ্নেয় অস্ত্র নয়) দেশীয় অস্ত্র-সজ্জিত কৃষক দ্বারা ঘেরাও হয়ে গিয়েছে। তেভাগা নস্যাত করার উদ্দেশ্যে জমিদার ও জোতদাররা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টির প্রেরণা যুগিয়েছিল। প্রথমে ভাড়াটে গুণ্ডা দিয়ে নমঃশূদ্র মেয়ের ইজ্জত নষ্ট করার চেষ্টা করা হয়েছিল। এই কাজে ব্যর্থ হয়ে জোতদারদের ভাড়াটেরা একটি মুসলিম মহিলাকে নিয়ে গিয়ে তার ইজ্জত নষ্ট করেছিল এবং তেভাগা এলাকার মধ্যে একটি রাস্তার ওপর তাকে উলঙ্গ অবস্থায় বেঁধে রেখে গিয়েছিল।”

ইতোপূর্বে ১৯৪৭ সালের জানুয়ারি মাসের শেষভাগে নড়াইলের স্থানীয় কমিউনিস্ট কর্মীরা কৃষকদের একটি মিছিলে বের

করেছিল। এই মিছিলে যোগ দিয়েছিল হাজার হাজার কৃষক। তারা জোতদার, জমিদার ও মহাজনদের শোষণের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছিল। এই মিছিলে জঙ্গি কৃষকরা হাতে করে নিয়ে এসেছিল ঢাক, ঢোল, রামদা, ঢাল, তির ধনুক, বল্লম ও লাঠি। বিড়লা গ্রামে এসে তারা প্রথমে সমবেত হয়েছিল। ফেব্রুয়ারি মাসে নড়াইলে একটি কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেছিলেন কমরেড মুজাফফর আহমদ। হাজার হাজার কৃষক এই সম্মেলনে যোগদান করেছিল। কৃষকরা এই সম্মেলন থেকে তেভাগা আন্দোলনের কর্মসূচি পেয়েছিল। কৃষকরা প্রত্যেকটি গ্রামকে দুর্গ হিসাবে গড়ে তুলেছিল। বাইরে থেকে সরকারের পুলিশ বাহিনীর এবং জোতদার-মহাজনদের হামলার আশঙ্কা দেখা দিলে ঢোলকের সঙ্কেতের মাধ্যমে প্রত্যেকটি গ্রামকে সতর্ক করে দেওয়া হত।

কৃষকদের সংগ্রামী জোটকে ভাঙার জন্য ১৯৪৭ সালের মার্চ মাসে কৃষক আন্দোলনের অন্যতম কর্মী আব্দুল গনিকে ধরতে সরকার একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটকে পাঠিয়েছিলেন। তিনি সঙ্গে করে এনেছিলেন ১৫ জন পুলিশ অফিসার ও ৫০ জন সশস্ত্র পুলিশ। ম্যাজিস্ট্রেট নড়াইলের রঘুনাথপুরে উপস্থিত হলে কৃষক বাহিনীর লোকেরা হাতিয়ার নিয়ে পুলিশ বাহিনীকে ঘিরে ফেলেছিল। আরও অগণিত কৃষক খবর পেয়ে চারদিকের গ্রাম থেকে পুলিশের বিরুদ্ধে লড়াই করতে ছুটে এসেছিল। পুলিশ কৃষকদের যুদ্ধে দেখি মনোভাব দেখে ভীত হয়ে পড়েছিল। শেষ পর্যন্ত কৃষক নেতাদের নিকট ক্ষমা চেয়ে ম্যাজিস্ট্রেট পুলিশসহ বিদায় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। কৃষকরা এ ব্যাপারে এত উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল যে নেতৃবৃন্দের নির্দেশ পেলে পুলিশ বাহিনীকে তারা মুহূর্তের মধ্যে ধ্বংস করে দিত।

নড়াইল অঞ্চলে কৃষকদের দুই-তৃতীয়াংশ ছিলেন নমঃশূদ্র কৃষক, বাকি মুসলমান। জোতদারদের বেশিরভাগই ছিল উচ্চবর্ণের হিন্দু। বেশিরভাগ বর্ণহিন্দু জোতদারদের কাছ থেকে কৃষকেরা পেতেন অবজ্ঞা, ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য। ফলে মুসলমান ও নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের বর্গাদার-কৃষকেরা, জোতদারদের সাম্প্রদায়িক চক্রান্তকে ধ্বংস করে ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলনে যোগদান করে। ৪৬-এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আতঙ্কে এই অঞ্চলের আন্দোলনের ঐক্যের মধ্যে ফাটল ধরাতে পারেনি। ‘ইদুজ্জোহার’ নামাজ শেষ হলে মুসলিম জোতদার তাঁর মুসলিম ভাইদের হিন্দুদের আক্রোশ থেকে রক্ষা পাবার জন্য ‘আত্মরক্ষা কমিটি’ গঠন করার প্রস্তাব দিলে, এলাকার কৃষকনেতা ও দুর্গাপুর ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতি নূর জালাল প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। পরিবর্তে তিনি হিন্দু ও মুসলমান কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ সভা থেকে ‘তেভাগা’-র দাবি আদায়ের জন্য এবং হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি রক্ষার জন্য হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত ‘স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী’ গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, তেভাগা আন্দোলনে অনেক মধ্যবিত্ত মানুষ শারীরিকভাবেই অংশ নিয়েছিলেন। আর কৃষকরাও ন্যায়ের আদর্শ ও আসন্ন অভীষ্ট-লাভের স্বপ্নে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। সেই আদর্শ ও স্বপ্ন তৈরি করতে পারি বা কিষণসভার মধ্যবিত্ত কর্মীরাও খানিকটা সাহায্য করেছিলেন। দৈনন্দিন জীবনের ওঠা বসা, কাজকর্ম ও বেঁচে থাকায় তেভাগা মধ্যবিত্ত ও কৃষক অংশগ্রহণকারীদের অনেকটা কাছাকাছি এনে দিয়েছিল। তাদের মধ্যে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের সুযোগ করে দিয়েছিল। এই সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান সাংগীতিক ক্ষেত্রে তো লক্ষণীয় বটেই, তবে সংস্কৃতি শব্দটা এখানে বৃহত্তর অর্থেই ব্যবহৃত—আসলে এই

আদান-প্রদানের ভিত্তি ছিল তাদের পারস্পরিক সহমর্মিতা ও সৌহার্দ্য। এর উজ্জ্বল বিবরণ পাওয়া যায় সোমনাথ হোরের ‘তেভাগার ডায়েরি’-তে।

কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের আগ্রহে চিত্রশিল্পী সোমনাথ রংপুরে গিয়েছিলেন কৃষক সংগ্রামে অংশ নিতে। সেখানে কৃষকদের বলিষ্ঠ সংগ্রামের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ, তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মেলামেশা করতে। সে-সব সচিত্র ধরা পড়েছে তাঁর এই ডায়েরিতে। তখন সংগ্রামের আবেগে ভেসে গেছে সব শ্রেণিভেদ। শহর থেকে আসা নেতাকে কেউ ‘বাবু’ বলে ডাকে না, বরং স্থানীয় কৃষক-নেতা শহরের বাবুর সম্মুখীন হন ‘রূপকান্তদা’। সবাই সবাইকে ‘কমরেড’ সম্বোধন করে। আবার এক ‘ভদ্রলোক’—দীনেশদা—একেবারে চাষিদের ভাষাতেই বক্তৃতা দেন, চাষীরা তা মুগ্ধ হয়ে শোনে। সকালে কৃষকরা যখন মাঠে ধান কাটতে যায় তখন তাদের মুখে মধ্যবিত্ত গণগীতিকার বিনয় রায়ের গান—‘চাষী দে তোর লাল সেলাম লাল নিশানারে’। এই গানের মধ্যেই তারা জোতদারদের গুণ্ডাদের প্রতিহত করার শক্তি পেত। সন্ধ্যাবেলাতেও সারাদিনের কাজের শেষে মধ্যবিত্ত নেতা, কৃষককর্মী সব এক জায়গায় জড়ো হয়, লড়াইয়ের স্ট্রাটেজি আলোচনা করে, গল্পগুজব করে। গান ছিল এই আড্ডারও অপরিহার্য অঙ্গ। এখানে হিন্দু-মুসলমান ভেদাভেদ ছিল না।

তেভাগা আন্দোলন ছিল এমনই এক স্তরের লড়াই। এর মূলে ছিল সংগ্রামী কৃষক ও জনগণের জীবনবোধের ভিত্তি। এই আন্দোলন শুধু সমাজের উপরিতলে আঘাত করেনি, নিম্নতলেও ভাঙন সৃষ্টি করেছিল। শোষণের জগদদল পাথরে শুধু ফাটল ধরানি, তার তলদেশকেও আন্দোলিত করে তুলেছিল।

এই আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, কমিউনিস্টদের দ্বারা পরিচালিত তেভাগা আন্দোলনে হিন্দু কৃষকদের আধিপত্য থাকলেও এই আন্দোলনে মুসলিমদের একটি বড় অংশ যোগদান করে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের পতাকা তুলে ধরেন। আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায়ে মুসলমান আধিয়ারেরা, মুসলিম জোতদারদের প্রভাবে সাময়িক দূরে সরে থাকলেও হাজি মহম্মদ দানেশ শেখ, আব্দুল কাদের চৌধুরী (দিনাজপুর), মহম্মদ ইয়াকুব মিঞা (কুমিল্লা), কাসেম মিঞা (গাইবান্ধা), সৈয়দ নৌশর আলি, মৌলবি নূর জালাল (যশোর), বাচ্চা মুন্সি (জলপাইগুড়ি), আলতাফ আলি, মৌলবি ফজলুল আলি, জহিরুদ্দিন মুন্সি (ময়মনসিং), জামসেদ চাটি, গুল মহম্মদ, বিলায়েৎ আলি (রংপুর) প্রমুখের নেতৃত্বে ক্রমশ বিপুল সংখ্যক মুসলিম আধিয়ার তেভাগা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। তাছাড়া ছিলেন জামসেদ আলি, সাবির মণ্ডল, মহতাবউদ্দিন, মজিদ মিঞা, মোকসেদ আলি রহমান প্রমুখ। চিরির বন্দরের খেতমজুর সমিরুদ্দিন (প্রথম শহিদ), খাঁপুরের কৃষকনেতা চিয়ার শাই শেখ এবং ঠাকুরগাঁয়ের আধিয়ার হীরামন মহম্মদ প্রমুখ এই আন্দোলনে বীরত্ব প্রদর্শন করে শহিদত্ব বরণ করেন। এ ছাড়া নিয়ামৎ আলি, বাচ্চা মহম্মদসহ অনেকে গুরুতরভাবে আহত হন এবং নাসির মণ্ডল, মৌলবি ফজলুল আলি প্রমুখ কারাবরণ করেন।

তেভাগা আন্দোলনে মোট প্রায় ৭০ জন কৃষক—হিন্দু, মুসলমান ও আদিবাসী পুরুষ-নারী—প্রধানত পুলিশের এবং জোতদারের গুলিতে নিহত হন। একমাত্র দিনাজপুর জেলাতেই শহিদ ৪০ জন কৃষক। ১২০০ কৃষককে গ্রেপ্তার করা হয় এবং আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে আহত হন প্রায় ১০,০০০ কৃষক।

জোতদাররা হিন্দুই হোক, মুসলমানই হোক, মিলিতভাবে নিজেদের শ্রেণিস্বার্থ বজায় রাখার কৌশল হিসাবে তারা ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতাকে প্রধান হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন।

দিনাজপুরে মুসলিম লিগের সাহায্য নিয়ে জোতদারেরা ব্যাপক ধর্মীয় প্রচারে নামেন। রংপুর জেলার ডিমলায় জোতদার যাদু মিঞা (মশিউর রহমান) এবং মজিদউল্লা সরকার মুসলিম আধিকারদের বশে রাখার নানান চক্রান্ত করেন। ময়মনসিংহের তেভাগা আন্দোলনকে তাঁরা হিন্দু জোতদারের বিরুদ্ধে প্রধানত মুসলমান কৃষকের সাম্প্রদায়িক লড়াই হিসাবে দেখিয়ে দেশভক্ত জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেন এবং যশোরের নড়াইল মহকুমায় সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও সন্দেহের কুটিল বাতাবরণ সৃষ্টি করেন। কিন্তু কৃষকসভার নেতৃত্বের সুস্থ রাজনৈতিক কৌশলের দ্বারা চক্রান্তগুলি ধ্বংস হয় এবং হিন্দু-মুসলিম ঐক্য ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অক্ষুণ্ণ থাকে।^১

আসলে, সাম্প্রদায়িক প্ররোচনার উর্ধ্বে উঠে কি হিন্দু কি মুসলমান সকলে এক হয়ে তেভাগা গণআন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। এমনকি মৌলবির পক্ষ থেকে জোতদারের উৎপীড়নের বিরুদ্ধে ভাগচাষীদের সমর্থন করেন। তেভাগা আন্দোলন মূলত অর্থনৈতিক আন্দোলন হলেও জোতদার ও ব্রিটিশ শাসকের বিরুদ্ধে আন্দোলনটি পরিচালিত হয়ে শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক রূপ পরিগ্রহ করে। এইভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর শ্রমিক-যুবক-কৃষক-ছাত্র-মহিলাদের মতো বাংলার হিন্দু-মুসলমান

উপজাতির কৃষকেরা কৃষকসভার নেতৃত্বে সামন্তবিরোধী আন্দোলন চালিয়ে, ব্রিটিশ শাসনকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে তীব্র গতিবেগ সঞ্চার করেছিল।

তথ্যসূত্র

১. মণিকৃষ্ণ সেন, 'রংপুরের তেভাগা সংগ্রামের কথা', ধনঞ্জয় রায় (স.), তেভাগা আন্দোলন, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০১
২. মণিকৃষ্ণ সেন, 'রংপুরের তেভাগা সংগ্রামের কথা', ধনঞ্জয় রায় (স.), তেভাগা আন্দোলন, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০১
৩. নূপেন ঘোষ, 'তেভাগা আন্দোলন : ডিমলা থানা', ধনঞ্জয় রায় (স.), তেভাগা আন্দোলন, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০১
৪. গৌতম চট্টোপাধ্যায়, ইতিহাসের পাতা থেকে, কলকাতা, পৃ. ৯০
৫. পিটার কাস্টার, ওমেন ইন দ্য তেভাগা আপরাইজিং, নয়া প্রকাশন, ১৯৮৭, পৃ. ১২২
৬. মালেকা বেগম, বাংলার নারী আন্দোলন, ইউনিভার্সিটি প্রেস, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃ. ১১৯
৭. মহঃ মোতাহার হোসেন, বাংলার তেভাগা আন্দোলন ও মুসলিম সমাজ : একটি পর্যালোচনামূলক সমীক্ষা, ইতিহাস অনুসন্ধান, খণ্ড-২৪, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, কলকাতা

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

শুভেন্দু রায়

গভর্নমেন্ট কন্ট্রোলার

মস্তেশ্বর, বর্ধমান

Sl. No. 200

পার্কের সৌন্দর্যায়ন



ঐতিহ্য সংরক্ষণ

নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতিটি
ক্ষেত্রে আমরা সদা কর্মমুখর

কলকাতার উন্নয়নে আমরা বদ্ধপরিকর



কলকাতা পৌরসংস্থা

বাতিঘর

কৃষ্ণ ধর

ঝড় বিজুলির রাতে তুমিই ভরসা
দিশাহীন মাস্তুলে আলোকম্পাত
তুমিই জলযানের লৌকিক বিন্যাস
খুঁজে পায় শরণার্থী
সিঙ্কসারসেরা ডানা ঝাড়ে স্বস্তিতে
তুমি আকাশে উড়াল দিলে
মাটিতেই আশ্রয় সৃষ্টি
তুমিই তখন প্রকৃত মায়াবী মননে
বিপ্লবের কাছে দেখাও বাঁচার দিশা
নক্ষত্রের স্থিরতা তুমি, ধ্রুব
পার্থিব পড়শী
হিংস্র অন্ধাকরে তুমিই আনো
উজ্জ্বল ভরসা, দীপ্যমান
প্রণম্য রাত্রির, তুমি বাতিঘর।

তবুও দাঁড়াতে হবে

কেস্ট চট্টোপাধ্যায়

ওদের দর্শন নেই আছে শুধু মিথ্যার ফানুস
নীতিও কিছুই নেই শুধু নিত্য নাগিনীর খেলা
কোনোখানে প্রীতি নেই সবখানে মারীচ নাচন
প্রতিশ্রুতি বহুবিধ দিকে-দিকে অর্থহীন মেলা।

শহিদ স্মারক ভাঙে সর্বক্ষণ উন্মত্ত খেয়াল
পাড়া ছাড়া, পোড়ে বই, ওড়ে ছাই লোলুপ আগুন
এ আকাশ বর্ণহীন চারিদিকে বিষাক্ত নিশ্বাস
নিশ্চুপ সমস্ত দিক পাখি নেই আতঙ্কে ফাগুন।

গণতন্ত্র কিছু নেই আইন-ও ধ্বংসের পথেই
বিপন্ন কৃষক আজ ঘর ছাড়া অশেষ দুর্গতি
খাঁ-খাঁ মাঠ পড়ে আছে, চাষ নেই, বীজ নেই মাঠে
বোধহীন ব্যভিচারে নিভে আসে উজ্জ্বল প্রগতি।

তবুও দাঁড়াতে হবে নেই কোনো বিকল্প এখন
রুখে দিতে হবে সব দৃঢ় পদে সমস্ত পতন।

ছেঁড়া ডায়েরি

পার্থ রাহা

কাল রাতে
হলুদ জ্যোৎস্নায় এক সাদা ঘোড়াকে
মৃতদেহ হতে দেখেছি
আমার নিদ্রাহীন স্বপ্নে
হলুদ জ্যোৎস্নায় এক সাদা ঘোড়া।
আমার কররেখার স্পর্শে
ফুল ঝরে যায়
মালা
হয়ে ওঠেনি জন্মদিনের মমতা
বিবাহ বার্ষিকীর প্রেমময় স্মৃতিসুখ।

একাদশীর চাঁদ পা গুটিয়ে বসে নেই
এখনো নক্ষত্রের আলো শিরায় শিরায়
যতদূর চোখ যায়
সমুদ্রের শরীর ছাড়িয়ে পাখিদের ছায়া
বুকের মধ্যে ছগলি তোলপাড়
তোলপাড়
মুঠোর মধ্যে ডালিমদানা তোলপাড়
তোলপাড়
বাগান ভরা যুঁই টগর শিউলি ফুলের পাশে
রক্তিম ক্যাকটাস

মূর্তি ভেঙে পড়ে
এখন আঁধার
আকাশ ভেঙে নামে
জানি
শুকনো রোদ্দুরের দিনে
মুখ ফেরানো সহজ নয়।
তবুও
কোথাও যেন কখন যেন
হঠাৎ যেন
পৌরুষ অটুত্ব হাসে।

জীবন

অরবিন্দ সরকার

বেশির ভাগ মানুষ প্রায়শ
স্বার্থের চোরা স্রোতে ঘোরাফেরা করে
মাঝে মধ্যে আকাশ জ্যোৎস্না
সমুদ্র অরণ্য ঝর্ণা
তাই জীবন, কুসুম-সুবাস।

হকার

অংশুমান কর

আমি কবি

আপনাকে আমি ঠিক দুদিন সময় দিচ্ছি
তার মধ্যে আপনি খালি করে দেবেন ফুটপাথ।

মাননীয় চেয়ারম্যান,

এই মিউনিসিপ্যালিটির একটি রাস্তার ওপরও

আমি দেখতে চাই না হকার।

আমি কবি

আপনাকে দুদিন সময় দিলাম, দুদিন।

পৃথিবীর কোনো সভ্য শহরে

ফুটপাথ দখল করে পসরা সাজিয়ে বসে না হকার

পৃথিবীর কোনো সভ্য দেশে

রেলগাড়ির ভেতরে বিক্রি হয় না

মোবাইলের কভার আর কান খোঁচানোর বাড।

ভারতীয় রেলকে হরকারমুক্ত করার জন্য

মিঃ ম্যানেজার,

সাতদিন সময় আপনার।

আমার যাত্রাপথের সম্মুখে, পিছনে, ডাইনে, বাঁয়ে

আমি দেখতে চাই না হকার।

আমি কবি

মাস শেষে আমার হাতে সহস্র স্বর্ণমুদ্রা তুলে দেন মালিক

গ্রীষ্মে আমার কক্ষ থাকে শীতল, শীতে উষ্ণ

আমার পসরা আমি বিক্রি করি

রাজগৃহে, ইন্দ্রের সভায়।

রাজপথে, রেলের গাড়িতে, গ্রীষ্মে, শীতে প্রবল বর্ষায়

আর পসরা সাজানো সম্ভব নয়।

আপনার সময় সাতদিন, মিঃ ম্যানেজার

মাননীয় চেয়ারম্যান, দুদিন আপনার।

মনে রাখবেন

আমি কবি, জনতার ঈশ্বর,

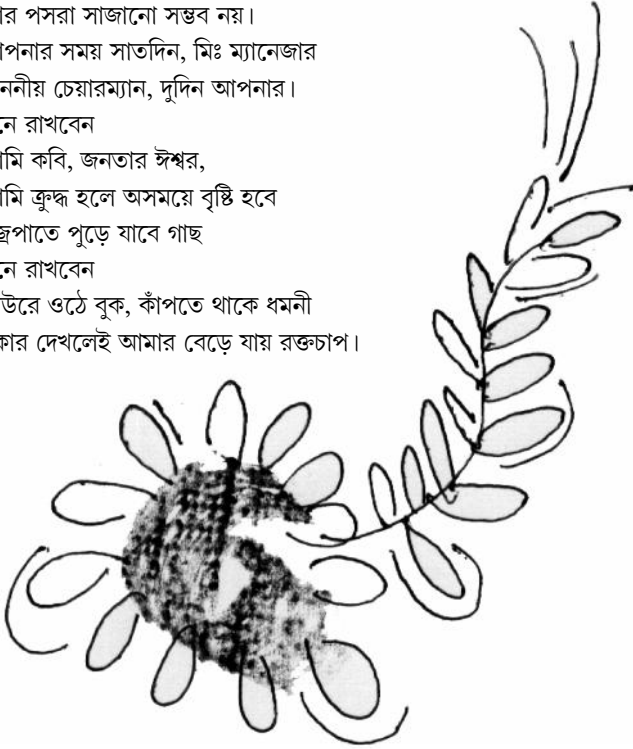
আমি ব্রুন্ধ হলে অসময়ে বৃষ্টি হবে

বজ্রপাতে পুড়ে যাবে গাছ

মনে রাখবেন

শিউরে ওঠে বুক, কাঁপতে থাকে ধমনী

হকার দেখলেই আমার বেড়ে যায় রক্তচাপ।



শূন্য হয়ে আছি

প্রণব চট্টোপাধ্যায়

দরজায় কড়া নাড়ছে কে?

ফিরে যাও ঘরে কেউ নেই

আসলে বাড়িটা খালি

তাই অতীত স্মৃতির দখলে

দেয়ালে ঝুল-কালি, মেঝে ভর্তি ধুলো

তক্তপোষটার পায়ভাঙা, ছড়ানো ছেড়া

বইয়ের পাতা; ওঠাবে কারও কাজে

লাগবে না; ঝাড়-পোঁছ না করে

ঘরে ঢুকলে তুমি প্রতিবেশীদের ক্ষমা পাবে না!

এই শূন্য ঘরে শূন্য হয়ে আছি আমি

তুমি যাদের খোঁজ এসেছো

তারা কেউই ধারে কাছে নেই;

পুরনো বাড়ির সকল শরীরে ধুলোর নিঃশ্বাস

ধুলো মুছতে দাও, ঘামরক্ত মুছতে দাও

ততক্ষণ অপেক্ষায় থাকো; আমি এখন

শূন্য হয়ে আছি; আমি কী দেবো বলো তোমাকে?

এখানে এখন রাত্রিদিন

মণিশঙ্কর রায়

এখানে এখন রাত্রিদিন

শব্দহীন আড়ালে ফিশফাশ কানে কানে,

কারা যেন অন্ধকারে সরে সরে যায়—

একাকী ঝাড়ুয়ের ডালে অশরীরী মাতাল হাওয়া,

তবে কি কোনো অশনি সংকেত?

নিঃসঙ্গ পিতার হাতে অজানা চিঠির সম্ভ্রাস,

কাল মধ্যরাতে দূরবর্তী নদীর জলে

নিরীহ বয়স্ক লাশ ভেসে যাবে উজান স্রোতে

বেদখল হয়ে যাবে স্মৃতিময় বাসগৃহ তার।

কাল রাতে ইটভাঁটার পরিত্যক্ত খামারে

খুন হলো এক আদিবাসী ধর্মিতা রমণী

কাল রাতে কারা যেন

আমার বুকের ওপর সঁটে দিয়ে গেলো

নয়া নিয়মের জরুরি লেবেল!

এখানে এখন সারি সারি মুখ

ভূতুড়ে মুখোশের মতো নৃত্যগীত করে

এখানে এখন কুয়াশায় ঢাকা শুনশান হাওয়া

বোবা শূন্যতায় শুধুই ঘুরপাক খায় অজানা আতঙ্কে!

নৌকা ডুবে যায়
মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

আঁধার বিলাসী রাতে কারা আজ চাঁদ ছিঁড়ে নৌকা ভাসায়
জ্যোৎস্নায় ফুটেছে ফুল
ফুলে ফুলে উল্কাপাত বুক ঢেকে যায়
সমস্ত পৃথিবী জুড়ে তুলকালাম কাণ্ড ঘটে গেলে
রক্তের ভিতরে দ্রুত আগুন দৌড়ায়।

ভালোবাসা চুরি করে জঙ্গলে লুকায় কোন নিষ্ঠুর নিষাদ?
আঁধারবিলাসী সব হাততালি দেয়
চাঁদের জ্যোৎস্নায় নৌকা নিয়ে যেতে যেতে গান গায়
এ গানে তো মাদল বাজে না
নাচে না পেখম মেলে সোনার ময়ূর
সাঁওতালি ভুয়াং নাচ লহমায় থেমে যায় পাহাড়তলিতে।

ফুলে ফুলে উল্কাপাত পাহাড়ে পাথরে
আগুন দৌড়ে যায় লতায় পাতায়
বাঁধা পড়ে হঠাৎ হরিণী
মাংসাশী উদ্যানে বাঘ সহসা বাঁপিয়ে পড়ে
চোখে মুখে আদিম অন্ধকার
চাঁদের পরকলা ভাঙে
মাঝরাতে নৌকা ডুবে যায়।

নিউজ বুলেটিনের মেয়েটি
বিপ্লব গঙ্গোপাধ্যায়

ওর রক্তাভ শরীরের চারপাশে আগুন
ঘূণা হয়ে কাঁপছে।
এখন ও আর কোন ভয় পাচ্ছে না। সাহসের বেলুন ফুলিয়ে
ছুটে আসছে তেজি বাতাস
এখন ন্যূনতম আতঙ্ক নেই
গোলাপের পাপড়ি ছিঁড়ে ফেলার শব্দে রাত্রি ভেঙে তিন টুকরো

দাঁত-নখের কিংবদন্তী পেরিয়ে
নিরস্ত্র সময়ের পাণ্ডুলিপি।
প্রতিদিন খবরের কাগজ থেকে উঠে আসে
বীভৎস চীৎকার। লজ্জা। গোঙানি। আর্ত রব। কান্নার আওয়াজ।
আমি সেলাই করতে থাকি
এই দীর্ঘশ্বাস

একদিন ঝড়ের প্রহর আসবে।

দর্শন
সিদ্ধার্থ সিংহ

চোখ বন্ধ করলেই দেখতে পাই টপাটপ ফুল ফুটেছে
রাস্তার দু'ধারে লালপেড়ে সাদা শাড়িরা সার সার দাঁড়িয়ে
তাদের রেকাবিতে কুচো ফুল, সাদা চন্দন
মঞ্চের মাঝখানে লাল ভেলভেটে মোড়া সিংহাসন
ছটার বাজিয়ে ছুটে আসছে এসকট ভ্যান
ভ্যানটা ঢুকতেই অ্যান্ডুলেস
অ্যান্ডুলেস না পুষ্পরথ!
চার দিকে তুলো তুলো মেঘ
ছোটো ছোটো তুষার পাহাড়
এত ঠাণ্ডা! চোখ মেলে তাকাতেই দেখি—
সারা এলাকা জুড়ে কিলবিল করছে কালকেউটে
ফুটন্ত তেলের কড়াইয়ে যণ্ডা মার্কা ক-টা লোক
কাকে যেন চ্যাংদোলা করে ফেলছে।
ছ্যাং করে ওঠে বুক
চোখ বন্ধ করে ফেলি।
দেখি, আবার ফুল ফুটেছে টপাটপ...
টপাটপ... টপাটপ...

আদুরী, তুমি উঠে দাঁড়াও
সতীরঞ্জন আদক

হাতের মুঠিটা শক্ত করো
সন্তর্পণে ভাবনাগুলো সরাও
দেখবে বিষণ্ণতা কেটে গিয়ে
ফিরে পাবে সূর্যম্নাত দিন
আমি অপেক্ষায় থাকলাম।

জীবনের এইসব অমোঘ ফর্মুলা
স্পর্শ করুক তোমাদের মনে
হৃদয়ের ইচ্ছেকণাগুলি আলোর স্পর্শে
খুঁজে পাক সঠিক ঠিকানা
সবুজের মুকুতায়।

উপেক্ষায় নয়, আনন্দে বাঁচো
ঘরে ভাসুক জুঁই ফুল ভাতের সুবাস
মেঘের ভেতরে মেঘ বৃষ্টি হয়ে নামে
বহু জমি ফসলের গান গায়
জেগে ওঠে নীল আকাশ
আদুরী, তুমি উঠে দাঁড়াও।

বন্দরের মেঘ

সঞ্চয়িতা কুণ্ড

নিজের মতো বেঁধে নিলাম
সাগরের জল আর জলোচ্ছ্বাস
নৌকা ও নৌবহর
বিস্তৃত বাজার, শস্যখামার।
সূর্যপথে বাষ্পসড়ক টোলট্যাঙ্ক ছাড়
দেখছো তো
আমার হাতের বাইরে বন্দরের মেঘ
তাই শস্যের উৎপন্ন দায় তোমার
হে কৃষিজীবন।

আলো

মৈনাক মুখোপাধ্যায়

সে এক আশ্চর্য আলো পিছলিয়ে পড়েছিল বিকেলের গায়ে
ধানক্ষেত, ধানক্ষেত, ধানক্ষেত চিরে গেছে কৃষ্ণরঙা পথ
সীমান্তে কি পুণ্য থাকে? পুণ্যের দিকে ছুটি সেই পথ ধরে
সারা বিকেলের আলো আমাদের আত্মা নিয়ে লোফালুফি খেলে

এমন নরম করে কতদিন কেউ যেন আদর করেনি
আলো, শুধু আলোটুকু মায়ের আঁচল হয়ে সর্বদিকে দোলে
তখন অথহীন ইচ্ছের ধুলো ঝাড়া আধুলি-সম্বলও
সমুদয় সত্তা জুড়ে অপরূপ বৈরাগ্য অবিনাশ জ্বলে

গত জন্মের একটি স্বপ্ন

শ্যামলবরণ সাহা

মরে যেতে ভয় নেই,
ভয় হয় শুধু ছাই হতে—
চেয়েছি ছেঁকাহীন এই বাঁচা!

তার চেয়ে অচিন পাখির
ওড়াউড়ি শেষ হলে
পুঁতে দিও এই খাঁচা।

মাটি ফুঁড়ে গাছ হবো,
শেকড়ে শেকড়ে কেবলি খুঁজি—
সাড়ে তিন হাত মাটি!

গত জন্মের একটি স্বপ্ন
তাড়া করে রোজ—
বর্ধমান থেকে বাণ্ডুইহাটি।

ভাঙাগড়া

সত্যনারায়ণ মজিলা

ইচ্ছে করলেই সব ভাঙা যায়
রাজপ্রাসাদ অট্টালিকা
টাটার গাড়ি, নবাববাড়ি
গির্জা-মন্দির-মসজিদ
থাকেও যদি স্বর্গের সিঁড়ি
চিনের প্রাচীরও নয় নিশ্চিত।।

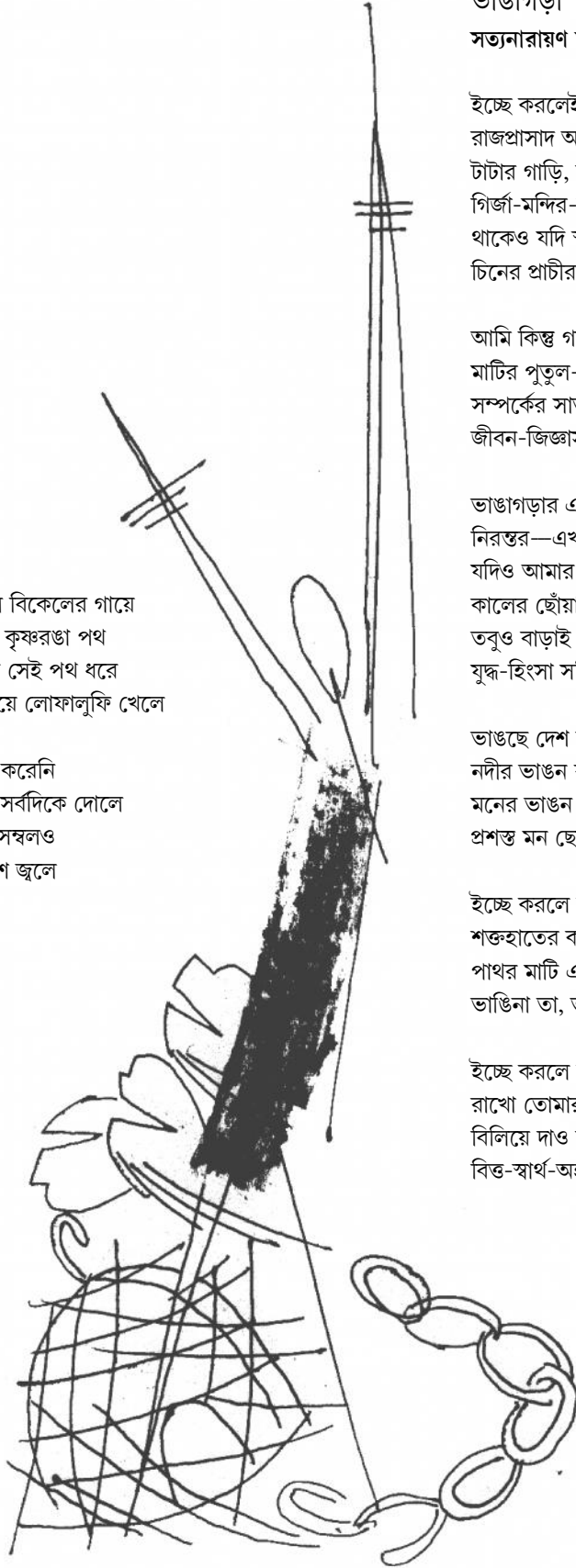
আমি কিন্তু গড়তে পারি
মাটির পুতুল—শিশুর ভালোবাসা
সম্পর্কের সাতনরি হার
জীবন-জিজ্ঞাসা।।

ভাঙাগড়ার এই যে খেলা
নিরন্তর—এখন-তখন
যদিও আমার অন্তবেলা
কালের ছোঁয়ায় বিলম্ব হাত
তবুও বাড়াই অকস্মাৎ
যুদ্ধ-হিংসা সরিয়ে রাখুন।।

ভাঙছে দেশ ভাঙছে দেহ
নদীর ভাঙন বসত ডুবায়
মনের ভাঙন ভীষণ সেও
প্রশস্ত মন ছোট্ট হওয়ায়।।

ইচ্ছে করলে সব ভাঙা যায়
শক্তহাতের কঠিন ছোঁয়ায়
পাথর মাটি এবং আইন
ভাঙিনা তা, ভাঙলে ফাইন।।

ইচ্ছে করলে সব গড়া যায়
রাখো তোমার কথার বুড়ি
বিলিয়ে দাও তা হাওয়ায় হাওয়ায়
বিন্দু-স্বার্থ-অহঙ্কারের তুচ্ছ ঘুড়ি।।



কতটা কে দুঃখ পাচ্ছে

সুনির্মল কুণ্ড

কতটা কে দুঃখ পাচ্ছে—সেই সব দুঃখ-হাহাকার
কারও ধৈর্যে টান দেবে, রক্তহীন হবে কারও ঠোঁট;
নিজের একক বৃত্তে ঘুরে ঘুরে কেবল কথার
সকল মেধার গর্ভে খোঁজ নেবে—কার কীসে চোট
না জেনেই জনমত—না জেনেই শুরু পক্ষপাত—
মুখে ফিকে গণতন্ত্র—ওঠবস করার নিয়ম;
কখন জেনেছে তার মূলপর্বে কত দিনরাত
শেষ হতে শেষ হতে পঙ্গু প্রায় ভীত কার্যক্রম!

এভাবে যতই দুঃখ পেতে থাকে জনগণমন—
যতই উপেক্ষা নিয়ে সরে যায় বিধিভঙ্গ দেখে—
অদ্ভুত স্পর্ধায় কেহ ছুঁড়ে দেয় ঘৃণা-নির্ঘাতন,
মানুষের দৃষ্টিশক্তি পেশিবলে কুক্ষিগত রেখে...
মানুষের গতিপথ রোখে কারও নির্দেশনামায়—
তার হাতে গণতন্ত্র—নির্বাচন ধ্বংস হয়ে যায়।

সোনামণি তুই শিখে নে

সজল শ্যাম

হৃদয় ভাঙা রাত-দুপুরে চাঁদের চোখে জ্যোৎস্না ছিল,
গাছগাছালি ঘুমিয়ে তখন সূর্যমানে স্বপ্নে মজে।
সূর্যমুখী ভোরের টানে রক্ত আমার অভিযানে,
মিছিল মুখের চোখের জ্যোতি কুরুক্ষেত্রের মাটি খোঁজে।

হিংসালোভী হায়নাগুলি আচস্মিতে হামলা করে,
স্বাধীনতা আমার বুকে সিঁটিয়ে থাকে মৃত্যু ভয়ে!
দৌড়ে চলি মশাল হাতে শক্তিরূপা আমি নারী,
কামদুনিতে ছিলাম আমি; মধ্যমথামে আমার বাড়ি।

সোনারখনি রাজনৈতিক মুখোশপরা সোনার ছেলে,
দামিনী তোর মৃত্যুসমন সবুজ দানব কাছে এলে!
গেরুয়াতে ভুলিস না তুই গল্প কথায় লজ্জা অনেক,
মা-মাটি আজ মুখ ঢেকেছে বুকে ঘৃণার আগুন জ্বলে।

জমছে কথা দুঃখভারে প্রলম্বিত বটের বুরি,
অবাঞ্ছিত অর্থনীতি লোভের দূষণ ছড়ায় শুধু।
নিম্নচাপের ঘূর্ণিঝড়ে ফসল ক্ষেতে দাঁতাল হাতি,
বিতর্ক সব আন্তর্জাতিক ভুগছে শুধু মানবজাতি।

সোনামণি তুই শিখে নে জুড়ো জানার খবরদারি।

সোজাসাপটা

তাপস রায়

ডালহৌসি স্কোয়ার থেকে রোদ
উড়ে গিয়ে বসে নবান্নের ছাদে
হুঁ হুঁ বাবা, মারাঠা ডিচের কথা যদি জানো
এই দেখো, ইতিহাস নতুন বানানো
এসো, পারো তো আক্রমণ করো—ডুবে মরো গঙ্গার খাদে

ওই রূপকথা—মিছিল নগরী, মিথ্যে মিথ্যে বেড়েছে আকারে
গায়ে সাঁকা লাগবার মতো ধুমুকার
দাপাদাপি করুক নদীর ওপারে

লালবাজার করুণ হয়ে আছে, মনুমেন্ট নীল
যেহেতু বাঙালি জাতি ভেবে ভেবে মরে
আগামী দশটা বছরে খুঁজে নিক লন্ডনের কী কী আছে মিল

যে মানুষটা

তাপসী আচার্য

পথিক, এমন একজনের সন্ধান দিতে পারো?
কেমন কেমন!—
যে মানুষটা মিথ্যে বলে না।
হাঁটতে হাঁটতে কত রাস্তা পেরিয়ে এলাম
কিন্তু কোথায় সেই সত্যের প্রতিমূর্তি!

ঐ মোড়টার বাঁকে
একজন বেলা বইয়ে দিলো
ভেবেছিলাম ওই বুঝি সত্যি বলবে
কোনো কিছু গোপন করবে না,
সকাল থেকে দুপুর
ওর সাথে কথা বলেছি আমি
এতটুকু বাঁকা কথা বলেনা ও,
মিথ্যেগুলো সত্যি করে অনায়াসে!

আমি কিন্তু একটু একটু
বুঝে ফেলছিলাম ওকে,
মিথ্যে বলতে বলতে আবার
ধরা পড়ার ভয়ে
কিছু সত্যি মিশিয়ে গোঁজামিল দিল।

তবে কি এমনই হয় সবাই!
মিথ্যের জলাশয় সত্যি-শ্যাওলার গাছ দিয়ে
ঢেকে রাখে!
পথিক, এমন একজনের সন্ধান দিতে পারো
যে মানুষটা মিথ্যে বলে না!

জরুরি সংবাদ
মিলনেন্দু জানা

সবপাখি ফিরে গেলে, সব গান শেষ হলে বনে—
নদী সব খুঁজে পেলে সাগরের লোনানীল চাবি—
ফুলের আদর ছুঁড়ে রাতের বিছানা জেগে ভাবি :

পৃথিবীর চক্ষু সব ‘ধূতরাষ্ট্র’ মহাসম্মেলনে?
মিয়মান সর্বশক্তি—‘খঞ্জ’ যেন ঠুটো জগন্নাথ—
‘প্রতিবন্ধী’ ঘর ঘর, রৌদ্রময় জরুরি-সংবাদ!

উন্মত্ত দুই হস্তীর সীমানা দখল
গিরীন্দ্রনাথ চাকী

এলাকা দখলের লড়াই চলছে প্রতিদিন।
বনাঞ্চল তুলে আনা যায় না।
শাল মহীশাল জ্বলন্ত মশাল
হল্লাবোল্লা বাজিয়ে তাড়াতে হবে
অনুপ্রবেশকারী হাতির দল।
জন্ম ঘাটির ঋণ কথা ওঠে,
বুনো হাতিদের কাছে মানুষের
এই চিরাচরিত কৌশল শেখা,
মানুষ এই সব বৃহদাকার প্রাণীদের
চেয়েও আরো আরো ভয়ংকর।

দখলদারির সম্মুখ সমরে
গজমতি প্রাণ দিল,
অর্জুনের মতো দাঁতালটি তো
একবারও বলেনি স্বজন নিধনে
কী কাজ এই জয় নিয়ে!

শ্রুতি নাটকের দীর্ঘ সংলাপ
মহাভারত থেকে নেওয়া হয়েছে সবটাই
কাব্য আর নাটকে মাখামাখি রক্তমঞ্চে
অনুপ্রবেশের কোনো বাধা নিষেধ নেই।

এদিকে তোলাবাজির তুরীয় আনন্দে
একের পর এক সীমানা যাচ্ছে ঢুকে,
রিলিফের প্যাকেজের দাঁড়ি কমা সেমিকোলন যত,
দুধকলার চুমু হয়ে ছোবল মারছে
বন্ধুর মুখে অহরহ।

কালবৈশাখী
বিশ্বনাথ কয়াল

বৈশাখ জুড়ে বজ্রবৃষ্টি, কেঁপে যায় মেদিনীপ্রাণবায়ু,
শিমুলতুলোয় বীজ দিগন্ত ছড়ালে
প্রাচীনেরা অর্বাচীনের ভয়ে খালি করে আসন আলয়।
দিন অস্তে পক্ষ যায়
মাসের পরে ঋতুচক্রে অন্য গতি
অশনি আলোক রেখায় কালবৈশাখী আর তেমন আসে না।

সবই তো আছে, রাতের শেষে সূর্যোদয়,
গ্রীষ্মের দহন শেষে দক্ষিণ সাগর জুড়ে জলভরা মেঘ;
প্রাচীনেরা হলুদ চোখে বসে আছি
অর্বাচীনের মতো সোনালী কিশলয় যৌবন সৌরভে
কখন দখল নেবে আমার আসন আলয়,
অশনি আলোক রেখায় কালবৈশাখী এখনও এল না।

আগামীকাল
গৌতম হাজারা

কথাগুলো ভীষণ জরুরি। কথার মাঝখানে যে সব
দাঁড়ি, কমা, সেমিকোলন আছে সেগুলোকে
হেলায় এলোমেলো করে হাওয়ায় ভাসিয়ে দিলাম।

তারপর ভাসতে ভাসতে কথাগুলো এর কানে ওর কানে
তার কানে অবলীলায় ঢুকে যেতে যেতে আটকে গেল
টাকরার ভেতর। অমনি বিষম খেতে খেতে প্রত্যেকের
মুখ লাল হয়ে উঠলো। ছুটে এলো ডাক্তার বদ্যি।
কিছুতেই থামানো গেল না যখন, রক্ত উঠলো মুখে
তখন পাড়ার নন্টে, ফন্টেরা দৌড়ে এসে পাকড়াও
করে নিয়ে গেল হাসপাতালের দিকে।

ক্রমে বিকেল গড়িয়ে অন্ধকার নেমে এলো। হাসপাতালের
করিডরে এখন অজস্র নীরবতা। কথারা এখন আর
কথা বলছে না। চুপচাপ শুয়ে আছে একা বিছানায়
শ্রদ্ধাযাত্রা খোঁজে।

কারণ, আগামীকাল কথাগুলো যখন হৈ হৈ করে উঠবে
তখন হয়ত আরো সাংঘাতিক কোনো ঘটনার
সূত্রপাত হলেও হতে পারে!

সকাল

মলয় রায়

‘কাল ছিল ডাল খালি আজ ফুলে যায় ভরে
বল দেখি তুই মালি হয় সে কেমন করে?’—রবীন্দ্রনাথ

হতাশায় ছাই মেখে ভূত সেজে লাভ নেই
সবাই দায়ী। কার ঘাড়ে চড়াবো ভুলের মাশুল!
এখনো সময় আছে।
ভাঙা খুঁটি ধরে বসে আছে চেতনার বেড়া।
রক্ত মাখা রুমালে মোড়া আছে শস্যদানা।
ছড়াবার সংকেত দেবে সময় স্নায়ু কোষে।

বিধবস্ত বর্ণমালা জুড়ে আবার শুরু করা যায় শব্দ চয়ন,
মাটি বুকে পা ফেলা যায় তালে তালে।
অধিকারের চাকায় আবার বেঁধে দেওয়া যায় শ্রাবণের মেঘ।
তার অজস্র ধারা। শহিদের রক্ত মাখা শস্যদানায়
ফের এঁকে দেওয়া যায় ফলনের অজস্র শিষ।

গজাবে হাড় মাংস। শব্দের ফুল কুঁড়ি।
শস্যমায়ের আঁচল জুড়ে বেজে উঠবে ফসলদানার ভালোবাসা।
ছিলায় টান দিতে বুড়ো আঙুল যতটা পিছোয়
ততটাই পিছোতে হবে কমরেড। তার বেশি নয়।।

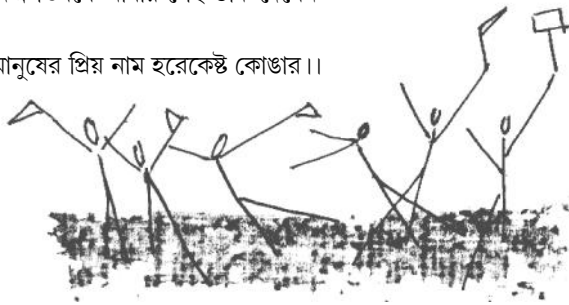
রক্তে রক্তে বেজে উঠবে ডায়াল টোন।
ধোঁয়াশা কেটে গিয়ে ফের নতুন দৃশ্যের মুখোমুখি হব আমরা।
সুবিধাবাদী শৈ্যালের চামড়া ছিঁড়ে দিতে
এসো মানুষের চামড়া নিয়ে মানুষের পাশে দাঁড়াই।

কতদিন সভ্যতার দাঁতে ব্রাশ পড়িনি।
কুল থেকে কুলে পৌঁছেলেও দাঁত ও মাড়ির যত্ননা বেড়েছে।
বিশ্বাসের ঘাড়ে অজস্র প্রশ্ন চিহ্ন আজো নিশ্বাস ফেলে।

এসো দেখ, ক্ষুধা তৃষ্ণার ধামসা মাদলে আবার উঠেছে বোল।
মানুষের অধিকারের, কণ্ঠে কণ্ঠে আবার তুলে দিই—
প্রতিবাদের ভাষা।

তবেই প্রশস্ত ডালে বসে পাখির কলতানে মুখরিত হবে
রাত্রি খেদানো সকাল। যন্ত্রণার দেওয়াল ফুঁড়ে
জন্মশতবর্ষে আবার সেই ডাক দেবেন

মানুষের প্রিয় নাম হরেকেক্ষ কোঙর।।



কেমন আছেন বলুন-তো?

অজয়রঞ্জন বিশ্বাস

পাখিরা-সব করছে-না রব রাত্রি পোহাইলে
কাক-ডাকা ভোর খুলছে-না চোখ কুসুম-কলির মতো—
এ-কোন দেশ এ-কোন কাল বলুন-তো বুক খুলে!
ব্রাস-সস্ত্রাস করছে যে গ্রাস
গ্রাম-গলি-মাঠ বিচরণ-ভূমি
এবং অন্তর্দেশ!!
এ-কার স্বদেশ—বিদ্যাসাগরের? রবীন্দ্র-নজরুলের?
কেমন আছেন বলুন-তো আপনি এবং ওঁরা সকলে?

চোখ খুলতেই ধোঁয়াটে আকাশ বিস্তারিত চারিদিক
সেইখানে সব ধিক-ধিক আর থিক-থিক
করছেন—এ-কারা? এ-কারা? এ-কারা?
চিলেরা আছেন ছোঁ-মারা চিল
সুযোগ-সম্মানী :
শকুনিরা-সব আকাশ-জুড়ে বিস্তারিত ডানা
তাদের দৃষ্টি ভাগাড় বানাবেই যে-কোনো পাড়ার মাঠে
যে-কোনো চিন্তে যে-কোনো মনন-বৃত্তে :
দোলন-চাতক-ময়নারা সব তল্লাট-ছাড়া কেন?
ভিড় জমাচ্ছেন ডানা-ওয়াল-সব এ-কারা?
পাখি-তো নয়—বিহঙ্গ নয়-ই—এ-কারা? এ-কারা? এ-কারা?
আছেন এখানে খুচরো-ছাঁচড়া অসংখ্য কাক অসংখ্য কাক
ঢ্যামনা-পাতি-ছিঁচকে—
এনারাই সব—এন-আর-আই-ও এঁরা—
পূজ্য : দর্পিত : দাপুটে :
সকাল-দুপুর-সন্ধ্যা
দখল নিয়েছেন এই দুনিয়াটাই
অর্থাৎ আকাশ-মাটি ও মঞ্চ
দখল-করে দাপিয়ে বেড়ান বাজিয়ে বেজায় বাজনা!!
খাজনা আদায় বাড়লে এবং বাজার বেজায় ঝাঁঝে
চিল-শকুনি ছিঁচকে ছাঁচড়া কাক
দল-পাকিয়ে চুল-ঝাঁকিয়ে ঘোষণা করেন সর্বজনগ্রাহ্য
কে-আর করে অগ্রাহ্য
এই তথ্য অর্থাৎ সত্য এবং ঐতিহাসিক মহাসত্য
কাক—পাতি-কাক—দাঁড়কাক—ছিঁচকে কাক—
তঁরাই পক্ষী এবং বিহঙ্গ-ও তঁরাই একমাত্র—একমাত্র—একমাত্র
এই-সময়ের এই-আকাশের দিক-দিগন্ত জুড়ে
অন্য পাখি নেই-তো কোনো : ছিল-না কোনো কালে
ইহাই সত্য চিরন্তনের
অচল অন্য সব-ই!!!

ইতিহাসের রক্ত-চক্ষু এই গোলাধারের স্তব্ধ অন্তরালে
কেমন আছেন বলুন-তো ভাই জ্ঞানী-গুণী-কবি?
আপনাদের বুকুর এবং মনের ভুবনডাঙা ভরে
পাখিরা-সব করে-কি রব রাত্রি পোহাইলে?
কাক-ডাকা ভোর খোলে কি চোখ মাছ-রাঙা খালে-বিলে?

কথা দর্পণ বিদ্যুৎ ভৌমিক

পাঁচবার ডেকেছি প্রিয় নাম ধরে
বারবার মহান হতে চেয়ে আকাশে উড়িয়ে দিয়েছি এক বুক ধোওয়া
ভেতর থেকে ছিঁড়েছি সব বয়সের শোক; সেটা দেখেনি কাকপক্ষী
এভাবে নিয়ম করে সুরক্ষিত হয় লবণ সমুদ্রে কান্নার চিহ্ন—
ইচ্ছা হয় সর্বনাশ এবং অন্ধকার এই অস্তিত্বে প্রাণ পাক
বীজ মস্ত্রে প্রহরী হয়েছে স্মৃতি; সেও কি আমার যাবজ্জীবনের পাপ
বহুতলে উর্ধ্ব আকাশ পথ; চোখে দেখা
চকিতে হারিয়ে যাওয়া লুকানো অন্তরীক্ষ শেষে
শেষবার এই রাস্তাতে গত জন্মের আয়না ভাঙার শব্দ পেতেই
শিশুকালের বাতাস শরীরে লুকিয়ে ছিল!
কথার সূক্ষ্মতায় বিশেষ স্বপ্নগুলো ভাসমান এলোমেলো
সেই থেকে অতলান্তিক আমিও অসহনীয় নির্যমে চোখ বুজে আছি!
সাদা পাতায় শব্দ ছড়িয়ে দিতেই অর্ধেক আকাশ
ভ্রাম্যমাণ মেঘের কাছে
অবিন্যস্ত ভুলগুলোকে বলেছে বিকেলে দেখা করতে!
মন খারাপ নিয়ে ঘুম ভাঙলে সংখ্যাভীত প্রবাহে
উড়ে যায় যাবতীয় অশরীর কথা

শহরের সব রাস্তায় চিরকালের অসুখ
অর্থাৎ নিষ্পলক হয়ে থাকার কথা ব্যক্তিগত চোখে চেয়ে নিলাম
রোজ কেউ না কেউ ফিরে যায় দরজা ডিঙিয়ে
রোজ ঘুমের পথে প্রিয় মুখগুলো নির্বোধ হয়ে ঘোরে নানান প্রবাহে
বাকি একটু পথ; ওখানে পৃথিবীর ছিন্ন ভিন্ন শাসন-আঁধার
এই একান্ত নির্যম জীবন
এর মধ্যে পকেট ভর্তি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস
এসব আমার কবিতার সঙ্গে অদল-বদল হয়ে থাকে।
শহরটা এখন চেনা যায় না
প্রতিদিনের ভাসমান পরিতাপ কপালের বলিরেখা থেকে উঠে এলে
কাঙালের মতো মধ্যরাতে চোখ বুজে ক্ষমা চাই
নিজের কাছে নিজেই!!

আকাশ নাসের হোসেন

বাড়ির সামনে এক বেচারি ষাঁড় একা একা দাঁড়িয়ে থাকে,
বসে থাকে, শুয়ে থাকে। তাকে কিছু-কিছু খেতে দিই,
সে খায়, খেয়ে সে সবসময় বিমোয় কিংবা ঘুমোয়
তাও নয়, দিব্যি চকচকে শরীর নিয়ে আপেক্ষা করে। যাদের
ষাঁড় তারা মাঝে-মাঝেই তাকে ডেকে নিয়ে যায়, যে-কাজে
লাগাবার সেই কাজে লাগায়, তারপর ছেড়ে দেয়, আর
ছেড়ে দিলেই সব-কিছু ছেড়ে সে আমাদের বাড়ির সামনে
এসে দাঁড়ায়, এখানেই মাঝেমাঝে আকাশের দিকে তাকিয়ে
কাউকে খোঁজে, কাকে খোঁজে তা আমরা জানি না, কেউ
কখনো তা জানতে পারি না।

মাকড়সা শেখ জয়নাল আবেদীন

পারছে না মেনে নিতে নীতিহীন রণে পরাজয়
রাজ্যহারা ঘরছাড়া গৃহবাসী ব্রহ্ম তাই ভাবে—
তবে কি সত্যিই রণে নীতি নয় বড় হয় জয়
ছলে বলে একপক্ষ সহজেই পার পেয়ে যাবে!

চোখে পড়ে—গুহামধ্যে মাকড়সা উঠছে পড়ছে
বারে বারে ক্ষুদ্রজীব ওঠে পড়ে, আশ্চর্য উদ্যম
আবার উঠছে তেজে, পরাজয় তবু না মানছে
অবশেষে সিদ্ধ হল মনস্কাম, এ তো নয় ভ্রম!

কানে আসে অকস্মাৎ পশুরাজ সিংহের গর্জন
কৈপে ওঠে অভ্যন্তর—উঠে পড়ে ব্রহ্ম মহাবীর
ছুটে চলে লক্ষ্যপথে যেন এক অকাল বর্ষণ
ধুয়ে মুছে শত্রু সাফ একমাত্র সংকল্প সুস্থির।

তারপর ইতিহাস,—সেনা সঙ্গে যুদ্ধে নেমে পড়ে
অমিত বিক্রমে বীর হতরাজ্য করায়ত্ত করে।।

নিজস্বতা অভিজিৎ দাশগুপ্ত

নিজস্বতায় ছুটছে নদী
ছুটতে ছুটতে এপার ওপার...
প্রাণের টানে ঢেউয়ের দোলা
চতুর্দিকে দুয়ার খোলা
পেরিয়ে যাবো
গভীর অন্ধকাব

নিজস্বতায় ফুটছে ফুল
ফুটতে ফুটতে পথেরই আহ্বান
পথের গানে ফাগুন হাওয়া
বাঁধন ভেঙে ছুটে যাওয়া
তোমায় দেবো
ভালবাসার দান

নিজস্বতায় উঠছে সূর্য
উঠতে উঠতে আলোর উদ্বোধন
কলতানে ভোরের আলো
বাইরে ঘরে প্রদীপ জ্বালো
স্বপ্ন-সাধে
এলো শুভক্ষণ।

নতুন পাতায় চিক্চিক্ ব্রিগেডের মুখ সুকমল ঘোষ

সব রক্ত শোভের অভিমুখ যদি
আছে পড়ে ব্রিগেডের মাটিতে
সুনামীর তোড়ে ভেসে তো যাবেই
রাজভবন রাইটার্স মন্ত্রিসভার দপ্তর।
খচ্চরের খোঁয়াড়ে, কে কাকে তখন মারবে লাথ
কিংবা পশ্চাতে পড়বে ঠ্যাং
সময় কি তা জানে!

বসন্ত এসে গেছে ইত্যবসরে
নতুন পাতায় চিক্চিক্ করছে কিশোরী মুখ
ছলকা বাতাসে ওড়ানার ফাঁসে সদ্যস্মৃতিত বুক।

কিশোরী এবার যৌবনের কপাটে দিয়েছে পা
ওরা একদিন মা হবে; সন্তানের খিলখিল হাসিতে
ভরে উঠবে শহর মাঠ গাঁ এবং ব্রিগেড।

ইঁশিয়ার বেহিসেবি বরাহের দঙ্গল
ইঁশিয়ার লুঠেরা বাহিনী
ইঁশিয়ার চাঙড় টাঙির দল!

এগিয়ে চলেছে আর এক শপথের ব্রিগেড
সারি সারি এগিয়ে চলেছে
একের পর আর এক ব্রিগেড
এক থেকে সহস্র ব্রিগেড।।

বাঁধভাঙা জলের সম্ভ্রাস অজিত ত্রিবেদী

প্রকৃত মৃত্যুর মতো বাঁচতে বাঁচতে
যথার্থ জন্মের এক একটি মুহূর্ত রচনা করি
অব্যবহৃত জীবনের বাইরে থাকতে থাকতে
অচেনা নিজে থেকে হাত ধরে ধরে নিয়ে যাই
অনধিগত প্রকৃত শিকড়ের কাছে
মায়াময় শূন্যতা শুয়ে আছে একা
কেন্দ্রহীন, চারদিকে আঁকাবাঁকা ফণাময় জল
ভুলেও সে একবার কাছে ডাকল না

তবুও জল, তোমার ভেতর দিয়ে জন্ম মৃত্যু যায়
এই আমি শূন্যের বৃন্দবৃন্দ একাএকা সমুদ্র গাড়ি
গড়ানো স্বভাবের শিল্প হয়ে রামধনু রঙে মিশে যাই
ভাঙি বাঁধ স্বপ্নের বসতি জুড়ে, মায়াতরঙ্গ শেকড়
উপড়ে এনে বামন অবতারে পুঁতে দিই চাঁদে,
সে তবু একটি অক্ষরও আলো জ্বালল না, একবার

উৎসরেখা অরূপ আচার্য

তুমি কতরকম জেলখানা দেখেছো নীলিমা
আমি রোজ দশটা পাঁচটার গরাদের ভেতর ঢুকে যাই
সহকর্মীদের অদ্ভুত বিদ্রূপ আর অপমানের তির্যক
ঢেকে দেয় আমার যাবতীয় জলের হিম খেলাঘর
ভুলে যাই আমি সৃজনের অনন্ত ইশারা নদী
মাথামুখ ঢেকে সাধারণ কেরাণীর মতো আমিও
হাহা হিহি আর মহার্যভাতার খবরে উজ্জ্বল উজবুক
দিন শেষে ছুটির ঘণ্টা শুনেই পালাতে চাই যখন সৃজনে
দেখি কলম থেকে ঝরে যায় শুধু ধূসর রক্ত শব্দ
তবু যেতে চাই মাঠের সবুজ মাখানো নতুন আঁধারে
বিকেলের পর সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে উঠি প্রিয় জীবনে
যোধপুরের ছ'তলা বাড়ির ওপরে এখন নীলিমা
তোমার আঙুল ছুঁয়ে মুছে ফেলি সব কালিমা
হাত বাড়িয়ে তুমি বসে থাকো শিয়রে যখন
আমি জানি শুধু আমার নিঃস্ব নরম জানালা
তোমার কাছেই রয়েছে আমার কবিতার উৎসরেখা
সারাদিন যত নষ্ট পরিক্রমার কালো কালো ছায়া-রা
তোমার মুখের আলোয় সেসব হেমস্তের অদ্ভুত পাখি
নীলিমা, তুমি কবিকে বাঁচাতে নদীর মতো নগ্ন হয়ে বোসো।

জন্মবৃত্তান্ত মনোজ মাজি

ঘুরে ঘুরে আসে জন্ম, মৃত্যু কিংবা শব্দভেদী স্মৃতি,
সলজ্জ উচ্ছ্বাস ফুটে ওঠে পটু যন্ত্রের আলাপে,
ব্যথার লাঘব বুঝি রিসিভারে ভাসে না প্রতীতি
দূরভাবে বিড়ম্বনা বাড়ে, কোন্ দৈব অভিলাপে!

নজরে পড়ে না কারো—বিহ্বলতা, পেখম কাহিনি
পই পই করে বলি : ঢেকে রাখ্ আকাশ, কুসুমে
মরশুমি মেঘ জন্মে, জন্মে আত্মঘাতী অক্ষৌহিণী
তোর জন্য অনুগ্রহ কিছু, ডুবে আছে—শীতঘুমে!

সন্দেহ প্রবণ মনে ঝড়বৃষ্টি তেড়ে আসে, আর
ঘুমের ভেতর জেগে যায় চপলতা একা একা
রাতভর টেলিফোনে কৃতজ্ঞতা, যান্ত্রিক যাপনে
কিছুটা কুহক, ভুলে যদি আসে কোনো সমাচার!

স্বপ্নে আকাশ জুড়ে হাতড়ে বেড়ায়—পত্রলেখা...

ঘুমিয়ে পড়েছে সেও, জাঁহাজ জন্মের কারণে।

জবাকুসুম দিনমণি কণিষ্ক আচার্য

তুমি যতক্ষণ থাকো, মাথার উপরে মাথা তুলে—
ভয় পেয়ে, ভয়েরা চলে যায় দূরে, বহু দূরে।
নতমুখ বেওনেট হিংসাকে গুলে খায়
বোতলের জলে; সম্মোহিত আকাশ ও মেদিনী।

তুমি যতক্ষণ খাড়া থাকো, চেতনার দিনমণি,
অসহায় বুজরুকি, মৌনীবাবা সাজে;
ধূর্তের শয্যাগমন, তুমি সজাগ যতক্ষণ—
কাঁটাগাছে পত্র বাহিরায় ক্যাকটাসও ঝলমলে—
বৃক্ষকূলে দেখা যায় ফুলের আর ফলের বাহার।
তোমার বর্জনির্ঘোষে কুসংস্কার দূরীভূত হয়—
কুচিন্তার নিমেষ হরণ। তাই আন্তরিক আবেদনে
আমরা জানাই—চেতনার দিনমণি তুমি—
জেগে থাক সারাক্ষণ।

মুক্তির কথা বর্না মুখোপাধ্যায়

প্রসাধনের মূল্য নেই কোনো
জীবনবোধের মৌল অবস্থান ছেড়ে
জীবনায়নের প্রশ্নে...
ভাবনার কাঠামোয় সংঘাত প্রাবল্য আঁকে।

শিউলির নীরব বাণী বীজ পোঁতে শিরায় শিরায়
ছন্দময় আশ্রয় খুঁজি।

অথচ অজ্ঞাত সুদীর্ঘ পথ নিঃসঙ্গ সন্ধ্যার দিকে
জীবনভূমিতে জাগে অকৃতজ্ঞতার ভার।
ঘৃণা করি মূলবোধহীন বিকার, ছুটে যাওয়া—
সত্যছলনার কাঙাল চেতনা।
ঘৃণা করি নেপথ্যে হরির লুট আর ভাঙাচোরা মুখ।

জানি না দর্শন কবে মানবিক হবে—
আঁকবে সমকালীন জ্যোতির তিলক!
এখনো যে সম্পর্কহীন প্রেতনৃত্য প্রধান ভূমিকায়!
তবু কবির কলম—
নিঃস্তুকতা ভেঙে অনগ্রসর জীবনের
মুক্তির কথা বলে।

ক্রৌঞ্চমিথুন পরেশ কর্মকার

ভাটিয়ালি গানে নৌকো ভাসিয়ে যে নাবিক নিরুদ্দেশ হয়
তার কাছে দুপুরবেলা, একলা নিঝুম সন্ধ্যা কী আর দিতে পারে!
মৃত সব মোহনার বুক চরে জমে না বিজয় উল্লাস, ওড়ে না পতাকা
মুঠোয় যে বৈঠা ধরা থাকে তার একলা বিরহ যন্ত্রণা শোনা যায়
অবহেলার কাজল পরে ক্রমেই ঘন হয় অন্ধকার
দূর থেকে আরো দূরে হারিয়ে যায় জলরাশির মতো
গাঁ-ঘর থাকে না, থাকে না সাজানো শহর, শহরবাসী
ইন্দ্রজাল বিছিয়ে বহমান ঢেউ আর স্রোত
ছই-এর উপর কড়া রোদ ঘনীভূত মর্মর কথার বাসা
হাওয়ার শব্দে কখনও ফিসফাস কুয়াশা ভেজা কথা
গল্পের খেয়াচরে বসে অধিকার ছিনিয়ে নিলে
দ্যাখো সে চরায় খেলা করে সুখী এক ক্রৌঞ্চমিথুন।

গোপাদি, আমরা জেগে আছি বিকাশ বিশ্বাস

গোপাদি, তুমি নিশ্চিন্তে ঘুমাও;
অতন্দ্র প্রহীরর ন্যায় জেগে আছি
আমরা জেগে থাকবো
জানি এ বড়ো দুঃসময়।

কত বাড়-ঝাপটা করেছ উপেক্ষা
পা টেলেনি, উদভ্রান্ত হওনি।
কখনো মধুমানবী
কখনো বিশ্বস্ত সৈনিক
সাবলীল সংলাপে ভূমিকা পালনে
তুমি ছিলে অক্লান্ত অনন্যা।

সংস্কৃতির অঙ্গনে জ্বলেছো
অনির্বাণ শিখা
মানবাধিকারের মিছিলে
তুমি হেঁটেছো অনেক;
তোমার দেখানো পথে হেঁটেই
আমরা ঠিকানা খুঁজে পাবো নিশ্চয়।

গোপাদি, অশান্তির কালো মেঘ
একদিন সরবেই
দূষিত রক্তের বাহকেরা
হোঁচট খাবেই।
তুমি ঘুমাও শান্তিতে
জীবনের জয়গান গেয়েই
আমরা আমৃত্যু জেগে থাকবো।

আয়নায় দেখা
স্বপ্না রায়

দেখেছি সে মেয়েটাকে
ভূগোলের ক্লাসে,
চুপিচুপি স্টোরি বুক
পড়ে আর হাসে।
লিখতে যখনি দিই
শ্রুতির লিখন—
আকাশে কী যেন খোঁজে
হয়ে আনমন।
মন নেই ইতিহাসে
কেবলই ঘুমায়,
শিবাজীর নাম শুনে
ফ্যালফ্যাল চায়।
অঙ্কের সাথে ভাব
নেই, জোর আড়ি।
প্লাসে আর মাইনাসে
গোল লাগে ভারি।
পেছনের বেঞ্চেতে
খেলা কাটাকুটি—
পাশে বসে যে মিনি
সেই হল জুটি।
মনে নেই নাম তার,
রোলও গেছি ভুলে,
আয়নাটা দেখলেই
মন ওঠে দুলে!

অপরাজিত
গৌরী সেনগুপ্ত

এসব মুনাফা বোঝে না
করমর্দনের ভাষা—
এসব রক্তচক্ষু বোঝে না
অর্জিত ফসল—
যেমন কোনো বুলেট বুঝতে চায় না
বাঁচার অধিকার।
তবুও শব্দ আছে—
শব্দ আছে তলোয়ারের মুখে।
নগ্নপদ মানুষ হাঁটছে
কৃষ্ণ অন্ধকারে
তরঙ্গিত সর্বহারা মিছিল।
ওরা তিমিরহনন সেই হাড়গুলো
খুঁজে নেবে গুপ্তধনের মতো—
মৃত্যুকে নিহত করে
শেষ করবে রাত্রির প্রহর।

যারা বাঁচায়
রিনা কুণ্ডু

ও মেয়ে তুই দুপুরবেলা
পরের কাজ গুছিয়ে মেলা
নরম কাঠির মাদুর পেতে
ভাতঘুমের ক্লান্তি মেখে
চোখদুটো জিরিয়ে নেবার
সময়টুকু পাস।

ও মেয়ে তুই দুপুর-রাতে
গরম ফোনা নুনভাতে
দুমুঠো ভাত নিজের করে
পেট ভরে রোজ খাস।

ও মেয়ে তুই সন্ধ্যাবেলা
গা ধুয়ে কি মাখিস মেলা
গভীর রাতে চিলেকোঠায়
বাবু কেন তোকে পাঠায়।

চুপিচুপি খিড়কি খুলে
এদিক-ওদিক উঁকি মেলে
চাঁদের আলো মাথায় করে।
কাঁচুলি তোর ঢিলেঢালা
ছায়া দেখি করছে খেলা
ঠোটে তোর ক্ষয়ের হাসি
ঘরে তোর পাস্তা বাসি।

জেগে তুই শরীর দেখাস
শরীর বেঁচে মানুষ বাঁচাস।
মেট্রোরেলের সিঁড়িগুলো
ঢুকলে পাড়ায় দেয় যে উলু
দাঁতের নিচে চিবিয়ে পান
ইচ্ছেগুলো হয় যে খান।

ও মেয়ে তুই মালিক ছেড়ে
নিজের শ্রম নিজেই করে
রাতজ্যোৎস্নার আদর মেখে
একটু তুই ঘুমা

সমাজ তখন এগিয়ে এসে
মিঠে রোদের পরশ মেখে
দেবে তোকে মিষ্টি অনেক চুমা।

সম্ভাবনার ভোর
সুধাংশুরঞ্জন সাহা

আমাদের মিসিসিপি নেই, ঠিকই।
নীলনদও নেই, নেই ভল্গা।
কিন্তু আমাদের আছে গঙ্গা
আছে, আছে প্রাণের পদ্মা।

শুনেছি গ্রামে গ্রামে
মহল্লায় মহল্লায় চলেছে তুমুল সন্তাস
লাঞ্ছিত হচ্ছে মা
লাঞ্ছিত হচ্ছে মাটি
লাঞ্ছিত হচ্ছে মানুষ।

কেউ কি শুনছো!!!
লাঞ্ছিত মায়ের কান্না
লাঞ্ছিত মানুষের কান্না
লাঞ্ছিত মাটি চিৎকার করে বলছে :
বাংলার মাটি বর্ষায়
হয়ে যায় একেবারে নরম কাদা
সেই মাটিতে যা খুশি যায় গড়া।
আবার এই মাটই গ্রীষ্মের উত্তাপে
হয়ে যায় অসম্ভব কঠিন পাথর
যা শত্রুর মোকাবিলায় ধারালো অস্ত্র।

আর দেরি নয়
এবার জনে জনে বলে দাও...
ঘরে বাইরে আমরা যুদ্ধে যাব
মুছতে কালোরাত্রি।

আমরা ভাঙবো লৌহকপাট
আমরা আনবোই সম্ভাবনার ভোর।

খুঁজে নেবে
পুষ্পজিৎ রায়

এখানে এখন দন্ধ দুপুর বেলায়
পরোয়াবিহীন ধায় গৃধু শকুন
সালিশির নামে ব্রুর নির্মমতায়
সহজেই চলে কত শত গুম খুন

বদলে কি যাবে আইনের উপভাষা
হেফাজত চলে বেশ তো অনির্দিষ্ট
প্রশ্নর রচে হত্যার বারমাস্যা
ঠাই তার ঠিক খুঁজে নেবে পদপিষ্ট!

বন্যা

উদয়ন ভট্টাচার্য

অনবদ্য জ্যোৎস্নায় স্রোতস্থিনী হলে
কিছু তীর ভাঙলো, কিছু মানুষকে
টেনে নিলে স্রোতে,
বহমান ধারায় স্নান করলো কাজের মানুষ,
কিছু সরীসৃপ বাস্তুচ্যুত হলো।

জনপ্রতিনিধির সামনে এসে দাঁড়ানো
হাজার হাজার মানুষ.
শুকনো চিড়ে, খিচুড়ি নিয়ে
ভরলো দান পাত্র,
অবিরাম বৃষ্টিতে এইভাবে একদিন, দুদিন
খোলা আকাশের নিচে মানুষ

উপব্রী বৃষ্টিতে তাঁবুর নিচে
জন্ম হয় একটি শিশুর,
আর ওদিকে যুবতীর মৃতদেহ নিয়ে
হরিধ্বনি দিতে দিতে চলে গেল একদল লোক।

স্বাধীন ভারত

মৃণালকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়

বরষার বারিধারা ওদের দু-চোখে অশ্রু হয়ে—
ঝরে পড়ে অবিরত, দারিদ্রের তমিস্রার মাঝে
সমাজের লাঞ্ছনা প্রতিদিন নীরবেই সহে,—
অশিক্ষাই চিরসাথী, তাই তারা ঘৃণ্য সমাজে!
যখন ভরে না পেট উদয়াস্ত পরিশ্রম করে—
ভাগ্যের দোহাই দিয়ে আধপেটা খেয়ে বেঁচে থাকে,
—সমাজের একপাশে নীরবেই থাকে তারা পড়ে,
দুষে না কারেও কভু জীবনের শত দুর্বিপাকে!
ছেষটি বৎসর যায় ওদের মাথার পরে বয়ে,—
স্বাধীনতা-স্বাদ কি যে বোঝে নি তো কখনো মনেতে,
জাতীয় পতাকা তাই ধনীদেব কাঁধে যায় রয়ে,
প্রতিশ্রুতির ঝড় যায় বয়ে দেশের বুকেতে!
গ্রামীণ-ভারত কাঁপে প্রতিদিন বৃভুক্ষার ঝড়ে,
স্বাধীন-পতাকা দেখি সেখানেই সগৌরবে ওড়ে!

কড়ি

সুশান্তকুমার ঘোষ

কী আনন্দ হত তখন বলত যখন লোকে
ফাটাফাটি রেজাল্ট তো কে আটকায় তোকে!

এম.পি. থেকে এম.এ. বি.এ. সবেতে ফাস্টক্লাস
আকাদেমিক কেরিয়ারে আর কী তুই চাস!

জয়েন্ট দিলে ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হতিস
কিন্তু ওসব পড়ার মত খরচ কোথায় পেতিস?

এই পড়তেই বাপের জমি মায়ের গয়না গাঁটি
মহাজনের ছুটিটাতে গাড়ল গিয়ে ঘাঁটি!

ইঞ্জিনিয়ার হতে গেলে মাথার উপর ছাদ
দু-তিনটে সেমিস্টারেই হত যে বরবাদ।

তার চাইতে এটাই ভাল এম.এ. প্রথম শ্রেণি
দু-চার মাসেই জুটে যাবে মাস্টারি কেরাণি।

দারুণ খুশি দারুণ আমোদ ভীষণ অহঙ্কার
ও সব পাতি চাকরিগুলো কে আটকায় আর!

পরীক্ষাতে বসা হল লেখা হল সব
ফল বেরতেই ডিগ্রিধারীর নতুন অনুভব!

পরীক্ষা আর ইন্টারভিউ হল ভুরিভুরি
সবখানেতেই চাকরির পথ আটকে দিল কড়ি।

পাল্টায় বর্ণমালা

পারেশনাথ কর্মকার

জীবন খাতার পাতার অক্ষরগুলো
আজ বড্ড অস্পষ্ট
অস্পষ্ট লাগে কবিতার শরীর।
বারুদের গন্ধে জ্বলে থাম, শহর, মানুষ
রক্ত নদীর স্রোতে বাড়তে থাকে
কচি ধানের চারা
গভীর যন্ত্রণায় কাটে দিন
একবুক হাহাকার নিয়ে।
অর্ন্তদাহে জ্বলতে থাকে সবাই
নিস্তার নেই কারও
দামিনীদের বুকো দুঃশাসনের থাবা।

কবিতার শরীর পাল্টে যায় রোজ
তার নতুন বর্ণমালায়।

রাজা আসে যায়, রাজা বদলায়
মানিকলাল অধিকারী

ভাবছো নাকি? ভাবনি তো ঠিক কখনো এমনি করে
চলতে ফিরতে এদিক ওদিক আগুন ঝরে
পুড়িয়ে দিতে চেয়েছিলে? পুড়তে নাকি?
শৈশব স্মৃতি, ছেঁড়া ক্যানভাস, আরো অনেক টুকিটাকি।

গভীর রাতের অন্ধকারে অরণ্যজুড়ে গাছের ফাঁকে
মধ্যবর্তী ছায়াপথে তারার চলার ঘূর্ণিপাকে
দাঁড়িয়েছিলে দুহাত তুলে? থামনি তো আর কখনো,
কেই বা ছিলো সঙ্গী তোমার শূকতার চোখ স্বপ্নঘন।

তখন তুমি ঘোড়ায় চড়ে ছুটছ শুধু দুলকি চালে
ঢেউ ভাঙছে জনারণ্যে, উঠছে আওয়াজ চলার তালে
এমনি করেই আসবে তুমি বলনি তো আর কখনো
এখন তবে যা হচ্ছে হোক শিউলি তলায় সানাই শোনো।

সানাই বাজে বানভাসিতে, কাঁসর ঘণ্টা ধূপ ধুনো
নাটমন্দির দখল নিয়ে বাস করছে ঘরকুনো
রাজা আসেন রাজা যান, ভাসছে দেশ চোখের জলে
ভাসছে ভাসুক এই চরাচর মেঘমল্লার বজ্রতলে।

অসঙ্গতি
মাধুরী অধিকারী

লক্ষ্মী আসবে বলে সমস্ত কোজাগরী রাত জেগে
কেন যে ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়ল
কেন যে একদম ঘুমের অতলে ঢুকে পড়ল ছেলোটো!
একই চালের নিচে তেত্রিশ কোটি
দেবতার সামনে বসে মা কোনো কিছুই জানল না—
আর পাশের বাড়ির স্বপ্নবিলাসী মেয়ে
যে কেবল ছবিই আঁকে
সেও তো কিছুই জানেনা—
অথচ দেশে বিদেশে তাবড় তাবড় মানুষ
যারা তাকে চেনেই না
কেমন করে যেন জেনে গেলো ছেলোটির ঘুমের খবর
বড় বড় সভা হল
চায়ের কাপে ঝড় উঠল
তার মাঝে কতবার যে লক্ষ্মী এলো গেলো!
আর এই আসা যাওয়ার মধ্যেই
ঘুমের খবরটা
ইতিহাস হতে গিয়ে হঠাৎ গল্প হয়ে গেল!!

ডাকো
তপন দাস

আরেকটি নতুন ঘুমের সাক্ষী থাকো
রাত শেষ হবার পর
তোমারও দু'চোখ নিঃশব্দে লাফ দিয়ে উঠবে!

সুরক্ষিত অন্ধকার কেড়ে নিলে
আরেকটি অমানুষিক পরিণতি শুকনো মাঠে
নীল হয়ে ফুটবে
হারিয়ে ফেলো না ধৈর্য
অগুণতি প্রতিবাদের গলা রচিত-মৃত্যু জ্বলে
সাজা দেবে
সময় হয়েছে ডাকো তাদের, এবার ডাকো...

ছিটকে পড়ুক
যযাতি দেবল

[কমরেড তরুণ ঘোষকে]

মিথ্যা যখন মাথার উপর ঘোরায় শাসন ছড়ি
মানুষ কেমন ভোম মেরে যায় তখন
কথারা সব খেঁই হারিয়ে জিভের ডগায় কাঁপে
মাৎস্যন্যায় উঠে আসে পুঁথির পাতা থেকে

প্রতিবাদের ধ্বজা ছেড়ে তাসের আসর মাতায়
মধ্যবিন্ত বাজার করে দুধের প্যাকেট কেনে
বউ ছেলে সব রাখতে ভাল কুলুপ আঁটে মুখে

এমন দিনে ছুটছে কে ওই পাড়ার থেকে পাড়া
ভরসা জোগায় সাহস জোগায় হৃদয়ে দেয় নাড়া
বলছে কে ওই কাটবে আঁধার কালো
দেখ না চেয়ে দিগঙ্গনে আলো।
সামাল সামাল বলছে হেঁকে কে?
হলোই বা তোর পোকায় কাটা বয়স
দেখ চেয়ে তুই দেওয়ালে তোর ফাটল
সাপগুলো সব তুলছে ফণা শীতঘুমটি সেরে
দশহরায় যত্নে লেপ ওই গোবর মাটি দিয়ে।
শক্ত হাতে মার হেতালের বাড়ি;
বাস্তবঘু বদবাবুদের ধাড়ি—
ছিটকে পড়ুক ছিটকে পড়ুক মাঝে উঠানে গিয়ে।

ঘুরে দাঁড়াও
পান্নালাল মল্লিক

তোমরা এখনও আঁধারে দাঁড়িয়ে আছো!
তোমরা এখনও নিজের কথায় মশগুল!
এগিয়ে এস, এক মুঠো রোদ্দুর হয়ে সামনে দাঁড়াও,
একমুঠো রোদ্দুর হয়ে সামনে দাঁড়াও—
প্রতীক্ষায় জননী, জন্মভূমি সে তোমার।

আজও প্রতিদিন অস্থায়ী মেঘের মতো ভেসে বেড়াও—
এখনও প্রতিদিন জল ছুঁয়ে আচমন কর জলজ প্রাণীর মতো,
এখনও প্রতিদিন প্রকৃতির আলায়ে মাথা গুঁজে বসে আছো—
জিরোন খোঁজ অপেক্ষায়, সমর্পণসুখে!

এই আঁধারে তোমরা এখনও কিসের অপেক্ষায় ঘন হয়ে আছো—
এস একমুঠো রোদ্দুর হয়ে সামনে দাঁড়াও,
মাটির ওপর বাতাস কাঁপিয়ে আরেকবার বল
জননী, এ আমার জন্মভূমি, এ আমার প্রতিদিনের আজানভূমি।
ঘুরে দাঁড়াও, দৃপ্ত কণ্ঠে বল আমি আলোর সন্তান—
জননী, এ আমার জন্মভূমি।



ঈদের চাঁদের পানে চেয়ে
অচিন পত্নী

কল্লোলিত 'বিষাদ-সিন্ধু' পারাবারে
ক্ষয়াটে চাঁদের এক ফালি
যখন তোলে খুশির হিল্লোল,
উপচে পড়ে চুইয়ে চুইয়ে
উষর মাটি ভিজিয়ে দেয়;
প্রাণস্পন্দিত হয়।

সোহাগে, আদরে, প্রেমে-অপ্রেমে
জড়াজড়ি করে বড় আতুর হয়,
ঘরে-বাইরে, আনাচে-কানাচে
আঁদাড়ে-পাঁদাড়ে
কলরোল তোলে খুশির ঝিলিক;
বিলিয়ে দেয়, ছড়িয়ে দেয় খুশির হাওয়া।

চুইয়ে পড়া চাঁদের হাসি
খুঁচিয়ে বলে, 'এই নাও আমার খুশি
দিলাম তোমায়
লক্ষ্মীটি, না কোর না।'

জাগ গান
কঙ্কণ সরকার

এখন আমি জাগরণের মধ্য দিয়ে যেতে চাই
মরণের দুয়ারে আঘাত হেনে
লোভ আর ভয় ভেঙে জ্বালতে চাই
অগ্নিময় চিতা

কিছুতেই আত্মসমর্পণ নয়, অন্ধকারে
চোরাবালি ক্ষয় এড়িয়ে চলতে চাই
আগুন জ্বালতে চাই
বারুদের স্তম্ভে স্তম্ভে ঘরে ঘরে

আমি এখন দুঃস্থের মধ্যে যেতে চাই
ঘরে ঘরে মৃত্যু আর ত্রাস, ঘরে ঘরে দুঃখ, দীর্ঘশ্বাস
মানব না, মানব না কিছুতেই আত্মসমর্পণ
ফিরব না ফিরব না যতক্ষণ বারুদ না জ্বেলে বিস্ফোরণ

সাম্রাজ্য তার সর্বস্বাস্ত্র হয়
এখন আমি জাগরণের মধ্য দিয়ে যেতে চাই
আমি এখন উপেক্ষার মধ্য দিয়ে আগুন প্রতিভা নিয়ে যেতে চাই
শান্তি ও নেশা কাটানোর জন্যে আমি জাগরণের গান গাই।

মানুষ
অপর্ণা দেওঘরিয়া

কেউ আসে না গর্তে পড়ে গেলে
কেউ হাঁটে না সহজ সরল পথে
মানুষগুলো মুখোশ নিয়ে ছুটে
আড়াল খুঁজে রঙ-বেরঙের ফাঁদে
মুখে মুখে কত রঙের বুলি
স্বপ্ন দড়ায় বুকুর কথাকলি
কেউ শোনে না সুখ দুঃখের কথা
ভালোবাসার আকাশটা যায় সরে।
অপেক্ষাতে একলা বসে বসে যাপন সুখে
মানুষ নামে মানুষ নেমে আসে
ফাঁকফোকরের গোপন গুহানলে
লালসাময় মিছিল তুফান তুলে
অর্থলোভের অচেনা মুখোসগুলো
মানবতার আকাশ করে কালো
ভালো মানুষ ভালো কাজে নামে
সঙ্গী সাথী জড়িয়ে ধরে মধুর আলিঙ্গনে
মানুষ তবু সৃজন খোঁজে বন্ধু খোঁজে
যুদ্ধে নয় প্রেম ছড়িয়ে হৃদয় মাঝে।

ইলশেগুঁড়ির মাস
আমির উল হক

হৃদয় ভাসে চোখের জলে
বুকটা দুঃদুর,
মন থাকে না মনের ঘরে—
পাগলপারা জ্যোৎস্না ঘিরে
রোদ কুড়োনের শুরু।
দুচোখ ভরা স্বপ্ন শোনায়ে
কোনো বেসুরো গান,
মনের ভেতর দিচ্ছে উঁকি—
সাঁঝ তারাদের লুকোলুকি
সবুজ ভরা ধান।
রাতের আকাশ মেঘ ঢেকেছে
বৃষ্টি ভেজা ঘাস,
স্বপ্ন দেখা চোখের পলক—
দেখে না আর রোদের বালক
ইলশেগুঁড়ির মাস।

শহিদ স্মরণে মলয়কান্তি মণ্ডল

এই বসন্তে কোথায় গেলে তুমি
আজকে আমার ব্যথার মনোভূমি
জুড়ে তোমার নীরব উপস্থিতি
তোমার কর্ম তোমার জীবনস্মৃতি
শক্তি যোগায়, সাহস যোগায় মনে
কঠিন পথে এগিয়ে চলার ক্ষণে।

তোমার স্মৃতি মুক্তিসাধন ব্রতে
পাথেয় দেয় অস্ত্রবিহীন
চলার পথে পথে।
কে বলেছে হারিয়ে গেছ প্রিয়
ঘনিয়ে আসে আঁধার যদি
প্রদীপ জ্বলে দিও।

চিহ্নপটে রক্তে লেখা
তোমার প্রিয় নাম
তোমায় লাল সেলাম।

চুপ থাকো না কৌশিক মণ্ডল

সূর্য অস্ত গেছে কিয়ৎক্ষণ
পূর্ণিমা রাত কিস্ত জ্যোৎস্নাহীন সারাক্ষণ
তোমার চলে যাবার আজ ঠিক দু-দিন
বাড়িময় ছড়ানো আমাদের প্রেম অস্তহীন

বর্ষণ আজ মেঘভাঙা, গাছের সব ফুল ঝরে পড়ে রাস্তায়
অকাল বসন্ত আজ, আমার আগে পরে, চারিধারে, চেতনায়
বই-তাকে বোলে বিয়ের বেনারসির কাটা টুকরোর পর্দাখানা
ওটা রয়ে গেল, তুমি শুধু আমার সাথে থাকতে পারলে না

পরীর মতন উড়তে চেয়েছিলে তুমি, কোনো এক প্রেমের কালে
সিলিং-এ ঝুলন্ত তুমি যেন সেই; জানাচ্ছে বিদায় কাঁধ হেলিয়ে
লক আউট নোটিশের উল্টোপিঠেই লেখা বিদায়বেলার দু-লাইন
দু-মাসের স্তব্ধতা, বাতি আলোহীন কলোনি, প্রাণহীনতা আজ সর্বজনীন

অথচ প্রত্যেক মঞ্চে, আমরা কত ভালোআছি
সিনে-টেলি তারকাখচিত বিজ্ঞাপন
এক ময়ালের গ্রাসে ‘বঙ্গবিভীষণ’ ও স্বাধীন নাগরিক দিনযাপন
তোমার চলে যাওয়া, ওদের কাছে কোনো এক ‘ছোট ঘটনা’
বিপন্ন আমি, তুমি ও আমরা, অনুরোধ বন্ধুরা, চুপ থেকো না।

এলেম নতুন দেশে গণেশ ভট্টাচার্য

এ এক নতুন দেশে এলাম।
এখানে নতুন কোনো গান নেই, গল্প নেই, কবিতা নেই
যেদিকে তাকাই বেকার যুবক-যুবতীর মুখ
ভাঙাচোরা রাস্তার মতো বেঁচে আছে।

তা বলে কারও ক্ষোভ নেই, কষ্ট নেই
বানানো ব্যস্ততার আড়ালে, মোবাইলের অহঙ্কারে
বেকারত্ব ঢেকে রাখে প্রায় সকলে
মাঝে মাঝে মদের দোকানে ভিড় করে
এমনকি আবগারি আবহাওয়ার খবরও রাখে অনেকে।

এ এক নতুন দেশে এলাম
এখানে শিল্প নেই, কথাশিল্প ছাড়া
মানুষ খুনের মতো নিরীহ ঘটনা আকছার,
প্রতিবাদ নেই;
এ দেশে এখন কাজ নেই, চাকরি নেই—

তবু তুমি চাকরি পেতে পারো
যদি তোমার বোনকে ধর্ষণ করে একদল ‘বলিষ্ঠ যুবক’
তোমার বাবাকে গুলি করে মারে ‘প্রিয় দুষ্কৃতি’
কেউ কেউ তোমার সামনে এসে বলবে,
“এই সব তুচ্ছ ঘটনা ভুলে যাও
এই নাও তোমাকে চাকরি দিলাম”...

এ এক নতুন দেশে এলাম
যেখানে মানুষের চোখ ক্রমশ শান্ত ভেড়ার মতো নির্জীব।

দীর্ঘ পরবাসে পারেশ ঘোষ

মাথার কাছে স্থির দাঁড়িয়ে আবার
সবেদা গাছের ছায়ার মতো
অবসর নেই—বিনোদন উধাও
জীবনযন্ত্রণায় তীর একাকার
সুখ নেই শান্তি নেই স্বস্তি নেই...
হাত বাড়ালেই যা ছিল অনাবিল অপার।

আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে বিষণ্ণতা
ঝাপসা হয়ে দৌড়ে আসে কালো রাত্রি
একষেয়েমির প্রেক্ষাপটে মুক্তি নেই...
নিজের সঙ্গে নিজেই বলি হাজার কথা
নৈঃশব্দের আড়ালে মুখ লুকিয়ে
কেউ আমাকে ডাক দিয়ে যায়
অন্ধকার ছুঁয়ে থাকে নীল কুয়াশা
আর হিমশীতল স্তব্ধতা।

তরুলতা

জহরলাল বেরা

আমাদের গোপন সূর্য ভূমি থেকে
সরে যায় কাক ও কোকিলের
মিহি ঠোঁটের অদ্ভুত উষ্ণ, মৃদুভাষ তৃষ্ণার জল
আর তরঙ্গ তরুলতা কামড়ে ধরে
সরীসৃপময় আনন্দ গম্ভীরা পথ
ধনুক-ছিলার মতো আমাকে সে
দরিদ্র ব্রাহ্মণবংশীয় করে তোলে।

যতবার চর্ম যাযাবর তোকে
চিনতে চেষ্টা করি
শুধু তখন হলুদ বন গুণিতক হয়ে যায়,
চাঁদে-পাথরে ঘুম ভাঙিয়ে
ক্রমশ ঝাপসা হয়ে ওঠে আমাদের
কোনো না কোনো নিবিড় অবৈতনিক পাঠশালা।

নদী-স্রাণ

মঞ্জীর বাগ

সাদা কালো রঙ ছুঁয়ে জল দেখি—
জলে ভেসে যায় কাগজের নৌকো—সেই নৌকো
ভেসে যায়, ফিরে আসে একান্ত শৈশব।
মহেন্দ্র মাঝি নৌকা ভাসায় জলে—
পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকা প্রজন্ম দেখে নীল-রং-জল।
জলজ সীমা নৌকা মিশে যায় দূরে
দিগন্ত রেখার কাছাকাছি মিশে থাকে জল ও জীবন।
সেই জলজ জীবন স্রাণ নদী বেয়ে নোনা জলে ভাসে।

প্রত্যেক জীবনই নদী—
বয়ে যায়, ভাসে আর ভাসে
নিঝুম রাতে একা শুই—
জল বেয়ে উঠে আসে স্রাণ-মহেন্দ্র মাঝি
প্রাণের স্রাণ-মাটির-জল বাতাস-প্রেমভূমি
একান্ত আমারই নীল রং আধ-ফোটা পারিজাত—
প্রজন্মের পর প্রজন্ম বয়ে যাওয়া জলের জীবন স্রাণ।

ফকির রাজা

প্রাণনাথ শেঠ

গল্পটা আজকের না
অনেক অনেক দিন আগের।

জ্যৈষ্ঠ মাস তখনও কালবৈশাখী দাপট
উঠোনের হরগৌরী গাছে লাগেনি আগুনের ছাট
যদিও রোদপল্লিতে মেঘ বালিকারা শুরু করেছে যাতায়াত
গল্পটা তারও অনেক অনেক আগের।

একটা লিকলিকে রোগা নদী
সামাই ঘাসে ভরা প্যাচপ্যাচে কাদা আর হেতাল ঝোপ এড়িয়ে
বাবার হাত ধরে সুন্দর খেয়ালীর বাড়ি
পচা ভাদ্রে রান্না পূজার পান্না খেতে যাওয়া
গল্পটা তারও অনেক অনেক আগের।

সাঁঝের বেলা পাশের বাড়ির নাম মনে নেই সেই মেয়েটা
গলা ছেড়ে গাইছে
‘নিঝুম সম্ভ্রায় পাখি পাখিরা বুজিবা পথ ভুলে যায়...’
ঠিক তখন নদীর পাড়ে আনমনে হেঁটে যায় কলেজ পড়ুয়া এক যুবক
সেই নদীর নাম মেয়েটির নাম আজ আমার মনে নেই
বাবার মনে ছিল...
গল্পটা তারও অনেক অনেক আগের।

মনে আছে তখনও পাঠশালায় ভর্তি হইনি
একটা ন্যাড়া হলুদ কলকে ফুলের গাছে খুব দুলতাম
আর ফুলের মধু খেতাম
দোপাখা উনুনে মাটির হাঁড়িতে ধান ও
ধানের ভিতর সিদ্ধ হতো শালুকের কন্দ
আমি আর আমার ছোটোভাই সেই টানে
উনুনের চারধারে চু চু রেলগাড়ি হয়ে ছুটতাম
কাঠের ঘোড়া আর বাঁশের পাটাতনে সদ্য ঝাড়া ধানে
বাবারা কুলোর বাতাস দিয়ে আগড়া উড়াতে
ফোড়েরা বড় বড় বেতের দাঁড়ি পাল্লায় ধান মাপত
রাম, দুই, তিন,... এভাবেই গুনত
চার বছর বয়সে ছোটোভাইটা একদিন
ফট করে মরে গেল। তখন আমি কাঁদিনি
গল্পটা তারও অনেক অনেক আগের।

আজ এই মধ্য দুপুরে আমি
সব পেয়েছির দেশের ফকির
রোগা লিকলিকে নদী, নাম না মনে থাকা
মেয়েটি, চার বছরের ছোটো ভাই
আমাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যায়
আমার শৈশব কৈশোরের রূপকথার রাজ্যে
আর আমি ফকির রাজা গুম হয়ে ভাবি
গল্পটা শুধু আজকের নাকি অনেক অনেক আগের।



একটি সাক্ষাৎকার

রূপক মিত্র

অসীমের কাছে যাওয়া দরকার। কিন্তু সময় হয় না আমার। খুব যে কাজের মানুষ আমি বা ভীষণ ব্যস্ত সেরকমও বলা যাবে না। অথচ দিনের পরে দিন যায়, কতবার ভাবি যাবো এইবার অসীমের খোঁজে। হয় না যাওয়া। হ্যাঁ, অসীমের কাছে নয়, খোঁজে, এইরকম বলাই ভালো। ওর সম্বন্ধে নিশ্চিত কোনো খবরও তো নেই আমাদের কাছে। বেশ কিছুদিন আগে, বছর তিন হয়ে গেল বোধহয়, শুনেছিলাম অসীম বিপদের মধ্যে আছে। এমনকি ওর খোঁজখবর নেওয়া বা কাছে যাওয়াও নাকি বিপজ্জনক। এতে আরো কুঁকড়ে যাই আমরা। অথচ অসীম আমার বন্ধু, একথা প্রায় প্রতিদিনই কোনো-না-কোনো সময় মনে পড়ে। এতদিন ধরে এইরকম চলছে। কিন্তু যাওয়া আর হয় না। কতখানি কুঁকড়েছি এতেই খানিকটা বোঝা যায়।

রেল স্টেশনের বাইরে, গঞ্জের আশোপাশে আমাদের কয়েকজনের বসবাস। গঞ্জের দোকানপাট শেষ ট্রেনের সময়, অর্থাৎ রাত এগারোটা পর্যন্ত খোলা থাকে। আগের মতো অত রাত পর্যন্ত নয়, তবু আমাদের আড্ডাটা এখনও টিকে আছে।

পাঁচ-ছ জন আমরা বসে থাকি অনেকক্ষণ। আগে আসতো দশ-বারো। তেমন কোনো অসুবিধা নেই, শুধু একটু নিচু গলায় এখন কথা বলতে হয়, এই যা। অসীমও আসতো এখানে, হঠাৎ হঠাৎ ট্রেন থেকে নেমে জুটে যেত আমাদের সঙ্গে। সে যেন খোলা হাওয়ার গান! বেশ ঝকঝকে পরিষ্কার ছিল অসীম। ছিল কেন বলছি? অসীম তো আছে এখনও। আমরা তার খোঁজখবর রাখি না। এটাই কি সত্যি নয়?

আড্ডা মেরে বাড়ি ফিরছিলাম। রাত প্রায় সাড়ে দশটা। মোরাম রাস্তা ফাঁকা। অন্ধকার। মাসের হিসেবে না হলেও শরৎকাল এসে গেছে, বাতাসের গন্ধ ও স্পর্শে বুঝতে পারছিলাম। মুখ তুলে তাকিয়ে দেখি আশ্চর্য ব্যাপার, সমস্ত নক্ষত্রেরা আকাশ জুড়ে মহা সম্মেলনে জড়ো হয়ে আজ ঝলমল করছে। এক থেকে অন্য দিগন্তের দিকে ভেসে যাচ্ছে ফিনফিনে তুলোর মেঘ। চাঁদ নেই, আকাশময় কী এক মায়াবি আলো! রাস্তার দু-পাশে ধানখেতের মাঝে মাঝে মানুষের ঘরবাড়ি। এখানটা নির্জন। থেমে যাই আমি। ঐ তো সপ্তর্ষিমণ্ডল, লুব্ধক, কালপুরুষ। আর উত্তর

আকাশের ওই যে ধ্রুবতারা। কত দিন হয়ে গেল, কত যুগ, ওরা সেই একইরকম...!

স্টেশনে নেমে অনেকটা ভেতরের দিকে অসীমের বাড়ি। অসীম তো সাইকেল নিয়ে টো টো কোম্পানি। আমাকে আজ হাঁটতে হবে কয়েক মাইল। লাল মোরামের রাস্তা একটা ছোট্ট আঁকাবাঁকা নদীর সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে মিলিয়ে গেছে দিগন্তে। রাস্তার দুপাশে বাবলা, তাল বা শিরিষ গাছ। কোথাও আলোছায়া, কোথাও খোলা আকাশ-বাতাস, মেঘ রোদ্দুর। রাস্তা পুরোপুরি নির্জন নয়, ভ্যান রিকশা, সাইকেল, মোটর বাইক...। আমি হাঁটছি, কারুর সঙ্গে কোনো কথা না বলে। অসীমের বাড়ি অনেক দূর। কিন্তু আমি চিনি। এসেছি অনেকবার।

হেঁটে যাচ্ছি আজই প্রথম। আগে যতবার এসেছি—হয় অসীমের সঙ্গে, নয়তো ও এসে অপেক্ষায় থাকতো। স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে। আমার আজকের আসটা তাই অন্যরকম। হাঁটতে হাঁটতে কী যে সব ভাবছিলাম, আমার স্বভাবমতো, এক ভাবনা থেকে আরেক, তারপর কোথা যে উধাও হলো মন! ফিরে আসছিলাম আবার নিজের কাছে, কিন্তু পরক্ষণেই দেখি সে দূর আকাশের পাখি। বারবার এরকম হবার ফাঁকে এক সময় আজ বুঝতে পারি অসীমের বাড়ি অনেক দূর। যতখানি আমি জানতাম এখন তার থেকেও দূর অনেক বেশি! আমরা বদলেছি, জল হাওয়া, রাস্তা কেউই আর আগের মতো নেই মনে হয়। আর অসীম? গা ছমছম করে ওঠে।

ক্লান্তি লাগছিল। একটু বসি। যেখানে ঐ শিমূলগাছটা। যেখানে নদী আর রাস্তা খুব কাছাকাছি। শিমূলতলা থেকে স্পষ্ট দেখা যায়। বেনা ঝোপ, শরবনের আড়াল দিয়ে নদী ছুটছে। অর্ধেক ভর্তি। ঘোলা জল। একটা হটিটি পাখি ডাকতে ডাকতে উড়ে গেল। দূর দিগন্তে মেঘের পাহাড় ফুলে উঠছে মনখারাপের মতো। এখনও অনেকটা যেতে হবে আমাকে, এইসব নিয়ে বা পেরিয়ে।

রোদ আচমকা ভাদ্রমাসের দুপুর হয়ে উঠলো। আরো খানিকটা এগোতেই বৃষ্টিভেজা হাওয়া, আলোছায়া। এখনও একটু আধটু সাহস আছে আমার, মনে মনে নিজেকে বলি। নইলে উপায় কী? যেতে হবে অনেকটা পথ। কাল মাঝরাতে স্বপ্ন দেখছিলাম কেমন যেন অদ্ভুত। নাকি ভূতের? এইসব অদ্ভুত বা ভূত নিয়েই রাতগুলো কাটছে ইদানীং। বোধহয় আধোঘুমের। তবে জেগে উঠি আবার শেষ পর্যন্ত। এটাই সাহসের কথা। যৎসামান্য যদিও। সেই নিয়েই তো অসীমের খোঁজে আজ। এতটা রাস্তা।

বাড়ির পেছনের দিকের বুনো কচু, বিছুটির ঝোপ পেরিয়ে, খিড়কি পুকুরের পাড় দিয়ে অসীমের বাড়ি পৌঁছেছি আমি। এদিকেও একটা বারান্দা আছে ওদের। মাটির মেঝে, টিনের চাল। দুটো বাচ্চা দুলে দুলে পড়ছে। মেয়েটা বছর আট-নয়, ছেলে পাঁচ। ঠিকঠাক বললে মেয়ে এইট প্লাস, পূজোর সময় জন্মেছিল। মনে পড়ে আমিও ছিলাম সেদিন হাসপাতালে। ওরা দু-জন চোখ গোল গোল করে আমাকে দেখছে। পড়া বন্ধ। মেয়ের মুখ আস্তে আস্তে নরম হয়ে যায়। হাসি ফোটে। চিক চিক করছে ওর চোখদুটো। কেমন অদ্ভুতভাবে ভূতের মতো এসে ওদের ছাঁচতলায় দাঁড়িলাম, তবুও চিনেছে আমাকে! হ্যাঁ, ওর নাম অপি। এখানেই শেষ নয়, ওর নাম অপরাজিতা।

—অপি, চিনতে পারলি আমাকে? বাবা-মা কই?
ছেলেটা গলা তুলে, যেন প্রবল উৎসাহে বলে ওঠে, কেউ

নেই। আমরা একা। গা ছমছমানিটা ফিরে আসে আমার। ছেলেটা কী যেন? দিপু? বিলু? সেখান থেকে? আসলে, যা ভাবছি তা নয়। তেমন হলে... না না, তা কী করে হবে?

—তোদের মা—

অপি বলে, মা কাজে গেছে।

—কখন ফিরবে?

—বলে গেছে দেরি হবে না।

—আর বাবা?

—জানি না। বলে যায় না কিছু।

—কখন গেছে? অপিকে এই প্রশ্ন করার আগেই শরীর মন স্নিগ্ধ হয়ে গেছে আমার, বুঝতে পারি। চান করার পর যেমন হয়। অপি কী যেন ভাবে, তারপর বলে, কদিন আগে বেরিয়েছে। বারান্দায় পা ঝুলিয়ে বসি আমি ওদের কাছাকাছি। একটু ক্লান্ত। পিপাসার্ত। অদ্ভুত ব্যাপার, ঠিক তখনই অপি বললো, জল খাবে?

ওর শ্যামলা মুখ, ভাসাভাসা চোখের দিকে তাকিয়ে থাকি কিছুক্ষণ। মুচকি হেসে বলি, তুই কী করে বুঝলি তেঁষ্ঠা পেয়েছে আমার?

উত্তর দেয় না, লাফ মেরে উঠে যায় অপরাজিতা। মাথা নিচু করে পড়ছে ছেলেটা। পড়ার খুব মন তো!

—দে তোর মাথাটা, ঝাঁকড়া চুলের আড়ালে কেমন বুদ্ধি আছে দেখি।

ছেলেটা একটু হামাগুড়ি দিয়ে আমার কাছে আসে। ওর মাথায় হাত রাখি। কিছু তরঙ্গবর্তী কি পাচ্ছি আমি? কেমন থাকবে এরা? কেমন পৃথিবী আমরা রেখে যাবো এদের জন্য? কথা রাখতে পারবো? সেইসব স্বপ্নমেশা যত অঙ্গীকার...! কী হবে সেগুলোর? শিশুর মাথায় রাখা হাত কি কাঁপছে আমার?

কনক বললো, আমি জানতাম, আপনারা কেউ আসবেন একদিন।

চেহারাটা বেশ খারাপ হয়েছে কনকলতার। লাবণ্যময়ী ছিল, এখন তার চিহ্নমাত্র নেই। চোখ দুটো কোটরে ঢুকেছে খানিক, দৃষ্টিপাত ক্লান্তি মেশানো। সাইকেল থেকে নেমে আঁচল দিয়ে মুখের ঘাম মুছলো একটু আগেই। আবার ঘামছে।

—আমার সেই কাজটা চলে গেছে। এখন কিছু মালপত্র নিয়ে দোকানে দোকানে দিয়ে বেড়াই। শহর তো নয়, গ্রাম। যত ঘোরাঘুরি সেই হিসেবে...। তাছাড়া নানান ঝামেলা।

কনক বলছে। আমি শুনছি। আমি এসব জানতাম। অবাক হবার প্রশ্নই নেই। না জানলেও অনেক কিছু অজানা থাকে না। যদি থাকে, তাহলে সেটা ভগ্নামি। যেমন কনকের এই সোজাসাপটা কথাগুলো। আগে না শুনলেও সবই আমার শোনা।

—একটা সময় মনে হতো আর পারবো না। অনেক দিন ওর তো কোনো খবরই ছিল না। আমাদের ফোন নেই। কেউ কাছে ঘেঁষতো না। কখনও ভাবিনি এরকম হতে পারে। কয়েক মাস বাচ্চাদের নিয়ে আমি বাপের বাড়িতে...

হ্যাঁ, অসীমের ফোন ছিল না। এ ব্যাপারে কতবার বলেছি আমরা। ও ইয়ার্কি মারতো, আমি গোঁড়া, প্রাচীনপন্থী, মানুষের মুখোমুখি বসে কথা না বললে মন ভরে না আমার। আমরা লড়তাম—এসব আর চলে না আজকাল, যুগোপযোগী না হলে...। অসীম হাস্যমুখে আমাদের উড়িয়ে দিত। আমরা বলতাম, আশ্চর্য, দরকারে তোকে পাবো কোথায়? খুঁজলে ঠিকই পাবি, অসীম যাবার আগে বলে যেত।

—অবশ্য একেবারেই আমরা একা এমন বলা যাবে না।
তাদের কথায় সাহস পেয়ে ফিরে এলাম। তাছাড়া আমার বাপের
বাড়ির অবস্থাও তো জানেন আপনারা। এসেও এমন কষ্টে
পড়লাম বাচ্চাদুটোকে নিয়ে। শেষকালে গাছগুলো বিক্রি করতে
হলো।

—গাছ!

—হ্যাঁ, ঐ ডোবার পাড়ে কটা গাছ ছিল না? আপনারা
দেখেছেন। তাল, নিম, শিরিষ...

তাই তো, দুটো নিমগাছ ছিল, একটা করে শিরিষ আর তাল।
ইস, চোখেই পড়েনি এতক্ষণ! মানুষগুলোর কথা ভাবতে গিয়ে
গাছের ব্যাপারটা নজরেই ছিল না। আমরা কজন আবার
প্রকৃতিপ্রেমিক। অন্ততপক্ষে নিজেদের সেইরকমই ভাবি আমরা।
অবশ্য আমাদের থেকেও এ-ব্যাপারে অসীম অনেক এগিয়ে।
নিজেদের গাছগুলোর অবস্থা দেখে কী হয়েছিল ওর মনে?

—গাছ বিক্রির টাকায় আর কদিন? শেষ পর্যন্ত এই মাল
ফেরি করার কাজটা শুরু করলাম।

—আর অসীম?

—কিছুদিন হলো ও আসছে। প্রথমে লুকিয়ে আসতো।
অনেক রাতে। আলো ফোটার আগেই চলে যেত। এখন ওরকম
নয়। তবে দশ পনেরো দিন কোনো খবরই থাকে না মাঝে মাঝে।
দেখলে চিনতে পারবেন না ওকে। বাচ্চাদের জন্যও খুব চিন্তা,
সকাল বিকেল বেরিয়ে যাই। কেউ নেই দেখার।

—বারান্দায় বসে পড়ছিল দেখলাম। ইসকুলে যায় না ওরা?

—যায়। আজ তো ছুটি, পনেরোই আগস্ট।

ও হ্যাঁ, আজ তো স্বাধীনতা দিবস। ইস, খেয়ালই ছিল না। কী
যে সব হচ্ছে আমার! একটু শান্ত হয়ে ভেবে দেখি, নাঃ, খেয়াল
ছিল। আজ আমাদের স্বাধীনতার দিন।

—বেলা অনেক হলো। রান্না চাপাই এবার। কিছুই তো
খাওয়া হয়নি আপনার। বসুন আপনি। চা খাবেন?

—বাচ্চা দুটো কই?

—আমি ফিরলেই ওরা হাওয়া। কোথায় যে নেচে নেচে
বেড়ায়। খুঁজতে হবে। দাঁড়ান, রান্নাটা হোক।

—অসীম?

—ওর কথা বলা যায় না। কবে আসে কবে...

ডোবার পাড়ে তিনটি আতাগাছ। এরা আগের থেকে তেমন
বান্ধেনি। একটা গাছের গায়ে ঠেসান দিয়ে বসি। ডোবার ওপারে
ধানখেত। বহুদূর অন্ধি দেখা যায়। নদী পার হয়ে ঢেউ খেলানো
মাঠের শেষে উত্তর দিগন্ত। এলোমেলো হাওয়ার দিন আজ। নীল
আকাশে উড়ে যাচ্ছে সাদা ও ধূসর মেঘ। বিশাল মাঠ, অথচ
মানুষজন নেই!

আমি আসলে কিছুই ভাবছি না। মানুষের মনের অনেকগুলো
স্তর, কোনখানে এখন আছি আমি বুঝতে পারি না। বেলা পড়ে
আসছে।

মানুষ নেই। কিন্তু ওই মাঠের আকাশে পাখি উড়ছিল। যেসব
পাখিরা নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল, তারা আবার ফিরে এসে ওড়াউড়ি
করছে এলোমেলো হাওয়ায় হাওয়ায়।

দিগন্তের ওপার থেকে একজন মানুষ হেঁটে আসছিল। আমি
অন্যমনস্ক। মানুষটিকে সেভাবে অনুসরণ করতে পারিনি। হঠাৎ
একসময় সে ডোবার ওপাড়ে এসে দাঁড়ায়। দাঁড়িয়ে থাকে
কিছুক্ষণ। কনক বলেছিল, চিনতে পারবেন না। সেরকম নয়,
চিনতে পারি। অন্যমনস্ক, তাও চিনেছি ঠিক। হ্যাঁ, অসীম!

ডোবার এদিকে এসে, আমারই মতো অন্য একটা আতাগাছে
পিঠ রেখে অসীম বসে। কোনো কথা হয় না অনেকক্ষণ। ডোবার
জলে ঢেউ, এলোমেলো হাওয়া, গাছের পাতায় ফরফর শব্দ, ঘুঘুর
ডাক...

আরো অনেকক্ষণ নীরবতার পর আমিই প্রথম কথা বলি, তুই
হারিয়ে গেলি নাকি, অসীম?

চোখ বন্ধ ছিল অসীমের, অত্যন্ত ধীরে চোখ খোলে। কোটরে
ঢুকে যাওয়া চোখদুটো স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে
কিছুক্ষণ, তারপর বলে, —না।

আরো অনেক পরে আমি বলি, তাদের গাছগুলো তো সব
গেল।

—আবার হবে।

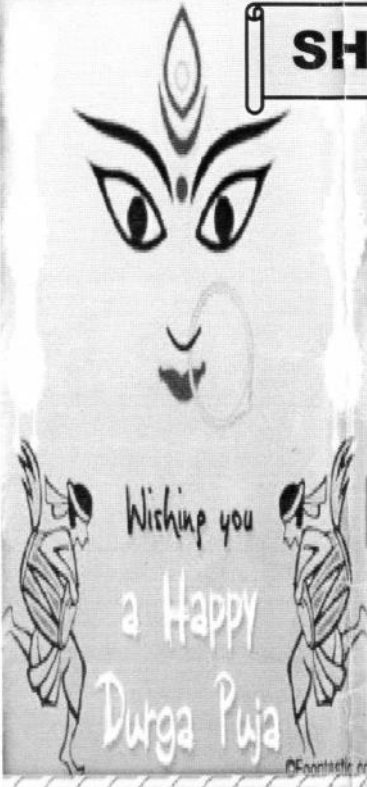
আমি মাঠের আকাশের দিকে আবার তাকাই। এলোমেলো
হাওয়া, নীল আকাশ, সাদাটে ধূসর মেঘ আর ওই যতো পাখি।
আশ্চর্য, এরা সব ছিল কোথায়!



SHYAM SEL & POWER LTD.



500D TMT REBAR



Wishing you
a Happy
Durga Puja



SHYAM GROUP
Vision for Future







Sl. No. 65

With Best Compliments of

হমারে ইঁহা গোল্ড টু গোল্ড
 ফুল রিটার্ন মিলতে হায়।
 ২২ ক্যারেট গোল্ড বা শুদ্ধ চাঁদি কে লিয়ে

Dukhilal Jewellers
 Moonlight Market
 Bastin Bazar, Asansol-1
 Proprietor : **Dhiraj Barman**

Sl. No. 95

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

দামোদর সিমেন্ট
 বালানপুর, জামুড়িয়া, বর্ধমান

Sl. No. 164

বিশ্বাসঘাতক

দেবদত্ত রায়

আজকাল আর দেখে না। ছেলেবেলায় দেখত। কিশোর বয়সে—এমনকি যৌবন পেরিয়ে এই মধ্য বয়সেও। সকালবেলা যখন পূর্ব আকাশ লাল করে সূর্য উকি দিতেন কেমন যেন মন তার নেচে উঠতো। ময়ূরের মতো কিনা জানে না। তবে নিজের অলঙ্কারেই চোখে মুখে কেমন যেন শিহরণ খেলে যেত একটা। সারা দেহে সিরসির একটা ঢেউ। কাঁপন তুলে চুলের ডগ থেকে নেমে আসতো। পায়ের নখের ডগা পর্যন্ত। আলো আরও আলো ফুটে উঠতো চারধার ঘিরে। পূর্ব আকাশটা তখন মনে হতো খুব কাছের। এত কাছের যেন হাত বাড়ালেই ছুঁয়ে ফেলতে পারে।

কিন্তু হাত বাড়াতো না। বালিশে বুক চেপে খোলা জানলার সেই সূর্য দেখা ছিল নেশার মতো। তাপসের। আপস মানে রাখুকার ছোটো ছেলোটা। ছেলেবেলা থেকেই তো দূরস্ত ছিল। এই দূরস্তপনার দৌলতে মার তো আর কম খায়নি। চড় চাপাটি তো নিদেন খৈ-বাতাসা। কিল-ঘুমি, এমন কি ঠ্যাঙ্গা-ভাঙা। কিছুক্ষণ চেল্লাতো। গুম হয়েও থাকতো। তারপরই চিৎকার জুড়ে দিত, অ্যাঁহি মা, খাবার দেবে কিনা বলো। নইলে—

মা চুপ করে থাকতেন—এই মাত্র প্রাণভরে পিটিয়েছেন ছেলেটাকে। তারপর নির্দয়তার খেসারত। গুম হয়ে বসে থাকা। অনুতাপও। এত মার না মারলেও চলতো। আসলে বাপের চশমাটা ভেঙেছে নিছক গুলি তাক করতে গিয়েই। সয় নি বকুলের। আর পড় তো পড়—বাপের চোখেই। রাধু দত্ত হাসবেন না কাঁদবেন বুঝতে পারছিলেন না। ছেলের তাক করা দেখে মনে মনে ফিকফিকই করছিলেন।

কিন্তু চশমার কাচটা ভাঙলো যখন, ‘ইস্’ বলে পেছন ফেরেন বারেন্দার চেয়ারে। এটা নির্খাত প্রশ্ন। এমন প্রশ্নে তাপস শুধু নয়, বাড়ির সব ছেলে মেয়েরাই পেত বাপের কাছে।

কিন্তু মা বকুল এসব একদম দেখতে পারতেন না। সওয়ার কথা তো নেই। সোয়ামীর মতো ছেলের তাক করা চোখে পড়েছিল বকুলেরও। দেখেই মানা করেছিলেন, এই ছোটো কী করছিস? ভাঙবে যে রে। এদিকে ছুঁড়িস না, ছুঁড়িস না—যা বাইরে। যা বলছি।

ততক্ষণে বাপের ব্ল্যাকবোর্ড মোছা ডাস্টার ছোঁড়া হয়েছে গিয়েছে এবং বাপের চশমাটি ছিটকে গিয়ে দেওয়ালে। দেওয়াল থেকে মাটিতে পড়েই কাচ তিন চার ফলা।

শিক্ষক বাপ মজাই পাচ্ছিলেন। মা অত সোজা নন। কাণ্ড দেখে ছুটে এসে প্রথমেই দুম দুম করে পিঠে কটা। তারপর চুল টেনে হিঁচড়ে অন্ধের মতো পেটালেন। রাধু মাস্টার একবার শুধু বলেছিলেন, করো কী, করো কী বকুল? টু শব্দ করেনি তাপস। অপরাধ বুঝেছে। উবু হয়ে মায়ের পিটুনিও হজম করেছে। ফুলে ফুলে প্রায় নিঃশব্দেই গুম মেরে থেকে কিছুক্ষণ পরই প্রায় স্বাভাবিক এবং চিৎকার করে দাবি—খেতে দেবে কিনা বলো? নয়তো চলে যাবো বাইরে। গুইরামের দোকানে গিয়ে দশটা কচুরি খেয়ে নেব। বুঝবে তখন।

মা বকুল বুঝেছিলেন। সঙ্গেসঙ্গেই এক বাটি তেলমাখা মুড়ি-চপের বাটিটা দুম করে নামিয়ে রেখে গজগজ করেছিলেন, শব্দুর—শব্দুর পেটে ধরেছিলুম, কোন কুম্ভণে কে জানেরে বাবা। হুঁ, বাপের অতো প্রশ্ন পেলে...

এমন তো কত যে ঘটনা। সে সব মনে নেই। থাকে না-ও। শুধু মা তো নয়, ইস্কুলের এক নম্বর শাস্তি খাওয়া ছেলে তো ছিল এই তাপস নামক দূরস্ত ছাওয়ালটিই—না কি। নিজেই তা অনুভব করতো। নিজের মনেই হাসতো ফিকফিক করে। এ এক মজা যেন!

এই তাপসই কিন্তু সহিতে পারতো না মিথ্যে বলা। বলত না নিজেও। ভুলভাল-অন্যায় কিছু দেখলেই দাঁড়াতো ঘাড় বাঁকিয়ে। প্রতিবাদ করতো তেজি ঘোড়ার মতো। আর তার জন্যও খেসারত দিতে হয়েছিল। তাও কম না।

কিন্তু এমন এক তাপস হঠাৎ-ই পাড়ায় হয়ে উঠেছিল কাছের লোক। ছেলে থেকে বুড়ো যখনই যার দরকার পড়তো একডাকে তাপস হাজির। তাপসকে ছাড়া পাড়া অচল। পাড়ার দুগ্ধো পুজোয় চাঁদা তুলবে কে?—তাপস তার মাথায়। লবদের পিসে হঠাৎ রেতের বেলায় গঙ্গাপ্রাপ্তি। তো মড়া পোড়াবে কে? গামছা বেঁধে হাজির তাপস—তার দলবল নেই, কোনো ভয় নেই—আমরাই তো আছি। আর কোনো ভাবনা নেই। দায় তার হাতে তুলে দিয়ে নিজেরা শুধু শোকতাপে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

বানের জলে ভেসে যায় দেশ। উদ্ধারে যাবে কে? তাপস তৈরি তার দলবল নিয়ে। এসে আবার ত্রাণ তহবিলে কৌটো নিয়ে পথে কে? তাপস। ছেলেমেয়েদের শীতকালীন স্পোর্টস করাবে কে? তাপস। তাপস ছাড়া নতুনপল্লি অচল। এমনকি ছেলে ভর্তি হতে পারছে না? আরে ধরুন না তাপসকে—ঠিক দেখবেন হয়ে গিয়েছে। তবে কথা একটাই। মিছে বলেটলে হবে না। কম নম্বর থাকলে তাও বলবেন। মানে তাপসের কাছে নিজেকে অসহায় বলে সমর্পণ করে দেবেন—দেখবেন উদ্ধার হয়ে গিয়েছেন। ঐ একটু ইয়ে আর কি,—মানে একটু আধটু তোয়াজ পছন্দ করে। বাবা-বাছা করে বললে একগাল হেসে গলে জল এক্কেবারে।

সেই তাপসকে দাদারা এসে ধরে বসল—এবার তোমাকে আমাদের সঙ্গে থাকতে হবে মিস্টার তাপস রঞ্জন।

তাপস না বোঝার ভান করে জিজ্ঞেস করে—থাকতে হবে, মানে কিসে থাকতে হবে?

চোখ পাকিয়ে ক্লাবের নাডুদা বলে উঠলেন, কেন আমাদের দেখেও বুঝলেন না কিসে থাকতে হবে?

বেশ গম্ভীর ভাবেই মাথা নাড়ে তাপস—না তো, সত্যিই বুঝলাম না। আমি তো আপনাদের ক্লাবের মেম্বর নই।

—নাই বা হলেন মেম্বর। পাড়ায় তো আছেন। পাড়ায় থাকেন।

পেছন থেকে কে একজন গিটিকিরি মারে—থাকতে তো হবে।

কানে যায় তাপসের। সোজা টান হয়ে দাঁড়ায়! চোখ কুঁচকে জিজ্ঞেস করে—থাকতে হবে মানে? আমরা কি নতুন নাকি? বরঞ্চ

আপনারা যারা দলবেঁধে এসেছেন, আপনাদেরই তো অচেনা অচেনা মনে হচ্ছে। কোথায় থাকেন সব? পাড়ায় তো দেখিনি।

দাদাদের পাণ্ডা নাড়ুগোপাল অবশ্য নতুনপল্লিতেই থাকে।
এগিয়ে এসে বলে, আমাদেরও অচেনা মনে হচ্ছে নাকি তাপসবাবু?
—না, না, আপনাকে অবশ্য তা মনে হচ্ছে না। তবে আপনার সঙ্গে ঐ কালো ছাড়া আর কেউ নতুনপল্লির বলে তো মনে হয় না। আর নতুনপল্লির কাউকে আমি চিনব না, কিংবা নতুনপল্লির কেউ আমাকে চিনবে না এমনটা বোধ হয় ঠিক না।

নাড়ুগোপাল বুঝে ফেলে বেশি রবাবি দেখিয়ে এক্ষুণি এক্ষুণি কিছু করা যাবে না। বুদ্ধি করে কিছুটা নরম হয়েই বলে, অ্যাই তোরা কেউ কথা বলবি না। একদম চুপ। তাপসবাবুর সঙ্গে নামুন। আপনি নামলে আমাদের কাজটা অনেক সুবিধের হয়।

তাপস নাড়ুগোপালের কণ্ঠস্বরে কিছুটা হলেও ভিজে যায়, জিজ্ঞেস করে—আপনারা কোন কাজের কথা বলছেন? কোন কাজে আমি নেই, থাকি না, বলতে পারেন?

—না, তা নয়। মানে, এবার আসলে আমরা ঠিক করেছি ভোটের পরেশদার হয়ে খাটব। পরেশদাকে চেনেন তো?

—পরেশদা মানে পরেশ পোদ্দার তো?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। ঠিক ধরছেন।

—তো পরেশ পোদ্দারকে কে চেনে না। আমিও চিনি। পাড়ার কোনো কাজে তিনি থাকেন? সামান্য কিছু চাঁদা চাইতে গেলে তো দরজা বন্ধ করে দেন। নাকের ওপর। নিজে তো দেখাই করেন না। একটু টানাটুনির অভ্যাসও আছে। সন্ধের পর নাকি বেরুতেই

পারেন না। সে ঠিক আছে, ওনার দুনিয়া নিয়ে উনি থাকেন। থাকুন। —বলেই নিশ্বাস টানে তাপস। একটু থেমে বলে—আমি ভোট টোটে নেই। আমার দুনিয়া আলাদা। আমি টুকটাক যা করি নিজের বিচার-বিবেচনাতে করি। আঙুল তুলে কিসসু হবে না।

—কিস্তি?

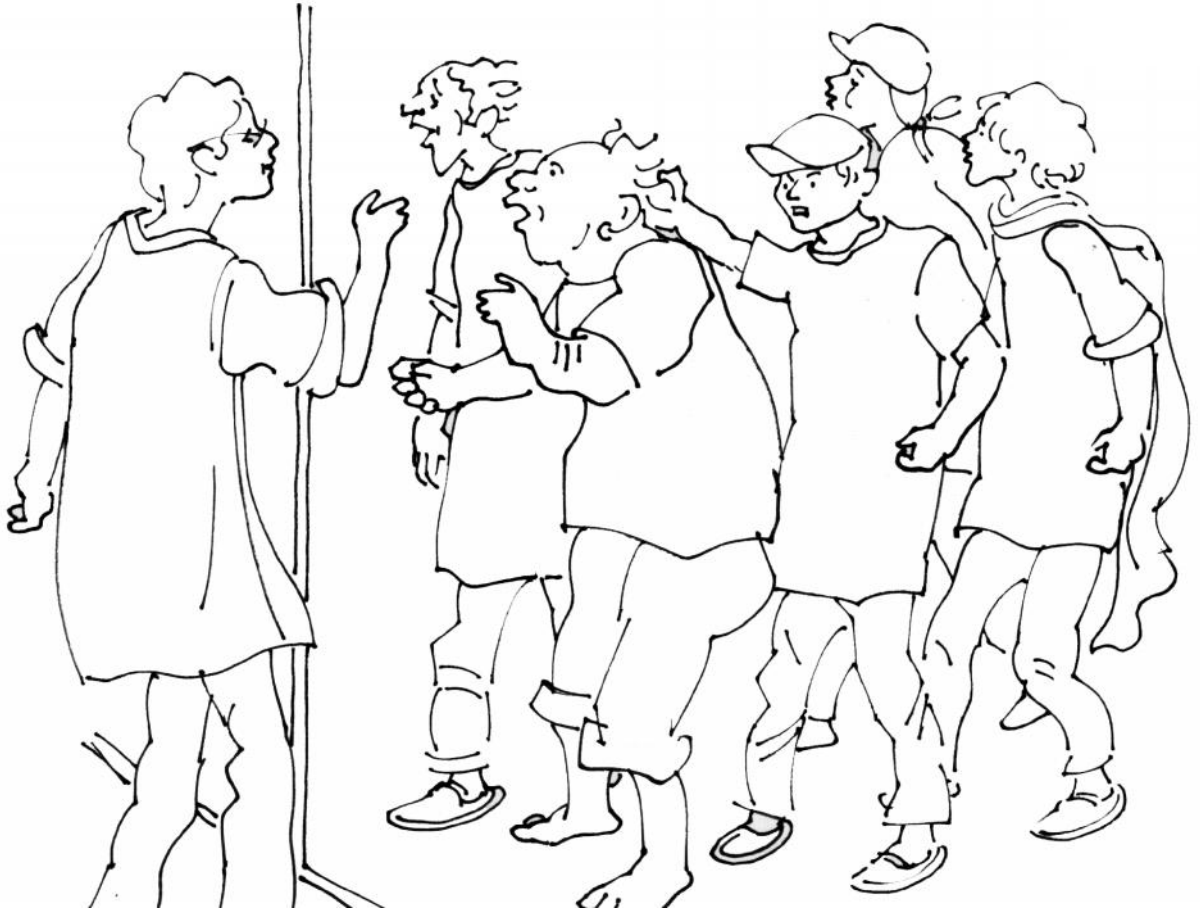
—কিসের কিস্তি?

—আমরা ক্লাবের মেম্বাররা একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি—কারণ পরিস্কার। পরেশবাবু এবার কথা দিয়েছেন—ভোটের আগে ক্লাবকে দু'লাখ এবং জিতে গেলে আরও তিনলাখ, মোট পাঁচলাখ টাকা দেবেন। আমরা ক্লাবটাকে নতুন করে পাকা করে ফেলতে পারব। আমরা চাই আপনিও আসুন আমাদের সঙ্গে।

—ও! এতক্ষণে কিছুটা বুঝলুম। আসলে পরেশ পোদ্দার প্রথমে আপনাদের দিচ্ছে ঘুষ। ঘুষ দিয়ে দলে টানলেন। আর পরেরটা হলো গিয়ে টোপ—তাই তো? শুনুন—বলেই বলতে যাচ্ছিল, আমি এসে একদম নেই মশাইরা।

কিস্তি বলতে পারল না। নাড়ুগোপাল বলতেই দিল না। আধপথে থামিয়ে বলে ওঠে, সে আপনি যা ভাবুন—আমরা ক্লাবের স্বার্থে এই সুযোগ ছাড়তে পারবো না। আমরা চাই আপনিও থাকুন। সোজা কথা বলে গেলুম। বাকিটা আপনার ওপর!

তাপস এরপরও কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিস্তি বলল না। আসলে ততক্ষণে পেছন থেকে হেঁড়ে গলায় কে একজন আঁচড়ে দিল, দাদা বড় বেশি কপচাচ্ছে মনে হচ্ছে? জিজ্ঞেস কর বটলয়ায় বই-এর



গুমটিটা চালাতে হবে কিনা? একটা দেশলাই-এর তো কাজ রে বাপু। অত জেল্লা না মেরে নাড়ুদা যা বলছে নেমে পড় হে বুদ্ধটাদ। এরপরেই হঠাৎ-ই প্রায় শাস্ত তাপসের মাথা গরম হয়ে গেল। কোনো কথা না বলে দুম করে দরজা দিল বন্ধ করে।

অবশ্য স্পষ্ট শুনতে পেল কেউ একজন দরজায় লাথি মেরে আবোল তাবোল কিছু বলে চেষ্টা চলেছে। শুধু তাই নয়। শুনতে পেল নাড়ুগোপালের চাপা গলা, এই হোড়, চুপ করবি তুই? চল এখন, আবার একবার আসব। দেখবো যদি মানে তো ভালো, আর যদি বিট্রে ফিট্রে করে তো... ঠিক আছে, তার আগে ওর বুড়ো বাপটাকে ধরে একটু থোতনা নেড়ে দোব। দেখবি তাতেই সব হয়ে যাচ্ছে। চ, চ এখন। আরও কিছু কাজটাজ আছে। চল জলদি সব।

তাপস বুঝল ব্যাপারটায় জট পাকাবে। তা, পাকাক। কিন্তু কেউ এসে রবাবি দেখিয়ে হুকুম করবে আর তাপসচন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে ভেজা বেড়ালের মতো ন্যাজ নাড়বে তাই হয়? ওরা দেখাতে পারলে—সেও দেখতে পারে। পাড়ায় ওদের যদি ক্লাব থাকে তো, পাড়ায় মানুষজনও আছে। ওর কিশোর বাহিনী আছে। দিদি-বৌদিরা আছে, যারা তাপস বলতে অভ্যস্ত। অস্ত্রত ডাক দিলে রুখে দাঁড়াবে। আরও এমনি কিছু ভবিষ্যৎ ভাবনার পাথনায় ভর করে নিজেকে সামলে নেয়। তবে ঐ একটা কথায় কিছুটা ধন্দেও পড়ে। নিজের কিছুকিছু আয়ের উৎস তো বটতলার তার ছোটো বই-এর গুমটিটাই। সকাল বিকাল দু-বেলা বসে সেখানেই। ভালোবাসে তাকে যাঁরা সবাই আসেন, পছন্দের বই, খাতা, পত্র-পত্রিকা নেন। কিছু স্থায়ী গ্রাহক খন্দেরও আছে। চলে যায় কোনো রকম। অস্ত্রত নিজেরটা চলিয়ে নেয়। বাড়িতেও কেউ তাকে বোঝা মনে করে না। কারণটা অবশ্য তার, তা তারা বলতে পারবে না। বলেও না। ভালো ছাত্র তো কখনই ছিল না। তবে টুকেও পাশ করা নয়। সরকারি, বেসরকারি আপিস-টাপিসে দরখাস্ত করার মতো নম্বরটা তার আছে। দুম-দাম খালি ঘোষণা দেখলেই দরখাস্তও করে ফেলে চট করে। ওটা শিক্ষক বাপ রাধু দত্তের পরামর্শ—চেষ্টা ছাড়বি না, লাগলে লেগেও যেতে পারে। তেমন গোটা তিনেক লেগেও ছিল। কিন্তু তার হয়নি। দু জায়গায় সিলেক্ট হবার পরও ঘৃণা না দিতে পারার জন্য জয়েন করা আর হয়নি। শেষমেশ দূর-ছাই বলে চাকরির কপালে লাথ মেরে বটতলার এই বই গুমটি।

পরামর্শ দিয়েছিলেন সুখেন স্যার। শুধু পরামর্শ নয়, রীতিমত উৎসাহ যুগিয়ে গিয়েছেন এবং শেষ পর্যন্ত লেগেই গিয়েছিল তাপস এই শুভকাজে।

পুরো সফল বলতে পারবে না—তবে নিরাশ হওয়ার মতো নয়। যা হচ্ছে তাতে তাপস খুশি। কারণ—এটা যেমন কিছু আয়ের কারণ, তার সঙ্গে ইচ্ছেমতো কারো না কারো জন্য কিছু করতে পারার ভালোবাসাটা তো তার পূরণ হচ্ছে। এটা তার অন্য কারণ। বাড়িও মেনে নিয়েছে। রাধু দত্তও খুশি।

উটকো ঝামেলা বাঁধিয়ে গেল—ঐ নাড়ুগোপাল কোম্পানি। ভেতরে ভেতরে কিছুটা হলেও তাপ-উত্তাপ বাড়িয়ে দিয়েই গেল। আবার ভাবল, কী আর করবে? বড়জোর আরও দু একবার আসবে, যাবে। গালাগাল করবে। এই পর্যন্তই।

কিন্তু ধারণায় যেটা ছিল না—প্রথম হ্যাঁচকা টানটা এসে পড়ল তার নিরীহ বাপটার উপরই।

দিন ক' বাদ বাপ তার বাজার করে ফিরছিল সকাল সকাল। বাজারটা রাধু দত্তের। রোজ না হলেও একদিন বাদ একদিন থলে হাতে পছন্দ মতো বাজারটি করে নিয়ে আসেন। খুশি হন। খুশি থাকেন তাতেই। পছন্দমতো হিঞ্জে শাক, কলমি, দু'এক শো

কাজলি মাছ, ব্যাস। পেলে একটু সাচি কুমড়ো, তাজা ঝিঙে।

ঝিঙে-পোস্তটা আসলে তাপসের খুব পছন্দ। তাই আর কি।

তেমন ফিরতি বাজারেই গুইরামের চায়ের দোকানের বাঁকেই হাঁক শুনে ফিরে দাঁড়ালেন। পাঁচ ছ-টা অচেনা ছোড়া, হাঁকছে পেছন থেকে—অ্যাঁই বুড়ো, বাজার হলো? কী লিলে দেখি? বলেই একজন তার হাত থেকে থলেটা টেনে নিয়ে উপুড় করে ঢেলে দিল পথের উপরই।

ভ্যাকাচেকা খেয়ে গেলেন রাধু দত্ত, এ—এ তোমরা কী করলে? আমার বাজারটা... বলা শেষও করেন নি, ঢ্যাঙা মতো ছেলে একটা হেঁচকি দিয়ে ওঠে, এ আর কী হলো? আরও হবে। বাজারটা ঢেলে দেখলাম—কী খাও তোমরা। ছেলের অত তেজ হয় কিসে!

রাধু দত্ত কোনো কথা না বলে উবু হয়ে কুড়াতে যান বাজারটা। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা ছেলে এসে এক লাথ মেরে সব বাজারটাই ছিটকে দেয়—আর বাজার কুড়াতে হবে না বুড়ো। যাও বেটাকে গিয়ে পাঠিয়ে দাও। বল গা, কেলাবের সঙ্গে যেন গদারি না করে। করলে অমনই হবে। কারো খ্যামতা নেই রোখে, বুঝলে?

রাধু মাস্টার কী বুঝলেন কে জানে, তবে এটুকু বুঝলেন, ব্যাপারটা অনিচ্ছাকৃত কোনো ব্যাপার নয়। ইচ্ছে করেই সবক শেখানো হচ্ছে। তাপসের ব্যাপারটা তো সেদিন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেই ছিলেন। এটা যে তারই বঁকলম চাপ—এটা স্পষ্ট হয়ে যায় অনেকটাই।

আর কোনো কথা না বলে মাথা নিচু করে ফিরে আসেন নিজের ঘরে। ভেতরের অভিমানে তখন চোখে তার টসটস করছে স্ফটিকস্বচ্ছ কয়েক ফোঁটা জল। যে তাপসকে কোনোদিন একটি কথা বলেন নি—সেই তাপসকে সামনে পেয়েই তাঁর স্ফোভ বারে পড়ে।—তুই আর মানুষ হলি না রে ছেলে? জানোয়ারদের সঙ্গে কেউ লাগতে যায়? এই দ্যাখ আমার কী অবস্থা! বাজার টাজার সব তো গেলই। আমাকে শুদ্ধ যা-তা বললে। ছিঃ ছিঃ।

ততক্ষণে বকুল, বড় ছেলে সাধন-বৌমাসহ সবাই জড়ো হয়ে গিয়েছে। বকুল তো তার শাস্ত স্বামীটির অবস্থা দেখে কেঁদেই ফেলেন—এ-মা, এ কী হয়েছে তোমার? কে করেছে এসব? বড় ছেলে সাধন স্ফোভ চেপে দাঁত কিড়মিড় করে। বৌমা মুখে কাপড় দিয়ে ঠোট বাঁকায়—আপনি আর বাজারে যাবেন না বাবা। এই বয়সে কী দরকার? ছেলেরা রয়েছে তাদের হাতে ছেড়ে দিন।

রাধু দত্ত মাথা নিচু করে শুধু শুনে যান সবার কথাবার্তা। এক সময় বিড়বিড় করে বলতে থাকেন, আমি জানতুম গো এমনটা হতেই পারে। ঐ গোঁয়ার ছেলে যখন পরেশ পোদ্দারের ছেলের দটিছিল, তখনই বুঝেছিলুম ওরা ছেড়ে দেবেনা আমাদেরকে। পেছনে লাগবেই। এইতো সবে শুরু। দ্যাখো আরও কত পোয়াতে হয়!—বলেই কাপড়ের খুঁট খুলে চোখ মোছেন। দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ান।

তখনও তাপস থম মেরে থাকে। ভেতরে ভেতরে যে ফুঁসছে বাইরে থেকে সবাই বুঝতে না পারলেও মা বকুল কিন্তু বুঝে যান। কিছু একটা যে করে বসতে পারে—অনুমান করেই ছেলেকে লক্ষ করে বলেন, এই গোঁয়ার—তুই আবার কিছু করতে যাসনে যেন। তোকে তো বিশ্বাস নেই। তেজ দেখাতে গিয়ে আবার বাড়িঘরই না ভাঙচুর হয়।

দাদা সাধনও মায়ের কথায় সায় দেয়।

কিন্তু রোখা গেল না তাপসকে। কারো কথা তার কানে গিয়েছে মনেই হলো না। আরও কিছুক্ষণ বাইরের ঘরের জানলা

ধরে আকাশ দেখল। অবস্থা কিছুটা শান্ত হতেও দিল। সবাই গুটিয়ে গাটিয়ে ভেতরের দিকে চলে যেতেই প্রায় অনুচ্চস্বরে বললে—দরজাটা বন্ধ করে দিও তো মা। আমি আসছি এখুনি।

আসলে মনে মনে ঠিক করে, এফুনি এফুনি এর একটা ব্যবস্থা করা দরকার। নইলে পাঁঠার দল আরও লাই পেয়ে যাবে। পাঁটা একটা কিছু করতেই হবে। এমন একটা কিছু যাতে টনক নড়ে পরেশ পোদ্দারেরও।

যেমন ভাবনা, তেমনি দ্রুত পথে নামা। প্রথমেই পাড়ার সদাশিববাবুর কাছে গেল। তাঁকে সবটা বলতেই তিনি বলে উঠলেন, বলিস কিরে তাপস? এমন ঘটেছে—চল থানায় আমিও যাব। নিবারণ মন্ডিরকেও ডেকে নিই আর। ও তো ট্যান্সি ইউনিয়নের কর্তব্যক্তি বটে, দেখি কী বলেন। আরও পাড়ার কাউকে কাউকে বলতেই তারাও বললেন, হ্যাঁ চলো, ঝুঁকি কিছুটা নিতে হচ্ছে বটে। নো রিস্ক, নো গেন। এভাবে মাস্তানদের ছেড়ে দিলে কাল যে আমাদের ওপর ঝাঁপাবে না তার ঠিক আছে! দেখতে দেখতে জমায়েতটা ভালোই হয়ে গেল। তাপস দেখল, দু-চারজন ছাড়া বড় একটা কেউ অরাজি হলো না। সবাই যেন কিছুটা হলেও উত্তেজিতও হয়ে উঠল। তাপস রওনা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সবাই তার পিছু ধরলো। পা চালাতে চালাতে বুঝতে পারলো—না, এখনও সবাই সব হারিয়ে ফেলেনি। এখনও বাদ-প্রতিবাদে সঙ্গ দেওয়ার মানুষ আছে। ওদের এভাবে এগুতে দেখে পথে অনেকেই জুটে যেতে থাকে।

দেখতে দেখতে জটলাটা আরও আরও বেড়েই চলে। শেষ পর্যন্ত কেমন যেন মিছিলের আকারই হয়ে যায়। বিনা স্লোগানেই নতুনপল্লির মানুষ নিজেদের আত্মরক্ষার জন্যে আইন শৃঙ্খলা রক্ষার দরজার দিকে এগিয়ে যেতে থাকে।

খবরটা চাপা থাকে না। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে চলে যায় পরেশ পোদ্দারের কানে। নাড়ুর দলবলের কাছে, এমন কি ফাঁড়িতেও।

তাপসের বুকে তখন অসীম সাহস। সে আরও বেশি গতিতে এগিয়ে যেতে থাকে। কুড়ি বাইশ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যায় নতুনপল্লির ফাঁড়ির কাছাকাছি। পৌঁছুতেই চোখে পড়ে ফাঁড়ি আগলে দাঁড়িয়ে সেই নাডুগোপালের দলটা। সঙ্গে ক্লাবের আরও কেউ কেউ।

দেখে থমকে যায় প্রথমে। একটা কিছু ঘটে যেতেও পারে ভেবে নিয়ে নিজেদের মধ্যে কিছুটা পরামর্শ করে নেয় তাপস

সদাশিববাবুরা। ঠিক করে, সবাইকে ফাঁড়িতে যেতে হবে না। তাপস তো যাবেই, সঙ্গে যাবেন সদাশিববাবু। সঙ্গে যোগ দিল কালোবাবু। কারণ কালোবাবুরও একটু রাগ আছে ক্লাবটার ওপর। গত মাসে দোলের সময় এই ক্লাবের ছেলেরাই তাঁর বিধবা বোনটাকে টানা-হেঁচড়া করেছিল। সে রাগ তার ছিলই। কিন্তু প্রতিকার করার সাহস পাননি। এই সুযোগে সে প্রসঙ্গটা তিনি তুলতে চান।

ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে তিনজন কয়েক পা এগিয়েই যান।

পথ রুখে দাঁড়ায় নাডুগোপালরা। এগিয়ে এসে চৌঁচিয়ে ওঠে—কোথায় চললে তোমরা? ফাঁড়িতে আমরা কাউকে যেতে দেবো না।

সদাশিববাবু পুরু চশমা তুলে জিজ্ঞেস করেন, ক্যানো, ক্যানো যেতে দেবে না। তোমরা কারা?

—আমরা য়েই হই—তা তোমাদের জানার কোনো দরকার নেই। আমরা ঢুকতে দেবনা—এটাই ফাইন্যাল। আমাদের বাদ দিয়ে ফাঁড়িও কিছু করতে পারবে না। ক্লাবের উন্নতির জন্য তারাও আমাদের সঙ্গে আছে। আর আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে পাড়ায় কেউ মাথা তুলতে চাইবে তাও আমরা দেবো না। সোজা কথা।

তাপসও ততক্ষণে গলা চড়ায়, আপনারা কি পাড়ার ঠিকা নিয়েছেন? যার ইচ্ছে সে যাবে আপনাদের সঙ্গে। অনিচ্ছুকদের ওপর আপনারা যেমন খুশি ছড়ি ঘোরাবেন?

—হ্যাঁ ঘোরাব। ঘোরাবই না শুধু, যারা আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে তাদের উচিৎ শাস্তিও দেব। পরেশ পোদ্দার ক্লাবের উন্নতির জন্য পয়সা দিচ্ছে। আমরা তার সঙ্গে আছি। আপনারাও আসুন। দেখবেন কোনো কিছু হচ্ছে না, হবে না। আর যারা আমাদের সঙ্গে বিট্রে করবে তাদের এমনটাই হবে। ফাঁড়ি কী করবে? ওরাও আমাদের সঙ্গেই আছে। বিশ্বাসঘাতকদের তারাও প্রশ্রয় দেবে না। বুঝলে? এরপর...?

থমকে যায় তাপস, সদাশিববাবুরা। আর সেইক্ষণে কে একজন তাপসের কানে এসে ফিসফিস করে খবর দেয়, বটতলায় তার বই-এর দোকানে কারা যেন আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। দাউ দাউ করে জ্বলছে তার বই-এর দোকান।

হঠাৎ তাপস মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে। হয়তো এই মুহূর্তে বিশ্বাসঘাতকতার সংজ্ঞাটা সে খুঁজতে থাকে।

With best compliments of

J.K. Ropeways Employees Co-Operative Credit Society Ltd.

Regd. No. 28 of 19-11-82
P.O. Kajoragram, Dist. Burdwan

Sl. No. 98

সে জলকন্যা ছিল না

ঘনশ্যাম চৌধুরী

যখনই কোনো নদীর সামনে দাঁড়াই, কিংবা খরস্রোতা পাহাড়ি
ঝোরা দেখি, তখনই আমার হৈমন্তীর কথা মনে পড়ে। এমনকি
প্রবল ঝড়-বৃষ্টির দুর্যোগের রাতেও হৈমন্তী নামের মেয়েটি আমার
অবচেতন মনের সামনে এসে দাঁড়ায়। হৈমন্তীর সঙ্গে জলস্রোতের
একটা সম্পর্ক আছে। সম্পর্কটা আমাকে জড়িয়ে। সেই कहিনিটা
না বলা পর্যন্ত আমার শান্তি নেই।

সেদিনটার কথা বলি। সমস্ত কিছু ভেঙে চূরে, কোনো নির্দিষ্ট



পথরেখা না মেনে উথালপাথাল জলস্রোত সেইদিন ছুটে
আসছিলো আমাদের গ্রামের দিকে। চোখের সামনে বারবার ভেসে
ওঠে সেদিনকার সেই ছবি। সেই জলময় ছবি ভুলতে পারি না,
কারণ তার সঙ্গে আমার স্মৃতিতে টাটকা জেগে আছে হৈমন্তী।

সেদিন ছিল আষাঢ়ের প্রথম দিককার আসন্ন এক সন্ধে। খুব
সকালে কিছুক্ষণের জন্য একবার প্রগাঢ় মেঘের বেড়াজালের মধ্যে
সূর্যকে দেখেছিলাম কয়েক মিনিট। তারপর সারাদিন মেঘভারে

ভরে ছিলো চরাচর। আমাদের গাছগাছালি সমন্বিত গ্রাম, খেলার
মাঠ, অদূরে সবুজ ফসলের খেত, রেল স্টেশন, সকালের হাট,
সন্দের বাজার—সব কিছুতেই ভারি বর্ষার স্নাতস্নেতে স্পর্শ ছিল।
কেননা, টানা বৃষ্টি চলছিলই। তিন দিনের টানা বর্ষাতে কাজের ছন্দ
থেকে গিয়েছিল। মনের মধ্যে চেপে বসেছিল একরাশ অবসাদ
আর ডিলেমি।

আমি তখন উচ্চমাধ্যমিকের ছাত্র। বয়ঃসন্ধির তেমন সময়ে
এমনিতেই অকারণ উচ্ছ্বাস, আবেগের ছড়োছড়ি থাকে। আবার
কখন যে অযথা ছড়মুড়িয়ে মন খারাপ করা মুড এসে যেত, তা
ঠাহর করতে পারতাম না। ভারাক্রান্ত মনে বুক ঠেলে কেন কান্না
আসত তাও বোঝা যেত না। তবে ব্যাপারগুলো হতো। আর ওই
তিনদিনের কখনো মুষলধারে, কখনো টুপটাপ, কখনো বিরবিরে
এই বৃষ্টিজল আমার মন খারাপ করা মনকে আরো বিষণ্ণ আরো
বিমর্ষ করে দিয়েছিল। জানালা দিয়ে বাইরে তাকালে মনে হচ্ছিল,
প্রকৃতির তাবৎ সবকিছু বোধহয় যেকোনো মুহূর্তেই কান্নায় ভেঙে
পড়বে।

কান্না না এলেও জলস্রোত এসেছিল শেষপর্যন্ত নদী উপচে মাঠ-ঘাট ডুবিয়ে দিয়ে। ফসলি মাঠের মাঝ বরাবর গেছে হাইওয়ে। সেদিককার বাড়িগুলো থেকে অনেক মানুষের চিৎকার ভেসে এলো হঠাৎই।—বান! বান আসছে রে—এ-এ-এ-এ-এ! বেহুলার বাঁধ ভেঙে জল আসছে রে, জল আসছে—এ-এ-এ।

আমি আমার পড়ার ঘরে বসে বইপত্র ওল্টাচ্ছিলাম। বিষণ্ণতায়, জলজ প্রকৃতির গতিহীন উপস্থিতিতে মন অবশ হয়েই ছিল। না ভালোলাগা তো ছিলই। সেই শোরগোল আমাকে বটকা দিয়ে বেশ নাড়িয়ে দিল নিমেষেই। মানুষের শোরগোলের পাশাপাশি সব কিছু ভেঙেচুরে দানবীয় জলস্রোতের আগুয়ান শব্দও শুনতে পাচ্ছি তখন। এমন শব্দ কোনোদিন শুনিনি—গুর-গুর-গুর-গুর-গুর-গুর লাগামহীন আতঙ্কের আবাহন।

গ্রামে বাড়িতে বাড়িতে ছোট্টাছুটি শুরু হয়ে গিয়েছিল। ঘরের মেঝেতে, বারান্দায় পড়ে থাকা জিনিসপত্র সব তাড়াতাড়ি মাচায় কিংবা ঘরের উঁচু জায়গায় রাখতে ব্যস্ত সবাই। কেন না বন্যার জল সব নষ্ট করে দেবে, ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।

পাশের বাড়ির হালদার জেঠার চিৎকার শুনতে পাচ্ছিলাম—ওরে, চৌকিটা উঠোন থেকে বারান্দায় তোল! কাপড়চোপড় সব বাঁশের আড়ায় বেঁধে রাখ! গ্রামে প্রত্যেক বাড়ির ব্যস্ততা, চিৎকার-চৈচামেচি, ছড়োছড়ি সব মিলে তখন প্রবল হট্টগোল। শুনতে পাচ্ছিলাম শিশুদের কান্না।

আকাশে সূর্য না থাকলেও এখনো অপরাহ্ন। সন্ধ্যা নামতে দেরি নেই। মেঘাচ্ছন্ন আকাশ হঠাৎই কিছুক্ষণের জন্য উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আমি পড়ার টেবিল থেকে উঠে পড়েছি। বাইরে বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। হঠাৎই চারপাশ আলোকিত হয়ে উঠেছে। এরকম অদ্ভুত আলো এর আগে কোনোদিন আমি দেখিনি। সেই আলোয় আমাদের গ্রামকে অপরূপ লাগছিল। গ্রাম জুড়ে চিৎকার- চৈচামেচি বাড়ছে তখন।

আমাদের বাড়িটা ছিল কাঠের কাঠামোর ওপর টিন দিয়ে তৈরি। ছাউনি ছিল ডেউ খেলানো টিনের। বাড়িতে থাকি আমি আর আমার মা। বাবা থাকেন কলকাতায়। আমাদের বাড়ির ডানদিকে চারটে বাড়ির পরেই হৈমন্তীদের বাড়ি। ওর বাবা-মা ছাড়াও ছিল ছোটো ভাই। বারান্দায় দাঁড়িয়েই দেখলাম হৈমন্তীর বাবা প্রশান্ত রায় একটা লোহার ট্রাক কাঁধে চাপিয়ে ছুটছেন রাস্তা ধরে। আমি চৌকি নিয়ে জিঞ্জের করলাম, কোথায় যাচ্ছেন মেসোমশাই?

স্টেশন প্ল্যাটফর্মে যাচ্ছি। দরকারি জিনিসগুলো প্ল্যাটফর্মে রেখে আসি।

দেখা গেল প্রশান্তবাবুর পিছু পিছু তাঁর স্ত্রী, মেয়ে হৈমন্তী আর ছোটো ছেলোটো দরকারি জিনিসপত্র নিয়ে স্টেশনের দিকে ছুটছে। হৈমন্তী আমাকে দাওয়ায় দেখে বলল, অমিতদা! এখনো দাঁড়িয়ে আছ? মাসিমাকে প্ল্যাটফর্মে রেখে এসো! অন্ধকার নামছে।

জলস্রোতের শব্দ বাড়ছে। হট্টগোল বাড়ছে গ্রামের মানুষের। এবার আর একজন দু-জন নয়, দলে দলে মানুষ স্টেশনের দিকে ছুটছে। শব্দ বাড়ছে মাঠঘাট ভেঙে জল গড়ানোর।

আমি কী করব? মা এরই মধ্যে দরকারি জিনিসপত্র মাচায় তুলে রাখা শুরু করেছে। বিছানা-বালিশ, মশারি যতটা উঠুতে রাখা যায়, তার ব্যবস্থা চলেছে। আমিও তাতে হাত লাগলাম।

সন্ধ্যা নামল। সমস্ত আলো চলে যাচ্ছিল। এই গ্রামে তখনো বিদ্যুৎ আসেনি। মা হারিকেন জ্বালালেন। গ্রামের বেশিভাগ মানুষ রাস্তায়। কারোর হাতে টর্চ, কারোর হাতে হারিকেন।

বাচ্চা-বউ-ছেলে-মেয়ে সবাই স্টেশনে চলেছে। বাঁধ ভেঙে নামছে বন্যার জল। শব্দ একটানা এখন আরো কাছে।

গুর-গুর-গুর-গুর-গুর-গুর-গুর-গুর!

আমি কোনোদিন বন্যা দেখিনি। বন্যার মুখোমুখি হইনি। বন্যা ঠিক কেমন হতে পারে এখনো পর্যন্ত জানি না। মাঠঘাট ভেঙেচুরে জল আসছে। শব্দের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে আতঙ্ক। অন্ধকার গাঢ় হচ্ছে। বন্যার সঙ্গে মায়ের পরিচয় আছে। এই সময়ে কী কী জিনিস সঙ্গে নিয়ে নিরাপদ জায়গায় যেতে হয়, মা জানেন। এও জানেন, বন্যার সময় টাকা-পয়সা, সোনাদানা হাতছাড়া করতে নেই।

তখনই ফের হৈমন্তীর ডাক শুনতে পেলাম।—অমিতদা! মাসিমা কোথায়? আর দেরি কোরো না। মাসিমাকে প্ল্যাটফর্মে পাঠাও তাড়াতাড়ি। শুনছি, কৃষ্ণবাটিতে জল ঢুকে পড়েছে। কৃষ্ণবাটির সব লোক হাইওয়ের ওপরে। হাইওয়ের কালভার্ট দিয়ে জল নাকি আমাদের গ্রামের দিকে আসছে!

মা ততক্ষণে দুটো পুঁটুলি বগলদাবা করে ঘর থেকে বেরিয়ে উঠোনে নেমে পড়েছে। আমি বললাম, মা যাচ্ছে তোর সঙ্গে। আমি আর আর কিছু জিনিস নিয়ে এক্ষুণি যাচ্ছি।

দেখলাম, ওদের গাইগোরুর দড়িটা বাঁ হাতে শক্ত করে ধরে ডান হাতে টর্চ নিয়ে সাবলীল হেঁটে চলল হৈমন্তী। মাকে বলল, চলুন মাসিমা।

এই রকম এক অস্বাভাবিক সন্ধ্যা বাড়ি থেকে অন্য কোথাও যেতে হচ্ছে! হৈমন্তীদের গোরুটাও হতচকিত। কিন্তু অবলা এই জীবটি আসন্ন বিপদ বুঝেছে বোধ হয়। তাই নির্বিবাদে হৈমন্তীর সঙ্গে সঙ্গে হাঁটছে। সামান্য হাস্য রবে তার অস্বস্তির কথা জানাতেও ভুলছে না সে।

খানিক পরেই আমি প্রতিদিনকার প্রয়োজনের কিছু জিনিস নিয়ে স্টেশন প্ল্যাটফর্মের প্রতীক্ষালয়ে রেখে এলাম মায়ের কাছে। প্ল্যাটফর্ম তখন বাচ্চা-বুড়ো-মহিলা-বৃদ্ধ-বৃদ্ধায় গিজগিজ করছিল।

দ্বিতীয়বারের জন্য যখন ফের বাড়িতে এলাম, তখন আমাদের উঠোনে বানের জল পায়ের পাতা ডুবিয়ে দিচ্ছে। তখনও দেখলাম হৈমন্তী আর একবার স্টেশন থেকে বাড়ির দিকে যাচ্ছে। আমাদের মতো ছোটো সংসার নয় ওদের। অনেক জিনিস নিয়ে যেতে হচ্ছে প্ল্যাটফর্মে। ও আসছে যাচ্ছে বারবার। ভয়ডর নেই ওর।

হৈমন্তী আমারই বয়সি। স্বভাবে আমার উল্টো। আমি ঘরকুনো, অস্তমুখী, পড়াশুনো নিয়ে থাকি। হৈমন্তী ছটফটে, যেন উড়ছে। পাঁচপট কথা বলে। চটপট কাজ করে। রান্নাবান্না, উঠোন বাঁট, গোরু-বাছুরের দেখভাল করে দিবি। এমনকি ওদের চাষের কাজেও হাত লাগায়। আমাদের চাষের জমি নেই। আমি সাঁতার টাঁতার জানি না। হৈমন্তী কোনো দুপুর গ্রামের পুকুর তোলপাড় করে ফেলে সাঁতারে। হৈমন্তীর পড়াশোনায় মোটেই মন নেই।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নিকষ হচ্ছিল অন্ধকার। খুব তাড়াতাড়ি বাড়ছে বন্যার জল। বাড়ির উঠোন ছেড়ে জল এখন দাওয়ায়। আমি ভয় পাচ্ছিলাম। জল যেভাবে বাড়ছে, দেখতে দেখতে কোমর ছাড়িয়ে যাবে। কয়েকটা পড়ার বই একটা ব্যাগে নিয়ে ঘরের দরজায় তালা মেরে নামলাম উঠোনে। বইয়ের ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে ডান হাতে টর্চ ধরে বাড়ির উঠোন ছেড়ে জল কাটিয়ে রাস্তায় নামলাম। কিন্তু এখন আর পরিস্থিতি স্বাভাবিক নেই। সেই পরিচিত রোজকার রাস্তায় এখন জলস্রোত। প্রত্যেক সেকেণ্ডে জল বাড়ছে। সারা গ্রাম নিস্তব্ধ। দু-একজন এখনো কিছু জিনিসপত্র কাঁধে নিয়ে চলেছে স্টেশনের দিকে।

জল ঠেলে ঠেলে রাস্তা বরাবর সামনে এগোচ্ছি। তাড়াতাড়ি এগোবার উপায় নেই। শ্রোতের ধাক্কা বাড়ছে। শরীরকে সোজা রেখে হাঁটা এখন আর সহজে হচ্ছে না। মাঝে মাঝে জলের তোড় বটকা মারছে। সেই তোড়ে আমি টাল খেয়ে যাচ্ছিলাম।

একটু দাঁড়ালাম। বুক টিপটিপ করছে। হ্যাঁ, জল বাড়ছে। অন্ধকার আরো গাঢ় হয়েছে। হঠাৎ পেছন থেকে টর্চের আলো পড়ল। আমার পেছনে কেউ আসছে। আমি দাঁড়িয়ে আছি। শেষপর্যন্ত স্টেশনে পৌঁছতে পারব তো! জলশ্রোতের সঙ্গে ওটা কী? আমি চমকালাম। একটা সাপ! রীতিমতো বড়সড়। আমার টর্চের আলো পড়েছে তার শরীরে। বিরাট শরীর নিয়ে জলশ্রোতের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সেও সামনে এগোচ্ছে। বীভৎস শরীর। দেখে আমি কঁপে উঠছিলাম বারবারে। আমি পাথর। সামনে জল। পেছনে জল। চতুর্দিকে জল। সাপেরা ওদের ডেরা থেকে বেরিয়ে পড়েছে। ওদের থাকার জায়গায় জল ঢুকছে। বন্যায় বহু মানুষকে সাপে কাটে, আমি শুনেছি। কয়েক মিনিটের মধ্যেই পরিস্থিতি বদলে গেল। এখন কোনো কিছুই সহজ নেই। ইচ্ছে মতো হাঁটতে চাইলেই হাঁটা যাবে না। যেখানে খুশি যাবার উপায় নেই। লক্ষ্য একটাই—কোনো রকমে স্টেশন প্ল্যাটফর্মে পৌঁছনো।

সাপের ভয়ে মাথার ঠিক ছিল না। আমার পেছনের টর্চের আলোটা এগিয়ে এসেছে। আমি পেছনে ফিরলাম। আমার টর্চের আলোয় ওকে দেখলাম।

—হৈমন্তী!

—অমিতদা!

—হ্যাঁ।

—দাঁড়িয়ে আছো কেন? চলো তাড়াতাড়ি! জল হু-হু করে বাড়ছে!

আমি পাথর হয়ে গিয়েছিলাম, হৈমন্তীকে বলি কী করে? ওর তাড়া খেয়ে জল ঠেলে চলতে শুরু করলাম। ও ততক্ষণে আমার পাশে চলে এসেছে। ও যত সহজে জল ঠেলে চলছিল, আমি সে-রকম পারছিলাম না। জলে অথবা ডাঙায় সর্বত্রই হৈমন্তী সড়গড়, স্বাভাবিক। আমি কোনোটাতেই নই। এই সত্যিটা স্বীকার না করে উপায় নেই। আমার সর্বত্রই সংকোচ, জড়তা।

—তুমি ওরকম দাঁড়িয়েছিলে কেন অমিতদা?

—একটা বিশাল সাপ পাশ দিয়ে চলে গেল।

—ও, তাই বলো! এখন ওদের ভয় পাবার কিছু নেই।

সাপেরাও এখন নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে ব্যস্ত।—হৈমন্তী কোনো কিছুতেই আশ্চর্য হয় না, ভয় পায় না। সবচেয়েই সাবলীল, স্বাভাবিক। সত্যি কথা বলতে কি, আমি একটু আগেও যেভাবে ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম, হৈমন্তীকে পাশে পেয়ে মনে হচ্ছে আমি যেন বাঁচলাম।

জল ঠেলে কসরত করে যেতে যেতে আমি বারবারে পিছিয়ে পড়ছিলাম। হৈমন্তী এগিয়ে গিয়ে ফের দাঁড়িয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। আমরা জলের মধ্যে হাঁটলেও ইট বিছানো রাস্তার স্পর্শটুকু পাচ্ছিলাম। দিক ভুল হচ্ছিল না। আর একটু এগোলেই গ্রামের প্রান্ত। বাদবাকি রাস্তাটুকু রেলের। তবে সামান্য নিচু। বুঝতে পারছিলাম প্রতি মুহূর্তে জল বাড়ছে। কখন যে জল কোমরের কাছে চলে এসেছে, বুঝিনি।

গ্রামের প্রান্তে চলে এসেছি। দু-জনের টর্চের আলোয় দেখা যাচ্ছিল ঘোলা জলের শ্রোত। তারই সঙ্গে ছুটছে শুকনো ডাল-পাতা, খড়কুটো। সামনেই স্টেশন প্ল্যাটফর্মে সার দিয়ে ইলেকট্রিক লাইট জ্বলছে। সেই আলো আমাকে কিছুটা ভরসা,

আর কিছুটা সাহস দিল। কিন্তু রেলের জমিতে বাদবাকি রাস্তাটুকুর ওপর দিয়ে এখন দূরন্ত শ্রোত।

ফের জলের তোড় হঠাৎই বটকা মারল। সাংঘাতিক বটকা! টাল খেলাম দারুণভাবে। কোনো উপায় নেই। দাঁড়াতেই হল। হৈমন্তী কি সুন্দর শরীরটাকে ভাসিয়ে দিয়ে টাল সামলে এগিয়ে যাচ্ছে। আমি পারছি না। হৈমন্তী জোরে চ্যাচাল, আমি তদা! একটুও দাঁড়াবে না!। শ্রোত বাড়ছে। জল বাড়ছে। যা দেখছি, জল মাথা ছাড়িয়ে যাবে। কিন্তু আমি দাঁড়ালাম। আমি সাঁতার জানি না। হৈমন্তীর মতো ভেসে ভেসে এগোনো সে আমি পারব না।

গ্রামের রাস্তা ছেড়ে রেলের রাস্তায় নামতে হবে। সেই রাস্তা সামান্য নিচু। হৈমন্তী সে রাস্তায় নেমেছে। সঙ্গে সঙ্গেই ওর কোমর ছাড়িয়ে পেটের ও ওপরে জল এসে গেল। টর্চ হাতে নিয়ে ওর পক্ষেও এবার সোজা দাঁড়িয়ে থাকা মুশকিল হচ্ছে। তবুও খানিক দাঁড়িয়ে হৈমন্তী বলল, চলে এসো অমিতদা। সাঁতার জানো তো?

—না।

এই কথাতে ওর কপালে একটু ভাঁজ পড়ল বোধ হয়। দাঁতে ঠোট কামড়ে কিছু একটা ভেবে নিল। আমি কখন যে হৈমন্তীর এপর নির্ভর হয়ে পড়েছি, তা নিজেও জানি না। হৈমন্তী এবার কিছুটা নিদেশের মতো করেই বলল, দেরি কোরো না, এগোও অমিতদা!

আর অপেক্ষা নয়। আমি গ্রামের রাস্তা ছেড়ে রেলের রাস্তায় নামলাম। একই সঙ্গে জলশ্রোতের আরো এক ধাক্কা। সেই ধাক্কা বন্যার জলকে আরো বাড়িয়ে দিল। আমি মাটি খুঁজে পাচ্ছি না। টাল খেয়ে পড়ে গেলাম জলে। হাতের টর্চ ছিটকে জলে তলিয়ে গেল। হাবুডুবু খাচ্ছি আমি। ভয়। ডুবে যাবার ভয় চেপে ধরল আমাকে।

কয়েক মুহূর্ত মাত্র। তারপরই আমার মাথার চুল মুঠিতে ধরে সোজা তুলে ধরল সেই মেয়ে। কিন্তু কোথেকে তীব্র শ্রোত আসছে জানি না, সেই বটকায় আমি সোজা দাঁড়াতেই পারছি না। অমানুষিক চিৎকার করে উঠল হৈমন্তী।

—তুমি সোজা দাঁড়াও। এখানে মোটেই ডুব জল নয়। অমিতদা, তুমি ছটফট করে আমাকে ঘাবড়ে দিচ্ছো। দাঁড়াও সোজা।

আমি কোনোক্রমে দাঁড়ালাম। জল আমার বুকের কাছাকাছি। পা মাটিতে থাকতে চাইছে না। জলশ্রোত ঠেলে দিচ্ছে আমাকে। হৈমন্তীর বুক পর্যন্ত জল। বোধ হয় সে শাড়ির আঁচল কোমরে গুঁজে নিয়েছে। প্ল্যাটফর্মের লাইটপোস্টের আলোতে একেবারে অন্ধকার না লাগলেও জলের সাঁতসেঁতে ঠাণ্ডার সঙ্গে আধো-অন্ধকার সব মিলে আমার বুক কাঁপছে। শ্রোতের মধ্যে পড়ে গিয়ে মাথার চুল অবধি ভিজে গেছে আমার। সে বলল, তোমার ডান হাতটা দাও।

জলশ্রোতের ওপরে সে তার বাঁ হাত দিয়ে আমার ডান হাতের কবজি সাঁড়াশির মতো চেপে ধরে এক পা এক পা করে এগোচ্ছে। জল এখন হৈমন্তীর গলার কাছাকাছি। আরো কুড়ি পঁচিশ হাত এগোলে আমরা স্টেশনের উঁচু পাড়ে পৌঁছোতে পারব। অন্ধের মতো আমি হৈমন্তীর হাত ধরে চলেছি।

ভুল বললাম। হৈমন্তীই আমাকে টেনে নিয়ে চলেছে। এগোচ্ছি একটু একটু করে। এরই মধ্যে সে একবার ফিসফিস করে বলল, বটকা এলে আমাকে চেপে ধরতে যোও না। তা হলে দু-জনেই ডুবে মরব। আলগার ওপর হেঁটে এগোও।

হ্যাঁ, আমরা সেভাবেই এগোচ্ছিলাম। আর পাঁচ হাত এগোলেই শুকনো ভাঙা। তারপরই কংক্রিটের প্ল্যাটফর্ম ছাড়া

কোথাও ডাঙা দেখছি না। দূরে জমাট অন্ধকার। আজকে ঘরে ঘরে জ্বালাবে সন্ধ্যাপ্রদীপ? কেই বা জ্বালাবে আলো?

আর তিন চার পা এগোলেই শব্দ ডাঙায় পৌঁছে যাচ্ছি। হৈমন্তী নিশ্চিত হয়ে আমার কবজিতে তার মুঠি আলগা করেছে। হৈমন্তী আমার বাঁ পাশে। আমি জল ঠেলে এক পা করে এগোছি। আর ভয় নেই।

হঠাৎ বিপত্তি! আমি পায়ের নিচে মাটি পাচ্ছি না। কী করে হয়? সামনেই তো ডাঙা! মুহূর্তেই নিজের ভুল বুঝতে পারলাম। এদিক-ওদিক তাকাতে গিয়ে রেলের রাস্তা ছেড়ে আমি ডানদিকে সরে গেছি। হৈমন্তী অবশ্য সোজাই এগোচ্ছে। রাস্তার ডানদিকে ঢাল আছে। সেই ঢালের দিকেই আমি ডান পা ফেলেছি। ভারসাম্য হারিয়ে ফেললাম আমি। হৈমন্তীর হাত থেকে আমার হাত ছুটে গেছে। আমি ডুবে যাচ্ছিলাম। শুধু একবার চিৎকার করে বললাম, হৈমন্তী! আমি ডুবে যাচ্ছি!

আমি শুধু দেখলাম হৈমন্তী ওর হাতের টর্চটা ছুঁড়ে ফেলল রেললাইনের দিকে, ডাঙায়। আমার পুরো শরীর জলের নিচে রাস্তার ডানদিকের ঢালে ঝুঁকে যাচ্ছে। জলে ডুবে যাচ্ছি আমি। আমার শরীরের ওপর আমার কোনো নিয়ন্ত্রণই নেই। একবার ডুবলাম। হাবুডুবু খেয়ে ফের মাথা তুললাম। ফের জলের নিচে চলে গেল আমার পুরো শরীর। আমার পা রেল-রাস্তার ঢালের গড়ানে আরো নিচে নামছে। আরো একবার হাত-পা ছুঁড়ে আমি মাথা তুললাম। হাত ছুঁড়ছিলাম আমি জলের ওপরে। ফের ডুবলাম। তখনই বাঁ হাতে টান লাগল। কেউ আমাকে টানছে। আমি জলের তলায়। নাক-মুখ দিয়ে জল ঢুকছে। মাথা কাজ করছে না। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। মরে যাচ্ছি আমি। হ্যাঁ, আমি জলে ডুবে মরে যাচ্ছি। মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যেতে যেতেই মনে হল, হাত ধরে কেউ আমাকে টানছে। দমবন্ধ হয়ে আসছে আমার। কিছু আঁকড়ে ধরতে চাইছি। কিন্তু ধরবার মতো কিছুই নেই। জলের গভীরেই একটু একটু করে এগোচ্ছি আমি। আমার বুকের ভেতরটা উথালপাথাল করছে। কিন্তু ঠাণ্ডা বরফচাপে আমি ক্রমশ আরো নিচে অতলে নেমে যাচ্ছি। আমার হাত-পা বুঝি ভারি লোহার শেকলে বাঁধা। পেটের মধ্যেও জল পাক দিয়ে উঠতে চাইছে। মরণকে ছুঁয়ে ফেলেছি আমি। হঠাৎ শব্দ কিছুতে আমার পিঠ ঠেকল। বুকের ওপরের বরফচাপ বেশ কম। আমি কি মরে গেছি? তাই বোধ হয় সব হালকা লাগছে। আমি চোখ মেলে চাইতে চেষ্টা করলাম। পারলাম না। চোখের সামনে অন্ধকার? নাকি আলো?—কিছুই বুঝছি না! মরে গেলেই বুঝি এমন হয়!

অনেক দূর থেকে কেউ বোধ হয় আমাকে ডাকল—অমিতদা। অমিতদা। তাকাও, আর ভয় নেই।

কথাগুলো, অস্পষ্টভাবে আমার কানে এলো। কেউ আমাকে ধরে ঝাঁকুনি দিচ্ছে। আমাকে চেপে ধরছে। নরম শরীরের স্পর্শ টের পাচ্ছি। ফের ডাকছে কেউ—অমিতদা, তাকাও! আমরা ডাঙায় চলে এসেছি।

কথাগুলো এখন আরো স্পষ্ট। আমার ঘোর কেটে যাচ্ছিল। ফের আমায় কেউ ঝাঁকুনি দিচ্ছে।—অমিতদা! তাকাও!

নারীকণ্ঠ। হ্যাঁ, এতক্ষণে বুঝলাম। এ তো হৈমন্তীর গলা। আমি চাইবার চেষ্টা করলাম। চোখের সামনে লাল হলুদ রঙের ছটা। আমি কথা বলতে চাই। কিন্তু পারছি না। আমি হাঁসফাঁস করছি। হাড়হিম ঠাণ্ডায় আমার কাঁপুনি হচ্ছে।

নরম শরীরটা আমাকে আঁকড়ে জড়িয়ে ধরেছে। আমি সেই শরীরের ওম পাচ্ছিলাম। এত কষ্টের মধ্যেও কিছুটা স্বস্তি।

আমার কানে মুখ ঠেকিয়ে হৈমন্তী কথা বলল, অমিতদা, তাকাও। উঠে পড়ো। আমরা রেললাইনের পাড়ে উঠে পড়েছি। আর চিন্তা নেই। এবার আমার মাথা সাফ হচ্ছে। ধন্দ কাটছে। স্বাভাবিক হচ্ছি। চোখ মেলতে চাইলাম। তাকাতে পারছি।

তাকালাম। প্রথমে সবই অন্ধকার। ধাতস্থ হয়ে চারদিকে দেখছি। আমি রেললাইনের পাড়ে, ডাঙায় কাত হয়ে পড়ে আমি। হৈমন্তী আমাকে জড়িয়ে ধরে আছে আধশোয়া অবস্থায়। এবার আরো স্পষ্ট সবকিছু দেখতে পাচ্ছি। স্টেশন প্ল্যাটফর্মের ইলেকট্রিক লাইটগুলো নজরে এলো।

বন্যার জলে দু-জনেরই শরীর ভিজে জ্যাবজ্যাব করছে। আমাকে চোখ মেলতে দেখে হৈমন্তী ওর মুখটা আমার মুখের আরো কাছে নিয়ে এলো। বলল, তেমন কিছু হয়নি অমিতদা। তুমি শুধু শুধু ভয় পাচ্ছে।

কনকনে ঠাণ্ডা জলে ডুবে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে তখনও আমি কাঁপছি। সে আমাকে অনেকক্ষণ জড়িয়ে ধরে, চেপে রেখে তার শরীরের ওম দিয়ে আমার কাঁপুনি থামিয়ে দিল। ওর সুডৌল দুটি স্তনের ওপর আমার মুখটা চেপে রাখল অনেকক্ষণ। আমি উষ্ণতা ফিরে পাচ্ছিলাম। গ্রামের ওপর দিয়ে, ফসল ভরা জমির ওপর দিয়ে, মাঠ-ঘাট প্রান্তরের ওপর দিয়ে বয়ে চলা বন্যার জলের এক নাগাড়ে বয়ে চলার শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম আমি।

আমার কাহিনি এই পর্যন্তই। কেননা, হৈমন্তীকে নিয়ে বানিয়ে বানিয়ে চূর্ণ চূর্ণ অক্ষর সাজিয়ে রচণ্ডে গল্প লেখার হিম্মত আমার একেবারেই নেই।

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

স্বস্তিক সিমেণ্ট

বালানপুর, জামুড়িয়া, বর্ধমান

Sl. No. 163

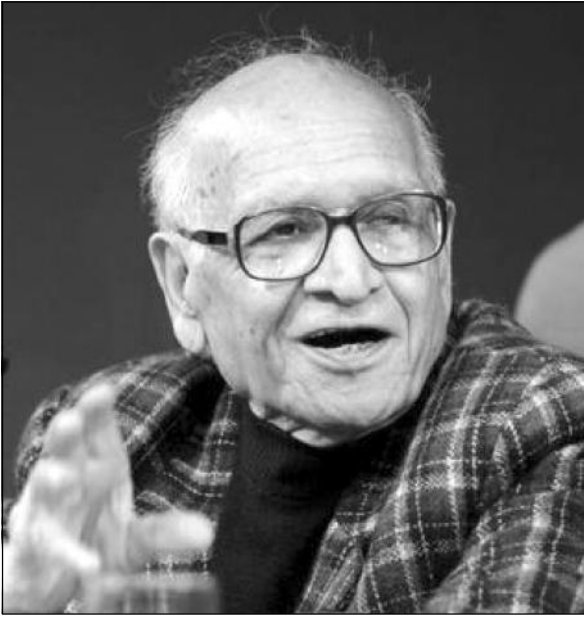
নতুন চিঠি শারদ ২০১৪ ।। ৯৬



৩০ আগস্ট প্রয়াত হয়েছেন প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ বিপান চন্দ্র। ইতিহাসচর্চায় যে বস্তুবাদী ধারাটি ভারতে গড়ে উঠেছে, তিনি ছিলেন তার অগ্রণী গবেষক। আমরা গর্বিত যে ১৯৯৩ সালের ২০ ডিসেম্বর ‘নতুন চিঠি’ ও গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ আয়োজিত একটি আলোচনাসভায় তাঁকে আমরা পেয়েছিলাম। আলোচনার বিষয় ছিল ‘সাম্প্রদায়িকতা’। পরে তিনি ‘নতুন চিঠি’-র জন্য ওই বিষয়েই একটি বিশেষ লেখা পাঠিয়েছিলেন, যেটি প্রকাশিত হয়েছিল ‘নতুন চিঠি’-র ১৯৯৪ সালের শারদ সংখ্যায়। বিষয়টি আজও প্রাসঙ্গিক, এবং বর্তমান সময়ে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। বিপান চন্দ্রের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য হিসেবে লেখাটি পুনর্মুদ্রিত হল।

সাম্প্রদায়িক ভাবাদর্শ

বিপান চন্দ্র



কোনো একটি প্রাথমিক কথা সংক্ষেপে বলে নিয়ে তারপর আমি আমার পূর্ণ বক্তব্যের দিকে যাবো। আমার পূর্ণ বক্তব্যের জন্যই এই প্রাথমিক কথা কটি বলা দরকার।

প্রথমেই আমাদের সংজ্ঞাগুলি স্পষ্ট করে নিই। সাম্প্রদায়িকতা বলতে কী বোঝায়?

সাম্প্রদায়িকতার শুরু এই বিশ্বাস থেকে যে ভারতের জনগণকে তাদের ধর্মীয় সত্তার ভিত্তিতে ধর্মনিরপেক্ষ লক্ষ্যে অর্থাৎ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক লক্ষ্যে গোষ্ঠীবদ্ধ ও সংগঠিত করা সম্ভব। অন্যভাবে বললে, হিন্দু বা মুসলিম বা শিখ বা খ্রিস্টানরা শুধুমাত্র ধর্মের মানদণ্ডেই আলাদা আলাদা সাম্প্রদায় নয়, এক ধর্ম বলে তাদের ধর্মনিরপেক্ষ স্বার্থও এক। এই বিশ্বাস দিয়ে সাম্প্রদায়িকতার শুরু বটে, কিন্তু এই বিশ্বাসই সাম্প্রদায়িকতা নয়। আমি এই কথা বলছি কেননা গান্ধীজি থেকে ই এম এস নাসুদিরিপাদ পর্যন্ত ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তিত্ব, ঐতিহাসিক কারণেই, ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়ের এই নামকরণকেই ব্যবহার করেছেন। সাম্প্রদায়িকতা বলতে ঠিক যা বোঝায় তা দেখা দেয় পরবর্তী পদক্ষেপে। বিভিন্ন ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়ের মানুষ বলে যাদের আমরা দেখি তাদের এই ধর্মীয় অবস্থানের কারণেই বিভিন্ন ধর্মনিরপেক্ষ স্বার্থ থাকতে পারে। যেমন হিন্দু ও মুসলমানদের অনেক নিজস্ব ধর্মনিরপেক্ষ স্বার্থ অর্থাৎ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ আছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ভারতে সাম্প্রদায়িকতার এই রূপটিকেই দেখা গেছে। আমি একে উদারধর্মী সাম্প্রদায়িকতা আখ্যা দিয়েছি। এই উদারধর্মী সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের যুক্তি ছিল, হিন্দু ও মুসলমানদের স্বতন্ত্র ও ভিন্নমুখী ধর্মনিরপেক্ষ স্বার্থ আছে এবং চাপ সৃষ্টি ও আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সেগুলির সমন্বয় ও বিন্যাস করতে হবে। কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও তাঁরা বলতেন যে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে তার চেয়েও বেশি আছে সাধারণ ধর্মনিরপেক্ষ স্বার্থ বা লক্ষ্য, যা তাদের একই জাতির অংশভুক্ত করেছে। এই সমস্ত সাধারণ স্বার্থ সাধনের জন্য এবং

সাধারণ লক্ষ্য অর্জনের জন্য তাদের একতাবদ্ধ হতে হবে—যার মধ্যে মুখ্য হল রাজনৈতিক স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং দারিদ্র্যমোচন। এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে উদারধর্মী সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা একে অপরের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেছেন এবং ঔপনিবেশিক শাসকদের সঙ্গে তাদের দাবি নিয়ে ফয়সালা করার জন্য প্রায়শই জাতীয় কংগ্রেসে মধ্যস্থ হিসেবে চেয়েছেন।

১৯৩৭ সালের পরে যে সাম্প্রদায়িকতা দেখা দিল, আমি তার নাম দিয়েছি উগ্রবাদী বা ফ্যাসিবাদী সাম্প্রদায়িকতা। এই উগ্র সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা বললেন, হিন্দু ও মুসলমানদের স্বার্থ শুধু যে ভিন্নমুখী তা-ই নয়—তারা পরস্পর বৈরিতামূলক এবং সেই কারণে সমন্বয়ের অযোগ্য। ফলে দেখা দিল পারস্পরিক ঘৃণা ও বিচ্ছিন্নতার পর্যায়। জিন্না ও মুসলিম লিগ যুক্তি দিলেন, ভারতে দুটি জাতি বিদ্যমান এবং তাদের একই রাষ্ট্রের মধ্যে সহাবস্থান সম্ভব নয়। অপরপক্ষে ভি ডি সাভারকর, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ ও হিন্দুমহাসভার বক্তব্য হল, ভারত একটিমাত্র জাতি নিয়েই গঠিত এবং সে জাতি হল হিন্দুজাতি—মুসলমানরা এদেশে বিদেশি হিসেবে রয়েছে। প্রথম পক্ষের যুক্তিতে দেশকে আনুষ্ঠানিকভাবে দু-ভাগে ভাগ করতে হয়, আর দ্বিতীয় পক্ষের যুক্তিতে এমন একটি রাষ্ট্র গড়ে তৈরি যেখানে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অধীনস্থ, অনুগত ও দ্বিতীয় শ্রেণির অবস্থান মেনে নিতে হবে।

এবার ধর্মনিরপেক্ষতার সংজ্ঞা দিচ্ছি। প্রথমেই বলে রাখা ভালো, অনেকে ধর্মনিরপেক্ষতার পাশ্চাত্য সংজ্ঞা ও তথাকথিত ভারতীয় সংজ্ঞার মধ্যে একটা মিথ্যা দ্বিবিভাজন করতে চান। বস্তুতপক্ষে, ধর্মনিরপেক্ষতার সংজ্ঞা একটাই, তবে ভারতের সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে তা কতকগুলি সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে।

ধর্মনিরপেক্ষতার মূল অর্থ ধর্ম থেকে রাষ্ট্র ও রাজনীতির, অথবা রাষ্ট্র ও রাজনীতি থেকে ধর্মের স্বতন্ত্রীকরণ। এই হল ধর্মনিরপেক্ষতার সর্বজনীন উপাদান। ধর্মনিরপেক্ষতার তথাকথিত কোনো ভারতীয় সংজ্ঞা যদি একে অস্বীকার করতে চায় তবে তার অর্থ ধর্মনিরপেক্ষতাকেই অস্বীকার করা।

ভারত বহু ধর্মের দেশ। এই বৈচিত্র্য থেকেই ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতার আর-একটি বৈশিষ্ট্য দেখা দিয়েছে। সকল ধর্ম সম্পর্কেই রাষ্ট্রের অবস্থান হবে নিরপেক্ষ। ধার্মিক মানুষরা একেই তাঁদের ভাষায় বলেন : রাষ্ট্র সকল ধর্মকেই সমদৃষ্টিতে দেখবে। আমরা এই বক্তব্যকে মেনে নিতে পারি যদি এই সমদৃষ্টি তাঁদের ক্ষেত্রে প্রসারিত হয়, যাঁরা নাস্তিক কিংবা যাঁরা কোনো ধর্মেই বিশ্বাস করেন না। রাষ্ট্রের এই নিরপেক্ষতার মতবাদই আরই একটি রূপ নেয়, তা হল ধর্ম বা বর্ণের কারণে নাগরিকদের মধ্যে কোনো রকম বৈষম্য করা যাবে না।

কিন্তু ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতার আরও একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। ইউরোপে ধর্ম থেকে রাষ্ট্রকে আলাদা করার সাধারণ উদ্দেশ্য ও শিক্ষা থেকে ধর্মকে দূরে রাখার বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণার উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছে। কিন্তু ভারতে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ছিল মূলত একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র, কেননা এমন একটি সমাজে তারা অনুপ্রবেশ করেছিল যার জনগণ আধিপত্যকারী শাসকশ্রেণির ধর্মকে গ্রহণ করেনি এবং করতে পারেনি। এই রাষ্ট্র কোনো বিশেষ ধর্মের উপর ভিত্তিশীল ছিল না—বিশেষ করে ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের শিক্ষার পর থেকে তো নয়ই। তাছাড়া, ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র রাষ্ট্র-নির্দেশিত শিক্ষার দিকটিকে ধর্ম থেকে মোটামুটি আলাদা করেই রেখেছিল। সুতরাং ইউরোপে যে পদ্ধতিতে এবং যে প্রশ্নগুলিকে কেন্দ্র করে ধর্মনিরপেক্ষতা গড়ে উঠেছিল,

ভারতে সেভাবে গড়ে ওঠেনি। ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতা গড়ে উঠেছিল ঔপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করার মতাদর্শ হিসেবে। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ভারতীয় জনগণের ঐক্য প্রতিষ্ঠাই ছিল ভারতের জাতীয় আন্দোলনের আবশ্যিক কাজ। অপর দিকে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রও গোড়া থেকেই, এবং বিশেষ করে ১৮৫৮ সালের পর থেকে, ভারতীয় জনগণকে বর্ণ, ভাষা, অঞ্চল ও ধর্মসম্প্রদায়ের ভিত্তিতে ভাগ করতে উঠে পড়ে লাগে। বিশেষ করে সাম্প্রদায়িকতাকেই তারা সর্বাধিক মদত দেয় এবং তা ভারতীয় জনগণের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের পক্ষে সবচেয়ে বড় বিপদ হয়ে দেখা দেয়। এই বিভেদকামী রাজনৈতিক শক্তির চ্যালেঞ্জের মোকাবিলার জন্যই ভারতের জাতীয় আন্দোলন উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদ থেকে ধর্মনিরপেক্ষতাকে নীতি হিসেবে গ্রহণ করে ও তার প্রচার শুরু করে। এর ফলে ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতা যে অর্থ পরিগ্রহ করে তার সবচেয়ে বড় কথা হল অ-সাম্প্রদায়িকতা। আজকেও একথা সমানভাবে সত্য।

অনেকে বলেন, ধর্মনিরপেক্ষতার ধর্ম-রাষ্ট্র বিভাজনের সংজ্ঞা গান্ধীজি গ্রহণ করেননি, কেননা তিনি প্রতিনিয়তই কি একথা বলেন নি যে এই দুইয়ের মধ্যে বিভাজন সম্ভব নয়? তাহলে বলতে হয়, গান্ধীজিই ১৯৪২ সালে বলেছিলেন : “ধর্ম একটি ব্যক্তিগত ব্যাপার, রাজনীতিতে তার কোনো স্থান থাকা উচিত নয়।” এর পরে ১৯৪৭ সালেও তিনি বলেছিলেন : “ধর্ম হল প্রত্যেকের নিজস্ব ব্যক্তিগত ব্যাপার। রাজনীতি ও জাতীয় ব্যাপারের সঙ্গে তাকে কখনোই মেশানো যাবে চলবে না।” প্রকৃতপক্ষে এই বৈপরীত্যের সমাধান সহজেই করা যায়। প্রথম ক্ষেত্রে ধর্মকে গান্ধীজি গ্রহণ করেছিলেন তাঁর সনাতন অর্থে—ব্যক্তির জীবনের এক নৈতিক নির্দেশিকা হিসেবে। রাজনীতিকে ধর্মের উপর ভিত্তিশীল হতে হবে—একথা বলতে তিনি বুঝিয়েছিলেন যে রাজনীতির একটা নৈতিক ভিত্তি থাকবে। তাঁর নিজের ক্ষেত্রেও তাঁর গভীর সামাজিক দায়িত্ববোধ এবং কঠোর নৈতিকতাবোধের মূলে ছিল সুগভীর ধর্মবিশ্বাস। পরে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা তাঁদের রাজনীতির স্বার্থেই সংগঠিত ধর্মকে ব্যবহার করছে এবং মানুষের ধর্মানুগত্যের কাছে আবেদন জানাচ্ছে। তখন তিনি ধর্ম ও রাজনীতির মিশ্রণের বিরোধিতায় নামেন। এ ব্যাপারে নিশ্চয়ই কারুর মতভেদ নেই যে রাজনীতিকে নীতিনিষ্ঠ হতে হবে, এবং নীতিবোধ নানা পথে এবং বিভিন্ন উৎস থেকে মানুষের মনে সঞ্চারিত হতে পারে, যার মধ্যে ধর্মীয় পথ এবং ধর্মীয় উৎস অন্যতম। আর যাই হোক একথা তো অস্বীকার করা যাবে না যে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে যতই পার্থক্য থাক না কেন, নৈতিক নির্দেশিকা সব ধর্মেরই প্রায় এক। আমার অন্তত একথা স্বীকার করতে কোনো দ্বিধা নেই, যদিও আমার নিজের কোনো ধর্মবিশ্বাস নেই এবং আমি আমার সামাজিক দায়িত্ববোধ ও নৈতিকবোধ অর্জন করেছি অ-ধর্মীয় যুক্তিবাদী উৎস থেকে।

আমার দেওয়া দুটি সংজ্ঞা থেকে এটা পরিষ্কার, এবং এটা ভালোভাবে বুঝতে হবে যে সাম্প্রদায়িকতা সর্বোপরি একটি ভাবাদর্শ (ideology) এবং কতকটা এই ভাবাদর্শের ভিত্তিতে সংগঠিত রাজনীতি। আমার এই বক্তব্যকে একটি স্পষ্টত প্রতীয়মান ঘটনা সম্পর্কে একটি সরল উক্তি বলে মনে হতে পারে, কিন্তু এর কিছু গভীরতর তাৎপর্য আছে। এখানে স্পষ্ট করে বলে নিতে চাই, ‘আইডিওলজি’ বা ভাবাদর্শকে মার্কস যে অর্থে দেখেছিলেন, আমি ঠিক সে অর্থে ব্যবহার করিনি। ভাবাদর্শ বলতে আমি যা বোঝাতে চাই তা হলো একটি বিশ্বাসতন্ত্র, পরস্পর সম্পর্কিত কতকগুলি

অনুমিতি, যার আলোকে সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রব্যবস্থাকে দেখা হয়। তার থেকেই আসে রাজনৈতিক ও অন্যান্য ফলাফল। এটাও আমাদের বোঝা দরকার যে আমাদের চারপাশে আমরা সম্প্রতি যে লোকায়ত সাম্প্রদায়িক বিশ্বাস ও সাম্প্রদায়িক ভাবাদর্শের উপাদানগুলিকে দেখতে পাই, তা বিগত শতাধিক বৎসরব্যাপী সাম্প্রদায়িক ভাবাদর্শের অস্তিত্ব ও বিস্তারেরই ফলশ্রুতি।

সুতরাং, আমার মতে, সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের মূল লক্ষ্য হল সাম্প্রদায়িক বিশ্বাসতন্ত্র ও চিন্তা-প্রকরণের বিস্তার। সাম্প্রদায়িকতাবাদী ক্রিয়াকলাপের অন্যান্য দিকগুলি গৌণ এবং মূল ভাবাদর্শ থেকেই উদ্ভূত। এ সম্পর্কে পরে আমি আরো বলব। কিন্তু বিশেষ করে এর আরো অর্থ হল, সাম্প্রদায়িকতাবাদের সঙ্গে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে আমরা যেন গুলিয়ে না ফেলি।

এ-বিষয়ে অবশ্য সন্দেহ নেই যে দাঙ্গা সাম্প্রদায়িক মতাদর্শের উগ্র বিস্তার ঘটাবার একটি উপায় হিসেবে কাজ করে এবং সাম্প্রদায়িক ভাবাদর্শ থেকেই আসে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। কিন্তু দুটিকে কখনোই আমরা এক করে দেখবো না—এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সাম্প্রদায়িকতাবাদের মর্মবস্তুও নয়। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা অবশ্যই সাম্প্রদায়িক ভাবাদর্শের বিস্তারের ফল। কিন্তু সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির এটাই মূলধার নয়। সাম্প্রদায়িক ভাবাদর্শ দাঙ্গার রূপ না নিয়েও যুগ যুগ ধরে শুধু টিকে থাকতে পারে তাই নয়—বাড়তে পারে এবং তার কজাকে শক্ত করতে পারে।

উদাহরণস্বরূপ, ভারতে যদিও ১৮৩০ সাল থেকেই ইতিহাস রচনা ও শিক্ষার মাধ্যমেই মুখ্যত সাম্প্রদায়িকতা একটু একটু করে শেখানো হয়ে আসছে, কিন্তু একটি সুসংহত ভাবাদর্শ হিসেবে তার আত্মপ্রকাশ ঘটতে থাকে ১৮৭০ ও ১৮৮০-র দশকে। তথাপি ১৮৩০ সালে পুনা ও কলকাতার মতো কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ক্ষেত্র স্বল্পস্থায়ী কয়েকটি দাঙ্গার ঘটনা ছাড়া, সারা উপমহাদেশের স্তরে দীর্ঘকাল যাবৎ কোনো দাঙ্গার ঘটনা প্রায় ঘটতেই দেখা যায়নি। ব্যাপকভাবে দাঙ্গা শুরু হল ১৯২০-র দশকে—নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে ১৯২২ সালের পর। কিন্তু এটা হলো পূর্ববর্তী চার দশক ধরে সাম্প্রদায়িক ভাবাদর্শের বিস্তারের সুনির্দিষ্ট ফল। একইভাবে ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৫—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন এই সময়েও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রায় ঘটে নি, যদিও ঠিক এই সময়কালেই ভারতে সাম্প্রদায়িকতা অতি দ্রুত বিস্তার লাভ করেছিল।

আমাদের বক্তব্যের সত্যতার আর একটি সুস্পষ্ট উদাহরণ মেলে পাঞ্জাবের রাজনীতিতে। পাঞ্জাবের ব্যাপারে এরকম একটা বিশ্বাস তৈরি হয়েছিল যে ১৯৪৭-এর ভারত বিভাগ সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান করে দিয়েছে, কেননা ১৯৪৭-এর আগে একদিকে ছিল হিন্দু ও শিখ সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা এবং অন্যদিকে ছিল মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা। কাজে কাজেই ধরে নেওয়া হয়েছিল যে ভারতবিভাগের সঙ্গে সঙ্গে এবং পাঞ্জাবের ভারতীয় অংশ থেকে মুসলিমরা প্রায় সবাই চলে যাওয়ার ফলে সাম্প্রদায়িকতাও মিলিয়ে যাবে। কিন্তু কার্যত ১৯৪৭ সালের অব্যবহিত পর থেকেই ভারতীয় পাঞ্জাবে হিন্দু ও শিখ সাম্প্রদায়িকতা অতি দ্রুত বাড়তে থাকে। যাঁরা এই গতি-প্রকৃতিকে বুঝতে পারছিলেন—কমিউনিস্টরাই তাঁদের মধ্যে প্রধান—তাঁরা ১৯৫০-এর দশকে সাম্প্রদায়িকতার বিস্তার সম্পর্কে অনবরত সাবধান করে দিচ্ছিলেন। জওহরলাল নেহরুও এই ঘটনা সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন এবং জনসমক্ষে বা ব্যক্তিগতভাবে এ বিষয়ে বক্তব্য বলেছেন ও লিখেছেন। আমার এখনও মনে আছে, ১৯৭৩-৭৪ সালে পাঞ্জাব ও হরিয়ানার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘুরে ঘুরে পাঞ্জাবে সাম্প্রদায়িকতার ক্রমবর্ধমান বিপদ সম্পর্কে যখন সাবধান করে দিচ্ছিলাম, তখন আমার অনেক সহকর্মী

বন্ধুই বলেছিলেন আমি নাকি শূন্যে তরোয়াল ঘোরাচ্ছি। কিন্তু ১৯৮১ সাল থেকে পাঞ্জাবে যা ঘটে চলেছে তা প্রকৃতপক্ষে ১৯৪৭ সাল থেকে সাম্প্রদায়িক ভাবাদর্শের ক্রমবিস্তারেরই ফল। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং তার পূর্ববর্তী সাম্প্রদায়িক ভাবাদর্শের বিস্তারের মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তার সাম্প্রতিক উদাহরণ মোরাদাবাদ, মীরাট, ব্যাঙ্গালোর, বোম্বে, ভাগলপুর, জয়পুর এবং লক্ষ্ণৌ। এমন অনেক জায়গার উদাহরণও দেওয়া যায় যেখানে এখন পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়নি, কিন্তু যেখানে সাম্প্রদায়িক ভাবাদর্শের নিরন্তর বিস্তার ভবিষ্যৎ দাঙ্গার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে চলেছে।

সাম্প্রদায়িক ভাবাদর্শ ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মধ্যে পার্থক্য করাটা খুবই জরুরি, কেননা দুটির মোকাবিলা করতে হবে দু-ভাবে এবং রাষ্ট্রের সঙ্গে তাদের সম্পর্কও আলাদা রকমের। আমার মতে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মোকাবিলার জন্য প্রয়োজন তাৎক্ষণিক রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক পদক্ষেপ। রাষ্ট্র এককভাবেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে দমন করতে, তার স্থায়িত্ব কমিয়ে আনতে এবং জীবন ও সম্পত্তিহানি নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম। এবং রাষ্ট্রটা যখন যাই হোক ধর্মনিরপেক্ষ, তখন রাষ্ট্রযন্ত্রের মধ্যে সাম্প্রদায়িক লোকজন এবং অন্যান্য সাম্প্রদায়িক উপাদানের অনুপ্রবেশ রোধের ব্যবস্থা নিতেই হবে। মোরাদাবাদ, মীরাট ও ভাগলপুরে পুলিশের যে ভূমিকা ছিল তার পুনরাবৃত্তি যাতে আর না ঘটে তা দেখতে হবে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-পরিস্থিতিতে শান্তিমিছিল ও শান্তিকর্মিটির যথাযোগ্য ভূমিকা আছে। আমি মানি এরকম পরিস্থিতিতে ভাবাদর্শগত সংগ্রামের তেমন মূল্য থাকে না। যখন ঘর পুড়ছে, তখন আগুন লাগার কারণ এবং কী করে আসুন নেভাতে হয় সে সম্পর্কে বক্তৃতা দিলে চলে না—আগুন নেভাবার কাজে নেমে পড়তে হয়।

যাই হোক, সাম্প্রদায়িক ভাবাদর্শের মোকাবিলার জন্য যা প্রয়োজন তা হলো দীর্ঘস্থায়ী রাজনৈতিক ও ভাবাদর্শগত সংগ্রাম। এর কোনো আশু সমাধান নেই।

যখন একটি ভাবাদর্শ—বর্তমান প্রসঙ্গে সাম্প্রদায়িক ভাবাদর্শ—জন্ম নেয় এবং প্রসারলাভ করে এবং দীর্ঘ দিন ধরে প্রভাবিত করতে থাকে, তখন তা নিজস্ব একটা জীবন ও শক্তি অর্জন করে। অনেক সময় তা তার প্রবক্তাদেরও ছাপিয়ে গিয়ে এক স্বতন্ত্র রূপ নেয়। একটি উদাহরণ দিচ্ছি। ১৯৩৭ সালের পরে জিন্না সাম্প্রদায়িকতার এক উগ্র, প্রায়-ফ্যাসিবাদী চেহারা তুলে ধরেন। পাকিস্তান সৃষ্টি করে ১৯৪৭ সালের ১৩ আগস্ট তিনি পাকিস্তান সংবিধান-পরিষদে ঘোষণা করেন যে এখন থেকে পাকিস্তানে ধর্মের ভিত্তিতে আর কোনো বিভেদ বা বৈষম্য করা হবে না। কিন্তু সাম্প্রদায়িক মতাদর্শকে এত সহজে ঝেড়ে ফেলা যায় না। তখন ও এখন—যে-কোনো সময়েই সাম্প্রদায়িকতা হলো সেই ভূত যাকে বোতল থেকে একবার বের করলে আর বোতলের ভিতরে ফেরানো যায় না। এতো আর জিন্নার ইচ্ছার অধীন রইলো না। পাকিস্তানে সাম্প্রদায়িক ভাবাদর্শ তাই চেপে বসে রইলো। একথা মনে হয় সত্য যে সংস্কৃতিবান জিন্না, যাকে সরোজিনী নাইডু ১৯১৮ সালে হিন্দু মুসলিম এক্যের তরুণ রাজদূত হিসেবে অভিহিত করেছিলেন, মনে-প্রাণে কোনো সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ পোষণ করতেন না। কিন্তু একবার যেই তিনি সাম্প্রদায়িক ভাবাদর্শের উগ্র ফ্যাসিবাদী রূপটিকে জাগিয়ে তুললেন, অমনি তিনি তাঁর একনিষ্ঠ অনুগামীদের মতোই সেই ভাবাদর্শের ফাঁদে বন্দি হয়ে গেলেন। এবং তাকে ব্যবহার করে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পর এখন তিনি তাকে পরিত্যাগ করতে চাইলেও যাদের পিঠে চেপে তিনি ক্ষমতায় এসেছেন তারা তাতে রাজি হবে না। আমি এই বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এই কারণে যে অনেককেই বলতে শুনি, এল কে আদবানি খুব নম্র

স্বভাবের চমৎকার লোক এবং তাঁর মতো লোকের নেতৃত্বে ক্ষমতায় এলে বিজেপি (এবং তার পেছনে আর এস এস)-ও মানবতাসমৃদ্ধ ও ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে যাবে। আমার মনে হয়, এই দৃষ্টিভঙ্গি শুধু অতি সরল নয়, বিপজ্জনকও—কেননা যে ভাবাদর্শ নিয়ে দল ও তার নেতারা জনসাধারণকে উদ্দীপ্ত করেছেন সেই ভাবাদর্শ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করা আর তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। আদবানির রথযাত্রা ও তার প্রভাব এবং বিজেপি-পরিচালিত রামজন্মভূমি আন্দোলন ও তার প্রতিক্রিয়া থেকেও বিষয়টি পরিষ্কার বোঝা যায়।

সাম্প্রদায়িক ভাবাদর্শের মোকাবিলা তাই সচেতনভাবেই করতে হবে। অন্যান্য পরোক্ষ ব্যবস্থাদি গ্রহণ করলেও তার ফল এই ক্ষেত্রে আপনা থেকেই ফলবে এমন মনে করার কোনো কারণ নেই। ১৯৩০ ও ১৯৪০-এর দশকে জাতীয়তাবাদীদের বিশ্বাস ছিল যে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম অপ্রত্যক্ষ ও স্বতঃক্রিয়াভাবে সাম্প্রদায়িকতাকে দুর্বল করবে এবং তারপর দূরীভূত করবে। বামপন্থীরা, কমিউনিস্টরা, সমাজতন্ত্রবাদীরা এবং জওহরলাল নেহরুও বহু দশক ধরে বিশ্বাস পোষণ করেছিলেন যে এক্ষেত্রে শ্রেণিসংগ্রামের ফল হবে আরো দ্রুত ও কার্যকর। ১৯৪৭ সালের পরে নেহরু সহ অনেকেই ভেবেছিলেন অর্থনৈতিক বিকাশ ও শিক্ষার বিস্তার ক্রমশ সাম্প্রদায়িকতাকে দুর্বল করে দেবে। কিন্তু ঘটনা এই যে সাম্প্রদায়িক ভাবাদর্শ একবার দানা বেঁধে ছড়িয়ে পড়লে তার বিরুদ্ধে সচেতন ভাবাদর্শগত সংগ্রাম ছাড়া তাকে দুর্বল বা দূর করা সম্ভব নয়। অন্য যে-ব্যবস্থাই নেওয়া হোক না কেন, নিজে থেকে তা কিছুতেই দূর হবে না।

এখানে একটি বিষয়ে রাস্ট্রেরও কিছু ভূমিকা আছে। শিক্ষা-ব্যবস্থা থেকে গণমাধ্যম এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদি নানা উপায়ে রাষ্ট্র সাম্প্রদায়িক ভাবাদর্শের পৃষ্ঠপোষকতাও করতে পারে, আবার তার বিরুদ্ধে সংগ্রামেও উদ্বুদ্ধ করতে পারে, অথবা সাম্প্রদায়িক ভাবাদর্শের মুখে দাঁড়িয়ে তা দুর্বল অবস্থানও গ্রহণ করতে পারে।

সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নে জাতীয় আন্দোলনের প্রধান ব্যর্থতাই হলো এই ভাবাদর্শগত সংগ্রামের ক্ষেত্রে। গান্ধীজি তাঁর সুগভীর ধর্মনিরপেক্ষতা সত্ত্বেও সাম্প্রদায়িকতার এই ভাবাদর্শগত দিকটি ধরতে পারেন নি। তাই ‘হিন্দু মুসলিম ভাইভাই’-এর স্তর পেরিয়ে তিনি তাকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারেননি। মানবতাবাদ দিয়ে সাম্প্রদায়িকতাবাদকে প্রতিহত করা সম্ভব বলে তাঁর আশা ছিল। ১৯৩৫-এর দশকে নেহরু স্পষ্ট এটা ধরতে পেরেছিলেন যে সাম্প্রদায়িকতা একটি ভাবাদর্শ এবং তার মূল রয়েছে বর্তমান শ্রেণিগত ও রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে। কিন্তু তিনিও, ১৯৩০-৩৪ ও ১৯৩৬-৩৭ এর স্বল্প সময় ব্যতিরেকে, এর বিরুদ্ধে কোনো ব্যাপক ভাবাদর্শগত সংগ্রাম গড়ে তুলতে ব্যর্থ হন, এবং ধরে নেন যে শ্রেণিগত ও রাজনৈতিক পরিকাঠামোগত পরিবর্তন (সামন্ততন্ত্র-বিরোধী ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী) এলে সাম্প্রদায়িকতাও ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। স্বাধীনতার পরে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে তিনি রুখে দাঁড়িয়েছেন বটে, কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার এই ক্রমাবলুপ্তির জন্য তিনি অর্থনৈতিক বিকাশ ও শিক্ষার বিস্তারের উপরই নির্ভর করেছেন। কমিউনিস্ট এবং সমাজবাদীরাও এই লক্ষ্যে শ্রেণি-সংগ্রাম ও সমাজ পরিবর্তনের সংগ্রামের উপরই বরাবর নির্ভর করে এসেছেন।

॥ ২ ॥

ভাবাদর্শ হিসেবে সাম্প্রদায়িকতাকে স্পষ্টভাবে বুঝতে পারলে সাম্প্রদায়িক দল কাকে বলবো সেটাও স্পষ্ট হয়। সাম্প্রদায়িক দলের

এই সংজ্ঞা আপাতত খুব সহজ মনে হলেও এ নিয়ে যথেষ্ট বিব্রান্তি আছে। বেশ কয়েক বছর ধরে আমার কিছু বন্ধুর সঙ্গে আমি ভিন্ন মত পোষণ করে এসেছি। তাঁদের বক্তব্য, কংগ্রেস একটি সাম্প্রদায়িক দল হয়ে গেছে কেননা এই দল টিভিতে ধর্মীয় সিরিয়াল দেখায়, রেডিওতে ভজন গান বাজায়, নির্বাচকমণ্ডলীর জাতপাত ও ধর্মবিচার করে নির্বাচনে প্রার্থী দেয়, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাবাজদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয় না এবং দিল্লি ও জম্মুর নির্বাচনে গোপনে গোপনে বিজেপি ও আর এস এস-এর সাহায্য নিয়েছে, ইত্যাদি। মজার কথা, আর এস এস এবং বিজেপি যখন খোলাখুলি জনতা দলকে সমর্থন করে তার সঙ্গে আসন ভাগাভাগি করে নিয়েছিল, তখন কিন্তু এই বন্ধুরা জনতা দলকে সাম্প্রদায়িক দল বলেনি। আমার মতে, কংগ্রেস দল বা জনতা দল কোনোটিকেই তখন বা এখন সাম্প্রদায়িক দল বলা ভুল হবে।

আমার মনে হয় সাম্প্রদায়িকতাকে যদি আমরা একটি ভাবাদর্শ হিসেবে দেখি, তাহলেই সাম্প্রদায়িক দল কাকে বলে সেটা বুঝতে সুবিধা হয়। সাম্প্রদায়িক ভাবাদর্শকে কেন্দ্র করে যে-সমস্ত দল ও গোষ্ঠী গড়ে ওঠে, সেগুলিকেই সাম্প্রদায়িক দল বা গোষ্ঠী বলা যায়। সাম্প্রদায়িক ভাবাদর্শ না থাকলে তাদের আর কিছুই থাকে না—তারা ছত্রাণ হয়ে যায়! ১৯৩৭ সালে এই রকমের একটা অবস্থাতেই মুসলিম লিগ নেতৃত্ব ও মোহাম্মদ আলি জিন্না দেখলেন, হয় সাম্প্রদায়িক ভাবাদর্শ ও জঙ্গিপনার মাত্রাকে বাড়িয়ে তুলতে হবে নয়তো মুসলিম লিগ ও মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার মৃত্যু প্রত্যক্ষ করতে হবে। একই সময় দিয়ে হিন্দুমহাসভার সামনেও এই বেছে নেওয়ার সমস্যাটি হাজির হল। মদনমোহন মালব্যর উদারধর্মী সাম্প্রদায়িকতার বদলে ভি ডি সাভারকরের উগ্রপন্থী সাম্প্রদায়িকতাকেই দল আত্মরক্ষার জন্য বেছে নিল।

১৯৮১ সালে পাঞ্জাব নির্বাচনে হেরে যাওয়ার পর অকালি দলের নেতৃত্বকেও এই একই উভয় সংকটের মুখে পড়তে হয়। সাম্প্রদায়িক দল হিসেবে তারা পাঞ্জাবে জিততে পারেন নি, আবার সাম্প্রদায়িকতাকে বর্জন করলেও দল হিসেবে তাঁদের টেকা মুশকিল। তাই তাঁদের সামনে বিকল্প হল হয় সাম্প্রদায়িক দল হিসেবে মৃত্যু অথবা পাঞ্জাবে সাম্প্রদায়িকতাকে জাগিয়ে তোলা। তাঁরা দ্বিতীয়টাই বেছে নিলেন। আমাদের ভোলা ঠিক হবে না যে মধ্যপন্থীরাই কিন্তু এই শ্লোগান তুলেছিলেন যে শিখদের বিরুদ্ধে গণহত্যা চলছে বা ভারতে শিখধর্ম বিপন্ন। এবং এইসব কিছুই করা হয়েছে ১৯৮২-৮৩ সালে অপারেশন ব্লু-স্টার বা ১৯৮৪-র নারকীয় দাঙ্গারও বেশ আগে।

কাজেই বিজেপিকে ধর্মনিরপেক্ষতা দিয়ে শোধন করার কথা বলা বা আর এস এস-কে মুসলিম-বিরোধ ত্যাগ করতে বলা, বা সাম্প্রদায়িকতাকে বাদ দিলেই বিজেপি ঠিক হয়ে যাবে এরকম ভাবার অর্থ সাম্প্রদায়িক ভাবাদর্শের আসল কথাটাই না-বোঝা। সাম্প্রদায়িকতাকে বাদ দিলে বিজেপি যে ‘ঠিক’ হবে না, বরং একটি শূন্যে পরিণত হবে—একথা বিজেপি নেতারাও জানেন। তাঁর এও জানেন যে, ১৯৭৭ সালের পরে সাম্প্রদায়িক ভাবাদর্শকে আড়াল করতে গিয়ে তাদের সংগঠন দুর্বল হয়ে গেছে। তাঁরা বুঝতে পেরেছেন তেতো বড়ির উপর মিষ্টির প্রলেপ দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু সাম্প্রদায়িক ভাবাদর্শ বাদ দিয়ে চলবে না। অন্য ভাষায়, সাম্প্রদায়িকতাই একটি সাম্প্রদায়িক দলের অস্তিত্বের শর্ত। যাঁরা পাঞ্জাব ও কাশ্মীরের সাম্প্রদায়িক দল ও গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে আপসরফা বা ‘মিটমাট’ করতে চাইছেন, তাঁরা তাঁদের চেষ্টা চালিয়ে যেতে পারেন, কিন্তু তাঁদের এটা অন্তত জেনেই এগোনো উচিত যে তাঁরা যাঁদের সঙ্গে কারবার করছেন তারা যে শুধু রাজনৈতিক

সুবিধাবাদী ও কারিগর তা নয়—তারা হলো ভাবাদর্শ-ভিত্তিক গোষ্ঠী।

বাম দলগুলি ও জনতাদল এটা বুঝতে পেরেছে ১৯৯০ সালের সেপ্টেম্বর অক্টোবরে, যখন নশ্বরভাব এল কে আদবানির সঙ্গে সহযোগ ও তাঁকে পথে আনার ১০ মাসব্যাপী প্রয়াস ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল। এবং যখন উভয় পক্ষের বিরোধ পেকে উঠল, তখন আদবানি ও তাদের সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন সমর্থকদের মধ্যে রাজনৈতিক ভিত্তিকে দুর্বল হতে না দিয়ে বরং বন্ধুভাবাপন্ন দলগুলির ও বুদ্ধিজীবীদের উদ্ধার পাত্র হওয়াকেই শ্রেয় মনে করলেন।

সাম্প্রদায়িকতাকে একটি ভাবাদর্শ হিসেবে দেখলে তা থেকে কয়েকটি অনুসিদ্ধান্ত বেরিয়ে আসে। সর্বোপরি, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে ভাবাদর্শগত সংগ্রামের চূড়ান্ত প্রয়োজনীয়তাটি স্পষ্টভাবে দেখা দেয়। সমাজের সাম্প্রদায়িকীকরণ পুলিশ বা আমলাতন্ত্রের মাধ্যমে ঘটে না, ঘটে চিন্তা ও ভাবাদর্শের মাধ্যমে। প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে সাম্প্রদায়িক দল ও গোষ্ঠীগুলির—বিশেষ করে যখন তারা ওপরে নয় কিন্তু ভিতরে ভিতরে সাম্প্রদায়িক—রাজনৈতিক বুদ্ধিকে, এবং জনগণের সাম্প্রদায়িকীকরণ ঘটানো এমনকি তাদের ক্ষমতাসীন হওয়াকেও, ঠেকানো সম্ভব নয়। ক্রমবর্ধমান সাম্প্রদায়িক জনমতের মুখে দাঁড়িয়ে যে দলগুলি মূলত ধর্মনিরপেক্ষ তারা পর্যন্ত দুর্বল ও সুবিধাবাদী হয়ে পড়তে পারে। একইভাবে পুলিশ ও আমলাতন্ত্রের সাম্প্রদায়িকীকরণ কোনো প্রশাসনিক আদেশ বা নির্দেশে ঘটে না, সমাজে যা ঘটছে তারই প্রতিক্রিয়া হিসেবে ঘটে।

এই নাগরিক সমাজের ক্ষেত্রটিকে অবহেলা করে রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় নীতির উপর দৃষ্টিকে কেন্দ্রীভূত করার একটি প্রবণতা ভারতে আছে। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে আসল লড়াইটা চালানো দরকার পরিবারে, মহল্লায়, স্কুলে, কলেজে, খামারে ও কারখানায়; এবং রাষ্ট্রের উপর দৃষ্টিকে কেন্দ্রীভূত না রেখে শিক্ষক, সাংবাদিক, স্বৈচ্ছাসেবী সংগঠন ও পেশাগত সংস্থাগুলির কর্মী এবং রাজনৈতিক দল, কিষাণসভা ও ট্রেড ইউনিয়নের সদস্যদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার উপর জোর দিতে হবে। প্রধান দুর্বলতাটা এখানেই।

সাম্প্রদায়িক দল, গোষ্ঠী ও ভাববাহকদের বৈধতা প্রদানের যে-কোনো প্রয়াসেরও বিরোধিতা করতে হবে আমাদের। স্বাধীনতা-সংগ্রাম ও ১৯৪৭-পরবর্তী কয়েক বছরের গৌরবময় ঐতিহ্য হল সাম্প্রদায়িকতাকে অবৈধ জ্ঞান করা। শব্দটি ছিল দুর্গন্ধযুক্ত। দুর্ভাগ্যক্রমে যে রাজনৈতিক বর্ণালী এতদিন পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী, ধারণা ও বর্গগুলিকে পরিহার করে চলতো, তা ক্রমশই সংকীর্ণতর হচ্ছে। ঘটনার সূত্রপাত হয় ১৯৬০ সালের প্রথম দিকে, যখন কেরালায় কংগ্রেস মুসলিম লিগকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করলো। কমিউনিস্ট দলগুলিও কেরালায় মুসলিম লিগ ও পাঞ্জাবে আকালি দলের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করে একই পথের পথিক হলো এই যুক্তি দেখিয়ে যে সংখ্যালঘিষ্ঠের সাম্প্রদায়িকতা হলো গণতান্ত্রিক। অতি সাম্প্রতিক পদক্ষেপটি হলো ১৯৮৯ সালের নভেম্বরে বিজেপির সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সমঝোতা এবং বিজেপির সমর্থনে কেন্দ্রে সরকার গঠন। ১৯৯০ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে বিজেপি যখন তার নখ বের করলো তখন জনগণ আর আগের মতো তাকে অচ্ছুৎ মনে করতে পারলো না।

আর একটি খুব প্রচলিত, যদিও অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আছে যার মাধ্যমে সাম্প্রদায়িকতাকে বৈধতা দেওয়া হয়, বিশেষত গণমাধ্যমে। খবরের কাগজ, রেডিও এবং টেলিভিশনে প্রায়শই সাম্প্রদায়িক নেতাদের উল্লেখ করা হয় তাঁদের ধর্ম-সম্প্রদায়ের নেতা হিসেবে। যেমন মুসলিম সাম্প্রদায়িক নেতাদের উল্লেখ করা হয় ‘মুসলিম

নেতা’ কিংবা শিখ সাম্প্রদায়িক নেতাদের ‘শিখ নেতা’ হিসেবে। এর ফলে এইসব নেতাদের অনুগামীদের কাছে সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের যথার্থতা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ধর্মনিরপেক্ষ নেতারা প্রতিভাত হন ‘বহিরাগত’ হিসেবে, যেন দেশ বা শ্রেণি বা রাষ্ট্র বা দলের প্রতিনিধি হলেও তাঁরা সংশ্লিষ্ট ‘সম্প্রদায়’-এর প্রতিনিধি নন। সাম্প্রদায়িকতাবাদের উভয় উপপন্থিই এতে প্রতিষ্ঠিত হয়—এক, বাস্তব জীবনে সম্প্রদায়গত স্বার্থ বিদ্যমান, এবং দুই, সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের যাই দোষ ত্রুটি বা নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য থাকুক না কেন, তাঁরা এই সম্প্রদায়গত স্বার্থের প্রতিনিধি এবং তাঁদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের বৈধ মুখপাত্র।

১৯৪৭-পূর্ববর্তীকালে মুসলিম ও শিখ সাম্প্রদায়িকতার বিস্তারে এই বৈধকরণ প্রক্রিয়ার একটা গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল। ১৯৪৭-এর পরেও একই ব্যাপার ঘটছে। ১৯৪৭ সালের আগে ও পরে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা যে একটি প্রধান শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারেনি তার অন্যতম কারণ হল প্রথমে জাতীয় আন্দোলনের নেতারা এবং সেই সঙ্গে জাতীয় সংবাদপত্র এবং পরে ধর্মনিরপেক্ষ নেতৃত্ব এবং সংবাদপত্র ১৯৪৭-এর আগের হিন্দু মহাসভা ও আর এস এস এবং ১৯৪৭-এর পরের জনসংঘ ও আর এস এস এক-কে কখনোই ‘হিন্দু নেতা’ বলে স্বীকৃতি দেয়নি। দুর্ভাগ্যক্রমে, সাম্প্রতিককালে গণ-মাধ্যমের একাংশ এই কাজই শুরু করেছে, মুসলিম ও শিখ সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের নিয়েও একই ভুলের পুনরাবৃত্তি করছে।

একইরকমভাবে, ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তিরও ‘শিখ মানসিকতা’ আহত হবে, ‘মুসলিম মানসিকতা’ হতাশাগ্রস্ত হবে—এরকম সব কথা অনবরত বলে যান। এখন যখন হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীরাও ‘হিন্দু মানসিকতা’ নিয়ে বলতে ও লিখতে শুরু করেছেন, তখন এ-জাতীয় ধারণার বিপদটা অনেকেই উপলব্ধি করতে পারছেন। প্রকৃতপক্ষে এটাও একটি সাম্প্রদায়িক প্রকাশভঙ্গি। আসলে এইসব ঢাকা দেওয়া সাম্প্রদায়িক প্রকাশভঙ্গি পরিহার করার ব্যাপারে আমাদের অত্যন্ত সতর্ক হওয়া প্রয়োজন, কেননা এইভাবেই সাম্প্রদায়িক ভাবাদর্শ ধর্মনিরপেক্ষ বৈধতার ছাড়পত্র পেয়ে যায়।

এই পর্যায়ে একটি প্রশ্ন উঠতে পারে : সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে ভাবাদর্শগত সংগ্রাম বলতে কী বোঝায়? আমি বলবো, সবার উপরে এর অর্থ হলো সাম্প্রদায়িক বিশ্বাসতন্ত্রের পিছনে যে অনুমিতিগুলি রয়েছে সেগুলি সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করা; এই অনুমিতিগুলি যে সঠিক নয়, সমাজ, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও রাজনীতির সাম্প্রদায়িক বিশ্লেষণ যে ঠিক নয়; ফলত সাম্প্রদায়িক সমাধানগুলিও যে সঠিক সমাধান নয়—তা ধৈর্যের সঙ্গে তত্ত্বগতভাবে ও সাধারণের বোধগম্যভাবে বিশ্লেষণ করে মানুষকে বোঝানো। অবশ্যই ভারতের সামাজিক পরিস্থিতিতে অনেক বৈঠক জিনিস আছে, কিন্তু সেগুলির কারণ হিসেবে সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা যা তুলে ধরে সেগুলি যেমন মিথ্যা তেমনি তাদের প্রস্তাবিত সমাধানও মিথ্যা। সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা যেটাকে রোগ বলছে তা আসলে রোগই নয় এবং তাদের ওষুধটাও আদৌ কোনো ওষুধ নয়। তারা হয় অন্যদের প্রবঞ্চিত করছে, নয়তো নিজেদেরই।

উদাহরণ হিসেবে, সাম্প্রতিক হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদী প্রচারের মূল খোঁচাটা এই যে ধর্মনিরপেক্ষ দল, ব্যক্তি ও শক্তিগুলি সংখ্যালঘু-তোষণ করছে এবং হিন্দুদের দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকে পরিণত করছে। কিন্তু কেউ কি জীবনের একটি ক্ষেত্রেও দেখাতে পারবে যেখানে মুসলমানদের বেশি সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়েছে? সরকারি কৃত্যক, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, সেনাবাহিনী, গণমাধ্যম, ব্যক্তিগত ব্যবসায় অথবা রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ক্ষেত্রে—কোথায়? কোম্পানি আইনে

প্রত্যেক পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিকে মাসিক ৬০০০ টাকার বেশি আয়সম্পন্ন কর্মচারীদের নাম বাৎসরিক প্রতিবেদনে উল্লেখ করতে হয়। এই সমস্ত তালিকায় মুসলমানদের সংখ্যা অতি নগণ্য। বেশি তো দূরের কথা, জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই জনসংখ্যার আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বটুকুও মুসলমানদের নেই।

হিন্দু-সাম্প্রদায়িকতাবাদী প্রচারের ‘সত্য’ অংশ এটা নয় যে ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিগুলি মুসলমানদের বা অন্যান্য সংখ্যালঘুদের বেশি সুযোগ-সুবিধা দিয়ে এসেছে বা দিচ্ছে—কিন্তু এর মধ্যে যেটুকু সত্য আছে তা হলো সংখ্যালঘুদের সাম্প্রদায়িকতাকে নরম দৃষ্টিতে দেখার একটা প্রবণতা তাদের আছে এবং হিন্দু-সাম্প্রদায়িকতাকে তারা যতটা তীব্রভাবে আক্রমণ করে থাকে, সংখ্যালঘুদের সাম্প্রদায়িকতাকে সাধারণত সেভাবে করে না। সংখ্যালঘুদের তোষণটা এইখানেই, এবং তা সংখ্যালঘুদের কোনো উপকার তো করেই না, বরঞ্চ তাদের উপকারই করে। মুসলিম লিগের সঙ্গে ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলির মৈত্রী কেরালার মুসলমানদের কোনো উপকারেই লাগেনি। শাহবানু আইন মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদী ও মতান্বেষীদের খুশি করতে পারে, কিন্তু মুসলমানদের ৫০ শতাংশ যে নারী তাদের ক্ষতি করেছে। শাহী ইমামকে ৫০ লক্ষ টাকা দান বা অন্যভাবে তাঁকে খুশি করার চেষ্টা কোনো দিক দিয়েই মুসলমানদের জন্য কোনো বিশেষ সুযোগ-সুবিধা এনে দেয়নি। নবীর জন্মদিনটিকে সরকারি ছুটির দিন ঘোষণা করে ধর্মীয় মৌলবাদীদের হয়তো তুষ্ট করা গেছে, কিন্তু সামান্য সংখ্যক মুসলমানেরই তাতে ‘লাভ’ হয়েছে—বরং যে-সমস্ত সরকারি কর্মচারী ছুটির সুখ

উপভোগ করছে তাদের ৯৭/৯৮ শতাংশই হিন্দু এবং মাত্র ২ শতাংশের মতো মুসলমান!

সব রকমের সাম্প্রদায়িকতাকে একই সঙ্গে আক্রমণের মাধ্যমে ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির এই দুর্বলতাকে কাটিয়ে উঠতে হবে। সাম্প্রদায়িক ভাবাদর্শ একটাই—হিন্দু, মুসলিম, শিখ, খ্রিস্টান ইত্যাদি তার বিভিন্ন রূপ। শুধু তার একটিমাত্র রূপকে আঘাত করে সাম্প্রদায়িক ভাবাদর্শের মোকাবিলা করা যাবে না। সংখ্যাগরিষ্ঠের সাম্প্রদায়িকতা ও সংখ্যালঘুদের সাম্প্রদায়িকতার ফলাফল অবশ্যই এক নয়। সংখ্যাগরিষ্ঠের সাম্প্রদায়িকতার অনিবার্য পরিণতি ফ্যাসিবাদে, অন্যদিকে সংখ্যালঘুদের সাম্প্রদায়িকতা টেনে নিয়ে যায় বিচ্ছিন্নতাবাদে ও বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাবে। কিন্তু উভয়েই বিপজ্জনক—সামগ্রিকভাবে জনগণ ও দেশের পক্ষে তো বটেই, সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা যাদের স্বার্থের ধুরো তোলে বিশেষ করে তাদের পক্ষেও। হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার জয় হলে সংখ্যাগরিষ্ঠের ওপরই ফ্যাসিবাদী রূপে তা নেমে আসবে এবং বহু শতাব্দী প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ বিধ্বস্ত হয়ে যাবে—তার ধর্মীয় দিকগুলিও রক্ষা পাবে না। সংখ্যালঘুদের সাম্প্রদায়িকতাও সংখ্যালঘুদেরই সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে। ১৯৪৭ সালের আগে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা মুখ্য শক্তি হয়ে ওঠে এবং নিজের শর্তে তা জয়ীও হয়। সেই জয়ের মূল্য আজও এই উপন্যাসদেশের মুসলমানদের দিয়ে যেতে হচ্ছে—তা তাঁরা পাকিস্তান, বাংলাদেশ বা ভারত যেখানেই থাকুন না কেন! শিখ সাম্প্রদায়িকতারও মূল শিকার হয়েছে শিখরাই—যতদিন তা টিকবে ক্ষতির বহরও বাড়বে।

With best compliments of

**A.K. CONSTRUCTION
&
HOPE CONSTRUCTION**
GOVT. CONTRACTOR

Monteswar, Burdwan

Sl. No. 201

সুকুমারী ভট্টাচার্য : ইতিহাসের উত্তরাধিকার

সৈয়দ তানভীর নাসরীন



অধ্যাপিকা সুকুমারী ভট্টাচার্য (১৯২১-২০১৪)-কে আমি দু-রকম ভাবে চিনতাম। প্রথম পরিচয়টি নৈর্ব্যক্তিক, তাঁর অনন্য মেধা এবং পাণ্ডিত্যের সঙ্গে আমার প্রথম বিদ্যায়তনিক পরিচয় আমার কলেজজীবন থেকে। তখন প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ি, প্রাচীন ভারত আলোচনা প্রসঙ্গে ক্লাসে বারবার সুকুমারী ভট্টাচার্যের ভাবনাচিন্তার কথা ঘুরে ফিরে আসত। সে সব বইয়ের সব কথা আঠারো-উনিশ বছর বয়সে সবটুকু যে হৃদয়ঙ্গম করতে পারতাম এমন নয়। তবে আর একটু বেশি আর একটু ভালো করে বোঝার ইচ্ছাটা তৈরি হত গভীরভাবে।

দীর্ঘকাল পরে ব্যক্তিমানুষটির সঙ্গে আলাপ হয়। তাঁর কন্যা জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা তনিকা সরকারের তত্ত্বাবধানে গবেষণাকালে সুকুমারী ভট্টাচার্যের সঙ্গে আমার পরিচয়ের সুযোগ ঘটে। প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পাশাপাশি তাঁর স্নেহশীল মনের প্রবল

প্রকাশ লক্ষ্য করেছে। খুব নিয়মিত যোগাযোগ ছিল এমন নয়, তবু এক দশকেরও বেশি সময় ধরে বিভিন্ন সময়ে ব্যক্তিগত পরিসরে তাঁর সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে প্রত্যক্ষ আলাপচারিতা আমাকে ঋদ্ধ করেছে।

শরীর যখন পদে পদে প্রতিকূলতার সৃষ্টি করেছে, তখনও একজন মানুষ কী আশ্চর্য প্রাণক্ষমতায় সতেজ-সজীব থাকতে পারেন, তাঁর চিন্তাচেতনা কী তীক্ষ্ণ ও প্রখর যুক্তিবাদী হতে পারে, ভাবলে বিস্ময় জাগে। ব্যক্তিগত দুঃখকষ্টের কাছে নতিস্বীকার না করার এই আদর্শ আমাদের জীবনে অনুকরণীয়; তাঁকে স্মরণ করার একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। অধ্যাপিকা সুকুমারী ভট্টাচার্যের সঙ্গে সঙ্গে একটি যুগেরও অবসান হল।

১৯২১ সালে মেদিনীপুরে তাঁর জন্ম। তাঁর জীবনবৃত্তে সুকুমারী ভট্টাচার্য ভারতের উপনিবেশিক-জীবন দেখেছেন, স্বাধীনতা-দেশভাগ-দাঙ্গা দেখেছেন এবং ১৯৪৭ উত্তর বাংলা তথা ভারতের রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনের বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাত দেখেছেন। একথা বিশ্বপ্রেমিকিতেও প্রযোজ্য। ভারততত্ত্বের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এই পণ্ডিত মানুষটি ছিলেন সর্বার্থে একজন বিশ্বনাগরিক, আবার খুব নিবিড়ভাবে ভারতীয় এবং বাঙালি। ভারতীয় সনাতন আদর্শের প্রতি আস্থা রেখেই আজীবন আত্মমগ্ন এক সাধক যেন, প্রচারবিমুখ!

উনিশ শতকে বাংলার সমাজজীবনে যথার্থ কোনো ‘নবজাগরণ’ হয়েছিল কিনা এনিয়ে অনেক বিতর্ক আছে। তবে একথা মানতেই হয় যে উনিশ শতক ব্যাপকতরভাবে শিক্ষিত বাঙালিকে প্রশ্ন করতে শিখিয়েছিল। প্রশ্নহীন আনুগত্যে প্রথাকে মেনে নেওয়া সে অনুমোদন করেনি। এই স্ব-প্রশ্নতার ঐতিহ্যেই সুকুমারীর পিতামহ বিপিনবিহারী দত্ত খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। প্রথম জীবনে এই ধর্মীয় বিভিন্নতার চড়া মূল্য দিতে হয়েছিল সুকুমারী দত্তকে; তখনও অমল ভট্টাচার্যের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়নি।

তাঁর ছাত্রজীবনের সেই সমস্ত প্রতিকূলতার বিস্তারিত বিবরণ আজ অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গিয়েছে; শাস্ত্রত হয়ে জেগে আছে যাবতীয় প্রতিকূলতাকে অতিক্রমণের সংগ্রাম ও সাফল্য। একই ধরনের সংকটের বিবরণ আছে এম আর আখতার মুকুলের ‘চল্লিশ থেকে একাত্তর’ বইটিতে।

একটা কথা মনে হয়, অহিন্দু তথা অব্রাহ্মণের সংস্কৃত পাঠে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি, তা যত বিক্ষিপ্তই হোক, আসলে প্রমাণ করে আমাদের সমাজে কখনও কখনও সাম্প্রদায়িকতা কী ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করতে পারে; কত গভীরে, মানুষের শিক্ষাবাসনার মধ্যেও তার শিকড় চারিয়ে দিতে পারে! হয়ত তার রূপ পাল্টেছে, তার কর্মপদ্ধতিও, তবে একালেও শিক্ষাক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতা তার অন্তিম প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা ছাড়েনি।

সুকুমারী ভট্টাচার্যের অভিজ্ঞতা আমাদের জীবনে দৃষ্টান্ত হয়ে থাকে। সুকুমারী ভট্টাচার্য ১৯৪৪ সালে প্রথমে ইংরেজি সাহিত্য এবং এক দশক পরে সংস্কৃত সাহিত্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। কর্মজীবনের প্রথম দিকে লেডি ব্রেরন কলেজে ইংরেজি সাহিত্যে অধ্যাপনা করতেন। সেই সময়কার লেডি ব্রেরন কলেজের বার্ষিক পত্রিকাগুলি (আমার গবেষণার প্রয়োজনে এগুলি আমায় দেখতে হয়েছিল) থেকে বোঝা যায় কলেজের সাংস্কৃতিক জীবনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন তিনি। মনে হতে পারে যে একজন বিদগ্ধ মানুষের জীবন-কর্ম আলোচনা প্রসঙ্গে এইরকম একটি বিষয়ের উত্থাপন কেন?

তা সেই সময়ের কলেজের স্টুডেন্ট প্রোফাইল বোঝার চেষ্টা করলে আরো পরিষ্কার হবে। লেডি ব্রেরন কলেজ থেকে তখন বাঙালি মুসলমান ছাত্রী-শিক্ষিকারা দলে দলে পূর্ববঙ্গে চলে যাচ্ছেন। অধিক সংখ্যায় ভর্তি হতে শুরু করেছেন পূর্ববঙ্গ থেকে আসা হিন্দুপরিবারগুলির মেয়েরা। বাকি মুসলমান মেয়েরা (যাদের কথা ভেবেই ১৯৩৯-এ লেডি ব্রেরন কলেজের প্রতিষ্ঠা) অধিকাংশই অবাঙালি। অপেক্ষাকৃত অধিক রক্ষণশীল। যাদের নিজেদের কাছে নাচ, গান, স্টেজে অভিনয় অভাবনীয় বিষয় ছিল, তাদের অভিভাবকদের অনেকের কাছেই যা ছিল অমার্জনীয় অপরাধ। সহকর্মীদের সঙ্গে এই মেয়েদের দিয়ে কখনও ইংরেজি নাটক, কখনও শ্যামা-চিত্রাঙ্গদা-শাপমোচন মঞ্চস্থ করানো খুব সহজ ব্যাপার ছিল না। বুটো গয়না জোগাড় করতে বললে মেয়েরা বাড়ি থেকে সোনার গয়না নিয়ে চলে আসত। এসব কথা তাঁর স্মৃতিচারণে শুনেছি। হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করেছি পণ্ডিতের দায়িত্ব কেবল পুঁথির মধ্যে, শিক্ষকের দায়িত্ব কেবল প্রথাগত পাঠদানের মধ্যে শেষ হয়ে যায় না।

১৯৫৭ সাল থেকে সুকুমারী ভট্টাচার্য তাঁর কর্মজীবনের শেষ পর্যন্ত দীর্ঘ সময় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন; প্রথমে তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগে, পরে সংস্কৃত বিভাগে। তিনি ইতিহাস বিভাগেও অধ্যাপনা করতে পারতেন, দর্শনবিভাগেও অধ্যাপনা করতে পারতেন, বিষয়ের উপর তাঁর ব্যুৎপত্তি বিবেচনা করলে, তুলনামূলক ধর্ম বা ধর্মতত্ত্ব বা নয় কেন?

বিশ্বাস (ফেইথ) আর যুক্তি (রিজন)-র যে অনন্ত বৈরিতা তাকে এক যুক্তিনিষ্ঠ নির্মোহ দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করেছিলেন সুকুমারী ভট্টাচার্য। ধর্ম, সাহিত্যের প্রতিটি ধারার বিশ্লেষণে তা পরিস্ফুট হয়। ১৯৭০ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর গভীর গবেষণালব্ধ গ্রন্থ ‘দি ইন্ডিয়ান থিয়োগনি’।

১৯৯২ সালে রাম জন্মভূমি বাবার মসজিদ বিতর্ক তীব্র আকার ধারণ করে, ধ্বংস হয় অযোধ্যার প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী মসজিদটি। বিচলিত মানবতাবাদী অধ্যাপক আবার রামায়ণ পড়তে শুরু করেন। ফলশ্রুতি ‘বান্ধীকির রাম : ফিরে দেখা’। যে পতিতপাবন পুরষোত্তম রামকে আমরা ভক্তিবলে বলতে শিখেছিলাম, “নীলাম্বজ শ্যামল কোমল-অঙ্গম, ... নমামি রামম্ রঘুবংশনাথম্” ইত্যাদি, তাঁকে অনেকগুলি প্রশ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে দিলেন সুকুমারী ভট্টাচার্য। তাড়কা রাক্ষসী (রাক্ষসী হলেও নারী তো) হত্যা দ্বিধাশ্রিত রাম এবং শম্ভুক (শুদ্র) হত্যা অবিচলিত রামকে আমরা নতুন আলোয় চিনতে শিখি। সেই রাম, যিনি স্ত্রীকে শত্রুগৃহ থেকে উদ্ধারের পর সর্বসমক্ষে “স্ববলীঢ়ং হবিঃ” বলে অভিহিত করেন, তাঁকে সুব্রহ্ম চিহ্নিত করেন অধ্যাপক ভট্টাচার্য।

প্রাচীন ভারতে শূদ্র এবং নারী কলির ত্রাস রূপে নির্দিষ্ট হয়েছিল। সুকুমারী ভট্টাচার্য দুটি ধারারই ঐতিহাসিক অনুসন্ধান করেন। নিম্নবর্গের ইতিহাস এবং নারী-ইতিহাস প্রাচীন ভারতীয় প্রেক্ষিতে স্থাপনার প্রাথমিক কৃতিত্ব তাঁর। তাঁর আগে পর্যন্ত প্রাচীন ভারতে বা

বৈদিক যুগে নারী সংক্রান্ত যে সমস্ত আলোচনা আমরা পেয়েছি, তা যেন নারীকে মহিমাম্বিত করার উদ্দেশ্যে এক সচেতন প্রয়াস। মোটামুটিভাবে ১৯৭০-র দশক থেকে বিশ্বজুড়ে যে মানবী বিদ্যাচর্চার ধারা শুরু হয়েছিল, সুকুমারী ভট্টাচার্য তাকে প্রাচীন ভারতে প্রতিষ্ঠা করলেন।

দীর্ঘ সময় পর্যন্ত আমাদের স্কুল-কলেজের ইতিহাস পাঠ্য বইয়ে একটি সরল সাধারণীকৃত ধারা মেনে চলা হতো। যার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে বৈদিক যুগে নারীর অবস্থা ঈর্ষণীয় রকমের ভালো ছিল। পারিবারিক ও সামাজিক সম্মানে সে সর্ব-অর্থে ‘সাম্রাজ্ঞী’ ছিল, ক্রমাবনতির কিছু চিহ্ন বেয়ে তুর্কি (মুসলমান) আক্রমণের পর থেকেই তার আসল লাঞ্ছনার শুরু এবং সমস্ত প্রকার স্বাধীনতার পরিসমাপ্তি। সুকুমারী ভট্টাচার্য প্রাচীন ভারতীয় উপাদান (বৈদিক সাহিত্য, ধর্মসূত্র, ধর্মশাস্ত্র, পুরাণ, সৃজনশীল সংস্কৃত ও প্রাকৃত উপাদান) থেকে প্রমাণ করেন যে খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতক থেকেই নারীর অবস্থা ক্রমান্বয়ে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। প্রসঙ্গ নির্দেশ করেই সর্বদা তিনি তাঁর উদ্ধৃতি ও প্রমাণ পেশ করেন। দুটি উদাহরণ মনে পড়ছে—প্রথমটি, নারীকে কৌমারকালে পিতা, যৌবনকালে পতি (বা ভর্তা) এবং স্থবিরকালে (বার্ধক্যে) পুত্রের রক্ষা করবেন। ‘রক্ষা’ করার ধারণাটি প্রশ্রয়িত করেন সুকুমারী এবং জানান যে এই বিধানটির মূল প্রসঙ্গ হল স্বাভাবিক বা স্বাধীনতার অধিকার নারীর নেই।

দ্বিতীয়ত, যেখানে নারীরা পূজিত হন, সেখানে দেবতারা বিরাজ করেন। যেখানে তাঁরা পূজিত হন না, সমস্ত ক্রিয়া (কার্য) সেখানে অফলা বা নিষ্ফল হয়ে যায় (যেই নারী পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতা : / যত্রৈতাস্ত পূজ্যন্তে সর্বস্তত্রাফলা ক্রিয়া)। প্রশ্রয়িত হয় ‘পূজা’-র প্রসঙ্গটি। আমাদের পক্ষে বোঝা সহজ হয় কেন চিত্রাঙ্গদা বলেছিলেন, “পূজা করি মোরে রাখিবে উর্ধ্বে সে নহি নহি।”

প্রাচীনকালে শিক্ষায় নারীর অধিকার ছিল বলে আমাদের যে গর্ববোধ তা কোন বর্গের কোন শ্রেণির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল? নারীর অধিকারের সীমা কীভাবে নির্ধারণ করতে পুরুষতন্ত্র, তা যাজ্ঞবল্ক্যের উদাহরণেই পরিস্ফুট। বৈদিক মন্ত্রে নারীর ‘কণ্ঠ’ কোথায়? সভা-সমিতিতে যে মেয়েরা যেতেন, সেখানে তাঁরা কী বলতেন? আদৌ কিছু বলার সুযোগ পেতেন কি?

পত্নী থেকে জায়া (জন্মদাত্রী) ভূমিকায় নারীর বিবর্তন আসলে তার অবস্থানের ক্ষেত্রে কতটা রূপান্তর ঘটিয়েছিল? কেন নারীকে প্রার্থনা করতে হয়েছিল, “যেন ইন্দ্রাণীর মতো অবিধবা হই?” সুকুমারী ভট্টাচার্যের হাত ধরে আমরা এই সমস্ত প্রশ্ন করতে শিখেছি।

প্রাচীন ভারতে নারীর অর্থনৈতিক অধিকারের ক্ষেত্রটি তাঁর অনুসন্ধানের অন্যতম ক্ষেত্র ছিল। যৌতুক, সৌদায়িক, স্ত্রীধনের উপর নারীর যথার্থ মালিকানা কতখানি ছিল? বহুবিবাহ-বাল্যবিবাহের মতো প্রথাদীর্ঘ সমাজে নারীর বিরুদ্ধে কোনো অর্থনৈতিক ষড়যন্ত্র কীভাবে ক্রিয়াশীল ছিল তা-ও বুঝেছি সুকুমারী ভট্টাচার্যের লেখায়।

আজকের সমাজে গণিকারা তাঁদের বিবিধ দাবির কথা তোলেন। শ্রমিকের মর্যাদা দাবি করে থাকেন। প্রাচীন ভারত কোন চোখে দেখেছিল গণিকাদের? কীভাবে এই প্রথার উৎপত্তি হয়েছিল তার এক মানবিক বিশ্লেষণ ছিল তাঁর লেখায়। বিভিন্ন শ্রেণির গণিকাদের চিহ্নিত করেছিলেন তিনি এবং পাপপুণ্যের দোলাচলে দ্বিধাবিভক্ত সমাজ কীভাবে একই সঙ্গে গণিকাদের তার নিজস্বার্থে ব্যবহার করতো ও নিন্দা করতো, সেই ব্যাখ্যা ছিল তাঁর তথ্যবদ্ধ বক্তব্যে। একদিকে ‘দ্বিজম্পগণিকা’ যাত্রার অনুকূল লক্ষণ বলে বিবেচিত, দেবীমূর্তি নির্মাণে ব্যবহৃত হয়েছে গণিকাগৃহের মাটি, আবার অন্যদিকে গণিকা-গমনে পাপ এবং তার প্রায়শ্চিত্তের বিধানও পাওয়া যায়। রাষ্ট্র ও সমাজের প্রেক্ষিতে কোথায় অবস্থান করতেন গণিকারা

তার আলোচনা ছিল তাঁর লেখায়। গণিকাবৃত্তি শেষ পর্যন্ত একটি অর্থনীতি-ভিত্তিক পরিষেবা। এই জীবিকাভুক্ত নারী যখন পেশাদারি মানসিকতার প্রতিফলন দেখিয়েছে তখন সে আরো নিন্দনীয় হয়ে উঠেছে। পেশাদারি সম্পর্কের মধ্যেও শোষণের বৃত্তে সমাজ তার কাছে স্বীকৃতিপ্রাপ্তি গুণাবলী আশা করেছে—সমাজের এই বৈধমনস্কতাকে তীব্র কশাঘাত করতে ভোলেননি সুকুমারী।

সংস্কৃত নাট্যকে আমরা নতুন করে বুঝতে শিখলাম তাঁর সাহায্যে। যেমন, মুচ্ছকটিক। তার সাবলীল বঙ্গানুবাদে মুচ্ছকটিক নামক প্রকরণটি আমাদের অনেক কাছের হয়ে উঠলো। জীবনবোধের গভীর মূল্যায়ন কীভাবে প্রকাশিত হয়েছে প্রাচীন সাহিত্যে, অন্যায়ের উপর ন্যায়, অসত্যের উপর সত্য প্রতিষ্ঠা পেয়েছে তা প্রাঞ্জল হয়ে ওঠে আমাদের কাছে। সুকুমারী ভট্টাচার্যের বিশ্লেষণে, “বহু বিচিত্র ঘটনার সমাবেশ, বহু স্বার্থের সংঘাত নানা রসের আনাগোনা, সব মিলে নাটকটি যে শুধু সমাজের ও মানবজীবনের একটি সুবৃহৎ বৃত্তান্তকে সার্থকভাবে প্রতিফলিত করেছে তা নয়, জীবনের নানা আবেগসঞ্জাত উপলব্ধি ও নীতিগত মূল্যবোধের অবতারণা বিশ্লেষণ ও পুনর্মূল্যায়নও করতে পেরেছে।” সাংস্কৃত সাহিত্যকে আমরা নতুন করে পাঠ করতে শিখলাম এবং কোন যাদুবলে মাটির খেলনা গাড়ি (মুৎ শকটিক) সোনায়ে ভরে ওঠে, তাও বুঝতে শিখলাম।

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের দর্শনভিত্তিক আলোচনায় সুকুমারী ভট্টাচার্য সংশয়বাদ ও নাস্তিক্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখিয়েও তাদের পার্থক্য আলোচনা করেছেন বিভিন্ন স্থানে। নাস্তিক বলতে কেবল ঈশ্বরপ্রামাণ্যবাদ বোঝায় না, ভারতীয় প্রেক্ষিতে বেদপ্রামাণ্যবাদীও নাস্তিক। সংশয়ের নজির উপস্থিত স্বত্বদে থেকেই। “উর্ধ্বতম আকাশ যিনি এ সকলের অধ্যক্ষ হয়তো তিনি জানেন, হয়েছে বা (তিনিও) জানেন না।” এই সংশয়ের মধ্যে কোনো অগোঁরব নেই। আদিমতম স্রষ্টা প্রসঙ্গে অস্বাভাবিক সূক্তে বলা হয়েছে, ‘কে তাঁকে জন্মাতো দেখেছে?’ এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় ‘তাঁর’ অস্তিত্ব অনুমানসিদ্ধ। অনুমান থেকে প্রমাণে যাবার এক জটিল প্রক্রিয়া ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে জড়িয়ে থাকে, তার মধ্যেও তাকে সংশয়। আদিসৃষ্টি ও আদিস্রষ্টার পাশাপাশি মৃত্যুর পর কী তা নিয়েও সংশয়ের অস্ত নেই। এগুলির বিশ্লেষণে গভীর দর্শনবোধের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

প্রাচীন ভারত বলতে সাধারণভাবে এক স্বর্ণযুগের চিত্র ভেসে ওঠে। রাজা-রানী, ধনসম্পদ, বিস্তুপ্রাচুর্যের বিবরণ মিলিয়ে অনেকটা

রূপকথার কল্পরাজ্যের মতো। সেই ‘মিথ’-কে ভেঙে দেন সুকুমারী ভট্টাচার্য। আমাদের বুঝতে সাহায্য করেন অবিরাম যুদ্ধবিগ্রহ কেবল ক্ষত্রিয় শৌর্যের কাহিনী ছিল না, যুদ্ধ ধ্বংস করতো রাজনৈতিক ও সমাজজীবনকে। একালের মতো সেকালেও নারী ও শিশু যুদ্ধের ফলে আরো বিপদগ্রস্ত হত। ধর্মীয় আধ্যাত্মিক সাহিত্য প্রধানত পুরুষ, ব্রাহ্মণ পুরুষের দ্বারা রচিত বলে বৌদ্ধ সাহিত্যের আগে অন্যকণ্ঠগুলি, নারীসহ দরিদ্র শূদ্র কৃষক-কারিগরের কণ্ঠ প্রাস্তিক হয়ে গিয়েছিল। সেকালেও ক্ষুধা ছিল, খাদ্যাভাব-দুর্ভিক্ষ-রোগ-মহামারী ছিল। ‘বেদের যুগে ক্ষুধা ও খাদ্য’ নামে একটি বইয়ে প্রসঙ্গটি উত্থাপন ও বিশ্লেষণ করলেন সুকুমারী ভট্টাচার্য। জন্মভূমিকে আবেগসর্বস্বতায় ‘সকল দেশের রানি’ বলতে রাজি ছিলেন না তিনি। হয়ত তাই ‘সার্থক জন্ম আমার’ তাঁর প্রিয় গানগুলির অন্যতম যেখানে কবি সংশয় প্রকাশ করেছেন, ‘জানি নে তোর ধনরতন আছে কি না রানির মতন’; তবু সে দেশের ছায়ায় যে তাঁর অঙ্গ পুড়াত সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

ইতিহাস মানে মহিমাম্বিত যুগকীর্তন নয়। তাকে জীবনের বাস্তবতার কণ্ঠিপাথরে যাচাই করে নিয়েছিলেন বলে তাঁর সম্মাননাগ্রন্থের নাম হয় “India and Indology Past Present and Future”— বর্তমানে দাঁড়িয়ে অতীতচর্চার সঙ্গে ভবিষ্যতের এক সার্থক সেতু রচনা করেছিলেন সুকুমারী ভট্টাচার্য।

তনিকাদি এক ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় আমাকে একবার বলেছিলেন, যাটের দশকের মাঝামাঝি সময়ে, তাঁর সামনে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা, তখন দীর্ঘ সময় নিষ্প্রদীপ থাকত শহর—যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসনেও আলো থাকতো না। ব্যক্তিগত বিলাসের আশ্রয় নেননি তাঁর মা—মেয়েকে নিয়ে চলে যেতেন যাদবপুর স্টেশনে। সমষ্টির মধ্যে অবস্থান করে সমাধান খোঁজার এ দৃষ্টান্তও অনন্য। বিদ্যাসাগর সত্যিই রাত্তার গ্যাসের আলোয় পড়াশোনা করেছিলেন কি-না এ প্রশ্ন অবাস্তব। বাঙালির জীবনে জ্ঞান অন্বেষণের একটি প্রতীক হয়ে গিয়েছে এই কাহিনিটি। যাদবপুর স্টেশনে বহুজনের মাঝে সুকুমারী ভট্টাচার্যের কিশোরী কন্যার কতখানি মনোরঞ্জন হত, তার থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, প্রতীকটি এভাবেই প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে বাহিত হয়। সেই আলোকবর্তিকার কণাটুকুও যদি আমার জীবনে বহন করে পরবর্তী প্রজন্মে সঞ্চারিত করতে পারি, সেটাই হবে তাঁর পাণ্ডিত্য, রচিবোধ ও জীবনদর্শনের প্রতি সার্থক তর্পণ।

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

সার্বিক স্বাস্থ্যবিধান প্রকল্পে সুলভ মূল্যে শৌচাগার গড়ে ব্যবহার করুন

খানো গ্রাম পঞ্চায়েত

(গলসী-২ পঞ্চায়েত সমিতির অধীন)

খানা জংশন, গলসী, বর্ধমান

জয়ন্তকুমার চ্যাটার্জি
উপ-প্রধান

জয়ন্তী রায়
প্রধান

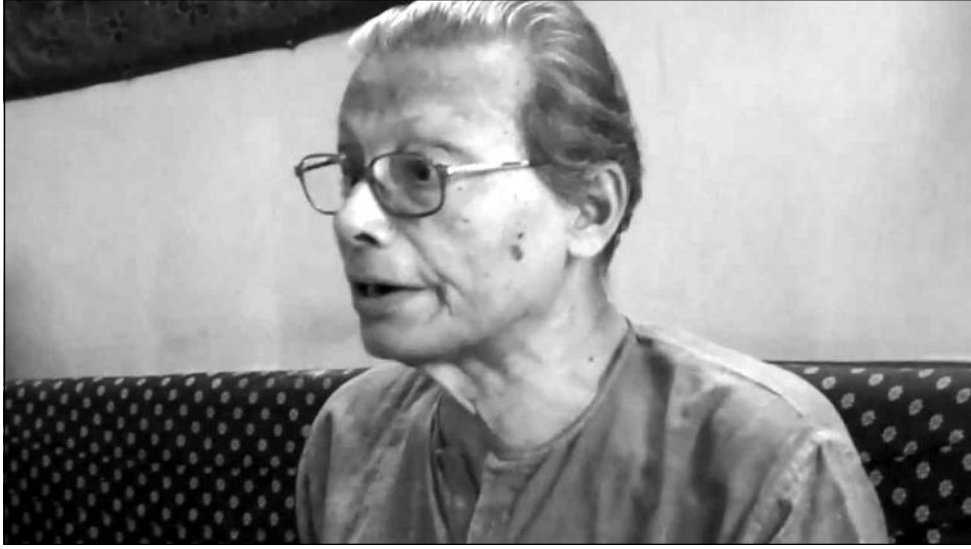
Sl. No. 194

W I T H B E S T C O M P L I M E N T S O F

WORMS & INSECTS CONTROL

27, G. T. Road, Lower Chelidanga, Asansol-4
Phone : 9333109597

Sl. No. 102



ঐতিহাসিক অমলেন্দু দে (১৯৩০-২০১৪)

সম্প্রতি প্রয়াত হলেন ঐতিহাসিক অধ্যাপক অমলেন্দু দে (১৬.৫.২০১৪)। অধ্যাপক অমলেন্দু দে-র জন্ম অধুনালুপ্ত অবিভক্ত বঙ্গের বর্তমান স্বাধীন বাংলাদেশ-রাষ্ট্রের মাদারীপুরে (২ জানুয়ারি, ১৯৩০)। বাবা গোপাল চন্দ্রের প্রথম পক্ষের দ্বিতীয় সন্তান তিনি। তাঁর সাত বছর বয়সে মা ফুলকুমারীর অকালমৃত্যু হয়। বাবা ছিলেন মাদারীপুর নিম্ন আদালতের মোজ্জার। অমলেন্দুবাবুর প্রারম্ভিক শিক্ষা মাদারী ইংলিশ হাইস্কুলে। ১৯৪৬ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে কলকাতায় আই-এ পড়তে আসা। রিপন কলেজে ভর্তি হলেও শেষ পর্যন্ত ১৯৪৮ সালে সিটি কলেজ থেকে আই এ পাশ। ১৯৫১ সালে ঐ কলেজ থেকে বি এ পাশ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে ভর্তি। ১৯৫৩ সালে এম এ পাশ করেন। ছাত্রজীবনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসাবে যাদের সান্নিধ্য লাভ করেন তাঁরা হলেন—ত্রিপুরারি চক্রবর্তী, নরেন্দ্র কৃষ্ণ সিংহ, শিবপদ সেন, প্রতুল চন্দ্র গুপ্ত, অনিল চন্দ্র ব্যানার্জী প্রমুখ।

এম এ পাশ করার পর ১৯৫৪ সালে উলুবেড়িয়া কলেজে ইতিহাস বিভাগে প্রভাষক হিসাবে যোগদান করেন যুবক অমলেন্দু। ঐ কলেজ থেকে ১৯৫৯ সালে দক্ষিণ কলকাতার মুরলীধর মহিলা মহাবিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে যোগদান করেন। ১৯৬৩ সালে কলেজের অধ্যাপনা থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে যোগদান। একটানা ৩২ বছর অধ্যাপনার পর ১৯৯৫ সালে গুরু নানক অধ্যাপক অমলেন্দু দে-র অবসর গ্রহণ। তাঁর দীর্ঘ অধ্যাপনা জীবনে বহু ছাত্র-ছাত্রীকে তৈরি করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে প্রায় ২৭ জন ছাত্র-ছাত্রী গবেষণা সন্দর্ভ পেশ করে উপাধি লাভ করে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত অবস্থায় অধ্যাপক দে ডি-লিট গবেষণা সন্দর্ভ পেশ করেন এবং উপাধি লাভ করেন (১৯৭৭)। কলকাতার বহু গবেষণা সংস্থার সাথে নিবিড় ভাবে যুক্ত ছিলেন—যথাক্রমে এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা হিস্টোরিক্যাল

সোসাইটি, ইনস্টিটিউট অব হিস্টোরিক্যাল স্টাডিজ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা অ্যাকাডেমি ইত্যাদি। এছাড়া ‘স্ক্রু—স্বত্ৰ ঙ্গথস্ট থ=ত্ৰা ঙ্গন্থস্ট্র=ঠ’ ও ‘ইতিহাস’ পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য হিসাবে কাজ করেছিলেন। ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের ১৯৯৪ সালে আলিগড়ে অনুষ্ঠিত অধিবেশনে আধুনিক ভারতীয় ইতিহাস শাখার সভাপতিত্ব করেন।

তাঁর দীর্ঘ ইতিহাসচর্চা প্রবন্ধের সংখ্যা প্রায় দ্বিশতাধিক। বাংলা ভাষায় প্রকাশিত বই তেইশটি, ইংরেজি ভাষায় বই-এর সংখ্যা তেরটি। এছাড়াও তিনি যদুনাথ সরকার, নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ ও জগদীশ নারায়ণ সরকারের রচনাপঞ্জী সম্পাদনা করেছিলেন। আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্রে যোগদানের জন্য তিনি জাপান (১৯৮৩), পশ্চিম জার্মানি (১৯৮৬), চীন (১৯৮৩ ও ১৯৮৭), বাংলাদেশ (১৯৭৩, ১৯৮৬ ও ১৯৯৬) ভ্রমণ করেন।

ঐতিহাসিক অমলেন্দু দে-র দীর্ঘ ইতিহাস গবেষণার পাঁচটি দিক স্পষ্ট হয়—১। জীবনীমূলক রচনা, ২। ভারতের জাতীয় সংগ্রামের ইতিহাস, ৩। ভারত ও ইসলাম, ৪। ভারত উপমহাদেশের বিভক্তির, ৫। অন্যান্য বিষয়।

তিনি একজন সদর্থক ইতিহাস গবেষক, যিনি নির্মোহ মনে সঠিক তথ্যের বিশ্লেষণে প্রয়াসী ছিলেন।

অধ্যাপক দে-র রাজনৈতিক জীবনের সংস্পর্শে আসা ছোট্ট বেলায় মা ফুলকুমারীর ছত্রছায়ায়। কমিউনিস্ট স্বৈচ্ছাসেবকদের সান্নিধ্যে বাম রাজনীতির প্রথম পাঠ। দুর্ভিক্ষের সময় ছাত্র অমলেন্দুর লঙ্গরখানা পরিচালনা এক বিশেষ দিক। কলকাতায় ছাত্রাবস্থায় বাম আদর্শের একান্ত সেবকে পরিণত হয়েছিলেন—যা আমৃত্যু বজায় ছিল। হয়ত কোনো কোনো বিষয়ে মতভেদ ছিল, কিন্তু বামপন্থাকেই জীবনের মূলমন্ত্র হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন—যা বজায় ছিল জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত।

With best compliments of

DURGAPUR CONSTRUCTION

MECHANICAL, STRUCTURAL & PIPE LINE CONTRACTOR

J.P. Avenue, Durgapur-713211, Dist. Burdwan

Sl. No. 124

সাম্প্রদায়িকতা—ধর্মের রাজনৈতিক রূপ

মইনুল হাসান

সাম্প্রদায়িকতার সমস্যা নিয়ে আমরা বহু বহু কাল ধরে ভুগছি। স্বাধীনতার এতগুলো বছর পরেও কোনো পরিব্রাণ নেই। কিন্তু আমরা বেশ আধুনিক হয়েছি বলে নিজেদের মনে করি। কিন্তু মনের কোনো গোপন কুঠুরিতে লুকিয়ে রাখি পঞ্চদশ শতাব্দীর ক্লেদান্ত চিন্তাটি। এখন এই লেখাটা তৈরির সময়েই দেশের নানা প্রান্তে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চলছে। উত্তরপ্রদেশ এবং আসাম বিগত ৩/৪ বছর ধরে ক্রমাগত উত্তপ্ত থেকেছে। আসামে লক্ষ লক্ষ ভারতীয় মুসলমান বাড়ি ঘর ছেড়ে অস্থায়ী আস্তানায় যেতে বাধ্য হয়েছে। মারা গেছে শতাধিক। উত্তর প্রদেশে বিগত ২ বছরে ২৫টা দাঙ্গা হয়েছে। সবচাইতে বড় দাঙ্গা হয়েছে মুজফ্ফর নগরে। এখনও সেটা শান্ত হয়নি। কোনো কোনো জায়গায় দেখা মাত্র গুলি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পুলিশকে। সম্প্রতি দেশে লোকসভার ষোড়শ নির্বাচন হয়ে গেল। বিজেপি ৩১ শতাংশ ভোট পেয়ে এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে সরকার গড়েছে। এই দলটির শাসনকালে গুজরাটে ২০০২ সালে দাঙ্গা নয়, একতরফা হত্যাকাণ্ড হয়েছে। সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে আমাদের মাথা হেঁট হয়ে গেছে। দেশের সবচাইতে প্রাচীন সৌধগুলির অন্যতম বাবরি মসজিদ তারা ধ্বংস করেছে। যাঁরা আজ মন্ত্রী ও নেতা তাঁদের অনেকেই সেই ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। অনেকের নামে এখনও এ ব্যাপারে মামলা চলছে। ভারতে ‘হিন্দুত্ব’ কায়ম করা এই দলটির অন্যতম প্রধান লক্ষ্য।

পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনী প্রচারে বিজেপি এই সাম্প্রদায়িক প্রচার করে। এ রাজ্যের মানুষ বরাবরই প্রগতির পক্ষে। নানা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে মানুষ পরীক্ষিত হয়েছে। অনেক কিছুকে এ রাজ্যের মানুষ সহ্য করেছে। কিন্তু সাম্প্রদায়িক শক্তিকে দৃঢ় হাতে মোকাবিলা করেছে। এটা রাজনীতি নির্বিশেষে করেছে। কেউ কেউ কোনো সময়ে ‘নরম সাম্প্রদায়িক’ মনোভাব দেখালেও শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি থেকেছে গণতান্ত্রিক মনোভাবের পক্ষে। সেই কারণেই সাম্প্রদায়িক দলগুলির কোনো প্রতিনিধি পশ্চিমবঙ্গে থেকে বিধানসভায় নেই। দু-এক বার বিজেপির প্রতিনিধি ছিল। দীর্ঘদিন মুসলিম লীগের অনেক সদস্য ছিল। আজ ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও কেউ জেতে না। মুর্শিদাবাদ-মালদা’র মতো মুসলমান মানুষ অধ্যুষিত এলাকাগুলো থেকে মুসলিম লীগ কোনো প্রতিনিধি তো দূরের কথা ভোটও প্রায় পায় না বললেই চলে। এবার লোকসভা নির্বাচনের প্রচার পশ্চিমবঙ্গে অন্য মাত্রায় হয়েছে। বিজেপি’র পক্ষ থেকে সরাসরি সাম্প্রদায়িক প্রচার করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে সরকারি দল এক্ষেত্রে আবার খানিকটা নরম সাম্প্রদায়িকতাকে ভিত্তি করে অস্ত্রীল প্রচার করে। বামপন্থীরা তাদের নীতিগত অবস্থান থেকে সরে আসেননি। সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াইতে বামপন্থীরা

সবসময়ই সামনের সারিতে থেকেছে—সংসদের ভিতরে এবং বাইরে। পশ্চিমবঙ্গে বর্তমান সরকারি দল এবং তার মুখ্যমন্ত্রী বিজেপি’র সঙ্গে দীর্ঘদিন জোট করে সরকার চালিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গে জোট করে নির্বাচন লড়েছেন। গুজরাটে বিজেপি সরকার হলে নতুন সরকারের মুখ্যমন্ত্রীকে অভ্যর্থনা করে নেত্রী ফুল পাঠিয়েছেন—সবই এ রাজ্যের মানুষ জানেন। অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার হলো যে বামপন্থীরা চিরদিন সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে এসেছে তাদের ভোটের অংশ থেকেই অন্যদিকে ভোটটা গেছে বেশি। এটা ঠিক ১ হাজারের বেশি বুথে বামপন্থীদের ভোট দিতে দেওয়াই হয়নি। ভোটের আগে এবং ভোটের দিনে বামপন্থী কর্মীরা সন্ত্রাসের মধ্যে থেকেছেন। শহিদ হয়েছেন। তবুও এটা ঠিক যে অনেক ঐতিহ্যবাহী এলাকাতেও বামপন্থীদের ভোট ক্ষয় নজরে পড়েছে। এর বাস্তবসম্মত বিশ্লেষণ বামপন্থীদেরই করতে হবে। ভোটের পরে, ফলাফলের পরে অনেকেই বলেছেন সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে বামপন্থীদের প্রচার মানুষের মনে দাগ কাটেনি। আমি আর একবার উল্লেখ করবো সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে প্রচারে বামপন্থীরা সবসময় দৃঢ় থেকেছে। ভোটের হিসাবে এই প্রচারের মাত্রা ঠিক করেনি বা কোনো সাময়িক লাভের জন্য এ প্রসঙ্গ তাদের কর্তব্য ঠিক করেনি। সবসময়ই নীতিগত অবস্থান নিতে চেয়েছে। আর সাম্প্রদায়িকতার সমস্যা একদিনে তৈরি হয়নি। একদিনে শেষ হবে না। এর বিরুদ্ধে লাগাতার সংগ্রাম চালাতে হবে। প্রাত্যহিক জীবন চর্চা থেকে শুরু করে সমস্ত ক্ষেত্রেই সেটা করতে হবে।

|| ২ ||

সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে তাত্ত্বিক আলোচনার চাইতে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের অভিজ্ঞতাগুলিকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া জরুরি কাজ হবে। সমস্যাটি যে একাধিক সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ ও বিদ্বেষের সমস্যা তা শব্দটি দেখলেই বোঝা যায়। এইখানে অবধারিত ভাবে চলে আসে ধর্মের কথা। সম্প্রদায় অথবা সম্প্রদায়গুলির ধর্মবিশ্বাস-এর কথা। কিন্তু একই সম্প্রদায়ের মধ্যেও যে এই সমস্যা হতে পারে অনেক সময় আমরা খেয়াল করি না। ধর্মের কারণ ছাড়াও যে সংঘাত হতে পারে সেটা ভুলে থাকতে পছন্দ করি।

একটা সম্প্রদায় আর একটি সম্প্রদায়ের প্রচলিত বিশ্বাস, আচার-আচরণ, অবস্থান, জীবনপ্রণালী, বাসস্থান, রাজনৈতিক বিশ্বাস, আর্থ-সামাজিক অবস্থান মেনে নিতে পারছে না—সুতরাং তাদের আঘাত করো, নিশ্চিহ্ন করো অথবা অধস্তন করে রাখো। পুরো ঘটনার পিছনে থাকে অসহিষ্ণুতা, অন্যের প্রতি অমর্যাদা

প্রদর্শন, নিজেদের অবস্থানকে বড় করে দেখানো আর অগণতান্ত্রিক আচরণ। সংঘাত অনিবার্য। এটাইতো সাম্প্রদায়িকতা। এবার আমাদের স্বাভাবিক অভিজ্ঞতা হলো সংঘাতটা হবে তাদের মধ্যে যারা ধর্মবিশ্বাসে আলাদা। আর একটু এগুলো ধরে নেওয়া হবে দু'পক্ষের একটা পক্ষ মুসলমান আর একটা পক্ষ হিন্দু। তাহলেই দাঙ্গা। পুরো বৃত্তটা এবার পূর্ণ হলো।

বিষয়টা কিন্তু অসম্পূর্ণ থেকেই গেল। একটু ভালোভাবে নজর করলেই সেটা ধরা পড়বে। হিন্দু-মুসলমানে সাম্প্রদায়িকতা হবে এটাই তো আমাদের কাছে জানাশোনা। কিন্তু একই সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘাত কম হয়নি বা হচ্ছে না। মুসলমানদের মধ্যে শিয়া-সুন্নিদের মধ্যে দাঙ্গা অতি পরিচিত ঘটনা। শুধুমাত্র মধ্যপ্রাচ্যে নয়, ভারতের মধ্যে, পাকিস্তানে এই সংঘাত অহরহ। পাকিস্তানে শুধু শিয়া-সুন্নি নয়, সুন্নি এবং কাদিয়ানীদের মধ্যে সংঘাত বাড়ছে। যদিও কাদিয়ানীদের সঙ্গে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই বলে পাকিস্তান ঘোষণা করেছে। হিন্দুদের মধ্যেও এই সংঘাত অপ্রতুল নয়। উচ্চবর্ণ এবং নিম্নবর্ণের মধ্যে সংঘাত। অস্পৃশ্যতা এর একটা বড় কারণ। শিখরাও হিন্দু। কিন্তু হিন্দু-শিখে সংঘাত কম হয়নি। হিন্দু এবং বৌদ্ধদের মধ্যে সংঘাতের কথা আমাদের ভুলে গেলে চলবে না। হিন্দুদেরই একটা অংশ বৌদ্ধরা। হিন্দুরা এমন অত্যাচার করলো যে তারা বনে-জঙ্গলে পালিয়ে গেল। একটা অংশ ধর্ম পাল্টে মুসলমান হয়ে গেল। শিখদের নিজেদের মধ্যে সংঘাত প্রচণ্ড। যাদের পাগড়ি আছে আর যাদের নেই। খ্রিস্টানদের মধ্যে ক্যাথলিক এবং প্রটেস্ট্যান্টদের মধ্যে সংঘাত সর্বজনবিদিত। ভাষা, বর্ণ ইত্যাদি কারণেও দাঙ্গা হয়। বর্ণবিদ্বেষবাদ সারা পৃথিবীর একটি বড় সমস্যা হিসাবে দেখা গেছে। ভাষা নিয়ে দাঙ্গা হয়েছে, আমাদের পাশেই একটি নতুন রাষ্ট্র হয়ে গেছে একারণেই। আমাদের দেশে আসামের শিলচরে একসময় বড় দাঙ্গা হয়েছে। অনেকে প্রাণ দিয়েছেন। এখনও ঝাড়খণ্ডে বাংলাভাষীরা তাদের মাতৃভাষার অধিকারের জন্য লড়াই করে যাচ্ছেন। সুতরাং দাঙ্গাও সবসময়ে ধর্মের কারণে হয় না। সাম্প্রদায়িকতার পিছনে ধর্মের একটা বড় ভূমিকা আছে। কিন্তু একমাত্র ভূমিকা নয়। একথা প্রমাণিত হয়েছে বার বার যে সাম্প্রদায়িকতার জন্য বা দাঙ্গার জন্য ধর্মকে ব্যবহার করা হয়েছে। কোনো ধর্ম কি দাঙ্গা করতে বলেছে? সব ধর্ম তো শান্তির কথা বলে। তাহলে দাঙ্গা হয় কেন? ধর্ম তো সমাজে কোনো কোনো সময়ে প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করেছে। খ্রিস্টধর্ম একসময় আবির্ভূত হয়েছিল নিপীড়িতের কণ্ঠস্বর হিসাবে। ইসলাম ধর্ম আবির্ভূত হয়েছিল মধ্যপ্রাচ্যে অন্ধকারের রাজ্য থেকে আলোর উদ্ভব ঘটানোর জন্য। হিন্দু ধর্ম যখন ব্রাহ্মণ্যবাদের অত্যাচারে জর্জরিত, শ্রী চৈতন্যের আবির্ভাব সাধারণ মানুষের কণ্ঠস্বর হিসাবে। কাজেই ধর্ম সব সময় বা এককভাবে দাঙ্গায় মানুষকে প্ররোচিত করবে এটা হতেই পারে না। তাহলে সাম্প্রদায়িকতার পিছনে ধর্মের যোগাযোগের কথা বলা হচ্ছে কেন?

একমসয় পূর্ববাংলার কয়েকটি জেলা রংপুর, রাজশাহী, কুষ্টিয়া, যশোর এবং পশ্চিমবাংলার নদীয়া, বধমান জেলাগুলি দাঙ্গাপ্রবণ ছিল। তখন দেশ স্বাধীন হয়নি। সংঘাতের পিছনে ছিল ভূমি-সম্পর্ক। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে মুসলমানরা জমিহারা হয়েছিল। নতুন জমিদার তৈরি করেছিল ইংরাজ সরকার। এই জমিদাররা বেশিরভাগই ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের। প্রজারা ছিল প্রায় সকলেই মুসলমান। কারণ ইতোমধ্যে তারা ইংরেজ সরকারের কয়েকটি সিদ্ধান্তের ফলে বহু পিছনে পড়ে গেছে। প্রথমত কাজির বিচারের দিন শেষ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। ফলে একটা বড় অংশের মুসলমান প্রশাসন এবং বিচারব্যবস্থা থেকে বিচ্যুত হয়ে

পড়ে। দ্বিতীয়ত, ফার্সিকে সরকারি দপ্তর থেকে বিদায় দেওয়া হলো। মুসলমানরা অভিমানে এবং বিদেশি বলে ইংরেজি শিখেনি। বিভিন্ন সরকারি দপ্তর থেকে মুসলমানদের বিতাড়ন শুরু হলো। দু'টো সিদ্ধান্তই হয়ত সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে একদিন না হয় একদিন নিতে হতো। কিন্তু সেই সময় এটা মুসলমান সমাজের বিরাট ক্ষতি করে দেয়। মুসলমান সমাজের মধ্যে অশিক্ষার পরিমাণ বেড়ে যায়। সুতরাং মুসলমান সমাজ জমি আঁকড়ে ধরে। আবার সে জমিও তার নিজের নয়, হিন্দু জমিদারের। খেতমজুর, বর্গদার, আখিয়ার হিসাবে মুসলমান সমাজ আত্মপ্রকাশ করে। সুতরাং নিম্নবর্ণের মানুষদের দৈনন্দিন জীবনের আর্থিক সমস্যাগুলো নিয়ে লড়াই হবে, দাবি উচ্চারিত হবে। সে দাবি হবে জমিদারের কাছে। এই লড়াইগুলোকে নষ্ট করা হয়েছে জমিদারের কড়া লেঠেল বাহিনী মারফৎ। শুধুমাত্র সেটাই নয়। ধর্মকে ব্যবহার করা হয়েছে। আসলে যা ছিল শ্রেণি আন্দোলন সেটা পর্যবসিত হয়েছে দাঙ্গার আগুনে। জমিদার বেঁচে গেছে। মরেছে গরিব মানুষ। গরিব এই মুসলমানদের মধ্যে কয়েকজন নিশ্চয় থেকেছে জমিদারদের বশব্দ হয়ে। মূল কাজটা তারাই করেছে। খুব সম্প্রতি মুজফ্ফর নগর (উত্তরপ্রদেশ)-এ যে সংঘাত হয়েছে, ১০০-র বেশি মারা গেছেন, তার পিছনেও কাজ করছে ভূমি-সম্পর্ক। আসামে যে মুসলমানরা দেশছাড়া হচ্ছে এবং খুন হচ্ছে সেটার প্রধান কারণ হলো মুসলমান মানুষদের জমিজমা দখল করা। একমসয় এই বোড়োলাণ্ড এলাকায় আদিবাসী মানুষের বাস ছিল। তাদের মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে। তারা যে-সমস্ত শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিয়েছিল সেগুলোই তাদের স্থায়ী বাসস্থান হয়ে গেছে। ফিরে যেতে পারেনি নিজের জমিতে বা ঘরে।

শুধুমাত্র কৃষক নয়—শহর বা শহরতলির ক্ষুদ্র শিল্পশ্রমিকদের মধ্যেও একইভাবে দাঙ্গা বাধানো হয়েছে। ভারতে মোরাদাবাদ খুবই সুন্দর একটি শহর। পেতলের বাসনপত্র এবং তার উপর কারুকার্য তৈরি করার পৃথিবীবিখ্যাত একটি কেন্দ্র। ঘরে ঘরে শ্রমিকরা এই কাজ করেন। সবাই ধর্ম বিশ্বাসে মুসলমান। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে থেকে শ্রমিকরা এখানে গিয়ে ভিড় করেছে। কিন্তু এই এলাকায় শ্রমিকদের দাদন দিয়ে ব্যবসাটা চালায় যারা তারাই আসল মালিক এবং তারা বেশিরভাগই হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ। মজুরি, কাঁচামালের দাম, তৈরি মালের দাম ইত্যাদি নিয়ে গণ্ডগোল চলেই। আসলে সমস্যাটা হলো মালিক এবং শ্রমিকের মধ্যে। কিন্তু এই শ্রেণিবিরোধকে শেষকালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হিসাবে চালিয়ে দেওয়া হলো।

প্রকৃত ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতা কতখানি যুক্ত সেটা আমাদের গভীরে গিয়ে দেখতে হবে। ধর্মীয় বিশ্বাস ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত—উভয়ই। কোনো মানুষ নিজের ধর্মকে ভালোবাসবেন সেটার মধ্যে কোনো অস্বাভাবিকতা নেই। আমার ধর্মের প্রতি ভালোবাসা যখন অন্যের ব্যক্তি অধিকার এবং তাঁর ধর্ম পালনে অন্তরায় হবে, অত্যন্ত সহজ ভাষাতে সেটাই সাম্প্রদায়িকতা। সুতরাং কোনো ধর্মপ্রাণ মানুষকে এককথায় মৌলবাদী বা সাম্প্রদায়িক আখ্যা দেওয়া যায় না। আমার মা অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ। নিয়মিত আচার অনুষ্ঠান পালন করেন। কিন্তু তিনি চান জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সবাই ভালো থাকুক। তাঁর এবং তাঁর কারও দ্বারা অন্যের ক্ষতি হোক সেটা চান না। মসজিদে যখন আজান পড়ে তখন তিনি মাথায় কাপড় তুলে দেন। আবার শহরে তিনি যখন থাকেন, মন্দিরে আরতি হতে দেখলে মাথায় কাপড় তোলেন। তিনি ধর্ম অন্ত প্রাণ। আমার মাকে কি সাম্প্রদায়িক বলবো? অথবা মৌলবাদী? সব ধর্মই সহনশীলতার কথা বলে। অন্য ধর্ম প্রসঙ্গে সহনশীলতার অভাব হলেই সেটা সাম্প্রদায়িকতা হবে। এই প্রসঙ্গে

বহুকাল ধরে চলে আসা একটা ভুল ধারণা সম্পর্কে একটু অবহিত হওয়া দরকার। একই ধর্মে বিশ্বাস করলেই সকলের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক স্বার্থ এক হয় না। যদি কেউ এটা মনে করে তবে তাকে মৌলবাদী নামেই এবং সাম্প্রদায়িক পাণ্ডা বলে অভিহিত করতে হবে। মুসলমান বা হিন্দু খেতমজুর ও মুসলমান বা হিন্দু জমিদারের স্বার্থ এক নয়। মুসলমান শ্রমিক বা হিন্দু শ্রমিক, মুসলমান বা হিন্দু মালিক দ্বারা চূড়ান্তভাবে শোষিত। এখানে ধর্মের অভিন্নতা শোষণের মাত্রায় হেরফের ঘটায় না। এখানে শ্রেণি সম্পর্কের বিষয়টি জোরের সঙ্গে উত্থাপিত হয়।

ভারতে তো এর চূড়ান্ত উদাহরণ আছে। ১৯৪৭ সালে দেশ তো মূলত ভাগ হয়েছে ধর্মের ভিত্তিতে। ভারত এবং পাকিস্তান। পাকিস্তানের আবার দু'টো খণ্ড ছিল পূর্ব ও পশ্চিম। এই দুই খণ্ডের বেশিরভাগ মানুষই মুসলমান। তারা আবার ভাগ হয়ে আলাদা রাষ্ট্র হয়ে গেল। ধর্ম তাদের এক জায়গায় বেঁধে রাখতে পারলো না। বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে সাহায্য করলো ভাষা এবং সংস্কৃতি। সুতরাং প্রমাণিত হচ্ছে ধর্ম এক হলেই স্বার্থ এক হবে, আর কোনো ঝামেলা থাকবে না তা নয়। ইরান এবং ইরাক বছরের পর বছর প্রাণঘাতী যুদ্ধে লিপ্ত থেকেছে। এখনও মূল সমস্যার সমাধান হয়নি। দু'টো রাষ্ট্রেরই ঘোষিত ধর্মের নাম ইসলাম। তাহলে একসঙ্গে থাকা, একভাবে চিন্তা করা, একপথে চলা ধর্মের বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে না।

এই সময়ে সারা পৃথিবী জুড়ে মৌলবাদীদের শ্লোগানের মধ্যে এটাও প্রধান যে ধর্মের নামে পরিচিত হও। মুসলিম ব্রাদারহুড সেই কথারই প্রচারক। পৃথিবী ব্যাপী বিভিন্ন মুসলমানদের সংগঠন এর দ্বারা প্রভাবিত। যারা সরাসরি রাজনীতি এবং রাষ্ট্র ব্যবস্থাতে হস্তক্ষেপ করতে চায় এবং নিজেদের মতো করে পৃথিবীর ভারসাম্যের ব্যাখ্যা দিতে চায়। যা কোনমতেই সহনশীল, গণতান্ত্রিক, ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে মিলিতে পারে না। ভারতে স্বঘোষিত হিন্দুত্ববাদী সংগঠন গড়ে উঠেছে। অনেকে আবার হিন্দুধর্ম এবং হিন্দুত্ব সমর্থক মনে করেন। হিন্দুত্ব আসলে একটা রাজনীতি। হিন্দুত্ববাদ নামে যে সংগঠিত রাজনীতিকে বিদ্যালয়, মন্দির সেবা প্রতিষ্ঠান সংস্কৃতি কেন্দ্র, গণমাধ্যম ইত্যাদির মধ্য দিয়ে কাজ করতে দেখা যাচ্ছে তার কেন্দ্রে আছে দু'টি মূল চিন্তা। প্রথম, ভারত হিন্দুদের দেশ, হিন্দু সংস্কৃতি হলো ভারতীয় সংস্কৃতির একমাত্র পরিচয়। দ্বিতীয়, হিন্দু ধর্মের বাইরে যা ধর্ম, সংস্কৃতি, জনগোষ্ঠী আছে তা সঠিক অর্থে ভারতীয় নয়, এমনকি তা ভারত-বিরোধী। দেশের অন্য সমস্ত সাংস্কৃতিক ইতিহাস অবাস্তব অথবা বিপজ্জনক। দু'টো কারণেরই মূলে রয়েছে অসহিষ্ণুতা। যার পরিণতি সাম্প্রদায়িকতা। প্রকৃত অর্থে খুব সংক্ষেপে বলতে গেলে সাম্প্রদায়িকতা হলো ধর্মের রাজনৈতিক রূপ।

মানুষ নানা পরিচয়ে সমাজে বসবাস করে। এইরকমই একটি পরিচয় ধর্মীয় পরিচয়। যা আমাদের দেশের বেশিরভাগ মানুষের কাছে সবসময় একটি অতি মূল্যবান সত্তা। সবসময়ই ব্যক্তি ও সমষ্টি কেন্দ্রিক। অর্থাৎ সব ধার্মিক ব্যক্তি বিশেষের একটি আভ্যন্তরীণ ধর্মচিন্তা বা চেতনা থাকে, তাছাড়াও ধর্মের একটা বৃহত্তর সমষ্টিবদ্ধ আনুষ্ঠানিক ও সংগঠিত জীবন আছে। সেখানে এক ধর্মের সঙ্গে অন্য ধর্মজীবনের কিছু মৌলিক ফারাক থাকেই, বিশ্বাসে ও ব্যবহারে। যখন সমষ্টিবদ্ধ, প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মজীবন পারস্পরিক ফারাকগুলি সম্বন্ধে বিশেষভাবে অবহিত হয়ে ওঠে, তখনই তাকে সাম্প্রদায় চেতনা বলা যায়, অর্থাৎ একটা বড় গোষ্ঠীর মধ্যে কিছু মৌলিক যোগসূত্র এবং একই সঙ্গে অন্য গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে মৌলিক ফারাক, এই চেতনা।

এই ভেদভাবকে সাম্প্রদায়ভিত্তিক চেতনা বলা যায়, কিন্তু এই চেতনা ও সাম্প্রদায়িকতা সমার্থক নয়। সাম্প্রদায়িকতা তখনই মাথা তোলে যখন আমরা মনে করি যে যা কিছু আমাদের থেকে অন্যরকম তা দুষণীয়। তা আমাদের শত্রু, তার সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে না। তার শক্তি যদি বাড়ে তাহলে তা আমাদের পক্ষে বিপজ্জনক এবং আমরা যদি ক্ষমতা পেতে চাই তাহলে তাদের নাশ করতে হবে। অর্থাৎ যখন আমরা বিভিন্নতাকে ভয় পাই, ঘৃণা করি, বিপদ বলে মনে করি, তখনই সাম্প্রদায়িক চেতনা জন্ম নেয়। এবং এই চেতনার একটা বিশেষ দিক হলো যে জন্মেই তা ঘোষণা করে যে পারস্পরিক এই শত্রুভাব সর্বাদীণ, চিরন্তন ও বৃহত্তম সত্য।

পরিচিতিসত্তার রাজনীতিতে ধর্মের পরিচয়টি বড় হয়ে ওঠাটাই সাম্প্রদায়িকতার কারণ। সাম্প্রতিককালে সারা বিশ্বব্যাপী এমন পরিচয় মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। এটা কেবল পিছিয়ে পড়া তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির সমস্যা নয়। উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতেও এই সমস্যা এখন দেখা দিয়েছে। জাতিগত বিদ্বেষ থেকে সাম্প্রদায়গত দাঙ্গা তীব্র হয়ে উঠেছে। চিনের উইঘুর প্রদেশের ঘটনা তারই প্রমাণ দিচ্ছে। আবার এমনতর সংঘাত কেবলমাত্র দেশজ কারণে হচ্ছে না। দেশের বাইরের কারণও এর সঙ্গে যুক্ত। সংখ্যালঘু মৌলবাদী সংগঠনগুলির ভারতে কার্যকলাপ এবং সেইহেতু সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট সে কথাগুলো প্রমাণ করছে। ভারত একটা ধর্মনিরপেক্ষ আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত হলেও পার্থক্য নানা কারণে বাড়তে থাকেছে। মুসলিম লীগ, জামাত-ই-ইসলাম, তবলিগ-ই-জামাতের ভূমিকা এতে অন্যতম। সাম্প্রতিককালে যুক্ত হয়েছে ডব্লিউ পি আই, এস ডি পি আই-র মতো সংগঠন, যারা ধর্মের নামে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে, সরাসরি ধর্মের নামে ভোট চাইছে। একজন মুসলমান কেবল একজন মুসলমান। সে অন্য কিছু হতে পারে না। এর সঙ্গে কিছু সম্ভ্রাসবাদী সংগঠন যুক্ত হয়েছে—লস্কর-ই-তৈবা, জইশ-ই-মহম্মদ। এদের সম্ভ্রাসবাদী কার্যকলাপ দেশের পক্ষে অত্যন্ত মারাত্মক। সাম্প্রতিককালের কিছু ঘটনা তার প্রমাণ।

এখানে উল্লেখ্য যে মানুষের সাম্প্রদায় বা ধর্মচেতনাকে সাম্প্রদায়িক হিংসা, দ্বি-জাতিতত্ত্ব ও ধর্মীয় রাষ্ট্রবাদে পরিণত করতে গেলে এক সংগঠিত ব্যাপক সংগঠন ও প্রচারমূলক প্রতিষ্ঠানিক রাজনীতির দরকার হয়। যাঁরা তাঁদের লেখা ও প্রচারের মাধ্যমে সাংগঠনিক কাজের ভিত্তিতে হিংসাত্মক বিভেদের ধারণাকে সৃষ্টি করতে চেষ্টা করছেন আসলে তাঁরা সমাজের, সাম্প্রদায়ের উপরতলার মানুষ—তাঁরা অপেক্ষাকৃতভাবে বিত্তবান, ক্ষমতালালী, প্রভাবশালী মানুষ। তাঁদের চেষ্টা তখনই সক্রিয় হয়ে উঠেছে, যখন সমাজের নিচুস্তর থেকে নিম্নবর্গীয় মানুষ—মহিলা, দলিত, মজুর, রায়ত—নিজস্ব অধিকারের দাবি তুলে সামাজিক বিন্যাসের, স্তরভেদের, বৈষম্য মোকাবিলা করতে চেষ্টা করেছেন।

|| ৩ ||

বিখ্যাত ঐতিহাসিক বিপান চন্দ্র তাঁর 'আধুনিক ভারত ও সাম্প্রদায়িকতাবাদ' গ্রন্থে লিখেছেন, "সাম্প্রদায়িক চেতনা ছড়িয়ে দেওয়ার হাতিয়ার হিসাবে এবং সাম্প্রদায়িক মতাদর্শের একটি মৌলিক অঙ্গ এবং এ মতাদর্শ কর্তৃক সৃষ্ট বস্তু হিসাবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হলো ভারতীয় ইতিহাসের, বিশেষত তার প্রাচীন ও মধ্যযুগের একটি সাম্প্রদায়িক এবং বিকৃত অবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি। বস্তুত এটা অত্যাধিক হতে না যদি বলা হয় যে, ইতিহাসের সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা ভারতীয় সাম্প্রদায়িকতাবাদের প্রধান মতাদর্শ, এবং তা না থাকলে

সাম্প্রদায়িক মতাদর্শের খুব কম অবশিষ্ট থাকবে। একথা বিশেষভাবে হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্য।”

স্কুল-কলেজে যে ইতিহাস পড়ানো হয় তা সাম্প্রদায়িকতা প্রসারে অন্যতম বাহকের কাজ করে। স্কুল শিক্ষার আদিলগ্ন থেকেই ইতিহাস শিক্ষার বিষয়টি সাম্প্রদায়িকতা দোষে দুষ্ট থেকে গেছে। ইতিহাস লেখাই হয়েছে এই দৃষ্টিকোণ থেকে। প্রথমে সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহাসিকরা, পরে অন্যান্যরাও তাই করেছেন। বিষয়টির তীব্রতা এত বেশি যে অনেক স্বাধীনচেতা জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকও সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির অনেক বিষয়কে ভারতীয় ইতিহাসের ‘মৌল’ বিষয় বলে মনে করেছেন, যা কোনো অর্থেই সত্য নয়। মহাত্মা গান্ধি পর্যন্ত বলেছেন, “যতদিন স্কুল ও কলেজে পাঠ্য পুস্তক মারফৎ ইতিহাসের অতিমাত্রায় বিকৃত ভাষ্য শেখানো হচ্ছে, ততদিন আমাদের দেশে স্থায়ীভাবে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়।” লাজপত রাই নিজের বাল্যকাল সম্পর্কে তাঁর আত্মজীবনীতে লেখেন, “সে সময়ে সরকারি স্কুলগুলিতে ‘ওয়াকিয়াত-ই-হিন্দ’ নামে ভারতের ইতিহাসের উপর একটি বই পড়ানো হতো। বইটি আমার মনে এই বোধের জন্ম দেয় যে মুসলমানরা হিন্দুদের প্রতি গভীর নিষ্ঠুরতার সঙ্গে আচরণ করেছিল। বাল্যকালে ইসলামের প্রতি যে শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলাম, ওয়াকিয়াত-ই-হিন্দ পাঠের ফলে ধীরে ধীরে তা ঘৃণায় পরিণত হতে থাকে।”

সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা মধ্যযুগের ভারতীয় ইতিহাসকে হিন্দু-মুসলমান সংঘাতের এক দীর্ঘ কাহিনি হিসাবে দেখে থাকেন। তাদের মতে, হিন্দুরা বা মুসলমানরা স্বতন্ত্র শিবিরে বিভক্ত ছিল এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল তিক্ত, সন্দিক্ত এবং বৈরিতাপূর্ণ। সমগ্র মধ্য যুগ জুড়ে আলাদা হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতি বিদ্যমান। মুসলমানরা একটি স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সম্প্রদায় হওয়ার কারণ ছিল ইসলাম।

মধ্যযুগের মুসলমানরা বিদেশি বলে চিহ্নিত হলেন। ভারতীয় সমাজে তারা বহিরাগত। দেশে চিরস্থায়ী বিদেশি। এটা ধর্মের জন্য। একজন মুসলমান কারণ সে মুসলমান। হিন্দুরা যে মুহূর্তে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলো সঙ্গে সঙ্গে তারা বিদেশি হয়ে পড়লো। অর্থাৎ জাতি বা জাতিত্ব ধর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়লো।

ভারত বিভাগের পর নতুন করে ইতিহাস পঠন-পাঠনের মাধ্যমে ছাত্রদের মনন গঠনের চেষ্টা নেওয়া হয়। একদিকে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে ছাত্রদের মধ্যে ভারতীয় ইতিহাসের মিশ্র সংস্কৃতির রূপটিকে তুলে ধরতে প্রয়াসী হয়, অন্যদিকে হিন্দু মৌলবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাসের বিচ্ছিন্ন ঘটনাবলী আলোচনা করারও প্রয়াস চলে। ১৯৫২ সাল থেকে রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের (আর এস এস) একটি সংস্থা ‘বিদ্যাভারতী’ বিভিন্ন রাজ্যে বিদ্যালয় স্থাপন করে ‘হিন্দুত্ব’ তত্ত্ব প্রচার করে ছাত্রদের মনন গঠন করতে চেষ্টা করে। বিভিন্ন রাজ্যে ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করার পর বিদ্যাভারতীর প্রয়াসকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য সরকারিভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। সরকার পরিচালিত বিদ্যালয়ের ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তক নতুন করে লিখবার জন্য এবং ইতিহাস পঠন-পাঠনে যেসব ‘বিকৃতি’ ঘটেছে তা দূর করার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘকে অনুরোধ করা হয়। বিদ্যাভারতী এই দায়িত্বও গ্রহণ করে। ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দের অ্যাকাডেমিক বছর থেকে নতুন করে লেখা ইতিহাসের পাঠ্য পুস্তক সরকার-পরিচালিত বিদ্যালয়গুলোতে পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ভারতীয় ইতিহাসের কী ধরনের ‘বিকৃতি’ এইসব পাঠ্যপুস্তকে দূর করা হবে তাও বিদ্যাভারতী ও আর এস



এস কর্মকর্তারা প্রকাশ্যেই উল্লেখ করে থাকেন। প্রথমে সংক্ষেপে তাদের কয়েকটি মত এখানে উল্লেখ করা হল : (ক) আর্যরা বাইরে থেকে ভারতে এসে ভারতে বসবাস করে। ঐতিহাসিকদের এই মতই ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু আর এস এস ‘বিশ্বাস’ করে, আর্যরা ভারতের বাসিন্দা। (খ) ইতিহাস গ্রন্থে মুঘল সম্রাট আকবরকে একজন ‘মহান’ শাসক বলা হয়। আর এস এস মনে করে, যেহেতু আকবর ও মহারাণা প্রতাপ সিংহ পরস্পরের রাজনৈতিক শত্রু ছিল, তাই দুজনকেই ‘মহান’ বলা সম্ভব নয়। তবে মহারাণা প্রতাপ সিংহ ‘এই দেশের বাসিন্দা’ ছিলেন আর আকবর হলেন ‘বিদেশি’, তাই এই অবস্থায় মহারাণা প্রতাপ সিংহকেই ‘মহান’ বলা যায়। আকবরকে নয়। তাছাড়া আর এস এস ওরঙ্গজেবের ‘নিষ্ঠুরতা’র ঘটনাও বিশদভাবে উল্লেখ করার পক্ষপাতী। (গ) ভারতের ইতিহাসে ‘বৈচিত্র্যের মধ্যে একতা’ এবং ‘মিশ্র সংস্কৃতির’ রূপটি ঐতিহাসিকরা উল্লেখ করেন। এই মতকেও আর এস এস মানতে অস্বীকার করে। তারা মনে করে, ভারতে ‘এক সংস্কৃতি’ ও ‘এক জাতীয়তাবাদ’ রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ‘ভারতীয় সংস্কৃতি হলো হিন্দু সংস্কৃতি’। (ঘ) আর এস এস মনে করে, ভারত বিভাগে গান্ধিজির ভূমিকা এবং কাশ্মীর গঠনে সর্দার প্যাটেলের ভূল ধারণা ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তকে আলোচনা প্রয়োজন। (ঙ) আর এস এস এই অভিযোগও করে, ‘সংখ্যালঘুদের তোষণ’ করার ‘রাজনৈতিক উদ্দেশ্য’ নিয়ে বিভিন্ন রাজ্যের বিদ্যালয়গুলোতে ছাত্রদের ইতিহাস শেখানো হয়। (চ) আর এস এস থেকে এই সমালোচনাও করা হয়, বর্তমানে বিভিন্ন রাজ্যে প্রচলিত ইতিহাস পাঠ্যপুস্তকগুলোতে বেশিরভাগ অংশই রয়েছে মুঘল আমল ও ব্রিটিশ রাজ সম্বন্ধে, তাতে রামায়ণের সময় থেকে প্রাচীন ভারতের কথা সমান্যই উল্লিখিত রয়েছে। (ছ) ‘হিন্দুত্ব’ জাগ্রত করার জন্য হিন্দু ধর্মের আদর্শ প্রচার করাই মূল উদ্দেশ্য হবে। আর এস এস রামচন্দ্রকে ‘আদর্শ ব্যক্তি’ মনে করে। ভারত কেন ‘হিন্দু জাতি’ এবং ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে রাম জন্মভূমির কী গুরুত্ব, তার বিষয়ে ছাত্র ও শিক্ষকদের সচেতন করার প্রতিও এই দল গুরুত্ব আরোপ করে। ‘ভারতীয় সংস্কৃতি’ সম্বন্ধে শিক্ষাদান করাই তাদের লক্ষ্য। (জ) অবশ্য আর এস এস লিখিত ইতিহাস পাঠ্যপুস্তকে ইসলামের সাফল্য ও খ্রিস্টধর্মের গুণ অস্বীকার করা হবে না। কিন্তু ভারতে ইসলাম ও খ্রিস্টধর্মের নামে যেসব ‘অপরাধ’ করা হয়েছে তা কোনো মতেই লুকোনো হবে না। এতদিন পর্যন্ত ইতিহাস পাঠ্যপুস্তকে বহু তথ্যই গোপন করা হয়েছে। আর এস এস তথ্য গোপন করার বিরোধী। তাছাড়া আর এস এস এও মনে করে, বিতর্কমূলক বিষয়গুলো গালিচার নিচে রেখে দিয়ে জাতীয়তাবাদকে কখনই শক্তিশালী করা সম্ভব হবে না।

(বা) আর এস এস থেকে বলা হয়, দেশের ঐক্য ও সংহতি ভেঙে পড়ছে দেখে তারা উদ্বিগ্ন। কোনো ‘সামাজিক গ্রুপ’ ভারতকে ভাঙতে চেষ্টা করলে তা তারা সহ্য করবে না। তাই শিশুদের ‘জাতীয়তাবাদী’ ও ‘প্রকৃত নাগরিক’ হিসেবে গড়ে তুলতে তারা বন্ধপরিকর। (এ) আর এস এস থেকে এই কথাও বলা হয়, পশ্চিমবঙ্গে ইতিহাস শিক্ষা সম্পূর্ণভাবে ‘বিকৃত’ করে ছাত্রদের ‘পিতৃপুরুষদের’ বিষয়ে না শিখিয়ে বিশ্ব ইতিহাস ও কার্ল মার্কস পড়ানো হচ্ছে।

‘হিন্দু মূল্যবোধ’ ও ‘আদর্শ’ অবলম্বন করে, ‘জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা’ গড়ে তোলার ভাবনা নিয়ে আর এস এস থেকে Alternate Model of Education নামে একটি পুস্তিকাও প্রকাশ করা হয়েছে। যেসব উদ্দেশ্য নিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টি পরিচালিত চারটি রাজ্যে এই বছর থেকে ইতিহাস পঠন-পাঠনে পরিবর্তন সাধন করা হচ্ছে তা উল্লেখ করা হলো। উল্লেখ্য এই, শিক্ষা সম্বন্ধে আর এস এস অনেকদিন ধরেই এই মত প্রচার করেছে। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে নাগপুরে ‘রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ’ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই এই সংগঠন ‘হিন্দু ভারত’ গঠনের তত্ত্ব প্রচার করে। তারা বলে, ‘হিন্দুস্থান কেবলমাত্র হিন্দুদের দেশ’ এবং মুসলমান, খ্রিস্টান ও অন্যান্য জাতি ‘অতিথি’ হিসেবেই এখানে বাস করতে পারে। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে আর এস এস পরিচালক গোলওয়ালকর লিখিত ‘We or Our Nationhood Defined’ গ্রন্থে সঙ্ঘের আদর্শ আরো বিস্তৃত করে আলোচিত হয়। ‘হিন্দু ভারত’ গঠনের উদ্যোগের অনেক আগে থেকেই ‘মুসলমানদের সৌহার্দ্য’ অর্জনের যে প্রয়াস মহাত্মা গান্ধি করেন তাকে ‘তোষণ নীতি’ বলে নিন্দা করেন। সুতরাং উপরে উল্লিখিত ভাবনাগুলো অনেককাল ধরেই ছিল। তবে তা এতদিন পর্যন্ত সংগঠনের সীমানার মধ্যেই ছিল এবং বিদ্যাভারতী পরিচালিত বিদ্যালয়গুলোর মাধ্যমে ছাত্রদের মধ্যে প্রচার করা হতো। আর কাশ্মীর বিষয়ে সর্দার প্যাটেলের সমালোচনা তাঁরা এমনভাবে প্রকাশ্যে কখনই করেননি। ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় জনতা পার্টি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে, বিশেষ করে ‘রাম জন্মভূমি-বাবরি মসজিদ বিতর্ক’ থেকে এই ভাবনাগুলোকে সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। এখন ভারতীয় জনতা পার্টি সরকারি যন্ত্রের সাহায্যেই ইতিহাসের পাঠ্যসূচি ও ইতিহাস শিক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তন করতে চলেছে। শুধু বিজেপি নয়, ‘বিশ্ব হিন্দু পরিষদ’ (১৯৬৪), ‘শিবসেনা’ (১৯৬৬) ইত্যাদি হিন্দু মৌলবাদী দলেরও আর এস এস-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা রয়েছে। আলাদা হলেও বিজেপি ও আর এস এস পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। এই কারণেই বিজেপি ইতিহাস পাঠ্যপুস্তক নতুন করে লেখার বিষয়ে আর এস এস-এর সাহায্য গ্রহণ করে।

নতুন শিক্ষামন্ত্রী তাঁর কাজ শুরু করে দিয়েছেন। দীননাথ বাত্রার সঙ্গে সভা করে পাঠ্যসূচি রচনার কাজ শুরু হয়ে গেছে। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ হিস্টরিক্যাল রিসার্চের সভাপতি হয়েছেন এমন একজন যাঁর নাম ইতোপূর্বে কেউ শোনেনি। সুতরাং পরিস্থিতি কেমন তা সহজেই অনুমান করা যাচ্ছে।

|| ৪ ||

ভারতের সমস্ত রকমের দুর্ভোগের জন্য এদেশে মুসলমান আগমনকেই দায়ী করে পাঠ্য ইতিহাসে ব্যাখ্যা করা হয়। অনেক শব্দ ব্যবহার করা হয় যেগুলো সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই করা হয়। এগুলোই সম্প্রীতি নষ্ট করার অন্যতম মাধ্যম। কখনও কখনও সেটা অবচেতনভাবেই করা হয়। কিন্তু সামগ্রিকভাবে বিষয়গুলো আলোচনায় আনতে হবে।

‘হিন্দু’ শব্দটির প্রকৃত অর্থ কী? ‘হিন্দু’ শব্দটা হিন্দুরা নিজেরা সৃষ্টি করেননি, এটা একটা বিদেশি শব্দ, পরে হিন্দুরা গ্রহণ করেছেন। আজকের অর্থে ‘হিন্দু’র উদ্ভব ঘটে গুপ্ত যুগের পরে, পঞ্চম খ্রিস্টাব্দে।

ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত আরবীয়, তুর্কি, পারসিক এই সমস্ত বিভিন্ন দেশীয় লোকদের মুসলমান বলার কোনো চল ছিল না। পশ্চিম এশিয়া বা ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল থেকে আগত গ্রিক, রোমান, আরবীয় সকলকেই ‘যবন’ বলা হত।

‘স্লেচ্ছ’ শব্দটি মুসলমানদের পিঠে দেগে দেওয়া হয়েছে। ঋগ্বেদে সর্বপ্রথম এই শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায়। যে সব মানুষ অনার্য ভাষা-ভাষী ছিলেন এবং আর্য সংস্কৃতির সঙ্গে যাদের পরিচয় ছিল না, প্রধানত তাদের সম্বন্ধেই শব্দটি ব্যবহার করা হত। উত্তর ও মধ্য ভারতের বিভিন্ন অংশের অনার্য ভাষা-ভাষী উপজাতিগুলোই ছিল প্রথম ‘স্লেচ্ছ’। পরে সব বিদেশিদের ক্ষেত্রে তা ব্যবহার হতে লাগলো। ধর্মীয় পরিভাষা নয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাংস্কৃতিক অর্থে ব্যবহৃত হতো। এখন তো শুধু মুসলমানদের ক্ষেত্রেই এটা ব্যবহৃত হয়।

মোঘল আমলের ইতিহাস বর্ণনার সময় সাম্প্রদায়িকতার প্রসার ঘটাবার ঘোর চেষ্টা। বিদ্যালয় বিশ্বহিন্দু পরিষদের প্ররোচনায় এখন তার গতি আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারতবাসী আকবরকে মহান বলেই জানেন। বিশ্বহিন্দু পরিষদ একজন বিদেশিকে সেই সম্মান দিতে নারাজ। রাণা মহেন্দ্র প্রতাপের সঙ্গে তিনি যুদ্ধ করেছিলেন। সুতরাং কোনো অর্থেই তিনি মহান হতে পারেন না। ইসলাম ধর্মাবলম্বীরাও যে সেই অর্থে আকবরকে খুব মান্যতা দিয়েছে তা নয়। কারণ আকবর যে ‘দীন ইলাহী’ চালু করেছিলেন তা পুরোপুরি ইসলাম-সম্মত ছিল না। তবে আকবর ছিলেন চিরায়ত ভারতীয় সম্প্রীতির প্রতীক। সবাইকে সেটা স্বীকার করতে হবে।

সবচাইতে ঘৃণিত আকারে আঁকা হয় ঔরঙ্গজেবের ছবি। তিনি অত্যাচারী ছিলেন, জিজিয়া কর বসিয়েছিলেন হিন্দুদের উপর, মন্দির ভেঙেছিলেন, অন্যের ধর্মের প্রতি অসহিষ্ণু ছিলেন ইত্যাদি। নিজের ধর্মকে ঔরঙ্গজেব বেশি ভালবাসতেন এ বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই। শুধু হিন্দু নয়, শিয়া ও সুফি সম্প্রদায়কে বিধর্মী আখ্যা দেন ঔরঙ্গজেব। বিখ্যাত সুফি সাধক শরাদ্দকে ফাঁসি দিয়ে দেন। রাজ্য পরিচালনায় কিন্তু ঔরঙ্গজেব একজন সফল শাসক। তার সময়েই ভারতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সমুদ্র-বাণিজ্য বেড়েছে। জিনিসপত্রের দাম নিয়ন্ত্রণে থেকেছে। চুরি ডাকাতি কম হয়েছে ইত্যাদি। অন্যান্য মোঘল সম্রাটদের মতো বিলাস-ব্যসনে মত্ত হননি তিনি। যেমন মসজিদ তৈরি করেছেন, তেমন মন্দিরও কম করেননি। তার দরবারে ১ হাজার টাকার বেশি বেতন পান এমন কর্মচারীর মধ্যে ১৮২ জন ছিলেন হিন্দু এবং ৬৯ জন ছিলেন ভারতীয় মুসলমান। নিজে কঠোর জীবন যাপন করতেন। আর যিনি রাজ্য পেতে বাবাকে বন্দী করতে পারেন ভাইদের হত্যা করতে পারেন, তাঁর কাছে অন্যরা অত্যাচারিত সেটা খুব আশ্চর্যের বিষয় নয়। এগুলো রাজ্য শাসনের জন্য, ধর্মের জন্য নয়।

সম্প্রতি কয়েকটি সিনিয়ার মাদ্রাসার পাঠ্যপুস্তক দেখার সুযোগ হয়েছে। সেখানেও প্রাথমিক শ্রেণিতে যে বর্ণপরিচয় পড়ানো হয় সেটা সাম্প্রদায়িকতার দোষে দুষ্ট। মুসলমান মৌলবাদীদেরই তাতে সাহায্য হবে। এখানেও ইতিহাস বইয়ের পাতার মধ্যে দিয়ে সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন করা হচ্ছে। ভারতীয় সংস্কৃতির ওদারের সঙ্গে তার মিল নেই। অত্যন্ত কড়াভাবে আমাদের এসব পরিহার করতে হবে।

দিল্লিতে এখন বিজেপি সরকার। আর এস এস-এর পরামর্শ মাফিক সরকারের কাজ হবে —ইতোমধ্যেই প্রকাশ হতে শুরু করেছে। নির্বাচনের আগে থেকেই আর এস এস-এর নেতারা সে প্রচার চালিয়েছিলেন। এখন পূর্ণোদ্যমে তাঁরা কাজে লেগে পড়েছেন।

ইতোমধ্যে সিদ্ধান্ত হয়েছে নতুন সিলেবাস তৈরি হবে। বিশেষ করে ইতিহাস। একসময় ‘বৈদিক অঙ্ক’ বলে তোড়জোড় শুরু হয়েছিল। সেটার কাজ শুরু হয়েছে। বিদ্যাভারতী স্কুলগুলিকে আদর্শ বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে। একজন বিচারপতি ইতোমধ্যে ভাষণ দিয়েছেন তাঁর হাতে ক্ষমতা থাকলে বা তিনি যদি একতন্ত্রী হতেন তা হলে প্রথম শ্রেণি থেকেই গীতা এবং মহাভারত পড়বার ব্যবস্থা করতেন। সবচাইতে বড় কাজটা করেছেন দেশের প্রথমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী। সম্প্রতি রমজানের পর ঈদ উৎসব গেল। তিনি নিজে কোনো ইফতার পার্টি দেননি। বরং যা সচরাচর দেখা যায় না, মহামহিম রাষ্ট্রপতির দেওয়া ইফতার সমাবেশে অনুপস্থিত থেকেছেন ইচ্ছা করে। সবচাইতে বড় ব্যাপার, সব মন্ত্রী ও অন্যান্যদের ইফতারপার্টি দিতে নিষেধ করেছেন। বেচারী রামবিলাস পাশোয়ান ভয়ে দিল্লিতে সেটা করতে পারেন নি। কিন্তু এই অনুষ্ঠান তিনি বহুকাল করে আসছেন। শেষ পর্যন্ত পাটনাতে এই উৎসব করে বোধ হয় শান্তি পেয়েছেন।

ব্যক্তিগতভাবে আমি খানিকটা খুশিই হয়েছিলাম। যাক, ইফতার পার্টির নামে রাজনীতি বন্ধ হবে। দেশ ধর্মনিরপেক্ষতার

দিকে যাবে। কিন্তু মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে সে ধারণা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। প্রধানমন্ত্রী নেপাল সফরে গেলেন। তিনি সরকারি সফরে গেছেন। দীর্ঘক্ষণ পশুপতিনাথ মন্দিরে পূজা করলেন। ২৪০০ কেজি সাদা চন্দন কাঠ এবং ২৫০০ কেজি খাঁটি ঘি (যা ভারত থেকে নিয়ে যাওয়া) দান করলেন। কী বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রীকে এবং বিশ্ববাসীকে? ঘি এবং কাঠের দামটি সরকারি কোষাগার থেকেই গেছে বলে আমার বিশ্বাস। এটাই কি এবার থেকে ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের সংস্কৃতি হবে? এর মধ্যেই আছে আর এস এস-এর একজন ‘প্রচারক’-এর নির্দেশে। সুতরাং মতাদর্শের লড়াইটা কঠিন। ভারতের সমস্ত শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষকে সঙ্গে নিয়ে এই লড়াই লড়তে হবে।

বামপন্থীদের অনেক শক্তিক্ষয় হয়েছে, সংসদের ভিতরে এবং বাইরে। কিন্তু বামপন্থীরা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যায়নি। সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নে, দেশের ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্র রক্ষার প্রশ্নে বামপন্থীরা বরাবর নীতিগত অবস্থান নিয়েছে। এই নীতি হচ্ছে ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত অধিকার এবং রাষ্ট্রকে ধর্মমুক্ত করতে হবে। ধর্মের পরিচয়ে কেউ বাড়তি বা বিশেষ সুযোগ পাবে না। দেশের সম্পদে সকলের সমান অধিকার। যারা পিছিয়ে আছে তাদের দিকে আলো ফেলতে হবে। রাষ্ট্রনেতাদের এমন কোনো আচরণ করা উচিত নয় যা বিশেষ ধর্মের মানুষকে উল্লসিত বা হতাশ করে।

এসব অর্থেই সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নটি আরও গভীরভাবে আলোচনা করে ভারতের চিরন্তন ঐক্য, সমন্বয় ও সম্প্রীতির ধারাকে সজীব ও গতিশীল করতে হবে।

With best compliments of

M/S BURNPUR INDUSTRY FIRE BRICKS

Vill. Bartoria, P.O. Mithani, Burdwan-713371

Sl. No. 101

ফ্যাসিবাদ ও তার উত্তরাধিকার

জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য

ইতিহাসে ফ্যাসিবাদ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে এক অস্থির জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি, অর্থনৈতিক মন্দা, নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অনিশ্চয়তা, শ্রমিকশ্রেণি ও কমিউনিস্টদের দুর্বলতা, সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের দোলাচলতা ও বিশ্বাসঘাতকতা, জনগণের হতাশা ও বিশ্রাস্তির এক বিশেষ বস্তুগত ও মানসিক পরিমণ্ডলে ফ্যাসিবাদের উদ্ভব ঘটে। একচেটিয়া সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির আশীর্বাদ ও বিভিন্ন স্তরের জনগণের একটি বড় অংশের সমর্থন নিয়ে এক মহামহিমাম্বিত নেতার অধীনে ফ্যাসিবাদ মাথা তোলে এবং ছলে-বলে-কৌশলে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে সমগ্র নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে পদদলিত করে এক সর্বগ্রাসী একনায়কতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করে।

সাধারণ অর্থে আমরা যাকে একনায়কতন্ত্র বলি, ফ্যাসিবাদকে তারই অন্যতম একটি রূপ বলে মনে করা ভুল হবে। ব্যক্তিগত, গোষ্ঠীগত, সামরিক ইত্যাকার বিভিন্ন ধরনের একনায়কতান্ত্রিক শাসনের সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা মানবজাতির আছে। একটি রাষ্ট্রে সরকার বদলের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় একটি ভালো সরকারের জায়গায় একট খারাপ সরকার হিসাবে ফ্যাসিবাদের উত্থান ঘটে, ব্যাপারটা এমন সরল নয়। ফ্যাসিবাদের চরিত্র গুণগতভাবেই আলাদা। ডিমিট্রিভের ভাষায়, ক্ষমতাসীন ফ্যাসিবাদ হলো লগ্নিপুঁজির সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল, সবচেয়ে উগ্র জাতিবাদী এবং সবচেয়ে সাম্রাজ্যবাদী অংশের খোলাখুলি সম্ভ্রাসবাদী একনায়কতন্ত্র।



মুসোলিনির নেতৃত্বে ইতালিতেই প্রথম ফ্যাসিবাদের উত্থান ঘটে। একজন সমাজতন্ত্রী হিসাবে রাজনৈতিক জীবন শুরু করলেও রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তার পরিস্থিতিতে তিনি প্রাচীন রোমের ক্ষমতার প্রতীক fasces বা দড়িতে বাঁধা একগুচ্ছ লাঠিকে প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করে ফ্যাসিস্ত

দল গড়ে তোলেন। তিনি সরকারে অংশ নেবার প্রস্তাব দিলে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী তা প্রত্যাখ্যান করেন। এর প্রতিক্রিয়ায় ১৯২২ সালে তাঁর দলীয় পতাকাবাহী বিশাল এক জঙ্গি ব্র্যাক-শার্ট বাহিনী রোম অভিযান করে এবং গৃহযুদ্ধের আশঙ্কায় রাজা ভিক্টর ইমানুয়েল মুসোলিনিকেই প্রধানমন্ত্রী পদে আসীন করেন। অচিরেই

সর্বক্ষমতাসম্পন্ন এক মহানায়ক (Duce) রূপে মুসোলিনি প্রতিবাদের সমস্ত কণ্ঠকে রুদ্ধ করে যে একচ্ছত্র স্বৈরশাসনের প্রতিষ্ঠা করেন, তা-ই ইতিহাসে ফ্যাসিবাদ নামে পরিচিত।



বিশেষ চরিত্রের এই একনায়কতন্ত্রকে তার পূর্ণ বীভৎসায় উদ্ভীর্ণ করার কৃতিত্ব অবশ্যই জার্মানির ন্যাশনাল সোশ্যালিস্ট জার্মান ওয়ার্কার্স পার্টি তথা নাৎসি দলের নায়ক হিটলার-এর। মুসোলিনির ক্ষমতা দখলের এক দশক পরে ১৯৩৩ সালে হিটলার রাষ্ট্রপতি হিডেনবুর্গ কর্তৃক চ্যান্সেলর পদে অভিষিক্ত হন এবং মহানায়ক (Fuehrer) হিসাবে এক বছরের মধ্যেই স্থিত শাসন-কাঠামোকে ধ্বংস করে ও বিরোধীদের,

বিশেষত কমিউনিস্টদের সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করে এক আর্থবাদী হিংস্র একনায়কতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। দলের নামানুসারে তা নাৎসিবাদ নামে খ্যাত। হিটলারের এই নাৎসিবাদের কাছ থেকে শিক্ষা নিয়ে মুসোলিনিও তাঁর ফ্যাসিবাদকে হিংস্রতর করে তোলেন।

ইতালি ও জার্মানি ছাড়াও ইউরোপের আরও কয়েকটি দেশে—যেমন পোল্যান্ড, যুগোস্লাভিয়া, গ্রিস, বুলগেরিয়া, পর্তুগাল, বেলজিয়াম, হাঙ্গেরি ও স্পেন, এবং এশিয়ায় তাজিকের নেতৃত্বে জাপানেও—নানা নামে কম-বেশি একই ধরনের একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার উদ্ভব ঘটে। নামে বিভিন্নতা থাকলেও গুণগত বৈশিষ্ট্যের নিরিখে এই বিশেষ ধরনের একনায়কতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতিকে অভিন্ন অভিধায় ফ্যাসিবাদ নামেই অভিহিত করা হয়।

এক সর্বশক্তিমান রাষ্ট্রযন্ত্রের নিষ্পেষণের পাশাপাশি বেসরকারি ষাটিকাবাহিনী গঠন করে ও তাদের সম্ভ্রাসবাদী কার্যকলাপকে ছাড়পত্র দিয়ে হিংসা, প্রতিহিংসা, সম্ভ্রাস ও গণহত্যার মাধ্যমে ফ্যাসিবাদ সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকার ও প্রতিবাদের কণ্ঠকে স্তব্ধ করে এবং ঘোষিত শত্রুর উপর যাবতীয় খারাপের দায় আরোপ করে তাকে আক্রমণের মূল লক্ষ্য করে তোলে। জার্মানিতে এইভাবেই ফ্যাসিবাদীরা মূল রাজনৈতিক শত্রু হিসাবে কমিউনিস্টদের চিহ্নিত করে। অন্যদিকে ইতর জাতির লেবেল লাগিয়ে ইহুদি ধর্মাবলম্বী

নুকুলগোষ্ঠীকে মহান আর্থ জার্মান জাতির ঘৃণ্য শত্রু হিসাবে ঘোষণা করে তাদের উপর হিংস্রতম আক্রমণ নামিয়ে আনে। ইহুদিদের নাগরিকত্ব ও ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়, কোনও সরকারি পদে তাদের নিয়োগ নিষিদ্ধ হয় এবং জার্মান নাগরিক বা আর্থরক্তের কারণে সঙ্গে তাদের বিবাহ বা যৌন সম্পর্ক অবৈধ বলে ঘোষিত হয়। সর্বোপরি, তাদের বেঁচে থাকার অধিকারটুকু পর্যন্ত কেড়ে নিয়ে ৬০ লক্ষ ইহুদিকে গ্যাসচেম্বারে পুরে বা অন্য নৃশংস পদ্ধতিতে হত্যা করা হয়।

বিশ্বাধিপত্যের লক্ষ্যে সামরিক শক্তিবৃদ্ধিকে অগ্রাধিকার দিয়ে ফ্যাসিবাদ যুদ্ধবাজি শুরু করে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে অনিবার্য করে তোলে। ১৯৩৯ সালে জার্মানির পোল্যান্ড আক্রমণের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। আক্রমণকারী ফ্যাসিবাদী অক্ষশক্তির প্রধানরা ছিল জার্মানি, ইতালি ও জাপান। আর ফ্যাসিবাদ-বিরোধী মিত্রশক্তিতে মুখ্য ভূমিকায় ছিল ব্রিটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা ও সোভিয়েত রাশিয়া। দু-বছর ধরে চলা এই যুদ্ধের প্রথম দিকে ফ্যাসিবাদের জয়যাত্রা অব্যাহত থাকে, কিন্তু ক্রমে তা ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র রক্ষার সর্বাত্মক যুদ্ধে পরিণত হওয়ায় অস্তিম পর্বে অক্ষশক্তি পিছু হঠতে বাধ্য হয়। ১৯৪৫ সালের ২৮ এপ্রিল পার্টিজানদের হাতে মুসোলিনির নিহত হওয়ার মধ্য দিয়ে ইতালির পতন ঘটে। ২ মে সোভিয়েত বাহিনী জার্মানিতে পা রাখতেই হিটলার আত্মহত্যা করেন। ১৮ আগস্ট জাপান আত্মসমর্পণ করে। কিন্তু ফ্যাসিবাদের এই সার্বিক পরাজয়ের মুখেই আমেরিকা নিজেকে ভবিষ্যৎ বিশ্বের নিয়ামক শক্তি হিসাবে তুলে ধরার জন্য বিনা কারণে জাপানের হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে অ্যাটম বোমা নিক্ষেপের বীভৎসা সৃষ্টি করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এক কলঙ্কজনক পরিসমাপ্তি ঘটায়। সমগ্র যুদ্ধে প্রাণ হারায় ৫ কোটি মানুষ।

ফ্যাসিবাদের চরিত্রলক্ষণ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্যাসিবাদ পরাস্ত হয়েছে, কিন্তু ফ্যাসিবাদ মরেনি। ইতিহাস এগোয়, কিন্তু অতীতের ভালো ও মন্দ দুই-এর উত্তরাধিকার বহন করেই এগোয়। ফ্যাসিবাদ এবং তার পরাজয়ের ইতিহাসও উত্তরাধিকার হিসাবে রেখে গেছে রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার এমন কিছু পদ্ধতি-প্রকরণ, যা নানা দেশের রাষ্ট্রব্যবস্থায় এবং তার ক্ষমতার বিভিন্ন স্তরের প্রয়োগিক রাজনীতিতে অনুসৃত হয়ে চলেছে নানা রূপে, নানা বিভঙ্গে। ফ্যাসিবাদের ইতিহাস একই সঙ্গে অবশ্য রেখে গেছে তার লক্ষণগুলিকে চিনে নেবার ও তার বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামের উজ্জ্বল উত্তরাধিকারকেও।

ফ্যাসিবাদের এই চরিত্রলক্ষণগুলিকে তাই বিশদভাবে চিনে নেওয়া দরকার।

১। কর্পোরেট শক্তি তথা শিল্প ও বাণিজ্যমহলের অধিপতিদের সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতায় ফ্যাসিবাদ শক্তি সঞ্চয় করে এবং ক্ষমতা দখল করে। জাতীয় সম্পদ লুণ্ঠনের অবাধ রাজত্ব কায়েম করে দান-প্রতিদানে পারস্পরিক স্বার্থকে পরিপুষ্ট করে তোলে।

২। নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে পঙ্গু করে, নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে দখলে এনে, বিরোধী ভোটারদের সম্ভ্রান্ত করে, ভোট দিতে না দিয়ে কিংবা প্রদত্ত ভোট নাকচ করে সমগ্র নির্বাচনকে গ্রহসনে পরিণত করে ফ্যাসিবাদ নিজ দলের বিপুল জয়কে সুনিশ্চিত করে।

৩। সমাজকে জাতির মধ্যে, জাতিকে রাষ্ট্রের মধ্যে, রাষ্ট্রকে দলের মধ্যে এবং ব্যক্তিকে দলতন্ত্রের মধ্যে আবদ্ধ করে, মহামহিমাম্বিত এক দলনায়কের নেতৃত্বাধীন নতুন দলের নামে, নতুন শ্লোগানে, নতুন আশার কথায়, শাসনের নতুন পদ্ধতির আওয়াজে উদ্ভুদ্ধ করে। দল-নায়ককে এক মহামানব, জাতীয় ইচ্ছার মূর্ত

প্রতীক, জাতির ত্রাতা এবং বিশ্ব-আধিপত্যের বীর নায়কের ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত করে ফ্যাসিবাদ তাঁর প্রতি প্রশংসনীয় আনুগত্য দাবি করে। কেননা সুগভীর অন্তর্বিশ্বাস, অশ্রান্ত অন্তর্নির্দেশ, অসীম দূরদৃষ্টি ও দৃষ্ট তেজে মহীয়ান এই মহানায়কের অপ্রতিহত ক্ষমতাই সর্বস্বীর্ণ জাতীয় স্বার্থ রক্ষা এবং জাতির শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশ্ব-আধিপত্য প্রতিষ্ঠার একমাত্র গ্যারান্টি বলে ফ্যাসিবাদ মনে করে। গোয়েবেলস-গোয়েরিং-দের মতো আজ্ঞাবাহী মুষ্টিমেয় এক নেতৃগোষ্ঠী দ্বারা পরিবৃত এই মহানায়ক বা সুপ্রিমোর কথাই শেষ কথা। কথায় কথায় দেবোপম এই মহানায়কের ভক্তি-আপ্সৃত নামোচ্চারণ একজন যথার্থ ফ্যাসিবাদীর মৌল লক্ষণ।

৪। ফ্যাসিবাদের কোনো সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি থাকে না। হিটলার স্পষ্টতই বলেছিলেন, কর্মসূচি একটা বাজে ব্যাপার। দলনায়ক যখন যা করা উচিত বলে মনে করেন সেটাই তখনকার কর্মসূচি।

৫। ফ্যাসিবাদ যুক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে, যুক্তিনির্ভর রাজনীতিকে বন্ধ্য, কলহপরায়ণ, বীযহীন, কর্মে অক্ষম বলে নিন্দামন্দ করে এবং বস্তুবাদকে বর্বরতা আখ্যা দিয়ে এক আবেগমথিত বিশ্বাস ও আকাঙ্ক্ষার দ্বারা মানুষের চিন্তা জয় করতে চায়। দলের পতাকা উড়িয়ে, শরীরে দল বা দলনায়কের প্রতীক ধারণ করে, সস্তা শ্লোগানে, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিনাশসাধনের উত্তেজক আহ্বানে ফ্যাসিবাদ এক গণ-উন্মাদনার সৃষ্টি করতে চায়।

৬। যে-কোনো ভিন্ন মতের প্রতি চূড়ান্ত অসহিষ্ণুতাই ফ্যাসিবাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। চিন্তা ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা তার পক্ষে অসহ্য। তার কাছে মানবাধিকার মূল্যহীন, লক্ষ্য সিদ্ধির পরিপন্থী হলে একেবারেই পরিত্যজ্য। যে-কোনো প্রতিবাদী কণ্ঠকে স্তব্ধ করতে যে-কোনো দমনমূলক পদ্ধতি গ্রহণে ফ্যাসিবাদ সদাপ্রস্তুত।

৭। সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের নুকুলগত পরিচয় বা ধর্মকে জাতির মানদণ্ড হিসাবে ফ্যাসিবাদ তুলে ধরে এবং তার শ্রেষ্ঠত্বের দাবি নিয়ে এক উগ্র জাত্যভিমানকে জাগিয়ে তোলে। তার অনন্য প্রতিভু ও একমাত্র রক্ষক হিসাবে নিজেকে জাহির করে জঙ্গি ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় এবং অন্য কোনো নুকুল বা ধর্মগোষ্ঠীকে তার প্রধানতম শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করে প্রত্যক্ষ আক্রমণের লক্ষ্য করে তোলে।

৮। শ্রেণিগত প্রতিপক্ষ হিসাবে কমিউনিস্টরাই ফ্যাসিবাদের প্রধানতম শত্রু, কারণ ফ্যাসিবাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থান শ্রমিক শ্রেণি ও তার স্বার্থের বিপ্রতীপে। কাজেই সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলন যাতে শাসকগোষ্ঠী ও তার কর্পোরেট মিত্রদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আধিপত্যের প্রতি চ্যালেঞ্জ হিসাবে গড়ে উঠতে না পারে সেজন্য ফ্যাসিবাদ তাকে স্ব-নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে, অন্যথায় তাদের আন্দোলনের সমস্ত অধিকার কেড়ে নিয়ে পঙ্গু করে দিতে চায়।

৯। একই সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণি ও শ্রমজীবী জনগণের অভিমুখকে শ্রেণি-সংগ্রাম ও সমাজতন্ত্রের দিক থেকে ঘুরিয়ে দিতে এবং কমিউনিস্টদের উপর তাদের আস্থা ও আশা-ভরসাকে টলিয়ে মার্কসবাদের খপ্পর থেকে ফুঁসলে বার করে আনার জন্য ফ্যাসিবাদ গোয়েবেলস-এর ভাষায় true socialism বা 'খাঁটি সমাজতন্ত্র'-র কথা আউড়ে এক তাত্ত্বিক ধোঁয়াশার সৃষ্টি করে। গরিব ও শ্রমজীবী মানুষের মৌলিক স্বার্থরক্ষা আদৌ তার লক্ষ্য না হলেও তাদের নতুন আশায় উজ্জীবিত করে নিজ রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার কাজে ব্যবহার করে।

১০। অন্য কোনো শ্রেণি বা গোষ্ঠীও যাতে নিজেকে বঞ্চিত মনে করে দূরে সরে না যায়, তার জন্য ফ্যাসিবাদ সব শ্রেণি ও গোষ্ঠীর সবরকম স্বার্থের কথাই বলে এবং সবাইকেই ঢালাও ভাবে

সবরকম প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রত্যাশায় উন্মুখ করে রাখে।

১১। নিদারুণ মন্দা ও বেকারির চাপে সর্বদাই সর্বহারা বনে যাবার ভয়ে ভীত সরব মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে লোভ দেখিয়ে, জাতাভিমান মথিত করে ফ্যাসিবাদ তার অনুকূলে নিয়ে এসে প্রচারকে পরিণত করতে চায়।

১২। বুদ্ধিজীবীদের প্রলুব্ধ করে দলীয় পরিবৃদ্ধি টেনে এনে ফ্যাসিবাদ তার ভাবমূর্তিকে উন্নীত ও মানুষের শ্রদ্ধা অর্জনে সচেষ্ট হয়।

১৩। সমস্ত গণ-সংগঠন এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহ সকল রকমের সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের উপর দখলদারির মাধ্যমে দলের তথা দলনেতাদের দাপটকে নিরঙ্কুশ করে তোলে।

১৪। নানা প্রলোভন সৃষ্টি করে ও অর্থ বিলিয়ে এবং নানা উৎসব-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পপুলার কালচারের উদ্দীপনায় মানুষকে মাতিয়ে তুলে ফ্যাসিবাদ নিজের প্রতি সমর্থন নিশ্চিত করতে এবং জনসমর্থনের প্রদর্শনী হিসাবে সেগুলিকে ব্যবহার করতে চায়।

১৫। গণমাধ্যমকে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ ভাবে করায়ত্ত করে ফ্যাসিবাদ তাকে আপন মাহাত্ম্য প্রচার এবং দলের যাবতীয় অপকর্মকে আড়াল করার কাজে ব্যবহার করে। প্রচারকৌশলে মানবাধিকার দলকেও জনগণের কাছে গ্রহণীয় এবং রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের উপর আক্রমণকে অভিনন্দনযোগ্য করে তোলাই তার উদ্দেশ্য। এতৎসত্ত্বেও মানবাধিকার দলন যখন কুখ্যাতির কারণ হয়ে ওঠে তখন ফ্যাসিবাদ তাকে সুকৌশলে গোপন করে, অস্বীকার করে, কিংবা তথ্য বিকৃতির আশ্রয় নেয়।

১৬। উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে-কোনো কাজ এবং যে-কোনো পদ্ধতিই ফ্যাসিবাদের কাছে গ্রহণযোগ্য, কেননা তার কাছে লক্ষ্যসাধনই উপায়ের যথার্থতার একমাত্র মাপকাঠি।

১৭। মিথ্যা হল ফ্যাসিবাদের একটি প্রধান অবলম্বন, কেননা ফ্যাসিবাদ বিশ্বাস করে মিথ্যাকেও যথেষ্ট জোরের সঙ্গে অবিরাম সত্য হিসাবে প্রচার করতে পারলে মিথ্যাই জনমানসে সত্য হিসাবে প্রতিভাত হয়।

১৮। যা কিছু খারাপ তার দায় চাপাবার জন্য ফ্যাসিবাদ সাধারণত কমিউনিস্ট, সমাজবাদী বা উদারনীতিবাদীদের, কোনো বিশেষ জাতি বা ধর্মগোষ্ঠীকে, ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিকে, কোনো চিরচরিত জাতীয় শত্রুপক্ষকে কিংবা তথাকথিত কোনো সম্ভ্রাসবাদী গোষ্ঠীকে সুবিধামতো বেছে নেয় এবং সেই দিকে মানুষের দৃষ্টিকে ঘুরিয়ে দিয়ে উত্তেজক অপপ্রচারে মানুষকে খেপিয়ে তুলে তাকেই স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত গণপ্রতিক্রিয়া হিসাবে দেখাতে চায়।

১৯। জাতীয় নিরাপত্তাকে ফ্যাসিবাদ দেশপ্রেমের আবেগমথিত শ্লোগানে পরিণত করে এবং বিরোধীদের জাতীয় স্বার্থ-বিরোধী এমনকি দেশদ্রোহী প্রতিপক্ষ করে আক্রমণের লক্ষ্য করে তোলে। একদিকে নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে নিক্রিয় রেখে নিজ দীলয় বাহুবলীদের হিংস্র দাপট ও লুণ্ঠের অবাধ সুযোগ করে দেয় এবং অন্যদিকে বিরোধীদের ক্ষেত্রে তাকে দমন ও নিপীড়নের হাতিয়ার হিসাবে অতিসক্রিয় করে তুলে ফ্যাসিবাদ এক সম্ভ্রাসের আবহ গড়ে তোলে। পুলিশকে দলদাসে পরিণত করে প্রতিপক্ষকে দমন করার জন্য ফ্যাসিবাদ তার হাতে ক্ষমতার যথেষ্ট অপব্যবহারের ছাড়পত্র তুলে দেয়। মিথ্যা অভিযোগে নিগৃহীত ও মিথ্যা মামলায় নাজেহাল করে তাদের বিরুদ্ধে জন-ঘৃণাকে উস্কে দিতে চায়। প্রতিপক্ষ যাতে ন্যায়বিচার না পায় তার জন্য নির্বিচার মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে বিচারব্যবস্থাকেও কার্যত পঙ্গু করে তোলে।

২০। মিলিটারি-পুলিশ ছাড়াও ফ্যাসিবাদ ব্ল্যাকশার্ট-

ব্রাউনশার্ট-এর মতো ঝটিকাবাহিনী তৈরি করে তাকে হিংসা ও যথেষ্টাচারের মাধ্যমে প্রতিপক্ষকে শায়েস্তা করার অবাধ সুযোগ করে দেয়।

২১। বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে স্বীয় আধিপত্য নিরঙ্কুশ করার জন্য ফ্যাসিবাদ মিলিটারিকে গৌরবান্বিত ও অতিসক্রিয় করে তোলে। তাই সমরবাদই হয়ে ওঠে ফ্যাসিবাদের বিদেশনীতির সারবস্তু।

পরিবর্তিত বিশ্ব ও ফ্যাসিবাদের উত্তরাধিকার

ইতিহাসে কখনোই একই ঘটনার অবিকল পুনরাবৃত্তি ঘটে না। একই রূপে ফ্যাসিবাদের পুনরাবির্ভাবও সম্ভব নয়। স্বাভাবিকভাবেই চরিত্রে ফ্যাসিবাদী হলেও পরিবর্তিত পরিস্থিতি অনুযায়ী এই সম্ভ্রাসবাদী একনায়কতন্ত্রের মুখ ও অভিমুখ এবং রূপ ও বিভঙ্গেরও পরিবর্তন ঘটে। মৌল চরিত্রলক্ষণগুলি দিয়ে তাকে চিনে নিতে হয়।

বর্তমানকাল বিশ্বায়নের কাল, লগ্নিপুঞ্জি তথা কর্পোরেট পুঞ্জির বিশ্বাধিপত্যের কাল, এবং তার প্রতিভূ হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও সামরিক আগ্রাসনের আবির্ভাব বিস্তারের কাল। বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিপর্যয়ের পটভূমিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখন বিশ্ব-সম্রাট, তার আগ্রাসনে বাধা দেবার কেউ নেই, রাষ্ট্রসংঘও ঠুটো জগন্নাথ। আজ একশতরও বেশি দেশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক উপস্থিতি, ন্যাটো তার আঙ্গাবহ যৌথ শক্তি। অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক কাঠামো বজায় রাখলেও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঔপনিবেশিক সমরবাদ এবং লগ্নিপুঞ্জির বিশ্বাধিপত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দেশে দেশে প্রতিক্রিয়াশীল সরকারগুলিকে তার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদত পুষ্টি যোগাচ্ছে ফ্যাসিবাদের উত্তরসূরিদের। তাই প্রধানত কমিউনিস্ট বা অন্য কোনও রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ সমূহ বিপদের কারণ হয়ে উঠেছে বা হয়ে উঠতে পারে এমন সম্ভাবনা দেখা দিলে, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ক্ষমতায় আসীন হওয়া সত্ত্বেও ফ্যাসিবাদের উত্তরসূরিদের গণতন্ত্রের মুখোস ছিঁড়ে ফেলতে বিলম্ব হয় না। তাদের সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল অংশ সবচেয়ে সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী বিভিন্ন রূপে ও বিভিন্ন মাত্রায় ফ্যাসিবাদী পদ্ধতি ও প্রকরণগুলি ব্যবহার করতে থাকে।

দেশে দেশে জাতিগত বা শ্রেণিগত প্রতিরোধকে সরাসরি দমন করা হচ্ছে। পাশাপাশি বৃহত্তর জাতি-চেতনা ও শ্রেণি-চেতনার মূলে আঘাত হানার হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে ধর্মীয় সত্তা এবং নুকুলগত ও জনজাতিগত নানা ক্ষুদ্রতর সত্তাবোধ (Identity) ও স্বাতন্ত্র্যচেতনার ভিত্তিতে জাতি ও বর্গ নির্ণয়ের উত্তর-আধুনিকতাবাদী তত্ত্ব (Post-modernism)। জাতীয়তাবাদের মতো তত্ত্বকে ‘বৃহৎ আখ্যান’ (Grand Narrative) হিসাবে নাকচ করে দীর্ঘ প্রয়াসসাধ্য জাতিগত সংবদ্ধতার বিপরীতে উত্তর-আধুনিকতাবাদী তুলে ধরছে জন্মলব্ধ ক্ষুদ্রতর সত্তার প্রাথমিকত্বকে। এর ফলে জাতিগত রাজনৈতিক ঐক্য অর্জনের বৃহত্তর প্রক্রিয়াকে খণ্ড-বিখণ্ড করে পরিচিতি-সত্তাগুলিকেই জাতি গঠনের মৌলিক মানদণ্ড হিসাবে তুলে ধরা হচ্ছে। এই সত্তাগত স্বাতন্ত্র্যবোধের সঙ্গে শ্রেণির ধারণাকে নাকচ করে যথার্থ দেওয়া হচ্ছে সত্তা-ভিত্তিক নিম্নবর্গ (Sub-altern)-এর ধারণাকে, যা শ্রেণি-চেতনা, শ্রেণিগত ঐক্য ও শ্রেণি-দ্বন্দ্বের প্রক্রিয়াকেই বিপর্যস্ত করে। এর ফলে শ্রেণিগত প্রতিরোধ যতটা দুর্বল হবে, কর্পোরেট পুঞ্জির অবাধ বিস্তার ও মার্কিন আধিপত্য প্রসারের পথও ততো মসৃণ হবে। রচিত হবে ফ্যাসিবাদের উত্তরসূরিদের সক্রিয় হয়ে ওঠার বাস্তব ভিত্তি। বস্তুতপক্ষে উত্তর-আধুনিকতাবাদ এই পুঞ্জিবাদী বিশ্বব্যবস্থাকেই মানব ইতিহাসের চূড়ান্ত পর্যায় (End of History)

বলে ঘোষণা করে। এ-প্রসঙ্গে অবশ্য এ-কথাও উল্লেখ করা দরকার যে ক্ষুদ্রতর এই সত্তাবোধগুলিকে যথোপযুক্ত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জাতিগত ও শ্রেণীগত একের বৃহত্তর বোধের উত্তীর্ণ ও সংবদ্ধ করার সদর্থক রাজনৈতিক প্রয়াসের পরিবর্তে বামপন্থীদের পক্ষ থেকে সেগুলিকে সরাসরি নাকচ করার এক সহজ প্রবণতাও পরোক্ষভাবে দেশে দেশে এই সত্তাবোধগুলির উজ্জীবন বা তাদের উজ্জীবিত করে তোলার প্রক্রিয়াকে সহজতর করেছে।

জাতীয় ক্ষেত্রের মতো আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রশ্রয়দায়ক হয়ে এই সত্তাবোধ ধর্মকে আশ্রয় করে নিজ রাষ্ট্রসীমাকে অতিক্রম করেও কতটা আগ্রাসী ও হিংস্র হয়ে উঠতে পারে, গাজা ভূখণ্ডে মুসলিম হামাস প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ইহুদি রাষ্ট্র ইজরায়েলের বীভৎসাই তার সবচেয়ে বড় উদাহরণ। ঐতিহাসিকভাবে আর্য-শ্রেষ্ঠত্বের ধ্বজাধারী ফ্যাসিবাদের নির্মমতম জিঘাংসার শিকার হওয়া সত্ত্বেও ইহুদিদের রাষ্ট্র ইজরায়েলই আজ প্যালেস্তাইনের মুসলিম প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে হিংস্রতায় কার্যত ফ্যাসিবাদের সার্থক উত্তরসূরি হিসাবে নিজেকে প্রতিপন্ন করে চলেছে।

যে-কোনো স্বৈর-শাসনের পক্ষেই স্বাধীন ও নিরপেক্ষ গণজ্ঞাপন ও গণমাধ্যম ব্যবস্থা আতঙ্কের কারণ। বিগত কয়েক দশকে কৃৎকৌশলে অভাবনীয় উন্নতির ফলে গণমাধ্যম জগতে এক বিপ্লব ঘটে গেছে। সমগ্র বিশ্বই এখন দৃশ্য, শ্রাব্য এবং দৃশ্য-শ্রাব্য গণমাধ্যমের নখদর্পণে। ইন্টারনেট প্রযুক্তি সমগ্র বিশ্বের যাবতীয় তথ্যকে ও তথ্যের আদান-প্রদানকে কম্পিউটারের মাধ্যমে, অধুনা মুষ্টি-আবদ্ধ মোবাইল ফোনের মাধ্যমেও অনায়াসলভ্য করে দিয়েছে। গণজ্ঞাপন ও গণমাধ্যম ব্যবস্থা যদি প্রকৃতই স্বাধীন ও নিরপেক্ষ ভাবে কাজ করে বা করতে পারে তাহলে বিশ্বের যে-কোনো স্বৈরশাসনের পক্ষেই তা সমূহ বিপদের কারণ হয়ে উঠতে পারে। শাসকের ভ্রষ্টাচার ও যথেষ্টাচারের অতি গোপনীয় তথ্যও যে-কোনো সময়ে জনসমক্ষে উদ্ঘাটিত হতে পারে। আজকের তুলনায় মুসোলিনি বা হিটলারের সময়ের গণজ্ঞাপন ও গণমাধ্যম ব্যবস্থার স্তরকে প্রায় আদিম হিসাবেই অভিহিত করা যায়। সেই সময়েও ফ্যাসিবাদ তার নিজ পরিবৃত্তে সেই ব্যবস্থাকেও করায়ত্ত করে তার কৃতিত্ব প্রচার ও বীভৎসা আড়াল করার কাজে ব্যবহার করেছে। বিশ্বস্তরে অবশ্য তা সম্ভব হয়নি। কিন্তু তৎকালীন স্তরে বিশ্বের গণজ্ঞাপন ও গণমাধ্যম প্রযুক্তিরও সামর্থ্য ছিল নিতান্তই সীমাবদ্ধ। ফ্যাসিবাদের অনেক তথ্যই তাই আজও অজানা রয়ে গেছে। বর্তমান বিশ্বায়নের কালে বিশ্বায়িত গণমাধ্যম-ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণের একমাত্র সম্ভাব্য উপায় তার উপর বিশ্বায়িত কর্পোরেট পুঁজির সার্বিক নিয়ন্ত্রণ আরোপ, এবং সেই প্রক্রিয়ায়ই বিশ্বস্তরে এবং রাষ্ট্রীয় স্তরে গণমাধ্যমকে নিজ মালিকানাধীনে নিয়ে আসার লক্ষ্যে কর্পোরেট পুঁজির অভিযান অপ্রতিহত বেগে এগিয়ে চলেছে। ফলে তাদের আশাবাদধন্য ফ্যাসিবাদের উত্তরসূরিদের অগ্রগতিও অনেকটা নিরাপদ হচ্ছে।

ব্রিটিশ ভারতবর্ষে ফ্যাসিবাদের উদ্যোক্তা এবং গুণগ্রাহীরা

পাশ্চাত্যে ফ্যাসিবাদের উদ্ভবের অনেক আগেই ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষে ধর্মের ভিত্তিতে হিন্দুদের সংগঠিত করে জাতি নির্মাণের প্রয়াস শুরু হয়। হিন্দুদের ‘আর্য’ হিসাবে অভিহিত করে দয়ানন্দ সরস্বতী ১৮৭৫ সালে বোম্বাইয়ে ‘আর্য সমাজ’-এর প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯০৯ সালেই আর্য সমাজ-এর নেতা হিসাবে লাল লাজপত রায় Nation শব্দটিকে সুনির্দিষ্ট সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্পন্ন একটি জনগোষ্ঠী হিসাবে গ্রহণ করে, সেই অর্থেই হিন্দুদের একটি জাতি হিসাবে অভিহিত করেন। ইতালিতে মুসোলিনির নেতৃত্বে

ফ্যাসিবাদের উত্থানের পর মদনমোহন মালব্য দূত মারফত তাঁকে মুক্ত প্রশংসা জ্ঞাপন করেছিলেন। ১৯০৬ সালে মুসলিম লিগ প্রতিষ্ঠিত হবার পরের বছরই, ১৯০৭ সালে মুসলমান-সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ পাঞ্জাবে ‘হিন্দুসভা’-র প্রতিষ্ঠা ঘটে এবং একে একে অন্যান্য প্রদেশেও গঠিত হতে থাকে। ১৯১০ সালে হিন্দুসভাগুলি একত্রিত হয়ে ‘হিন্দু মহাসভা’ গড়ে তোলে এবং বিভিন্ন প্রশ্নে সরাসরি রাজনৈতিক অবস্থান গ্রহণ করতে থাকে।

জাতির যে সংজ্ঞার ভিত্তিতে আর্য জাতি-গরিমার জয়ধ্বজা নিয়ে ফ্যাসিবাদ-নাৎসিবাদ উগ্র রূপ ধারণ করে এবং ক্ষমতা দখল করেই বিশ্বধাসী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়, তার সঙ্গে ভারতবর্ষের হিন্দু ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের উদ্যোক্তাদের সংজ্ঞার সায়ুজ্যটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ১৯২০ সালে ফ্যাসিস্ত বাহিনীর রোম অভিযান এবং মুসোলিনির ক্ষমতা দখলের পাঁচ বছর পরেই, ১৯২৫ সালে হেডগেওয়ারের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ। লক্ষ্য, এমন একটি শৃঙ্খলাবদ্ধ, শক্তিশালী ও আক্রমণাত্মক হিন্দু জাতীয়তাবাদী বাহিনী গড়ে তোলা যা জনগণকে এমন এক আঙ্গিক দেশপ্রমে উদ্বুদ্ধ করে তুলবে যার মূল কথা ভারতবর্ষে হিন্দুরাই একমাত্র জাতি (Nation), হিন্দুত্বই হচ্ছে রাষ্ট্রীয়ত্ব। প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই হেডগেওয়ারের নেতৃত্বাধীন রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ তার জাতিবোধ, সাংগঠনিক নীতি ও রীতি-প্রকরণে ক্রমোত্তর ফ্যাসিবাদী বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে থাকে। স্বয়ংসেবকদের খাকিপ্যান্ট-সাদাশার্ট-টুপি সমন্বিত আধা-সামরিক ইউনিফর্ম, কঠোর শৃঙ্খলা, উপুর করা ডান হাত বুকে ঠেকিয়ে পতাকার প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার ভঙ্গি, লাঠি হাতে কুচকাওয়াজের ধরন ফ্যাসিবাদের ব্ল্যাকশার্ট-ব্রাউনশার্ট বাহিনীরই ভারতীয় প্রকরণ। ১৯৩১ সালে হিন্দুবাদী নেতা মুঞ্জে ইতালিতে যান এবং মুসোলিনির সঙ্গে দেখা করে ও বিভিন্ন ফ্যাসিস্ত সংস্থা পরিদর্শন করে বিশ্ময়ে অভিভূত হন। তিনি তাঁর দিনলিপিতে লেখেন, একমাত্র ফ্যাসিস্ত মতবাদ ও সংগঠনই ভাবিষ্যৎ ভারতরাষ্ট্র ও সমাজের ঐক্য ও সংহতি সাধন করতে পারে। হিন্দুমহাসভার সভাপতি হিসাবে সাভারকর যে তীব্র ঘৃণার সঙ্গে মুসলমানদের অতিজাতিক ধর্মীয় আনুগত্যসম্পন্ন বলে অভিহিত করে হিন্দুদের এক প্রতিস্পর্ধী জাতীয়তাবোধে উগ্র করে তোলার দায়িত্ব পালন করেন, তার প্রতিতুলনা চলে একমাত্র ইহুদি-ঘৃণার উপর প্রতিষ্ঠিত নাৎসি আর্য্যভিমানের সঙ্গে। হিন্দুবাহী পত্রিকা Hindu Outlook যেমন ফ্রান্সে, মুসোলিনি, হিটলারের প্রশংসায় মুখর হয়, তেমনি নাৎসি দলের মুখপত্র Volkischer Beobachter-ও সাভারকর সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করে। সাভারকর ১৯৩৮ সালে জার্মানির সুদেতানল্যান্ড দখলকে সমর্থন জানান এই যুক্তিতে যে উভয় দেশের জনগণের একই রক্ত, একই ভাষা। আর্যজাতির পবিত্রতা রক্ষার জন্য জার্মানিকে ইহুদিমুক্ত করার নাৎসি অভিযানকে গোলওয়ালকর ভারতবর্ষ তথা হিন্দুস্থানের পক্ষে একটি শিক্ষণীয় বিষয় হিসাবে উল্লেখ করে বলেন, মূলগতভাবে ভিন্ন জাতি ও সংস্কৃতির পক্ষে একই সমগ্রতায় সমন্বিত হওয়া কখনই সম্ভব নয়। অর্থাৎ নাৎসি জার্মানিতে ইহুদিদের যে পরিণতি হয়েছিল, ভবিষ্যতের হিন্দুরাষ্ট্রে মুসলমানদেরও সেই পরিণতিই হবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রকালে উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের এক সমাবেশে সাভারকর জার্মানির ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, নাৎসি জার্মানি যুদ্ধে জিতলে তাদের স্বস্তিকা প্রতীকের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ভারতবর্ষেও হিন্দুত্ববাদীরা ওই ধরনের একটি রাষ্ট্র গঠনের আশা রাখে।

এই সক্রিয় উদ্যোক্তাদের মধ্যেই যে ফ্যাসিবাদ-নাৎসিবাদের প্রভাব সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়। ভারতের জাতীয় রাজনীতির মুখ্য ধারাও ফ্যাসিবাদের প্রভাব থেকে একেবারে মুক্ত ছিল না। গান্ধিজি ও

নেহেরুর মতো কংগ্রেসের নেতারাও ফ্যাসিবাদ-নাৎসিবাদের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধিতে বিলম্বের কারণে কম-বেশি বিভ্রান্তির শিকার হন। গান্ধিজি স্বয়ং মুসোলিনি সম্পর্কে সাময়িকভাবে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। নেহেরুও ফ্যাসিবাদ-নাৎসিবাদের বিরোধিতায় যথেষ্ট সর্বব হয়ে উঠতে কিছুটা সময় নেন। তবে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনাটি ঘটে ১৯৩৯-এর মার্চে ত্রিপুরী কংগ্রেসের মধ্যে। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শেঠ গোবিন্দদাস এবং গোবিন্দবল্লভ পন্থ সরাসরি হিটলারের প্রশংসা করেন। অধিবেশন শেষে পাঞ্জাবের প্রতিনিধিদের ধ্বনি ছিল মহাত্মাজি কি জয়, হিন্দুস্তান কি জয়, হিটলার কি জয়। ব্যথিত রবীন্দ্রনাথ ১৭ মার্চ অমিয় চক্রবর্তীকে এক চিঠিতে লিখলেন, “অবশেষে আজ এমন কি কংগ্রেসের মঞ্চ থেকেও হিটলারী নীতির নিঃসঙ্কোচ জয়যোষণা শোনা গেল। স্বাধীনতার মন্ত্র উচ্চারণ করার জন্য যে বেদী উৎসৃষ্ট সেই বেদীতেই আজ ফ্যাসিস্টদের সাপ ফাঁস করে উঠেছে।” প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রবীন্দ্রনাথ নিজেও ১৯২৬ সালে ইতালিতে গিয়ে মুসোলিনির সঙ্গে সাক্ষাৎকারে ও ফ্যাসিবাদের আপাত জৌলুসে মুগ্ধ হয়েছিলেন, যদিও রম্মা রল্লা অচিরেই তাঁকে ভ্রান্তিমুক্ত করেন এবং ফ্যাসিবাদের স্বরূপ উপলব্ধির পর রবীন্দ্রনাথই হয়ে ওঠেন ফ্যাসিবিরোধী আন্তর্জাতিক আন্দোলনের এক অগ্রপথিক।

সুভাষচন্দ্র বসুও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে দেশত্যাগ করে হিটলার সহ অক্ষশক্তির মহানায়কদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপন করেছিলেন। তবে এই সংযোগের মূল উদ্দেশ্য ছিল রণকৌশলগত। ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে গড়ে তোলা তাঁর আজাদ হিন্দ ফৌজের সশস্ত্র সংগ্রামকে যে-কোনো মূল্যে সফল করে তুলতেই যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে কাজে লাগিয়ে তিনি শত্রুর মিত্র হিসাবে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন।

কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ রাজনীতির জগতেই নয়, বুদ্ধিজীবী মহল ও গণমাধ্যম জগতেও ফ্যাসিবাদ-নাৎসিবাদের প্রভাব কম-বেশি লক্ষ্যণীয় হয়ে ওঠে। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ১৯৩৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য থাকাকালীন ইতালির রাষ্ট্রীয় সংস্থা Institute for Middle East and Far East-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখপত্র Calcutta Review-তে একের পর এক প্রকাশিত হয় মুসোলিনি ও ফ্যাসিবাদের প্রশস্তিবাচক লেখা, যার মধ্যে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের লেখাও ছিল। মুসোলিনিতে মুগ্ধ সাংবাদিক তারকনাথ রায় তাঁর একটি জীবনচরিত পর্যন্ত লিখে ফেলেন। ‘Modern Review’ পত্রিকায়ও ফ্যাসিবাদের প্রশস্তিবাচক লেখা প্রকাশিত হয়। হিটলারের অভ্যুত্থানের পর দেশ-আনন্দবাজার-অমৃতবাজারের মতো পত্রিকাগুলিও তাঁর প্রশংসায় কম-বেশি মুখর হয়ে ওঠে।

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় অবশ্য উপাচার্য হিসাবে ফ্যাসিবাদী একটি সংস্থার সঙ্গে শিক্ষাগত সংযোগের স্তরেই থেমে থাকেননি। সাভারকরের বিশেষ অনুরাগী হিসাবে ১৯৩৮ সালেই তিনি প্রত্যক্ষ রাজনীতির জগতে চলে আসেন এবং সরাসরি হিন্দুমহাসভায় যোগদান করেন। তিনিই স্বাধীন ভারতের প্রথম হিন্দুত্ববাদী রাজনৈতিক দল জনসঙ্ঘ-এরও প্রতিষ্ঠাতা।

স্বাধীন ভারতে ফ্যাসিবাদের উত্তরসুরিরা

ভয়াবহ হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার মধ্য দিয়ে ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করে, কিন্তু ভারত ও পাকিস্তান এই দুই রাষ্ট্রে বিখণ্ডিত হয়ে। পাকিস্তান একটি মুসলিম রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হলেও ভারত (India) একটি ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক



প্রজাতন্ত্র হিসাবে সংবিধানবদ্ধ হয় ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি। ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস-এর প্রাথমিক পর্বে গভর্নর-জেনারেল মনোনীত প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ক্ষমতাসীন হয়। ১৯৫২ সালে নবপ্রণীত সংবিধান অনুযায়ী প্রথম লোকভা নির্বাচনেও বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে কংগ্রেস দল জয়ী হয় এবং প্রধানমন্ত্রিত্বে পুনরায় আসীন হন জওহরলাল নেহরু। ১৯৭৭ সালের ২৪ মার্চ পর্যন্ত কংগ্রেসের ধারাবাহিক শাসন অব্যাহত থাকে। স্বভাবতই হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সঙ্কল্পবদ্ধ সাভারকর-গোলওয়ালকর ঘরানাভুক্ত ফ্যাসিবাদের উত্তরসুরিদের অকাঙ্ক্ষা অপূর্ণই রইলো। রাষ্ট্রক্ষমতা থেকেও তারা রয়ে গেল অনেক দূরে। কিন্তু ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে তাদের সক্রিয়তা বাড়তে থাকে। ১৯৫১ সালেই শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় হিন্দুত্ববাদী রাজনৈতিক দল ‘জনসংঘ’। ১৯৬৬ সালে মুম্বাইয়ে বাল্লা সাহেব থ্যাকারের নেতৃত্বে শিবসেনা গড়ে ওঠায় হিন্দুত্ববাদী রাজনীতি আরও শক্তিশালী হয়। হিন্দু মহাসভা ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়লেও বিশ্ব হিন্দু পরিষদ হিন্দুত্বের ধ্বজা বহন করে চলে। আর এস এস তার হিন্দু সাংস্কৃতিক সংগঠনের ছদ্ম আবরণ সরিয়ে ক্রমশ হিন্দুত্ববাদী রাজনীতিতে প্রত্যক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করতে থাকে।

রাজনৈতিক চরিত্র বিচারে কংগ্রেসকে একটি ফ্যাসিবাদ-অনুসারী দল বলা না গেলেও, স্বাধীনতালাভের দিন থেকে ধারাবাহিকভাবে ক্ষমতাসীন থাকার ঔদ্যতে ১৯৭০ সালের শুরুতেই কংগ্রেস-শাসিত অঙ্গরাজ্য পশ্চিমবঙ্গে সি পি আই(এম)-এর অগ্রগতিকে স্তব্ধ করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থস্বরূপ রায়-এর নেতৃত্বে ও প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর প্রশ্রয়ে যে সম্ভ্রাসকে নামিয়ে আনা হয়েছিল, চারিত্রিক বিচারে তাকে যথার্থই আধা-ফ্যাসিবাদী হিসাবে অভিহিত করা যায়। ১৯৭৫ সালে সারা ভারতব্যাপী কংগ্রেস-বিরোধী গণবিক্ষোভের মুখে অভ্যন্তরীণ জরুরি অবস্থা জারি করে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী সেই একই প্রকরণে এগোতে চেয়েছিলেন। কিন্তু জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে সম্মিলিত আন্দোলনের ধারায় ১৯৭৭ সালে গঠিত হয় জনতা পার্টি এবং হিন্দুবাদী জনসংঘ দলও তার অন্তর্ভুক্ত হয়। নির্বাচনে জনতা পার্টি জয়ী হয় এবং মোরারজি দেশাই-এর প্রধানমন্ত্রিত্বে কেন্দ্রে জনতা সরকার গঠিত হয়। কিন্তু এই সরকার মাত্র দু-বছর চার মাস স্থায়ী হয়। এর পর জনতা পার্টি (সেকুলার) দলনামে চরণ সিং-এর কয়েক মাস শাসনে সহায়তা দিয়ে ১৯৮০ সালের জানুয়ারি মাসেই ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস আবার সরাসরি ক্ষমতায় ফিরে আসে।

১৯৮০ সালের এপ্রিলেই পূর্বতন জনসংঘপন্থীরা জনতা দল ভেঙে ভারতীয় জনতা পার্টি (BJP) গঠন করেন। সঙ্ঘ-পরিবারভুক্ত দলগুলি এবং ঠাকুরপন্থী শিবসেনার মতো কিছু দল ও গোষ্ঠী হল তাদের সহযোগী শক্তি। ১৯৮৪ সালে প্রতিষ্ঠিত

হয় জঙ্গি হিন্দু সংগঠন বজরং দল। ১৯৯০ সালের শুরুতেই রামজন্মভূমি আন্দোলন মাথা তোলে। রামজন্মভূমির উপর নির্মিত হয়েছে বাবরি মসজিদ, এই অভিযোগে ১৯৯২ সালের ৬ জুন বিজেপি-সহ সমস্ত হিন্দুত্ববাদী দলের নেতাদের উপস্থিতিতে ও প্রত্যক্ষ প্রণোদনায় করসেবকদের ঝটিকা বাহিনী বাবরি মসজিদকে ধূলিসাৎ করে দেয়। হিন্দু ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের উগ্রতায় এক নতুন মাত্রা যুক্ত হয়। ১৯৯৬ সালে প্রথমবার অতি স্বল্পকালের জন্য ও ১৯৯৮ সালে পূর্ণ পাঁচ বছরের জন্য অটলবিহারী বাজপেয়ীর প্রধানমন্ত্রিত্বে বিজেপি সরকার ক্ষমতাসীন হয়। রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতায় কেন্দ্রের বিজেপি সরকার অপেক্ষাকৃত সংযত থাকলেও বিজেপি-শাসনাধীন গুজরাতের পরিস্থিতি ছিল ভিন্ন। আর এস এস নায়ক নরেন্দ্র মোদীর মুখ্যমন্ত্রিত্বকালে গোধরায় সবরমতী এক্সপ্রেসে একটি অগ্নিকাণ্ডে অযোধ্যা-প্রত্যাগত করসেবকদের মৃত্যুর জন্য মুসলমানদের দায়ী করে ২০০২ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি প্রশাসনের প্রত্যক্ষ মদতে সারা রাজ্য জুড়ে মুসলিম-নিধন যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। বাজপেয়ী-পরবর্তী দশ বছর মনমোহন সিং-এর প্রধানমন্ত্রিত্বে কংগ্রেস শাসনের পরে এই নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বেই ২০১৪ সালের ২৮ মে থেকে কেন্দ্রে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে।

ফ্যাসিবাদের প্রকৃত উত্তরসাধক অবশ্যই বিজেপি ও সঙ্ঘ-পরিবার। মুসোলিনি ও হিটলার প্রদর্শিত পথ ধরেই ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতাকে মেকি-ধর্মনিরপেক্ষতা হিসাবে নাকচ করে সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের ক্লোগানে ভারতকে একটি হিন্দু ধর্মীয় রাষ্ট্রে পরিণত করার লক্ষ্যে তারা আজও অবিচল। ফ্যাসিবাদের সবকটি মৌল বৈশিষ্ট্যই কমবেশি হিন্দুত্ববাদী বিজেপি ও সঙ্ঘ-পরিবারের মধ্যে বিদ্যমান। সুযোগমতো তার মৌল প্রকরণগুলি নীতিনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করতে তারা সদাপ্রস্তুত। যে নাগরিক সমাজের মধ্য থেকে ফ্যাসিবাদ তার শক্তি সংগ্রহ করে সেখানে তারা সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়িয়ে চলেছে। যুক্তিবাদকে পরিহার করে ভক্তি ও অন্ধবিশ্বাসের পথকেই তারা শ্রেয় মনে করে। ভারতকে মনে করে পুণ্য আর্ষভূমি তথা হিন্দুভূমি। তারা বিশ্বাস করে ভারত তার হিন্দু অতীতে জগতসভায় শ্রেষ্ঠত্বে আসীন ছিল, তার সাম্রাজ্য বহুদূর বিস্তৃত ছিল, এবং একমাত্র হিন্দু জাতীয়তাবাদ ও সমরবাদের মাধ্যমেই ভারত আবার সেই শ্রেষ্ঠত্ব ফিরে পেতে পারে। কাজেই হিন্দুত্ব তাদের জাতীয়তাবাদী উগ্রতার প্রতীক ও চালিকা শক্তি। সেই চলার পথে প্রধান ধর্মীয় শত্রু মুসলমানেরা এবং রাজনৈতিক শত্রু কমিউনিস্টরা। সংখ্যালঘু মুসলিম মৌলবাদ সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু ধর্মের এই ধ্বজাধারীদের আরও উগ্র করে তুলেছে।

এই ধর্মীয় রাজনীতিকেই কার্যত তাত্ত্বিক প্রশয় দান করছে উত্তর-আধুনিকতাবাদেরই বিশেষ ভারতীয় রূপ উত্তর-ঔপনিবেশিকতাবাদ (Post-colonialism)। সুনির্দিষ্ট ভারতীয় প্রতীক ও বাগধারাকে আশ্রয় করে এই তত্ত্ব সুনিপুণ বৌদ্ধিক প্রকরণে হিন্দুধর্মকেই ভারতীয় জাতীয়তাবাদের মৌলিক আধেয় হিসাবে তুলে ধরে এবং ধর্মনিরপেক্ষতাকে ধর্মীয় সহিষ্ণুতার একটি নীতির অতিরিক্ত কোনো বিশেষ মূল্য প্রদানে অস্বীকার করে। কিন্তু একমাত্র ধর্মকে ভিত্তি করে গড়ে তোলা গোষ্ঠীতন্ত্রের কাছে সহিষ্ণুতা এক অলীক প্রত্যাশা ছাড়া আর কিছুই নয়।

আর এস এস নায়ক নরেন্দ্র মোদীর মুখ্যমন্ত্রিত্বে গুজরাতের মুসলিম-নিধন যজ্ঞ সাম্প্রদায়িকতারই এক ফ্যাসিবাদী বহিঃপ্রকাশ। কংগ্রেসের অপশাসন এবং বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তির দুর্বলতা ও অনৈক্যের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে সেই নরেন্দ্র মোদীই ২০১৪

সালের লোকসভা নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রিত্বে আসীন হয়েছেন। বহুজাতিক ও জাতীয় বৃহৎ পুঁজির ঢালাও পৃষ্ঠপোষকতায় হয়, তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন মিডিয়া-প্রচারের উদ্ভুদ প্রবাহে এবং হিন্দু ধর্মীয় জাতীয়তাবাদীদের সার্বিক প্রয়াসে এক মহান জাতীয় নেতার মহিমারঞ্জিত হয়ে, ভারতের এক উল্লেখযোগ্য জনাংশকে সুদিন নিয়ে আসার বাকবিভূতিতে মোহিত করে তাঁর এই প্রধানমন্ত্রিত্বে উত্তরণ। দলের সভাপতি হিসাবেও গুজরাটেরই আর এক সহযোগী আর এস এস নায়ক অমিত শাহ-কে আসীন করে এবং মন্ত্রিসভা সহ দলীয় সংগঠনের উচ্চতম স্তরে আর এস এস আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে তিনি সর্বক্ষমতাসম্পন্ন এক মহানায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে চলেছেন। গণতন্ত্রের সুদীর্ঘ ঐতিহ্যসম্পন্ন ভারত তাই এখন হিন্দুত্বের ধ্বজাধারী ও কর্পোরেট পুঁজির স্বার্থসাধক এক ফ্যাসিবাদী শাসনের ভয়াবহ সম্ভাবনার সম্মুখীন। তার নানা প্রকরণ ইতোমধ্যেই অনুসৃত হতে শুরু করেছে। সেই সঙ্গে জম্মু ও কাশ্মীর সহ ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে উত্তেজনা তৈরি হচ্ছে, যার সুযোগে সমগ্র ভারতের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিকেও সাম্প্রদায়িক উত্তেজনায় অস্থির করে তোলার সম্ভাবনাও বাড়ছে।

এ-জাতীয় যে-কোনো অপচেষ্টার বিরুদ্ধে জনগণের শুভ-চেতনাই সবচেয়ে বড় গ্যারান্টি। এ-প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বিষয়টি হল, ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন হলেও বিজেপি ভোট পেয়েছে মাত্র ৩১ শতাংশ মানুষের, অর্থাৎ দেশের প্রায় ৭০ শতাংশ মানুষই বিজেপি-কে চায়নি। তাছাড়া, ভারতের নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কেন্দ্র-রাজ্য ক্ষমতার বন্টন ও রাজ্যগুলির আপেক্ষিক স্বাভিত্ত্য, কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় স্তরেই আইনবিভাগ, শাসনবিভাগ ও বিচারবিভাগের পারস্পরিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ভারসাম্য রক্ষার ব্যবস্থা এবং সংবিধানের অভিভাবক হিসাবে বিচারবিভাগের বিশেষ ক্ষমতার মতো রক্ষাকবচগুলিও রয়েছে। জনগণের শুভ-চেতনা ও সাংবিধানিক রক্ষাকবচগুলি কতটা কার্যকর ভূমিকা নিতে পারে, তার উপরেই নির্ভর করবে বিজেপি সরকার তার উদ্দিষ্ট পথে কতদূর অগ্রসর হতে পারবে। জাতীয় জরুরি অবস্থা ঘোষণার ক্ষমতা প্রয়োগ করে কেন্দ্র সাময়িকভাবে যথেষ্টাচারী হয়ে উঠতে পারে, ইন্দিরা গান্ধী ১৯৭৫ সালে যার উদাহরণ স্থাপন করেছিলেন। তারই কোনো ভয়ংকরতর রূপ ভারতবাসীকে প্রত্যক্ষ করতে হবে কিনা সে আশঙ্কা একেবারে অমূলক নয়। সর্বোপরি, জাতীয় পরিস্থিতিকে উত্তাল করে তুলে সমগ্র সাংবিধানিক ব্যবস্থাকেই বিপর্যস্ত করে সম্ভ্রান্তবাদী স্বৈরতন্ত্রের পূর্ণ প্রতিষ্ঠার দিকে নিয়ে যাওয়া ভারতের মতো গণতন্ত্রের সুদীর্ঘ ঐতিহ্যসম্পন্ন বিশাল ও বৈচিত্র্যময় দেশে কতটা সম্ভব কিংবা আদৌ সম্ভব কিনা, ভবিষ্যতই তা প্রমাণ করবে।

পশ্চিমবঙ্গে ফ্যাসিবাদের অনুশীলন

রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের মাধ্যমেই ফ্যাসিবাদী একনায়কতন্ত্রের পূর্ণ আত্মপ্রকাশ সম্ভব। বিজেপি-শাসনাধীন ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র এখন সেই সম্ভাবনারই সম্মুখীন। কিন্তু তার একটি অঙ্গরাজ্যের সীমিত ক্ষমতার বৃন্তের মধ্যেও ফ্যাসিবাদী পদ্ধতি-প্রকরণের অনুশীলনকে কতদূর এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব তৃণমূল কংগ্রেসের তিন বছরের শাসন তা প্রতি মুহূর্তে প্রমাণ করে চলেছে। দীর্ঘ ৩৪ বছরের বামফ্রন্ট শাসনের শেষভাগে নানা ভ্রান্তি ও ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণে জনগণের ক্ষোভ ও হতাশাকে কাজে লাগিয়ে ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস ও এস ইউ সি আই-কে সঙ্গে নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মহানেতৃত্বে বামফ্রন্টকে পরাজিত করে শাসনক্ষমতা দখল করে। তৃণমূল কংগ্রেস এককভাবেই ২৯৪টি আসনের মধ্যে

১৮৪টি আসন পায়। কিছুদিনের মধ্যেই অপাংজেক্স কংগ্রেস ও এস ইউ সি আই জোট ছেড়ে বেরিয়ে যায়। প্রতিষ্ঠিত হয় তৃণমূল কংগ্রেসের তথা তার মহানেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একচ্ছত্র শাসন। দলনেত্রীকে দলদেবীর আসনে বসিয়ে তাঁর কৃপা লাভের প্রতিযোগিতায় তৃণমূল দলের প্রত্যেক নেতা বা কর্মী নিরন্তর তাঁর ভক্তি-আপ্নত নামোচ্চারণ ও প্রশস্তি বাচনে তৎপর। চিত্রপটে সর্বত্র তাঁর উপস্থিতি। দল ও দলনেত্রী, দল ও সরকার একাকার। দলের নেই কোনো সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি, নেত্রী যখন যা নির্দেশ দান করেন সেটাই তখনকার কর্মসূচি। তাঁর ইচ্ছাই চূড়ান্ত। তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রশংসনীয়, প্রশংসার অর্থ আত্মহনন।

পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল শাসন কার্যত এক সন্ত্রাসবাদী একনায়কতন্ত্রের রূপ পরিগ্রহ করেছে। যে-কোনো ভিন্ন মতের প্রতিই তৃণমূলের চূড়ান্ত অসহিষ্ণুতা। তবে সি পি আই(এম) তার প্রধানতম শত্রু। দলীয় একাধিপত্য প্রতিষ্ঠায় লুপ্তপনরায় তৃণমূলের অগ্রবাহিনী। স্বয়ং দলনেত্রীই তো প্রকাশ্য জনসভায় বিরোধীদের সতর্ক করে দিয়ে গর্বের সঙ্গে ঘোষণা করে দিয়েছেন যে তিনি মস্তানদের কন্ট্রোল করেন। দলের পতাকা উড়িয়ে, দলনেত্রীর জয়ধ্বনি দিয়ে, সস্তা শ্লোগানে, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিনাশসাধনের উত্তেজক আহ্বানে এরাই গণ-উন্মাদনার সৃষ্টি করে। সমগ্র নির্বাচন প্রক্রিয়াকে প্রহসনে পরিণত করে, বাহুবলে বিরোধীদের জয়কেও পরাজয়ে রূপান্তরিত করে, তৃণমূলের বিপুল জয়কে সুনিশ্চিত করে। এরাই ফ্যাসিবাদের ব্ল্যাকশার্ট-ব্রাউনশার্ট ঝটিকাবাহিনীর ভূমিকা নিয়ে খুন ও সন্ত্রাসের মাধ্যমে বিরোধী দল ও জনগণকে আতঙ্কিত করে রাখার ধারাবাহিক দায়িত্ব পালন করে চলেছে। তোলাবাজি, সিডিকেটের জুলুমবাজি, দুর্নীতি ও লুণ্ঠের অবাধ রাজত্ব কায়মে হয়েছে। সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গণ-সংগঠন, গণমাধ্যম এবং সকল রকমের সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের উপর দলের দখলদারি ও দাঙ্গাগিরি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। পুলিশকে দলদাসে পরিণত করে একদিকে দলীয় বাহুবলীদের যা-খুশি করার অবাধ সুযোগদান এবং অন্যদিকে বিরোধীদের নির্বিচার দমনের ছাড়পত্র দিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে সন্ত্রাস-হত্যা-নারীধর্ষণ ইত্যাদি নিত্যকার ঘটনা হয়ে উঠেছে। তৃণমূল শাসনের প্রথম তিন বছরের মধ্যেই বামপন্থী হওয়ার অপরাধে দেড়শতাবধিক হত্যা, সাড়ে সাত হাজার জখম ও সাতশত ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে, দেড় হাজার দলীয় ও গণসংগঠনের কার্যালয় ভাঙচুর বা দখল করা হয়েছে, প্রায় পঞ্চাশ হাজার জন ঘরছাড়া হয়েছে এবং আরও পঞ্চাশ হাজার জন মিথ্যা মামলায় গ্রেপ্তারের শিকার হয়েছেন। একেশ্বরীর নৈরাজ্যের রাজত্বে লাগামহীন সন্ত্রাস ও আতঙ্কের কবলে আজকের পশ্চিমবঙ্গ, যার তুলনা চলে ফ্যাসিবাদী আবহের সঙ্গেই।

ফ্যাসিবাদী কলা-কৌশলও অনসৃত হয়ে চলেছে ধারাবাহিকভাবে। সি পি আই(এম) তথা বামদলের সমস্ত শ্লোগান চুরি করে এখন তৃণমূলই প্রকৃত সমাজতন্ত্রী। একই সঙ্গে সব শ্রেণি ও গোষ্ঠীর সবরকম স্বার্থের কথা বলে এবং সবাইকেই সবরকম প্রতিশ্রুতি দিয়ে মানুষকে প্রত্যাশায় উন্মুখ করে রাখাই তার সুচতুর কর্মকৌশল। অনতিবিলম্বেই সেইসব প্রতিশ্রুতি পূরণের মিথ্যা দাবির ধারাবাহ্যে মিথ্যাকে সত্য প্রতিপন্ন করাই তৃণমূল শাসনের অগ্রগতির খতিয়ান। যা কিছু খারাপ তার সমস্ত দায় সি পি আই(এম)-এর নেতৃত্বে ৩৪ বছরের বামফ্রন্টের তথাকথিত অপশাসনের, যার প্রতি ধিক্কারবাণীতে তৃণমূলের যে-কোনো খারাপ কাজও নিমেষে যথার্থতা



লাভ করে। পাশাপাশি উন্নয়নে তৃণমূলের ব্যর্থতার দায় বইতে হয় কেন্দ্রীয় সরকারকে, কেননা যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ যোগানে অনীহাকেই এর কারণ হিসাবে তুলে ধরা হয়। অথচ বিভিন্ন ক্লাব ও গোষ্ঠীকে অকাতরে অর্থ বিলানো, অজস্র পুরস্কারপ্রদান এবং একের পর এক উৎসব-অনুষ্ঠানে অকাতর ব্যয়ে অর্থান্যায়ের কোনো ইঙ্গিত নেই। আসলে বস্তুগত অপ্রাপ্তির সমস্ত কষ্ট ও বেদনাকে ভুলিয়ে সমর্থনের এক আবেগময় আবহ রচনার জন্য নানা প্রলোভন সৃষ্টি, বিনোদন জগৎ নিয়ে বাড়াবাড়ি, মানুষকে বিনোদনে নিমজ্জিত রাখা, পপুলার কালচারের উদ্দীপনায় মানুষকে মাতিয়ে তোলার ধারাবাহিক প্রয়াসে মহানেত্রী ও তাঁর দল সদাতৎপর। বুদ্ধিজীবীদের প্রলুব্ধ করে দলীয় পরিবৃত্তে টেনে এনে ভাবমূর্তিকে উজ্জ্বল করা এবং মানুষের শ্রদ্ধা অর্জনের প্রক্রিয়াও চলমান। সুযোগমতো ধর্ম ও জনজাতিগত সম্ভাবোধকে উস্কে দিয়ে বিশেষ সমর্থন অর্জনের প্রয়াসেও তৃণমূলনেত্রীর কোনো কুণ্ঠা নেই। কুণ্ঠা নেই সারদা চিটফাঙে জনগণের আমানত নির্বিচারে লুণ্ঠ করে দল ও দলনেতাদের স্বর্গীত থেকে স্বর্গীতর করে তোলায়। অর্থ-লুণ্ঠের মতো ভোট-লুণ্ঠও দলের নির্বাচনী জয়ের গ্যারান্টি। কিন্তু ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস তার বাহুবলীদের দ্বারা ব্যাপক ভোট লুণ্ঠের মাধ্যমে ৪২টি-র মধ্যে ৩৮টি আসন দখল করলেও প্রাপ্ত ভোট কিন্তু কমে হয়েছে ৩৯.৩ শতাংশ। লুণ্ঠ করা ভোট বাদ দিলে সেটা কত শতাংশে গিয়ে দাঁড়াবে সে প্রশঙ্গ না হয় বাদই দেওয়া গেল।

বামপন্থার সামনে চ্যালেঞ্জ

সর্বভারতীয় ও রাজ্যস্তরে বামশক্তি এখন এক বিরাট চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। কীভাবে তার মোকাবিলা করা সম্ভব তা একটি স্বতন্ত্র পর্যালোচনার বিষয়। তবে আসনসংখ্যার বিচারে লোকসভায় বিজেপি ও পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় তৃণমূল কংগ্রেস বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলেও প্রাপ্ত ভোটের বিচারে জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের সমর্থন থেকে এখনো তারা অনেক দূরে। এককভাবে সম্ভব না হলেও বাম ও গণতান্ত্রিক দলসমূহের ব্যাপকতর একা গড়ে তুলে সেই বিকল্প-প্রত্যাশী সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের আস্থা অর্জনের মাধ্যমেই একমাত্র এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা সম্ভব হতে পারে। এবং ধরাবাঁধা শ্লোগান এবং গতানুগতিক চিন্তাধারা ও কর্মপ্রণালীতে আবদ্ধ না থেকে পরিবর্তমান ভারতীয় বাস্তবতা এবং ভারতীয় জনগণের শুধু ধর্মগত নয়, সেই সঙ্গে তার জনজাতিগত বিপুল বৈচিত্র্যের বাস্তব বিশ্লেষণ, তদনুযায়ী তাদের শ্রেণিচেতনায় উন্নীত করার কর্মপ্রণালী নির্ধারণ এবং গভীর জনসংযোগের সাংগঠনিক উদ্যোগের মাধ্যমেই বামশক্তিকে সেই আস্থা অর্জনের যোগ্য হয়ে উঠতে হবে।

With best compliments of

DURGAPUR SAW MILL

TIMBER MERCHANTS & GENERAL ORDER SUPPLIERS

G. T. Road (Main Gate), P.O. Durgapur-713203, West Bengal
Phone : 0343 2585184, 6452480, Mobile : 9832163188

Sl. No. 170

ইরাকে আইএসআইএস-এর উত্থান : ইসলামি রাষ্ট্র গঠন এবং জেহাদি আন্দোলন

সেখ সাইদুল হক

প্রস্তাবনা

মুসলিম জঙ্গিবাদী গোষ্ঠী আলকায়েদা এবং তার প্রতিষ্ঠাতা ওসামা বিন লাদেনের কথা কমবেশি আমরা সকলেই জানি। বিশেষ করে ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর মার্কিন দেশের নিউইয়র্কের যমজ মিনার বিমান হানায় ধ্বংসের পর এই সংগঠনের পরিচিতি বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে। তারপর ওসামা বিন লাদেনের খোঁজে আফগানিস্তানে ও পাকিস্তানের সীমান্তে তল্লাসির নামে মার্কিনীদের অভিযান এবং অবশেষে লাদেনকে ধরা এবং তাকে হত্যা করা এই ঘটনার আলোচনাও সময়ের সাথে সাথে কিছুটা স্তিমিত হয়েছে। আফগানিস্তানের বুকো ইসলামি রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যে তালিবানদের আন্দোলনের কথাও আমরা জানি। যদিও তালিবানরা এখনও আফগানে, পাকিস্তানের কিছু এলাকায় সক্রিয়তা দেখাচ্ছে, তথাপি যে ঘটনা সাম্প্রতিককালে আমাদের সবার নজর কেড়েছে তা হলো ইরাকের ঘটনা—যেখানে ইসলামি রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যে চোরাগোপ্তা কিংবা আচমকা আক্রমণের সম্ভ্রাসবাদী কার্যকলাপ নয়, আইএসআইএস বা আইসিস (Islamic State of Iraq and Syria) নামে একটি গোটা মিলিশিয়া বা সশস্ত্র বাহিনী ইরাকের সামরিক বাহিনীর সাথে সম্মুখ সমরে নেমে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ মুসুল (Moosul) শহর সহ বিস্তীর্ণ এলাকা থেকে ইরাকি বাহিনীকে হটিয়ে দিয়ে তা নিজেদের দখলে এনেছে। মুসুল হলো ইরাকের অন্যতম

বাণিজ্যকেন্দ্র। মুসুল দখলের পর এই মিলিশিয়া টাইগ্রিস নদী ধরে আরো দক্ষিণে এগিয়ে দখল করে নিয়েছে সাদ্দাম হুসেনের শহর টিকরিত। আইসিসআইসি ইতিমধ্যে সিরিয়া ও ইরাকের বেশ কয়েকটি তৈলক্ষেত্র এবং জলাধারও নিজেদের দখলে এনেছে। এই ঘটনা শুধু ইরাকে কিংবা সিরিয়ায় কিংবা মধ্যপ্রাচ্যে নয়, গোটা বিশ্বে আলোড়ন ফেলেছে কেননা এর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে যে-সব জেহাদি গোষ্ঠীগুলি ইসলামি রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যে কিংবা বিশ্ব ইসলামি জীবনচর্যাকে পুনরুত্থানের লক্ষ্যে কাজ করছে তারা আবার সক্রিয় হয়েছে। তাই ইসলামি রাষ্ট্র গঠনে আন্দোলন কিংবা জেহাদি আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনার আগে আইএসআইএস-এর উত্থান এবং ইরাকের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী নিয়ে কিছু আলোকপাত করতে চাই।

আইএসআইএস-এর উত্থান এবং ইরাকের ঘটনাবলী

আইএসআইএস বা ইসলামিক স্টেট অব ইরাক অ্যান্ড সিরিয়া-কে কখনও কখনও আইএসআইএল (Islamic State of Iraq and the Levant) বলেও অভিহিত করা হয়। এটি একটি সুন্নি মুসলিমদের জেহাদি সংগঠন যারা ইরাক সহ সমগ্র লেভান্ট অঞ্চলে (Levant Region) অর্থাৎ সিরিয়া জর্ডন, ইসরায়েল, প্যালেস্টাইন, লেবানন এবং দক্ষিণ তুর্কিস্তান দেশগুলিকে নিয়ে একটি ইসলামিক রাষ্ট্র গঠন করতে চায়। এই সংগঠনের বর্তমানে যিনি প্রধান ও



আমির সেই আবু বকর আল বাগদাদী নিজেকে খলিফা ঘোষণা করেছে এবং চাইছে সমগ্র মুসলিম দুনিয়ার ধর্মীয় কর্তৃত্বে নিজেকে উপস্থাপিত করতে। ইরাক ও সিরিয়ার বিভিন্ন জঙ্গি ইসলামি গোষ্ঠী যারা মূলত সুন্নি তারা এই সংগঠনে যুক্ত হয়েছে কিংবা সমর্থন করেছে। যেমন মুজাহিদিদীন সুরা কাউন্সিল, ইসলামিক স্টেট অব ইরাক এবং আলকায়দা ইন ইরাক, জৈয়স আন ফাতেহি, আনসার-আল-তাহিদ, জইস-আল-তাইফা আন মনসুরা ইত্যাদি। এছাড়া ইরাকের সুন্নি কুর্দ উপজাতি গোষ্ঠীগুলির একটা অংশ এর সাথে যুক্ত হয়েছে।

এক সময় এই গোষ্ঠী ছিল একটি শাখা সংগঠন। মূল সংগঠনটির নাম ছিল জামাত-আল-তৌহিদ-আল-জিহাদ। ২০০০ সালের শুরুতে এই মূল সংগঠনটি তৈরি করেন আবু মুসা আল জারকাওয়াই (Al-Zarqawi)। জারকাওয়াই ছিলেন একজন জর্ডনীয় সালাকী যিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের দখলদারির বিরুদ্ধে লড়াই করতে আফগানিস্তান গিয়েছিলেন। কিন্তু সোভিয়েত ফৌজ ইতিমধ্যে চলে যাওয়ায় তিনি ফিরে এসে পুনরায় আফগানিস্তানে যান এবং হিরাত শহরে ইসলামি জঙ্গি ট্রেনিং ক্যাম্প খোলেন। তারপর তিনি জর্ডনের রাজাকে উৎখাত করার জন্য এক নেটওয়ার্ক তৈরি করতে শুরু করেন। ২০০২ সালে জর্ডনে আমেরিকার রাষ্ট্রদূত লরেন্স ফোলেকে হত্যায় তাঁর নাম জড়িয়ে যায়। ২০০২ সালে আফগানিস্তানে মার্কিন সেনা অভিযান শুরু হলে তিনি পশ্চিম ইরাকে চলে যান। সেখানে তিনি ইরাকের ইসলামি জঙ্গিগোষ্ঠী আনসার-আল-ইসলামের সাথে জোটবন্ধন গড়ে তোলেন। পরে তা ভেঙে যায়।

২০০৩ সালে আমেরিকা সাদ্দাম হুসেনকে উৎখাত করার জন্য ইরাক অভিযান শুরু করলে এবং সাদ্দামের পতন ঘটলে মার্কিনিরা সেখানে তার সেনাবাহিনীকে রেখে দেয় এবং একটি পুতুল সরকার বসায় যার প্রধান হন একজন শিয়া। আমেরিকার বাহিনীর উপস্থিতি ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে এবং শিয়াদের বিরুদ্ধে জারকাওয়াই বিভিন্ন ইসলামি জঙ্গিদের সম্মিলিত করে ওসামা বিন লাদেনের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে আল-কায়দা-ইন-ইরাক গঠন করেন ২০০৪ সালের অক্টোবর মাসে। এই নামে তারা নিজেদের অভিহিত না করলেও এই নামেই তাদের পরিচিতি হয়। এই সংগঠনটি অন্যান্য গোষ্ঠীর সাথে মিলে তৈরি করে মুজাহিদিন সুরা কাউন্সিল। এই গোষ্ঠী ২০০৫ সালে আশ্মানের তিনটি হোটেলে বিস্ফোরণ ঘটায়। ২০০৬ সালের জুনে জারকাওয়াই এক সংঘর্ষে মারা গেলে ২০০৬ সালের ১২ অক্টোবর ওই কাউন্সিল আরও কিছু জঙ্গি গোষ্ঠীকে যুক্ত করে এক অনুষ্ঠানে মিলিত হয়ে ঘোষণা করে যে তাদের লক্ষ্য হল শিয়াদের আধিপত্য ও পশ্চিমিদের অত্যাচার থেকে সুন্নিদের রক্ষা করা এবং আল্লাহ-র পথে দেশকে চালিয়ে ইসলামের গৌরবের পুনরুত্থান করা।

এই পটভূমিতে পরদিন অর্থাৎ ২০০৬ সালের ১৩ অক্টোবর ‘ইসলামিক স্টেট অব ইরাক’ ঘোষিত হয়। একটি মন্ত্রিসভা গঠিত হয় যার আমির হন আবু আবদুল্লাহ-আল-রাশিদি-আল-বাগদাদি। এই নামেই ওই গোষ্ঠীর নাম হয়। এই গোষ্ঠীর মূল চালিকা চাবি থাকে মিশরীয় আবু আবু আল মাশারির হাতে। ইরাকের আল কায়দা সহ অন্য কিছু গোষ্ঠী অবশ্য এই ধরনের মন্ত্রিসভা গঠনকে সমর্থন করেনি। তথাপি এই জেহাদি আদর্শকে সামনে রেখে এই সংগঠনটি ইরাকের সুন্নি এলাকাগুলিতে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। এবং মানববোমার মাধ্যমে আমেরিকান বাহিনী ও ইরাকের শিয়া ধর্মাবলম্বী শাসনকর্তার বাহিনীর বিরুদ্ধে অর্থাৎ যৌথ বাহিনীর বিরুদ্ধে আক্রমণ সংগঠিত করতে থাকে। ২০১০ সালের এপ্রিলে

এই দুই যৌথ বাহিনীর আক্রমণে আল-বাগদাদি ও আল মাশারি নিহত হন। তখন এই দলের নেতা হন আবু বকর-আল-বাগদাদি। আবু-বকর-আল-বাগদাদির বয়স ৪৩ বছর। তিনি বাগদাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট। ইনিই বর্তমানে আইএসআইএস নেতা। ২০১৩ সালে এই সংগঠনের কাজকর্ম ইরাক ছাড়াও সিরিয়াতে বিস্তৃত হয়। সিরিয়ার গৃহযুদ্ধে এই গোষ্ঠী সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। তারপর এপ্রিল মাসে এই গোষ্ঠীটির নামকরণ হয় Islamic State of Iraq and Syria। কেউ সিরিয়ার পরিবর্তে বলে আল সাম (Al-Sham)। সাম শব্দটির অর্থ বৃহত্তর সিরিয়া যাকে পূর্বে লেভান্ত অঞ্চল বলা হতো।

এখন এই গোষ্ঠী আর কেবল একটি জঙ্গি গোষ্ঠী নয়। এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে একটি মিলিশিয়ায় যার নিজস্ব সামরিক বাহিনী আছে। ইরাকেই এদের আছে চার হাজারের বেশি প্রশিক্ষিত যোদ্ধা (Armed Militia)। এরা তাদের জঙ্গি কার্যকলাপ সিয়া সমর্থক ও বিদেশি শাসক ও তাদের বাহিনীকে লক্ষ্য করে চালাতো। এরা আলকায়দার সাথে সম্পর্ক রেখে কাজ করতো। যদিও ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে এরা আলকায়দার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে স্বাধীনভাবে জঙ্গি কার্যকলাপ চালাচ্ছে। আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র সহ সামরিক বাহিনী গড়ে তুলে তারা ইরাকের বিস্তীর্ণ অঞ্চল দখল করেছে। মাসুল শহর দখলের পর ২৯ জুন ২০১৪ তারা খিলাফৎ গঠনের কথা ঘোষণা করেছে এবং আবু-বকর-বাগদাদি তার আমির হয়েছেন। এই গোষ্ঠী এখন নিজেদেরকে আইএসআইএস না বলে কেবল ‘ইসলামিক রাষ্ট্র’ (Islamic State) এই নামে অভিহিত করেছে। অর্থাৎ তাদের লক্ষ্য কেবল ইরাক নয়, গোটা লেভান্ত ও মধ্যপ্রাচ্যে ইসলামিক রাষ্ট্র গঠন করে খিলাফৎ কার্যকর করা।

এই জঙ্গিবাহিনীর আয়-ব্যয়, সদস্যভুক্তি বা চিঠিপত্র সংগ্রাস্ত তথ্যাবলী যা RAND Corporation সংস্থার মাধ্যমে ২০১৪-তে সামনে এসেছে, তাতে দেখা যাচ্ছে ২০০৬ সালে প্রতিষ্ঠা হবার পর ২০১০ সাল পর্যন্ত এই আয়ের ৫ শতাংশ এসেছে বাইরের দান থেকে, ২৫ শতাংশ এসেছে অপহরণ করে টাকা তুলে বা তোলাবাজির মাধ্যমে বা ভয় দেখিয়ে চাঁদা নেওয়ার মাধ্যমে। বাকিটা এসেছে সদস্য চাঁদা বাবদ। যার বড় অংশ এসেছে মাসুল সহ সুন্নি অধীন এলাকা থেকে। এইসব অর্থ জঙ্গি আক্রমণ শানাবার জন্য বিভিন্ন এলাকায় বন্টন করা হতো। ইরাকি গোয়েন্দা সূত্র থেকে জানা যাচ্ছে যে ২০১০ সালের পর থেকে ২০১৪-র মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত এই জঙ্গি গোষ্ঠীর হাতে এসেছে ২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এক অর্থে এটিই বিশ্বের সবচেয়ে ধনী জেহাদি গোষ্ঠী। এই অর্থের সিংহভাগ এসেছে ২০১৪-র জুনে মাসুল দখল করার পর। কেননা এরা মাসুলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক থেকে ৪২৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার লুট করেছে। পাশাপাশি পূর্ব সিরিয়াতেও এই গোষ্ঠী খুবই সক্রিয়। ওখানে একটা বড় এলাকা নিজেদের দখলে এনেছে যেখানে তৈল খনি আছে। এছাড়া এরা দখলীকৃত সিরিয়ীয় অঞ্চলে নিজেরাই ক্রুড অয়েল (crude oil) তৈরি করে তা বিক্রি করছে। এমনকি উত্তর সিরিয়াতে এরা বৈদ্যুতিক শক্তিও বিক্রি করছে।

এই গোষ্ঠীর হাতে চার হাজারের মতো প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সেনানি আছে, এর মধ্যে এক হাজার জন অতি প্রশিক্ষিত কমান্ডো ফোর্স। এরা ইতিমধ্যে দখল করেছে বা নিজেদের দখলে এনেছে ভূমি থেকে আকাশে নিক্ষেপযোগ্য স্টিনজার মিশাইল। এছাড়া আছে এম ১৯৮ হাউজার্ড, অ্যান্টি এয়ারক্রাফট রাইফেল, মিসিনগান এবং স্কাড মিসাইল। এমনকি তারা মাসুল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নিউক্লিয়ার সরঞ্জামও দখল করেছে। এগুলির বিশদে উল্লেখ করলাম এই কারণে যে এই বাহিনী এখন আলকায়দা অপেক্ষা অনেক বেশি

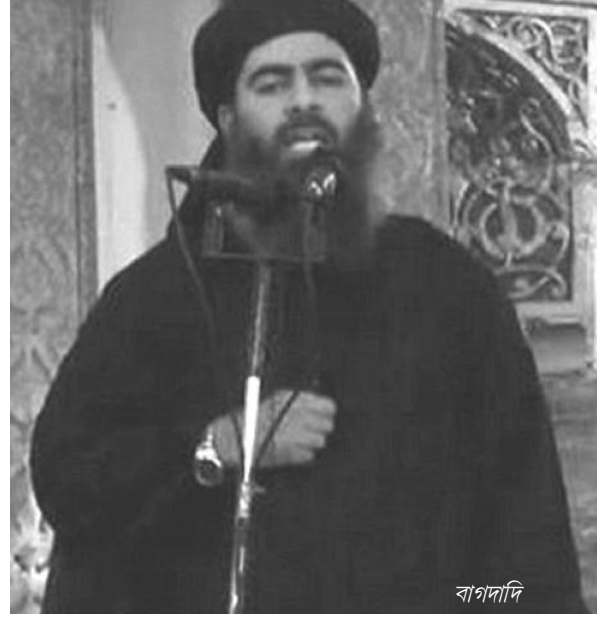
শক্তিদর এবং ভয়াবহ। নিজেকে সে এখন বিশ্বের বিভিন্ন ইসলামি জেহাদি গোষ্ঠীগুলির নেতা হিসেবে প্রতিপন্ন করতে চাইছে।

আইএসআইএস-এর গণভিত্তি ও অগ্রগতি

ইসলামের নতুন খলিফা হিসেবে বাগদাদির আনুগত্য মেনে নেওয়ার জন্য অন্যান্য জেহাদি সংগঠনগুলিকে স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে আল কায়দা প্রধান আল জাওহিরির কাছে নিঃসন্দেহে এটা কঠিন চ্যালেঞ্জ। আবু বকর-আল-বাগদাদির ‘ইসলামিক স্টেট ইন ইরাক অ্যান্ড সিরিয়া’ সংক্ষেপে আইএসআইএস (বা আইসিস) যে গতিতে টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর অববাহিকায় অগ্রসর হচ্ছে তাতে জাওহিরির আল কায়দা এদের শক্তির তুলনায় অপ্রাসঙ্গিক প্রতিপন্ন হওয়ারই কথা। সিরিয়া ও উত্তর ইরাকের সুন্নি অধ্যুষিত যে এলাকা ইতিমধ্যে আইএসআইএস-এর দখলে এসেছে তা পৃথিবীর অনেক দেশের আয়তনের চেয়ে বড়। ইরাকের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর ও বাণিজ্যকেন্দ্র মাসুল দখলের পর আইএসআইএস বাহিনী টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদী ধরে আরও দক্ষিণে নেমে এসে এখন বাগদাদের ঘাড়ের উপর নিশ্চয় ফেলছে। যদি আইএসআইএস-এর এই অভ্যুত্থান সম্পূর্ণ ব্যর্থও হয়ে যায়, তাহলেও এই ঝোড়ো অভিযান তাদের জেহাদি ইতিহাসে স্থায়ী জায়গা করে দেবে। আমেরিকা বাগদাদির মাথার দাম এক কোটি ডলার ঘোষণা করেছে।

মাসুল দখল করার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে টাইগ্রিস নদী ধরে আরও দক্ষিণে এগিয়ে আইএসআইএস বাহিনী যখন দখল করে নেয় সাদ্দাম হুসেনের শহর টিকরিত, তখন ওই শহরে প্রাথমিকভাবে এই সুন্নি জঙ্গিদের যে রাজকীয় অভ্যর্থনা মিলেছে তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। ইরাকে সুন্নি সম্প্রদায়ের মধ্যে বঞ্চনাবোধের উৎস যদি খুঁজতে হয়, তাহলে নিঃসন্দেহে তা মার্কিন বাহিনীর হাতে সাদ্দামের নিধন হওয়ার ঘটনা। ২০০৩-এ সাদ্দামের পতনের পর থেকেই ইরাকে ভয়াবহ শিয়া-সুন্নি গোষ্ঠী লড়াইয়ের সূত্রপাত। মার্কিন মদতে শিয়া নেতা নুরি আল মালিকী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর সে গোষ্ঠী সংঘর্ষ ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। শিয়া প্রধান ইরাকে গত এক দশকে সেনাবাহিনী প্রশাসন ও সমস্ত সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে সুন্নিদের যেভাবে বিতাড়িত করা হয়েছে, তাতে তাদের বঞ্চনাবোধ আরও তীব্র হয়েছে। যা একদা আল কায়দার শাখা সংগঠন আইএসআইএস-এর সমর্থন ভিত্তি তৈরিতে সুবিধা করে দিয়েছে। শিয়া, সুন্নি ও কুর্দ—এই তিনভাবে ইরাকের জনসমাজ বিভক্ত। কয়েকদিন আগে মালিকি সরকার এক সুন্নি মধ্যপন্থী নেতাকে ইরাকের পার্লামেন্টের স্পিকার পদে মেনে নিয়েছেন। এক কুর্দকে ইরাকের প্রেসিডেন্ট পদে বসানো হয়েছে। এই ঘটনাকে পশ্চিমি দুনিয়ার তরফে ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হলেও, এই মুহূর্তে তা কতটা কার্যকর তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। বস্তুত এখন পরিস্থিতি সম্পূর্ণ মালিকি সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। ওদিকে গাজায় ইজরায়েলের সামরিক অভিযানে প্যালেস্তাইনীয় মুসলিমদের মৃত্যুর গ্রাফ প্রতিদিন লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। আমেরিকা সহ পশ্চিমি দুনিয়া পরোক্ষে ইজরায়েলকেই সমর্থন করছে। যা শেষ বিচারে মধ্যপ্রাচ্যে বাগদাদির আইএসআইএস-এর মতো জঙ্গি গোষ্ঠীগুলির শক্তিবৃদ্ধিতে সাহায্য করেছে।

মাত্র ১০০০ জনের বাহিনী নিয়ে আইএসআইএস ২০ লক্ষ মানুষের শহর মাসুল দখল করেছে। শহর দখলের পর দলে দলে সুন্নি যুবকরা তাদের সঙ্গে এসেছে। জঙ্গিরা মাসুল দখল করার পর সেখানে গান-বাজনা, ধূমপান, মহিলাদের বোরখা না পরে প্রকাশ্যে চলাফেরা ইত্যাদি নিষিদ্ধ হয়েছে। জঙ্গিদের কথা না শুনলে প্রকাশ্যে



মৃত্যুদণ্ডের মতো ঘটনাও কিছু ঘটছে বলে জানা গেছে। এমনকি প্রকাশ্য রাজপথে মানুষের হাত কেটে নেওয়ার মতো ঘটনা জঙ্গিরা টুইটারে লাইভ সম্প্রচার করেছে। এক সময় আফগানিস্তানে তালিবানরা এই কাজ করেছিল। কিন্তু তাদের সাথে এদের পার্থক্য আছে। চিন্তাধারা সপ্তম শতকের হলেও আইএসআইএস জঙ্গিরা ফেসবুক, টুইটার, ইউটিউব ইত্যাদি সোশ্যাল মিডয়ার ব্যবহারে খুব দক্ষ। বস্তুত, সোশ্যাল মিডিয়াকে ব্যবহার করে জঙ্গি অভিযান চালানোর এই কৌশল গোটা পৃথিবীর সমরবিশেষজ্ঞদের নজর কেড়েছে। পৃথিবীর আর কোনো জঙ্গি গোষ্ঠী এদের মতো এত পারদর্শী নয়।

বাগদাদির স্বপ্ন ফের খলিফাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা। আপাতত সিরিয়া, ইরাক, লেবানন ও জর্ডানের বিস্তীর্ণ অংশ নিয়ে এই খলিফাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চায় এই সংগঠন। প্রাচীন ইতিহাসে এই অঞ্চলটি লেভান্ত বলে পরিচিত। পূর্বে টাইগ্রিস নদীর অববাহিকা থেকে পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত এই লেভান্ত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে যা ছিল তুর্কি অটোমান সাম্রাজ্যের অধীন। বস্তুত, সব মুসলিম জঙ্গি সংগঠনই আল-আফগানির বিখ্যাত প্যান ইসলাম তথা বিশ্ব ইসলাম-এর তত্ত্ব দ্বারা অনুপ্রাণিত। এই তত্ত্বের নির্যাস হল সব মুসলিম দেশ খলিফার অধীনে শাসিত ও সংগঠিত হলে, তবেই মুসলিমদের অগ্রগতি ও ঐক্য সম্ভব।

বাগদাদির খলিফাতন্ত্রের স্বপ্ন বৃহত্তর মুসলিম জনসমাজের কাছে যতই অবাস্তব লাগুক, ইরাক ও সিরিয়ার বিস্তীর্ণ অংশ যে আইএসআইএস-এর দখলে চলে এসেছে তা উপেক্ষা করার কোনো সুযোগ নেই। বাগদাদি যে আল কায়দাকে আরব দুনিয়ায় অবাস্তর করে দিয়েছে, তা নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই। সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশাল আল আসাদ এবং ইরাকি প্রধানমন্ত্রী নুর-আল-মালিকির পক্ষে সম্ভব নয় এই দুর্ধর্ষ জঙ্গিদের মোকাবিলা করে জমি পুনরুদ্ধার করা। সিরিয়া ও ইরাকের শিয়া-প্রধান সরকারের পাশে শিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ ইরান দাঁড়িয়েছে। সুন্নি জঙ্গিদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য ইরান থেকে ইরাকে সুখোই বিমান এসেছে। কিন্তু বিমানহানা দিয়ে কি মাটির উপরের বাস্তবতাকে বদলে দেওয়া সম্ভব? মার্কিন ও তার মিত্রদের ও গালফ-এর রাজতন্ত্রগুলির টাকায় বলীয়ান বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলি সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট আসাদের বিরুদ্ধে সিরিয়াতে দীর্ঘদিন

গৃহযুদ্ধ চালাচ্ছে। একইভাবে মার্কিন ইন্ধনে গোষ্ঠী সংঘর্ষ ও গৃহযুদ্ধে ছিন্নভিন্ন ইরাক। সিরিয়া ও ইরাকের তেলভাণ্ডার দখল করতে মরিয়্যা আমেরিকা। দুই দেশের দাঙ্গা-হাঙ্গামায় পীড়িত সুন্নি জনমানসকে এখন ভরসা যোগাচ্ছে আইএসআইএস। এই বাস্তবতাকে বিমানহানা দিয়ে বদলে ফেলা সম্ভব নয়। কটর জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে যে সাধারণ মানুষ লড়াই করতে পারতো তারাই আজ জঙ্গিদের পাশে।

আইএসআইএস জঙ্গিরা যত বাগদাদের দিকে অগ্রসর হচ্ছে তত ইরাকে শিয়া বনাম সুন্নি গোষ্ঠী লড়াই প্রবল হচ্ছে। রাষ্ট্রসংঘের হিসাবে গত দেড় মাসে ইরাকে সাড়ে পাঁচ হাজার নিরীহ মানুষ গোষ্ঠী লড়াইয়ে প্রাণ হারিয়েছেন। আইএসআইএস-এর দখলে সিরিয়া ও ইরাকের বেশ কয়েকটি তৈলক্ষেত্র ও জলাধার। সিরিয়ার আল-ওমর তৈলক্ষেত্র আইএসআইএস দখল করেছে। ইরাকের বাইজি তেল শোধনাগারের দখলও তারা পেয়েছে। এছাড়া ইরাকের ফালুজা জলাধার ও সিরিয়ার তাবকা জলাধার পুরোপুরি আইএসআইএস জঙ্গিদের নিয়ন্ত্রণে। মধ্যপ্রাচ্যে তেল ও জলের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারলে অনেকদিন ক্ষমতায় টিকে থাকা যায়। তেল ও জলের উপর নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ইতিমধ্যে দখলে আসা সিরিয়া ও ইরাকের বিস্তীর্ণ অংশের উপর যদি আইএসআইএস দীর্ঘস্থায়ী অধিকার কয়েম করতে পারে, তাহলে তা পার্শ্ববর্তী জর্ডন, লেবানন সহ আরব দুনিয়া ও অন্যান্য এলাকার জেহাদি গোষ্ঠীগুলিকে অনুপ্রেরণা ও মদত জোগাবে।

মার্কিন সরকারের অবদান

পূর্বেই বলেছি মার্কিন সরকার আবু-বকর-আল-বাগদাদি-র মাথার দাম ১ কোটি ডলার ঘোষণা করেছে। ইতিমধ্যে মার্কিন প্রশাসন উজবেকিস্তানের রাজধানী আর্বিলের কাছে আইএসআইএস জঙ্গি গোলন্দাজ বাহিনীকে লক্ষ্য করে এফ-১৮ যুদ্ধবিমান থেকে বোমা বর্ষণ শুরু করেছে। যখন আইএসআইএস বাহিনী সিরিয়া গৃহযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিল তখন মার্কিন প্রশাসন পরোক্ষে এদের ইন্ধন জুগিয়েছিল আসাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য। এমনকি জুন মাস থেকে যখন আইএসআইএস বাহিনী উত্তর ইরাকের বেশ কিছু শহর দখল করেছিল তখন মার্কিন সরকার নিলিগু ছিল। মার্কিনদের একটা উদ্দেশ্য থাকতে পারে যে ২০১১ সালের শেষের দিকে ইরাক থেকে মার্কিন বাহিনী তুলে নেওয়া হয়। কিন্তু ওখানে কর্মরত ইঙ্গ-মার্কিন তৈল কোম্পানিগুলি চাইছিল তাদের তেল সরবরাহ বজায় রাখতে মার্কিন বাহিনী আবার আসুক। তাই প্রথমদিকে মার্কিন সরকার নিলিগুতো দেখিয়েছিল। কিন্তু যেই মাত্র আইএসআইএস বাহিনী ইরাকের বাহিনীকে পরাজিত করে মাসুল ও টিকরিট শহর সহ আরও ১৭টি শহর দখল করল এবং বেশ কিছু তৈলক্ষেত্র নিজেদের দখলে নিয়ে এল তখন পেন্টাগনের টনক নড়ল। কেননা আইএসআইএস বাহিনী ইতিমধ্যে সিনজা পর্বতকে ঘিরে রেখেছে এবং আর্বিলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। যদি আর্বিল এরা দখল করে নেয় তাহলে সেখানকার বিশাল সংখ্যক তেলের খনি থেকে তেল সরবরাহের সুযোগ মার্কিনরা হারাবে। তাছাড়া ২০১২ সালে বেনগাছির মার্কিন কনসুলেটে জঙ্গি হানায় ওবামা প্রশাসন বেকায়দায় পড়েছিল। আবার যদি আর্বিল কনসুলেটে এই ধরনের আক্রমণ হয় তাহলে মার্কিন প্রশাসন নিজের দেশেই চাপের মুখে পড়বে।

মার্কিন প্রশাসন জানিয়েছে যে, এক ইরাকি আর্তি জানিয়েছেন বলে তারা এগিয়ে এসেছে। এটা মোটেই ঠিক নয়। তাহলে গাজায় কত মানুষ আর্তি জানিয়েছিল তখন মার্কিন সেনা আসেনি বরং ইজরায়েলকে সমর্থন জানিয়েছে। ফলে মার্কিনদের লক্ষ্য হল

আবার ইরাকে সৈন্য নামিয়ে তেলখনিগুলিকে কজায় রাখতে। ইরাকের নূর-আলি-মালিকের পুতুল সরকার মার্কিন অভিযানকে সমর্থন করলেও এই সরকারের কিছু কিছু শরিক এখন আপত্তি জানাতে শুরু করেছে। কিন্তু আইএসআইএস এই মার্কিন বিমান হানাকে উপেক্ষা করেই এগিয়ে চলেছে। ইতিমধ্যে মাসুল দখল করার পর টাইগ্রিস নদীর উপর এগিয়ে মাসুল ড্যাম্পও দখল করে নিয়েছে। এর ফলে ইরাকে উৎপাদিত জলবিদ্যুৎ-এর একটা বিরাট অংশ জঙ্গি নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে।

ইসলামি রাষ্ট্র

আইএসআইএস বর্তমানে তার নামকে সংক্ষেপ করে বলেছে কেবল ‘ইসলামিক স্টেট’। তারা এটা বলছে এই কারণে যে কেবল সিরিয়া ও ইরাকে নয় তারা চায় সমস্ত বিশ্বের সমস্ত মুসলিমদের একটি খলিফার অধীনে আনতে। আর সেই খলিফা হবেন আবু বকর আল বাগদাদি। কিন্তু বিষয়টিকে শুধু এইভাবে সরলীকরণ করে ব্যাখ্যা করলে হবে না। কেননা বিশ্বে ধর্মপ্রাণ মুসলিম জনগণের কাছে ইসলামি রাষ্ট্র গঠনের আত্মনাটি খুবই স্পর্শকাতর ও আবেগের সাথে জড়িত বিষয়। বিশ্ব মুসলিম জনগণের একটা বড় অংশ মনে করেন যে পশ্চিম সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাবে ইসলামি সংস্কৃতি ও জীবনবোধের অবক্ষয় ঘটেছে। ইসলাম নিজেই একটি জীবনদর্শন ও পাকাপাকি রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিচালনারও দিক-নির্দেশক। হজরত মহম্মদ তাঁর জীবিতাবস্থায় কীভাবে ইসলামি রাষ্ট্র পরিচালিত হবে তার দিক-নির্দেশিকা দিয়ে গেছেন। পরবর্তী চার খলিফার আমলে তার সম্যক প্রতিফলন ঘটেছে। বিশ্বের মুসলিম জনগণ সেই দিক-নির্দেশিকাকে অশ্রান্ত বলে মনে করেন। তাদের বড় অংশ মনে করেন বিশ্বের যেগুলি মুসলিম রাষ্ট্র বলে পরিচিত সেখানেও ইসলামি দর্শন ও জীবনধারার অবমূল্যায়ন ঘটেছে। মুসলিম জনমানসে কমবেশি সেই কারণে এক অস্বাচ্ছন্দ্যবোধ বা বেদনাবোধ (Malaise) কাজ করে। Wilferd Cantwel Smith তাঁর ‘Islam in Modern History’ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, “The fundamental malaise of modern Islam is a sense that something has gone wrong with Islamic History. The fundamental problem of modern Muslim is how to rehabilitate that history.” অর্থাৎ বিশ্ব মুসলিম জনগণের বড় অংশ মনে করে তারা তাদের অতীত গৌরবকে হারিয়েছে এবং তাদের সেই হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করতে হবে। এই পুনরুদ্ধারের ভাবনা থেকেই তারা চায় এমন ইসলামি রাষ্ট্র যেখানে আল্লাহ এবং তার রসুল (হজরত মহম্মদ)-প্রদত্ত আইন (Divine Law) ছাড়া মনুষ্য-নির্দেশিত আইন (Human Law) তারা মানতে বাধ্য থাকবে না। এর থেকেই এসেছে প্যান ইসলামিজম (Pan-Islamism) বা মুসলিম দুনিয়ার ভাবনা। এই মতবাদের আদর্শগত ভিত্তি হল পৃথিবীর সমস্ত মুসলিম জাতির জন্য এক ঈশ্বর (আল্লা), এক প্রেরিত পুরুষ (হজরত মহম্মদ) এবং একটিমাত্র জীবনধারা—ইসলাম।

প্যান ইসলামিজমের ধারণা

প্যান ইসলামিজমের ধারণাটি একটু প্রাচীন। এর বৈশিষ্ট্য হল মুসলিমদের একটি সর্বজনীন খলিফার নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা। প্রাথমিক পর্যায়ে প্যান ইসলামিজম বলতে বোঝাতো মুসলিমদের তুর্কি খলিফার নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকে। পরবর্তী পর্যায়ে তুর্কিস্থান থেকে খলিফাতন্ত্রের অবসান ঘটলে প্যান ইসলামিজমের ধারণার পরিবর্তন হয়। ইকবাল তাঁর ‘Reconstruction’ গ্রন্থে এর নাম দিয়েছেন ‘Neo-pan-Islamism’। ইকবালের ব্যাখ্যায়—“There could be

no Turkish, Persian, Arab or Indian Islam. Islam could best survive not by narrow nationalism... but by a league of nations of Islam.” এর থেকেই এসেছে Muslim Brotherhood-এর ভাবনা অর্থাৎ মুসলিমদের নিজ নিজ দেশের জাতীয়তাবোধের সংকীর্ণ ধারণা থেকে মুক্ত হয়ে বিশ্ব মুসলিম সৌভ্রাতৃত্বের আদর্শে লালিত হতে হবে। মুসলিম আত্মত্ববোধের ধারণাটি মতবাদ হিসেবে গড়ে উঠেছে বিশ শতকের প্রথম দিকে মিশরে এবং তা প্রসারলাভ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আরব দুনিয়ার দেশগুলোতে, বিশেষ করে প্যালেস্টাইন ভূখণ্ডে ইজরায়েল রাষ্ট্র গঠিত হবার পর। ১৯২৮ সালে মিশরে হাসান-আল-বানা ‘আবওয়ানুন মুসলামিশন’ গঠন করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মিশরে এরই সূত্র ধরে গঠিত হয় Muslim Brotherhood দল। এদের লক্ষ্য হলো ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইসলামীয় ধর্মীয় আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করা এবং ইসলামি রীতিনীতি অনুযায়ী রাষ্ট্র ব্যবস্থা পরিচালনা করা। Lawrence Davidson তাঁর ‘Islamic Fundamentalism’ গ্রন্থে বলেছেন যে ইসলামি কটর মৌলবাদীরা (অন্য ভাষায় ইসলামি জেহাদিরা) মনে করে অমুসলিম সংস্কৃতি বিশেষ করে পশ্চিম সংস্কৃতির প্রভাব থেকে বিশ্ব মুসলিম জনগণকে মুক্ত করতে হবে। প্রয়োজনে এই কাজে যে-কোনো চরমপন্থা গ্রহণ করতে হবে। এদের লক্ষ্য ডেভিডসনের ভাষায়, “to re-islamise Islamic Society by way of repoliticising Islam itself.” আফগানিস্তানে তালিবানরা এটা করতে চেয়েছে। আল-কায়েদা এটা করতে চেয়েছে। এখন ইরাক ও সিরিয়ার বুকে আইএসআইএস এটা করতে চাইছে। এবং তারা শুধু ওই দুটি দেশেই নয়, মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলিতে তার প্রভাব ছড়াতে চাইছে। এর ফলে ইসলামি রাষ্ট্রের কথা বলে জেহাদি আন্দোলন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আবার সক্রিয় হবে। প্যান ইসলামীয় ধারণার আজকের পটভূমিতে বাস্তবতা নেই। অথচ একেই মূলধন করে তারা রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করতে চাইছে। আর তাই জেহাদি আন্দোলন জারি রাখতে চাইছে। বর্তমানে এই জেহাদি আন্দোলন বিশ্বজোড়া বৈশিষ্ট্য হিসাবে হাজির হয়েছে।

জেহাদিরা একদিকে মুসলিম দেশে দেশে নিজ ধর্মের গণতন্ত্রপন্থী কিংবা উদারপন্থীদের সাথে হিংসাত্মক লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছে, তেমনি বিভিন্ন ধর্মভিত্তিক দেশে অন্য ধর্মীয় গোষ্ঠীর সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে। ইরান, ইরাক, সিরিয়া, তুরস্ক, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, মিশর, আলজিরিয়া, চেকেনিয়া, এশিয়া মাইনর, বাংলাদেশ, ভারত সহ বহু দেশে মুসলিম মৌলবাদীরা সক্রিয়। মুসলিম-মৌলবাদীদের এই বিশ্বজোড়া অবস্থানের সাথে প্যান-ইসলামিক ধারণাটি সম্পর্কযুক্ত। পূর্বেই বলেছি প্রাথমিক পর্যায়ে তুরস্কের সুলতান ও অটোমান সাম্রাজ্যের দিকে লক্ষ রেখে বিশ্ব মুসলিম মৈত্রীবোধ বা প্যান-ইসলামিক সৌভ্রাতৃত্ববোধ (World Muslim Brotherhood) নামে এটি আখ্যায়িত হয়েছে। এই মতবাদের লক্ষ্য হল ইসলামের অতীত-গৌরব পুনরুদ্ধার করা, ইসলামের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ার স্বপ্ন তুলে ধরা এবং বিশ্ব মুসলিম সৌভ্রাতৃত্ববোধের বাণীকে প্রচার করা। মহম্মদ আলি জিন্না ‘India’s Problem of Her Future Constitution’ পুস্তিকায় এই প্যান ইসলামকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, “In Islam religion is the motive spring of all action in life. A Muslim of one country has far more sympathies with a Muslim living in another country than with a non-Muslim living in the same country.” এই মর্মবাণীকে সঙ্গী করেই জঙ্গিবাদীরা জেহাদি আন্দোলন জারি রেখেছে ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে।

জেহাদি আন্দোলন

জেহাদ কথার অর্থ সংগ্রাম বা আন্দোলন। ইসলামি জেহাদ বলতে বোঝায় ইসলামের জন্য জেহাদ। সেই ইসলাম নিজের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করা অথবা সমাজে প্রতিষ্ঠা করা বা দুইই হতে পারে। ইসলাম সম্পর্কিত বিশেষজ্ঞরা জেহাদের দুটি মূল ধারার কথা বলেছেন একটি হল আল জেহাদ আকবর এবং অপরটি হল আল-জেহাদ আল-আসগর। প্রথমটি হলো ব্যক্তির নিজ দুর্বলতা কাটিয়ে উঠে পারিপার্শ্বিক দূষিত দুনিয়া থেকে নিজেকে দূরে রেখে আত্মসংশোধনের মাধ্যমে একজন প্রকৃত মুসলমান হয়ে ওঠার জেহাদ বা সংগ্রাম। আর দ্বিতীয়টি হল স্ব-নিরাপত্তার স্বার্থে বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে জেহাদ বা সংগ্রাম। অর্থাৎ কোনো অন্যায্যকারী শাসক বা ক্ষমতাবান গোষ্ঠী, তা সে মুসলমান বা অমুসলমান যাই হোক না কেন, তার বিরুদ্ধে গড়ে তোলা সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগ্রামে মানুষকে যুক্ত করার উদ্যোগই জেহাদ।

সাম্প্রতিককালে জেহাদের প্রকৃতি একটু আলাদা। এটা অনেকাংশে ধর্মীয় ঘেরাটোপের বাঁধনে বাঁধা। এই জেহাদের মূল বিষয় হল মুসলিম দুনিয়া আজ বিপন্ন ও আক্রান্ত। মুসলিম জীবনকে নৈতিক অবক্ষয় গ্রাস করেছে। এদের মতে এই অবক্ষয়ের মূলে আছে ইসলামি ধর্মাচরণের প্রতি অবহেলা এবং পশ্চিম দুনিয়া ও পশ্চিম সভ্যতার প্রলোভনে পা দেওয়া। ইসলাম-বিরোধী বিধর্মীদের চক্রান্তে ইসলামি সভ্যতার গৌরবোজ্জ্বল দিনের পতন ঘটেছে। সুতরাং ইসলামীকরণের জেহাদ চালাতে হবে এবং ইসলাম বিদ্রোহীদের নির্মূল করতে হবে। পাকিস্তানের আলা মুওমুদি বা মিশরের সৈয়দ কুতুব এই ধরনের জেহাদের কথা তুলেছেন।

মধ্যপ্রাচ্য ছাড়াও এই জেহাদের সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়েছে আফগানিস্তান এবং অঞ্চল ভারতে। অর্থাৎ পাকিস্তান, ভারত ও বাংলাদেশে। মুসলিম মৌলবাদী সংগঠনগুলি এই দেশগুলিতে সক্রিয়। ভারতে বর্তমানে ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন, হুজি, লক্ষর-এ-তৈবা, জৈস-এ-মহম্মদ প্রভৃতি জঙ্গি গোষ্ঠীগুলি সক্রিয়। আফগানিস্তানে তালিবান এবং আলকায়েদা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। পাকিস্তানের আইএসআই ভারতে মুসলিম মৌলবাদী সংগঠনগুলিকে মদত জোগালেও নিজের দেশের মধ্যেই তারা ওইসব মৌলবাদী সংগঠনের জঙ্গি হিংসাত্মক আন্দোলনের শিকার। লাহোর, করাচি, ইসলামাবাদ—সর্বত্র এই হিংস্র জেহাদিদের আক্রমণের ঘটনায় নিরীহ মানুষের প্রাণ যাচ্ছে। শুধু নিরীহ মানুষ নয়, এমনকি রাষ্ট্রপ্রধানদেরও মরতে হয়েছে। বাংলাদেশে আজ এই সব মুসলিম মৌলবাদী সংগঠনগুলির হিংসাত্মক আন্দোলনে ওই দেশ ক্ষত-বিক্ষত। এই তিনটি দেশই বর্তমানে ইসলামি রাষ্ট্র। অথচ ইসলামের বিশুদ্ধতা রক্ষার লক্ষ্যে এইসব মৌলবাদী জঙ্গি সংগঠন জেহাদের নামে রাষ্ট্রক্ষমতায় বসতে চাইছে।

আইএসআইএস জঙ্গিরা তাদের প্রভাবিত এলাকার মেয়েদের জন্য তালিবানি ফতোয়া জারি করেছে। তাদের অধিকৃত মসুল শহরে মেয়ে ডাক্তারদের বলা হয়েছে শরীর-ঢাকা বোরখা এবং হাতে দস্তানা পরতে। বিজ্ঞপ্তি পড়েছে ১১ থেকে ৪৯ বছরের সব মেয়েকে ‘ছুন্নত’ করতে হবে অর্থাৎ তাদের যৌনাস্বের কিছু অংশ কেটে ফেলতে হবে যাতে যৌন আনন্দ না পেতে পারেন। এদের রাজধানী সিরিয়ার আল রাকা শহরে মেয়েদের ইসলামি অনুশাসন পালনের নজরদারির জন্য তৈরি হয়েছে ‘আল খানসা’ ব্রিগেড নামে জঙ্গি নারীবাহিনী যাদের বেশিরভাগ মহিলা সিরিয়া বা ইরাকের বাসিন্দা নন। বেশি অংশ ব্রিটিশ নাগরিক, যারা এই জেহাদিদের সাথে যুক্ত হয়েছেন। এদের বয়স ১৮ থেকে ২৪ বছরের মধ্যে।

ভারতে আইএসআইএস-এর প্রভাব

আইএসআইএস জঙ্গিরা এবার জেহাদির খোঁজে ভারতেও থাবা বসাতে সক্রিয় হয়েছে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে তারা তাদের জঙ্গি গোষ্ঠীতে সামিল করার জন্য ভারতীয় মুসলিম যুবকদের আহ্বান জানাচ্ছে। আইএসআইএস নেতা আবু বকর আল বাগদাদি ইতিমধ্যে ঘোষণা করেছেন যে ভারত হল ‘শত্রু রাষ্ট্র’। ভারতীয় মুসলিম যুবকদের কাছে বাগদাদি বার্তা দিয়েছেন যে তাঁর সংগঠন যেটা করছে সেটা ক্ষমতা দখল নয়, এটা হল ধর্মযুদ্ধ। খবরে প্রকাশ আইএসআইএস-এর ওই আহ্বানে সাড়া দিয়ে ইতিমধ্যে মুম্বই শহরের চার যুবক—আরিফ মজিদ, আনচির শেখ, আমন নঈম এবং শাহিন ফারুকি দেশ থেকে গোপনে পালিয়ে মাসুল শহরে পৌঁছেছে ওই জঙ্গিদের সঙ্গে যোগ দিতে।

শুধু তাই নয়, আইএসআইএস-এর সমর্থনে শ্লোগান লেখা টি-শার্ট পরে সোস্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটে ছবি প্রকাশিত হয়েছে তামিলনাড়ুর রামনাথপুরমের দুই যুবকের। তাদের নাম আব্দুল রহমান এবং মহম্মদ রিলভান। দু-জনকেই ধরা হয়েছে। আইএসআইএস-এর সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়েছে কাশ্মীরে। কাশ্মীর এমনিতেই অশান্ত। দীর্ঘদিন সেখানে জঙ্গিরা নানা নাশকতার সঙ্গে যুক্ত। পাকিস্তানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জঙ্গিরা বিশেষ করে হাফিজ সঙ্গদের লক্ষ্য-এ-তৈবার জঙ্গিরা এবং ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের জঙ্গিরা বেশ কয়েক বছর ধরে সক্রিয়। কাশ্মীর উপত্যকায় সেনাবাহিনীর বিশেষ ক্ষমতা অধিকারের প্রয়োগ এবং জঙ্গিদের ধরার নামে কাশ্মীরী যুবকদের উপর নির্যাতন ও আক্রমণে কাশ্মীরে জনগণের মধ্যে ক্ষোভ ক্রমবর্ধমান। আফজল বেগের ফাঁসি তাদের বিক্ষোভকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। ছরিয়ত ও জে.কে.এল.এফ সমর্থন ধরে রাখতে মধ্যপন্থী অবস্থান থেকে সরে আসতে বাধ্য হয়েছে। এই পটভূমিতে কাশ্মীরে বেশ কিছু এলাকায় ইরাকের আইএসআইএস-এর এই জঙ্গি দলের পক্ষে লেখা ব্যানার পোস্টার পড়েছে। ওই এলাকার শিক্ষিত কিশোর-তরুণদের কাছে ভারতবিরোধী বার্তা ছড়িয়ে নানা উস্কানি দিয়ে চলেছে আইএসআইএস। এই কাজে তারা হাতিয়ার করেছে ইন্টারনেটকে।

কেরল, কর্ণাটকের মতো দক্ষিণের রাজ্যগুলির ওপরও নজর দিয়েছে আইএসআইএস। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্রের খবর দেশের দক্ষিণ অংশ সহ কিছু রাজ্য থেকে কিছু তরুণ যুবক আচমকা উধাও হয়ে ইরাকের মাসুল, তিকরিতে জঙ্গি ঘাঁটিতে আশ্রয় নিয়েছে। গোয়েন্দা দপ্তরের মতে অতীতে কিছু ভারতীয় তরুণ পাকিস্তানে

পালিয়ে ট্রেনিং নিয়েছে। কিন্তু এ দেশ থেকে পালিয়ে পশ্চিম এশিয়ার জঙ্গিদের সাথে হাত মেলানোর ঘটনা নজিরবিহীন। কেন্দ্রীয় সরকারের গোয়েন্দা দপ্তরের মতে আইএসআইএস-এ নাম লেখানো ভারতীয় তরুণরা তাদের আত্মীয়-বন্ধুদেরও দলে টানার চেষ্টা করবে। আমেরিকা জাতীয় প্রতিরক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞ টমাস লিপ্ফের, বক্তব্য শুধু ভারত নয়, এ-ধরনের প্রবণতা ভারতীয় উপমহাদেশ-পাকিস্তান-বাংলাদেশ সহ গোটা বিশ্বের পক্ষে আশঙ্কার।

উপসংহার

সংবিধানগতভাবে ভারত ধর্মনিরপেক্ষ দেশ। এখানে সংখ্যাগুরু সাম্প্রদায়িকতা দেশের ঐক্য ও সংহতির সামনে এক বড় বিপদ। সেই বিপদের মুখে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ যারা ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির পাশে তারা এই বিপদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে। কিছু মানুষ সাময়িক বিভ্রান্ত হলেও তাদের সেই বিভ্রান্তি কাটছে। এই পটভূমিতে ইরাকের ঘটনাবলী এবং আইএসআইএস-এর কার্যক্রম এখানকার সংখ্যালঘু জঙ্গি (মৌলবাদী) গোষ্ঠীগুলিকে উৎসাহিত করবে। এতে ধর্মনিরপেক্ষ মানুষের সংগ্রাম বাধাপ্রাপ্ত হবে এবং সংখ্যাগুরু সাম্প্রদায়িক মতবাদীদের হাত শক্ত হবে।

তাই ধর্মনিরপেক্ষ মানুষকে দৃঢ় চিন্তে আবার সংগঠিত ও সচেনতনভাবে পথে নামতে হবে। পৌঁছে দিতে হবে এই বার্তা যে আইএসআইএস ইরাকে যা করছে তা না মুসলিমের জন্য, না মুসলিম জনগণের জন্য। এটা করছে কেবল রাজনৈতিক কর্তৃত্ব দখলের জন্য। সেই লক্ষ্যেই আবু বকর আল বাগদাদি নিজেকে খলিফা বলে ঘোষণা করেছেন। আমাদের দেশেও সংখ্যাগুরু সাম্প্রদায়িক শক্তি কিংবা সংখ্যালঘু (মৌলবাদ) শক্তি নিজেদের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব দৃঢ় ও বিস্তৃত করতে চাইছে। এদের সকলের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম জারি রাখতে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে দুই সম্প্রদায়েরই জঙ্গি সংগঠনগুলির নেতৃত্বে আসীন ব্যক্তিবর্গ নিজেদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে চরিতার্থ করতে মানুষের ধর্মপ্রীতিকে ব্যবহার করছে এবং ধর্মীয় ঐক্যের শ্লোগান তুলছে। আমরা জানি জঙ্গি মৌলবাদীরা শ্রেণিস্বার্থেই ধর্মীয় রাষ্ট্রের কথা বলে। কিন্তু ধর্মীয় রাষ্ট্র শান্তি কিংবা মানুষ কর্তৃক মানুষের শোষণ থেকে মুক্তি আনতে পারে না। তা যদি হতো তাহলে হিন্দু রাষ্ট্র নেপালে দরিদ্র হিন্দু থাকতো না। তা যদি হতো তবে আফগানিস্তানে ও পাকিস্তানে এত হানাহানি হতো না। তাই চাই ধর্মনিরপেক্ষ মানুষের ঐক্য।

With best compliments of

PRASAD CONSTRUCTION

Nabagram

Sl. No. 99



ভগ্নমন্দিরে অক্ষুণ্ণ প্রতিমা

সুকৃতি ঘোষাল

সমগ্র বিশ্বে বয়স্ক মানুষের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। সংখ্যাতত্ত্বের নিরিখে ১৯৯০ থেকে ২০১০ এই দুই দশকে যাতোর্থ মানুষের হার ১৮ থেকে বেড়ে ২৫ শতাংশে পৌঁছেছে। ভারতে ১২০ কোটি মানুষের প্রায় ৯ কোটি সিনিয়র সিটিজেন, পশ্চিমবঙ্গে ৫৭/৫৮ লক্ষ। বিষয়টা আরো স্পষ্ট হবে যদি আমরা খেয়াল রাখি যে স্বাধীনতা লাভের পর ছয় দশকে ভারতে মানুষের গড় আয়ু ৪০-৪৫ থেকে বেড়ে এখন ৬৪-৬৫-তে দাঁড়িয়েছে। জীবনদায়ী ওষুধ, উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থা, জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের ফলেই এটা সম্ভব হয়েছে। এই সংখ্যাধিক্য স্বাগত, কারণ মৃত্যুর অনিবার্যতার বাস্তবতায় এ হল জীবনের জয়ধ্বনি।

বয়স্ক মানুষের ভিড় সমাজে যে অভিঘাত সৃষ্টি করছে সেটা কিন্তু নগণ্য নয়। ভবিষ্যৎ নবীনদের হাতে। যাদের প্রাণশক্তি নিভুনিভু, তাদের কে আর পান্ডা দেয়? রবীন্দ্রনাথ তো কবেই ‘আধমরাদের ঘা মেরে’ বাঁচানোর জন্য কাঁচাদের কাছে অবদন করে সবুজের গান গেয়েছেন। সম্প্রতি বাজপেয়ী, আদবানি, যোশীদের সংসদীয় বোর্ড থেকে বাদ দিয়ে মোদীজি সেই ‘প্রবীণবিদায়’ পালার পুনরভিনয় করেছেন। বিজেপির অশীতিপর ত্রি-মূর্তিকে ‘মার্গদর্শক’ হিসেবে একটা কমিটিতে রাখা হয়েছে বটে তবে বাস্তবে তা গলাধাক্কা ভেদ করা, ইংরেজিতে ‘Sugarcoating’ বলা যায়। যদি কখনো তাঁরা মার্গ দর্শাতে বা কোনো রাজনৈতিক পথ বাঙলাতে যান, সমালোচনার ঝড় উঠবে। ‘Gerontocracy’ (বয়স্ক-শাসন)-র ব্যঙ্গাত্মক অনুবাদ ‘বুড়োক্রেসি’ থেকেই মালুম হয় নীতি নির্ধারণে বয়স্কদের ভূমিকাকে কোন চোখে দেখে সমাজ।

কিন্তু এমনটা কেন মনে করা হয়? বুড়ো মানেই কি জীবনকে ‘গুডবাই’ জানিয়ে মরণের ‘ওয়েটিং লিস্ট’-এ নাম তোলা? সুধীর চক্রবর্তী একটা লেখায় লিখেছেন যে তিনি সত্তরের দশকে শান্তিনিকেতনে বৃদ্ধ ভূপেন সরকারের সাক্ষাতে যান। ‘পূর্বপল্লিতে থাকেন, বুড়ো মানুষ, চেনো?’—বলে রিক্সাওলাকে সরকারবাবুর বাড়ি বোঝাতে চাইলেন সুধীরবাবু। সে চটজলদি উত্তর দিল, ‘পূর্বপল্লিতে সবাই তো বুড়ো, না-হয় বুড়ি। হয় একা, না-হয় দোকা। ওই পল্লিকে আমরা বলি এখন-তখন পাড়া, বুঝলেন?’ মৃত্যুর বাস্তবতা অস্বীকার কে করবে? মহাভারতে বক্রপী ধর্মের ‘আশ্চর্য কি?’ এই প্রশ্নের উত্তরে যুধিষ্ঠিরের উত্তর ছিল :

অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্

শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি, কিমার্শমতঃপরম্।

অর্থাৎ প্রতিদিন মানুষ যমালয়ে যাচ্ছে, তবু যারা বেঁচে আছে তারা আরো আয়ু চাইছে, এর থেকে বেশি আশ্চর্যের আর কী আছে! এই দার্শনিক উচ্চারণের মধ্যে মহাভারতকারের অনভিপ্রেত অন্য এক

সত্য নিহিত আছে। মৃত্যুই যেখানে শেষ কথা, সেই জৈব-অস্তিত্বে জীবনকে আঁকড়ে না ধরাটাই আশ্চর্যের। ‘উটের গ্রীবের মত নিস্তব্ধতা’ কবে এসে আমাকে গ্রাস করবে বলে বসে অপেক্ষা করে না কেউ :

তবুও তো পোঁচা জাগে

গলিত স্থবির ব্যাং আরো দুই মুহূর্তের ভিক্ষা মাগে

আরেকটি প্রভাতের ইসারায় অনুমেয় উষ্ম অনুরাগে।

—জীবনানন্দ

‘দুরন্ত শিশুর হাতে ফড়িং-এর ঘন শিহরণ’-কে জীবনানন্দ যথার্থই মরণের কাছে আত্মসমর্পণ নয়, মরণের সাথে লড়া বলে চিহ্নিত করেছেন।

তাই ‘এখন-তখন’ পাড়ার অধিবাসীদের তচ্ছল্য না করে সমাজে তাদের সামিল করে নেওয়াটাই সভ্যতা। হাসপাতালে ‘Geriatric Ward’ থেকে বৃদ্ধাশ্রম স্থাপন এই সমাজবিবর্তনের দিকেই ইঙ্গিত করে। শুধু স্বামী-স্ত্রী-সন্তান নিয়ে ভারতীয় পরিবার নয়। সেখানে দাদু-ঠাকুমা, পিসিমা, ননদ, কাকি-জেঠিদের এমনকি দূর-সম্পর্কের আত্মীয়দেরও একটা দাবি ছিল। তাই মা-বাবাকে বৃদ্ধাশ্রমে রাখা নিয়ে ব্যঙ্গাত্মক লেখালিখি হয়। বাড়িতে পরিবারের সম্মানিত সদস্য হিসেবে বৃদ্ধদের থাকা অবশ্যই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু ছোটো পরিবার—উৎকেন্দ্রিক, ব্যস্ত জীবনে তা সম্ভব না হলে একটা গ্রহণযোগ্য বিকল্পের সন্ধান তো করতেই হবে। এ নিয়ে আজকাল আরো বেশি ভাবা উচিত কারণ মানুষের গড় আয়ু ক্রমবর্ধমান। দু-তরফেই একটা সাময়িক মানিয়ে নেওয়ার জোড়াতালি ব্যবস্থার বদলে সভ্য দীর্ঘমেয়াদি সুরাহার কথা ভাবা উচিত। বৃদ্ধাশ্রমে অপরের বোঝা হয়ে থাকার আত্মগ্লানি ও গঞ্জনার হাত থেকে রেহাই মেলে। উপরি হিসেবে চিকিৎসা, সাহচর্য ইত্যাদি সামাজিক সুরক্ষাও অমিল নয়। অস্তুত ভাল বৃদ্ধাশ্রমে। তাই এই বন্দোবস্ত একটা গ্রহণযোগ্য বিকল্প হিসেবে অবশ্যই দেখতে হবে।

কিন্তু তাতেই কি সব হল? মানুষের একটা বড় সমস্যা হল শুধু দিন যাপনে শুধু প্রাণধারণে তৃপ্ত থাকা তার চরিত্র নয়। শিক্ষা প্রসঙ্গে কথাটা চমৎকারভাবে বুঝিয়ে বলেছেন রবীন্দ্রনাথ : “আমাদের দেহ সাড়ে তিন হাতের মধ্যে বদ্ধ, কিন্তু তাই বলিয়া ঠিক সেই সাড়ে তিন হাত পরিমাণ গৃহ নির্মাণ করিলে চলে না। স্বাধীন চলাফেরার জন্য অনেকখানি স্থান রাখা আবশ্যিক, নতুবা আমাদের স্বাস্থ্য ও আনন্দের ব্যাঘাত হয়।” অর্থাৎ অস্তিত্ব (Existence) ও জীবন (Life) এই দুয়ের মধ্যে তফাৎ করা দরকার। অস্তিত্ব প্রাথমিক; সে চাহিদা মিটলেই উন্নত জীবনের দাবি উঠবেই—পেটের খাবার জুটলেই মনের খাবারের সন্ধান করবে মানুষ। বয়স্কদের নিয়ে এই একটা

জয়গায় সমস্যা তৈরি হয়। সমাজ যেহেতু থেমে থাকে না, আর অভ্যাসগত কারণে একটা বয়সের পর নিজেকে পাল্টানো যেহেতু কষ্টকর, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে প্রজন্মগত ব্যবধান বাড়তেই থাকে। ফলে বৃদ্ধরা একা, আরো একা হতেই থাকেন। আর জীবন যেহেতু কারুর পরোয়া করে না, এই প্রবীণ মানুষজন নিজেদের রাতা অবহেলিত ভাবতে থাকেন। ছেলের সময় নেই, নাতি কথা শোনে না, তাঁর রুটির সঙ্গে বর্তমানের রুটি মেলে না। ফলে বিচ্ছিন্ন হতে হতে তাঁরা গুটিয়ে যেতে থাকেন। স্মৃতি আর আত্মমগ্নতাকে অবলম্বন করে বাঁচতে চান তাঁরা। মুখে আমরা ‘স্মৃতি সততই সুখের’ যতই বলি না কেন, অতীতের ভুলভ্রান্তির হিসেব রোমন্থনকে তেতো করে দেয়। বৃদ্ধদের বসুর ভাষায়—

কী আছে আমার আর
তীর তেতো মন্ত স্মৃতি ছাড়া?

স্মৃতিকণ্ঠ্যনের আর একটা খারাপ দিক হল এটা বর্তমানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। প্রবীণরা হামেশাই তাঁদের যৌবনকালের সবকিছুকে বর্তমানের সঙ্গে তুলনায় ভালো দেখিয়ে বর্তমানকে খোঁটা দিয়ে থাকেন। এই মানসিকতা একটা বিকার। রবীন্দ্রনাথ নিজস্ব ভঙ্গিতে এর বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মতে বৃদ্ধরা বিগতকালকে গৌরবান্বিত করেন, “তাহার একটা কারণ, সেকাল তাঁহাদের আশা করিবার কাল ছিল এবং একালটা তাঁহাদের হিসাব বুঝিবার দিন। তাঁহারা ভুলিয়া যান, একালের যুবকেরাও আশা করিয়া জীবন আরম্ভ করিতেছে, এখনো তাহারা চশমা চোখে হিসাব মিটাইতে বসে নাই।” অর্থাৎ বয়স্কদের চোখে ফেলে আসা কালটা ভালো মনে হয় কারণ তাঁদের চোখে তখন স্বপ্ন ছিল, যেটা বর্তমানে বিবর্ণ হয়েছে। কিন্তু যাদের কাছে এটা স্বপ্ন দেখার বয়স তাদের কাছে একই সময় বর্ণময়।

প্রাচীনতর মানুষদের এই সমস্যার নানা সমাধান খোঁজা হয়েছে, হচ্ছে। কবি Yeats ফুরিয়ে যাওয়ার আগে দ্বিগুণ তেজে জ্বলে উঠতে চেয়েছেন :

Grant me an old man's frenzy
Myself must I remake

আর এক কবি Dylan Thomas তাঁর মৃত্যুপথযাত্রী বাবাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে মৃত্যুর কাছে দুর্বল আত্মসমর্পণ কাপুরুষতা। তিনি তাই লিখেছেন :

Do not go gentle into that good night,
Old age should burn and rave at close of day,
Rage, rage against the dying of light.

নিভস্ত চুল্লির মতো চুপসে না গিয়ে, গর্জে উঠে চিরবিদায়ের আগে ধূমকেতুর মত জ্বলে ওঠাই ভালো মনে হয়েছে তাঁর। এ যদি হয় পাশ্চাত্যের মনোভঙ্গি, প্রাচ্যের দর্শন একেবারে আলাদা। ভারতীয় দর্শন মৃত্যুর অমোঘতাকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করে। মৃত্যু জীবনের শত্রু নয়, জীবনের পরিণতি। তাই তাকে ঠেকাতে চেষ্টা না করে তাকে বরণ করার প্রস্তুতি নিতে হয়। চতুরাশ্রমের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে ব্রহ্মচর্য হল সংযমের সাধনা করে ভোগের অধিকার অর্জনকাল; গার্হস্থ্য হল সংযমের পরীক্ষাকাল, এ হল ইন্দ্রিয়সুখ ও ইন্দ্রিয়দাসত্বের পার্থক্য উপলব্ধির সময়; বাণপ্রস্থ হল বাঁধন আলাগা করার, দড়ি ছেঁড়ার তপস্যা। আর সন্ন্যাস? এ যেন জীবনের সব কিছু অন্য হাতে সমর্পণের প্রস্তুতি। এ প্রস্তুতি ছাড়া মৃত্যু হবে হরণ। তা কেন হতে দেব? যা যাবে, বুদ্ধিমান তাকে আঁকড়ে ধরে না। আমি তুলে দেবো, কেড়ে নিয়ে বাহাদুর হতে দেবো না মৃত্যুকে। নিজে স্থান ছেড়ে দেবো, ঘাড়ধাক্কা দিতে দেবো না। এতেই উড়বে জীবনের জয়ধ্বজা। মৃত্যুর উল্লাসকে জীবনের পরোক্ষ বিজয়ে পরিণত করাই সন্ন্যাস। মানে খুঁজে পাবেন এই প্রস্তুতির। এ যেন

ফলের বৃন্তচ্যুতি; জীবনের নস্বরতা প্রমাণের জন্য নয়, লয়োত্তর সৃষ্টির সম্ভাবনার প্রয়োজনেই এই বিনাশ।

সে যাই হোক, এ প্রস্তুতির একটা বাহ্যিক দিক হল জরাকে স্বাভাবিক বলে মেনে নেওয়া। ‘মোহমুদগর’-এ শঙ্করাচার্য বয়সকালে জীর্ণ শরীরের (Yeats-এর ভাষায় কাকতাদুয়া ‘a tattered coat upon a stick’) এক ভয়াবহ ছবি আঁকেছেন :

অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং

জাতং দশনবিহীনং তুণ্ডম্।

বৃদ্ধো যাতি গৃষীত্বা দণ্ডম্

তদপি ন মুঞ্চতি আশা পিণ্ডম্।

অর্থাৎ জৌলুযহীন দেহ গলে পড়ছে, মাথার চুল বিলকুল সাদা, মাড়ি দস্তহীন, হাঁটুতে বাত—লাঠি ছাড়া অচল, তবু বাঁচার আশা যোল আনা। শঙ্করাচার্য এ ছবি আঁকেছেন জীবনরূপ মোহকে দর্শনের মুণ্ডর গিয়ে চূর্ণ করতে। কিন্তু চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের কাছে এটাই চ্যালেঞ্জ। হরমোন থেরাপি, রক্ত ক্যানাল ট্রিটমেন্ট, বাইপাস সার্জারি, ছানি অপারেশন, মায়প্লাস্টিক সার্জারি দিয়ে কোঁচকানো চামড়াকে ইন্সট্রি করা—সবই সুলভ। শুধু একটু ব্যয়বহুল এই যা। তবে এ সব কি মাঠ ছাড়ার হুঁশেল অশ্রুত থাকবে? ‘ফাল্গুনী’ নাটকের ‘সূচনা’ অংশের কথা মনে পড়বেই আমাদের। রাজমহিষী রাজার গলায় মল্লিকার মালা পরাতে গিয়ে চমকে ওঠে, রাজার কানের পাশে দুটো পাকা চুল। ডাক্তার হয়তো বলবে—এতে এত ঘাবড়াবার কী আছে? কলপ করলেই চুল কৃষ্ণবর্ণ হবে। কিন্তু নাটকে মহারাজ রাজবৈদ্যের শরণাপন্ন না হয়ে এই পরিণতিকে অবিচলিতচিত্তে গ্রহণ করেন। তাঁকে বলতে শুনি, ‘মন্ত্রী, যমরাজ আমার কানের কাছে তাঁর নিমন্ত্রণপত্র বুলিয়ে রেখে দিয়েছেন। মহিষী এ দুটো চুল তুলে ফেলতে চেয়েছিলেন, আমি বললুম, কী হবে, রাণী। যমের পত্রই যেন সরালুম কিন্তু যমের পত্রলিখনকে তো সরানো যায় না। অতএব এপত্র শিরোধার্য করাই গেল।’ বাইরেটাকে যতই রঙ-রাংতায় ঢাকার চেষ্টা করি, ভেতরের ক্ষয়টা অস্বীকার করার জো নেই। তাই সন্ন্যাস এক প্রকার প্রায়োপবেশন—সিঁদ কাটতে না দিয়ে দরজা খুলে দেওয়া, যাতে থলি ভরলেও চোরের জেতার তৃপ্তি নেই।



তবে সন্ম্যাস তো সর্বজনসাধ্য নয়। সন্ম্যাসের আদর্শটুকু গ্রহণ করে কোনো বিকল্প সম্ভাবন সম্ভব কি? আমায় বিদায় নিতে হবে সেই মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে নিরাসক্তভাবে জীবনকে আলিঙ্গন করাই কি উচিত নয় আমাদের? মৃত্যুর মতো জীবনকে অস্বীকার করাও বোকামি। জীবন তো শুধু ভোগের, শুধু পাবার অবকাশ নয়; ত্যাগের, দেবার সুযোগও সৃষ্টি করে এই জীবন। সে দান নিশ্চয়ই ভিন্নতর। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় : “প্রবীণ মানুষের কাছে আমরা যে দাবি করতে পারি সেটা করার আদর্শ নয়, সেটা হওয়ার আদর্শ।” বৃদ্ধ যিনি, তিনি অনুকরণীয় হবেন, নিজের মতামত নবীনদের ওপর চাপিয়ে দেবেন না, কিন্তু বৃদ্ধদের অভিজ্ঞতাপুষ্ট সে মতাদর্শ এমনই হবে যে তাঁর অভিভাবকত্ব অস্বীকার করার দুরূহ হবে না সমাজের। অর্বাচীন যে, সে প্রবীণের মূল্য বুঝতে না পারে। কিন্তু যিনি জীবনের অনেকটা দেখেছেন, তিনি তো জানেন, তিনি সরে দাঁড়ালে তাঁর উত্তরসূরি অনাথ হবে, এসে যাবে তার পালা মঞ্চ ছাড়ার ক্ষণ। এই ভাবটাই অননুকরণীয় ভাষায় ব্যক্ত করেছেন কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত :

এখন আমার তরুণতর সতীর্থেরা বলে
অলোকদা, আপনি আমাদের
মাথার ওপরে আছেন।
ভাবি, আমি কি তবে তাদের
জরাজীর্ণ আচ্ছাদন, ছলে ও কৌশলে?
নাকি আমার মাথার ওপর সিন্ধুর সূতোয়
খড়্গ ঝুলছে, যে কোনো মুহূর্তে
নেমে আসবে ছুতো পেলেই, ঘুরতে ঘুরতে...

ঝুলছে ঝুলুক, মাথাটা খুব রেখেছি সাবধানে,
কারণ আমার শিরোশ্ছেদের মানে
আমার যে জন পরবর্তী, উত্তরজাতক
তাকেই কি না হতে হবে সমাসন্ন মৃত্যুর সামিল
আমার চলে সাদা কাশফুল, আকাশটা খুব নীল।

‘বাবরের প্রার্থনা’, কবি শঙ্খ ঘোষের ভাষায়, ছিল : ‘ধ্বংস করে দাও আমাকে যদি চাও / আমার সন্ততি স্বপ্নে থাক।’ এটা কিছুটা ব্যক্তিগত, ভগ্নস্বাস্থ্য পুত্রের জন্য কাতর পিতার মিনতি, আমার আয়ু নিয়ে আমার সন্তান বাঁচুক। এই মর্মার্থ। এও এক প্রবীণোচিত মানবিক প্রার্থনা। কিন্তু যা বাস্তব তা হল, সেও অমর নয়। আমি যত দিন আছি অস্তিত্ব ততদিন ‘এবার, তোমার পালা’ বলে তার দিকে আঙুল তুলবে না কেউ। তাই খাঁড়া শিরে ধারণ করার সাহস। এ কোনো ব্যক্তিগত, স্নেহত্যাগিত আত্মত্যাগ নয়; কর্তব্যবোধে উজ্জীবিত, দায়িত্বপালনে উন্মুখ, রক্ষাধর্ম পালনে তৎপর বয়স্কবৃহৎ—প্রজন্ম কনিষ্ঠকে বুক দিয়ে আগলানো।

এইখানে বয়স্কদের পক্ষ থেকে যে প্রশ্নটা তোলা যায় তা হল, জীবন মানে কি শুধু কর্তব্যপালন? জীবনের কাছ থেকে তাদের কি কোনো প্রত্যাশা নেই? পাবার নেই কিছু? তাহলে তো দীর্ঘজীবন একটা অভিশাপ। টেনিসনের ‘টিথোনাস’ কবিতায় বিগতযৌবন টিথোনাসের কাছে অমরত্ব অভিশাপ। সে বুড়িয়ে গেছে, জীবনের স্বাদ গ্রহণে অক্ষম, কিন্তু মরতে পারছে না। গাছ, প্রাণী, মানুষ সবাইকে সে ঈর্ষা করে, কারণ মৃত্যু তাদের বার্ষিক্যে পূর্ণচ্ছেদ টানে। অর্থাৎ জীবনের কাছে কিছু পাবার না থাকলে জীবন দুর্বহ মনে হয়। অথচ প্রজন্মগত ব্যবধানে বৃদ্ধরা জীবনের সঙ্গে সংযোগস্থাপনে বিফল হতে থাকেন। ধনঞ্জয়-সতীনাথে অভ্যস্ত কানে ব্যাণ্ডের গান নিছক আত্ননাদ বলে বিশ্বাস ঠেকে। কানন দেবী, ছবি বিশ্বাসের অভিনয়ে অভ্যস্ত চোখে রিয়া, পরমরতর অভিনয় আলুনি মনে হয়।

এ সমস্যার কি কোনো সমাধান নেই? ‘দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায় রইল না/সেই যে আমার নানা রঙের দিনগুলি’—এই আক্ষেপেই কি বাঁধা থাকবে বার্ষিক্য? তেমন হলে তো ‘আয়ুস্মান ভব’ কোনো আশীর্বাদ নয়; প্রতিটি বাড়তি পল হল বেদনার দীর্ঘায়ণ মাত্র। তাই বয়স্কদের কাছে ও জীবন উপভোগ্য হতে হবে। জীবনে উপভোগের সরঞ্জামের তো অভাব নেই, যা নেই তা হল উপভোগের সামর্থ্য। কিন্তু এটাও একটা ভুল কথা। বয়স্করা গুটিয়ে থাকেন কারণ তাঁরা অতীতচারী, বর্তমান সময়টাকে তাঁরা নিজেদের সময় বলে ভাবতে পারেন না। কিন্তু যা বাস্তব তা হল অতীতের স্থান যাদুঘরে বা ইতিহাসে। তার থেকেও যেটা বড় কথা, বর্তমান সময়টা বয়স্কের নিজের নয় কোন যুক্তিতে? তিনি নিজেই তো এখনো বর্তমান। তাই অতীতটা যেমন তাঁর কাল, বর্তমানটাও তাঁর সময়। দাদুর সময়টা নাতির সময় নয়, সে তখন জন্মায় নি। কিন্তু নাতির সময়টা দাদুরও সময়, তিনি এখনও বর্তমান। তাই একালকে গ্রহণ করার সাহস রাখতে হবে। আপনি লাইব্রেরিতে বই পড়েছেন, রেডিওতে ক্রিকেটের ধারাবিবরণী শুনেছেন। নাতি কম্পিউটারে পড়ে, টিভিতে খেলা দেখে। আপনি যদি মোবাইলে মেসেজ পাঠানো শিখে নেন, সেও একদিন ‘পূজনীয় দাদু’ বলে চিঠি লিখতে বসবে। আপনি একটা ফুচকা চেখে দেখলে, সেও ‘সিমি’ চেখে দেখবে, নাক সিঁটকাবে না। গুরুটা আপনাকে করতে হবে। কারণ ‘চলতি হাওয়ার পন্থী’ না হয়েও বর্তমানের স্বাদ আপনার নিজের প্রয়োজনেই দরকার। প্রজন্মের ফারাকটা অসেতুসম্ভব করে তুললে প্রবীণদেরই ক্ষতি—নবীনরা বুঝতে চাইবে না, বুঝতে পারবে না বলা ভাল কারণ তাদের কোনো অতীত নেই, সবটাই বর্তমান।

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

মহেশ্বরী মাল্টিপল মিলস্ প্রা. লি.

শুশুনা, তারাগুশুনা, বর্ধমান ফোন : (০৩৪২) ২৩২৪৭১১
মোবাইল : ০৯৭৩৫১৪৯৭২৩, ০৮১৪৫৫০১৬৭১

এখানে উন্নত মানের প্রযুক্তির মাধ্যমে উৎকৃষ্ট মানের কাঁকর ও কালোমাছি বিহীন পারবয়েল্ড সিল্কি চাউল প্রস্তুত করা হয়।

SI. No. 199

With best compliments of

*A
Well Wisher*

Sl. No. 100



একটি অবৈধ প্রেমপত্র

গীষ্পতি চক্রবর্তী

প্রিয় মোর,

অনেক দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, সঙ্কোচের পাহাড় ডিঙিয়ে তোমাকে লিখছি। জানিনা এ চিঠি শেষপর্যন্ত তোমার হাতে তুলে দিতে পারবো কি না। এভাবে তোমাকে লেখা উচিত না অনুচিত তা আমি জানি না। কিসের এক তাড়নায় আমি লিখছি। মন ঘাড়ে ধরে আমাকে দিয়ে লিখিয়ে নিচ্ছে। বুঝতেই পারছো আমি তোমাকে ভালোবাসি। স্বার্থগন্ধহীন নিষ্পাপ ভালোবাসা। আমি দূর থেকে তোমাকে দেখি। তুমি সুপুরুষ, সপ্রতিভ, উজ্জ্বল এক যুবক। আর আমি? থাক সে কথা।

তোমার মনোজগতের কোথাও আমার কোনো অস্তিত্ব নেই। তুমি আমাকে চেনো না। তোমার সঙ্গে কোনোদিন দু-দণ্ডের জন্য চোখাচোখিও হয়নি আমার। আলাপ তো দূরের কথা। আমি তোমাকে এড়িয়ে গিয়েছি। আমি তোমাকে এমন এক দূরত্ব থেকে দেখি, যেখানে দাঁড়িয়ে আমি তোমাকে খুব ভালো করে দেখতে পাই। অথচ তুমি আমাকে কোনোভাবে দেখতে পাবে না। লুকোচুরির এই অভ্যাসটা আমাকে করতেই হয়েছে। এই তো সেদিন তুমি একটা টি-শার্ট পরে এসেছিলে। দূর থেকে দেখা সমুদ্রের রঙের ছোঁয়া ছিল তাতে। প্যান্ট ছিল ধবধবে সাদা, বকের ডানার মতো রঙ। তোমাকে দেখে মনে হচ্ছিল দেবদূত। অথচ আমি জানি তুমি যা সেজেছো, তুমি আসলে তা নও। তুমি নেহাতই দোষেগুণে একজন গড়পরতা বাঙালি। আমিও তাই। কিন্তু ‘আমিও তাই’ কথাটা খুব জোরের সঙ্গে বলবার মতো মনের জোর আমার নেই। আমি সবসময় থাকি একধরনের দ্বিধা, দ্বন্দ্বের জগতে। একথাটা তো আমি আগেই বলেছি।

ভগবান বলো, প্রকৃতি বলো, যা খুশি বলতে পারো তাকে,

সে আমাকে দিয়েছে সামান্য বিশ্লেষণের শক্তি, সামান্য কৌতূহল, কিছুটা যুক্তি প্রয়োগের ক্ষমতা; দিয়েছে ভাববার কিছুটা সময়, ভাববার মতো এক মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের জটিল রসায়নে জারিত অনুভব শক্তি।

আমি তোমার নাম জানি না। আচ্ছা, ধরা যাক, তোমার নাম... নাঃ, কোনো জুতসই নাম আমি তোমাকে দিতে পারছি না। তার চেয়ে তোমার একটা সাধারণ পরিচয় আছে। সে নামেই তোমাকে ডাকবো মনে মনে। কী ভাবছো? পুরুষ? ঠিকই তাই। পুরুষ বললে তুমি গর্বিত হও। যদি বলা হয়—‘হাতে চুড়ি পরগে যা’, তুমি অপমানিত হও। তার মানে মহিলা হওয়া এক অপমানজনক ব্যাপার। বাড়িতে ছেলে জন্মালে যারা ঢোল বাজাতে বাজাতে আসে, তারা বলে—‘ব্যাটাছেলে, পয়সা তো বেশি লিবই। মেইয়েছেলে হলে পয়সা কম।’ বোঝো ঠ্যালা। আইন বলছে ছেলে-মেয়ে সব সমান। তফাত করলে হাজতবাস। সমাজ বলছে অন্য কথা। নাচানোর খরচ ছেলের জন্য একরকম, মেয়ের জন্য আরেক রকম। ছেলের বাড়ির লোক কপট রাগ দেখিয়ে বেশি টাকা তুলে দেয় ওদের হাতে। ভেতরে ভেতরে এক ধরনের তৃপ্তি অনুভব করে ছেলের বাপ, ছেলের মা।

সুতরাং, হে আমার প্রিয়তম, আমি তোমাকে শুধু পুরুষ নামেই চিনব। আমি যদি তোমাকে এমন নামে ডাকি, যে ডাকের মানে সারা পৃথিবীতে এক, তা হল পুরুষের বৈজ্ঞানিক পরিভাষা। পুরুষ বললে বাঙালি ছাড়া কেউ বুঝবে না। যদি বলি তুমি ‘XY’, সারা বিশ্বে কেউ আপত্তি করবে না। ‘XY’ ব্যাপারটা কী? আমাদের শরীরের সমস্ত কাজ কারবার যে নিয়ন্ত্রণ করে তার নাম ক্রোমোজোম। মোট তেইশ জোড়া ক্রোমোজোম সারা

শরীর-যন্ত্রটাকে ঠিকঠাক চালাচ্ছে। এদের মধ্যে বাইশ জোড়া ক্রোমোজোম ছেলেদের ও মেয়েদের একই রকম। তফাৎ শুধু একজোড়ায়। ছেলেদের ওই একজোড়া ক্রোমোজোম হল ‘XY’; মানে একটি ‘X’ ক্রোমোজোম ও আরেকটি ‘Y’ ক্রোমোজোম। মেয়েদের ক্ষেত্রে ওই একজোড়া ক্রোমোজোম হল ‘XX’; অর্থাৎ দুটি ‘X’ ক্রোমোজোম। আসল তফাটটা করে দিল ‘Y’ ক্রোমোজোম। আর এই ‘Y’ ক্রোমোজোম আসে বাবার শুক্রাণুর হাত ধরে। মা শুধু দিতে পারে ‘X’ ক্রোমোজোম। অথচ তোমরা পুরুষেরা না বুঝে না জেনে মেয়েদের দোষ দাও পুত্রসন্তান দিতে না পারার জন্য। আমি এক উচ্চশিক্ষিত মাকে দেখেছি, মেয়ের জন্ম দেওয়ার পর সদ্য মা হওয়া মেয়েটির বাবা যখন তার সঙ্গে সন্তানের জন্মের পরই দেখা করতে গেল, সে তখন বাবাকে দেখে ডুকরে কেঁদে উঠল; তার মুখ থেকে বেরিয়ে এল—বাবা তোমাকে নাতি দিতে পারলাম না। বাবা ও মেয়ে এরপর পরস্পরকে সান্ধুনা দিতে লাগল অনেক ধরে। সদ্য জন্মানো অবহেলিত মেয়ের মা শিক্ষিকা। তার বাবাও উচ্চশিক্ষিত। আমি চুপ করে সব শুনছিলাম। আমি বলতে পারলাম না, সাতরাজার ধন ‘Y’ ক্রোমোজোম দেওয়ার কোনো ক্ষমতা নেই মায়ের। ওটা আসে সন্তানের বাপের কাছ থেকে। সদ্য জন্মানো মেয়ের বাপও বোধ হয় জানেনা বিষয়টা; যদিও তাকেও বিশ্ববিদ্যালয় মূল্যবান সার্টিফিকেট দিয়েছে। যদি সে জানে, অবলীলায় তার কোনো উল্লেখ সে করবে না। সাধারণভাবে আমাদের সমাজটা তো বহুদিনের জমে থাকা অন্ধকার অন্ধ্রেণে বয়ে নিয়ে চলেছে। হাসতে হাসতে কতজন বলে—সব সমান; ছেলে, মেয়ের তফাৎ বোঝা যায় আজকাল? ছেলের মতো করে বড়ো করলেই হল। মেয়েরা কিসে কম? সদ্য মেয়ের জন্ম দেওয়া মায়ের দুঃখকে তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করে অনেকে।

আমি চুপ করে সব শুনছিলাম। আমার মনে বইছিল ঝড়। আমি ভাবছিলাম, যদি ইচ্ছে মতো উল্টেপাল্টে নেওয়া যেত ছেলেমেয়ের ব্যাপারটা? যদি মায়ের ইচ্ছে হলেই সন্তানের লিঙ্গ নির্দিষ্ট করে দিতে পারতো সে সহজেই? সমাজটা ভরে যেত পুরুষে। একসময় হয়তো ‘মূল্যবান’ পুরুষদের জন্ম দেওয়ার গর্ভই পাওয়া যেত না কোথাও। কী কাণ্ডটাই না হবে যদি প্রকৃতি নিজ হাতে সব ওলট-পালট করতে থাকে? আমাদের চেনাজানা জগতটা তখন দেখতে কেমন হবে?

ভাবছো কী সব আগড়ম্ব বাগড়ম্ব বকছে! তুমি পড়ুয়া ছেলে। বিশ্ববিদ্যালয়ে তোমার ভালো ছাত্র বলে পরিচিতি আছে। প্রাণীবিদ্যা বিভাগের তুমি এক রত্নবিশেষ। আমি যা বলছি, তা তো তোমার হাতের তালুর মতো চেনা জগত। তাই বলছিলাম, প্রকৃতি মাঝেমাঝে কী সব উল্টোপাল্টা কাণ্ড করে বসে। ছেলে-মেয়ের এই ব্যাপারটাকেই দেয় গুলিয়ে। আমরা অভিশাপ, অভিশাপ বলে ঘুমিয়ে পড়ি অবচেতনায়। কিন্তু বিশ্বাস করো, আমার ঘুম আসে না। আমি রাতের পর রাত জেগে ভাবি, কেন এমন হয়? রাতের নৈশশব্দে আমার চেতনা জেগে ওঠে হাজার প্রশ্ন নিয়ে। আমি রাতের পর রাত প্রশ্ন তাড়া করে বেড়াই। আমি চারিদিকে হাতড়ে বেড়াই। বই ঘাঁটি, নেট ঘাঁটি, রাতের পর রাত চলে যায় কোথা দিয়ে। ভোরের প্রথম আলো যখন পাখিদের ঘুম ভাঙায়, কত রাতের শেষে আমি তখন ঘুমোতে যাই।

এইতো সেদিন জানলাম, ‘Y’ ক্রোমোজোমের একটি নির্দিষ্ট জায়গা এই লিঙ্গ নির্ধারণের ব্যাপারটা নিয়ন্ত্রণ করে। ক্রোমোজোমের ওই জায়গায় যদি কোনো পরিবর্তন হয়, অর্থাৎ, যাকে বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় মিউটেশন বলে, তাহলে শুক্রাণু

তৈরির অঙ্গ গড়ে উঠবে না। এসব তো তোমার অজানা নয়। তুমি জানো ‘DNA’ নামে এক জটিল রাসায়নিক যৌগ, যা ক্রোমোজোমের মর্মবস্তু, তাই-ই সব নিয়ন্ত্রণ করে। মিউটেশন হয় ওই যৌগের কোনো এক জায়গায়। ছোট্ট অদৃশ্য এক পরিবর্তন। কেন হয় এই মিউটেশন? আপাত সরল, আসলে জটিল এই প্রশ্ন। আমাদের সব সমস্যার শুরু হয় মিউটেশনের পর। এক আশ্চর্য পদ্তু গ্রাস করে হতভাগা পুরুষকে। পুরুষ হয়েও সে পুরুষ পরিচয় দিতে অক্ষম। নিজের রক্ত-মাংস নিংড়ে ক্রোমোজোমের ছবি তুলে সে যদি চিৎকার করে বলে—দ্যাখো, আমি পুরুষ; শুধু ছোট্ট একটা ক্ষত আমার হতভাগ্য ‘Y’ ক্রোমোজোমে, আমাকে পদ্তু পুরুষে পরিণত করেছে; যেমন অনেকের শরীরে নানা জন্মগত ত্রুটি থাকে, এটা তার চেয়ে বেশি কিছু নয়। মানবে কেউ? এ-রকম এক বিপরীত প্রক্রিয়ায় যদি ‘Y’ ক্রোমোজোমের ওই বিশেষ অংশ প্রকৃতির খেলালে কোনো ‘X’ ক্রোমোজোমে চলে যায়, আর হতভাগ্য কোনো মেয়ে, যার ক্রোমোজোমের ছবিতো তাকে ‘XX’ ছাড়া কিছুই বলা যাবে না, সে যদি চিৎকার করে বলে—দ্যাখো আমার ক্রোমোজোম বলছে, আমি মেয়ে, কেউ মানবে কি? আসলে তার শরীরে তখন বেড়ে উঠেছে শুক্রাণু তৈরির অঙ্গটি আর শরীরের গঠন যেন কেমন ছেলেছেলে ভাবে তৈরি হতে শুরু করেছে। কী কাণ্ড? এতদিন জানতাম, ‘XX’ হলেই আমি বলতে পারি—আমি নারী। নারীর অধিকার, নারীর সম্মান, নারীর বিশেষ স্থান, বাসে, ট্রামে, ট্রেনে, চাকরিতে নারীর সদর্প চলাচল যেন থমকে গেল এক লহমায়। আমি মাইক্রোস্কোপের সন্ধানী চোখের ওপরেও আস্থা রাখতে পারবো না? কিসের ওপর ভরসা? আমার শরীর কেন এমনতরো অদ্ভুত? বলো, এভাবে কোনো মেয়ে যদি প্রশ্ন করে—আমি কম কিসে? মানবে কেউ?

আসলে মেয়ে বলতে সমাজে এক নির্দিষ্ট ছাঁচের ধারণা আছে। যতক্ষণ সব ছাঁচ অনুযায়ী চলেছে ততক্ষণ সব ঠিক। একটু ছাঁচের বাইরে গেলেই গোলমাল। ভেবে দ্যাখো প্রিয়, তোমরা যতই বলো, পুরুষ, নারী, এসব কোনো পরিচয় নয়, আসল পরিচয় মানুষ, কাজের বেলায় তোমাদের মনের আসল চেহারাটা বেরিয়ে পড়ে। তোমরা একটি পাথরের চোখ বসানো মেয়েকে ভালোবাসতে পারো। কিন্তু যে মেয়ের মেয়ে পরিচয়টা তোমাদের চোখে গোলমালে, তার হাত ধরে বন্ধুর মতো তোমরা কেউ বলতে পারো না—আমি তো আছি, আমি তোমায় ভালোবাসি। শরীরের সব বাধা বিপত্তি টপকে আমার মনের এক বিরাট সমুদ্রে এসো আমার হাত ধরে। ডুব দাও আমার মনের গভীরে। কত রঙিন প্রাণের লুকোচুরি দেখতে পাবে, যেমন সমুদ্রের গভীরে প্রবাল প্রাচীরের অন্দরে-কন্দরে ঘুরে বেড়ায় রঙিন মাছেরা। এসব তোমার কন্মো নয় আমি জানি। তুমি তোমার পুরুষত্ব নিয়ে এক আশ্চর্য প্রাচীরের মধ্যে এক প্রাসাদে বাস করো। তুমি ভাবো প্রাচীর নেই। তোমার মনের চোখ প্রাচীর দেখে না। তুমি যখন ধন্দে পড় তোমার চোখ খুলে যায়। তুমি বুঝতে পারো, এতদিন মানুষ-মানুষ করে যেতো কথা বলছিলে, সব আসাড। পুরুষ না নারী, এই লিঙ্গ-ভেদ তোমার মধ্যে স্পষ্ট। দোষ দিই না। তোমার মতো বেশিরভাগ মানুষের মনে নিজের অগোচরে বেড়ে ওঠে নির্দিষ্ট লিঙ্গ পরিচয়। সেই লিঙ্গ পরিচয়কে ছাড়িয়ে শুধুই মানুষ পরিচয় নিজেকে গড়ে তোলা? এসব দূর-কল্পনা। তার চেয়ে এসো তোমায় অন্য কথা শোনাই।

এমন হতভাগাও হয়, যার শরীরে ডিম্বাশয় ও শুক্রাশয় দুটিই থাকে। যদিও এদের বেশিরভাগের ক্রোমোজোমের যে চেহারা

পুরুষ, নারী বিভাজন হয় তা নারীর। অর্থাৎ লিঙ্গ নির্ধারক ক্রোমোজোম ‘XX’। কী সাংঘাতিক! এসব হতভাগাদের সংখ্যা যে খুব বেশি তা নয়। তবে এমন মানুষ আছে আমাদের মধ্যে। আচ্ছা, ভেবে দেখেছো, এরা নিজের পরিচয় যখন লিখবে কোনো সরকারি নথিতে, যেমন ট্রেনের রিজার্ভেশন থেকে পরীক্ষার ফর্ম ভর্তি করা অবধি, সব জায়গায় কেমন ধাক্কা খাবে। ফর্ম ভর্তির সময় লিখতে হয় নিজের লিঙ্গ পরিচয়। কী লিখবে সে? পুরুষ, নারী, নাকি দুটোই। ছোটো দুটি বক্সের পাশে লেখা, একটিতে পুরুষ, একটিতে স্ত্রী। ছোটো একটি টিক চিহ্ন দিতে হবে বক্সের ভেতর। সে থমকে দাঁড়াবে। কাকে জিজ্ঞাসা করবে? জনাজানি হলে টি টি পড়ে যাবে চারিদিকে। কথা ছড়াবে কানে কানে দাবানলের আগুনের মতো। লিঙ্গে গোলমাল? ফিসফাস, হাসাহাসি, কত অশ্লীল ইয়াকিঁতে বাতাস হবে ভারি। বোচারা মানুষটি পুরুষ-নারী পরিচয়ের আবর্তে পরে ঘুপাক খাবে নিজের চারিদিকে। নিজের দিকে তাকিয়ে থাকবে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে। দরজা বন্ধ করে উলঙ্গ হয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কাঁদবে। হা-হুতাশ করবে সে শুধুমাত্র গোলমালে লিঙ্গের জন্য।

হে আমার প্রিয়, তুমি কি তখন পারবে তার মাথার হাত রাখতে? তোমার হৃদয় কি তখন ভরে উঠবে কানায় কানায় গভীর মমতায়? তুমি কি তখন মুখ ফুটে বলতে পারবে—ছাড়ো গোলমালে লিঙ্গের কথা? তোমার একটা পা বাঁকা হলে, একটা হাত অন্যরকম হলে তুমি কি পাল্টে গেলে? মনটা তো তোমার মানুষের। ভালোবাসা তো শরীরের সীমানা ছাড়িয়ে অসীমের গান শোনায়ে। এসো আমরা পাশাপাশি বসি নদীর কিনারে। ডুবে যাওয়া সূর্যের রঙে নদীর জল যখন শব্দহীন এক স্বর্গীয় গানে ভুবন ভরাবে, তখন আমরা পরস্পরের লিঙ্গ-পরিচয়ের গণ্ডিতে বাঁধা পড়ব? আমি জানি তুমি তা বলতে পারবে না। আসলে তুমি ঘৃণা করতে শিখেছো ছোটোবেলা থেকে। যা কিছু অন্যরকম, তাকে হয় ভয়—না হলে ঘৃণা করতে শিখেছো ছোটো থেকে। চারিদিকটা যেমন করে দেখছি, ঠিক তেমনভাবেই সারাটা জীবন সব কিছু দেখতে চাও তুমি ও তোমরা। তাই তোমার নিখুঁত লিঙ্গ পরিচয়ের নিরাপদ আশ্রয়ে থেকে তুমি অনায়াসে বলে যাও মানুষের সামনের কথা। সব মানুষ সমান—এ কথাটা বলতে হয়, তা তুমি জানো।

তুমি অনেক খোঁজ-খবর রাখো। তবুও বলছি, তুমি কি জানো, প্রায় কুড়ি একশ রকমের নানা ধরনের ঝকঝকিতে ক্রোমোজোমের পরিচয়ে যে পুরুষ তার বহিরঙ্গের চেহারাটা এমন হতে পারে, যাতে তাকে চেনা মুশকিল হয়, সে মেয়ে না ছেলে? মেয়ে ভেবে বাবা-মা বোচারা ‘XY’ ক্রোমোজোমের মালিককে বড় করে মেয়েদের মতো করে। তারপর কোনো অশুভ মুহূর্তে যখন জনাজানি হয় মাইক্রোস্কোপের নিচে, ও মেয়ে নয়, তখন কী করণ অবস্থা হয় বাপ-মায়ের; কী দুর্দশায় পরে হতভাগ্য ‘মেয়েটা’। রাস্তায় বেরোনো দায়। বাড়ির সামনে দিয়ে রকবাজ ছেলেরা শিস দিতে দিতে চলে যায়। অশ্লীল ইঙ্গিতময় সে শিস। কী অপরাধ? লিঙ্গ পরিচয়ে গোলমাল। ক্রোমোজোমের পরিচয়ে মেয়ে হয়েও কোনো হতভাগা জন্মালো পুরুষের লিঙ্গ পরিচয়ে বা অদ্ভুত লিঙ্গ গঠনে। সে জন্মমুহূর্তেই হয়ে উঠল বাপ-মায়ের আতঙ্কের কারণ। প্রায় আট-দশ রকম শরীরী ঝকঝকিতে এসব হতে পারে, তুমি জানো নিশ্চয়।

প্রিয়, এরকম কোনো মানুষের বন্ধু হয়েছো কখনও? কখনও শুনেছো মন দিয়ে ওদের কারো কথা? ওরা জানে, ওদের ভালোবাসার কোনো দাম নেই। লিঙ্গ-পরিচয়হীন ভালোবাসায় মানুষ এখনও পৌঁছায় নি। একথাটা ওদের চেয়ে ভালোভাবে

আর কেউ জানে না।

প্রিয়, আমি লুকিয়ে লুকিয়ে এই অদ্ভুত জগতটায় ঘুরে বেড়াই। আমরা মানুষকে পুরুষ ও নারী, এই দু-ভাবে দেখতে অভ্যস্ত। কিন্তু প্রকৃতির গভীরে কোনো অজ্ঞাত চেতনা এই দুই সরল হিসাবের মধ্যে অনেক ভগ্নাংশ ঢুকিয়ে দেয় মাঝে মাঝে। সব খেলাটা শরীরটা নিয়ে। প্রকৃতি যখন আপন খেয়ালে শরীরের মধ্যে কিছুটা ছেলের, কিছুটা মেয়ের নানা লিঙ্গ পরিচয়ের চিহ্ন কোনো জটিল রসায়নকে হাতিয়ার করে ঢুকিয়ে দেয়, তখন সে হয়ে ওঠে ভগ্নাংশ। একজন খণ্ডিত মানুষ! কী অদ্ভুত! তাই না? শরীরের সব পরিচয় ছেড়ে শুধু লিঙ্গ পরিচয় কী বিরাট ব্যাপার। অথচ কথায় কথায় আমরা মনের কথা বলি। মন, মনই সব। কিন্তু এই অদ্ভুত লিঙ্গ পরিচয়ের কোনো মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে আমরা ভাবতেই পারি না প্রেম, ভালোবাসার কোনো দেওয়া-নেওয়া। ওখানে আমাদের ‘উদার’ মন বড় জোর করুণা করতে পারে? কে চায় করুণা? সমানে সমানে করুণা হয় না। অসমান ভেবে তবেই সমানের গালগল্প। কোনো সত্যিকার প্রেমের গল্প, নাটক, সিনেমা হয় না এইসব মানুষদের নিয়ে। তুমি পারবে লিখতে কোনো অমর কাব্য এইসব ‘অদ্ভুত’ মানুষদের নিয়ে? তোমার সাহসে কুলোবে না আমি জানি। দোষ দিই না। এতটা সাহস আশা করি কী করে? আসলে তোমাকে আমার ভালো লাগে। তাই এত কথা লিখে ফেললাম তোমাকে। তুমি ভাবছো, কে এই পাগল? উল্টোপাল্টা, উদ্ভট সব সমস্যা নিয়ে আজোবাজে লেখায় কটা কাগজ নষ্ট করল?

আসলে আমিও এক ভগ্নাংশ মানুষ। শুধুমাত্র পুরুষ বা নারী বলে নিজের পরিচয় দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি এক দশমিক দুই, না এক দশমিক তিন পুরুষ বা নারী, যাই হই না কেন, আমি স্রেফ পুরুষ, নারী, এসব কিছু না। প্রকৃতি আমাকে শুধু মানুষ পরিচয় দিয়ে ছেড়ে দিয়েছে তোমাদের মাঝে। যারা হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে কোনো এক নারীকে বা কোনো এক পুরুষকে—যে হবে ভবিষ্যত প্রজন্মের মা, বাবা যাহোক একটা কিছু। হ্যাঁ আমরা চিকিৎসা করাতে পারি। শরীরের ওপর ওষুধ, কাটাছোঁড়া কতকিছু করে নিজের ‘আমিটাকে’ শেষ করে অন্য এক ‘আমি’ হতে চাই। অথচ এসব না করে যদি বুক চিতিয়ে বলতে পারতাম, আমি যা আছি, আমি তাই, তাহলে হয়তো তোমাদের ঘেম্মার যোগ্য জবাব হতো। আমি বেশ বুঝতে পারছি, তুমি আমাকে ঘেম্মা করতে শুরু করেছো। এত সাহস? যার ইয়ের ঠিক নেই, সে কিনা প্রেমের চিঠি লেখে? জনাজানি হলে সবাই হাসির খোরাক হয়ে যাব—এই তোমার মনের কথা। তুমি আমায় ফোন করবে না জেনেও আমি নম্বরটা দিয়েছি। যদি করো এই আশায়। মানুষের মন তো? আশা নেই যেখানে, সেখানেও আশা করে। তোমার সঙ্গে দুটো কথা বলার, একটু পাশে বসার ইচ্ছা ছিল। এই সামান্য ইচ্ছাটুকুই কী অসম্ভব দাবি, স্রেফ আমি অন্যরকম বলে। ভেবে দেখ, তুমি কতজনের সঙ্গে গল্প করেছো, পাশে বসেছো, ভিক্টোরিয়ায় দল বেঁধে গিয়ে কতরকমের চোখাচোখি হয়েছে তোমাদের অনেকের মধ্যে। অথচ সেখানে আমার চোখের দিকে তাকাতে তোমার ঘেম্মা। গা গুলোচ্ছে? আর কষ্ট দেবো না।

জানো, এ চিঠি আমি আমার মাকে, বাবাকে দেখিয়েছি। তোমার কাছে পাঠাবার আগে কেন জানি না মনে হল আমায় যারা এই অপূর্ব পৃথিবীর আলো দেখালো, তাদেরকে দেখাই, তাদের সম্ভানের অপকীর্তি। চিঠি পড়ে মার কী কান্না! বলতে থাকে, ভগবান তোকে কালা করতে পারতো, খোঁড়া করতে পারতো, এ কী সর্বনাশ করে তোকে পাঠালো আমার কোলে? আমি যতো বোঝানোর চেষ্টা করি, মা ততো কাঁদে। আমি বলি—মা, এসব

শ্রেফ নানা জটিল রাসায়নিক বিক্রিয়ার কিছু গোলমালে ব্যাপার। কে শোনে কার কথা! আমি বলি, জিন, ডি.এন.এ. এসব এ যুগের আশ্চর্য আবিষ্কার। আমরা জানতে পেরেছি, কোনো অভিশাপে নয়, পূর্বজন্মের কোনো পাপে নয়, মা, আমি একটু অন্যরকম শুধু জটিল জৈব-রসায়নের নানা কারিকুরিতে। কোটি কোটি কোষের নানা খেলায় আমি হয়েছি আমার মতো। মা বলে, ওরে পাগল, সমাজ বুঝলি না এখনও। সমাজ তোর রসায়ন-ফসায়ন বোঝে না; সমাজ বোঝে তুই তোর এই জামাকাপড়ের আড়ালে কেমন? মা হয়ে এর চেয়ে বেশি কী বলব? আমি সান্ত্বনা দিই। বলি, তোমায় ভাবতে হবে না আমার কথা। আমি ঠিক বুঝে নেব নিজেরটা। মা কি সহজে হার মানে? বলে, চিঠি লিখিস কেন? আমি বলি—ভালোবাসি তাই লিখি। মা পড়ে আছে কোন যুগে! বলে কিনা, তোদের ভালোবাসা শুধু বাপ-মায়ের জন্য। আর কাউকে তুই ভালোবাসতে পারিস না। সমাজ এসব মানে না। তোদের মতো মানুষদের মনের মানুষ থাকতে নেই। ভালোবাসা নিষেধ তোদের জন্য। আমি বলি—মা, ভালোবাসার জন্য শরীরটা এতো জরুরি। শরীরের এক বিশেষ পরিচয়ে অস্পষ্টতা থাকলে তার মনে ভালোবাসা বাসা বাঁধতে পারে না, প্রকৃতি তো এমন নিষেধের

নিগড় গড়ে নি আমাদের জন্য। ভালোবাসার ইচ্ছা তো আসতো না তাহলে। আমি বুঝি, আমি বেশ ভালোবাসতে পারি। মা মাথায় হাত বুলায়। বাবা এসে পাশে দাঁড়ায়—শুতে চল। আমি গিয়ে শিশুর মতো শুয়ে পড়ি বাবা-মায়ের মাঝখানটিতে। কী নিরাপদ আশ্রয়! কোনো ভয় নেই। কোনো ঘেমা নেই; নেই কোনো সন্দেহ, নেই কোনো প্রশ্ন। আমি বাবাকে আঁকড়ে ধরে শুয়ে থাকি। মাকে বলি ঘুম পাড়ানি গান শোনাতে। ঘুমিয়ে পড়ি কখন জানতেও পারি না।

স্বপ্ন দেখি—তুমি পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চেপে ঝলমলে পোষাক পরে টগবগ করতে করতে আসছো। আমি ছুটছি ছুটছি ছুটছি। পেছনে তাড়া করে আসছে সব বিকট চেহারার রান্ধস-খোন্ধসেরা। আমি হাত বাড়িয়ে দিলাম। তুমি হাত ধরলে। ঘুম ভেঙে গেল। ঘামে ভিজ়ে সারা শরীর। আমার শরীর। পবিত্র, একটা আস্ত শরীর। আমি নিজের গায়ে হাত বুলালাম পরম মমতায়। আমার মন ভরে গেল এক সাগর ভালোবাসায়। আমি এই সাগর তোমায় দান করলাম।

ইতি
এক টুকরো মানুষ

সকলকে শারদ শুভেচ্ছা জানাই



খোয়াই

এই সময়ের অন্যতম বিশিষ্ট প্রকাশনা

পুরুষোত্তম সামন্ত সরণি, কুণ্ডপুকুর, বর্ধমান-৭১৩১০১

Sl. No. 90

বর্ধমান জেলার ভূমিপুত্র উগ্রক্ষত্রিয় সম্প্রদায়

সর্বজিৎ যশ

বর্ধমান জেলায় আদি আবাসস্থল এবং কয়েক শতাব্দী ধরে মূলত একটি জেলাতেই নিরবচ্ছিন্নভাবে বসবাস, এই ধরনের চরম কেন্দ্রীভূত জাতিগত আঞ্চলিকতার বিরলতম দৃষ্টান্ত সম্ভবত আগুরি বা উগ্রক্ষত্রিয় সম্প্রদায়। বাংলাদেশে এঁরা আগুরি, আগুরি নামে এবং কৃষিজীবী জাতি রূপে পরিচিত। প্রাচীনকালে এঁরা কৃষিবৃত্তি এবং সামরিক বৃত্তি উভয়ই গ্রহণ করতেন। মহাভারতের আদিপর্বের একাদশ অধ্যায়ে ‘উগ্রত্ব’ই সমস্ত ক্ষত্রিয়ের শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলে উল্লিখিত আছে। মনুসংহিতায় এই জাতিকে উগ্রক্ষত্রিয়ের ঔরসে শূদ্রানী গর্ভজাত বলেছেন। কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে এদেরকে করণের ঔরসে রাজপুত্রকন্যা গর্ভজাত বলেছেন। সুতরাং এই পরস্পরবিরোধী জন্মতত্ত্বকে বিশ্বাস করা যায় না। বায়ু পুরাণ মতে মগধের রাজা প্রথিতযশা মহানন্দ শূদ্রকন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁর এই শূদ্র স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান মহারাজা মহাপদ্ম নন্দ যিনি নন্দ বংশের প্রতিষ্ঠাতা, তিনি উগ্রক্ষত্রিয় জাতিতে পরিচিত হন। যদিও তিনি জৈন ধর্ম গ্রহণ করেন। এই জন্য বর্ণাশ্রমী ব্রাহ্মণগণ তাঁর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়ে তাঁর ক্ষত্রিয়ত্ব অস্বীকার করেন। কিন্তু এই সময়ে বঙ্গদেশে জৈন ধর্ম বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করার ফলে বর্ণাশ্রয়ীদের বিরোধিতা সত্ত্বেও নন্দ তাঁর সমস্ত রাজ্যের ক্ষত্রিয়দিগকে পরাভূত করে উগ্রক্ষত্রিয়দেরকে প্রতিষ্ঠিত করেন।^১ পণ্ডিতপ্রবর পঞ্চনন তর্করত্ন মহাশয় বলেন—

উগ্রক্ষত্রিয় জাতি আদিকাল হইতে বেদবিধি-ব্যবস্থা অনুসারে চলিয়া আসিতেছেন। ইহাদের মধ্যে অনেকেরই সদারত অতিথিশালা আছে। অনেকের বিগ্রহস্থাপনা আছে। শালগ্রামশিলা প্রায় গৃহে গৃহে বিরাজমান। বর্ধমান জেলাতে অনেক ধনাঢ্য ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং কায়স্থ আছেন, কিন্তু এই উগ্রক্ষত্রিয় জাতি তাঁদের অপেক্ষা কোনোমতেই ধর্মকর্মে হীন নহেন।... পূর্বে এই জাতির অনেক স্ত্রীলোক সহমৃত্যু হইতেন। অদ্যপি বর্ধমান জেলায় নানা স্থানে নদীকূলে বা সরোবর তীরে অথবা প্রান্তর মধ্যে সেই সকল সতীসাক্ষীগণের স্মরণস্বরূপ ‘সতীর মন্দির’ বিদ্যমান আছে।^২

উগ্রক্ষত্রিয়গণের মধ্যে প্রবাদ আছে—মুঘল সম্রাটের সেনাপতি মানসিংহের সঙ্গে উগ্রক্ষত্রিয়গণ যুদ্ধব্যপদেশে আখা থেকে এদেশে আসেন। কথিত আছে, মুঘল রাজত্বকালে যখন পাঠানগণ বারবার বিদ্রোহ করে এবং বর্গী এসে লুণ্ঠন করতে থাকে, তখন রাজা মানসিংহ এই উগ্রক্ষত্রিয়দের আখা থেকে নিয়ে এসে মারাঠা লুণ্ঠনকারীদের গতিরোধ করার জন্য শাহি রোডের দুই পাশে বসতি দান করেন এবং একটি বিশাল ভূখণ্ডও এদেরকে ভাতা হিসেবে দান করেন। এই জন্য এই স্থানের নাম ‘ভাতাড়’ হয়েছে।^৩ ঐতিহাসিক সূত্রে উক্ত প্রবাদ ভিত্তিহীন বলে প্রমাণিত হয়েছে। কারণ মুঘল আমলের পূর্বেও উগ্রক্ষত্রিয়দের অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া যায়। যেমন

উগ্রক্ষত্রিয়দের একটি উপাধির উল্লেখ মুঘল আমলের আগেই পাওয়া যায়, উপাধিটি হল ‘যশ’। দিব্যকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য রামপাল রাঢ় দেশে যেসব রাজন্যবর্গের দ্বারে দ্বারে ঘুরেছিলেন তাঁদের পরিচয় আছে সম্রাটের নন্দী বিরচিত ‘রামচরিত’-এ। সেই রাজার মধ্যে পাওয়া যায় ভীম যশ-এর নাম। আবার ব্রাহ্মণদের মধ্যে আছে মহাযশ, এছাড়াও আছে ললিত যশ, বিষ্ণু যশ, অনন্ত যশ প্রভৃতি নামগুলি। মহাযশ বংশের নামও পাওয়া যায়।^৪ মানসিংহের বাংলায় আগমন মাত্র ৪৬০ বছরের কথা। খগেন্দ্রনাথ ভৌমিক অবশ্য দেখিয়েছেন উগ্রক্ষত্রিয় ও কায়স্থ উভয় জাতিরই যশ পদবি হতে পারে।^৫ ‘হরপ্রসাদ সংবর্ধন লেখমালায়’ (১ম, পৃ. ২৭৫) দেখা যায়, প্রায় ৭০০ বছর পূর্বে মহারাজ বল্লাল সেনের আমলেও উগ্রক্ষত্রিয়গণ এদেশে বাস করতেন। বল্লাল সেনের রাজত্বকালে গৌড়বঙ্গে প্রচলিত জাতিগুলির থাক নতুন করে নির্দিষ্ট করা হয়, যে সময় আগুরি জাতিকে ‘নবশাখ’ থাকের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।^৬ ‘গৌড়ের ইতিহাস’-কার রজনীকান্ত চক্রবর্তী বলেন—

পশ্চিমরাঢ়ে উগ্রক্ষত্রিয়গণের কয়েকটি রাজ্য ছিল, এই সকল রাজ্য পাল রাজাদের অধীনতা স্বীকার করেছিল। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত কৃত্তিবাসী রামায়ণের মূল গ্রন্থকর্তা ১৫০২ শতাব্দির রচনাতে সেকালের গৌড়ের দক্ষিণে সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত সুবিশাল ভূভাগে উগ্রক্ষত্রিয়গণের ২২টি রাজত্বের অস্তিত্বের বর্ণনা করেছেন। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যেও উগ্রক্ষত্রিয় জাতির প্রাচীনত্বের বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। মুকুন্দ চক্রবর্তীর ‘চণ্ডীমঙ্গল’ কাব্যে ঘনারাম চক্রবর্তীর ‘ধর্মমঙ্গল’-এ এই জাতির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। এই সমস্ত বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে, রাজা মানসিংহের আগমনের বহু পূর্ব থেকেই এই জাতির অস্তিত্ব বাংলাদেশে আছে।^৭

লোকেশ্বর বসু লিখেছেন—

মনুসংহিতা ও বৃহদ্রমপুরাণের নৃতাত্ত্বিক নাম ‘উগ্রক্ষত্রিয়’ পরে বৃত্তি নাম পায় ‘অগ্রহারিক’, তা থেকে দেশজ উচ্চারণে অপভ্রংশিত হয়ে ‘অগ্রহারী ও পরে ‘আগুরি’ থেকে ‘আগুরি’।^৮

ময়ূর ভট্টের ‘ধর্মপুরাণ’-এ আছে উগ্রক্ষত্রী, যারা সম্রাট বা রাজার কাছে অগ্রহার ভূমি লাভ করতেন তাঁদের বলা হতো অগ্রহারীণ, অগ্রহারী বৃত্তিনাম থেকে এসেছে আগুরি।^৯

১৮৯১-এর জনগণনায় আগুরিদের দ্বিতীয় শ্রেণি হিসেবে দেখানো হয়েছে।^{১০} উইলিয়াম হান্টারের ‘স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যাকাউন্ট অব বেঙ্গল’ গ্রন্থে নবশাখ পর্যায়ে আগুরি জাতির নাম আছে, সেখানে বলা হয়েছে—

The Aguris are popularly believed to be modern representatives of the Ugra Khatriyas mentioned in Manu, ‘from a Khatriya by a Sudra girl is

born a creature called an Ugra (cruel) which has a nature partaking both of Khatriya and of Sudra and finds its pleasure in savage conduct'. According to the same authority, their occupation is, 'catching and killing animals that live in holes.'^{১১}

১৯১০ খ্রিস্টাব্দের বর্ধমান জেলা গেজেটিয়ারে বলা হয়েছে—“Aguri is contracted from Ugra-Khetri, or the fierce Khetris, it is a distinctly cultivating caste.”^{১২} অন্যদিকে, ১৯৯৪-এর বর্ধমান জেলা গেজেটিয়ারে বলা হয়েছে—“Aguris, along with Brahmins and Sadgopas, are to be found among the large landowners and Jotedars in the rural areas of the district.”^{১৩} নরহরি দাস জাতিতত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন, উগ্রক্ষত্রিয় হিন্দু বিশেষ (বৈশ্যের গর্ভে ক্ষত্রিয়ের ঔরসে আগুরি জন্ম হয় : বৃহদ্রমপুরাণ)। এই সংকর জাতি বলবান ও তেজস্বী রাজপুত নারীর গর্ভের করণের ঔরসে আগুরি জাতির উৎপত্তি হয়।^{১৪} এইসব মন্তব্য থেকে মনে হয় আগুরি সম্প্রদায় উচ্চ মর্যাদা এবং আর্থিক ক্ষমতাসম্পন্ন একটি জাতিগোষ্ঠী। আগুরিদের সম্পর্কে কয়েকটি প্রবাদ প্রবচন^{১৫} প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়—

১. ‘ধান, আগুরি মুসলমান
এই নিয়ে বর্ধমান।’
২. ‘চাষা, আগুরি মুসলমান
এই তিন নিয়ে বর্ধমান।’
৩. ‘আগুরি, মজুরি আর বাজার সরকার
বর্ধমানে পাওয়া যায় অতি চমৎকার।’

ইতিহাসের দিক থেকে দেখলে এই আপাত লঘু প্রবাদ প্রবচনগুলি মোটেই অতিশয়োক্তি বলে মনে হয় না। সমাজতাত্ত্বিক সমীক্ষায় প্রচলিত ভিত্তিবর্ষ হিসেবে ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের আদমসুমারি অনুযায়ী বর্ধমান জেলাতে ছিল ৫৯,৮৮৭ জন আগুরির বাস।^{১৬} কুলথস্থাদিতে জানতে পারা যায় যে, বাংলাদেশের মধ্যে নিঃশঙ্ক, মুজাফরসাহী, বাঘা, বারবকসিন, সাতসৈকা, ধেঞা, হোসেনপত্তন বা সাহাবাদ ও বর্ধমান—এই ৮টি পরগনায় উগ্রক্ষত্রিয়গণ আদিতে বসবাস স্থাপন করেন ও আজ পর্যন্ত এই সমস্ত অঞ্চলে ও বাঁকুড়া, বীরভূম, মেদিনীপুর, হুগলি, ২৪-পরগনা, সাঁওতাল পরগনা প্রভৃতি স্থানে বসবাস করছেন। বর্ধমানে বহু ধনী আগুরির বসবাস আছে। এঁরা কৃষি ও বাণিজ্যের দ্বারা বহু সম্পত্তি অর্জন করে হিন্দু সমাজে বর্ধিষ্ণু কৃষক ও জমিদার রূপে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করেছেন।^{১৭}

১৮৯১-এর জনগণনা রিপোর্টে উগ্রক্ষত্রিয় জাতিকে সাতটি স্তরে বিন্যস্ত করে দেখানো হয়েছে—১. বর্ধমানী, ২. কাশীপুরী, ৩. বাঘা, ৪. সাতসাইকা, ৫. চাগ্রামী, ৬. জানা এবং ৭. সুত। বলা বাহুল্য, এই বিভাগগুলি সঠিক নয়। তবে সেম্পাস কমিশনের প্রয়াস লক্ষণীয়। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে সেম্পাস রিপোর্ট মোটের উপর প্রমাদপূর্ণ ও অসমাপ্ত ছিল। স্যার হার্বার্ট রিজলি ‘ট্রাইব অ্যান্ড কাস্ট অব বেঙ্গল’ নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন, যা ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়, যাতে বাঙলার উচ্চবর্ণের হিন্দুসমাজকে চারটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়। প্রথম শ্রেণি : ব্রাহ্মণ; দ্বিতীয় শ্রেণি : বৈদ্য, কায়স্থ, ক্ষেত্রী, রাজপুত, উগ্রক্ষত্রিয়; তৃতীয় শ্রেণি : নবসায়ক বা নবশাখ, গন্ধর্বগণিক, তাঁতি প্রভৃতি সংব্রাহ্মণ-যাজিত গোষ্ঠী; চতুর্থ শ্রেণি : চাষি, কৈবর্ত, গোয়াল, সুবর্ণবণিক, সেকরা, শৌণ্ডিক, তৈলিক, সূত্রধর প্রভৃতি বর্ণ ব্রাহ্মণ কর্তৃক যাজিত গোষ্ঠী।

রিজলি সাহেবের গ্রন্থানুসারে তৎকালীন উগ্রক্ষত্রিয় জনসংখ্যা ছিল ৯০,৩৬৯ জন। উগ্রক্ষত্রিয় জাতি সম্পর্কে তিনি যে মন্তব্য তাঁর

গ্রন্থে প্রকাশ করেছেন তার আংশিক মর্মানুবাদ উদ্ধৃত হল :

আগুরি বা উগ্রক্ষত্রিয় জাতিকে (যে নামেই কথিত হোক) ইংরাজি বর্ণমালা অনুসারে দ্বিতীয় শ্রেণীর শেষ ভাগে স্থান দেওয়া হয়েছে। তবে এই উচ্চস্থান তার পক্ষে প্রাপ্য কিনা সে সম্বন্ধে নিশ্চিতভাবে কিছু জানা যায় না। জেলা-কর্মচারীগণের মধ্যে কেউ কেউ তাকে (উগ্রক্ষত্রিয়কে) তৃতীয় মানে স্থান দেবার জন্য সুপারিশ করেছিলেন।^{১৮}

পূর্বে বর্ধমান শহরে আগুরির সংখ্যা তেমন উল্লেখযোগ্য ছিল না। গ্রামাঞ্চলে, বিশেষত, দামোদরের দক্ষিণ তীরস্থ গ্রামগুলিতে তখন আগুরিদের প্রচণ্ড দাপট ছিল। একই সাথে বর্ধমান শহরের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলের গ্রামগুলি, যেমন রায়ান, ভাতাড়, বলগোনা, নাসিগ্রাম, পোষলা, মুশারু প্রভৃতি এলাকায় তাদের যথেষ্ট দাপট ছিল। কিন্তু বিংশ শতকের প্রথমার্ধে (১৯০০-১৯৫০) অল্প এবং ১৯৫০ থেকে ১৯৭০-এর মধ্যে বিশাল সংখ্যক মানুষ দক্ষিণ দামোদর এলাকার বাস উঠিয়ে বর্ধমান শহরে বসতি স্থাপন করেন। চাকরির সুযোগ, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার সুযোগ, ব্যবসা এবং সর্বোপরি রেল ও সড়কপথে বর্ধমানের সঙ্গে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের যোগাযোগ ইত্যাদি বেশ কিছু কারণ এর পিছনে কাজ করেছিল। দক্ষিণ দামোদরের বিধবৎসী বন্যাও আর একটি অন্যতম কারণ। দক্ষিণ দামোদর থেকে আগত জনমানুষের বেশিরভাগটাই ছিল আগুরি সম্প্রদায়ের। ফলস্বরূপ বর্ধমান শহরে ধীরে ধীরে আগুরিরা প্রধান ক্ষমতাবান গোষ্ঠী হিসেবে উঠে আসে। বাঙালি জাতিসত্তার সামগ্রিক প্রেক্ষিতে অতিক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী হিসেবে বিবেচিত হলেও বিপুল সংখ্যাধিক্যের জোরে আগুরি জাতি নিঃসন্দেহে বর্ধমান জেলার ‘ভূমিপুত্র’।^{১৯}

বর্ধমানের উগ্রক্ষত্রিয় সমাজের মোট জনগোষ্ঠীর বসবাস গ্রামে প্রায় ৭০ শতাংশ এবং বর্ধমান শহরে ৩০ শতাংশ। এঁরা শহরে বা গ্রামে যেখানেই থাকুন না কেন এঁদের মধ্যে একটা সংঘবদ্ধতা লক্ষ করা যায়। পারস্পরিক বোঝাপড়া, সহযোগিতা ও বিভিন্ন পূজাপার্বণে সাড়ম্বর সমাবেশ এঁদের বৈশিষ্ট্য বলা যায়। বিভিন্ন উপবিভাগে বিভক্ত হলেও শহরাঞ্চলে তার অস্তিত্ব তেমন পরিস্ফুট নয়। পল্লিগ্রামে শোনা যায় এখনও কৌলীন্যবোধ মাঝে মাঝে জেগে ওঠে। কিন্তু শহরাঞ্চলের মানুষরা মনে মনে মনে পোষণ করলেও তার বহিঃপ্রকাশ নেই বললেই চলে। এই সম্প্রদায়ের মানুষ শহরে যে অঞ্চলে বসবাস করেন নবাগত আগুরিরা সেই অঞ্চলেই বসবাস করার বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন। এর মূলে রয়েছে জাতিপ্রীতি। তাই তাদের প্রতিবেশীসুলভ ভালোবাসার অভাব দেখা যায় না। ছোটোখাটো সমস্যা দেখা দিলে এঁদের প্রধান লোকদের সহায়তায় তা মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা লক্ষ করা যায়। অবশ্য ঘটনাক্রমে এর ব্যতিক্রম যে ঘটে না তা নয়।^{২০}

তৎকালীন সেম্পাসে যদিও সাত প্রকার আগুরির কথা জানা যায়, বর্তমান বর্ধমানে কিন্তু কেবলমাত্র জানা ও সুত—এই দুটি ধরনের আগুরির অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। সুত আবার কটি শ্রেণিতে বিভক্ত—কাশীপুরী, চাগ্রামীয়া, বারগ্রামী ও পশ্চিমা। তবে বর্তমানে সমস্ত ভেদাভেদ লুপ্তপ্রায়। এরা আবার কুলীন এবং মৌলিক শ্রেণিতে বিভক্ত। কুলীনেরা মৌলিকের সাথে ক্রিয়া করতে পারেন, কিন্তু তাতে কুলীন পাত্র সমাজে নিন্দনীয় হয় এবং যদি কোনো পরিবার উপরি উপরি মৌলিকান্ত ক্রিয়া করেন, তাহলে সেই বংশ মৌলিকত্ব হয়। এঁরা সকলে নিজ নিজ থাকে বিবাহ করেন, অপর থাকে বিবাহ নিষিদ্ধ ও নিষিদ্ধ। ‘জানা’ ও ‘সুত’ শ্রেণিরা আপনাদের ‘দক্ষিণরায়’-এর বংশধর বলে ব্যক্ত করেন। সমগ্র আগুরি জাতি আপনাদের দ্বিজধর্মী বলে মনে করেন এবং ‘জানা’ থাক ব্যতীত অন্য কোনো থাক উপবীত গ্রহণ করেন না। শুধুমাত্র বিবাহের সময়

‘জানা’-রা উপবীত ধারণ করেন। যাঁরা নিজ হাতে ভূমিকর্ষণ করেন অথবা ধান্যাদি চাষ করেন তাঁরা উপবীত ধারণ করেন না। স্বগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ হলেও ‘জানা’ ও ‘সুত’ শ্রেণির মধ্যে বৈবাহিক আদান-প্রদানের কোনো বাধা নেই—যদিও তাঁরা একই পূর্বপুরুষ ‘দক্ষিণরায়’ থেকে উদ্ভূত। বর্তমানকালে এঁরা ‘সুত’ ও ‘জানা’—মাত্র দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত। ‘উগ্রক্ষত্রিয় সমিতি’ দীর্ঘ আন্দোলনের ফলে এই দুই শ্রেণির মিলনসাধনে সমর্থ হয়েছে।^{২১}

এঁদের মধ্যে নিম্নোক্ত গোত্রগুলি দেখা যায়—ভরদ্বাজ, গৌতম, কাশ্যপ, শাণ্ডিল্য ইত্যাদি। নিম্নোক্ত পদবিগুলি আগুরিদের মধ্যে বর্তমান—কর, কার্ফা, কুণ্ডু, কুমার, কেশ, কোঙার, খাঁ, গুণ, গুহ, গৌ, ঘোষ, চন্দ্র, চাঁই, চৌধুরী, তা, দত্ত, নায়েক, দাঁ, দিকপতি, নন্দী, পই, পবি, পাল, পাঁজা, বন্ধু, বুট, বোস, মল্লিক, মাকড়, মাজী, যশ, রক্ষিত, রায়চৌধুরী, রায়, পালিত, রুদ্র, রেজ, সাঁই, সাম, সামন্ত, সাহানা, সিকদার, সেন, সোম, হাজরা, হাজরাচৌধুরী, হাটি, ছই, দে, মাল, কুঁড়, ভুঁই, বাগ, বগি, দলুই, কাজি, সরকার, দানা, জানা, শ্বেতা, মাঝলে, বারুই, আচি, দাশ, নাগ, ধারা, রায়জি, রেজা, সাঁতরা, হাজারি, সামুই, সই, জুই, রায়, রাউৎ, মল্ল, মজুমদার, বাটী, সর, সা, হর, মাতাপ।^{২২} তবে একটা কথা বলা দরকার যে আগুরিদের বিবাহ আগুরি জাতির বাইরে হয়েছে, এ ধরনের দৃষ্টান্ত খুবই কম। সংখ্যাগতভাবে ০.০১ শতাংশেরও কম।^{২৩}

আর একটি বিষয় বলা দরকার। আগুরি সম্প্রদায়ের সঙ্গে জমির অর্থাৎ কৃষির সম্পর্ক খুব গভীর। বর্ধমান শহরে যে প্রচুর সংখ্যায় আগুরি গ্রাম থেকে এসেছেন তাঁদের সকলেরই বর্তমানেও কৃষিজমির পরিমাণ উল্লেখযোগ্য। তাঁরা আর্থিকভাবে হয়তো কৃষিজমির উপর নির্ভরশীল নন কিন্তু চাষজমি, দেবোত্তর জমি, কুলদেবতা—সবকিছুই গ্রামে টিকিয়ে রাখতে চান। বর্ধমান শহরে থাকার কারণে তাঁরা গ্রাম থেকে ছিন্নমূল হয়ে পড়েননি। তবে বহু আগুরি ব্যবসাদার, শিক্ষক, কেরানি, ঠিকাদার, রাজনীতিবিদ হিসেবে বর্ধমান শহরেও তাঁদের স্থায়ী স্থান করে নিতে পেরেছেন।^{২৪}

১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে জনগণনা রিপোর্টে আগুরি সম্প্রদায়কে দ্বিতীয় শ্রেণি হিসেবে দেখানো হলেও কিছু বাঙালি মনে করতেন আগুরিরা নিম্ন সম্প্রদায়ভুক্ত। এঁদের মধ্যে বিশিষ্ট বাঙালি লালবিহারী দে, জয়কৃষ্ণ ঘোষ প্রমুখ ছিলেন। ইংরেজদের সঙ্গে তাঁদের সখ্য থাকায় ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ আগুরিদের তপশিলি জাতিভুক্ত করা হয়। ভারতের স্বাধীনতার পরেও তা বজায় ছিল। কিন্তু ১৯৫০-এ সংবিধান প্রণয়নের সময় এ বিষয়ে নতুন বিতর্ক দেখা দেয়। সে-সময়ে উগ্রক্ষত্রিয় সমিতি বেশ সক্রিয় ছিল। তৎকালীন বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব স্বাধীনতা সংগ্রামী যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজার নেতৃত্বে আগুরি সম্প্রদায় তপশিলি জাতিভুক্ত হওয়ায় অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। বাঁকুড়া নিবাসী বিশিষ্ট সাহিত্যিক রায়বাহাদুর সত্যকিন্দর সাহানা বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের মতামত জানতে চাইলে তিনি প্রথম দিকে তপশিলি জাতিভুক্ত হবার পক্ষে মতামত দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা-র মতামতের সঙ্গে তিনিও ঐকমত্য প্রকাশ করেন। সে-সময় আগুরি সম্প্রদায় সাধারণ জাতি হিসেবে থেকে যায়। ১৯৯১-এর জনগণনার সময়ে বর্ধমানে যাজিগ্রামের সন্তান প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী অজিতকুমার পাঁজা আগুরিদের ওবিসি-ভুক্ত করার জন্য জোর উদ্যোগ গ্রহণ করেন। বর্ধমান শহরে সে-সময় প্রাক্তন সাংসদ (১৯৭৭ সালে জনতা দলের প্রার্থী রূপে নির্বাচিত) রাজকৃষ্ণ দা এ-বিষয়ে আন্দোলন গড়ে তোলেন। কিন্তু ‘উগ্রক্ষত্রিয় পরিচিতি’ গ্রন্থের লেখক সঞ্জীব বন্ধু সহ বর্ধমান শহরের উগ্রক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের মানুষ এর বিরোধিতা করেন এবং শেষ পর্যন্ত অজিত পাঁজার প্রয়াস ব্যর্থ হয়। আগুরিরা বর্তমানে ‘জেনারেল

কাস্ট’ হিসেবেই বিরাজমান।^{২৫}

বাংলার বিভিন্ন জেলায় উগ্রক্ষত্রিয়দের ‘সমাজ সংস্থান’ বিভিন্ন। পূর্ববঙ্গের আগুরিদের শিক্ষার হার তেমন নেই কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের আগুরিদের মধ্যে এই হার বেশি। পূর্বে উগ্রক্ষত্রিয়দের কন্যাদের বাল্যবিবাহের প্রচলন ছিল। বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ এবং পতি পরিত্যাগ করে পত্যস্তরে যাওয়া রীতিবিরুদ্ধ ছিল। বর্ধমান জেলার বেশিরভাগ অঞ্চলে উগ্রক্ষত্রিয়দের স্থাপিত দেবালয় ও অতিথিশালা আছে। আগুরিদের অধিকাংশই চাষবাসের উপর নির্ভরশীল ছিলেন বলে ইংরেজি শিক্ষার প্রতি প্রথম দিকে এঁদের তেমন ঝোঁক ছিল না। তুলনামূলকভাবে পরবর্তীকালে ইংরেজি শিক্ষালাভে অগ্রসর হলেও বর্তমানে এঁরা প্রভূত উন্নতিলাভ করেছেন। সমাজের বহু শিক্ষিত ব্যক্তি, ব্যবসায়ী, রাজনীতিজ্ঞ উগ্রক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের মানুষ। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন মহাভারতের প্রথম ইংরেজি অনুবাদক (১৮৭৩ খ্রি.) প্রতাপচন্দ্র রায়, সি.আই.ই., ধনকৃষ্ণ সেন, ভোলানাথ রায়, কালীকিন্দর যশ, সুপণ্ডিত হরিচরণ বন্ধু (উগ্রক্ষত্রিয় তত্ত্ব বিষয়ক বেশ কয়েকটি গ্রন্থের লেখক), রায়বাহাদুর সত্যকিন্দর সাহানা, বিদ্যাবিনোদ, এম.এল.সি, শিক্ষাব্রতী কেশব চন্দ্র হাজারী, রামপ্রসন্ন সামন, ড. মনোহর রায়, রমাপদ চৌধুরী, চিকিৎসক উমামহেশ সামন্ত (বাংলায় বায়োকেমিক চিকিৎসার প্রবর্তক), ডা. গণপতি পাঁজা, ব্যারিস্টার জি.পি. কর, কালীতারণ সামন্ত, বিধুভূষণ সিকদার, রায়বাহাদুর বনোয়ারীলাল হাটি, চৈতন্যচরণ মুঙ্গী (সাব-জজ), নিশাকর চৌধুরী (জজ), ক্ষেত্রনাথ কুমার, সত্যকিন্দর পাল, ড. সোমেশ্বর প্রসাদ চৌধুরী, যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা (বাংলার কুটিরশিল্প মন্ত্রী), দাশরতি তা (মন্ত্রী), বিনয় চৌধুরী (মন্ত্রী), অন্নদাপ্রসাদ মণ্ডল, ভক্তচন্দ্র রায়, সুরেন্দ্রকুমার রায়, অজিত পাঁজা (কেন্দ্রীয় মন্ত্রী), বিশিষ্ট ব্যবসায়ী রায়বাহাদুর রাজেন্দ্রনাথ গুহ, গঙ্গাধর সামন্ত, প্রফুল্লচন্দ্র গুহ, মন্মথনাথ সামন্ত, নারায়ণ চৌধুরী, সুধীরচন্দ্র দাঁ প্রমুখ।^{২৬}

বর্তমানে শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের বহুমুখী সুযোগ প্রসারিত হওয়ায় আগুরিরা বর্ধমান জেলার ঘেরাটোপ ছেড়ে সমগ্র ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে। তবে ১৯৯৪-এর জেলা গেজেটিয়ারে লেখা আছে পশ্চিমবঙ্গের মোট আগুরির ৭৫ শতাংশই রয়েছেন বর্ধমানে।^{২৭} তা সত্ত্বেও নিরঙ্কুশ সংখ্যাধিক্যে আগুরিরা আজও মূলত বর্ধমান জেলার মানুষ। শুধু বর্ধমান শহরেই আগুরির সংখ্যা আনুমানিক ৪০ হাজার। বর্ধমানের মতো অপেক্ষাকৃত ছোটো শহরে এই সংখ্যাটা নেহাত কম নয়।

উগ্রক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের জাতিগত সমিতি গঠনের প্রচেষ্টা বার বার দেখা গেছে। সর্বপ্রথম এই প্রচেষ্টাটি দেখা যায় ১২৯৫ বঙ্গাব্দে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বসবাসকারী উগ্রক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের মানুষেরা ওই বছর ১৫ আশ্বিন একটি সমিতি গঠন করেন। উদ্যোগী সদস্যদের মধ্যে ছিলেন পণ্ডিত প্রতাপচন্দ্র রায় সি.আই.আই., রায়বাহাদুর বিজয়নারায়ণ কুণ্ডু, রায়বাহাদুর বনোয়ারীলাল হাটি, ডা. কুমুদবিহারী সামন্ত, নৃসিংহমুরারী পাঁজা, হারাধন তা, হরিদাস সাঁই, নিকুঞ্জবিহারী চৌধুরী প্রমুখ। সমিতির প্রথম অধিবেশন ১২৯৫ বঙ্গাব্দের ১৬ ফাল্গুন, দ্বিতীয় অধিবেশন ১২৯৬ বঙ্গাব্দের ২৬ চৈত্র, তৃতীয় অধিবেশন ১২৯৭ বঙ্গাব্দের ২৭ জ্যৈষ্ঠ এবং চতুর্থ অধিবেশন ১২৯৭ বঙ্গাব্দের ২৬ ভাদ্র অনুষ্ঠিত হয়। তৃতীয় অধিবেশনটি হয়েছিল বর্ধমান রাজ কলেজে। অপর তিনটি অধিবেশন বসেছিল পণ্ডিত প্রতাপচন্দ্র রায় মহাশয়ের কলকাতার বাসভবনে। এরপর এই সমিতিটির আর কোনো অধিবেশন হয়েছিল বলে জানা যায় না।^{২৮}

প্রায় ৩৭ বছর পরে ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের ৯ পৌষ শ্রীশচন্দ্র তা, সিদ্ধেশ্বর চৌধুরী, ডা. গণপতি পাঁজা, ডা. গৌরমোহন রায়,

সোমেশ্বর প্রসাদ চৌধুরী প্রমুখের উদ্যোগে উগ্রক্ষত্রিয় সমিতিটি পুনর্গঠিত হয়। ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের ২ আষাঢ় বর্ধমান টাউন হলে রায়বাহাদুর বনওয়ারিলাল হাটির সভাপতিত্বে একটি প্রকাশ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন রায়বাহাদুর রাজেন্দ্রলাল গুহ এবং লক্ষ্মীনারায়ণ হাজারার মতো বিশিষ্ট মানুষজন। পরবর্তীকালে এই সমিতির বেশ কয়েকটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ১৩৩৭ বঙ্গাব্দের ১৭ ও ১৮ ফাল্গুন বিষ্ণুপদ পাল-এর আহ্বানে যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজার সভাপতিত্বে বর্ধমান জেলার হিট্রা গ্রামে, ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের ২৫ মাঘ রাধাপ্রসন্ন গৌঁ-এর আহ্বানে কামিনীনাথ রায়-এর সভাপতিত্বে বর্ধমান জেলার বোঁয়াইচণ্ডীতে, ১৩৪০ বঙ্গাব্দের ২ ও ৩ বৈশাখ রামরতন রায়-এর আহ্বানে এবং নরেন্দ্রনাথ সামন্তের সভাপতিত্বে আসানসোলে, ১৩৪১ বঙ্গাব্দের ৯ বৈশাখ বর্ধমান শহরবাসীর উদ্যোগে এবং শিরোমণি হাজারার সভাপতিত্বে বর্ধমান টাউন হলে, ১৩৪২ বঙ্গাব্দের ২৩ বৈশাখ কলকাতাবাসী উগ্রক্ষত্রিয়দের উদ্যোগে এবং যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজার সভাপতিত্বে কলকাতার অ্যালবার্ট হলে, ১৩৪৩ বঙ্গাব্দের ১৪ চৈত্র শ্যামাপদ মণ্ডলের আহ্বানে এবং সিদ্ধেশ্বর চৌধুরীর সভাপতিত্বে বর্ধমান জেলার মেঝিয়ারিতে, ১৩৪৫ বঙ্গাব্দের ৪ ও ৫ বৈশাখ বীরভূম জেলার বাহিরী গ্রামের উগ্রক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের আহ্বানে এবং শ্রীশচন্দ্র তা-এর সভাপতিত্বে বাহিনীতে, ১৩৪৫ বঙ্গাব্দের ২৬ ও ২৬ চৈত্র বাঁকুড়ার বড়জোড়া গ্রামের উগ্রক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের আহ্বানে শ্রীশচন্দ্র তা-এর সভাপতিত্বে বড়জোড়া গ্রামে, ১৩৪৭ বঙ্গাব্দের ১৫ ও ১৬ বৈশাখ বর্ধমান জেলার কুসুমগ্রামের উগ্রক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের আহ্বানে এবং প্রফুল্লকুমার পাঁজা-র সভাপতিত্বে কুসুমগ্রামে, ১৩৫৬ বঙ্গাব্দের ২৭ কার্তিক ভবতারণ মণ্ডলের সভাপতিত্বে বাঁকুড়ার হাট-আসুরিয়া গ্রামে, ১৩৫৭ বঙ্গাব্দের ৩ ও ৪ বৈশাখ বর্ধমান জেলার পানাগড়ে উগ্রক্ষত্রিয়দের উদ্যোগে ও সিদ্ধেশ্বর চৌধুরীর সভাপতিত্বে পানাগড়ে এই সমিতির সভা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে নদীয়ার আংদিয়া, খলিসাকুন্তী, বাংলাদেশের বগুড়া, রাজশাহী, বীরভূম জেলার বিভিন্ন গ্রামে উগ্রক্ষত্রিয় প্রধানগণ মিলিত হয়ে এই সম্প্রদায়ের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতেন। বহুদিন এই ধারা বজায় ছিল।^{১৯}

বর্তমান বর্ধমানে যে ‘উগ্রক্ষত্রিয় সমিতি’টি সজীব রয়েছে তার প্রতিষ্ঠা ১৪০৭ বঙ্গাব্দের ১০ ভাদ্র (২৭ অগস্ট, ২০০০) বর্ধমান শহরের সাংবাদিক বৈদ্যনাথ কোঙারের উদ্যোগে পীরপুকুরের পাশে উগ্রক্ষত্রিয় জাতিতত্ত্ব বিষয়ে বিশেষজ্ঞ সঞ্জীবকুমার বন্ধুর বাসভবনে। এই সমিতির উদ্যোগে ৫ নভেম্বর, ২০০০ বর্ধমান বন্ধন ম্যারেজ হলে রাজেশ্বর সামন্তের সভাপতিত্বে প্রথম বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই কমিটির তৎপরতায় সমিতিতে পশ্চিমবঙ্গ সোসাইটির আইন অনুযায়ী রেজিস্ট্রি [S/IL 8139(2021-2002)] করা হয়। এই সমিতির দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন বসে ২০০১ সালের ১১ আগস্ট, রাজেশ্বর সামন্তের সভাপতিত্বে বর্ধমান জেলা পরিষদ হলে। তৃতীয় বার্ষিক সভা হয় কনক ভবন ম্যারেজ হলে ১৩-০১-২০০২ এবং চতুর্থ সভা হয় ১৭-০৮-২০০৩ তারিখে জেলা পরিষদ হলে। পরবর্তী বার্ষিক সভাগুলিও বর্ধমান শহরের বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত হয়। সমিতির পঞ্চদশ বার্ষিক সভাটি ৯ ফেব্রুয়ারি চৌধুরী চিঁড়া মিলের কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হয়।

বার্ষিক সভা ছাড়াও সমিতির উদ্যোগে বছরে আরও দুটি অনুষ্ঠান হয়—বিজয়া সন্মিলনী ও কৃতী ছাত্রছাত্রী সংবর্ধনা। এক্ষেত্রে শুধু উগ্রক্ষত্রিয় সম্প্রদায়েরই নয়, অন্য সম্প্রদায়ের মানুষদেরও সম্মান প্রদান করা হয়।

বিভিন্ন সময়ে উগ্রক্ষত্রিয় সমিতি থেকে পত্রিকা প্রকাশের

উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ-বিষয়ে প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করেন শ্রীশচন্দ্র তা। ১২৯৮ বঙ্গাব্দে তাঁর সম্পাদনায় ‘উগ্রক্ষত্রিয় প্রতিনিধি’ নামে একটি মাসিক পত্রিকা উগ্রক্ষত্রিয় সমাজের মুখপত্র রূপে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছিল। পত্রিকাটিতে কেবলমাত্র উগ্রক্ষত্রিয় জাতির কথাই আলোচিত হতো এমন নয়—লোকসমাজ, লোকধর্ম প্রভৃতি বিষয়ে প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা প্রকাশিত হতো। পত্রিকাটিতে তৎকালীন সমাজের একটি সামগ্রিক চিত্র পাওয়া যায়। অবশ্য পত্রিকাটি কয়েক বছর পর বন্ধ হয়ে যায়।

১৩৩৭ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাস থেকে ‘উগ্রক্ষত্রিয় পত্রিকা’ নামে একটি ত্রৈমাসিক প্রকাশিত হতে থাকে। প্রথমে এটির সম্পাদনা করতেন যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা ও দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র রায়। পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে সত্যকিন্ধর সাহানা, নিকুঞ্জমোহন সামন্ত, ডা. অসিতরঞ্জন সেন, বিষ্ণুপদ রায়চৌধুরী, শ্যামাপদ মণ্ডল প্রমুখ এটির সম্পাদনা করেন। পত্রিকায় ঠিকানা ছিল ১০৬/এ, বেনিয়াটোলা স্ট্রিট, কলকাতা। আরও দুটি ঠিকানা পাওয়া যায়। একটি টাকাকড়ি ও পত্রিকা পাঠাবার জন্য—৬২, ক্লাইভ স্ট্রিট, কলকাতা, প্রযত্নে : হংসেশ্বর পাঁজা এবং বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত ঠিকানা—প্রকাশক, শ্যামাপদ মণ্ডল, ৪৩ নম্বর মণ্ডল স্ট্রিট, কলকাতা। পত্রিকাটির দাম ছিল ৬ আনা এবং বাৎসরিক গ্রাহক চাঁদা ছিল ১ টাকা ৪ আনা।^{২০}

বর্তমানে ‘উগ্রক্ষত্রিয় সমিতি’ ২০০৫ সাল থেকে তাদের বার্ষিক সাধারণ সভার সময়ে একটি স্মারকপুস্তিকা প্রকাশ করে থাকে। এই পুস্তিকাটি বিভিন্ন সময়ে সম্পাদনা করেছেন বৈদ্যনাথ কোঙার, ইন্দ্রজিৎ রায়, সর্বজিৎ যশ প্রমুখ। পত্রিকাটি এখনও নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে চলেছে।^{২১}

তথ্যসূত্র

১. অনন্ত ব্রহ্ম, *বাঙালি জাতির উৎস সন্ধানে*, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ৫৮
২. শৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ, *বাঙালি জাতি পরিচয়*, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ, ২০০৬, পৃ. ২১
৩. অনন্ত ব্রহ্ম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৮
৪. লোকেশ্বর বসু, *আমাদের পদবীর ইতিহাস*, একাদশ মুদ্রণ, কলকাতা, ২০০৯, পৃ. ৪৪
৫. খন্দেনাথ ভৌমিক, *পদবীর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস*, কলকাতা, ষষ্ঠ সংস্করণ, ২০১২, পৃ. ১২৮
৬. সন্তোষকুমার কুণ্ডু, *বাঙালি হিন্দু জাতি পরিচয়*, কলকাতা, ২০০৮, পৃ. ৬৬
৭. শৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২
৮. লোকেশ্বর বসু, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২
৯. লোকেশ্বর বসু, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১-৩২
১০. জনগণনা রিপোর্ট, ১৮৯১
১১. উইলিয়াম উইলসন হান্টার, *স্ট্যাটিসটিক্যাল অ্যাকাউন্ট অব বেঙ্গল*, চতুর্থ খণ্ড, কলকাতা ১৮৭৬, পৃ. ১০৮
১২. জে.সি.কে. পিটারসন, *বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার’স : বার্ডোয়ান*, ১৯১০, পুনঃপ্রকাশ ১৯৯৭, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পৃ. ৮৪
১৩. কে. আর. বিশ্বাস, *ওয়েস্ট বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার’স*, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯৪, পৃ. ১৩৬
১৪. নরহরি দাস, *জাতিতত্ত্ব ও উপাধিমালা*, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ৩০
১৫. রতনলাল দত্ত, ‘ছড়া ও প্রবাদে বর্ধমান পরিচিতি’, *বর্ধমান চর্চা*, দ্বিতীয় খণ্ড, বর্ধমান, ১৯৯০, পৃ. ৫৩-৫৪
১৬. জনগণনা রিপোর্ট, ১৮৭২
১৭. সমীরণ চৌধুরী, ‘অধুনালুপ্ত উগ্রক্ষত্রিয় পত্রিকা : একটি বিশ্লেষণ’, *উগ্রক্ষত্রিয় সমিতির পত্রিকা*, বর্ধমান, ২০০৫
১৮. হার্বিট রিজলে, *ট্রাইব অ্যান্ড কাস্ট অব বেঙ্গল*, ১৮৯১, পৃ. ১০২

১৯. নারায়ণ চৌধুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার, ২২-০৬-২০০২
২০. বৈশাখী চক্রবর্তীর অপ্রকাশিত গবেষণাপত্র, ‘বর্ধমানের উগ্রক্ষত্রিয় সমাজ, জীবন ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন’, গবেষণাপত্র দাখিল ১৯৯৬, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
২১. শৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১-২২
২২. সঞ্জীব বসু, উগ্রক্ষত্রিয় পরিচিতি ও গঙ্গারিডি প্রসঙ্গ, বর্ধমান, ২০০৮, পৃ. ৬৮
২৩. গবেষকের নিজস্ব ক্ষেত্রসমীক্ষা
২৪. ড. গোপীকান্ত কোণ্ডার-এর সঙ্গে সাক্ষাৎকার, ১০-১২-২০১০
২৫. শ্রীসঞ্জীব বসুর সঙ্গে সাক্ষাৎকার, ২০-১২-২০১০
২৬. শৌরীন্দ্র কুমার ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২-২৩
২৭. কে.আর. বিশ্বাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬
২৮. সঞ্জীব বসু, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২
২৯. সঞ্জীব বসু, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২-০৩
৩০. শ্রীবৈদ্যনাথ কোণ্ডারের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, ১০-০৭-২০১৪
৩১. সঞ্জীব বসু, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯
৩২. সঞ্জীব বসু, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯
৩৩. উগ্রক্ষত্রিয় সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত স্মারকপুস্তিকা সমূহ

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

সমবায় আন্দোলন দীর্ঘজীবী হোক

নতুন-মোহনপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লি.

রায়না-১, বর্ধমান

সুনীল পোডেল
সভাপতি

সুবীর মুখার্জী
সম্পাদক

উজ্জ্বল মল্লিক
ম্যানেজার

Sl. No. 202

With best compliments of

Kalna Thana Co-Operative
Agricultural Marketing Society Ltd.

DHATRIGRAM, BURDWAN

Sl. No. 56

ভারত সরকার চ্যারিটেবল
ভারত সরকার ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর
ভোকেশনাল ট্রেনিং (NCVT)
Vocational Training Provider

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে শিক্ষা ও কোর্স শেষে সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে

কোর্সসমূহ

Computer Accounting in Tally
Desk Top Publishing (DTP)
Web Designing, Domestic BPO, BPO Non-Vice,
BPO Voice, Accounting Banking, Spoken English

যোগাযোগ

কামনাড়া পীরতলা, বিডিও অফিসের নিকট, বর্ধমান
৯১৫৩২৫৪১২৬, ৯১৩৩৩৫৭৭১২৯



ছড়া সমৃদ্ধ লোকক্রীড়ায় গ্রামীণ মেয়েরা

রত্না রশীদ

মানুষ তার জৈবিক সত্তাটুকু টিকিয়ে রাখার জন্য মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উদয়াস্ত যে পরিশ্রম করে চলে, তার নাম জীবিকা। কিন্তু শুধু খেয়ে-পরে মানুষ বাঁচে না। জীবজগতে বিচিত্র মানসিকতা সম্পন্ন মানুষেরই কেবল প্রয়োজন পড়ে ‘কাজ’-এর বাইরে ‘অকাজ’ করার—তাই না এই শব্দবন্ধের উদ্ভব—‘নেই কাজ, তো খই ভাজ’। প্রতিদিনের প্রাথমিক প্রয়োজন ‘খাওয়া-পরা’র বন্দোবস্ত বাস্তবিক অর্থে অতীব গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যেকটি মানুষের কাছে। কিন্তু তবুও, তারপরেও মানুষেরই কেবল প্রয়োজন পড়ে আত্ম-উন্মোচনের, চিত্ত বিনোদনের, ‘ব্যক্তি-আমি’কে ‘সমষ্টি-আমি’তে উত্তরিত করার। নিজের বাঁচার সার্থকতার তাগিদেই মানুষের শিল্পসৃষ্টি, সমাজ সৃষ্টি। ‘একা মানুষটা নিরর্থক’—মানুষ তাই সচেতনে নিজেকে যুক্ত করেছে ‘লোক’-এর সঙ্গে এবং ‘লোক’-এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে নিত্যন্ত ব্যক্তিক অভিব্যক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে লোকসংস্কৃতির বিবিধ ধারায়,—লোকগান, লোকনাট্য, লোকনৃত্য, লোকশিল্প, লোকক্রীড়া ইত্যাদি। বর্তমান আলোচনায় আমরা নিবিষ্ট হব ‘লোকক্রীড়া’ বলতে কী, আরও সীমায়িত বৃত্তে—কৈশোরাবস্থার কন্যাকেন্দ্রিক লোকক্রীড়ায় একই সঙ্গে যেগুলি ছড়ার ছন্দে লীলায়িত।

একেবারে শৈশবাবস্থায় শিশুরা—ছেলেমেয়ে নির্বিশেষে একসঙ্গে মেতে ওঠে বিভিন্ন খেলায়—যেমন, ইকিডমিকিড়, রেলগাড়ি, ইচিংবিচিং, লুকোচুরি, কানামাছি, পুতুলখেলা ইত্যাদি। কিন্তু একটু বড়ো হয়ে উঠে কৈশোরের চৌকাঠে পা রেখে ছেলেমেয়েরা আর এক সঙ্গে খেলায় উৎসাহ পায় না—ছেলেরা এবং মেয়েরা আলাদা আলাদা দল গড়ে ওই একই খেলা খেলে। কারণ হিসেবে বলা যায়—১. অভিভাবক ও সমাজের রক্ষণশীলতা, ২. শারীরিক জোরের দিকটায় মেয়েদের প্রকৃতিগতভাবে কিছুটা খামতি, ৩. মনস্তাত্ত্বিক বিকাশের পর্যায় এবং ৪. অন্যান্য।

একাধিক কারণেই কিশোরী হয়ে ওঠার পর মেয়েরা নিজেদের আলাদা দল গড়ে বিভিন্ন খেলায় অংশগ্রহণ করে। এই আলোচনায় আমি কেবলমাত্র বর্তমানে প্রায় অবলুপ্ত অথচ এই কিছুদিন আগে পর্যন্তও গ্রামেগঞ্জে মেয়েদের কাছে খুবই জনপ্রিয় ছিল এমন কিছু খেলার উল্লেখ করবো। তৎকালীন দলবদ্ধ খেলা যেগুলি এখনও মেয়েরা দল বেঁধে খেলে, যেমন—বুড়িবসন্ত, ধাপসা, কাবাডি, খো-খো এবং অধুনা ফুটবল, ক্রিকেট, বাস্কেটবল, টেনিস, ব্যাডমিন্টন ও আরও অনেক খেলা—যা কালে কালে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে ও বিভিন্ন পাঠ্যপুস্তকে বিশদে আলোচিত হয়েছে, আমি সেগুলিকে আমার এই আলোচনা থেকে বাদ দিচ্ছি।

একদা জনপ্রিয় অথচ অধুনা প্রায় লুপ্ত খেলাগুলির কয়েকটি হল—১. আতালী-পাতালী, ২. ঘাঘরা আনি, ৩. কঁটি বা গুটি খেলা,

৪. জেলেনি-মাছ, ৫. তেঁতুল-বিচে, ৬. চোর-পুলিশ, ৭. রুমাল চোর, ৮. কিলগলি, ৯. জগো-জগো-ঢিলো, ১০. বাঘ-বন্দী, ১১. ষোলোগুটি, ১২. ভস্মাসুর, ১৩. জোড়া ছাড়াছাড়ি, ১৪. পায়ে-পায়ে ঝগড়া, ১৫. লাল রল-লাঠি, ১৬. পায়ে দোষ, ১৭. কিৎ-কিৎ, ১৮. মুরগি লড়াই, ১৯. একা-দোকা, ২০. পিটু, ২১. আইস-বাইস, ২২. নেতা-ধরা, ২৩. উপেন-কি বায়োস্কোপ, ২৪. রাম-রাবণ, ২৫. খেটে খেলা, ২৬. এলাতিং-বেলাতিং, ২৭. কাঁঠালগাছি এবং আরও অন্যান্য বহু প্রাচীন খেলা, যেমন—দড়ি টানটানি, খোস্তাখুস্তি, নুন-গাদী, ভয়ে-পাথর, ভাওয়া, পাঁচগুটি ইত্যাদি। আমি এই আলোচনায় শুধুমাত্র যে খেলাগুলির সঙ্গে বিচিত্র ছড়া যুক্ত হয়ে আছে, তারই কয়েকটি মাত্র উল্লেখ করবো।

১. আতালী-পাতালী : এই খেলায় ৮-১০ জন মেয়ের একটি দল দু-ভাগে ভাগ হয়ে সামনের দিকে লম্বা করে পা মেলে মুখোমুখি বসে—একদলের পায়ের পাতা অন্যদলের পায়ের পাতা ছুঁয়ে থাকবে। এরপর প্রত্যেকে নিজেদের দু-পায়ের হাঁটুতে হাত বুলাতে বুলাতে সমবেতভাবে ছড়া কাটবে—

আতালী লো পাতালী
শ্যামলাদের সাতালী
রামা-শ্যামা দুই ভাই
তারা কেউ ঘরে নাই
রাম গিয়েছে মাঠে
শ্যাম গিয়েছে হাটে
শ্যামলাদের ছেলেগুলো
দুয়ারে বসে কাঁদে
আর কেঁদোনা আর কেঁদোনা
ছোলাভাজা দেবো
আবার যদি কাঁদো তবে
তুলে আছাড় দেবো—

ছড়া শেষ হওয়া মাত্র প্রত্যেকে নিজের সামনে বসা জুড়ির এবং পাশের মেয়ের হাত ধরে বসে থাকা অবস্থায় বাঁ দিক দিয়ে গোল হয়ে ঘুরবে, যেখানে হাত বা পা খুলে যাবে অর্থাৎ মেয়েদের মধ্যে যার হাত বা পা অন্যের থেকে আগে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, সেই ‘জুটি বাদ’ পড়ে যাবে। এভাবে খেলা চলতে চলতে ক্রমশই বাদ পড়া জুটির সংখ্যা বাড়তে থাকবে। একেবারে শেষ পর্যন্ত টিকে থাকা জুটিকেই জয়ী বলে মেনে নেওয়া হয়।

২. ঘাঘরা আনি : দশ বারোজন কিশোরী একসঙ্গে হাতে-হাত ধরে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে একটা কাল্পনিক পুকুর তৈরি করবে। নিজেদের মধ্যে থেকে একজনকে নির্বাচন করবে,—হয় টস করে, নয়তো ‘উবু দশ-কুড়ি’ গুনে। সেই নির্বাচিত জন প্রথম খেলার

সুযোগ পাবে। সে তখন মেয়েদের হাত ঘিরে করা গোল পুকুরে ঢুকে মিছিমিছি কিছু একটা খোঁজার ভান করবে। তখন হাতে-হাত বাঁধা মেয়েদের একজন তাকে প্রশ্ন করবে—এই, তুমি পুকুরে নেমে কী করছো? ‘প্রথম খেলী’, যে পুকুরে ঢুকেছে, সে তখন উত্তর দেবে,—“এই পুকুরে আমার ঘাঘরা হারিয়েছে, তাই খুঁজতে নেমেছি।” তখন সকলে বলবে—“ঠিক আছে, খোঁজো।” প্রথম ‘খেলী’ মেয়েটি তখন ঘাঘরা খোঁজার ভান করে পুকুরের ভেতরে একবার বসবে, একবার উঠবে। তার সঙ্গে সঙ্গে চারপাশে বৃত্ত করা হাতে-হাত বাঁধা মেয়েরাও সব একসঙ্গে ওঠবোস করতে থাকবে—দেখে মনে হবে যেন পুকুরের জলস্তর একবার উঠছে, একবার নামছে। এই সময় তারা সমস্বরে সুর করে এই ছড়াটি বলে—

এক গিট পানি
ঘাঘরা আনি (উচ্চারণে ‘ঘাঘরানি’ হয়)
এক হাঁটু পানি
ঘাঘরা আনি
এক জাং পানি
ঘাঘরা আনি
এক কোমর পানি
ঘাঘরা আনি
এক বুক পানি
ঘাঘরা আনি
এক গলা পানি
ঘাঘরা আনি
মাথা ভোর পানি
ঘাঘরা আনি
ভু-উ-স্—

বলে ভেতরের ঘাঘরা খোঁজকারিণী মেয়েটি পুকুরের ডুবে যাবার ভান করে যাকে সামনে পাবে তার হাতের তলা দিয়ে গলে বা শিকল ভেঙে ছুটে দৌড়ে পালাবে এবং অন্যান্য খেলীরাও তখন হাত শিকলে তৈরি করা পুকুর ভেঙে দিয়ে তার পিছু পিছু ধাওয়া করবে। যে সবার আগে ঘাঘরা খোঁজকারিণীকে ছোঁবে—সেই হবে নতুন ঘাঘরা খোঁজকারিণী। আবার অন্যান্যরা হাতে হাত বেঁধে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে পুকুর তৈরি করবে, এবং একই নিয়মে খেলা চলতে থাকবে।

৩. **কঁটি বা গুটি খেলা** : ভাঙা খোলামকুটিকে স্থানভেদে কোথাও কঁটি, বা কোথাও গুটি বলা হয়। সাত-আটজন কিশোরী মিলে এই খেলাটি খেলে। নিয়ম মতো খোলামকুটি দিয়ে টস্ করে, নয়তো ‘উবু-দশ-কুড়ি’ গুনে শেষে পড়ে থাকা মেয়েটিকে ‘রাজকুমারী’ হিসেবে নির্বাচন করা হয়। বাকিরা সবাই প্রশ্নকারী। এরপর ‘রাজকুমারী’র হাতে অনেকগুলি গুটি বা কঁটি দেওয়া হবে। তারপর প্রশ্নকারীরা দলবদ্ধভাবে ছড়া কাটতে কাটতে রাজকুমারীকে বলবে—

ফেলো ফেলো ফেলো গুটি
কঁটি দাঁড়িয়ে আছি আমরা জুটি।

তখন রাজকুমারী গুটিগুলো মাটিতে ছড়িয়ে ফেলে দেয়। প্রশ্নকারীরা তখন যে যার মতো করে গুটি কুড়াবে, বা কুড়োবার ভান করবে, কেউ আবার গুটি কুড়ালেও অন্য কোথাও লুকিয়ে দিয়ে শুধু হাতটাই মুঠো করে রাখবে, দেখে মনে হবে প্রত্যেকের হতেই যেন গুটি রয়েছে। এরপর আবার প্রশ্নকারীরা রাজকুমারীকে সমস্বরে সুর করে বলবে—

ছট কুমা কুম
বুট কুমা কুম

শা কুমা কুম
শি—ও—,
কার হাতে আছে কঁটি/গুটি
বলে দাও ভাই রাজারবিটি।

রাজকুমারী তখন বুদ্ধি বিবেচনা মতো একজনকে দেখিয়ে দিয়ে সুর করেই বলবে—“এর হাতে আছে গুটি”—যাকে দেখানো হবে, সে তখন হাতের মুঠো খুলে সবাইকে দেখাবে। যদি তার হাতে গুটি না থাকে, তবে আবার রাজকুমারীকে নিজের আগের ভূমিকায় খেলা চালিয়ে যেতে হবে, কারণ সে সঠিক উত্তর দিতে অসফল হয়েছে। আর যদি দেখানো মেয়েটির হাতে গুটি থাকে, তখন তাকে উদ্দেশ্য করে রাজকুমারী ছড়া কাটবে—

তুমি হও ভাই রাজার বিটি
আমি এবার খেলবো গুটি।

এরপর যে মেয়েটির হাতে গুটি পাওয়া গেছে সে হবে ‘রাজকুমারী’। এখন তার হাতে সমস্ত গুটি চলে আসবে। আগের বারের ‘রাজার বিটি’ এখন প্রশ্নকারীদের দলে ঢুকে যাবে। আবারও একই নিয়মে চলতে থাকবে খেলা।

৪. **কিলগালি** : প্রথমে সমস্ত খেলীকে দু-দলে ভাগ করে নিতে হবে। তারপর টস্ করে নির্বাচন করা হবে কারা নির্দিষ্ট লেনে দু-পাশে দাঁড়াবে, এবং কারা লেনের বাইরে দল বেঁধে বসে থেকে একে একে খেলী পাঠাবে লেনের ভিতরে। ধরা যাক, ‘ক’ দল লেনে দাঁড়িয়ে খেলবে এবং ‘খ’ দল বাইরে মাঠে বসে থেকে এক এক করে খেলী লেনের ভেতরে পাঠাবে। এরপর মাঠের বা খামারের মধ্যে লম্বা করে দুটি লাইন বা চিক কাটা হবে। ওই লাইন বরাবর ‘ক’ দলের খেলীরা সমান দু-ভাগে ভাগ হয়ে পাশাপাশি দাঁড়াবে। লেনের ভেতরের যে জায়গাটা দিয়ে ‘খ’ দলের একজন করে খেলী ছুটে বেরিয়ে যাবে, সেই জায়গাটায় দাঁড়িয়ে থাকা ‘ক’ দলের খেলীদের ডান হাত গুটিয়ে কনুই বের করে রাখা থাকবে। এরপর ‘খ’ দলের এক একটি খেলী যখন দুই সারির কনুই বার করা ‘ক’ দলের মধ্যকার লেন বা গলির ভেতর দিয়ে ছুটে বেরিয়ে যাবার দান দেবে, তখন ‘ক’ দলের দু-সারির খেলী নিজের নিজের বার করে রাখা কনুই দিয়ে তাকে গুঁতো মারে। এবার যে খেলী যাটা গুঁতো খাবে, তার ওটা পয়েন্ট হবে। খেলা শেষে দেখা হবে কার পয়েন্ট সব থেকে কম হয়েছে। সবচেয়ে কম পয়েন্ট যার হবে, সে-ই জয়ী বলে ঘোষিত হবে।

খেলা চলাকালীন, বসে থাকা দলের এক একজন করে খেলী যখন কিলগালির ভেতর দিয়ে ছুটে বেরিয়ে যাবার দান দিতে যাবে, তখন তার দলের অন্য মেয়েরা বসে থেকে চিৎকার করে এই ছড়াটি বলবে—

ওরে আমার সোনা ময়না
ওরে আমার টিয়ে
ঘুরে আয় ঘুরে আয়
বাঁধ পথ দিয়ে
ঐ গলিতে যাস না
কিল-গুঁতোটা খাস না।

এইভাবে একদলের খেলা সম্পূর্ণ হয়ে গেলে, পজিশন পাল্টে নিয়ে, আবার একই নিয়ম অনুযায়ী চলতে থাকবে খেলা।

৫. **জগো জগো ঢিলো** : এই খেলাতে দশ-বারো জন খেলী প্রথমে নিজেদের দুটো দলে ভাগ করে নেবে। তারপর টস্ করে ঠিক করা হবে কারা প্রথম ‘মোর’ দেবে। যারা মোর দেবে তাদের বলা হবে বিশেষ কোনো গাছের পাতা খুঁজে আনতে। সাধারণত, কাছাকাছি পাওয়া যাবে না—এমন গাছেরই পাতা আনতে বলা হয়।

ওরা যখন পাতা খুঁজতে যাবে, অন্য দলের খেলীরা তখন যে যার মতো যুতসই জায়গায় লুকিয়ে পড়বে। এরপর পাতা নিয়ে এসে প্রথম ‘মোর’ হওয়া দলের মেয়েরা লুকিয়ে থাকা মেয়েদের খুঁজতে থাকবে। খুঁজতে খুঁজতে যদি কাউকে দেখে ফেলে, তাহলে ধরা পড়ার ভয়ে সে ছুটতে থাকবে। ‘মোর’ দলের মেয়েরাও তাকে পাতা হাতে নিয়ে ধরতে চেষ্টা করবে। —কিন্তু নিজের পিছু ছাড়াবার জন্য, তাকে বিপন্নু করার জন্য এবার তার দলের লুকিয়ে থাকা অন্য কেউ বা কয়েকজন লুকিয়ে থাকা জায়গা থেকেই চিৎকার করে ছড়া কাটবে—

জগো জগো ঢিলো
ফটফট ফাটিলো

তখন আমার ‘মোর’ দলের মেয়েরা চাইবে ছুটে গিয়ে ওদের আউট করতে, আর ওরা চাইবে ছুটে পালিয়ে গিয়ে বাঁচতে। এইভাবে খেলতে খেলতে পাতা হাতে মেয়ের দল যখন অন্য দলের খেলীদের ছুঁয়ে দেবে তখন সে ‘আউট’ বা ‘মোর’ হয়ে যাবে। তবে ছোঁয়ার সময় ‘মোর’ দলের খেলীর হাতে অবশ্যই নির্দিষ্ট করা পাতাটি থাকতে হবে—অন্য পাতা থাকলে হবে না, ফের ‘মোর’ দিতে হবে। খেলতে খেলতে যখন বিপক্ষের সবাই আউট বা ‘মোর’ হয়ে যাবে, তখন এবারের ‘মোর’ এবার বিপক্ষের হুকুম মতো বিরল পাতা খুঁজতে যাবে, বিপক্ষ দলের মেয়েরা যাবে লুকিয়ে পড়তে। এইভাবে একই নিয়মে চলতে থাকবে খেলা।

৬. **উপেন-কি-বায়োস্কোপ** : এই খেলাটি বাড়ির বড়ো উঠোনে বা খামারে খেলা হয়। অন্য খেলার মতো একজন নয়, এই খেলায় প্রথমেই দু-জন ‘বুড়ি’ নির্বাচন করে নিতে হয়। তারা দু-জনে মুখোমুখি দু-হাত তুলে পরস্পরের হাত ওপরে তুলে ধরে দাঁড়াবে। তৈরি হবে একটি গেট বা ফটক। অন্য মেয়েরা লাইন করে দাঁড়িয়ে একে অপরের পিছু পিছু রেলগাড়ির মতো ছুটবে, বুড়িদের তোলা হাতের তলা দিয়ে গিয়ে আবার পেছন ঘুরে আবারো তোলা হাতের তলা দিয়ে ছুটতে থাকবে। ছোট্টার পথটা হবে অনেকটা বাংলার ‘৪’-এর মতো। একবার ডাইনে, আর একবার বাঁয়ে ‘বুড়ি গেট’-কে পাস দিয়ে দিয়ে ছুটতে থাকবে মেয়ের দল,—এঁকে বঁেকে রেল গাড়ির মতন ফটকের ভেতরে বাইরে—ডাইনে-বামে ছুটতে ছুটতে তারা এবং ফটকের মতো হাতজুড়ে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েদুটিও জোরে জোরে কোরাসে সুর করে ছড়া কাটবে—

উপেন কি বায়োস্কোপ
টেনেটুনে তেইস্কোপ
চুলটান বিবিয়ানা
সাহেব বাবুর বৈঠকখানা
কাল বলেছে যে-তে
পান-সুপারি খে-তে
পানের ভিতর মৌরিবাটা
ইস্কাপনের ছবি আঁকা
ছোটো ছোটো যাদুমণি
যেতে হবে অনেকখানি
কলকেতার মাথা ঘসা
মেদনিপরের চিরুণী
দিদিভাই চেপে ধরো
দুলিয়ে দেবে বিনুনি
আমার নামটি রেণুবালা
গলায় পড়ল হীরের মালা—

বলতে বলতেই দাঁড়িয়ে থেকে হাতের গেট করা দু-জনেই হাত নামিয়ে দেবে—তখন সেই সময় গেটের মাঝে ছুটন্ত যে মেয়ের গলায় হাত দু-জোড়া পড়বে, এবার তাকে হতে হবে ‘বুড়ি’। একই রকমভাবে ছড়া বলতে বলতে আবারো খেলা হবে। আবার একজন হাতের মধ্যে ধরা পড়ে হবে ‘বুড়ি’। তখন নতুন দুই ‘বুড়ি’ হাত তুলে যুক্ত করে ফটক বা গেট দাঁড়াবে, আর আগের দু-জন ‘বুড়ি’ অন্য খেলীদের সঙ্গে রেলগাড়িতে জুড়ে যাবে আবার একই নিয়মে চলতে থাকবে খেলা।

একদম শৈশবাবস্থায় শিশুরা যে দলবঁধে একে অপরের পিঠ ধরে লাইন করে ছুটতে ছুটতে ‘রেলগাড়ি’ খেলে, তারই একটু পরিশীলিত রূপ এই ‘উপেন-কি-বায়োস্কোপ’ খেলাটি।

৭. **কাঁঠালগাছ** : এক সময়ের অত্যন্ত জনপ্রিয় মেয়েদের এই খেলাটি এখন প্রায় হারিয়েই যেতে বসেছে। থামাঞ্চলে কোনো কোনো জায়গায় এখনও খেলাটি হয়। দশ-পনেরো জন মেয়ে মিলে এই খেলাটি খেলে। দলের মধ্যে মাথায় যে সব চেয়ে লম্বা, সে হয় ‘কাঁঠালগাছ’। সে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় মাথার দু-দিকে হাত রেখে, হাতের মাঝে একটু ফাঁক করে রাখবে। অন্য মেয়েরা তার দু-দিকের হাতের ফাঁকা জায়গায় নিজেদের হাত গলিয়ে ধরবে। আবার তাদের হাতের ফাঁকে হাত গলিয়ে আরো ছোটো মেয়েরা নিজেদের হাত গলিয়ে ধরবে। কেউ আবার গাছের কোমর ধরবে, কেউ ধরবে পা। এইভাবে কাঁঠালগাছের পা থেকে মাথা পর্যন্ত অজস্র কাঁঠাল ধরে আছে, এমনি দেখতে হবে। এবার দলের মধ্য থেকে একটি মেয়ে হবে গাছ আগলদার, অন্য একজন বা দু-তিন জন হবে শিয়াল, অন্য এক-দুজন হবে চোর, আবার অন্য কেউ কেউ হবে কুটুম, বৌদি, বোন ইত্যাদি। আগলদার মেয়েটি মুখে একটি ছড়া বলে বলে এক পায়ে লাফাতে লাফাতে কাঁঠাল গাছের চারপাশে ঘুরে ঘুরে পাহারা দেবে, তখন অন্য যারা শেয়ার বা কুটুম বা চোর সেজেছে, তারা পাল্টাপাল্টি করে কাঁঠাল গাছের কাছে এসে কাঁঠাল পাড়ার অভিনয় করবে। পাহারাদার মেয়েটি শেয়াল বা চোরকে তাড়িয়ে দেবে, মাঝে মাঝে ছড়া বলে বলে গাছ জল দেবার অভিনয় করবে, আবার কুটুম এলে সঙ্গে সঙ্গে কাঁঠাল পেড়ে খুব আনন্দ করে তার হাতে দেবে,—অর্থাৎ গাছ থেকে কাঁঠালরূপী একটি মেয়েকে খসিয়ে নিয়ে কুটুমকে দেওয়া হবে। এইভাবে খেলতে খেলতে কোনো কাঁঠাল আবার এমনিই খসে পড়ে গাছ থেকে—গাছ তখন বলে—“খুব পেকে গেছে কাঁঠালটা, আর ধরে রাখতে পারছি না”—ইত্যাদি। আগলদার মেয়েটি খেলা চলাকালীন কাঁঠালগাছের চারপাশে ঘুরতে ঘুরতে জোরে জোরে সুর করে এই ছড়াটি বলে—

কাঁঠালগাছে পানি/জল দিই
হস্—হস্—হস্
শিয়াল এলে লাঠি নিই
হস্—হস্—হস্
চোর এলে তাড়া মারি
হস্—হস্—হস্
বোন এলে কাঁঠাল দিই
হস্—হস্—হস্
পড়লে কাঁঠাল তুলে রাখি
হস্—হস্—হস্
ভাবী/বৌদি এলে মুখে হাসি
হস্—হস্—হস্
ভাবীর কোলে আসবে কাঁঠাল
কালো মানিক ব্রজের গোপাল।

এই শেষের লাইনটি কোথাও কোথাও একটু ভিন্নভাবে বলা হয় :
ভাবীর কোলে আসবে কাঁঠাল
ননীচোরা নন্দদুলাল।
বিভিন্ন মেয়ের বিভিন্ন ভূমিকায় বহুক্ষণ ধরে খেলাটি চলতে থাকে।

৮. এলাতিং-বেলাতিং : এই খেলায় পনেরো-কুড়ি জন কিশোরী অংশগ্রহণ করতে পারে। যদি বেজোড় সংখ্যার মেয়ে থাকে, তবে প্রথমেই একজনকে রাজকন্যা নির্বাচন করে, তাকে বাদ রেখে, সমান সংখ্যক মেয়ে নিয়ে দু-ভাগে দুটি দল গড়া হবে। এবার বড়ো খামারের ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় একটা লম্বা করে খড়ি দিয়ে দাগ দিয়ে দিতে হবে। এক-এক ভাগ ‘কোট’ এক-এক দলের হবে। এবার ওই খড়ির দাগকে মাঝে রেখে দুই ধারের দুই কোটে দুই দলের মেয়েরা হাত ধরাধরি করে হাত-শৃঙ্খল তৈরি করে দাঁড়িয়ে পড়বে। এবার যে দল প্রথম খেলার সুযোগ পাবে সে-দলের কোনো একজন খেলী দ্বিতীয় দলে এসে ‘রাজকন্যা’র জন্য একটি সঙ্গী চাইবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে না দিয়ে দ্বিতীয় দল তখন জানতে চাইবে কাকে তার রাজকন্যার জন্য প্রয়োজন। যে নিতে এসেছে, সে তখন একটি মেয়ের নাম বলবে,—কিন্তু এবার দ্বিতীয় দল তাকে ছাড়তে চাইবে না। যাকে চাওয়া হয়েছে সেই মেয়েটি কিন্তু ডাক আসা মাত্রই দল থেকে বেরিয়ে নিজের কোটের চিকের ধারে তার দলের লাইনের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে খেলার নিয়ম মেনে। এবার ওই মেয়েটির হাত ধরে দু-পক্ষে টানাটানি হবে। এই টানাটানিতে মেয়েটি যদি নিজের কোট আটকে দাঁড়িয়ে থাকতে না পারে, যদি বিপক্ষের কোটে গিয়ে পড়ে, তবে সে এবং তার সঙ্গে আরো যে-কজন চিকের দাগ লঙ্ঘন করেছে তারা বিপক্ষের কাছে হেরে গেছে বলে ধরে নেওয়া হবে এবং তারা এখন কোটের বাইরে রাজকন্যার কাছে গিয়ে বসবে। মোটামুটিভাবে দাবি করা মেয়েটির শরীরের বেশিরভাগ অংশ বিপক্ষের কোটে চলে যাওয়া মাত্র তার নিজের দলের খেলীরা তাকে ছেড়ে দেয়, কারণ মুহূর্তে যার যার হাত তার সঙ্গে চেন-এ যুক্ত থাকবে, তাকে-তাকে ‘মোর’ বা আউট হয়ে যেতে হবে,—ঠিক একেবারে ইলেকট্রিক কারেন্টের এফেক্টের মতো। গোটা টিম একসঙ্গে আউট হতে কখনোই চাইবে না। তাই বিপদ বুঝে ঠিক সময়ে হাত-চেন কেটে দেওয়া হয়। তবুও অনেক সময় দেখা যায়, দাবি করা মেয়েটির সঙ্গে, টানাটানির জেরে বাড়তি দুই বা তিনজন একসঙ্গে আউট হয়ে যাচ্ছে। আর যদি যে ডাক দিতে এসেছে, সেই মেয়েটিকে চারপাশ থেকে ঘিরে এই কোটে রেখে দেওয়া যায়, তবে সে মোর বা আউট হয়ে কোটের বাইরে চলে যাবে। এইভাবে একপক্ষ অপর পক্ষের শক্তিক্ষয় করে চলবে, পর্যায়ক্রমে একের পর এক দু-পক্ষই ডাক দেবে এবং খেলা চলতে থাকবে একই নিয়মে। যে পক্ষের খেলী কম আউট হয়ে মাঠের বাইরে যাবে, সেই পক্ষ বিজয়ী বলে ঘোষিত হবে। কারণ একপক্ষের ‘মোর’ অন্যপক্ষের ‘মোর’কে জীবিত করে তোলে, তাই যে পক্ষের ‘মোর’ কম স্বভাবতই তাদের বিনিময়ে অন্যপক্ষের ‘মোর’ খেলী কম প্রাণ পায়। এইভাবে স্থির হয় হার-জিত। যাদের দলে বেশি খেলী জীবিত থাকে, ‘মোর’ কম হয়—তরাই জেতে, অন্যপক্ষ হেরে যায়। খেলাটি অনেকটা দড়ি টানাটানি করে শক্তি পরীক্ষার মতো। এই খেলায় অংশগ্রহণকারী দু-পক্ষই অন্যপক্ষের মেয়েকে ‘ডাক’ দিতে আসার সময় সুর করে ছড়াটি জোরে জোরে বলে—

এলাতিং-বেলাতিং সইলো
কিসের খপর আইলো
রাজা একটা বালিকা চাইলো

কোন্ বালিকা চাইলো
(খেলীদের একজনের নাম) অমুক বালিকা চাইলো।

বলা মাত্র মেয়েটি বেরিয়ে এসে নিজের লাইনের আগে এসে দাঁড়াবে, শুরু হয়ে যাবে খেলা।

তান্ত্রিকেরা অনেকেই এই শব্দগুচ্ছের মাঝে তৎকালীন গ্রাম্য সমাজ থেকে নীতিবিগর্হিতভাবে অত্যাচারী সামন্ত-রাজাদের খোয়ালখুশি মতো ‘নারী’ তুলে নিয়ে যাবার ঘৃণ্য ছায়াপাত ঘটেছে বলে অনুমান করেন। কিন্তু অপাপবিদ্ধ কিশোরী বয়সের খেলতে আসা মেয়েদের কাছে ছড়ার শব্দমালা কোনো গুরুত্ব পায় না, কিন্তু গুরুত্ব পেয়ে থাকে ছড়ার সুরের টান, বাকি সবটুকু মন জুড়ে থাকে দলবদ্ধ খেলার অনাবিল আনন্দ।

৯. খেটে খেলা : এটিও একটি দলবদ্ধ লোকক্রীড়া। দশ-বারোজন মেয়েরা মিলে এই খেলা খেলে। প্রথমেই একজনকে নির্বাচন করে নিতে হয়, যে হবে ‘খেটে’ বা ‘বুড়ি’। এরপর মেয়েরা দু-দলে ভাগ হয়ে যাবে। খামারে খড়ি দিয়ে লম্বা করে ‘ঘর’ কাটতে হবে। একদল থাকবে ওই ঘরের মাঝখানে, অন্য দল থাকবে ঘরের বাইরে যেখানে ‘বুড়ি’ বা ‘খেটে’ বসেছে তার আশেপাশে। এরপর ঘরের মেয়েরা এক দমে ছড়ার বলতে বলতে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে যদি ‘বুড়ি’ বা ‘খেটে’-র মাথা ছুঁয়ে নিয়ে বাইরের দলের কাউকে ছুঁয়ে দেয়, তবে যাকে ছোঁয়া হবে সে ‘মোর’ বা ‘আউট’ হয়ে খেলা থেকে বাদ যাবে। এইভাবে খেলা চলতে চলতে দেখা যাবে কোনো দলের সব খেলী ‘মোর’ হয়ে গেল, সেই দল তখন হারবে—এবং বিপক্ষ দল জয়ী হিসেবে ঘোষিত হবে। আবার নতুন করে ‘কোট’ পাল্টাপাল্টি করে খেলা চলতে থাকবে। প্রচুর ছড়া বলতে বলতে ‘ঘর’ বা ‘কোট’-এর মেয়েরা বাইরে যায় ‘বুড়ি’ বা ‘খেটে’-র মাথা ছুঁতে এবং তারপর বিপক্ষের খেলীকে ছুঁয়ে আউট করতে। সেই ছড়াগুলির মধ্যে একটি এরকম—

চু-কিং-কিং বিন্দাবন
মাছি ওড়ে ভনভন।।
ও মাছি পবনকাঠি
খেটে করলাম কুচিকুচি।।
চু-চু-চু-লেলা
তু খেটে উঠে পালা।।
চু যাবো চরকি যাবো
পাতি নেবুর মেথি খাবো।।
খাবো না মেথি খাবো না
গুড়গুড়িতে যাবো না।।
মামার বাড়ি যাবো
মণ্ডামেঠাই খা-বো।।
মামার বাড়ির দিঘির জল
চাঁদ পড়েছে টলোমল।।
সোনার গাছে চাঁদির ফুল
সই-নাম বকুল ফুল।।
ও বকুল তোর ঘরকে যাবো
এক খিলি পান দু-জনে খাবো।।...

পুরো ছড়াটা আরো বড়ো। সবটা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। এরকমই বহু ছড়া, অজস্র খেলা জড়িয়ে স্বতন্ত্রভাবে উচ্চারণ করতে করতে কিশোরী থেকে নারী হয়ে ওঠে মেয়েরা। বাংলার মাঠে-প্রান্তরে, গ্রামে-গঞ্জে সুপ্তভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে কন্যাকণ্ঠ উচ্চারিত ক্রীড়া সম্পর্কিত এরকম অজস্র—অগণিত মণি-মাণিক্যের দ্যুতিসম্পন্ন ছড়া। যথাযথ গুরুত্বের সঙ্গে এগুলি

সংগ্রহ করা গেলে তা বাংলা লোকসাহিত্যের অন্যতম সম্পদ বলে বিবেচিত হবে বলে অন্তত আমার বিশ্বাস। যে-সামান্য কটি খেলা সম্পর্কিত খেলার কথা এখানে উল্লেখ করা গেল, তা বিশাল লোককীর্তি সংগ্রহ ছড়া-সমুদ্রের এক আঁজলা জল।

একটা জিনিস বলতেই হয়, এই খেলাগুলোয় কোনো প্রতিযোগিতার রেশারেশি নেই, নেই কোনো মূল্যবান কীর্তিসামগ্রীর হ্যাঙ্গাম। কিশোরী থেকে মহিলা হয়ে ওঠার পর, তবুও, নিম্নবিত্ত পরিবারের মেয়েদের জীবন থেকে ‘খেলা’ নামক এক অকারণ আনন্দের উৎস একেবারেই যেতো হারিয়ে। মধ্যবিত্ত পরিবারের বা সম্পন্ন পরিবারের মেয়েরা বিয়ের পরও দেখা যেতো তাস, লুডো, ক্যারম ইত্যাদি ইনডোর গেম খেলতেন। কিন্তু নিম্নবিত্ত পরিবারের মেয়েরা বিবাহের পর যে দুর্বিষহ অনটনের আবর্তে পতিত হয়, সেখানে একবেলা খাবারের পরের বেলায় খাবারের চিন্তায় বনে-বাদাড়ে, পুকুরপাড়ে ঘুরে ঘুরে জ্বালানি কাঠ, শামুক-গুগলি, লোকের চোখ এড়িয়ে মাছ, শাক-পাতা সংগ্রহে এবং নিজের ঘরের ও পরের বাড়ির (মনিবের) দাসীবৃত্তি করতে করতে কখন যে সুখি উঠেছে—আর কখনই বা তা অস্তাচলে ঢলে পড়েছে, তা ঠাহর করার সময়ই হয় না তার। এই কঠোর দৈনন্দিনের বাইরে, জীবনের কোনো এক সময় যে ‘খেলা’ নামক পরশপাথরটি তার স্পর্শরেখায়

কখনো-কোনোদিন এসেছিল, সে চিন্তাও যেন ক্রমশ দূর থেকে দূরতর হয়ে ভিনগ্রহমণ্ডলে সোঁধিয়ে যায়। তবে এক সময় সক্রিয়ভাবে খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করার সুবাদে তার শরীর-মন সংগতভাবেই সঙ্গ দেয় তাকে এই নিরবচ্ছিন্ন জীবনযুদ্ধ হার না মেনে দাঁতে দাঁত চেপে লাগাতার চালিয়ে যেতে।

এই প্রবন্ধে মাত্রই গুটিকয়েক, মেয়ের গ্রামীণ লোককীর্তির উল্লেখ করা গেল, যেগুলি ছড়াসমৃদ্ধ। একটিমাত্র জেলা বর্ধমানের গ্রাম ‘রাজুয়া’ (কাটোয়া থানা) এবং ‘পাইটা’ (মাধবডিহি) থানা-তে অল্প ক-দিনের ক্ষেত্রসমীক্ষায় এই খেলার বিবরণ ও ছড়া কটি সংগ্রহ করা হয়েছে। বিস্তৃত পশ্চিমবঙ্গ একেবারেই অধরা রয়ে গেছে।

কৃতজ্ঞতা

১. মুহম্মদ আয়ুব হোসেন, রাজুয়া, বর্ধমান
২. তাপসী বিশ্বাস, রাজুয়া, বর্ধমান
৩. সুলেখা রায়, পাইটা, বর্ধমান
৪. নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক আরো কয়েকজন

With best compliments of

BHAMRA TRAILORS (HSB)

Specialist in : HYDRAULIC TRAILOR

G.T. Road, Panagarh Bazar, PIN : 713148

Contact Nos. 0343-6451066, 9932347928, 9932347927, 9932347890

Manufacturer of—

- Tractor Trailors • Hydraulic Trailors • Water Tank
- Garbage Box • Cage Wheel Cultivator

Sl. No. 89

With best compliments of

M/S TIWARI CONSTRUCTION

Fabricators, Erectors, Mechanical Engineers, Civil Contractors

Specialist in :

*Stainless Steel & Pipeline Job, Dealing with Earth Moving Machine,
JCB & Hydraulic Crane Etc.*

ESBY Industrial Estate

Sanjib Sarani, Durgapur-713201, Dist. Burdwan, E-mail : vinodtiwarig@gmail.com

Phone : 0343-2554757 (R), G.T. : 9002390791

V.T. : 9333950979, R.T. : 9333907643 / 9932697055

WORKS SITE

(1) Graphite India Ltd., (2) Ganga Rasayanie (P) Ltd. (3) Jai Balaji Group, (4) Ultratech

Sl. No. 168

সপ্তকুণ্ডের পথে

বিলাস চ্যাটার্জি



‘উষ্ণায়ন’ বর্তমানে একটি বহুল প্রচালিত শব্দ। এর প্রকোপ বোঝার জন্য আজ আর দূর দেশে যেতে হয় না। বর্ধমান শহরে বসেই বোঝা যায়। এপ্রিল-মে মাসের গরম এখন আমাদের শহরে অসহনীয় হয়ে উঠছে। আবার ঠিক তখনই হিমালয়ের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবিরাম তুষারপাতও স্বাভাবিক নয়। উষ্ণায়ন নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মতামতকে আগ্রহ করে উষ্ণায়নের নামে চলছে প্রকৃতি ধ্বংসের কাজ। জঙ্গল, গাছপালা কাটার বিরাম নেই। বিরাম নেই জলাভূমি ভরাটের কাজেও। আবার নদীর স্বাভাবিক গতিকে স্তব্ধ করে চলেছে নিয়ম না মেনে বাঁধ নির্মাণ। দেখা দিচ্ছে বাধাপ্রাপ্ত প্রকৃতির ভয়ালরূপে বাধা উপকানোর চেষ্টা। পরিণতি ধ্বংস। ধন, প্রাণ, সম্পদ এক লহমায় ধ্বংস হচ্ছে।

বর্ষাপূর্ব আমাদের এ-বছরের হিমালয় পদযাত্রা নির্ধারিত সময়েই স্থির করি। কিন্তু পাহাড়ের গাইড বন্ধুর কাছে খবর পাই ১০ হাজার ফুটের উপরে এখনও প্রচুর বরফ। সুতরাং আমরা যেন দড়ি, আইসঅ্যাক্স সাথে নিয়ে যাই। সাথে পর্যাপ্ত শীতবস্ত্র। স্যাকের ওজন বাড়লো। মালপত্রের সরঞ্জামের পরিমাণ বাড়লো। এ-বছর ২৪ মে লটবরহ নিয়ে উঠি দুই এক্সপ্রেসে। লক্ষ্য গাড়োয়াল হিমালয়ের সপ্তকুণ্ড। প্রায় ১৬,৫০০ ফুট উচ্চতায় হিমালয়ের দুর্গম অঞ্চলে নন্দাঘুন্টি শৃঙ্গের পাদদেশে অবস্থিত সপ্তকুণ্ড। কাছাকাছি দূরত্বে সাত সাতটি কুণ্ড বা জলাশয় একই জায়গায় অবস্থিত। ধর্মপ্রাণ স্থানীয় মানুষজন যেমন প্রতি বছর এই অঞ্চলে যান, তেমনই আমাদের মতো প্রকৃতিপ্রেমীদেরও যাতায়াত আছে এই অঞ্চলে।

২৬ মে সকাল ৭টায় হরিদ্বার পৌঁছে একটি গাড়ি ভাড়া করে যাত্রা করলাম পাহাড়ে। লক্ষ্য ‘ঘাট’ হয়ে ‘সিতেল’ যাওয়া। দেবপ্রয়াগ, রুদ্রপ্রয়াগ, কর্ণপ্রয়াগ পেরিয়ে নন্দপ্রয়াগ থেকে ঘাট-এর রাস্তা ধরলাম। ঘাট পৌঁছাই তটা নাগাদ। ঘাট জনপদে আমি প্রথম এসেছিলাম ১৯৯৩ সালে। তখন কয়েকটা মাত্র বাড়ি, ছোটো

দু-একটা হোটেল, দোকান ছিল। এখন একটি ছোটোখাটো শহরে রূপান্তর ঘটেছে এই জনপদের। ঘাটের মূল আকর্ষণ মন্দাকিনী নদী। তার দু-পাশে তৈরি হয়েছে ৩-৪ তলা বাড়ি, হোটেল। আর এই সুন্দর নদীকে পরিণত করা হয়েছে অবজ্ঞা ফেলার নর্দমায়। নদীতে প্রচুর প্লাস্টিকসহ আবর্জনা দেখে মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল।

সামান্য চা বিরতির পর আবার এগিয়ে চলি। এতক্ষণ পিচ ঢালা সুন্দর পথে এলেও এখন থেকে ১২ কি.মি. দূরের সিতেল গ্রাম পর্যন্ত এখনও পিচ রাস্তা হয় নি। পাথর বিছানো সদ্য তৈরি হওয়া গাড়ি চলার পথ। বারে বারে ড্রাইভারের বিরক্তিসূচক বাক্য শুনতে শুনতে ৪টার পর সিতেলের বনবাংলোয় পৌঁছাই। সেখানেই অপেক্ষায় ছিল আমাদের পুরনো বন্ধু ও গাইড লখপত তার মালবাহক সঙ্গীদের নিয়ে। এখান থেকেই আমাদের হাঁটা শুরু হবে পরদিন।

সিতেল একটি ছোটো গ্রাম। কয়েকটি দোকান, হোটেল আছে। বেশ কিছুদিন আগে থেকেই এখানে গাড়ি চলাচল করছে। তাই দোকানগুলি গড়ে উঠেছে। আশপাশের পাহাড়ের গায়ে অনেক গ্রাম আছে, যাদের যাতায়াত এই পথ দিয়েই করতে হয়। তবে গাড়ির রাস্তা সামনে আরও অনেকটা তৈরি হয়ে গেছে। উপরে সুতোল গ্রাম পর্যাপ্ত গাড়ি চলাচল করবে শীঘ্রই। সিতেল বনবাংলোটি মন্দাকিনী নদীর তীরে জঙ্গল ঘেরা, গ্রামের শেষ প্রান্তে। বেশ নির্জন স্থানে অবস্থিত হওয়ায় এখান পর্যন্ত গাড়িতে এসে অনায়াসেই দু-তিনদিন থাকা যেতে পারে।

২৭ মে—ভোরবেলা উঠে তৈরি হয়ে যাত্রা শুরু করতে সাড়ে ছটা বেজে গেলো। পথে খাওয়ার জন্য রুটি, সবজি তৈরি করিয়ে নিয়ে আসবে মালবাহকরা। আমরা লখপত-এর সাথে এগিয়ে চলি। সুতোল যাওয়ার গাড়ি চলার পথ ধরেই এগিয়ে চলা। চওড়া পরিষ্কার পথ। কিছুটা এগিয়েই একটি সেতু পেরিয়ে নদীর অপর



পারে চলে আসি। এখন থেকে নদী আমাদের ডান দিকে থাকে। পাহাড় কেটে পথ তৈরি হয়েছে। এখনও কিছু কিছু জায়গায় পাহাড় কাটার কাজ চলছে। চলতে চলতে অনেকটা ওপরে উঠে এসেছি। মন্দাকিনী চোখের আড়ালে চলে যায়। ঘণ্টা দুয়েক চলার পর গাড়ির পথ ছেড়ে বাম দিকের পায়ে চলা একটি পাহাড়ি গ্রাম্য পথে হাঁটা শুরু হয়। এবার চড়াই পথে দমের ঘাটটি হয়। মাঝেমাঝেই থামতে হয় চলার পথে। নিজের জন্য দাঁড়িয়ে বিশ্রাম নিই, আবার এগিয়ে চলি। যত ওপরে উঠতে থাকি চারদিকে দৃশ্যপট পরিষ্কার হয়। দূরের পাহাড়ের গায়ে ঘন জঙ্গল, মাঝে ছোটো ছোটো গ্রাম; ধানচাষের জমিতে চাষ হয়েছে। আরও দূরে তুষারশুভ্র শৃঙ্গেরও দেখা মেলে। চড়াই পথের কষ্ট নিমেষে লাঘব হয় এই সব দৃশ্যাবলী দেখে।

১০টা নাগাদ চড়াই বেয়ে উঠে এলাম একটি পাহাড়ের ওপরে। ছোটো একটি গ্রামের নিচে এই জায়গাটির নাম পাতিন্দার। দুটি দোকান আছে, যেখানে টুকিটাকি প্রয়োজনীয় জিনিস কেনাকাটা করা যায়। একটিতে চা, জলখাবারও পাওয়া যায়। আমরা চায়ের অর্ডার দিলাম। ওপরেই একটি ছোটো মন্দির। যদিও তার দরজা বন্ধ থাকায় বিগ্রহ দেখা হল না। মন্দিরের দাওয়ায় বসে রুটি, সবজি আর চা খাওয়া হল। এখানে বসে সুতোল সহ ছোটো ছোটো অনেক দূরবর্তী গ্রামের অবস্থান দেখলাম, চিনলাম, বিশ্রামের ফাঁকে। ১১টা নাগাদ আবার যাত্রা শুরু করি। এবার পথ আর কঠিন চড়াই ওঠা নয়। পাহাড়ের গা বেয়ে সুন্দর পায়ে চলা পথ। মিনিট ২৫ হাঁটার পরই পৌঁছাই পেরিগ্রামের স্কুলবাড়িতে। স্কুলে ছুটি থাকায় কেউ ছিল না স্কুলবাড়িতে। আমরা একটি ঘরে পলিথিন সিট বিছিয়ে আমাদের আজকের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করি।

স্কুলের ওপর ও নিচের পাহাড়ের ঢালে চাষ আবাদ হলেও মূল পেরিগ্রামটি এখান থেকে একটু দূরেই। প্রায় মিনিট ১৫-র মতো হেঁটে পৌঁছাতে হবে গ্রামে। দূর থেকে দেখা যায়। কৃষিকাজে ব্যস্ত গ্রামের মহিলারা। আমরা স্কুলঘরের বাইরে রোদে পিঠ দিয়ে বসে দেখি। দুপুরের খাবার তৈরি হলে খেয়ে একটু বিশ্রাম নিয়ে ঘুরতে যাই গ্রামের দিকে। পাহাড়ের গায়ে স্তরে স্তরে সাজানো সুন্দর গ্রাম। দিনের শেষ লগ্নে মহিলারা ব্যস্ত গবাদি পশুর খাবার সংগ্রহে। ঘাস, গুল্ম বোঝা বেঁধে নিয়ে যায় বাড়ির পথে। কেউবা পাকা ফসল কাটায় ব্যস্ত। এই সময় গম ও যব পেকেছে জমিতে। সম্ভার্য আগেই ফিরে আসি স্কুলবাড়িতে। গ্রামের বাইরে স্কুলটির অবস্থান হওয়ার নির্জনতা বিরাজ করে অন্ধকার নামার সাথে সাথেই। অনেকক্ষণ বারান্দায় বসে আড্ডা দেওয়া হয়। ঠাণ্ডায় আর বসে থাকা যায় না। ৮টা নাগাদ রাতের খাবার খেয়ে শুয়ে পড়ি।

২৮ মে সকালে চা বিস্কুট খেয়ে যাত্রা শুরু হয়। সহজ পথে পেরিগ্রামে পৌঁছাতে সময় লাগে না বেশি। শতাধিক পরিবারের বাস এই গ্রামে। উদয়াস্ত পরিশ্রম করে এখানের মানুষজন। যদিও এই সময়ে এই অঞ্চলের গ্রামগুলিতে কোনো যুব বয়সের মানুষের দেখা পাওয়া যায় না। সকলেই চলে যায় দুর্গম পাহাড়ের উপর জড়িবুটি-র খোঁজে। গ্রামে এই মুহূর্তে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ও শিশুদের বাস। ভেষজ ওষুধ তৈরির কাজে লাগে এমন জড়িবুটি বা শিকড়বাকড় হিমালয়ের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পাওয়া যায়। তা চিনে সংগ্রহ করতে পারে স্থানীয় মানুষজন। সমতলে তা অনেক দামে বিক্রি হয়। এমন জড়িবুটি সংগ্রহকারী মানুষদের সাথে ট্রেকিং পথে অনেক সময়ই দেখা হয়েছে। কিন্তু এই অঞ্চলে একটি বিশেষ জড়িবুটি, কিডাজোড়ি পাওয়া যায়, যার মূল্য সমতলে অনেক বেশি। আমাদের হাতের কড়ে আঙুলের মতো ছোট্ট একটি শিকড় জাতীয় দ্রব্য কিডাজোড়ি। যার একটির মূল্য প্রায় ৪০০টাকা। এক একটি পরিবারের একাধিক লোকজন এই জড়িবুটি সংগ্রহের কাজে যুক্ত হয়। এই সময়ের দু-মাসে একটি পরিবার লক্ষাধিক টাকা রোজগার করে এই কাজে যুক্ত হয়ে। এই অঞ্চলের প্রায় প্রতিটি গ্রাম থেকে যুব বয়সের লোকজন এই কাজের জন্য পাহাড়ের উপরে চলে যায়। স্থানীয় মানুষের কাছেই জানতে পারি এই তথ্য। আশ্চর্য হই যখন জানতে পারি এই মূল্যবান ভেষজ আমাদের দেশে নয়, চোরা পথে চলে যায় চিন দেশে। সরকারি কোষাগারে এর বিনিময়ে কোনো বিদেশি মুদ্রা আসে না।

একজনের চায়ের আমন্ত্রণ গ্রহণ না করে এগিয়ে চলি। সামনেই কঠিন এক চড়াই উঠতে হবে। কাল থেকেই আমাদের নজরে আছে সেই চড়াই। গ্রামের প্রায় শেষ প্রান্তে এসে এক বৃদ্ধের চায়ের আমন্ত্রণ আর ফেরানো গেল না। অগত্যা গরুর দুধের সুন্দর চা এক গ্লাস করে তৃপ্তিসহকারে পান করে যাত্রা শুরু করি। পাহাড়ের গায়ে পাকদণ্ডী পথ বেয়ে উঠে চলা। দমের ঘাটটি হয়। দাঁড়িয়েই ক্ষণিকের বিশ্রাম, আবার এগিয়ে চলা। হালকা জঙ্গলের মধ্য দিয়ে উঠে আসি একটি সুন্দর বুগিয়ালে। বুগিয়াল মানে চারপক্ষত্র। পাহাড়ের গায়ে প্রকৃতির সৃষ্ট ঘাসে ঢাকা অঞ্চল। জায়গাটির নাম বানিয়াট। পেরি গ্রাম থেকে কঠিন চড়াই বেয়ে উঠে আসা হল বানিয়াটে। গ্রামের কিছু মানুষ বছরের এই সময়ে এমন জায়গায় গরু মোষ নিয়ে চলে আসে। এখানে কুঠি বানিয়ে থেকে যায় বর্ষা পর্যন্ত। এমনই এক কুঠি বা গোট-এর বাসিন্দা বৃদ্ধ দম্পত্তির আমন্ত্রণে আবার চা পান হল এক প্রস্থ।

চা সহযোগে বিশ্রামের পর আবার এগিয়ে চলা। একটি গিরিশিরা বেয়ে চড়াই পথ ঘন জঙ্গলের ভিতর দিয়ে। পায়ে চলার পথরেখা থাকলেও জঙ্গলের ভিতর কখনও ঢাকা পড়ে যায়। দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে হয় লখপতের জন্য। সে-ই আমাদের পথ প্রদর্শক। পথ চিনিয়ে নিয়ে চলে। তবে এই পথে মাঝেমাঝেই দলবদ্ধভাবে অনেক মানুষকে যেতে দেখা যায়। তাদের সাথে ক্ষণিকের পরিচয়ও হয়। সবাই চলেছে জড়িবুটির সন্ধানে। আমরা যে পথে চলেছি সেই পথেই। এদের কারো তাঁবু আগেই তৈরি হয়েছে। কেউ কেউ গিয়ে তৈরি করবে পলিথিন সিট দিয়ে মাসাধিক কাল থাকার জন্য তাদের বাসস্থান। জঙ্গল শেষে উঠে আসি আরো একটি সুন্দর ছোট্ট বুগিয়ালে। বুগিয়ালটির নাম কুবরিয়া ধার। এই বুগিয়াল জুড়ে ছোটো ছোটো হলুদ, নীল ফুল ফুটে আছে। এখানেই বসে বিশ্রাম করি ও খেয়ে নিই। রুটি, সবজি সকালে তৈরি করে নিয়ে এসেছিল। তাই খাওয়া হল। আবার এগিয়ে চলা। গিরিশিরা বেয়ে উঠে চলা। বড় গাছের জঙ্গল নিচের থাকে, আমরা চলেছি বুগিয়ালের ওপর দিয়ে। আশেপাশে

ছোটো ছোটো রডোডেনড্রন গাছের বাড়, ফুল প্রায় শেষ হয়ে এসেছে এখন। সামনেই একটি কঠিন চড়াই বেয়ে উঠে আসি অনেকটা। তবে পাহাড়ের শেষ ধাপটা ওঠার আগেই ডান দিকে পাহাড়ের গা বেয়ে আমাদের পথ সহজ হয়। প্রায় ২টো নাগাদ পৌঁছাই। তিলবুড়ি খরগ। সুন্দর ক্যাম্পিং সাইট। সেখানেই আমাদের টেন্ট খাটানো হল। বিকালের মধ্যেই রান্না সমাপ্ত হয়েছে। সন্ধ্যার অন্ধকার নামার আগেই ডিনার শেষ হল আমাদের। ঠাণ্ডায় বেশিক্ষণ বাইরে থাকারও উপায় নেয়। তাই তাঁবুতে বসেই কিছুক্ষণ আড্ডা দিয়ে শুয়ে পড়ি আটটা নাগাদ।

২৯ মে সকাল ৭টায় তৈরি হয়ে যাত্রা শুরু হল।

মালবাহকেরা আসবে পরে। তাঁবুগুলো শুকিয়ে গুছিয়ে নিয়ে আসবে। পথের খাবারও ওরাই তৈরি করে নিয়ে আসবে। আমরা চা-বিস্কুট খেয়ে যাত্রা শুরু করি। সামনেই এক কঠিন চড়াই ভেঙে উঠতে হবে পাহাড়ের মাথায়। কাল এসে থেকে এই চড়াইটা দেখছি আর ভয় পাচ্ছি। কতক্ষণ যে লাগবে সেই হিসাব করেছি বসে বসে নিজেদের মধ্যে। স্থানীয় মানুষ যারা জড়িবিটি আনতে এই পথে যাচ্ছে তাদের সময় লাগছে প্রায় ঘণ্টাখানেক। তাহলে আমাদের দেড়-দু ঘণ্টা লাগার কথা। আর ভাবার সময় নয়। এবার চলতে শুরু করি। ধীরে গতিতে এগিয়ে চলি। সকালের সময়ে পথ চলার কষ্ট অনেক কম হয়। চড়াই উঠতে দমের ঘাটতি মোটাই বিশ্বাসে। উঠি, দাঁড়াই আবার উঠতে থাকি। প্রায় ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আমরা পৌঁছে গেলাম ওপরে। এবার একটু বসে বিশ্রাম নিই। জায়গার নাম তিলবুড়ি টপ। উল্টো দিকের পাহাড়ে উঁচু নিচু কিছু পাহাড়ি পথ চলার পর পৌঁছাই একটা সুন্দর ক্যাম্পিং সাইটে। যেখানে কয়েকটা ঘোড়া ও গরু চড়ে বেড়াচ্ছে। জায়গার নাম পাথরকুড়ি। কাল এখানেই ক্যাম্প করার কথা ছিল। কিন্তু আমরা এসে পৌঁছাতে পারি নি।

এখান থেকেই দেখা দিল দূরে অনেক তুষারশৃঙ্গ। এখন পাহাড়ের অনেকটা ওপরে উঠে আসায় সামনের পাহাড় আর বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। তবে ডান দিকের যে পাহাড়ের গা বেয়ে যেতে হবে তার প্রায় সবটাই করফে ঢাকা। অর্থাৎ এখান থেকেই শুরু হল বরফপ্রান্তরে হাঁটা। যেহেতু জড়িবিটির জন্য স্থানীয় মানুষজনের যাতায়াত আছে, তাই পাহাড়ের গা বেয়ে বরফের ওপর পায়ে চলার পথ তৈরিই হয়ে আছে। সেই পদচিহ্ন ধরেই উঠে চলি সামনের গিরিশিয়ার ওপর। আবার কিছুটা নেমে সোজা হাঁটা। বেলা বাড়ার সাথে সাথে রোদের তাপে বরফ গলে যাওয়ায় কখনো পা ঢুকে যায় হাঁটু অবধি। আবার কখনো স্লিপ খেয়ে গড়িয়ে পড়ি। এইভাবেই পরপর ৪টি গিরিশিরা অতিক্রম করার পর কিছুটা সমতল জায়গায় একখণ্ড ঘাসের জমি দেখতে পাই। কয়েকদিন আগেই বরফ গলে মাথাতুলে দাঁড়িয়েছে। সেখানেই আজকের তাঁবু খাটানো হল রাতের জন্য। জায়গার নাম মারতোলি খরগ। দুটি তাঁবুর মাঝের অংশে পলিথিন দিয়ে তৈরি হল কিচেন। চারিদিকে বরফে ঢাকা থাকায় রোদ চলে যেতেই তাঁবুবন্দি হতে বাধ্য হলাম।

৩০ মে ঘুম থেকে উঠে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তৈরি হয়ে নিলাম যাত্রা শুরুর জন্য। বরফে হাঁটা সকাল সকাল হলে অনেক সুবিধা হয়। যত বেলা বাড়বে ততই বরফ গলতে থাকবে। আর তখন গলা বরফের ওপর হাঁটতে হলে পা ঢুকে যাবে নয়তো গড়িয়ে পড়ার ভয় থাকে। তাই রোদ আসার সাথে সাথেই যাত্রা শুরু করলাম ৬.৩০ মিনিট নাগাদ। আজকের পথ পাহাড়ের গা বেয়ে বরফের ওপর দিয়ে। বরফ শক্ত থাকায় চলার গতি ভালই। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই পৌঁছে গেলাম অপর দিকের পাহাড়ের



গায়ে। সেই পাহাড়ের গায়ে বরফ নেই। খাড়াই বেশি থাকা ও দিনের বেশি সময় রোদ থাকায় বরফ গলে গেছে। তবে পাকদণ্ডী পথ খাড়াই চড়াই। অত্যন্ত ধীর গতিতে উঠতে হয় পাহাড়ের এই জায়গাটি। প্রায় মিনিট ৪৫ চলার পর পৌঁছাই পাহাড়ের মাথায়। জায়গাটির নাম সূর্যঘাট। উচ্চতা ১২৫০০ ফুটেরও বেশি। তাই দমের ঘাটতি হয় উচ্চতাজনিত কারণে, অক্সিজেন কম থাকায়। আরও কিছুটা এগিয়ে আবার একটা কঠিন চড়াই সোজাসুজি ভাবে উঠে পড়ি। একটি মন্দির তৈরি করা আছে ছোটো পাথর সাজিয়ে। এখানে এসে সকলে পূজা দেয়। আমাদের মধ্যেও কয়েকজন পূজা দিল। সামনে নন্দাঘুন্টি। বামপাশে পরপর সাজানো নীলকণ্ঠ, চোখান্ধা, হাতি পর্বত, ঘোড়ী পর্বতশৃঙ্গ। পরিষ্কার দেখা যায় চারপাশটা। দারুন সুন্দর এই অঞ্চল। এখানে থেকেই সিন্ধে বুগিয়ালের শুরু। অনেকটা নেমে মূল বুগিয়ালে পৌঁছাই। তবে বুগিয়াল পুরোই বরফে ঢাকা। এখান থেকে যে পথে সপ্তকুণ্ড যাওয়া হবে তা সামনেই দেখা যায়। কিন্তু এত বরফ এবং কঠিন চড়াই দেখে ভাবতে হয় কালকের প্রোগ্রাম নিয়ে। জড়িবিটি তুলতে আসা স্থানীয় মানুষদের সাথে কথা বলে জানা যায় এখনও সব কটি ঢালই বরফে ঢাকা। আবার সামনের পাহাড়টির ওপর উঠলেও উল্টোদিকে কুণ্ডগুলির দিকে নামা খুবই বিপজ্জনক হবে। আরও কিছুটা নেমে এসে আপার দেবান্দনে আজকের তাঁবু খাটানো হল। চারদিকের পাহাড় বরফে ঢাকা থাকলেও আমরা তাঁবু খাটলাম। একখণ্ড ঘাসের জমিতে।

বিকালের দিকে সকলে বসে আলোচনা করে ঠিক হল ভোর ভোর বেরিয়ে যতটা যাওয়া যায় যাবো। কোলোদার হাঁটুতে আঘাত লেগেছে তাই সে থাকবে তাঁবুতেই।

দূর থেকে দেখা যায় দেবান্দন ও তার নিচে ঘাসে ঢাকা অঞ্চলে অনেক তাঁবু তৈরি হয়েছে। স্থানীয় মানুষজন এই অঞ্চলের পাহাড়ে সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি জড়িবিটি সংগ্রহের কাজে ব্যস্ত থাকে। বিকালের দিকে হঠাৎ এক পশলা বৃষ্টি নামে। সূর্য নেমে যায় পশ্চিম আকাশের পাহাড়ের আড়ালে। আর এই তুষাররাজ্যে ঠাণ্ডা নেমে আসতেই আমাদের আশ্রয় নিতে হয় তাঁবুর ভিতরে। সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসার সাথে সাথেই আমাদের ডিনার সমাপ্ত করে স্লিপিং ব্যাগের উষ্ণ আশ্রয়ে যেতে হয়।

৩১ মে সকালে ঘুম ভাঙতেই পর্যাণ্ড শীতবস্ত্র পরে বেরিয়ে পড়লাম। ৬টার আগেই আমাদের যাত্রা শুরু হল। এখান থেকে সপ্তকুণ্ড যেতে ঘণ্টা তিনেক সময় লাগে। দেখে ফিরে আসতে আরও ঘণ্টা তিনেক। এই সময় হাতে নিয়েই আমাদের যাত্রা শুরু হয়। সাথে কিছু শুকনো খাবার, জল। গাইড নিয়েছে দড়ি ও আইসগ্র্যাক্স। কিছুটা উৎরাই বেয়ে নেমে আসতেই ওপরে যাওয়ার

পায়ে চলা পথরেখা বরফের ওপর। এখন বরফ শক্ত থাকায় বিশেষ অসুবিধা হয় না পথ চলতে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই প্রথম চড়াইটা উঠে আসি। সামনে ধূধু বরফপ্রান্তর। চড়াই ভেঙে চলতে হয়। এই উচ্চতায় দমের ঘাটতি হয়। কনকনে ঠাণ্ডায় দাঁড়িয়ে বিশ্রাম নেওয়ারও উপায় নেই। চললে শরীর গরম থাকে। দাঁড়ালেই ঠাণ্ডায় জমিয়ে দিতে চায়। ঘণ্টাখানেকের চেষ্টায় চড়াই পথটা শেষ হতেই সামনে আবার পরপর কয়েকটা ছোটো চড়াই আসে। তার পরেই দাঁড়িয়ে আছে একটি বড় খাঁড়াই দেওয়াল। দেওয়ালের পাশে আছে বরফ ঢাকা চড়াই। যার নাম জোড়াগলি। সেই গলিপথেই উঠতে হবে আমাদের। পৌছাতে হবে সামনের পাহাড়ের দেওয়ালের মাথায়। সেখান থেকে উত্থাই বেয়ে বরফের ঢাল পেরিয়ে নামতে হবে কুণ্ডের কাছে। দু-ঘণ্টায় যেটুকু পথ আমরা অতিক্রম করতে পেরেছি, বাকি পথটি যেতেই আমাদের আরও প্রায় ঘণ্টা ৪-৫ সময় লাগবে। ফিরতে হবে একই পথ দিয়ে। তখন রোদের তাপে বরফ গলে বিপদজনক হয়ে যাবে পথ চলা। অগত্যা দলনেতা সিতাংশুদা সকলের সাথে আলোচনা করে এখান থেকেই ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন।

একই পথে ফিরে আসতে বেশি সময় ব্যয় হল না। কারণ এখনও বরফ গলতে শুরু করে নি। ১০টা নাগাদ ক্যাম্পে ফিরে এসে কিছু খেয়ে এখান থেকে আজ আরো কিছুটা পথ নেমে যাওয়া হবে ঠিক হল। কিছুটা পথ নেমে ক্যাম্প করলে বরফ প্রান্তর থেকে একটু দূরে থাকা যাবে, যাতে ঠাণ্ডার প্রকোপ একটু হলেও কম হবে। আর একই সাথে আগামীকালের চলার পথ কমে যাবে। সেই মতো আমরা আবার যাত্রা শুরু করলাম নেমে যাওয়ার জন্য। সিম্প্রে বুগিয়ালের এই অংশে বরফ নেই। ঘাসে ঢাকা পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে চলা। পথে দেখা যায় পুরুষ মহিলা মিলে সারা পাহাড়ের গায়ে খুঁজে চলেছে কিরাজোড়ি। কেউ কেউ আমাদের দিকে ফিরে তাকায়। কাছাকাছি থাকা মানুষজন এগিয়ে

এসে কথা বলে। আমরাও তাদের সাথে কুশল বিনিময় করি। ১২টা নাগাদ আরও কিছুটা পথ পেরিয়ে এসে একটা সুন্দর ক্যাম্পিং সাইটে আজকের জন্য তাঁবু খাটানো হয়।

সিম্প্রে বুগিয়াল অনেক বড় বুগিয়াল। কালকের ফেলে আসা সেই চড়াই থেকে আজকের এই ক্যাম্পিং সাইট বেশ কয়েক কিমি বিস্তৃত। এখান থেকেও পরিষ্কার দেখা যায় নীলকণ্ঠ, চোখাম্বাসহ এক ঝাঁক তুষারশৃঙ্গকে। আবার পিছন ফিরলেই সামনে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে নন্দাঘুন্টি শৃঙ্গ। সারাদিন বসে দেখে যাই পর্বত-শিখরের সাথে মেঘের লুকোচুরি খেলা। বুগিয়ালের ঢাল বেয়ে একটু নিচেই রডোডেনড্রনের জঙ্গল। সেখানে এখনও কিছু ফুল ফুটে আছে। বুগিয়াল জুড়ে হলুদ, নীল ফুল ফুটতে শুরু করেছে। কিছুদিনের মধ্যেই ফুলে ঢেকে যাবে সারা অঞ্চলটি। রোদ বলমলে দিনে অলসভাবে বসে থাকি। দেখতে থাকি প্রকৃতির এই মোহময় রূপকে। রডোডেনড্রন জঙ্গলে চারটি মোনাল পাখি নিজেদের মধ্যে খুনসুটি করতে করতে বেরিয়ে আসে জঙ্গল থেকে। হিমালয়ের এই রঙিন মোনালের দল আমাদের আজকের এই উপভোগ্য প্রকৃতির মাঝে উপরি পাওনা হয়। যেমন রঙিন প্রকৃতি তেমনই রঙিন এই মোনালের দল।

দিনের শেষে পড়ন্ত সূর্যের আলোয় আর এক অন্যরূপে সেজে ওঠে প্রকৃতি। দূরের তুষারশৃঙ্গগুলি হলুদ, লাল নানান রং-এ নিজেদের রঙিন করে তোলে। যতক্ষণ তাদের এই রং বদলানোর খেলা চলতে থাকে আমরা সকলেই অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকি। দেখতে থাকি রং বদলানোর এই খেলা।

দিনের আলো সরে যেতেই এক সময় উপত্যকা জুড়ে নেমে আসে অন্ধকার। রাত্রির আঁধার আমাদের মনের কোণেও বাসা বাঁধে। জানান দেয় অদ্যই শেষ রজনী। কালই আমাদের ফিরতে হবে লোকালয়ে, মানবমেলায়। আবার ধুলো, ধোঁয়া, গাড়ির হর্নের আওয়াজের মাঝে।





ইয়ে হ্যায় মুম্বই মেরি জান...

মধুছন্দা মিত্র ঘোষ

আরব সাগরের লোনা ঢেউ ছলকানো ও লোনা বাতাস মাখা মুম্বই মহানগর। মানুষজন আত্মাদী নামবিশেষণ দিয়েছেন ‘স্বপ্ননগরী’। কথাটা অবশ্য সত্যি, এতটুকু অতিরঞ্জিত নয়। আরও কতো যে নাম আছে এই নগরটার। নগর তো নয়। মহানগর। ‘কমার্সিয়াল ক্যাপিটাল’ বা ‘বাণিজ্য নগরী’, ‘লন্ডন অব দ্য ইস্ট’, ‘বলিউড’, ‘মেট্রো ক্যাপিটাল’, ‘মুম্বই মেরি জান’, ‘আমচি মুম্বই’—গালভরা নাম আছে মুম্বইয়ের। আলো ও অন্ধকার জগৎ নিয়েও মুম্বই। মুম্বই অত্যাধুনিক শহর হিসাবে সমস্ত বিশ্বে ষষ্ঠ স্থানে।

মুম্বইকে বলা হয়, ‘মোস্ট কসমোপলিটান সিটি ইন্ডিয়া’। মুম্বইকররা অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষাভাষীর মানুষজনদের প্রতিও সৌভ্রাতৃত্ব ও উদার মনোভাব বজায় রেখে চলেন। মুম্বই-এ সবাই প্রায় ‘মুম্বইয়া’ হিন্দিতে কথা বলেন। বলিউডের প্রভাব বলা যেতে পারে। নিজস্ব মরাঠি ভাষাও বলেন। নানা ভাষা, নানা মত, তবু বিবিধের মাঝে সবাইকে নিয়ে চলার ইচ্ছে মুম্বইকরদের আছে বলেই মুম্বই ভারতের অন্যান্য শহরগুলির থেকে অনেকটাই এগিয়ে।

বিগত তিন বছর যাবৎ এই পশ্চিম মূলুকে রয়েছে। প্রথম দিন সন্ধ্যতেই মুম্বইয়ে সাংসারিক কেনাকাটা করে, নামি রেস্টোরাঁয়

সেঁধোলাম, মুম্বইয়ের জিভে জল আনা সাবেকি খাবার ‘পাওভাজি’ ব্যাপারটার আস্বাদ নিতে। কতোদিন মনে পুষে রেখেছিলাম, মুম্বইয়ে প্রথম রেস্টোরাঁবাজিটাই করবো পাওভাজি চেখে।

আন্ধা মহারাষ্ট্রের অন্যতম খাবার এই ‘পাওভাজি’। স্ট্রিট ফুড কালচারে পাওভাজি একটা দুর্দান্ত রেসিপি। ইয়া বড় লোহার তাওয়ায় চটকানো সবজি ও প্রচুর রঙচঙা মশলাপত্রের কারিকুরিতে কষা গরমাগরম গ্রেভি। সাথে জবজবে করে মাখনে ভেজানো দু পিস পাও। খোপ কাটা স্টিলের থালায় কয়েক কুচি পেঁয়াজ, ধনেপাতার চাটনি, কয়েক ফালি মশলা মাখানো কাঁচালঙ্কা ও একটুখানি মিক্সড আচার বা পাতিলেবুর কোয়া। পাওভাজি প্রচুর গুরুপাক, প্রচুর মশলা, মাখন—সমস্তটাই প্রচুর। তবে পেটভরা খাবার হিসাবে পাওভাজি ব্যঞ্জনটি মুম্বইকরদের রসনা তৃপ্তির ব্যাপক খোরাক। পকেট-ফ্রেন্ডলিও। পথের ধারে, পর্যটক সমাগম হয় এমন ধাবাগুলোয় স্কুল-কলেজ পড়ুয়া থেকে অফিস যাত্রী—সবাইই প্রিয়। পাওভাজি বানানোর পদ্ধতি মোটামুটি এক হলেও, কারিগর-বিশেষে উপাদান মিশ্রণ ও রান্নার কৌশলে নিজস্ব সিক্রেট থাকে।

‘রাস্তে ওয়ার্চি খায়চ’ হিসাবে বড়া পাও, মিশাল পাও, কান্দা ভাজি, কান্দা পোহা, বটাটা ওয়াড়া, পানিপুরি, মেদু ওয়াড়া সবই মুম্বইকরদের কাছে রসনাপূর্তির শেষ কথা। মুম্বইকরদের কাছে ‘স্ট্রিট আইকন’ হল এই ওয়াড়া পাও যা কিনা নিতান্তই পাতি আলুর চপ। এখানে বলে ‘বড়া’ আর ‘পাও’—মানে গোল আকৃতি পাউরুটি—আস্তু একটা পাও সামান্য চিরে তারমধ্যে ‘বড়া’ ঢুকিয়ে মাখনে এপিঠ-ওপিঠ ভেজে মশলা মাখানো কাঁচালঙ্কা ভাজা ওপরে সাজিয়ে দেবে। ধুমসো ওই ওয়াড়া পাওয়ে একখান সুখের কামড় দিতে প্রথমেই যেটা লাগবে তা হল কৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শন করানোর মতো বিশাল হাঁ।

মুম্বইকরদের বড় আদরের জায়গা জুহু বিচ। বিশ্বের বৃহত্তম বিচগুলোর মধ্যেই এর স্থান। সবসময় ভিড়ঠাসা। নানান বিনোদনী পসরায় সেজে থাকে বিচ প্রাঙ্গণ। রকমারি মুখরোচক মুম্বইয়া খাবারদাবারের এলাহি হাতছানি। জুহু বিচের নামি স্টলগুলোয়



পাওভাজির স্বাদ কিন্তু নিতেই হবে মুম্বই বেড়াতে আসা প্রতিটি ভিন রাজ্যবাসীর। এদের এখানকার পাওভাজির স্বাদও জরা হটকে। কয়লার আঁচে সেকাঁ বিট-লবণ ও পাতিলেবু ঘষা রোস্টেড মকাইয়ের জন্য জুহু বিচে হা পিত্যেস করে লাইনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে হয়। মকাইওয়ার সহকারী সেই লাইন সামলায়। তার হাতে টাকা গুঁজে দিয়ে যে ‘আমায় আগে ছেড়ে দে বেটা’ বলবেন, তা কিন্তু হবে না মোটেই। যখন আপনার ‘বারি’ আসবে, আপনি ভুটার তুপ থেকে নিজে পছন্দ করে তাকে এগিয়ে দিলে, সে সেকাঁ মশালা মারকে হাতে তুলে দেবে। জুহু বেড়াতে গেলেই মকাইদানা, পাওভাজি আর ফেরার পথে জুস্ পার্কারে ফালুদা—আইসক্রিম-এর লোভনীয় ককটেল—এটার সাথে ওটা, সেটা, নানান ফ্লেবার-এর রকমারি মিশ্রণ ভর্তি লম্বা কাঁচের কাপে সাজানো সম্ভার। আয়েসি চুমুক দিয়ে মনকাড়া আভিজাত্যের স্বাদ নিতে নিতে ভাবি, এই অমৃত-এর ভাণ্ডারের জন্যই বোধহয় দেব-অসুরের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধটা হয়েছিল।

পরবাস যাপন হলে কি হবে, মুম্বইয়ে প্রায় সর্বত্রই ‘বং-কানেকশনস্’। দোকান, বাজার, ব্যাঙ্ক, শপিং মল, রেস্টোরাঁ, রাস্তা—সবখানেই বাঙালি পেয়ে যাই। বেশ কিছু বাঙালি অ্যাসোসিয়েশনও আছে। প্রথম প্রথম মাহের বাজার, শপিং মল, রাস্তাঘাটে বাংলা কথোপকথন শুনলেই ঘাড় ঘুরিয়ে আড় চোখে জনান্তিকে দেখে নিতাম। এখন আর চমকে ফিরে তাকাই না। তবে মুম্বইয়ে যারা বেশ কিছুদিন যাবৎ রয়েছেন, সে চাকরিসূত্রে হোক বা বৈবাহিক সূত্রেই হোক, তাদের বাঙালি কথায় অদ্ভুত অন্য ধরনের টান। কেমন আধো আধো বুলিতে জিবকে প্রভুত কষ্ট দিয়ে হিন্দি টানে বাংলা বলেন। মনে হয় এখনও যেন জিবের আড় ভাঙেনি, গলার শিরা ফুলিয়ে অকারণ হিন্দি ডায়ালেক্টে বাংলা বলেন। কেন যে তাঁরা এতো রঙচঙ করেন অহেতুক। বড়ো মেকি মনে হয় মুম্বইয়া এই বাঙালিদের। কেবল দেখনদারি আর শো-অফ্ করা।

এদিকে আবার এই ‘না ঘরকা না ঘাটকা’ টাইপ বাঙালিরাই পঁচিশে বৈশাখ ও দুগ্গাপুজোয় পুরোদস্তুর ‘বং-কানেকশনস্’ মোড়কে। নানান পেশাগত কারণে বেবাক ছুটে বেড়ানো মুম্বই প্রবাসী বাঙালি গৃহস্থরা দুগ্গাপুজোর পাঁচটা দিন ‘বাঙালিপনা’র আদিখ্যেতা কাটাতে চান। তবু একটা ব্যাপারও চোখে আঙুল দিয়ে লক্ষ্য করবার আছে। মুম্বইয়ে প্রায় প্রতিটি দুগ্গাপুজো বিশাল বিগ বাজেট, গ্রান্ড মেগা ইভেন্ট, কর্পোরেট স্পনসরশিপ, ধামাকা এন্টারটেইনমেন্ট এতো সব গ্রেট স্টাইলিং পুজো হলেও পুজোর প্রতিমা কিন্তু একেবারে সাবেকি মাতৃমূর্তি। কোনও ‘থিম’-এর ধারে কাছে যেতে রাজি নন পুজোর প্রতিটি কর্মকর্তা। সনাতনী প্রথায পুজো মস্তপাঠ, ঢাকি, কাঁসর ঘণ্টা, পাক্সা বাঙালি ভোজ, পাত পেড়ে কমিউনিটি লাঞ্চে ভোগ খাওয়া, পুষ্পাঞ্জলি, ডিজাইনার ধুতি-পাঞ্জাবি, কেতাদুরস্ত শাড়ি, সাজগোজ, গুলতানি—এ-বলে আমায় দেখ, ও-বলে আমায়। সাজগোজ, বলিউড টলিউড সেলিব্রিটিদের অমুক নাইটস্ তমুক নাইটস্, দেবীবরণ, সিঁদুরখেলা, বিজয়া, কোলাকুলি, মিষ্টিমুখ—যেন এক টুকরো ঘরেফেরার গান নিয়ে কলকাতা ফ্লেবার। শুধু মুম্বই কেন, বাংলার বাইরের প্রবাসী শহরগুলোর চেনা যাপনের উপপাদ্য।

আমার কাজের ‘বাঈ’ বিজয়া সিন্দে হল আমার মরাঠি শেখানোর ঘরোয়া দিদিমণি। ও আমায় টুকটাক কথাবার্তা চালানোর মতো মরাঠি ডায়ালেক্ট শেখায়। আমার মতো ভিন্ প্রদেশী এক ‘বাঙালি ম্যাডম্’-কে মরাঠি প্রতিশব্দ শেখায় আর ফিক্ ফিক্ করে হাসে। আমিও ‘ভাজি’ মার্কেটে যেয়ে অভ্যস্ত বাঙালিপনা বুলি সরিয়ে পের্যাজ কেনার সময় বলি ‘পাও কিলো কান্দা’, আলু কেনার সময় বলি ‘চাই কিলো বটাটা’। বেগুনকে ‘ওয়াঙ্গা’, ওলকে ‘সুরণ’, কুমড়োকে ‘ভোপলা’, কড়াইগুটিকে ‘ওরানা’, লাউকে ‘দুদি’, কচুকে

‘আরবি’, উচ্ছেকে ‘কারলো’, বাঁধাকপিকে ‘পান গোবি’, আমকে ‘হাপুস’, কাঁঠালকে ‘ফানস’ বলি। যদিও মুম্বইয়ে প্রায় সর্বত্রই ‘মুম্বইয়া হিন্দিতে’ কথা বলেন। মরাঠি ভাষার সাথে দেশজ হিন্দি-ইংরাজি সব মিলিয়ে একটা চালু কথ্য ভাষা। বলিউডের প্রভাব বলা যেতে পারে।

আনন্দবাজার পত্রিকা, মুম্বই-এ লেখালিখি করার সুবাদে অনেকের সাথেই কথা বলতে হয়, সাক্ষাৎকার নিতে হয়। বলিউডের স্বনামধন্য বাঙালি সঙ্গীতশিল্পী, বা পুরনো বলিউড সিনেমার প্রাক্তন বাঙালি চরিত্রভিনেতা থেকে প্রখ্যাত বাঙালি চিত্রশিল্পী কিংবা দুর্গাপুজো কমিটির প্রবীণ কর্মকর্তা সবাই কেমন যেন হিন্দি টানে এবং বেশ কষ্ট করে বাংলায় সাক্ষাৎকার দেন। হয়তো বহুদিন মুম্বই থাকতে থাকতে তাঁদের মাতৃভাষা এভাবেই আলোকিত হয়েছে। নিজের মুখের বাংলা ভাষা আইসক্রিমের মতো গলে গলে মিশে গেছে হিন্দি-মরাঠি-ইংরাজির সাথে। হালের জেন-ওয়াই প্রজন্ম না হয় ‘চলতি হাওয়ার পন্থী’, কিন্তু যাঁদের কথা বলছিলাম আর কি, তাঁরা বয়সে যথেষ্ট প্রবীণ।

যাপিত জীবন বড় বলাই। তারই মধ্যে নিরন্তর চাওয়া-পাওয়া, আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন দেখা প্রাত্যহিক জীবনশৈলীতে স্বপ্নপুরণের শেষ সিঁড়িতে পা রাখার অদম্য এক বাসনা। আর এই সমস্ত রকম চাওয়া-পাওয়ার চোরাবালিকে আশ্রয় করেই মুম্বইয়ের মানুষজন কাটিয়ে দেন তাদের বারমাস্য।

মুম্বইকে কখনও মনে হতে পারে অদ্ভুত রকমের কৃত্রিম, অতিমাত্রায় আদবকায়দায় আভিজাত্যপূর্ণ, প্রভুত হাল হকিকৎ সচেতন পেশাদারিত্বে ভরা ফাস্ট লাইফসহ যান্ত্রিক মহানগর। কথাটা বহুলাংশে সত্যি হলেও, মুম্বইয়েও অতি সাধারণ মধ্যবিত্ততা আছে। একেবারে মাটির কাছাকাছি দিন আনি দিন খাই গোছের জীবনও আছে। চূড়ান্ত আভিজাত্য-এর পাশাপাশি একেবারে অন্য ধরনের ঐতিহ্য নিয়েও বহাল আছে আর এক শ্রেণিজীবন।

মুম্বই নগরীয়ায় বাঁ চকচকে আশিয়ানার সাথেই প্রায় সহাবস্থান করে রয়েছে আরও একধরনের অন্য আস্থানা। মরাঠি ভাষায় যার পোষাকি নাম ‘চাল’ বা ‘চালি’ বা ‘খোলি’। ‘খোলি’ মানে ‘ঘর’। তিন, চার তলা বিশিষ্ট বাড়ি—যেখানে এক একটি তলে দশ থেকে কুড়ি পঁচিশটি পরিবার একত্রে ঘোঁষাঘেঁষি করে থাকেন। মুম্বই ও নভি মুম্বইতে এমন প্রচুর চাল রয়েছে। অলিতে গলিতে। একটিমাত্র কি খুব বেশি হলে দেড়খানা কুঠুরি ঘরেই পুরো পরিবারের মাথা গুঁজে নাম মাত্র থাকে। একটা ঘরেই শোয়া বসা রান্না। ওই ঘরেই একপাশে বাসনপত্র, গ্যাসচুল্লি, রান্নাবান্না। কোথাও আবার সাথে একচিলতে রান্নাঘরও থাকে।

শৌচাগার ব্যবহার করতে হয়ও নিয়ম মেনে মিলেমিশে। কারণ প্রতিটি ব্লক পিছু হয়তো তিনটি কি চারটি কমন শৌচালয়। পরস্পর মানিয়ে নিয়েই সেগুলো ব্যবহার করেন। তবু প্রতিদিন সাতসকালে খিঁচখিঁচ লেগেই থাকে। আবার ব্যক্তিগত মালিকাদীন শৌচাগার পেতে হলে খোলি-র ভাড়ার সাথে আনুপাতিক ৫০ শতাংশ বাড়তি ভাড়া দিয়ে নেওয়া যায়। কিন্তু তাও খুব সীমিত। নিজস্ব শৌচাগার থাকলে তাতে তালাচাবি বন্ধ করে রেখে দিলেই হল। তবু কখনও প্রতিবেশীদের আপদেবিপদে প্রয়োজনের স্বার্থে সেই তালাচাবি খুলে দিয়ে সাহায্যও করতে হয়। এ সমস্তই চাল বা খোলির নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার।

খোলির ঘরগুলির একটানা বারান্দায়, যেখানে রেলিং-এ ভিজে কাপড় শুকানো থেকে শৌখিন ফুলের টব, তুলসী গাছ, পোষা পাখির খাঁচা টাঙানো (প্রসঙ্গত হালের ‘বম্বে টকিজ’ সিনেমার দ্বিতীয় গল্পে নওয়াজ উদ্দিন সিদ্দিকীর পোষা এমু পাখিও বারান্দায় ঘুরে বেড়াতো),

মহিলাদের পরিনিদা-পরচর্চা, বাচ্চাদের খেলাধুলো, গল্পগুজব, চা পান সবই চলতে থাকে।

উনিশ শতকের গোড়ার দিকে এই সমস্ত ‘চাল’-গুলি নির্মিত হয়েছিল মুন্সই কটন মিল শ্রমিকদের কাজের পাশাপাশি বাসস্থানের সুবিধার্থে। এইসমস্ত চালে বসবাসকারীদের মধ্যে জীবনযাত্রায় দু-ধরনের বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। প্রথমত, একটানা লম্বা বারান্দা বা উঠোন ও লাগোয়া প্রতিটি ঘর হওয়ায় সেখানে ন্যূনতম গোপনীয়তাও থাকে না। হয়তো কোনও সামান্য কথাই গুজবের মতো দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে দেখা যায়। ঝগড়াঝাঁটি বচসা তো নিত্যনৈমিত্তিক লেগেই থাকে। আবার অন্যদিকে লক্ষণীয়ভাবে এও দেখা যায়, পাশাপাশি একই সাথে থাকতে থাকতে সুন্দর পারিবারিক সম্প্রীতি, একাত্মবোধ, ঐতিহ্যের আদানপ্রদান ও পরস্পরের সুখ-দুঃখের অংশীদার হওয়া এমনতরো সুস্থ সম্পর্কও গড়ে ওঠে ‘খোলি’-তে বসবাসকারী মানুষজনের মধ্যে। তাই চাল বা খোলির ঐতিহ্যবাহী একটা মূল্যবোধও আছে। নিত্যদিন ঝুটঝামেলার পাশাপাশিই একটা মানবিকতা ও দায়বদ্ধতার অদ্ভুত সুন্দর বাস্তবসম্মত মিশেল খুঁজে পাওয়া যায় চাল বা ‘খোলি’-র বাসিন্দাদের মধ্যে। যৌথ পরিবারের যে প্রচীন বনেনিয়ানা তা আজও খুঁজে পাওয়া যায় এই ‘খোলি জীবনগাথায়’।

মরাঠি অস্মিতার এক অবিস্মরণীয় নাম ছিলেন বালাসাহেব ঠাকরে, মুন্সই সুপ্রিমো। মরাঠি তথা সাধারণ মুন্সইকরদের কাছে ‘সরকার’—শ্রদ্ধা সম্মান ও মর্যাদার মানবজীবন। যিনি তাঁর ছিয়াশি বছরের জীবন পর্যন্ত হিন্দুত্ব ও মরাঠি স্বার্থকেই গুরুত্ব দিয়েছিলেন। বিতর্ক তাঁর পিছু ছাড়েনি। মহারাষ্ট্রের সমস্ত স্কুলকলেজে ইংরেজির সাথে মাতৃভাষা মরাঠি বাধ্যতামূলক, এমনকি মহারাষ্ট্রের সমস্ত দোকান বাসের নম্বর, রাস্তার নাম ও নম্বর—যাবতীয় সাইনবোর্ড মরাঠি ভাষায় লেখা করিয়েছিলেন। মুন্সইয়ে থাকার অভিজ্ঞতায় দেখেছি বালাসাহেবের মৃত্যুর খবর ঘোষণার সাথে সাথেই আক্কা মুন্সইয়ে স্তব্ধ হয়ে গেছিল জনজীবন। বালাসাহেবের দুরন্ত ক্যারিসমার আঁচ তখনও।

সমগ্র মরাঠাবাসীদের একটা চালু গৌরবোচিত বহুলপ্রচলিত শ্লোগান হলো—“জয় জয় মহারাষ্ট্র মানবা... জয় ভবানী জয় শিবাজী...”। মরাঠি শব্দ ‘মানবা’ মানে ‘আমার’। এদেশের ইতিহাসের পাতায়, বীরগাথায়, দুর্গের ভগ্নাবশেষে, মরাঠি জাত্যভিমানে আছে ছত্রপতি শিবাজী রাজে ভৌঁসলে। প্রতি বছর ১৯ ফেব্রুয়ারি যথোচিত মর্যাদার সাথে পালিত হয় শিবাজী জন্মজয়ন্তী। সারা রাজ্যে সরকারি ছুটির দিন। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে মরাঠি জনতার কমলা নিশান নিয়ে কখনো মোটরসাইকেল র‍্যালি বা পদব্রজে ‘জয়তু শিবাজী জয় মহারাষ্ট্র’ সমবেত ধ্বনিতে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। ভারি প্রাণবন্ত। রবিঠাকুর বললেই যেমন বাঙালি আবেগ-আতিশয্যে

উছলে ওঠেন। মরাঠাবাসী কিন্তু ভক্তিতে মনে প্রাণে দেবতাজ্ঞানই পূজো করেন তাঁদের বীর মরাঠা ছত্রপতি রাজেকে।

মুন্সইকরদের প্রাণাধিক প্রিয় দেবতা গণপতিবাগ্না। ভাদ্র মাসের শুক্লা চতুর্থী থেকে অনন্ত চতুর্দশী পর্যন্ত দশদিনের এই জাঁকালো উৎসবটি টুকে রাখার মতোই। গণেশ জয়ন্তীর উৎসবমুখর দিনগুলিতে পুরো মরাঠাবাসী ‘ফেস্টিভ মুড’-এ মেতে থাকেন। অসাধারণ মণ্ডপসজ্জা ও আলোকসজ্জায় এক একটি বিশালাকায় গণেশ মূর্তি পূজার্নায় মাতোয়ারা বারোয়ারি মহোৎসব কমিটিগুলি। গণপতিবাগ্নাকে যোলো উপাচারে শ্রদ্ধা ভজ্ঞাপন। প্রথমতো একুশটি নারিয়েল, একুশটি মোতিচূর, মোদক, একুশটি দুকো ঘাস, গুড়, মিহরি, লাল রঙ, ফুল ও মালা, ত্রিপত্র, লাল উত্তরীয়, রক্তচন্দন ইত্যাদি অর্ঘ্য নিবেদনে গৌরীনন্দন বন্দনা ‘জয় গণেশ জয় গণেশ জয় গণেশ দেবা, মাতা জাকি পার্বতী, পিতা মহাদেবা...’ মুখরিত সমস্ত উৎসব প্রাঙ্গণ ও মরাঠাবাসী।

মুন্সইয়ে খোদ মরাঠা দেশে যখন রয়েছে, উৎসবের কথাই যখন উঠল, তখন ‘হোলির’ কথাও সামান্য বলি। স্থানীয় কোঙ্কনী ভাষায় হোলিকে বলা হয় ‘সিম্গা’। এই ‘সিমগোৎসব’-কে ঘিরে ঐতিহ্য অনুসারে দোলপূর্ণিমার পর পঞ্চমী তিথিতে দোল খেলা পালন করার রীতি। সেজন্য এখানে দোল উৎসবকে ‘রাগপঞ্চমী’ উৎসবও বলা হয়। ‘সিম্গা’ হল সমস্ত শুভের প্রতীক। মুন্সইকররা এই দিন প্রথমে বাড়ির তৈরি মিস্তি, মূলত ‘পুরণপোলি’ অগ্নিদেবতাকে উৎসর্গ করেন। মরাঠি কচিকাচাগুলো হল্লোর করে রঙ খেলতে খেলতে বলতে থাকে—‘হোলি রে হোলি, পুরণটি পোলি’।

‘চলতি কা নাম গাড়ি’—বছর তিনেক মুন্সই পরবাস যাপনে এটা টের পাই। পেশার তাগিদেই বলো কি জীবিকা নির্বাহের তাগিদে, এখানকার জনমানসে সঙ্কলেই বেজায় ব্যস্তবাগীশ। ‘কমার্শিয়াল ক্যাপিটল’ পদবাচ্য মুন্সইয়ে সময়ের দাম নিক্তি মেপে। প্রতিটি সেকেন্ড-মিনিট-ঘণ্টার হিসেব কষে চলেন সবাই। যাপিত জীবন যে বড় বালাই। একটু আমোদে, স্বাচ্ছন্দ্যে, সুখে, আরও একটু বেশি বেশি করে ভালো থাকতে চাওয়া—মুন্সইতে দুরন্ত গতিতে ছুটে চলে আপাত-আধুনিক জীবন। তারই মধ্যে অগুনতি চাওয়া-পাওয়া, আশা-আকাঙ্ক্ষা। জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ে স্বপ্ন পূরণের শেষ সিঁড়িতে পা রাখাই যেন মূল চরিতার্থতা। এই চাওয়া-পাওয়ার হিসেব-নিকশের চোরাবালিকে আশ্রয় করেই মুন্সইয়ের মানুষজন কাটিয়ে দেন তাঁদের রোজনাচা দিনগুলো।

মুন্সইয়ের এই অতি সচেতন প্রফেশনলিজমে ভরা ফাস্ট লাইফ, প্রভূত আপডেটেড জীবনশৈলী, আদবকায়দায় অতি সফিস্টিকেটেড, কিছুটা যান্ত্রিক, কিছুটা কৃত্রিমতা, বাকিটা আবেগ, সৌভ্রাতৃত্বসুলভ মনোভাব, কর্মসংস্কৃতি এসব নিয়েই সদা প্রবহমান থেকে যায় মুন্সই। প্রবাসীদের কাছেও ‘মুন্সই মেরি জান’।

With best compliments of

Narayani Rice Mill

Paraj More, NH-2, Burdwan-713403

Sl. No. 152

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

সফল কেরিয়ার / স্বনির্ভরতা / বেসরকারি হাসপাতাল,
ল্যাব ক্লিনিকে (সরকারি/বেসরকারি) / কাজের সুযোগ ও স্বনির্ভরতা
বেশি খরচে বড় ডিগ্রির থেকে কম খরচে ছোটো কোর্সের বর্তমান সময়ে ভবিষ্যৎ বেশি

বর্ধমান রুরাল মেডিক্যাল ট্রেনিং অ্যান্ড ট্রিটমেন্ট সেন্টার

Joint Venture of Bardhaman-1 Community for Multipurpose Society

AFFILIATED TO

National Council for Vocational Training Govt. India & Technical Education & Training Govt. of West Bengal &
National Institute of Open Schooling, (NIOS), (NIOS) MHRD, Govt. of India

ভোকেশনাল কোর্সে

মেডিক্যাল/নার্সিং (Assist) ভারত সরকারের সহযোগিতায় (SDI-MES) স্কিমের পংবং সরকার দ্বারা পরিচালিত
ন্যূনতম যোগ্যতা : মাধ্যমিক/উচ্চমাধ্যমিক পাশ (Any discipline)



- নার্সিং ট্রেনিং অ্যাসিস্ট্যান্ট
- ডেন্টাল সেরামিক অ্যাসিস্ট্যান্ট
- রেডিওলজি টেকনিসিয়ান
- সার্টিফিকেট ইন কমিউনিটি হেলথ (NIOS)
- অপারেশন থিয়েটার (OT) টেকনিসিয়ান
- ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্ট্যান্ট
- হেলথ কেয়ার মাল্টিপারপাস ওয়ার্কার
- সার্টিফিকেট ইন হোমিওপ্যাথি ডিসপেন্সিং (NIOS)



- বর্ধমান : তিনকোনিয়া বাসস্ট্যান্ডের কাছে, গুরুদুয়ারার বিপরীতে, বর্ধমান পৌরসভার পিছনে PNB ATM-এর নিকট
মো. 9474784700, (0342) 2568580
- মেমারি : মেমারি দকদীঘি মোড় চৌমাথা থেকে জিটি রোড ধরে মেমারি কলেজ যেতে নায়েক কালীমাতা কোল্ড স্টোরেজের
বিপরীতে, পাল ভবন 1st floor, Ph. (0342) 2252621
- বোলপুর : শ্রীনিকেতন রোড, বোলপুর হাইস্কুলের নিকট, আস্থা কমপ্লেক্স 1st floor, ঢাকা মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের পাশে
Ph (03463) 252547
- আসানসোল : আসানসোল বাসস্ট্যান্ডের সামনে, ১০নং হটন রোড, রঞ্জন কেবিনের বিপরীতে গড়াই বিল্ডিং,
Ph. 9434834448, 0341-2280296

Sl. No. 114

অক্ষর বৃক্ষ
দিলীপ সাঁতরা

মাঝে মাঝে অক্ষরগুলো আমাকে ভাবায়
অক্ষরগুলো সাজিয়ে সাজিয়ে
একটার পর একটা শব্দ তৈরি করি
এককোষী প্রাণি থেকেই নাকি প্রাণের সৃষ্টি
আর অক্ষর বৃক্ষের মতোই
প্রাণ থেকে মহাপ্রাণের সৃষ্টি
অথচ আমরা জন্মবৃত্তান্ত জন্মান্তর মানিনা।

আমরা কত নির্দায় নিজেকে ভালোবাসি
অপরকে গুরুত্ব দিইনা এতটুকু
অথচ আমাদের দিনের রাতের
পালাবদলের মতোই জন্মান্তর হচ্ছে
শব্দগুলোই বাক্যে পরিণত হয়ে
আমাদের শিক্ষা দিচ্ছে শব্দ বিকাশের।

এমনি করেই ইন্টার পর ইন্ট সাজিয়ে হয় বাড়ি
আমরা ভুলে যাই ছোটো বড় অনেক
ঘর নিয়েই হয় কারখানা
সেখানেই শব্দের মতো অক্ষর বৃক্ষের মতো
অনেক হাত এক হয়ে সৃষ্টি হয় কাজ
আর সেই কাজই একমাত্র করতে পারে
সব কাজের সব সমস্যার সমাধান।

মানুষ-অমানুষ
দিলীপ কালিন্দী

কে যে মানুষ কে অমানুষ
বলা বড় শব্দ
মানুষ হোক বা অমানুষ
আছে তারও ভক্ত।
ভদ্রলোকের মুখোশ পরে
অভদ্ররা জগৎ ভরে
বাড়ি গাড়ি হাতের মুঠোয়
মগজ আছে বিদ্যা ভরে।
মানুষ বেশি অমানুষে
শোষণ শাসক চলছে হেসে
রাজনীতিরই যাঁতাকলে
মরছে মানুষ দেশে দেশে।

পাথর কথা
রামপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

বেবাক দাঁড়িয়ে আছে ঠায়
কালো কষ্টি পাথরে কোঁদা
শ্রীমতী সুবাসিনী কোঁড়া।
ভাঙা ঘর ভিটেতে ছড়ানো ছিটানো সব
মাঠে মাঠে বোরো ধান
সবই হয়েছে লুট; অনেকেই গ্রাম ছাড়া।

গ্রামের পর গ্রাম, শুধু দীর্ঘ শ্বাস
শ্মশান এখনো হয়নি, তবে
শ্রাবণে অজয়ে হাঁটে সমাসন্ন খরা।
দোতলা বাড়ির বাবু নেতারা
ছেলে মেয়েদের পড়াতে হবে
তাই, অনেকেই শহরে গেছে, পালায়নি ওরা।

পাবতী, বিলু, জামাই গণেশ
ঘনশ্যাম, চুড়কো টুডুরা সব জেলে আছে।
সবারই একশো দিন আছে, নেই শুধু ওদের পাড়ার।
লাঠি ঠুকে ঠুকে নিত্য সন্ধ্যায় আসে তবু নির্ভয়া বুড়ি,
মিসা কেটে মরদ মরেছে তার
দু'চোখে মশাল জ্বলে, অখণ্ড আঁধার।

অনুভব
নিগমেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

আমাদের সকাল নেই, ঢুকে গেছে রাত্রির গহ্বরে
আমাদের বিকেলের দিকে তেড়ে আসে
রাত্রির লোলিহা জিহ্বা, কখন ফেলবে গিলে
কেউ জানে নাকো
কিন্তু মধ্যাহ্ন ছিল আপন মহিমায়
আশ্চর্য আকাশ জুড়ে মিটিমিটি তারার বন্যায়
ঢেকে গেছে সব
ঢেকে গেছে সূর্যের দীপ্তি সুদর্শন চক্রের আড়ালে
তাই আজ এত গোপন আড়ালে আবডালে
ভ্রান্তির কৈতববাদ দেশে ও প্রবাসে

শিশুর শৈশব নেই, সামনে তার কাজের পাহাড়
নারীর নারীত্বটুকু হারিয়েছে অর্থের জঙ্গলে
বৃদ্ধ শুধু একা একা বন্দী বৃদ্ধাবাসে
স্বপ্ন দেখে অতীত স্বকালের ভেসে ওঠে
মৃতমুখ একান্ত প্রিয়র

কংক্রিটের অরণ্যে বসে কবি খোঁজে মৃত্যুর মহিমা।

নারী

তন্ময় ভট্টাচার্য

প্রেম... আগুন... নির্জনতা...
ধমনীর রক্তচাপ বেড়ে যাচ্ছে অসম্ভব
যেন টাইটানিক ধাক্কা মারছে হিমশৈলে।

জীবন নিয়ে উপদেশ দিয়েছ চিরকাল
আজ নির্জনতার কাছে আমার আত্মসমর্পণ
তবুও তুমি আগুনের কথা বললে।

পেয়ালা ভর্তি আগুন দিতে কি পারো
এইতো খুলছি একাকিত্বের বাস
নির্জনতার লাশ ভাসালাম জলে।

এদেশে মেয়েরা খবর বুলালে গাছে
এদেশে মায়েরা অপুষ্টিতেই বাঁচে
অথচ একই পার্ক স্ট্রিট দিয়ে চললে।

প্রতি একশোয় একজন তুমি অন্ধ
স্বাস্থ্য তোমার অদ্ভুত বিলাসিতা
বাঁচবে বলেই গুড়াপ-এ জায়গা নিলে।

থাক কামদুনি, থাক মধ্যমগ্রাম দূরে
শিবের লিঙ্গ গ্যালন গ্যালন দুধ থাক
তুমি তবু থেকো অগ্নিশুদ্ধ হয়ে।

নির্জনতায় প্রেমের আগুন ছুঁয়ে...

সহজিয়া

সলিল আচার্য

আমরা শত সহস্র জন
আর ওরা হাতে গোনা
মাত্র ক-জন
মাত্রা বুঝে যাত্রা করো
ধরো হাল কঠিন হাতে
পেছনো থেকে শিখতে হয়
আগুয়ানি গানের মেজাজ
ধ্বস্ত সময়ে ব্যস্ত সবাই
ভেবো না পাশে থাকেই

আমরা শত সহস্র জন
আর ওরা হাতে গোনা—
মাত্র ক'জন
মাত্র ক'জন
মাত্র ক'জন

এসো, প্রতিবাদের প্রাচীর গড়ি
শেখর অধিকারী

বিভাজন নয়, মনের মলিনতা মুছে ফেলার এই তো সময়—
রাস্তায় দেখ, দানবেরা শুরু করেছে উদ্দাম নৃত্য,
তাদের মুদ্রা ছুঁয়েছে আকাশ,
পৃথিবীর সবটুকু বাতাস শুষে নিয়ে
এই সব পিশাচেরা অটুতহাসি হাসছে এখন,
আমাদের বিপন্নতায় উল্লসিত ওরা রাজারও কৃপাধন্য!

বিভাজন নয়, মনের মলিনতা মুছে ফেলার এই তো সময়—
ভেবে দেখ, ন্যায় বিরুদ্ধ রাজা সুরক্ষিত রাখতে চান সিংহাসন
দানবের পেশী আত্মফালনে, সুকৌশলে তাই
আমাদের করেছেন খণ্ডিত
বর্ণ বিভাজনে ছত্রখান আমরা প্রতিবাদহীন, মুক-বধিরের মতো
সর্বসংসার, তথাপি অদৃশ্য টানাপোড়েনে অবিরাম ক্ষতবিক্ষত!

মানুষের জন্যে এই দানবারণ্যে এসো তাই প্রতিবাদের প্রাচীর গড়ি,
ছিন্ন করি অদৃশ্য পর্দা, সব নদী মিলিত হোক, সব জলধারা,
মিলিত প্রতিবাদের অনিবার শ্রোতে চূর্ণ হোক রাজ অভিপ্রায়,
স্তব্ধ হোক দানবের দুর্নিবার মৃত্যু, স্তব্ধ হোক ছংকার,

এসো মলিনতা মুছে ফেলি হাতে হাত ধরি সবাকার।

কবে আসবে সে

উজ্জ্বলকুমার ঘোষ

আমি আকাশ
অপেক্ষা শুধু বৃষ্টির জন্য
তাপ উত্তাপে ফুটিফাটা হৃদয় নিয়ে
শুধুই বসে থাকা।
কত মেঘ আসে
দেখা দেয় বার বার নানা সাজে
গর্জন আর ঘূর্ণিঝড়ে উড়ে যায়
পরক্ষণেই সব ফাঁকা।
অনেকে বলে ঠাণ্ডা হতে গেলে কিছু কর
চেষ্টা করেছে
বট গাছের নিচে, লাইন হোটেলের খাটে
হাইস্পিড বাইকের পিছন সিটে
কোথাও কিছু নাই।
তবুও বসে থাকা
খরা কাটিয়ে করে আসবে সে
সাদা নিশান হাতে সমঝোতার পথে
শুধু তার অপেক্ষায়।

কে জানে আমার মধ্যে কে আছে
কামাখ্যাচরণ মুখোপাধ্যায়

এখন কবিতা লেখা খুবই কঠিন,
কেননা শব্দ ছাড়া কবিতা হয় না—
আর শব্দরা এখন অসতী হয়ে যাচ্ছে।
বন্ধুত্ব, ভালোবাসা, দয়া, মায়া, মমতা—
তখন অন্যের ঘর করছে,
শব্দরাও এখন বেশ্যামাগীর মতো
যাকে তাকে দেহ দিচ্ছে।
আমি কাউকেই মেনে নিতে পারছি না
অথচ আমার কবিতা অনেক ঢাউন্স ঢাউন্স পত্রিকা
ছেপেছে, কিন্তু তাও আমার ভালোলাগে নি।
আমি জানিনা কে আমাকে কুরে কুরে খাচ্ছে—
আমি ক্ষয়িত হচ্ছি, নিন্দিত হচ্ছি,
তবুও গতানুগতিক হতে পারলাম না—
—কে মানে আমার মধ্যে কে আছে?

নীলাঞ্জন তুমি
সুমিতা মুখোপাধ্যায়

নীলাঞ্জন তুমি কি সত্যিই—
ভালোবেসেছিলে তাকে
গোলাপি ওড়নায় শরীর ঢেকে
সে বসেছিল তোমার পাশে।
তোমার হাতের নরম আঙুল—
তার মসৃণ চুলের ফাঁকে।
ভালোবাসার ইচ্ছে ডানা তখন
তার আর তোমার অন্তরের, সমস্ত বাঁধন কেটে দিয়েছিল।
ক্রমশ সেই ভালোবাসায়—
দূরত্ব এনেছিল অর্থাহঙ্কার
আকাশ মেঘলা করা ভালোবাসার দিনে—
নীলাঞ্জন, তুমি জানিয়ে দিলে তোমার অক্ষমতা।
অন্য নারী তখন তোমার স্পর্শ সুখ
ভাগ করে নিয়েছে তার থেকে।
আর অসহায় সেই মেয়ে, একাহতে—হ...তে
দেয়ালে পিঠ ঠেকেছে তার।
তার জীবনে এখন ফুল ফোটান শব্দ শোনা যায় না।
তুমি সুখে অপহৃত আনন্দোলোকে
জীবন কাটাচ্ছ নীলাঞ্জন।
আর সে—আনকোরা সেই ভালোবাসার দিনগুলোর কথা মনে করে,
গঙ্গার বয়ে যাওয়া স্রোতে
জ্যোৎস্নার ওঠা পড়া গুনছে।
আর সেলাই মেশিনের ঘরঘর—ঘর—ঘর
আওয়াজের মাঝে
জীবনের মানে খুঁজে চলেছে।

অমরত্ব

শম্ভু ঘোষ

[বিনয় কোণ্ডার স্মরণে]

লড়াইয়ের মাটি ভিজেছিল কত ঘামে
গরিব কৃষক খেতমজুরের সংগ্রামে
বিপ্লবী দাদার আদর্শে আশ্রুত
ভোগবাদের বাসনা ছেড়ে দ্রুত
সংগ্রামের ময়দানে ছয়টি দশক
অস্ত্র শানিয়ে চলে শাসক-শোষক
কারাবরণ আত্মগোপন এই তো জীবন
আক্রান্ত ক্ষয় রোগে লড়াই মরণপণ।
অগ্রজের শতবর্ষে চলে গেলে তুমি
শোকবিহ্বল সারা বঙ্গের ভূমি।
গ্রামশহরে আজ ভরেছে জঞ্জাল
আকাশেতে ওড়ে শত শকুনের পাল।
রক্তপতাকা হাতে পুরো পরিবার
অমরত্ব পেলে কমরেড বিনয় কোণ্ডার।

মোমের স্বেদবিন্দুরা
নির্মল নিয়োগী

গীর্জায় ঘণ্টাধ্বনি মসজিদে আজান
মন্দিরে কাসর-করতাল
মোমের আলোরা অন্ধকারে নেমে আসে
ছুঁয়ে আবছায়া নাবাল—।

শব্দদের সন্ধানে সন্ধানে
হারানো নিঃশ্বাসের মুক্তি কাম
উত্তপ্ত মোমের স্বেদবিন্দুরা হাঁটে
দৃপ্ত মুষ্টিতে অবিরাম।

কথা ছিল না, এ কেবল
যন্ত্রণা প্রত্যয় কাহিনির ভিতর
প্রবঞ্চনার আহ্বাদি সুরে—
কেন তবে বিলাপের নামাস্তর?

অবশেষে শুনি আত্মার হাসি
যেন তাঁর বিকলাঙ্গ রূপলাস্য
নাবাল অন্ধকার সাজায় আলপনা
কখন হারায় জীবন-দ্যুতির ভাষ্য।

প্রাণ অতিক্রম করেছে বায়বীয়তা
বিলুপ্তি লিখে যতিয়ান অবনীতে—
এ ধ্বংসের হিসাব লিখে যাব কোথায়
কেমন করে কোন্ স্বরলিপিতে!!

আক্ষেপ

সুজাতা সান্যাল (চট্টোপাধ্যায়)

যদি পারতাম পৃথিবীর দুঃখের দিনগুলো
ভাসিয়ে দিতে—যদি পারতাম ঘরে ঘরে
হাসি আর আনন্দের ভরা কলস উপুড়
করে দিতে—পৃথিবীর বড় দুঃসময়
চারিদিকে পিশাচের নগ্ন নৃত্য অটুতহাসি—
বুকের গভীরে ভয় আর আশঙ্কা
থরথর কাঁপে—এর মাঝে আমাদের
পরের প্রজন্ম তার রূপ-রস-গন্ধ
নিয়ে কি বিকশিত হতে পারবে!
গাজার সেই শিশুরা কী দোষ করেছিল—
শত্রুর আঘাতে তাদের অমল শৈশব
হারিয়ে গেল, শর্মিলা চানুর যৌবন
কেন অকাল বার্ষিক্যে শেষ হল, কেন
শেষ হল কামদুনির রঙিন কিশোরী বেলা?
সব প্রতিরোধই আজ নিষ্ফল হতাশায়
ভরা—হে ঈশ্বর, বলে দাও তোমার
সৃষ্টির পথ এত কটকাকীর্ণ কেন,
কেন হারিয়ে গেল বাঁচার অধিকার!

মধ্যাহ্নে নিশীথের অন্ধকার
উদিতনারায়ণ সিংহ

আরপিএফ-এর টহল—বোমার ধোঁয়ায় অন্ধকার
বর্ধমান—এক সাবেকি স্টেশন চত্বরে।
হঠাৎ শোনা গেল গুলির আওয়াজ
ধাবমান স্ট্যাকো ফোর্স, র‍্যাফ, সঙ্গে প্রেস, গা ছমছমে ভয়ে
নিজস্ব একান্ত রাজকার চেনা পরিবেশ। পাল্টে গেল।
লোকেরা পালায় রুদ্ধশ্বাসে, পুলিশের দৌড়
আনাচে-কানাচে গুম গুম আওয়াজ।
শোনেনি, অনেকদিন বর্ধমান।
অক্টোবরে, শীত নেই। তবু বোমার গরম যেন।
মধ্যাহ্নেও নিশীথের অন্ধকার।
এরা কারা? নাম ওঠে সমাজবিরোধী।
শুরু বিশ্ববিদ্যালয়ের আঙিনা থেকে।
নিয়োগে নাকি অনিয়ম। তারপর, পরপর ক-দিন।
শুনশান শহর, প্রাচীন শহর, আমাদের গর্বের শহর।
স্কুল, কলেজ, দোকানপাট, বাজার বন্ধ।
আনাগোনা নেই মানুষের, গুমোট, ভয়াবহ।
জীবন যেন সাময়িক থমকে গেছে।
কেন? কার অপরাধ? আমার, আপনাদের, আমজনতার?
কলঙ্কের দাগ কে মুছবে? সাহস হবে?
কারও! কী বলেন, নগরবাসী!
গর্বের মাথা হেঁট একেবারে।
রাজনীতির নোংরা শ্রাব্য বন্ধুত্বের গর্ভে
আমাদের বর্ধমান।

ইচ্ছাপত্র—এক

পার্থ চৌধুরী

মেঘবালিকার চোখে
মন খারাপের জল
তোমায় দিলাম।

সায়রের বাঁধাঘাট
চাঁপা ফুলগাছ
মাথবীর লতা
তোমায় দিলাম।

স্নান হয়ে ঘুণে ধরা
মলিন দুপুর
চিলেকোঠা ঘর
তোমায় দিলাম।

ঘুম-চুরি হয়ে যাওয়া
বেইমান রাত
বালিশেতে আড়মোড়া
তোমায় দিলাম।

ঘুম ভেঙে জেগে ওঠা
মহালায়া ভোর
ফুলচুরি খুনসুটি
তোমায় দিলাম।

ছকভাঙা ধারাপাত
পায়ে পায়ে বড়ো
প্রখর মিছিল
তোমায় দিলাম।

চুপিচুপি কেঁদে মরা
যত প্রতিবাদ
ছাইচাপা বাসনার
মরে যাওয়া স্বাদ
তোমায় দিলাম।

দিশেহারা সময়েও
পথ খুঁজে ঘোরা
ছায়াহীন...

তবু সাথে থেকো...
আমার শহর।

তোমার পথের বাঁকেই
মানুষ চিনেছি।
আগুনের ফুলঝুরি
আবার কিনেছি।।

শ্যামরাই
দেবাশিস প্রধান

মাথার ভিতর রাত্রি বুঝি নামিয়ে দিয়ে ছটফটাচ্ছে খুব
এখন খোঁজো রোদ্দুরের স্রোত! কে যে কখন দখল করবে স্বপ্নকুর্শি...
গাঁটছড়া না বাঁধাই ভালো—হে শ্যামরাই, প্রতিকোণে
আঁফর ডাঁফর শাঁস। শিখিপাখা ধুলায় লুটায়, লেখো শ্যাম
অন্যমুখ কথা। ভেতরে ভেতরে কেটেকুটে আঁধার দ্রাঘিমায়
খড়ি দাগ স্লেটে, তাহলেই এসপার ওসপার ঘটক বিচ্ছিরি কিছু
আদার ব্যাপারী হয়ে জাহাজের গঙ্গো হলো ঢের। বড়বাবা,
ছোটবাবাদের বৈঠকী আড্ডায় এবার নতুন কিছু ছপাল মারুক।
আঁধার ছিঁড়ে ছিঁড়ে এসময়ে প্রচ্ছদে আঁকা হোক তুমুল ওড়ার বাসনা
নম্র নীল ওড়ার উসখুস, আলোর চিবুক ছুঁয়ে, চুম্বনের গন্ধে
ভেসে যাক আমাদের অনিবার্য কবিতার পাতা ও পরব!

আত্মকথন প্রভাত ঘোষ

এমনি আঁধার দিন গাঢ়তর অন্ধকার রাত্রি নামলেই
গৃহে আছি অন্তরিন, প্রায় প্রৌঢ় সদ্য তিরিশেই,
ভাবি আর চলবেনা, তবু দেখি কেটে যায় দিন—
অন্যত্র অনূর্বর, গৃহে শুধু সংখ্যা বাড়ে
এক দুই তিন।

প্রত্যহ পরাস্ত হই, মুক্তি খুঁজি ব্যক্তিগত সুখে,
নিজেকে প্রবোধ দিই, ‘আমি নই পলাতক সৈনিক প্রবর’
তুমুল বিতর্ক চলে অফিসে চায়ের ভাঁড়ে লড়াই জবর।
আবার ফাইল কালি, দরজা বন্ধ হওয়া স্থলিত চরণ—
তখন সবাই একা : সারিবদ্ধ মানুষের খোঁজ কে রাখে!

মধ্যরাত্রে ঘুম ভাঙে কালোমুখ করে যায় সতর্ক আইন
গলির স্তব্ধতা ভেঙে জেগে ওঠে আত্নাদ অনার্য প্রাচীন
সে শব্দ সি ভয় আনে : ভাবনার মুখে থুথু
জানালায় হাত—
সমর্পিত আত্মসুখ চার দেয়ালেতে শুধু দীর্ঘ হয় রাত।

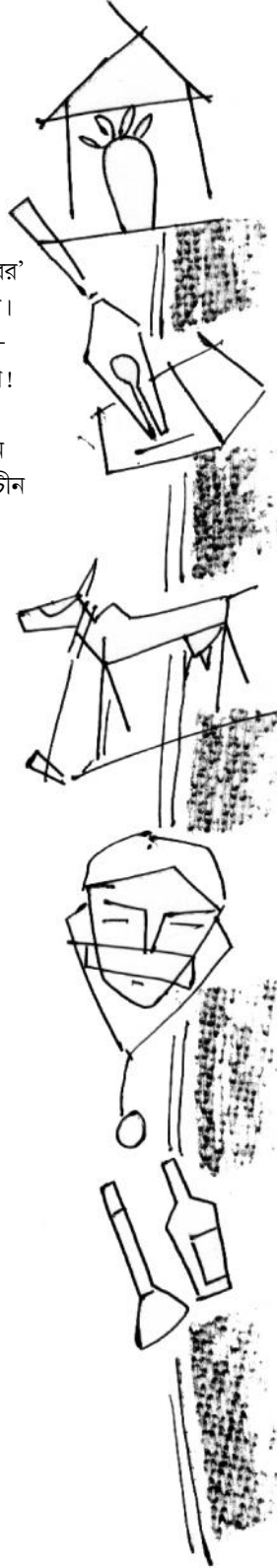
পার্ক সার্কাসের বস্টিটা রীতা বসু (ধর)

পার্ক সার্কাসের বস্টিটা আজ আর নেই
কোথায় হারিয়ে গেল, আগুনের শিখায়।
পার্ক সার্কাসের বস্টিটা... আর নেই।
ওদের ছোট্টাছুটি, হাহাকার, সরকারি সাহায্য
কে শোনে আর, ওদের কান্নায় বাষ্প হয়।

ওরা তো জানে না ভেদ, হিন্দু-মুসলমান কিংবা
খ্রিস্টান, বাঁচার আছে সম অধিকার।
দুমুঠো অম্লের তাগিদে, এ শহরে বাস
শ্রমজীবী মেহনতি মানুষ, প্রয়োজনে ওরা
সবার, সেই দলাদলি, যে-ই ডাকে ছোট্টে।

একটা বাসস্থান, দু-মুঠো অম্ল, পোশাকের
নেই বাহার, তবু ওদের উপর কেন অত্যাচার।
পুলিশ, রাজনীতির হাজার ঝামেলায়
দৈনিক কোনো-না-কোনো গারদে রক্তবমি হয়
বুকের পাঁজর ভেঙে তবু ওরা অস্ত্র গড়ে।

সেই অস্ত্রের ধারে নোয়ায় আকাশ
কখনো কখনো আসে অগুনতি খড়কুটোর
মতো, মনোবল, জড়ো হতে থাকে
প্রতিবাদী শক্তি, একতার হেইয়া হো গান।
পার্ক সার্কাসের বস্টিটা আজ আর নেই।



লিমেরিক দেবেশ ঠাকুর

এক.

পদ্য পড়তে এদিক ওদিক যেতেই তো হয় নিরন্তর
লোকে বলে, ‘আপনি কি ভাই রবিবাবুর বংশধর?’
‘ঠাওরে নিলেন আপনি কিসে
তিনি আমার জ্যাঠার পিসে?’
বলেন, ‘দাড়ি পদবিতে মনে হচ্ছে ঠাকুর-ঘর।’
‘জোড়াসাঁকো নয়রে দাদা, আমার আদত পাকুড় ঘর।’

দুই.

কালিদাসের কাব্যে আছে যৌনজীবন বর্ণনা
তুমি লিখলে ‘অবসিনেটি’
তোমার ভাবে কোন সিন্ এটি!
গিম্মি ভাবেন, মধুক্ষরা
এ কোন জনা? বিশ্বাধরা?
তোমার লেখা পর্ণেগ্রাফি। কালিদাসের ‘পর্নো’ না?

তিন.

যণ্ড ছেড়ে রাখাই ভালো, বাজারে থাক ছাড়া-bull
দুগ্ধবতী গাই-এর ভিড়ে
নীতিবাগীশ চ্যাপ্টা চিড়ে
যণ্ড জনন। সৃষ্টি হবে।
শিল্প হবে। কৃষ্টি হবে।
যণ্ড শিবের অনুরত। উন্টে দিলেই আরা-bull.

চার.

ডোম দেখলো পোস্টমর্টেমে লাশের মেরুদণ্ড নাই
ডাক্তার কয়, ‘বঙ্গরতন।
ফালতু নাকি তোমার মতন!
বুদ্ধিজীবী। সুশীল ইনি।’
‘তাই মনে হয় চিনি চিনি।’
‘মেরুদণ্ড লিঙ্গে থাকে। পিঠে হাড়ে খণ্ড নাই।’

পাঁচ.

প্রতিদিন তো হুইস্কি খাও, মাঝে মধ্যে ‘রম’-ও নিও
দেখবে সুবোধ-বালক জীবন হয়ে উঠবে রমণীয়।
যে গাছেতে বাঁধলে কাছি
আমড়া? নাকি আমলাগাছি
এ্যাঙ্গলিন যা গিললে সুখে আজকে সবই রমণীয়!
অবোধ-বালক যা করে তার অনেক কিছু ক্ষমণীয়।

মেঠো পথের পথিক অনিল মাইতি

ব্রিটিশ দস্যুদের
কালাপানির অন্ধকার কারাকক্ষে
পেয়েছিলে জীবনের মন্ত্র
সর্বহারার জীবন দর্শন।
ব্যক্তি জীবনের সমস্ত স্বাচ্ছন্দ্য
পরিত্যাগ করে
পথ চলা শুরু হয়েছিল তোমার
মেঠো পথে
সর্বহারা মুক্তির সংগ্রামে।
যেখানে বন্ধ্যামাটির বুক চিরে
কালো কালো মানুষদের
হাতের জাদুস্পর্শে
ফলে সোনার ফসল,
সেই সোঁদা মাটির গন্ধে
শ্বাস নিয়েছ আশ মিটিয়ে।
ঘামঝরা মানুষদের
স্পর্শ নিয়েছ বারবার
কাছে টেনে—আপন করে।
উত্তাপ দিয়েছ তাদের,

উত্তাপ দিয়েছ আমাদের।
মাটিকে ভালোবেসেছিলে মায়ের মতো
যারা লুট করে অপরের শ্রম,
লুট করে ঘাম বারানো ফসল,
সেই জমিচোর লুটেরাদের বিরুদ্ধে
সংগ্রামের ময়দানে
তুমি ছিলে পদাতিক সেনাপতি।
তোমার কাছেই শিখেছি
শত্রুকে ঘৃণা করতে না পারলে
মিত্রকে আপন করা যায় না,
ভালোবাসা যায় না।
তোমার নিভীক পদচারণা,
বজ্রকণ্ঠে তোমার সংগ্রামের ডাক
শত্রুর হাড়ে কাঁপন ধরিয়েছে বারে বারে,
প্রেরণা জুগিয়েছে আমাদের।
তোমার সেই উদাত্ত কণ্ঠের ঘোষণা—
ভীরুতা মরে হাজারবার,
সংগ্রামী মানুষ মরে মাত্র একবার
যা সৃষ্টি করে ইতিহাস।

শত্রুর প্রতি সীমাহীন ঘৃণা—
আমাদের বুকের মাঝে
আগ্নেগিরির গলিত লাভা
বিস্ফোরণের অপেক্ষায় যেন
প্রহর গোনে,
চঞ্চল ধমনিতে ওঠে বৈশাখী ঝড়।
পায়ে পায়ে অতিক্রান্ত শতবর্ষ।
আজ তুমি নেই আমাদের মাঝে,
তবু তুমি আছো
আমাদের চিন্তায়, মননে, সংগ্রামের ময়দানে
অনির্বাক দীপশিখা হয়ে
সংগ্রামের মশাল হাতে।
তোমার মৃত্যু নেই কমরেড
তুমি মৃত্যুঞ্জয়।
যেখানেই বাঁচার সংগ্রাম,
যেখানেই প্রতিরোধ,
সেখানেই অন্তরের গভীর থেকে
উচ্চারিত একটি প্রিয়নাম
কমরেড হরেকৃষ্ণ কোঙার...

যদি রাজি থাকো
দীপা বিশ্বাস

যদি রাজি থাকো সওয়ার হতে বাঘিনীর পিঠে
তবে চলে এসো আমার সঙ্গে
তোমাদের নিয়ে যাব গিরি গুহামুখে
সাপিনীরা কিলবিল করে, পাহারা দেয় ওই গুহামুখ

যদি রাজি থাকো ছুটে যেতে অশ্বপৃষ্ঠে পাথুরে রাস্তায়
যেখানে তোমার আর কিছু নেই, শুধু অন্ধ ছুটে চলা
তবে দেখাব তোমাকে আমার মেরুন জঙ্ঘা
যার স্বপ্ন ছুঁয়ে দেয় চৈত্রের নির্জন রাত

যদি রাজি থাকো পাবকে প্রক্ষালন সারতে
ঈশানে তুমুল মরুঝড় নৈঋতে মেঘ
সামনে দস্যুরানি, তবে চলে এসো
এবার তোমার আর কিছু নেই শুধু অন্ধ ছুটে চলা।

আবেগ
সমর সাহা

আমার আবেগ শুধু খোঁজে ক্ষুধায় দুমুঠো ভাত,
আমার আবেগ খোঁজে তাই বেকারি ঘুচানো হাত।
আমার আবেগ পেতে চায় প্রিয়ার বুক স্পন্দন,
আমার আবেগ যদি পায় মাথা-গোঁজার অঙ্গন!

তবে কেন সেই আবেগগুলো কানাগলিতে ঘোরে,
লালসা ভরা বেহায়া প্রতীক পথের মোড়ে মোড়ে!

অন্ধ-আবেগ কেড়েছে আমার শান্তি সুখের ঘর,
অন্ধ-আবেগ লুটছে আমার প্রিয়ার সমাদর।
অন্ধ-আবেগ ছাঁটছে আমার প্রাপ্য কাজের হাত,
অন্ধ-আবেগ ছিনছে আমার মোটা চালের ভাত!

তাইতো আজ ভাঙতে হবে ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমাজ,
আঁধার ছেঁড়া রক্তিম সূর্য আনব সবাই আজ।

চোখ নিলয় মিত্র

আদেল বাড়ি আছো তো!

আদেল

আমি এসেছি

আমি, স্ববোধ নিয়ে ফিরে এসেছি তোমার কাছে

বাইরে এসো আদেল

গানের মতো গুড়ো গুড়ো তোমার হাসি নিয়ে এসো।

আদেল!!

মানুষটা একবার দুবার তিনবার

অনেক অনেকবার

উষ্ণকণ্ঠে চিৎকার করে ডাকলো

আদেল!!

আলোহীন গাঢ় অন্ধকার থেকে

কেউ কোনো সাড়া দিল না

ঘাড়গোঁজা অন্ধকারে শুধু পাতা ঝরার শব্দ।

সব শিরা উপশিরা গলায় জড়ো কোরে

মানুষটা ফের চিৎকার করে ডাকলো

আদেল!!!!



যে চোখ দুটো আমি হারিয়েছিলাম আদেল

তাদের খুঁজতে খুঁজতে...

হারিয়ে ফেলা নদী, জখম পাহাড়,

খুবলে খাওয়া বনাঞ্চল,

এক যুবকের লাশ, এক মায়ের লাক্ষিত শরীর,

এক পিতার যন্ত্রণা, পথের ধুলায় পড়ে থাকা ধর্ষিতা মেয়ে

পাঠিয়ে দিল তোমার কাছে।

আদেল তুমি,

তুমি তোমার বুকের মধ্যে যত্ন করে আগলে রেখেছো

আমার দোমড়ানো মোচড়ানো চোখ দুটোকে।

শুদ্ধসত্ত্ব চেতনায় আমি ফিরে এসেছি

অনেক লোভের দরজা পেরিয়ে,

ফিরিয়ে দাও আদেল

এবার ফিরিয়ে দাও আমার চোখ দুটো

না, কোনো সাড়া নেই, শব্দ নেই

শুধু স্তব্ধতার গুচ্ছ আবর্তন।



ছেঁড়া ফাটা একটা পাখিঘুড়ি যেন ডানা মেলে

ছাদের শিকটায় উড়ছিল আপন মনে

এক দঙ্গল কুকুর দখল নিয়েছে বারান্দা

নিশ্চিন্তে শ্বাস প্রশ্বাস ফেলছে বিষাক্ত পাথেনিয়ামের ঝাড়

ভাঙাচোরা জানাল দরজা

একটা মহানিম অসংখ্য বীজের নতুন জাজিম রেখেছে পেতে,

মানুষটা হাঁটু মুড়ে বাড়িটার দিকে তাকিয়ে

গুণ্ডিয়ে উঠল প্রার্থনার ভঙ্গিতে, আদেল

আমি জানি, তোমার হৃদয় নীলকান্ত মণি

জানি, তোমাকে একবার ছুঁতে পারলেই

বিশ্বের নিরেট আঁধার থেকে আমার চোখ

মুক্তিতে উৎসিক্ত হবে।

জানি সংরক্ত লোভ, দোলাচল, বোধের ভ্রান্তি

বিনাশী সময় কেড়ে নিয়েছিল চোখের রোদ

সম্পর্কগুলো ভেসে গিয়েছিল নোনা জলে।

সর্বস্ব হারিয়ে বেঁচে আছি আমি

শুধু বাঁচার নিয়মে।

ফিরিয়ে দাও আদেল

স্বচ্ছ শুদ্ধ দৃষ্টি ফিরিয়ে দাও

আমার চোখ দুটো

ফিরিয়ে দাও।



এক যুবক

দুহাতে তার ভরস্তু নদী, দুপায়ে শস্যভূমির কাদা জল

এক বুক রোদের কৃপাণ

সূর্যরথ থেকে নেমে হেঁটে এলো মানুষটার কাছে

তুলে ধরল তাকে,

হাতে হাত বেঁধে নিয়ে এলো

সম্পন্ন বাতাসে।

ঐ যে দ্যাখো

ঐ শিউলি গাছটার ছায়ায়

আদেল অপেক্ষা করছে এই মাটিতে

আদেল।

ওর বুক দু-চোখ ভুবিয়ে ছুঁয়ে থাকো

ফিরে পাবে শুদ্ধতা

এসো।



সোনালী গৌরহরি দত্ত

সোনালী প্রস্ফুটিত হবার আগে ঝরে গেল

কী কারণে তা আজও শয়নে স্বপনে ভাবি

সোনালী ছিল বড়ই জেদি একরোখা

তবে পড়াশুনায় খুবই ভালো ছিল

অনেক আশা ছিল তাকে নিয়ে

আজ প্রায় দু বৎসর হতে চলল

সোনালী আমাদের ছেড়ে চলে গেছে

যেখানেই থাকুক সে যেন ভালো থাকে

শান্তিতে থাকে। এই কামনা মনের

নিভৃতে সব সময় করি।

প্রবেশক

বীরেন্দ্রনাথ দাস

ইচ্ছা ছিল,
বলি সুকান্তের ভাষায়,
ইচ্ছা ছিল,
বাঁচি জীবনানন্দের আশায়।
আমারও ইচ্ছা হয় বলতে,
তাদেরও পথ ধরে চলতে।
বলতে ইচ্ছা করে কভু,
‘এবিশ্বকে শিশুর বাসযোগ্য করে যাব,
তারপর হব ইতিহাস...।’
আবার কখনও বলি,
‘আবার আসিব ফিরে—
ধান সিঁড়িটির তীরে,
এই বাংলায়...।’
কখনও চাঁদ দেখে বলি,
‘ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়,
পূর্ণিমা চাঁদ যেন
ঝলসানো রুটি...।’
দিনেশের ভাষায় ভাবি,
‘কাস্তেটা ধার দিয়ে বন্ধু
...এযুগের চাঁদ হল কাস্তে।’
নজরুলের মতো আমি,
হয়ে উঠি বিদ্রোহী।
কখনও রবির ভাষায় করব কাব্যপাঠ।
কখনও কাবুলিওয়ালার সাজব।
কখনও হব সবুজ দ্বীপের রাজা
কখনও হব, টিনটিন ফেলুদা,
কখনও শ্রীকান্ত হব,
কভু নীরাকে পাব।
এভাবেই বাংলা ভাষা তো
মানুষের বিবেক,
শিশুর জীবন,
কিশোরের খেলা,
আর আমার—
বাল্যবেলা।

গান

দীপক হালদার

গান কি ধ্বনিত হয় মাত্র, বাজায় না?
এমত প্রশ্নে চোখের সবগুলো প্রত্যয় মেলে
জ্বলে দিয়েছিলে সদরের আলো,
পথরেখা তাতে কি ততটা উষ্ণ হলো! নাকি গ্রাহ্য সীমায়
দ্রিদিম ঝংকার শেখালো নগর বনতল!
আর, অবিলম্বে রাস্তায়ও হলো যুগ্ম গণ্ডগ্রাম,
প্রতিবাদ টিকলো না।

চাওয়া পাওয়া

তপন পাল

চাই; কিছু চাই,
চাই বলেই কিছু পাই।
সর্ব কর্মের পশ্চাতেই চাওয়া;
অন্ধের মতো ধাওয়া—
অথবা লোভের ডিঙি বাওয়া।
ছুটে আশার পিছু পিছু,
পেয়ে যাই কিছু না কিছু।

গাছ লাগালে ফল পাই
মাটি খুঁড়লে জল পাই
দুধ খেলে বল পাই
বেশি খেলে মল পাই
ভালোবাসলে ছল পাই।
শেষ মেশ সব ছাই।
তবুও বাঁচতে চাই—
কিছু না কিছু তো পাই।

সময় কাটে নিজের কাজে,
অন্যের জন্য ব্যয়, সে বাজে।
নিম্নক বলে, ‘তুই স্বার্থপর;
অন্যের জন্য একটু কর।’
পরের জন্য কর্ম করা;
তাও বোধ হয় স্বার্থে ভরা।
সেবার কাজে পুণ্য পাওয়া,
ঈশ্বর ধ্যানে মুক্তি চাওয়া।
যা কিছু পাওয়া—
সবেতেই চাওয়া।



পাখি

বিনয়েন্দ্রকিশোর দাস

মহানীলে নীড় গড়া
আসল পাখির কাজ।
সব শাবকদের মমতা বয়ে
তারা শীত, গ্রীষ্মে
উঁচুতে, আরো উঁচুতে ওড়ে
পেছনের কান্না, দুঃখ ভোলে না।

মহানীল স্বর্গের স্বাদ পেয়ে-ও
বেশি অক্লিঞ্জন নিয়ে
পাখি ফেরে মাটির কাছে
ক্ষুধার্ত, স্বপ্নে-রাঙা অনুজদের কাছে।
তাই তারা দায়বদ্ধ পাখি।

রঙিন বেলুন, তুবড়ি, ফানুস
ওড়ে ছজুগে, লক্ষ্যহীন তারা।
তাদের জগতে শুধু আত্মস্বার্থ
তাদের শুধু ষোলআনা সুখ লোটা।
তাদের অভিধানে অন্যদের
সুখ-সমৃদ্ধি দেবার দায় নেই।
তাই তারা পাখির মতো
অনেক উঁচুতে থাকার মোহ ছেড়ে
আটপোরে গাছে নীড়
বাঁধে না, বাঁধতে পারে না।
নীড়ে-ফেরা পাখিরা
লোটে চূড়ান্ত জয়
সেই পাখিরা হারে না।

বৃষ্টি

সুনন্দ অধিকারী

জনলায় কড়া নাড়ছে বৃষ্টি
যেতে কাছে
হেসে বললো মিষ্টি, ‘এসো নামো
এখনও এত কী ভাবছো!’

আমি খুলে দিলাম জনলা
বাড়িয়ে দিলাম হাত
আজ না হয় হাতে
হাতটুকুই থাক।

বোধ হয় ব্যথা পেল মনে
তখনই বিদ্যুৎ তখনই বজ্রপাত—
এবার বললাম আমি, ‘এসো
শব্দ দিয়ে এবার নীরবতাকে বাঁধি।’

কমে এল তোড়
ফিরে আসল ছন্দ
যেন পৃথিবীর সব নারী
সাম্যবাদের জন্য হাঁটলো।

তোমার কাজললতার কালি ও অন্যান্য খরিত্তী গোস্বামী

১.

তোমার লুকোনো কাজললতার কালি
সাবধানে করে চুরি
সেদিন দুপুরে বর্ষার মেঘে চালিয়েছি রঙ-তুলি,
বৃষ্টি যখন এলো
বিশ্ব-ভুবন তোমার আঁখির কালো,
সেই কালিমার পটে
তমালবিপিন পথে
আনকোরা এক শিল্পী রসিক আঁকে
বিরহী রাধার ছবি।

২.

আজকে বাদলা দিনে
আকাশজুড়ে মেঘমালার ছায়া
আর সে জন এক মেয়ে
কঙ্কমুখে অশ্রু জলের ধারা
মাধব গেছে চলে
তবু বাঁশির সুর যে বেড়ায় ঘুরে
দূর নয় সে দূরে
বাজে আপন মনের গভীর তলে।

৩.

পিপাসিত তটপথে ছায়াহীন ঘরে
চেয়ে ছিল এক বধু সারাদিন পথে
তাপিত জ্বরিত জ্বালা পোড়া দেহজুড়ে
মেঘভাঙা জল নেমে ধুয়ে দেবে কবে?
সেইদিন অবেলায় কাজ সারা হলে
জলকে যাবে সে চলে যমুনার তীরে,
বিজলীর সংশ্লেষে আকাশের বুক
নিমন্ত্রণ লেখা হবে নাগরের ঘরে—
ভেসে যাবে কলসি, ঘোমটার আড়ে
শ্যামলালে মিলে যাবে নিলীমার কূলে।

অভিসারী-মন

বিষ্ণুপদ দাশ

নিজেকে ভেঙেছি বারবার তবু,
অপমান মেঘে মিশে যাই ঘাসে
অনসত্রে ভাসে মধুপুর বৃন্দাবনী হাওয়া।

যে মাটি আমার মা আদুরে সন্তান নাচে গায়
বাগুইয়ের তীর ঘেসে দূর শূন্যে—
হরিনামে ইতিহাস হবে আজ।

তখন জাঁকানো আসরে নাগর কানাই
যমুনা পুলিনে রাধা নামে ডাকে;
কুলমান হারা অভিসারী-মন...

আমাদের পৃথিবী বিপ্লব ভূঞা

কাল থেকে আর ফুলের গরিমায়
হলুদ জলে পা ধোওয়াব না তোমার;

ধূপের ধোঁয়ায় সিঁছেটিক সাজঘরে
ছদ্মবেশী মুকুট পরেছ আজ!

ভেবেছি এদের হা-ভাত দেওয়ালে
ভাত-কম্বলের আলপনা এঁকে দেব...

কাল থেকে ফুলের গরিমা নয়,
নারীকে পাতা ওড়া চৈত্রে ও আষাঢ়ে
আঁচল ভরে কিছু উর্বর মাটি তুলে দেব...

এক পলাশ বসন্ত ফিরবেই আমাদের পৃথিবীতে...

নীরব সমর্পণ

তেমুর খান

বিপন্নতা গ্রাস করতে আসছে
আমি হাসি মুখে ঠাট্টা মনে করছি

নিজের আঙুল চিবিয়ে চিবিয়ে জখম হল হাত
প্রেম এলেও এখন আর ছুঁতে পারব না—
চৈতাবার ইচ্ছে নেই
অপমান এসে খুলে দিচ্ছে কপাট

আঁধারের রঙ

মানস মণ্ডল

পাহাড়কে বললাম, “বল, কী তোমার কথা?”
বন-জঙ্গলকে, সমুদ্রকে, তোমাকে, তোমাকে।

সমুদ্র ঢাকলো মুখ, ঘন কুয়াশায়
পাহাড় ঘোরালো মুখ
বনাঞ্চলের মাথা নেমে এল নিচে।

বাতাস, যে আজ এখানে তো, কাল
নীল পরীদের দেশে, বলে গেল
“—মহাশয়, এখানে বলে না কেউ, শুধু একজন
কোনো হ্যালো নেই, শুধু সাজানো নম্বর
মুখ নেই, শুধু কান
চোখ নেই, তাই একটাই রঙ
একটাই রঙ!”

খবর

গোবিন্দ গোস্বামী

অনেককিছুই অলিখিত থেকে যায়
অনেক অপ্রাসঙ্গিক তুচ্ছ ঘটনা
হঠাৎ কখন শিরোনামে এসে
তুলকালাম বাধিয়ে দেয়
দেয়ালের দৈর্ঘ্য প্রস্থ খননশৈলীতে ঘাটতি থাকলে
অনিবার্য পতনের দুর্ঘটনা এড়ানো অসম্ভব
বনের মোষ তাড়ানোর জন্য মজুত থাকে
কিছু সুযোগসম্মানী অনুচর
সংকেত পেলেই টানটান সংঘাত দাঁড়িয়ে যায়
আকাশ রঙ বদলিয়ে ফেলে বাজির মশলায়
খেলার মাঠে তখন প্রচারের অপার ঐশ্বর্য
অন্ধকারের চেনা জগৎ থেকে নিয়ন্ত্রিত
সমস্তুরাল দ্বিতীয় ক্ষমতা কুরে কুরে খেয়ে যাবে
দারিদ্রসীমার নিচে নামার নিঃস্ব তথ্যাবলী
তাবৎ ভয়াবহ অনাহারজনিত মুখ্য সংবাদ
সন্তপর্ণে চাপা পড়ে যায় সুতোর কৌশলে
দৃষ্টি ঘুরিয়ে দিতে চাদের গ্রহণ ঘিরে ধুকুমার
ওষুধি কাচের ভেতর আকাশ রাখার সুপারিশ
চিরটাকাল প্রথম পাতার প্রথম গুরুতর খবর
আশ্চর্য অন্তরালে অদৃশ্যই থেকে যায়।

একটি মন খোলা ভাবনা
সংঘমিত্রা চক্রবর্তী

ভাবতে পারলে বহুদূরে থেকে এই তো কাছেই তুমি
ভাবতে পারলে শ্রাবণের দিন কেটে যাবে মরুভূমি
ভাবতেই পারো গুণগুণ গানে মন বলে গেল কেউ
ভাবতে বসলে অকুল সাগরে উথালপাথাল ঢেউ।

ভেবো না তা বলে মেঘ জানে সব আকাশের গোপনতা
কথার পরতে কথার পরতে শুধুই কথার কথা
দেখা বিনিময় রাতের গভীরে আলোর প্রমাণ ঢেকে
ভাবনা মাঝির তরী ভেসে গেল আধো আলো ছায়া মেখে।

ভাবনা ততটা, যতখানি তুমি মনে মনে নিতে পারো
ভাবতে ভাবতে ভাবনার নেশা বেড়ে যাবে 'আরও আরও'
তখন হয়তো থামানো যাবে না ভাবনার ঘোড়াটাকে
ছুটতে ছুটতে নাওয়া খাওয়া সব ধার দিয়ে দিলি কাকে?

ভাবনা গভীর, ভাবনা অতল, ভাবনার নেই দেশ
ভাবনার শোতে খড়কুটো হয়ে কাছে এলি অনিমেঘ
ভাবনা খেয়ালি, ভাবনা অলীক, ভাবনার জাদুকর
এই তো তোমাকে ভাবতে পারছি পঁচিশ বছর পর!

গোবিন্দকে নিবেদিত...

অমিয়কুমার সেনগুপ্ত

রোড শো জমে না। কিন্তু রণমুখী সেনা
প্রস্তুত। তবুও ফেনা-ফেনা
শুনশান জনপদ, জনতার পুষ্পবৃষ্টি কই!

গোবিন্দকে নিবেদিত আগড়া ধানের উড়ো খই
কাকেও চাটে না।
তাতে আতঙ্ক কাটে না।
সারা দিন সারা রাত থেমে-থেমে প্রচারের গাড়ি
নিরুদ্দিষ্ট কোন্ পথে পাড়ি
দেয়—কেউই জানে না। মানে না
সময় অব্যাহত কেরামতি। ফেনা-ফেনা
শুনশান জনপদ, জনতার পুষ্পবৃষ্টি কই!

দধিভাণ্ড ভেঙে যদি নেপোরা উদোম্ হয়ে দই
খায়, যায় বিড়াল চাঁচিয়ে
কী হবে মঙ্গল তবে সুন্দরের নাকে দড়ি দিয়ে!
কী হবে গন্তব্যে গিয়ে যদি কোনো প্রাণের মহিমা
সেখানে না থাকে! যাকে ভর করে সৌজন্যের সীমা
লঙ্ঘন করতে গিয়ে ধুলোবালি ধাঁধিয়েছে চোখ!

বান্ধীকি কি পুনরায় রত্নকর হয়ে যাচ্ছে! লোক
দু-হাত উঁচিয়ে তা-ই বলতে চায়, কোন্ অভিপ্রায়
গঙ্গোত্রী-মার্জিত জলে টেনে নিয়ে যায়
মদোন্মত্ত তপস্বীকে? শিকে
কার ভাগ্যে ছেঁড়ে—কার রণনাদ তাই দিকে-দিকে...
বাজে, বেজে যায় নির্বিকার!

রোড শো জমে না। তবু কমে না রক্তের দাহ। যার
বিয়ে, তার মনে নেই, উৎসাহী পড়শিরা
বজ্র আঁটুনি দেয়। ফসকে তবু যায় সব গিরা।

ভয়
নলিনীরঞ্জন সরকার

ভয় পেয়ো না
ভয় পাবে না
তোমায় আমি মারব না
তোমায় কভু কাটব না।

দেব কেবল আদর করে খামচে
যাতে হও আমারই চামচে
যাবে আমার সভার ভাষণ শুনতে
মাঝে মাঝে কথার মাঝে হাততালি মারতে।

এখনও তোমাকেই ভালোবাসি
স্বপনকুমার চক্রবর্তী

এখনও তোমাকেই ভালোবাসি
এখনও একান্ত নির্জনে
দুঃখ পেতে ভালোবাসি শুধু তোমাকেই ভেবে।
যখন সকালের রোদ এসে
আমার উঠোনে পায়চারি করে আমোদে আহ্লাদে
যখন সবুজ ঘাসের মাথায়
ক্লান্ত শিশিরের টুপটুপ টুপটাপ,
তখন তোমাকেই মনে পড়ে বারবার।
তোমার আকাশে এখনও কি বলাকারা
সার বেঁধে উড়ে যায় নীল দিগন্ত ছুঁয়ে?
এখনও কি পদ্মার প্রবল টানে
ভেসে যায় ভাটিয়ালি গান?

মমতায় এখনও তোমাকেই
বুকের গোপন সিঁদুকে ভরে রাখি।
একনও স্মৃতি ছুঁয়ে বেঁচে আছি আমি,
উদাস্ত শিবিরের আতনাদ
এখনও আমাকে সারারাত সারাদিন
তাড়া করে ফেরে।

তবুও এখনও তোমাকেই ভালবাসি
আমার প্রিয় স্বদেশ প্রিয় জন্মভূমি!

বিশ্বায়ন

অরুণ মজুমদার

এখন আমরা কুরুক্ষেত্র মহাপ্রান্তরে—
মৌন হয়ে আছে মুখোমুখি
লক্ষ কোটি বুড়ক্ষু ভারত
মাঝখানে শামিয়ানা টাঙিয়ে
কারা যেন রস্তার কদলী শোনায়ে
—কষে বাঁধো কৌপীন
এ ভারত মহাভারত হবে
দ্রৌপদীর কুন্তল বন্ধনে

এখানে এখন আমরা
বিশ্বায়নের বিশ্বরূপ দেখছি
ব্যাপারিরা কষে কোমর বাঁধছে...



অনিকেত
রথীন্দ্রনাথ ভৌমিক

এখন
মাঝে মাঝেই আমার মনে পড়ে না
বেরিয়েছিলাম কেন
কোথায় যাবো বলে।
চেনা পথ ধরে হাঁটি
চৌমোড়ে এসে প্রায়ই দিক্ভ্রান্ত হই
হাঁটি, ভাবি
ঘুরপথে দেরিতে হলেও ঠিক পৌঁছবো নিশ্চয়ই।

এখন
প্রায়ই আমি
বলতে বলতে হারিয়ে ফেলি খেই
পুরোনো এলানো জালে জড়িয়ে যায় পা—
আমার কী যে বলার ছিলো
আমার কী যে কথা!

চোখে চালশে দূরের ছবি ধোঁয়া
যাওয়া হয় না আমার পথে
হয় না কথা বলা।

শিল্পী বা আমি তোমাদেরই লোক
বিশ্বজিৎ সরকার

তুমি শিল্পী

তোমার অনেক নাম যশ খ্যাতি
প্রতিদিন পাও অজস্র সেলাম
তোমার পদচিহ্ন আঁকা সরলরেখায়
এদিকে পাহাড়, ওদিকে সাগর।

তোমার সান্নিধ্য আর পরশ পেতে
শত সহস্র মানুষের ঢল
হুমরি খায়, শ্লোগান ছোটায়।

এত প্রাপ্তি, এত সম্মান
রয়েছে সেই হিমালয় শিখরের উচ্চতার ন্যায়
নেমে এসো শিল্পী, এ মাটির বুকে
যেথা হাজারো মানুষ ধুলোতে লুটায়।

গড়েছ অনেক কিছু, তুমি তো ছদ্মবেশী
অমৃত দিয়েছো, দিয়েছো জীবনের যত প্রাপ্তি,
যত জয়গান, পূর্ণতা দেয় ইহলোক,
সব রয়ে যাবে, যদি বল উচ্চস্বরে
আমি তোমাদেরই লোক।

প্রার্থনা গান

রসুল করিম

অজগরের পিঠে চড়ে আছি। সব নিম, নিমের শিকড় উপড়ে নিয়েছে যেন।
হাওয়ার বিকেল দস্যুময়, শূকনো হয়ে শুয়ে আছে আমাদের
নিঙড়ানো গ্রাম।
কালো পিঁপড়ের গা বেয়ে অনেক ফণা নেমে আসে,
দুই অবিমিশ্র রঙ
চেটে নিচ্ছে নর্দমার শরীর, রাস্তা কাটে কালো বিড়াল।
আমি জীবনের গল্প জানি—আগুনথেকো পাখিদের ডেকে নিই
এখন। পচামাছ, বেগুনবাজার, আগাছার আনন্দমেলা, আরও
কয়েক পঙ্ক্তি অন্ধকার। এসবের জন্য কিছু মুর্ছনা গান।
তবে শুরু হোক স্তোত্রপাঠ। উঁচু বুকের থেকে পাথর নামিয়ে হাওয়ায়
ভেসে যাক সব আয়নাগুলো। সমান ও সমান্তরাল হতে আমিই
বলবো সে কথা।

চুপ করো—

ঠাকুরঘরে মায়ের অশ্রুপাতে মিশে যাচ্ছে স্বজন ভোরের আলো,
একান্তে...

ক্ষমা

অচিন মিত্র

আকাশের নীলে
মাটির নিখিলে
ফুলের মতন ফোটে ক্ষমা
প্রভু করতে পারিনি তার সার্থক তর্জমা
ঘাসের নিবিড় থেকে শিখরের দিকে
দিশাহীন যাপনের আলো ক্রমে ফিকে
তার মাঝে জলছবি ফুটে ওঠে ক্ষমা
প্রভু করতে পারিনি তার সার্থক তর্জমা।

পিকাসো

গৌরীজ মিত্র

তিনি গিটার বাজাতে পারতেন না,
চৌবাচ্চায় গলদা চিংড়ি চাষ জানতেন না,
ফুটবল খেলতে জানতেন না,
তিনি শুধু ছবি আঁকতে পারতেন,
স্বপ্নদর্শী তুলি দিয়ে ছবির পর ছবি আঁকতেন,
ছবির ভেতরে বেঁচে থাকার চেষ্টা করতেন।

অবশেষে তাঁর আঁকা ছবিগুলো দিয়ে
মহাকাল এক ভাস্কর্য নির্মাণ করল,
শক্ত পাথরে গড়া সেই ভাস্কর্যের নাম—
পাবলো পিকাসো।

হাদি

মেঘ বসু

কৃষক যেভাবে জাগায় শস্যকে
সেভাবে তুমিও জাগাও আমাকে হাদি
স্তব্ধতা ভেঙে শুরু হোক কিছু গান
পাখিদের মতো ইচ্ছেরা পাক ছুটি
জলের মিনারে পড়েছে রাতের ছায়া
ছায়াতেও দেখি তোমারই সোনার মুখ
ভালোবেসে আমি ভিথিরির কাছে ঋণী
মৃত্যুকে রোজ দিয়েছি করুণাপাত
ভালোবেসে তুমি আঘাত দিয়েছ যত
তার বেশি প্রাণ দিয়েছ প্রশ্রয়।

ঘুমের ভিতর

সুমিতেশ সরকার

ঘুমের ভিতর

আঙুল নড়ে উঠছে তোমার

ঘুমের ভিতর

কেঁপে উঠছে তোমার ঠোঁট

ঘুমের ভিতর

তোমার শরীরে

এক অদ্ভুত আলোছায়া খেলা করছে

আর পাখিদের কথাবার্তা, গাছেদের কথাবার্তা

মেঘেদের কথাবার্তা

আশ্চর্যভাবে সত্যি হয়ে উঠছে তোমার জীবনে।

স্বপ্ন

নরেশ মণ্ডল

তোর বৃকে এত জ্বালা ছিল

বলিসনি তো আগে, আমরা কি পারি না

নিতে তোর নিত্য কর্ম।

বিছানো কাঁথায় সুতোর কাজ তোলে বুড়ি।

এবার আয়েসি বিছানায়

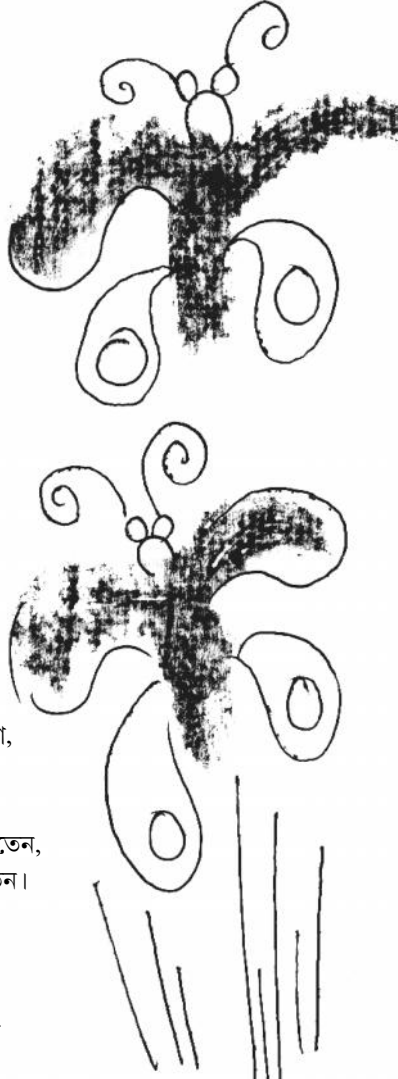
এলিয়ে দেব না শরীর

তোর কথা মনে রেখে

মিছিলেই আছি

জীবন তো কেটে যেত সুখ ও স্বপ্নে

সুখ-টা থাক স্বপ্নটা রইল বৃকে।





পতনোন্মুখ পালকের রঙ সুনীল নাগ

প্রবণতাগুচ্ছ হতে ছুটে আসছে
বধির শূন্যতা পতনের জীর্ণ পালক
প্রেমের ভেতর অ-প্রেমের অতি ক্ষুদ্র কাঁটা
লুকোনো সব বিযাক্ত শলাকা
আনন্দের অগোচরে ঘনায়মান বিষাদ।
এ এক অদ্ভুত সময়, চলমান প্রবণতা মিছিলে
সত্যের কুহক, অ-সত্যের টেরাকোটা
বিজলী আলোর উৎসবে ক্ষুদে কালো পোকার বাহার!
মাছ দিয়ে শাক ঢাকা।

ভোরে চড়ুই তবু খুঁটে খায় দু-এক কণা
সুখ-স্মৃতি, শস্যের উজ্জ্বল মুখ
একা মানুষই শুধু সহ-নাগরিকের অনাহারকে
নিশ্চিত করেছে প্রলোভনের বিচিত্র কৌশলে।
বাঘের চেয়েও মানুষকে আজ হিংস্র মনে হয়
প্রবণতাগুচ্ছ হতে ঝরে পড়ছে পতন চিহ্নের
বিচিত্র পালক, মানুষের মাথার মুকুটে প্রতিদিন।

সেই সুখে মানুষের তরল আত্মদ, প্রবাহের
মাত্রা পেয়ে ছুটে যাচ্ছে

আরো কোনো অধঃপতনের দিকে...

ভুল-অর্চনা প্রবীর বন্দ্যোপাধ্যায়

পাতার হলুদ জড়িয়ে নেমে আসে শীতের ছায়া—ফসিল বিকেল
গাছের তলে জড়ো হচ্ছে ক্ষীণ ধোঁয়াশা—
আলো-ছায়ার এমনতরো মাদারি খেল
তবু যেন গলা জুড়ে জেগে থাকে জলপিপাসা!

পিপাসার্ত একটা চলে মাঠের পরে রাস্তা পেরোয়
রাস্তা তাকে দাঁড় করিয়ে হারিয়ে যায় দূরের বাঁকে—
প্রতিবারই জলের ছবি সরে যায় বাঁকের গেরোয়
প্রতিদিন ইচ্ছেগুলো পথের মাঝে পুড়তে থাকে!

পুড়তে থাকে আত্মীয়তা নিরভিমান দুঃখলিপি
পায়ের ও ভুল হয়ে যায়—পা চলে যায় মেঘের বাড়ি—
মেঘের ও সময় কম—সে বলে যায় চুপি চুপি :
অযথা কান্না জমাস—মনে রাখ লড়াই জারি!

জারি তো লড়াই ঠিকই—জানি তো লড়তে হবে
কিন্তু মাটি তো বন্ধ্য এখন—বাতাসও প্রবল ভোগী :
পারি না পা মেলাতে আত্মহনন মহোৎসবে
পূজা পায় না জ্ঞান-তাপস, পূজা পায় নকল যোগী।

বিরক্তির আগস্ট ষষ্ঠীপদ পাল

আগস্টের জাপান, আয়নায় রয়েছে এখনও
পীড়িত মানুষের লাজ ও লজ্জাগুলি
কেড়েছিল আঁকাবাঁকা অন্য এক লজ্জার ধোঁয়া,
আমেরিকা, তুমি ভাল থেকো!
আমরা ‘ফিনিক্স’ পাখি হয়ে উড়তে শিখেছি আজ
তোমাদের সব নির্লজ্জতা ঢেকে দেবো
ফিনিক্সের গানে, লজ্জা পেয়োনা ভাই,
কীই বা কেড়েছ আমাদের একদিনে
বরং তোমাদের পোশাকি হাসি
শুকনো পাতাও ঝরাও পারেনি এতকাল,
কোনো পাখিও বসেনি তোমাদের চালে।
বকম্-বকম্ যে ঠোটগুলি ছুঁয়েছিল
পাখির হৃদয়ে, তোমরা দেখেছ কি তা?
আমরা তা দেখেছি বলেই
আমাদের রয়ে গেছে পুরনো পোশাক
আর তোমাদের সেই ক্লীব পোশাক
খুলে যাচ্ছে অবিরত, লজ্জা নয়
ঘৃণার ছায়াতলে
যেখানে কোনো পাখিও বসেনা আজ।

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

বর্ধমান কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচার অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক লি.

ওল্ড কোর্ট কম্পাউন্ড, বর্ধমান
দূরভাষ : ০৩৪২-২৬৬২৩৯০, ২৬৬৫৭১২

১৯৪১ সাল থেকে দীর্ঘমেয়াদি ঋণদানে নিয়োজিত অগ্রণী সমবায় প্রতিষ্ঠান

উল্লেখযোগ্য ঋণ প্রকল্প

স্থায়ী চাকুরিজীবী ও শিক্ষক শিক্ষিকাদের সহজ শর্তে বাড়ি তৈরি ও বাড়ি মেরামতের জন্য ঋণ যে-কোনো ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য ঋণ, রাইস মিল, এস.আর.টি. ও ডেয়ারি প্রকল্প, পোলট্রি প্রকল্প, মৎস্য প্রকল্প, ট্রাক্টর ও পাওয়ার টিলার ক্রয়, মহিলা স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীদের (এস.এই.জি.) ঋণ।

শাখা অফিস : বর্ধমান ও সেহারাবাজার ।। সাব অফিস : আসানসোল ও দুর্গাপুর

শ্রীগঙ্গাধর পাল
চেয়ারম্যান

Sl. No. 17



উকুন

গৌরঙ্গ চ্যাটার্জী

রাত্রি প্রায় সাড়ে দশটা হবে। দরজাটা বন্ধ করে সবে হটপট থেকে খাবারটা বার করে থালাতে রেখে খেতে যাবে এমন সময় দরজাতে আস্তে আস্তে টোকা মারার আওয়াজ পেল অনির্বাণ। মনে মনে ভাবে কী আপদ—এত রাতে আবার কে এল? কোনো ছাত্র নাকি? ইদানীং কয়েকজন ছাত্র পড়াশোনা বাদ দিয়েও অনির্বাণের কাছে মাঝে মাঝে যোগাযোগ করতে আসে—নানা সামাজিক অস্থিরতা, অবিচার ইত্যাদি বিষয়ে ওর কাছে চর্চা করতে আসে।

অনির্বাণ নিজে একজন বাম মনোভাবাপন্ন ব্যক্তি এবং সরাসরি রাজনীতির সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত—এটা ওর স্কুলে সবাই জানে। কিন্তু এই মনোভাবের সরাসরি বহিঃপ্রকাশ কোনো সময়ই ক্লাসরুমে অথবা স্কুল পরিসরে প্রকাশ পায়নি—সেখানে সে একজন নীতিনিষ্ঠ শিক্ষক। নানা বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে ক্লাস নিয়ে থাকে। ছাত্রদের সাথে একটা আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে অনির্বাণের। এমনকী তাদের পারিবারিক অথবা ব্যক্তিগত কোনো সাহায্যের প্রয়োজন হলে তাও করার চেষ্টা করে থাকে। কিন্তু ওর তিন দশকের মাস্টারি জীবনে কোনো সময়ই স্কুলের ভিতরে কোনো রকম রাজনৈতিক চর্চা করতে ওকে কেউ দেখেনি, শোনেওনি। শুধুমাত্র কয়েকদিন আগে এক ছাত্রী সম্পর্কে স্কুল মোড়ের কাছে একটা চায়ের দোকান থেকে সরস মন্তব্য ভেসে আসায় আর নিজেকে সামলে রাখতে পারেনি অনির্বাণ। সরাসরি ঐ চায়ের দোকানে দাঁড়ানো ছেলেটির জামার কলার ধরে হন হন করে মাঝ রাস্তাতে টেনে এনে সপাটে চড় মারে ছেলেটির গালে।

হঠাৎ এই আক্রমণে হতভম্ব হয়ে পড়ে ছেলেটিও। তার দলবল যে যেদিকে পারে দৌড়ে পালিয়ে যায়। ছেলেটিও জামার কলার ঠিক করে জামার ঝুল টেনে ঠিক করতে করতে অনির্বাণকে দেখে নেওয়ার ছমকি দিয়ে চলে যায়। সেদিন আর ভালোভাবে ক্লাস নিতে পারে না অনির্বাণ। ছাত্রীটিকে হেডমাস্টার মহাশয় তার বাবাকে ডেকে বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন।

টিফিন আওয়াসে টিচার্স রুমে শিক্ষকরা কী হয়েছিল তা জানার জন্য ঘিরে ধরে অনির্বাণকে। অনির্বাণ আনুপাতিক ঘটনার বিবরণ দিয়ে বলতে থাকে—‘হলটা কী? মা-বোনের আর কোনো মান সম্মান থাকবে না, আমাদের বাচ্চারা স্কুলে-কলেজে মর্যাদার সাথে যাতায়াত করতে পারবে না ...?’ খুবই উত্তেজিত দেখাচ্ছিল অনির্বাণকে। আর কয়েকদিন পরে রিটার্নার করবেন রমেশবাবু, চেয়ারে বসে একমনে পান চিবুতে চিবুতে সব গুনছিলেন। অতিরিক্ত পান খাওয়া রমেশবাবুর বদ অভ্যাস। পাঞ্জাবিটার গা নানা ছোপে পূর্ণ। বাকি শিক্ষকরা এই কারণে সবাই ওনাকে ‘রাঙাদা’ বলে ডাকেন। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যেও কেমন করে এই নামটা চালু হয়ে গিয়েছে কে জানে। ওরাও ওঁকে রাঙাবাবু বলেই ডাকে। ইংরাজির শিক্ষক, খুবই ভালো পড়ান। ছাত্র শিক্ষক সবার কাছে প্রিয় এ হেন ‘রাঙাদা’ চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে আলতো করে চাপ দেন অনির্বাণের কাঁধে। খুবই ধীরে ধীরে বলেন, “শোনো ভায়া, মাথা গরম কোরো না। এখন এদের সাথে মাথা গরম করে পেরে উঠবে না। রাষ্ট্র শক্তি যদি সমাজবিরোধীদের আশ্রয়স্থল হয় তাহলে সমাজবিরোধীদের সাথে

পেরে ওঠা মুশকিল—সময় লাগবে, এদের গতি এখন উদ্ভ্রমুখী, মাধ্যাকর্ষণ শক্তি অবহেলা করে এরা ওপরে উঠছে। কিন্তু মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে অবহেলা করতে কেউ পারেনি, পারবেও না। এদের তো না আছে কোনো আদর্শ, না আছে কোনো তত্ত্ব। এদের নিয়ে এত উত্তেজিত হওয়ার কোনো কারণই নেই। সাময়িক ঝোড়ো হাওয়ার দাপটে উড়ন্ত এঁটো পাতার মতো খানিকটা উড়ে আবার নেমে আসবে এই ধরণীতে। তুমি তো বিজ্ঞানের ছাত্র—সব জান, বোঝো, কেন উত্তেজিত হচ্ছে।” শুনে অনির্বাণ বলে ওঠে, “তা বলে ...”। আরও কিছু বলতে চায় অনির্বাণ, ততক্ষণে একগাদা ছাত্র-ছাত্রী ছড়মুড় করে টিচার্স রুমে ঢুকে পড়ে একসাথে সবাই বলতে থাকে—“আমার থানাতে যাব স্যার, এর বিহিত চাইব।” হেডস্যারকে লক্ষ্য করে ওরা বলে, “স্যার আপনিও চলুন।” হেডস্যার রাজি হন না। ছাত্রদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, “আমার স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের নিরাপত্তার জন্য আমি প্রশাসনের কাছে চিঠি পাঠাচ্ছি, তোমাদের কোথাও যেতে হবে না, তোমরা যাও।” ছাত্ররা বলে ওঠে, “স্যার ওই চিঠি আমাদের হাতে দিন আমরা নিয়ে যাবো।” হেডস্যার রাজি হন না। শেষে রাগান্বিত-কেই পরিস্থিতি সামাল দিতে হয়। বলেন, “তোমরা নিজেরা থানায় যেতে পারো, আমরা বাপু যাব না। তবে হ্যাঁ, আমরা ছাত্র-ছাত্রী ও স্কুলের নিরাপত্তার বিষয়ে চিঠি লিখে পিওন দিয়ে থানাতে পাঠাবো।” ছাত্ররা নিম্নরাজি হয়ে একে একে ফিরে যায়। স্কুল থেকে থানাতে যথারীতি সব জানানো হয়, তারপর থানা কী অ্যাকশন নিয়েছিল, এ নিয়ে আর মাথা ঘামায়নি অনির্বাণ।

আর পাঁচটা দিনের মতো নিজের কাজে ডুবে ছিল অনির্বাণ। দরজায় টোকার আওয়াজ পেয়ে প্রথমে স্বাভাবিকভাবে অনির্বাণের কোনো ছাত্রের কথাই মনে হয়। রুটিটা ধরে ছেঁড়ার উপক্রম করছিল, হঠাৎ দরজায় আওয়াজ পেয়ে রুটিটা হাতে নিয়েই দরজার ছিটকানিটা খুলতেই ওর ছাত্র বিটু ছড়মুড় করে ঘরে ঢুকে বলল, “স্যার, এখনি বার হয়ে আমার সাথে চলুন, বাবা আপনাকে এখনি নিয়ে যেতে বলেছে।” অনির্বাণ বলে, “সে কী রে, এখন যাবো কীভাবে, আমি তো খেতে বসেছি, খেতে হবে না?” বিটু বলে ওঠে, “না না, খেতে হবে না, আমাদের বাড়িতে চলুন, যা হোক ব্যবস্থা করা যাবে।” অবাক হয়ে অনির্বাণ বলে ওঠে, “কেন এত তাড়াতাড়ির কী আছে, কাল গেলে হবে না?”— “না না, আপনাকে এখনি নিয়ে যাবার কথা বলেছে আমার বাবা। না গেলে কিন্তু আপনার ভয়ানক বিপদ হতে পারে।” এবার অনির্বাণের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ে কে যেন খানিকটা আঘাত দিয়ে জানিয়ে দেয়, সাবধান অনির্বাণ, বেরিয়ে পড়। সেদিনের ঘটনার কোনো জের হতে পারে। বদমাইশগুলোর রাজনৈতিক খুঁটি শক্ত। ওরা রাজনৈতিক ক্ষমতার বলে পুলিশ-প্রশাসনকে ওদের হাতে নিয়ে নিয়েছে। ওরা সব পারে—দেরি করিস না, বেরিয়ে পড়। অনির্বাণ লুপ্তি পরে ছিল, তাড়াতাড়ি পাজামা-পাঞ্জাবিটা গলিয়ে নিয়ে পায়ে চপ্পল পরে নিজের রুমে তালা দিয়ে বাইরে দরজাটা ভেজিয়ে তালা লাগাতে যাবে, এমন সময় দূর থেকে একটা হৈ হৈ আওয়াজ শুনতে পায় ওরা। বিটু অনির্বাণকে তালা লাগানোর সুযোগ না দিয়ে একপ্রকার জোর করে নিজের মোটরসাইকেলে চাপিয়ে বলে, “স্যার জীবন থাকলে সব হবে, চলুন তো।” —বলেই একপ্রকার জোর করেই মোটরসাইকেলটা স্পিডে চালিয়ে দিল।

হতভম্বের মতো মোটরসাইকেলে বসে থাকে অনির্বাণ। ঘটনার আকস্মিকতায় অনির্বাণের মতো শক্ত মনের মানুষও কেমন যেন অবসন্ন হয়ে পড়ে— রাত্রে কেন মানুষ সাময়িকভাবে দুর্বল

হয়ে পড়ে কে জানে? রাত্রি হলে কি মানুষ একা থাকলে কোনো সাহায্য খোঁজে? এই সমস্ত মনোবৈজ্ঞানিক বিষয় নিয়ে ভাবতে ভাবতে প্রায় বেশ কয়েক কিলোমিটার কখন যে পেরিয়ে চলে এসেছে তা বুঝতে পারে না অনির্বাণ।

বাড়িতে পৌঁছে বিটু গাড়ি থামিয়ে দরজায় টোকা মারে। যেন দরজা খুলে অভ্যর্থনা জানানোর জন্যই প্রস্তুত হয়েছিল তাঁর বাবা। বলে, “নমস্কার মাস্টারমশাই, আসুন আসুন, আমার নাম সতনাম সিং।” নামটা অনেক আগে থেকেই শোনা অনির্বাণের। সতনামের কাজকর্ম নিয়েও যে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল তাও নয়। পাল্টা নমস্কার করে অনির্বাণ বলে ওঠে, “তা হঠাৎ করে আমাকে এখানে নিয়ে আসার কারণ কী জানতে পারি?” — “অবশ্যই, বলছি বসুন”, বলেই সাদরে অভ্যর্থনা জানায় সতনাম। ইতিমধ্যেই বিটু বাড়ির ভেতর থেকে একটা গ্লাসে করে খানিকটা চা নিয়ে অনির্বাণকে বলল, “স্যার, চা টা খেয়ে নিন, তারপর কথা হবে।” চায়ের গ্লাসটা হাত বাড়িয়ে নিতে যাবে অনির্বাণ, এমন সময় একটা বিকট শব্দে চতুর্দিক কেঁপে উঠলো। এখানে কোলিয়ারির ওপেন কাস্ট খাদানগুলোতে মাঝে মধ্যে ডিনামাইট ফাটিয়ে কিছু লোক মাছ ধরে। সেরকমটাই ভেবে বিটুকে অনির্বাণ জিজ্ঞাসা করলো, “এখানে কোথাও খাদান আছে বোধহয়, সেখানে কোথাও মাছ ধরছে তাই না রে?” বিটু বলল, “হতে পারে, আবার অন্য কিছুও হতে পারে।” এমন সময় বিটুর ফোনটা বেজে ওঠে। বিটু ফোনটা ধরে কথা বলার জন্য খানিকক্ষণের জন্য বাইরে বেরিয়ে যায়। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে বলে, “স্যার, ওরা আপনার ঘরে ঢুকে আপনার ঘরটাকে ভেঙে দিয়েছে, আপনার বাইরের দরজা খোলা পেয়ে আপনাকে ভিতরে মারতে গিয়েছিল, আপনাকে না পেয়ে আপনার ঘর আর ঘরের সবকিছু ভেঙে দিয়েছে। বোমা মেরে বাড়িটাতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। আর বোম ফেটে বোধহয় ওদের একজন বা দুজন ওখানে আপনার বাড়ির দরজার কাছে মরে পড়ে আছে।” সিনেমার মতো এত তাড়াতাড়ি ঘটনাটা ঘটে গেল যে কী করবে, কাকে বলবে কিছুই বুঝতে পারছে না অনির্বাণ। সাথে করে মোবাইল ফোনটাও অনেনি যে কারো সাথে যোগাযোগ করবে।

অনির্বাণ বুঝতে পারছে না কী করবে। অনির্বাণ বিটুকে লক্ষ্য করে বলে—“তুই একটু খোঁজ নিয়ে দেখ না, ওখানে আর কী হচ্ছে।” বিটুর বাবা বলে ওঠে, “থাক, আমি খবর নিচ্ছি। যা হবার হচ্ছে, আপনার কপালে ভোগান্তি শুরু হল, আর কি।” সতনাম ওদের শ্রমিক সংগঠনের একজন বড় মাপের নেতা। এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনেও জিতেছে। সমিতির কী একটা পদ পেয়েছে। বলে, “মাস্টারমশাই ভাববেন না, আমি দেখছি কী হল।” বলতেই তার ফোন বেজে উঠলো। ফোনটা ধরে শুধু ‘হঁ’ আর ‘হাঁ’ করে কয়েক মিনিট কথা বলে, বলে উঠে, “ঠিক আছে তোমরা থাক, আমি বার হচ্ছি।” ফোনটা রেখে দেয় সতনাম। এবার সতনাম অনির্বাণকে বলে, “মাস্টারমশাই, আমাকে তো আপনার ওখানে যেতে হবে। রাজু জানালো, আপনার বাড়িতে নাকি কয়েকজন বাইরের দুষ্কৃতি নিয়ে আপনি মিটিং করছিলেন। এইসময় পাড়ার কয়েকজন গিয়ে আপনার এই কাজের প্রতিবাদ করাতে আপনার সাথে বচসা হয়। তারপর মারামারি, তারপর দুষ্কৃতিরা আপনার বাড়ি থেকে বোমা ছোঁড়ে, আর তাতে নাকি আমাদের দলের দুজন ছেলের স্পিটডেথ হয়েছে। এরফলে জনরোষ এত তীব্র হয় যে জনতা আপনার বাড়ি ভেঙে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। আর ওই দুষ্কৃতিরা এবং আপনি পালিয়ে গিয়েছেন। এখন পুলিশ এসেছে। আমাদের থানা যেতে হবে,

ডায়েরি লিখতে হবে। আগামীকাল এই এলাকায় বনধ ডাকার পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে।” এতগুলো কথা বলে অর্থপূর্ণভাবে অনির্বাণের দিকে তাকিয়ে থাকে সতনাম। জামাটা গায়ে দিয়ে বিটুকে মোটর সাইকেলটা বার করতে বলে। —“আমি তো কালই জানতে পেরেছিলাম যে এরকমটা হবে। ওরা মানে যাকে আপনি স্কুল মোড়ে ধরেছিলেন। ওরা নেতা ধরে থানাতে গিয়ে ছাড়া পেয়ে এসেছে, তারপর আপনাকে জব্দ করার পরিকল্পনা শুরু করে। আপনাকে জব্দ করতে পারলে এখানে বামপন্থীদের জব্দ করা সহজ হবে। কারণ বাকি সবাইকে যেটুকু হাওয়া পানি আপনিই যোগাচ্ছেন। কিন্তু আপনাকে জব্দ করা যাচ্ছে না। ওদের আজকে যাবার কথা ছিল আপনার বাড়িতে। আপনাকে খানিকটা মারধর আর আপনার ঘরটা ভাঙচুর করে খানিকটা সমঝে দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু নিজেদের বোমা ফেটে নিজেরাই মারা যাবে এরকমটা পাকচফ্রে ঘটে গেল। আপনার বাড়িতে হামলা থেকে আপনাকে বাঁচানোর জন্যই তো বিটুকে পাঠিয়ে আপনাকে এখানে নিয়ে এলাম। আমি এই বিটুর কাছে আপনার কথা প্রায়ই শুনি। ও তো আপনার দারুন ভক্ত। আর রোজ রোজ ওর মুখে আপনার কথা শুনে আমিও জানি না কেমন করে অজান্তে আপনার ভক্ত হয়ে পড়েছি।” সতনাম অনির্বাণকে আশ্বস্ত করে বলে, “আপনি এখানে আরাম করে বসুন, আমি ওখান থেকে ঘুরে আসি। নতুবা আবার ওদের কেউ এখানে এসে পড়বে। আর আপনাকে যদি আমার বাড়িতে দেখে ফেলে তাহলে তো সর্বনাশ।” সতনাম এবার বিটুকে উদ্দেশ্য করে বলে, “চল তুই আমাকে ছেড়ে চলে আসবি—দেখি কী হয়।” ওরা দুজনে মোটর সাইকেলে বার হয়ে যায়।

এ বাড়িতে বাপ-ব্যাটা ছাড়া কেউ থাকে না। দরজা ভেজিয়ে চুপ করে বসে থাকে অনির্বাণ। এদিকে খিদেতে পেটটা চুঁই, চুঁই করছে। কিন্তু উপায় নেই। সামনে টিভিটা চলছে, সিনেমা হচ্ছে। মানে টিভিটা চালিয়ে রেখেই সতনাম বার হয়ে গেছে। আনমনে রিমোটটা নিয়ে বাংলা খবরের চ্যানেলগুলো ঘোরাতে থাকে অনির্বাণ। দেখে নিচে স্ক্রলিং হচ্ছে ‘বাম সমির্থত শিক্ষকের বাড়ি থেকে হামলা, দুজন যুব নেতার মৃত্যু’। আর টিভিতে চলছে ধনলক্ষ্মী যন্ত্রের বিজ্ঞাপন। মানে বিজ্ঞাপন শেষ হলেই খবরটা দেখানো হবে। ধনলক্ষ্মী যন্ত্র নিয়ে অনির্বাণের আগ্রহ না থাকলেও খবরের আগ্রহে বিজ্ঞাপনের দিকে ভাবলেশহীন ভাবে তাকিয়ে থাকে অনির্বাণ। বিজ্ঞাপন শেষ হয়, ঘোষিকা বলতে থাকে —‘এইমাত্র খবর পাওয়া গেল, কুসুমপুর গ্রামের উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের রসায়ন শিক্ষক অনির্বাণ রায়ের বাড়িতে হার্মাদদের সভা চলছিল। সেই সভা থেকে হার্মাদরা বাইরে জমায়েত একটা সভার ওপরে বোমা মারে। এর ফলে দুজন যুবনেতার মৃত্যু হয়। হার্মাদরা পলাতক। কিন্তু জনরোষে অনির্বাণ রায়ের বাড়ি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। পুলিশ এসেছে। তদন্ত চলছে।’ এরপরই কুসুমপুর থানার বড়বাবু এবং পুলিশ কমিশনারেট সাহেবের বক্তব্যের সাথে এলাকার বিধায়কের বক্তব্য প্রচারিত হতে থাকে।

আর দেখার ইচ্ছা হল না অনির্বাণের। অন্য একটা বাংলা চ্যানেলের অনুষ্ঠান দেখতে থাকে। সেখানেও শরীরের ওজন কমানোর বিজ্ঞাপন দেখে টিভিটা বন্ধ করে দেয় অনির্বাণ। অলস হয়ে চেয়ারটায় গা এলিয়ে দেয়। আর ভাবতে পারে না। অনেক কমরেড ওর কাছে এরকম পরিস্থিতিতে এসেছে, দেখা করেছে, নিজে দেখা করতে গিয়েছে। তাদের নানা ধরনের পরামর্শ দিয়েছে। কিন্তু পরামর্শ দেওয়া আর নিজে বাস্তব পরিস্থিতির সমানে পড়ে তার মোকাবিলা করার মধ্যে যে বিশাল পার্থক্য তা

আজ বুঝতে পারে। কিন্তু ভবিষ্যতের ওপর নির্ভর না করে বিকল্পের ভাবনাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে অনির্বাণ। আজ মোবাইল ফোনটা আনতে পারেনি। কোনো নম্বরই মনে করতে পারছে না। সতনামের বাড়ির ল্যাণ্ড ফোনটা দেখে ভাবলো যে ফোন করবে। কিন্তু এত রাতে আর কাকেই বা ফোন করবে, আর নম্বরই তো জানে না। কীভাবে কমরেডদের সাথে যোগসূত্র স্থাপন করা যায় তা নিয়ে ভাবতে থাকে অনির্বাণ। অভ্যাস মতো হাতঘড়ির দিকে তাকায়। তখন প্রায় রাত্রি একটা বাজে। বিটু বা তার বাবা কখন ফিরবে কে জানে? এমন সময় মোটর সাইকেলের আওয়াজ কানে এলে সতর্ক হয় অনির্বাণ। দরজাটা খোলাই ছিল। বিটু ভেতরে প্রবেশ করে। সামনে খাটে বসে বলে, “স্যার সর্বনাশ, ওরা আপনার আর আপনার সাথে আরো কয়েকজনের বিরুদ্ধে নানা রকম অভিযোগ দিয়ে থানাতে কেস করেছে। আপনার বাড়িটা তো ভেঙেচুরে নাশতুশ, কোনো কিছু আস্ত নেই। কী করব, সব দেখলাম। বাবা আমাকে চলে আসতে বলল। ওরা থানাতে গেল। আগামীকাল কুসুমপুর থানা এলাকা বন্ধ। দুষ্কৃতি আর হার্মাদদের গ্রেপ্তারের দাবিতে।” এ পর্যন্ত বলেই খানিকটা শ্লেষের সাথে বিটু বলে ওঠে, “আর যাবেন ছাত্রীকে বাঁচাতে? বুঝুন ঠালা, আমি তো বাবাকে সেদিনের ঘটনার কথা বলেছিলাম। বাবা তখনই বলেছিল যে ছেলেটা ভালো না। দেখবি তিলকে তাল করবে। আর হলও তাই। তার জন্যই তো বাবা খবরটা জানতে পেরে আপনাকে বাঁচাবার জন্য আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছিল।”

অনির্বাণ বলে ওঠে, “কিন্তু তোর বাবা তো ওনাদেরই নেতা।” বিটু বলে ওঠে, “হলই বা, কিছুক্ষণ আগেই তো শুনলেন আমি রোজ নানা বিষয়ে বাবার সাথে আলোচনা করি আর আপনার কথা এসে পড়ে। বাবা তো বলেই ফেলেছে কেমন করে তিনি আপনাকে ভালোবেসে ফেলেছেন।” অনির্বাণ বলে ওঠে, “তা তো বুঝলাম, কিন্তু তোদের যদি কোনো বিপদ হয়?” বিটুর উত্তর, “অতশত জানি না, তবে এটা জানি আমার বাবা প্রথম জীবনে আপনাদের বেশ কয়েকজন বড় বড় নেতার সান্নিধ্যে কাজ করেছে। তাঁদের কথা প্রায়ই বাবা বলে। সাথে সাথে এখনকার নেতাদের তুলনাও করে। এখনকার নেতাদের অনেকের ওপরেই বাবা অসন্তুষ্ট। কিন্তু আপনাদের পাটিটাকে মনে মনে দারুন শ্রদ্ধা করে। আপনারা যদি ওর সাথে সামান্য সম্মানের সাথে যোগাযোগ রাখতেন তাহলে মনে হয় বাবা ওদের দলে যেত না। কিন্তু ওরাও যে ভালো নয় তা বাবা এখন হাড়ে হাড়ে বুঝতে পেরেছে। বোধহয় এসব দুর্বলতার কারণেই আপনাকে সাবধান করে বাঁচাতে পাঠিয়েছিল।” বলেই বিটু আবার বলে ওঠে, “স্যার আপনাকে এখানে আর রাখা যাবে না, লোকে দেখে ফেলবে, বাইরে কোথাও আপনাকে যেতে হবে।” অনির্বাণ বলে, “তা তো হবেই।” কিন্তু কোথায় যাবে, কার কাছে যাবে ভাবতে ভাবতে বিটুকে বলে, “চল, আমাকে স্টেশনে পৌঁছে দে। ওখান থেকে কোথাও যাওয়া যাবে।” “তাই ভালো” বলে বিটু শ’দুয়েক টাকা অনির্বাণের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে, “স্যার এটা রাখুন, পরে ফেরৎ দিয়ে দেবেন।”

খানিকটা ইতস্তত করে হাত বাড়িয়ে টাকাটা নিয়ে নেয় অনির্বাণ। একটা টাকা পয়সাও নিয়ে বার হতে পারেনি। মনে মনে ভাবে চেকবই, এ টি এম কার্ড যা কিছু সবই তো বাড়িতে ছিল। সবই তো পুড়ে গিয়েছে। কীভাবে খরচাপাতি হবে সেই ভাবনা আকুল করে তোলে ওকে। তারপর পুলিশি ঝামেলা, বড়রকমেরই কেস তৈরি করবে ওরা। দুজন মারা গিয়েছে, নিজেদের দোষ ঢাকতে এখন ওর ওপর সবটা না চাপালেও তো চলবে না। কেমন

করে ওসবের বিরুদ্ধে লড়াই চালাবে তা নিয়ে ভাবতে থাকে। তারপর আবার স্কুলের বিষয়, জামিন না হওয়া পর্যন্ত সেখানে যাওয়া যাবে না। কীভাবে কী করবে কিছুই ভাবতে পারছে না অনির্বাণ। বিট্টুকে যে বলবে সংগঠনের লোকজনকে খবর দিতে তারও ভরসা করতে পারছে না। কারণ কোনোরকমে যদি সমস্ত ঘটনা প্রকাশ হয়ে পড়ে তাহলে বিট্টুদের তো অসুবিধা হবেই, সঙ্গে পার্টির একটা বন্ধু পরিবারকে হারাতে হবে। কী করা যায় সাতপাঁচ ভাবতে থাকে অনির্বাণ। বিট্টু খানিকটা চা আর গোটা ছয়েক বিস্কুট এনে বলে, “খেয়ে নিন স্যার, আমাদের বাড়িতে বাবা আর আমি রাত্রে খাবার খেয়ে নিয়েছি। এছাড়া কিছু নেই। আমার তো মা নেই, মা মারা গিয়েছে, যখন আমি এতটুকু ছিলাম—” বলেই দু হাত প্রসারিত করে সেই সময় বিট্টু কতটুকু ছিল তা দেখায়। “এ দেখুন মায়ের ছবি”— বলেই বিট্টু ওর বাবার শোয়ার খাটের দেওয়ালের দিকে একটা ব্ল্যাক অ্যাণ্ড হোয়াইট ছবি দেখালো। বিট্টুর মা যে বেশ সুন্দরীই ছিলেন তা ছবিটা দেখলেই বোঝা যায়। কিন্তু ছবিটা দেখতে দেখতে অনির্বাণের মনে হয় যেন ঐকে কোথায় দেখেছি। কিছুতেই খেয়াল করতে পারে না, অথচ খুব চেনা চেনা মনে হয়। মনের ভাব মনের মধ্যেই লুকিয়ে রেখে অনির্বাণ জিজ্ঞাসা করে, “তোমার মা বোধহয় বাঙালি ছিলেন, তাই না? তোমরা তো শিখ?” বিট্টু বলে ওঠে, “ঠিক বলেছেন স্যার, কিন্তু আপনি কী করে ছবি দেখে বুঝতে পারলেন?” নিজের সন্দেহ যে সঠিক সেটা এতক্ষণে বুঝতে পেরেছে অনির্বাণ। কিন্তু মনের কথা মনে রেখেই বলল, “না, আসলে বাঙালি মেয়েদের চেহারা তো, দেখলেই বোঝা যায়।”

অনির্বাণের বেশ মনে পড়ে এই মেয়েটি তারই সহপাঠী শ্রীপর্ণ-র বোন অতসী। কলেজে পড়তে পড়তে অতসীর সাথে এক শিখ যুবকের পরিচয় হয় এবং এই শিখ যুবকের সাথেই ঘর বাঁধে অতসী। শ্রীপর্ণ-র বাবা প্রচণ্ড রক্ষণশীল ছিলেন। অতসীর বিয়ের পর থেকে আর যোগাযোগই রাখেননি অতসীর সাথে। কিন্তু অতসী যে মারা গেছে সে খবর অনির্বাণ পায়নি। আজকে অতসীর ছবিটা দেখে পুরনো কথাগুলো মনে পড়ছিল। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে অনির্বাণ বিট্টুকে জিজ্ঞাসা করে, “তোমার মাকে মনে পড়ে?” বিট্টুর উত্তর— “না স্যার, মনে পড়ে না, তবে শুনেছি আমার মা নাকি আপনাদের সংগঠনের কাজ করতেন। আর আমার মামাও তো আপনাদের সংগঠনের কর্মী ছিলেন। কিন্তু ‘শুদ্ধিকরণ’ না কী বলে তার ফলে মামার সাথে আপনাদের আর এখন কোনো সম্পর্ক নেই বলেই জানি। তবে এখনও সমর্থন করেন আপনাদের।” অনির্বাণ বলে, “তোমার মামার নাম কী?” নামটা শুনেই অনির্বাণ বুঝতে পারে এতক্ষণ ধরে ও যা ভাবছিল সবটাই সঠিক। এবার অনির্বাণ বিট্টুকে জিজ্ঞাসা করে, “তোমার মামা এখন থাকেন কোথায়?” বিট্টুর উত্তর— “ওই অজয় নদীর ওপারে রামপুর গ্রামে। ওখানেই তো আমার মামার বাড়ি। আমি মাঝে মাঝে মামার কাছে যাই। বাবা অবশ্য যায় না।” অনির্বাণ এত কষ্টের মধ্যেও যেন খানিকটা আলোর রশ্মি দেখতে পায়, মনে হয় এখন বিট্টুর মামার সাথে কথা বলে। কিন্তু আবেগ চেপে রেখে বলে, “চল চল, বেরোতে হবে, —ট্রেন পাওয়া যাবে। একটা এদিকে আর-একটা ওদিকে যাবে। মানে একটা পূর্বদিকে, আর-একটা পশ্চিমদিকে। যদিকে খুশি, আপাতত আপনি কয়েকদিনের জন্য বাইরে চলে যান। তারপর আমি বাকি সব কিছু খবর নিয়ে আপনাকে জানানো সেইভাবে যা করার করবেন।” বলেই একটা কাগজে নিজের ফোন নম্বর লিখে দিল বিট্টু। অনির্বাণ আর বিট্টু বেরিয়ে পড়ে স্টেশনের দিকে।

বিট্টু আর ওর বাবা দুজনের কাছে ঘরের চাবি থাকে, যখন খুশি দুজনে বাড়িতে ঢোকে, যাতে দুজনেরই যাতায়াতের কোনো অসুবিধা না হয় তার জন্য। বিট্টুর সাথে মোটর সাইকেলে যেতে যেতে বিট্টুর মামা রামপুর গ্রামের দিকে কোথায় কোন পাড়াতে থাকে জেনে নেয় অনির্বাণ। বলে, “তোমার মামা কি সবসময় গ্রামের বাড়িতেই থাকেন?” বিট্টু বলে, “হ্যাঁ স্যার, মামা আর কোথায় যাবে? পাশের গ্রামে প্রাইমারি স্কুলে মাস্টারি করে আর বাড়িতেই থাকে। আগে তো অনেক কাজ করতো। এই তো বছর দশেক হল চুপচাপ থাকে। কাজ ছাড়া খুব একটা বাইরে বের হয় না। ... আপনি কি চেনেন মামাকে?” অনির্বাণ বলে, “না না খোঁজ নিচ্ছিলাম।” কথা হতে হতেই কুসুমপুর রেল স্টেশনে ওরা পৌঁছে যায়। হাতঘড়িতে সময় দেখে নেয় অনির্বাণ—চারটে পনের মিনিট। আর খানিক পরেই স্টেশনে ট্রেন আসবে। স্টেশনে লোকজন আসতে শুরু করেছে—অনেকেই ওর দিকে আড়চোখে তাকাচ্ছে, তা বেশ বুঝতে পারে অনির্বাণ। সামান্য পাশে সরে গিয়ে বিট্টুকে বলে, “তুই চলে যা। তোকে আর আমাকে একসাথে দেখলে পরে তাদের অসুবিধা হবে। আমি পরে ফোন করব।” বিট্টু কথা না বাড়িয়ে মোটর সাইকেল চালিয়ে পাড়ি দেয় বাড়ির দিকে।

বুকিং কাউন্টারের দিকে পা বাড়ায় অনির্বাণ—রামপুর স্টেশনের টিকিট কাটে। ট্রেনটা রাইট টাইমে ছিল, স্টেশনে ট্রেন আসতেই তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে। দীর্ঘদিন মাস্টারি করার সুবাদে এদিকে অনেকেই ওকে চেনে। তারপর সারারাত ধরে টিভির খবর যে অনেকেই দেখেছে সে জন্যে আড়চোখে কেউ ওর দিকে তাকালেই অনির্বাণের মনে হচ্ছিল এই বোধ হয় জিজ্ঞাসা করে, “মাস্টারমশাই কোথায় চললেন? কী হয়েছে ব্যাপারটা?” যাইহোক এসব কেউ জানতে চায়নি। ট্রেনটা ফাঁকা ছিল। কখন সে ঘুমিয়ে পড়ে বুঝতেই পারে না। ঘুম ভাঙে রামপুর স্টেশনের আগের স্টেশনে। ধড়মড় করে উঠে পাশের জনকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নেয় পরের স্টেশনটাই রামপুর। রামপুরে গাড়ি থামলো—তখন সকাল ৮টা। একটা রিক্সা নিয়ে অনির্বাণ শ্রীপর্ণ-র বাড়ির দিকে এগিয়ে চলে।

শ্রীপর্ণ আসলে যে বিট্টুর মামা তা জানত না অনির্বাণ। দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছরের বেশি যোগাযোগ নেই দুজনের মধ্যে। বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়ার পর থেকে ওরা হারিয়ে গিয়েছিল পরস্পরের কাছ থেকে। কিন্তু অনির্বাণ জানত যে শ্রীপর্ণ রামপুরেই থাকে, কোনো একটা প্রাইমারি স্কুলে মাস্টারি করে। কিন্তু পার্টির সাথে আর যোগাযোগ নেই। বহুবার ইচ্ছা হয়েছিল ওর সাথে দেখা করার, সময় হয়ে ওঠেনি। একই রুমে হোস্টেলে কত রাত কাটিয়েছে ওরা দু'জন। কত কথা সব মনে পড়ে অনির্বাণের। মনে মনে ভাবে হঠাৎ করে আজ শ্রীপর্ণ-র বাড়িতে হাজির হলে কেমনভাবে গ্রহণ করবে শ্রীপর্ণ? ভালোভাবে করবে তো? ... প্রথম দেখা হলে কীভাবে সম্ভাষণ করবে অনির্বাণ শ্রীপর্ণকে? আর শ্রীপর্ণই বা ওকে কেমন করে গ্রহণ করবে? ভাবতে ভাবতে রিক্সাওয়ালা কখন যে ওকে নিয়ে চলে আসে শ্রীপর্ণ-র বাড়ির দরজার কাছে তা বুঝতেও পারে না। —“বাবু এই যে আমরা চলে এলাম, নামুন।” রিক্সাওয়ালার আওয়াজে অনির্বাণের সম্মতি ফিরে আসে। বলে ওঠে —“ও হ্যাঁ।”

তাড়াতাড়ি নেমে ভাড়া চুকিয়ে দেয় অনির্বাণ। দেখে একটা ছিমছাম বাগানের মাঝখানে বাড়িটা। গেট থেকে রাস্তার দু ধারে সুন্দর বাগান। গেটের গায়ে কলিং বেল। খানিকটা ইতস্তত্‌ভাবে, তারপর জোরে বেলটা চেপে ধরে অনির্বাণ। একবার ... দুইবার ...

তিনবার। খট করে দরজা খোলার শব্দ হয়, বাড়িওয়ালা বেরিয়ে আসে। পাজামা পরে আছে, খালি গায়ে খালি পায়ে, ধপধপে ফর্সা, একমুখ লম্বা দাড়ি। অনির্বাণের মনে হয় ... সেই ... শ্রীপর্ণ। শুধুমাত্র চুল-দাড়িগুলো সব সাদা, বাকি কোথাও কোনো পার্থক্য নেই। আস্তে আস্তে গেটের দিকে এগিয়ে আসে শ্রীপর্ণ। গেটটা খোলার আগে এক দৃষ্টিতে অনির্বাণের দিকে তাকিয়ে থাকে। চোখ দুটো ছোট করে ঞ্চ কঁচকে সে চেনার চেষ্টা করছে—কিন্তু পারছে না। অর্ধেক হয়ে অনির্বাণ বলে, “দেখছিস কী খোল, আমি অনির্বাণ।” ভূত দেখার মতো চমকে ওঠে শ্রীপর্ণ, আবেগে অনির্বাণকে জড়িয়ে ধরে বলে ওঠে, “বাবা কত দিন পর, তা প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর হবে। হঠাৎ কী মনে করে? চল চল তাড়াতাড়ি।” বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করে ওরা দু’জন। ভিতরে ঢুকেই অনির্বাণ বলে, “একটু চা খাওয়াবি আর স্নান করার ব্যবস্থা করে দে। সাথে কোনো লাগেজ নেই এক বস্ত্রে বাড়ি থেকে বার হয়ে এসেছি।” শ্রীপর্ণ বলে ওঠে, “আমি সব জানি, গতকালই টিভিতে খবর দেখেছি, কিন্তু মাস্টারমশাই যে তুই তা বুঝতে পারিনি। ঠিক আছে তোর যা যা দরকার ঐ দেখ কাঠের আলমারির মধ্যে আছে। সব পাবি— জামা, পাঞ্জাবি, লুঙ্গি সব আছে। রেডি হয়ে নে। অনেক ধকল গিয়েছে। পরে সব কথা শুনবোখন। যতক্ষণ না কোনো সুরাহা হয় এখানে থাক, আর আমি দেখি কী করা যায়। কোনো চিন্তা নেই, থাক না এখানে।” অনেকটা নিশ্চিত বোধ করে অনির্বাণ।

স্নান-টান করে রেডি হয়ে এসে অনির্বাণ বলে, “শোন, অতসীর ছেলের সাথে দেখা হল, সে আবার আমার ছাত্র। জানতাম না, কিন্তু গতকালই জানলাম, যখন সে আমাকে তার বাবা সতনামের পরামর্শে ওর বাড়িতে নিয়ে যায় তখনই”—বলেই সতনাম পর্বের আনুপূর্বিক বিবরণ পেশ করলো। মনে মনে ভাবে, গতকাল বিটু যদি না নিয়ে যেত তাহলে কী হত? অনির্বাণের মনের কথা বুঝতে পেরে শ্রীপর্ণ বলে ওঠে, “বিটু তোকে না নিয়ে গেলে সর্বনাশ হত রে। আর তোর সাথে যে আমার পুরনো পরিচয় তা বিটুকে বলেছিস?” অনির্বাণ উত্তর দেয় “না, শুধু তাই নয়, অতসীকেও জানতাম তাও বলিনি। ছেলোটা মায়ের মতোই ইনোসেন্ট হয়েছে”—বলেই পকেট থেকে শ’দেড়েক টাকা বার করে শ্রীপর্ণকে দেখিয়ে বলে, “দেখ তোর ভাগ্নে আমাকে এটা দিয়েছে।” কষ্টের মধ্যেও হেসে ফেলে অনির্বাণ। ইতিমধ্যে মামা-ভাগ্নের মধ্যে ফোনে একপ্রস্থ কথা হল। কিন্তু শ্রীপর্ণ জানাল না যে অনির্বাণ ওর কাছেই আছে।

এদিকে খিদের জ্বালায় পেট চুই চুই করছে অনির্বাণের। কিছু খাবার জন্য মনটা ছটফট করে। পাশের বাড়িতে বোধহয় রুটি হচ্ছিল ...। অনির্বাণ শ্রীপর্ণকে বলে ওঠে, “কোথায় কী সুন্দর গরম গরম রুটি হচ্ছে, গন্ধ পাচ্ছিস?” শ্রীপর্ণ অবাক হয়ে বলে, “তুই এখনও গরম রুটির গন্ধ পাস অনির্বাণ?” কথাটা বলে শ্রীপর্ণ এমনভাবে তাকিয়ে রইল যে, ওর সেই দৃষ্টির দিকে সোজা করে তাকাতে পারিছিল না অনির্বাণ। বাড়ির ছাদের দিকে চোখ রেখে পাল্টা প্রশ্ন করলো, “তুই পাস শ্রীপর্ণ? আমার তো মনে হয় তোর আমার মতো যারা একদিন সমাজ বদলের লড়াইয়ে এই গরম রুটির গন্ধে পাগল হয়ে যোগদান করেছিলাম তারা অনেকই পাই না রে। যদি পেতাম ...” বলেই একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলল অনির্বাণ, যেন কোনো অতৃপ্তি ওকে গ্রাস করেছে। আলাতোভাবে কাঁধে হাত রেখে শ্রীপর্ণ অনির্বাণকে জিজ্ঞাসা করে, “তোর খুব খিদে পেয়েছে তাই না রে?” অনির্বাণ মাথা নাড়ে। বাড়িতে কাজের মেয়েটা একটি থালাতে করে গোটা চারেক রুটি, খানিকটা

আলুভাজা আর একটা ওমলেট দিয়ে যায়। শ্রীপর্ণ বলে, “নে খেয়ে নে, পরে কথা হবে।”

খাওয়ার পরে খানিকটা ধাতস্থ হয় অনির্বাণ। এক মনে ওর খাওয়া লক্ষ করছিল শ্রীপর্ণ। এবার একটা সিগারেট অনির্বাণের দিকে বাড়িয়ে দিয়াশলাইটা বাড়িয়ে দিল, নিজে একটা ধরাল। একগাল ধোঁয়া ছেড়ে বলল, “চিন্তা করিস না আমি খবর নিচ্ছি। ওখানে তো তোদের ছোট-বড় কোনো নেতারই আর কাজ করার সুযোগ নেই। চরম সম্ভ্রাস, পুলিশি নির্যাতন। আইন কানূনের তোয়াক্কা নেই। তবুও কতদূর কী করা যায় দেখছি।” অনির্বাণ বলে ওঠে, “দেখ সে ভাবনা আমার কিছুই নেই। কারণ সেই দিনটার কথা মনে কর যখন আমরা ছাত্র ছিলাম। যেদিন শপথ নিয়েছিলাম যে সমাজ পরিবর্তনের লড়াই-এ অংশ নেব, তা যতই কঠোর হোক না কেন সেখান থেকে সরে আসব না—তোর মনে আছে?” শ্রীপর্ণ উত্তর দেয়—“মনে নেই আবার, খুব আছে, কিন্তু আমি তোর মতো কোনো নিয়মের ছাঁচে বাঁধা নেই, আমার কোনো দায়বদ্ধতাও নেই”—বলে দুম করে একটা প্রশ্ন করে বসে শ্রীপর্ণ, “আচ্ছা তুই আমাকে বল তো, বিপ্লবের নেতৃত্ব কারা দেয়?” অনির্বাণ সরলভাবেই বলল, “কেন, শ্রমিক শ্রেণি।” শ্রীপর্ণ-র দ্বিতীয় প্রশ্ন, “আর শ্রমিক শ্রেণিকে কারা নেতৃত্ব দেয়?” অনির্বাণ বলে ওঠে—“কেন এসব বাজে বক্ছিস বল তো, তুই জানিস না, যারা পেশাদার বিপ্লবী তারাই তো শ্রমিক শ্রেণিকে নেতৃত্ব দিয়ে থাকে?” শ্রীপর্ণ বলে, “ঠিক বলেছিস।”

শ্রীপর্ণ আবার প্রশ্নের ছলে বলে ওঠে, “জানিস আমার মনে একটা বিষয় নিয়ে একটা ধন্দ কাজ করে। তা হল, ধর আমাদের দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হল। সমাজতন্ত্র মানে তো একটা সুন্দর জীবন—ভালো জীবন—সুখদায়ক জীবন। কিন্তু এই জীবনে যেতে হলে অনেক অনেক কষ্ট স্বীকার করতে হবে। জেল, জরিমানা এমনকি মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ জীবন সেটাও যেতে পারে”—এই পর্যন্ত বলে অনির্বাণের দিকে লক্ষ করে বলে, “বল পারে কি না?” অনির্বাণ সম্মতি সূচক মাথা নাড়ে। “ঠিক আছে আমার প্রথম প্রশ্নের উত্তরে তুই পাস” বলে আবার শুরু করে শ্রীপর্ণ—“আমাদের দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন হবার পরে যে যে সুযোগ সুবিধা এবং আরাম প্রমোদ একজন সমাজতান্ত্রিক দেশের নির্মাণকারীর পক্ষে পাওয়া সম্ভব, তার থেকে আমাদের দেশে যে সব পেশাদার বিপ্লবীরা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য লড়াই করছেন তাঁরা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে না থেকেও যে সব সুযোগ বা আরাম ভোগ করছেন তা কি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে কম? যদি কম পেয়ে থাকেন তাহলে কোনো প্রশ্ন নেই। আর যদি বেশি পেয়ে থাকেন তাহলে তারা কেন এই ঝুঁকিপূর্ণ পথের শরিক হয়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সত্যি সত্যি লড়াই করবেন?”

এবার অনির্বাণ তার চোখের সামনে যে-সব পেশাদার বিপ্লবীরা আছেন তাঁদের সম্বন্ধে নিজের অজান্তেই চোখ বুলোতে থাকে—এ কি! এ কার বিশ্বরূপ দেখছে অনির্বাণ? এতটা তো তলিয়ে ভাবেনি। মাথা ধরে যায় অনির্বাণের, বলে, “থাক, তোর মাথা শয়তানের কারখানা, তোর মাথা থেকে এখন যা মাল মশলা বের হবে তার কাটান দেওয়া আমার পক্ষে এখনও সম্ভব নয়। তবে মনে হয় তোর এই তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ঠিক নয়।”

শ্রীপর্ণ বলে ওঠে, “ঠিক নয় মানে, আলবাত ঠিক। যাঁরা বিপ্লব করবেন তাঁরা তো বিপ্লবের আগেই যা পাচ্ছেন বিপ্লব হলে এর থেকে কী বেশি পাবেন? যদি না পাওয়া যায় তাহলে কেন এত রিস্ক নিতে যাওয়া? দেখছিস এদের জীবন? একজন কর্পোরেট স্টাইলের ব্যক্তি যেভাবে ঘড়ি ধরে জীবনযাপন করে,

ঠিক সেভাবেই এরা জীবনযাপন করে। এদের দিয়ে বিপ্লব হবে?—কখনোই না।” অনির্বাক্য উত্তর দেয়— “তোমার কথার মধ্যে আপাতত সারবত্তা আছে বলে মনে হলেও দর্শন কিন্তু তোমার মতকে সমর্থন করে না। তাহলে তো গণতান্ত্রিক সমাজের বিকাশের কোনো ইতিহাসই থাকত না। সবটাই শোষণ বঞ্চনা আর মধ্যযুগের ইতিহাস হতো। কিন্তু তা হয়নি। কারণ বার বার পরিবর্তনের লড়াই হচ্ছে— কেন হচ্ছে? কেন ইতিহাসের পট পরিবর্তন হচ্ছে? শোনো বন্ধু, এক ধরনের বৌদ্ধিক ভ্রম—‘ইন্টেলেক্চুয়েল হ্যালুসিনেশন’ তোমাকে এই ভ্রান্ত বিচ্ছিন্নতার সিদ্ধান্তে নিয়ে এসেছে। সমাজ পরিবর্তনের তত্ত্বের সাথে তোমার তথাকথিত ভোগবাদী বিচ্ছিন্নতার কোনো সম্পর্ক নেই। এক চরম বিচ্ছিন্নতা তোমাকে গ্রাস করেছে শ্রীপর্ণ, তাই তুমি এরকম একটা দীর্ঘস্থায়ী লড়াইকে একটি নান্দনিক শিল্পকর্মের সাথে তুলনা করতে পারছ না। কিন্তু মনে রেখো সমাজ পরিবর্তনের এই লড়াইটাও হল একটা শিল্পকর্ম, যা একাধারে চরম নান্দনিক, অন্যদিকে আবার চরম ক্ল্যাসিক। তুমি যদি সমাজ, ব্যক্তি, সংগঠন সম্পর্কে বিচ্ছিন্নতায় ভোগো তাহলে সমাজ পরিবর্তনের এই ক্ল্যাসিক্যাল সৃষ্টিকে বুঝতে পারবে না। আর পাঁচটা লড়াই এর সাথে এর পার্থক্য করতে পারবে না। ফলে চাওয়া-পাওয়ার দৃষ্টিতেই তুমি এই মহৎ সৃষ্টিকে বিচার করবে। আর এখানেই তোমার ভুল হচ্ছে শ্রীপর্ণ।” এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে অনির্বাক্য আবার বলে “দেখ ভ্রাতৃকি কিছু বিচ্ছিন্ন উদাহরণ হয়তো থাকলেও থাকতে পারে কিন্তু তা কখনই চিরায়ত নয়। আর এই বিচ্ছিন্ন উদাহরণগুলিকে যারা চিরায়ত বলে মনে করে নিজের পথ থেকে সরে আসতে চায় আমি তাদের দলে নই।”

এবার আলোচনা অন্যদিকে যেতে পারে মনে করে শ্রীপর্ণ বলে ওঠে, “ঠিক আছে, চল এখন কুসুমপুরের খবর নিই, তারপর এটা নিয়ে তর্ক করা যাবে। এখন খানিকটা রেস্ট নিয়ে নে। আমিও খবর নিয়ে দেখছি কী করা যায়।”

চরম ক্লান্তিতে গভীর ঘুমের দেশে তলিয়ে যেতে থাকে অনির্বাক্য। কিন্তু ছায়াছবির মতো মাথার মধ্যে ভাসতে থাকে বিস্ময়—রাজ্য-দেশব্যাপী শ্রমজীবী অংশের নেতৃত্বে নানা আত্মত্যাগের ঘটনা। যার সাথে ভোগবাদের আদৌ কোনো সম্পর্ক নেই—তাহলে? ঘুম আসে না। আবার বিছানায় উঠে বসে টিভিটা চালিয়ে দেয়। দেখে সত্য মিথ্যা নানা বর্ণনায় অনির্বাক্যকে চিত্রিত করা হচ্ছে। সে নাকি হার্মাদদের নেতা। তার দাপটে ওদের পথ চলা দায়। স্কুলের কচি-কাচাদের শুধু মাথা খাওয়াই নয়, তাদের নিয়ে রাজনীতিও করে অনির্বাক্য। এ ধরনের ব্যক্তির কঠোর সাজা হওয়ার দরকার বলে অভিমত স্থানীয় বিধায়ক নেতা সবারই। শুধুমাত্র কয়েকজন ছাত্র কালো ব্যাজ পরে এর প্রতিবাদ করেছে। এলাকার স্কুলগুলিতে নাকি ছাত্র-ছাত্রীরা আসেনি—ফাঁকাই ছিল। কারও মতে এটা ছাত্রদের সরকারি অবিচারের বিরুদ্ধে একটা প্রতিবাদ। যদিও স্থানীয় বিধায়কের মতে অনির্বাক্যের গুণ্ডারা মানে ছাত্ররা স্কুল-কলেজ বন্ধ রেখেছে, পড়ুয়াদের আসতে দেয়নি। দু-চারটে পোস্টারও কে বা কারা সাঁটিয়ে দিয়েছে অন্যায্য পুলিশি জুলুম এবং সরকারি চক্রান্তে সাজানো মামলার বিরুদ্ধে। অনির্বাক্য ভাবতে শুরু করে, তাহলে? যাদের সম্বন্ধে ভাবছিল তারা কিছু করবে না, চুপ করে বসে আছে, তারাই কি এসব করছে? অথবা



যারা কেউ নয়, চুপচাপ সভা সমিতিতে আসে, ওদের কথা শোনে, তারাই কি? নাকি শ্রীপর্ণ-র মতো সব কিছু বুঝেও যারা মরুঝাড়ের সময় উটের মতো বালিতে মুখ গুঁজে আছে তারা? কারা এ সময় অন্ধ হলেও প্রতিবাদের স্ফুলিঙ্গ জ্বালিয়ে রেখেছে? দ্বিধায় পড়ে যায় অনির্বাক্য। তাহলে কি দূরে কোথাও গা ঢাকা দিয়ে থাকবে, না ফিরে যাবে ওদের মধ্যে—যারা অসহায়ভাবে বুকের আগুণটাকে জ্বালিয়ে রেখেছে তাদের মধ্যে? খুঁজে বার করবে তাদের? কী করবে ... হ্যাঁ ফিরে যাবে, তারাই আশ্রয় দেবে। অনির্বাক্য ঠিক করে মরুভূমির উটের মতো মরুঝড়ে মুখ গুঁজে থাকাদের মধ্যে নয়, ফিরে যাবে, আজকেই ফিরে যাবে এসব ঝোড়ো পাখিদের সন্ধানে। যারা এখনও ডানা মেলে সাহসের সাথে উড়ছে, ডাঙার সন্ধানে, আশ্রয়ের সন্ধানে।

ছড়মুড় করে উঠে বসে অনির্বাক্য। ময়লা পা-জামা আর পাঞ্জাবিটা গায়ে গলিয়ে নেয়। হাতখড়িটা পরে নিয়ে টেবিলে রাখা শ্রীপর্ণ-র সিগারেটের প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বার করে ঠোটে গুঁজে নেয় অনির্বাক্য। শ্রীপর্ণ-র দামি লাইটারটা জ্বালিয়ে বড় আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে খানিকক্ষণ। সিগারেটটা ধরায় না। লাইটারের আগুনে সিগারেট ঠোটে চেপে ধরা অনির্বাক্যের মুখটা লাল হয়ে ওঠে। হঠাৎ অনির্বাক্য খেয়াল করে শ্রীপর্ণ কখন যেন ওর পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। আয়নাটা লক্ষ করে শ্রীপর্ণ বলে ওঠে, “কী রে, আমার লাইটারের আগুনে নিজের মুখটা দেখছিস নাকি?” চমকে উঠে লাইটারটা বন্ধ করে অনির্বাক্য বলে, “হ্যাঁ, ঠিক তাই, কিন্তু কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না।” ঠোট থেকে সিগারেটটা নামিয়ে মুচড়ে ভেঙে দেয়। লাইটারটা টেবিলে নামিয়ে রেখে বলে, “অনেক ধন্যবাদ, তোর এই ক্ষণিক আশ্রয়ের জন্য। ভাবছি ফিরেই যাবো। আমার কোনো অভাব নেই, এখন যা পাই বিপ্লব হলে তার থেকে কম পাবো জেনেও ফিরেই যাচ্ছি যারা বিপ্লবের জন্য লড়বে তাদের কাছে। তোর যদি কোনদিন ইচ্ছা হয় আসিস।”

হাঁ করে তাকিয়ে থাকে শ্রীপর্ণ। ওকে আর কোনো কথা বলতে না দিয়ে পায়ে পায়ে রাজপথে অনিশ্চিতের দিকে এগিয়ে যায় অনির্বাক্য। মিলিয়ে যায় অনির্বাক্য জনারণ্যে। ... অনিশ্চিতের পথে।



প্রতিভা

গৌতম চট্টোপাধ্যায়

সোমবার সাতসকালে উইমকো ম্যাচ ফ্যাক্টরির গেটে ছলুছলু কাণ্ড। তপন মুখার্জিকে গার্ড ঢুকতে দেবে না কিছুতেই। কার্ড পাঞ্চও করবে না সে। কারণ কার্ড-এর ব্যক্তির ছবির সাথে তপনের ছবি মিলছে না। কার্ড-এ পাঞ্জাবীদের মতো ঝুঁটিঝাঁধা চুল এবং জাল দিয়ে বাঁধা আঁচড়ানো চাপ দাড়ি। নাম-ধাম কিছুই পড়তে পারে না গার্ড পুনিত থাপা। অসম থেকে সবেমাত্র বদলি হয়ে গত বুধবার দক্ষিণেশ্বরের ফ্যাক্টরিতে ডিউটিতে জয়েন করেছে। তপন মুখার্জি, গতকাল দাড়ি-গোঁফ-চুল সব কেটেছে তার প্রতিজ্ঞা পূরণ হয়েছে বলে। শর্শু-গুন্স-মস্তকমুণ্ডণ করেছে রবিবার আর সোমবার সে এসেছে কাজে যোগ দিতে। সে একসপ্তাহ আগে ছুটিতে গিয়েছিল যখন, তখন তার সতিহি গোঁফ-দাড়ি-চুল ছবিতে যেমন দেখাচ্ছে তেমনই ছিল, কিন্তু গতকাল থেকে নেই। এই চুল-দাড়ি-গোঁফ ছিল তার গত একবছর ধরেই। সেগুলো রাখা হয়েছিল একটা প্রতিজ্ঞা-রক্ষার জন্য। যেহেতু গার্ড নাম-ধাম পড়ে দেখার ধার ধারছে না, তপন মুখার্জি মানে, দাড়ি-গোঁফ-মাথা কামানো তপন আর দাড়ি-গোঁফ-ঝুঁটিওয়ালা তপন যে একই ব্যক্তি তা প্রমাণ করা শক্ত হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তপন উইমকোর তিন বছরের পুরানো কর্মী আর গার্ড আনকোরা নতুন। সুতরাং তর্কাতর্কিই সার। সহকর্মীদের সাহায্য নেওয়াই বিকল্প পথ ভেবে তপন একে একে তাদের

মুখাপেক্ষী হতে গেল। কী আশ্চর্য তারাও কেমন চিনতে না পারার ভান করে এক এক করে গেট দিয়ে ঢুকে গেল। তার পাশের মেসিনে কাজ করে জীবন পাল, সে যখন চিনতে পারল না তখন তপন হতাশ হয়ে বসে পড়ল গেটের পাশে গাছতলায়। মনে মনে ঠিক করে নিল যে সকাল দশটা নাগাদ যখন ফ্যাক্টরির সর্বময় কর্তা আইবুলসইমানসন গাড়ি করে আসবেন, তখন সাহেবের কাছে তপন নালিশ জানাবে।

তর্কাতর্কি, ধাক্কাধাক্কি, শেষপর্যন্ত অসহায় অসফল, তপন বেশ ক্লান্ত ও কাহিল হয়ে পড়েছিল। গাছের ছায়ায় চোখের পাতাদুটো লেগে গেল। ঠিক তখনই সাম্প্রতিক ঘটনাগুলো উড়ে উড়ে পুঞ্জ-পুঞ্জ মেঘের মতো কিংবা সিনেমার ফ্ল্যাশ-ব্যাকের মতো তপনের স্বপ্নে দেখা দিল।

তপন ফুটবলটা ভালই খেলে। দক্ষিণেশ্বর ইয়ংমেনস্ অ্যাসোসিয়েশন-এর, ডায়মা-র, রাইট হাফ সে। ফুটবল অন্ত প্রাণ। গতবছর, অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার, চক্ৰিশ পরগণা লিগে ডায়মা অত্যন্ত খারাপ খেলে প্রথম ডিভিশনের রেলিগেশন ফাইটে দমদম শ্রীসঙ্ঘের কাছে ৩-১ গোলে হেরে দ্বিতীয় ডিভিশনে নেমে যায়। দক্ষিণেশ্বরের ভালো খেলোয়াড়রা প্রায় কেউ-ই টিমে ছিল না। ভবানী রায় বালিপ্রতিভায়, সমীর বোস স্পোর্টিং ইউনিয়ন-এ, প্রদীপ বিশ্বাস এরিয়ালে, মোহিনী বিশ্বাস এক্য

সম্মিলনীতে—কোলকাতায় তখন প্রথম ডিভিশন খেলছে। তপন কিন্তু মনে খুব আঘাত পেয়েছিল। সে প্রতিজ্ঞা করে বসল, একবছর জান-প্রাণ দিয়ে খেলে দ্বিতীয় ডিভিশনে দক্ষিণেশ্বরকে এক বছরে চ্যাম্পিয়ন করে—প্রথম ডিভিশনে না ওঠা পর্যন্ত সে চুল-দাড়ি-গোঁফ কাটবে না। দক্ষিণেশ্বর দ্বিতীয় ডিভিশনে নামার পর তপন দু-চার দিন বিমর্ষ হয়ে পড়েছিল। তারপর কালীমন্দিরে গিয়ে মানত করে এল চুল-দাড়ি না কাটার। একটা বছর কোথা দিয়ে কেটেছে কেউ জানে না। সকাল ছটা থেকে তিনটে উইমকোর কাজ। তারপর চারটি মুড়ি চিবোতে চিবোতে দক্ষিণেশ্বর মাঠে। কঠোর অনুশীলন সন্ধ্যা অবধি। বাড়ি ফিরে রাত্রের ঘুম। চুল-দাড়ি বেড়েছে দিনে দিনে অসভ্যের মতো। তাদের অনুশাসনে বাঁধার জন্য ঝুঁটি আর জাল। পাড়ার ছেলে ছোকরারা তো কবে একদিন থেকে খ্যাপাতেই শুরু করল ‘সিং-জি-সৎ-শ্রী-আকাল’ বলে। তপন ঠ্যাং বাড়িয়ে ঝামেলা পাকায় নি। তার ফোকাস একটাই। প্রথম ডিভিশনে ওঠা। ততক্ষণ গায়ের জ্বলুনিটাকে পুষে রাখা, চুল-দাড়ি পুষে রাখা। জ্বলুনি যত বাড়ে বাড়িতে-বাইরে লোকের ঠেস দেওয়া কথায়-বিন্দুপে, তপন ততই শরীরে-মনে আরও শক্ত হয়ে ওঠার অনুশীলন চালিয়ে যায়।

দ্বিতীয় ডিভিশনের প্রথম ম্যাচ বরানগর ইউনাইটেডের সঙ্গে। তপন বাবা-মাকে প্রণাম করে শুরু করল বছরটা। বাবা কালীপ্রতিম একসময় ঢাকা উয়াড়ী-তে খেলতেন। দেশভাগের কালে সব চুলোয় গেছে। একটা চায়ের দোকান করে কোনও মতে সংসার চালান। তপন পড়াশুনোয় এমন কিছু ভালো ছিল না। উইমকো-র চাকরিটা পেয়ে এখন সংসারে কিছুটা সচ্ছলতা এনেছে তপন এবং চাকরিটা তার ফুটবল খেলার জন্যেই।

প্রথম ম্যাচটা প্রায় ৬০ মিনিট পর্যন্ত গোলশূন্য। এরপর তপন যখন নিজেদের হাফে, প্রতিপক্ষ ফরোয়ার্ডের পা থেকে সব বলটা ছিনিয়ে দু’পা এগিয়েই দেখে বিপক্ষ গোলকিপার প্রায় সাত-আট পা এগিয়ে ডান-দিক চেপে দাঁড়িয়ে। তপনের ভেতরের মানুষটা হঠাৎ ডেকে উঠল—এই সুযোগ। সবাই ভাবছে তপন এগিয়ে কোনো সামনের সহ-খেলোয়াড়কে পাশ দেবে। তপন জোরালো শটে উঁচু করে সটান গোলে মেরে দিল। বলটা গোলকিপারকে ও বরানগরের সব খেলোয়াড়দের স্তম্ভিত করে বাঁ-দিকের কোণ ঘেষে সোজা গোলে আশ্রয় নিলো। সেই দর্শনীয় গোলেই দক্ষিণেশ্বরের প্রথম জয় দ্বিতীয় ডিভিশনে। তারপর একে একে আরো নটি ম্যাচ জিতে, দুটি ড্র করে, দক্ষিণেশ্বর দ্বিতীয় ডিভিশন লিগ টেবল-এর শীর্ষে। শেষ খেলা আড়িয়াদহ স্পোর্টিং ক্লাব-এর সঙ্গে। এড়েঁদা নটিতে জিতেছে, তিনটি ড্র করেছে—মাত্র দুই পয়েন্ট পেছনে। এড়েঁদাকে জিততেই হবে, আর দক্ষিণেশ্বর ড্র করলেও চ্যাম্পিয়ন।

শনিবারের বড় ম্যাচ। অনেকটা মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের মতো। দক্ষিণেশ্বর মাঠে। কাতারে-কাতারে দর্শক। একদিকে গোটা এঁড়েদার সমর্থককূল, আরেকদিকে দক্ষিণেশ্বরের ছেলে-ছোকরারা। গোলের পেছনে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মঞ্চ। উইমকোর ম্যানেজার আইবুলসইমানসন তপনকে চাকরি দিয়েছিলেন খেলার জন্য, তিনি দক্ষিণেশ্বরের একজন পৃষ্ঠপোষক। তিনি, বিখ্যাত ফুটবলার আমেদ খান, পরিমল দে, কেষ্ট পাল সব মঞ্চে আসীন।

খেলা শুরুর বাঁশি বাজার সঙ্গে সঙ্গে এঁড়েদার শঙ্করী চাটুজ্যে, সেন্টার হওয়ামাত্র, বল নিয়ে একে বেকে তীব্রবেগে দৌড়ে, তিনজনকে অনবদ্য ড্রিবলে পরাস্ত করে গোলে বল ঠেলে দিল ছ-সেকেন্ডের মাথায়। তপনের মাথায় বাজ পড়ল যেন। রাইট-ব্যাক দিলীপ সেনগুপ্ত আর স্টপার নারায়ণ পাল—দক্ষিণেশ্বরের ডিফেন্সের স্তম্ভ যারা—তারাও কেঁপে উঠলেন। দক্ষিণেশ্বরকে নিয়ে এরকম ছেলেখেলা? খেলায় শেষ পর্যন্ত দক্ষিণেশ্বরকে ক’ গোল হজম করতে হবে তাই নিয়ে চিন্তা শুরু হয়ে গেল। দক্ষিণেশ্বরের সমর্থকরা স্তব্ধ-নিশ্চুপ। এঁড়েদার কোনও খেলোয়াড়ের পায়ে বল পড়লেই এঁড়েদার সমর্থকদের কী বিপুল চিৎকার। দক্ষিণেশ্বর টিমটা কেমন যেন সাঁটিয়ে গেল। পাশ করে তো ভুল, রিসিভিং বাজে—পা থেকে বল ছিটকে অপোনেন্টের পায়ে, অকারণ বেশি ড্রিবল করছে ফরোয়ার্ডরা আর বিপক্ষের খেলোয়াড়দের পায়ে বল জমা দিচ্ছে। আর নাস্তানাবুদ করে দিচ্ছে এঁড়েদা আক্রমণের পর আক্রমণ শানিয়ে। হাফটাইম পর্যন্ত দক্ষিণেশ্বর যে আর গোল খায় নি, তার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব গোরাদার—আর ব্যানার্জি সেদিন দুরন্ত কিপিং করে যেন সনৎ শেঠকেও হার মানিয়েছিল। হাফটাইমে দক্ষিণেশ্বরের খেলোয়াড়দের বল-ভরসা জুগিয়ে গেলেন আমেদ খান। হয়তো কিছু শলা-পরামর্শও দিলেন।

দেখা গেল, দ্বিতীয়ার্ধের খেলায় দক্ষিণেশ্বর নিজেকে গুছিয়ে নিয়েছে। নিজেদের মধ্যে পাশ খেলে খেলে নিখুঁত ছকে বিপক্ষকে নিজেদের জোনে আটকে রেখেছে। মাঠ ছড়িয়ে খেলছে, উইং দিয়ে আক্রমণ হানছে তীব্র গতিতে তারপর বক্স-এ বাঁকানো সেন্টার। পঞ্চাশ মিনিটের মাথায় এরকম এক সেট পিস মুভমেন্ট থেকে, নিজেদের হাফ থেকে দৌড়ে বাঁকানো সেন্টারে মাথা ছুঁইয়ে গোল করে এল তপন। ষাট মিনিটে কর্নার কিক থেকে ভাসানো বলে হেডে গোল করে এল মানিক ভৌমিক। এবার টিপটিপ করে বৃষ্টি শুরু হল। মাঠও ভিজে গেল, পেছলও হয়ে গেল খানিকটা। এ অবস্থায় এঁড়েদার কফিনে শেষ পেরেকটা পুঁতলেন বোকোনদা—প্রদীপ চ্যাটার্জি। মাঠের বাঁদিক থেকে সোজা কোনাকুনি দৌড়। যেই এঁড়েদার কোনো ডিফেন্ডার স্লাইডিং ট্যাকল করতে উদ্যত হয়, বলটা টুক করে আগে বাড়িয়ে, ছোট্ট লাফে তাকে অতিক্রম করে যান বোকোনদা। এঁড়েদার বিখ্যাত গোলকিপার শৈল ঘটকের মুখোমুখি হয়ে বোকোনদা এমন কোমরদুলুনি দিলেন যে শৈলদা ডানদিকে আছাড় খেয়ে পড়লেন আর বোকোনদা আলতো টোকায় বা দিক দিয়ে বল জালে ঠেলে দিলেন। রুদ্ধশ্বাস গোল এবং পুরো প্রক্রিয়াটা চোখের পলকে সমাপ্ত হল। সেন্টার হওয়ামাত্র সমাপ্তির বাঁশি।

ছইসিলের দীর্ঘ শব্দ যেন তপনের স্বপ্নভঙ্গ ঘটাল। সে এখন জেগে উঠেই দেখে সাহেবের গাড়ি আসছে। সাহেব জানতেন তপনের প্রতিজ্ঞার কথা। কাজেই তপনের দুর্ভোগের কথা শুনে তার কি হাসি—অট্টহাসি। তপনের চেহারা দেখেন আর হাসেন—ইংরেজিতে বললেন, “এভরিওয়ান গট সো এ্যাকাস্টমড্ উইথ ইয়োর টারবান এন্ড বিয়ার্ড তপন, নাও নোভি ক্যান আইডেনটিফাই দ্য ক্যারিকেচার—তপন। ইউ হ্যাভ শেভড দেম অ্যান্ড ইউ লুক আ জোকার।” তপনকে গাড়িতে তুলে নিয়ে ঢুকে গেলেন ফ্যাক্টরির ভেতর। আর সেলাম ঠুকে গেট খুলে হতভম্ব হয়ে পুনিত থাপা ভাবতে লাগল—ফ্যাপাটার এলেম আছে বটে।

একটি থাপ্পড় অথবা পঞ্চবটি ধূপের গন্ধো

কৌশিক লাহিড়ী

মহিলাকে অনেকক্ষণ ধরেই দেখছিলাম।
কাছে আসতে এবার গলাও শুনতে
পেলাম। একটা একঘেয়ে পেশাদার ক্লান্তি
মেশা গলা।

—আমি অন্ধ মানুষ, তবে হাত পাতি
না, গান গেয়ে ভিক্ষাও করি না।
আপনাদের পছন্দের ধূপকাঠি বিক্রি করি।
পছন্দ হলে কি নেবেন? আমার কিছু
উপকার হত।

কথাগুলো, সোজাসুজি।
ন্যাকামিবর্জিত। খানিকটা হয়ত যান্ত্রিক
তবে, সরলতার জন্যই হয়ত, একটা
সিরসিরে ভাব বয়ে আনছিল। দু-একবার
ভাঙা ভাঙা হিন্দিতেও কথাগুলো
বলছিলেন।

গাড়ির মন্দগতি অনুভব করে,
স্বগতোক্তির মতো একবার বলে
দিলেন—বর্ধমান ঢুকছে। চারটি প্যাকেট
কুড়ি টাকা।

ডাকলাম। —চার প্যাকেট দিন।

উনি দেখলাম ব্যাগ হাতড়াতে শুরু
করলেন। ভাবলাম বুঝি, বুঝতে পারেন
নি। দশ টাকার নোট দুটি বাড়িয়ে দিয়ে
বললাম, —এই নিন।

মহিলা হাত ভর্তি ধূপের প্যাকেট
নিয়েও তখনো ব্যাগ হাতড়াচ্ছেন।

ট্রেন তখন প্রায় প্ল্যাটফর্মে পৌঁছে
গেছে। ইষৎ অধৈর্য ভাবটা যতটা সম্ভব
চেপে রেখে জিজ্ঞেস করলাম—কিছু
খুঁজছেন?

—না কিছু না, এই রাবার ব্যান্ডটা।
আপনার নিতে সুবিধা হবে।

গার্ডার বাঁধা প্যাকেটগুলো আমার
হাতে দিলেন। আমার নজরে পড়ল, ওনার
শূন্য দৃষ্টির চোখ দুটোয় তখন একটা ছোট
যুদ্ধ জয়ের হাসি মাখা।

—একটা কী যেন হাত থেকে পড়ে
গেল।



—কিছু না, প্লাস্টিকের একটা
টুকরো, কামরা নোংরা হবে বলে ফেলিনি,
হাতে রেখেছিলাম। পড়ে গেল। একটু
তুলে রাখবেন, দাদা?

প্লাস্টিকের টুকরোটা মাটি থেকে
তোলার সময় চোখে পড়ল, কামরার
মেঝে ভর্তি চক্ষুন্মান যাত্রীদের ফেলে

দেওয়া মুড়ির চোঙা, প্লাস্টিকের টুকরো
আর চায়ের কাপগুলো গড়াগড়ি যাচ্ছে।
আমি কেবল ওই প্লাস্টিকের ছোট
টুকরোটা কুড়িয়ে নিলাম, নামার সময়
ডাস্টবিনে ফেলে দেওয়ার জন্য। বাকি
কামরোটা পরিষ্কার করার সময়, সুযোগ বা
দায় কোনটাই আমার ছিল না।

With best compliments of

ROY TRANSPORT CO.

G. T. Road, Bhiringi (W), Durgapur-03, Dist. Burdwan

Sl. No. 7

ঘুরে দাঁড়ানোর কথকতা

তপোময় ঘোষ

চারদিকে সম্ভ্রাসের মধ্যেই ওরা চার পাঁচজন পার্টি অফিসটা খুলে ভেতরে বসল। ভোটের রেজাল্ট বেরনোর পর থেকেই আর খোলা হয়নি। ফলাফল শুনে কর্মীরা সবাই বিমর্ষ হয়ে এ মুখো হয়নি। বিজয়মিছিলের নাম করে ওদের দু-একজন উচ্ছৃঙ্খল ছেলে বাইরে থেকে লাঠির ঘা দিয়েছিল। দীর্ঘদিন না খোলায় ভেতরে ধুলোর আস্তরণ পুরু হয়েছে।

ঝাঁটপাট দিয়ে, শতরঞ্চি পেড়ে বসল ওরা। বাইরে রাস্তার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হচ্ছে ওদেরকে। মনে হচ্ছে চারদিকে ফিসফিসানি। কারা যেন কী সব বলছে। পাশের দোকানদার ধানু ময়রা এসে বলল,—কী গো খুললে! ভালো হলো। জায়গাটা ফাঁকা ফাঁকা লাগছিল। ওদের মধ্যে একজন উত্তর দিল,—তোমরা কী বুঝছে? খোলা রাখতে পাবতে তো, না কি হামলা হবে? ধানু বলল, সেটা বাপু বলতে পারব না! বলেই চলে গেল সে।

ওদের আলোচনা চলতে থাকল। কাল থেকে কে কখন আসবে, কতক্ষণ থাকবে—এসব। কথার মাঝেই সবার দৃষ্টি বাইরের দিকে। কখন কী হয়। বড়ই সতর্ক থাকার দিন এখন ওদের। একটু পরে ওই ফুটের বিজয় সাহা আর বিকাশ গড়াই এসে বলল, অফিস তো খুললি, থানা বা ওই পার্টির সঙ্গে একটু আলোচনা করে নিয়েছিস তো? দেখিস ভাই, ঝামেলাটামেলা যেন না হয়। এলাকাটা অনেকদিন শান্ত ছিল।

ওদের মধ্যে থেকে রঞ্জিৎ বেশ বুদ্ধি করে জবাব দিল—
তোমরা তো আছো। যাতে ঝামেলা না হয় দেখো। আমরা তো আর ঝামেলা করতে যাচ্ছি না। ওরা যদি আসে, তোমরা একটু বোঝাবে!

—আমাদের কথা ওরা শুনবে না ভাই। আমরা আটকাতেও পারব না। আমরাই ভয়ে ভয়ে আছি। বিজয়ের হাত ধরে বিকাশ টেনে নিয়ে চলে গেল। বিজয় সাহা এক সময় এ অফিসে আসা যাওয়া করলেও বিকাশ গড়াই কোন পার্টির সমর্থক বোঝা যেত না। এখন বোঝা যাচ্ছে উনি ওদের সমর্থক। সে ভয়ে হোক বা ভক্তিতে।

রাস্তা দিয়ে লোকজন যাতায়াত করছে। রঞ্জিৎদের এক সময়ের সাথীরাও চলে যাচ্ছে। কেউ কেউ সামনে এসে একটু দাঁড়িয়ে কে কে আছে দেখে চলে যাচ্ছে। কেউ ভয়ে এ-মুখো হচ্ছে না। অফিস খোলা আছে এটা আড় চোখে দেখে, চোখে পড়েনি এমন ভান করে চলে যাচ্ছে। তবে পার্টি অফিস খোলা হয়েছে এ সংবাদটা ফ্রমশ এলাকায় এদিক ওদিক চলে যাচ্ছে। এখন অপেক্ষার ওরা কখন কীভাবে আসবে।

আক্রমণের আশঙ্কা নিয়ে ওরা তা প্রায় ঘণ্টা দুই কাটিয়ে ফেলল। রঞ্জিৎ-খোকন-বিশু-বলরাম আর তুষার নিজেদের মধ্যে সবরকম আলোচনাই করছিল। হঠাৎ দেখে রঞ্জিৎদের পাড়ার ছেলে বিজন

আর প্রভাত এদিকে আসছে। রঞ্জিৎ তাদেরকে জিজ্ঞেস করলো, কী রে এদিকে কোথা? বিজন বললো, এই একটু বাজারে এসেছিলাম।

—আয়, ভেতর দিয়ে আয়। আয়, কিছু হবে না। আমরা তো আছি।

—তোমরা আছ বলেই তো ভয় দাদা!

খোকন বলল, তা যা বলেছিস। আমরাই জ্যান্ত বিড়ম্বনা।

—অফিসের ভেতরে না যাই, মনে মনে সঙ্গে আছি, এটুকু জেনো। কিন্তু পরিস্থিতি দেখছো তো! কে কার নিরাপত্তা দেবে বলো? তোমাদের পার্টি দায়িত্ব নিতে পারবে—একশ ভাগ?

—না ভাই, তা এখন পারব না, রঞ্জিৎ বলে। তবু যে মনে মনে সঙ্গে থাকার কথা বললি এতেই আমাদের সাহস বেড়ে গেল। এজন্যই তো অফিসটা খোলা রে। যাক, তাদের সঙ্গে তো দুটো কথা হল! বেশ, পরে আসিস। বিজন আর প্রভাত চলে গেল।

ওদের এখান থেকে যাওয়া দেখে কোথা থেকে জুটে গেল ফটিক, ফটকে। সঙ্গে আজিবা। এখন ওরা মানিকজোড়। একসঙ্গে কন্ট্রাস্টের করে। ব্লক অফিস থেকে ফিরছিল বোধহয়। এক সময় ফটিক রঞ্জিৎদের পার্টির অনেকখানি ছিল। এখন আর নেই। সরাসরি ওদের দলে যোগ দিয়েছে। এ সময়ে ফটিকের এই অফিসের সামনে উপস্থিতি রঞ্জিৎ-খোকন-বিশু-বলরামদের অস্বস্তি বাড়ায়।

ওরা অফিস বন্ধ করার উদ্যোগ করে। বলা যায় না ফটিকের মতিগতি। সরাসরি ওদের দলে গিয়েছে শুধু নয়, গিয়েই ব্লকের কন্ট্রাস্টেরদের চাঁই হয়েছে। তাকে খোকনরা এড়াতে চাইছে। কিন্তু মোটরবাইক থেকে নেমে দাঁড়িয়েই আছে ফটকে আর আজিম।

রঞ্জিৎ খোকনরা অফিস থেকে



ওঠে। শতরঞ্চি কোটায়, অফিসঘরের দরজা বন্ধ করে। ফটকে বলে বন্ধ করে দিলে না কী! থাকো আর খানিক। এই তো সবে পাঁচটা বাজছে। খোকন বলে, না ভাই, বাড়িতে কাজ আছে।

—কাজ তো সবারই আছে। বিডিও-র সঙ্গে কথা বলব বলে বসে রইলাম, ব্যাটা সভাপতির ঘরে ঢুকে বেরুচ্ছে না দেখে চলে এলাম। যাক চলো, আমি বাড়ি যাই...

রঞ্জিতরা সাইকেলে চাপলে ফটকেও আজিমকে চাপিয়ে ওদের সঙ্গে নিল শুধু নয়, স্পিড কমিয়ে ওদের সাইকেলের সঙ্গেই যেতে লাগল। খোকনদের সন্দেহ বাড়ল—সঙ্গ ছাড়ছে না কেন আজিমরা! বাজারটা পেরোতেই একটা ফাঁকা জায়গায় এসে দাঁড়াল ফটকের বাইক। মোবাইল বের করে কাকে ফোন করল। ওদের আরো ভয় হয়ে গেল। পাশেই বিখ্যাত কালভার্ট—যেখানে রঞ্জিতদের অনেকে আশ্রয় নিয়েছে।

ফটিক ডাকলো, এই খোকনদা, দাঁড়াও দাঁড়াও, যাচ্ছে কেন? এদিকে এসো, সিগারেট খাও।

রঞ্জিত বললো, আরে ভাই, তুমিই তো আমাদের সঙ্গে আগে ছেড়েছ। আমরা তো ওই পার্টি অফিসেই বসছি। কই, তুমি তো আর আসছ না, তুষার বলল, আসবে কী করে, ভায়ার ‘পরিবর্তন’ হয়েছে যে!

—আমার কোনো পরিবর্তন হয়নি, হয়েছে তোমাদের। ফটিক বলে। আমি তো ক্ষমতাসীনদের সঙ্গে ছিলাম, এখনও তাই আছি! কোথায় পরিবর্তন হল? কন্ট্রাস্টের করে খাই। ক্ষমতা যেখানে সেখানে আমরা। এতে তো তোমাদের রাগ করার কিছু নেই। কী বল আজিম? তাহলে তোমরা অন্য কাজ দাও! তিরিশ বছরে পারোনি আর পারো?

রঞ্জিত বললো, দারুন বললি তো! তোর ‘পরিবর্তন’ ঘটেনি! ঘটছে পরিস্থিতির। ঠিকই তো! এভাবে তো ভাবিনি!

দুই.

পরদিন। নিম্নচাপ। চারদিক আঁধার। সকাল থেকেই ঝিরঝিরে বৃষ্টি। সেই কালভার্টের কাছে, ঝোপের আড়ালে নিয়ে গিয়ে তুষারকে ঘিরে বাকেরের প্রশ্ন—শালা পার্টি ছাড়বি, না খুন হবি?

—যদি বলি খুন হবো, খুনটা এখন করবি নাকি সময় নিবি?

—এখনই, এই দেখ মেসিন। রিভলবার দেখায় পাশু।

—সময় দিলে ভেবে বলতাম। এতবড় সিদ্ধান্ত হঠাৎ এক্ষুনি রাস্তায় বলি কীভাবে। তোরা তো এভাবে আলটিমেটাম দিসনি?

—শোন তুষার, বলার কিছু নেই তোকে। সবই জানিস। কী বলব, কী বোঝাবো তোকে! বুঝবি? তিরিশ বছর ধরে কী পেয়েছিস বল। তোর মতো ছেলে কেন ওখানে পড়ে থাকবি? রোজগারের তো দরকার আছে না কি? তোর সংসার হয়েছে। পার্টি চালাবে? নেতারা তোর সংসারের খোঁজ নেয়? কাল খুব তো অফিস খুললি। কোনো নেতা এলো না কেন? এমন ক্যালান দিতাম? শুধু রঞ্জের সাহসে এলি না কী?

একটানা কথাগুলো বলে যায় বাকের, তৃণমূল নেতা করিম মিঞার মেজো বোটা।

—তোর বাবার অসুখ, বোনের বিয়ে, কেউ সাহায্য করেছে? পাশু জিজ্ঞেস করে। আমরা করব। ক-টাকা দরকার বল। কালই দেওয়া করাছি! বল, বল, সময় নেই। আমাদের এখন অনেক কাজ।

—তা তোরা আমাকেই এভাবে টার্গেট করলি কেন?

—কচি খোকা, জানো না, তোমার বউ-ই তো পঞ্চায়েত

মেন্সার। তোমাকে পেটালেই তাকে দলত্যাগ করানো যাবে। গোটা পঞ্চায়েত হবে আমাদের! পঞ্চায়েতেই তো সব মধু, তুমি জানো না!

—অঃ, ওই হিসেবটা।

—হ্যাঁ, সোজা হিসেব। শোন, হয় টাকায় ফয়সালা কর, নয় মর। দেড় লাখ টাকা পাবি কালই আমাদের হাত দিয়ে। সারা টার্ম থেকে ওই টাকা তোর বউকে তোর পার্টি দিত না। এদিক ওদিক করতেও দিত না। পাচ্ছিস নিয়ে নে। হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিস না।

—দেড় লাখ?

—হ্যাঁ, ওই টাকাটা এই সেপ্টেম্বরেই গাছের টেন্ডার ডেকে তুলে নেবে প্রধান। শ্রীগাপাল নার্সারির সঙ্গে কথা হয়ে গেছে করিম চাচার। পাশু বলে, সাহাপুর পঞ্চায়েত সজলের গ্রুপ দখল করেছে, আমাদেরটা যদি আমরা যদি না পারি বিস্তুদা, মুকুলদার কাছে মুখ দেখাবো কী করে?

বমাবম বৃষ্টি নামে। বটতলার ঝোপ তুষারকে রক্ষা করতে পারে না। জুবজুবে ভিজে হয়ে তার রূপ বদলিয়ে যায়। সপ্সপে জামা, ন্যাতানো চুলে তাকে চেনা যায় না। ফিসফিসানিও আর শোনা যায় না।...

তিন.

দু-দিন নিম্নচাপ থাকার পর আজ রোদ উঠেছে। বাজার হাট খুলেছে। মানুষ বেরিয়েছে। দলে দলে। বাজারে জোর প্রচার তুষারের বউ পদত্যাগ করেছে। আজই তারানগর গ্রাম পঞ্চায়েতের দখল পেয়ে যাবে করিম মিঞার দল।

কেউ প্রশ্ন তুলল, তা হতেই পারে না। এই তো কালই তুষার এই পার্টি অফিস খুলে বসেছিল। কেউ বলল, ওই পার্টি অফিস খোলাটাই তো কাল হল দেখছি। এ মনে নেওয়া যায় না। আমরা করবী ঘোষকে ভোট দিয়েছিলাম লাল পার্টির ক্যান্ডিডেট হিসেবে। এইসব দলত্যাগ মানছি না।

রঞ্জিত-খোকন-বলরামও বাজারে ঘুরছে। বাজার গরম নানান আলোচনায়। আজ আর অফিস খোলা যাবে না। শতেক মানুষের কৌতুহলী প্রশ্ন : কী হল রঞ্জিত? কী হল খোকনদা? বাধ্য হয়ে রঞ্জিত ফোন করে তুষারকে : হ্যারে তুষার, খবরটা সত্যি?

—হ্যাঁ, সত্যি। আর পারলাম না। প্রাণভয় এবং টাকার লোভ, দুই-ই কাজ করেছে আমার ক্ষেত্রে। আমাকে ক্ষমা করে দে। রাখছি...

—আরে শোন, শোন... বলছি যে...

—শোনানোর আর থাকল কই! আমি তো বেইমান।

মনে হল তুষার কাঁদছে। বলছে, ভেবেছিলাম, ঘুরে দাঁড়াবো। তাই দাঁড়ালাম, তবে একশো আশি ডিগ্রি উল্টোমুখে! আর বিপদ নেই রে। ‘হ্যাঁ’-গুলো সব ‘না’, আর ‘না’-গুলো সব ‘হ্যাঁ’ করে ফেলেছি...

গস্তীর মুখে ফোন কাটল রঞ্জিত। ততক্ষণে তার চারপাশে বাজারের অনেক লোক। তারা বলল, পার্টি অফিস খুলতে হবে। চলো রঞ্জিতদা, চাবি দেবে! চারপাশে বিজন-প্রভাত-শ্যাম-বাদল-টুকাই—অনেকে।

—না, আজ থাক। মন মেজাজ খারাপ...

জনতার মধ্যে থেকে প্রভাত বলে উঠল, সিকের মন খারাপ? চলো তো পার্টি অফিস খুলবো। ইনকিলাব...

জনতা আওয়াজ দিল,—জিন্দাবাদ! জিন্দাবাদ!



নুড়িপাথরের গান

কাকলি ঘোষ

—মা সবজি বেচতে যাবে না?
 —যা বৃষ্টি নেমেছে! আজ এই বাদলায় কে সবজি কিনবে?
 —কী খাব মা তালে? কালকের পাঁউরুটিটা তো খেয়ে ফেলেছি, ভাই উঠেই খেতে চাইবে।
 —চল দেখি বৌদির বাড়ি যাই, এই বৃষ্টিতে কাজের লোক যদি না আসে তাহলে বাসন মেজে দিলে কটা টাকা পাব।
 —তুমি যাও। আমি পরে যাব।
 —কেন? তুই কোথায় যাবি?
 —কোথায় আর যাব মা। বাবা বলছিল দেখি দু-এক টিপ ভাড়া পাই কী না। এসে চা খাব, তাই উনুনটা জ্বালি। চা বসাবো।
 —আ মরণ, যত দরদর বাবার ওপর। মা-টা যে খেটে খেটে মলো তা মেয়ের চোখে পড়ে না।
 —আচ্ছা আচ্ছা তোমার জন্যেও এক কাপ করব। ফিরে এস।
 বৃষ্টিতে চালের ফুটো দিয়ে চারিদিকে জল পড়ছে। রাজের মাথাটা ভিজে যাচ্ছে। কৃষ্ণ ভাইকে ডাকে, —ওঠ ভাই, উঠে পড়।

জল পড়ছে ভিজে যাবি। দিদির ডাকে রাজ লাফিয়ে ওঠে।
 —আগে ডাকিসনি কেন? আমার ছবিগুলো যে জলে ভিজে গেল।
 —গেল তো গেল। ছবি ঐকে কী হবে?
 —তোর ছবি কৌস্তভদা নিজের বলে চালিয়ে পুরস্কার নিল। তুই কী করলি?
 —একবার পেরেছে বলে কি বার বার পারবে? আমার ছবি দেখিস একদিন পুরস্কার পাবে। সেদিন আর আমাদের কোনো কষ্ট থাকবে না।
 —ভাই, এবার মাধ্যমিকটা দিবি তো?
 —দূর, পরীক্ষা দিয়ে কী হবে? বড় বড় আঁকিয়েরা লেখাপড়ার চেয়ে আঁকাটাই ভালো করে ঐকেছে।
 —আমাদের ঘরে ঐকে কী হবে ভাই? লেখাপড়া করলে তবু একটা চাকরি পাবি।
 —চাকরি পাব? মা তো তোকে কষ্ট করে বি.এ. পাশ করালো।

লোকের বাড়ি কাজ করে তুইও পড়লি। চাকরি পেলি?

—তবু তো টিউশনি করছি।

—ভদ্রলোকের বাড়ির ছেলেমেয়েরা কি আমাদের কাছে পড়বে? ঐ বস্তির ছেলেমেয়েদের পড়িয়ে কটা টাকা পাবি?

—তবুও তো মাকে সাহায্য করছি। তোকে রঙ-তুলি কিনে দিচ্ছি।

—মা কখন ফিরবে রে? এক কাপ চা খাওয়া দেখি। কালকের ছবিটা শেষ করতে হবে।

—চারিদিকে জল পড়ছে, তুই তার মধ্যে ছবি আঁকবি?

—হ্যাঁ, ছবি তো কষ্টের মধ্যেই আঁকতে হয়। যত রক্ত ঝরবে, হৃদয়ে তত রঙ ঝরবে রঙ-তুলিতে।

—ভাই দেখি তোর ছবিটা, এটা তো একটা আগুনের ছবি।

—হ্যাঁ, আগুনের। ভলক্যানো। চারিদিকে লাভা ছড়িয়ে পড়ছে। আগুন আগুন ছড়িয়ে পড়ছে।

—ভাই, তুই এখন রঙ তুলি রাখ। ক্যানভাস গোটা। মা এখন এসে পড়বে। আজকে সবজি বিক্রি হয়নি, রেগে আগুন হয়ে আছে। তোর সব ছবির সরঞ্জাম ছুঁড়ে ফেলে দেবে।

—বলছিস, তাহলে আমার শিল্পকলা একটু আড়ালেই থাক। দিদি একটু মুড়ি দিবি চায়ের সঙ্গে? কাল রাতে খাইনি তো, খিদে পেয়ে গেছে। সরোজদের বাড়ি যাব।

দুই.

—সরোজ বেরোচ্ছিস? কালকে তুই আসতে বললি, কী ব্যাপার রে?

—তোর সঙ্গে অনেক কথা আছে, চল। রেশন আনতে যাচ্ছি। তুইও চল।

—বেশ, যেতে যেতে কথা হবে।

দু-জনে পা চালায়। বৃষ্টি একটু ধরেছে। চায়ের দোকানগুলোতে ভিড় জমেছে। ওরা একটা শটকাট নেয়।

—বুঝলি রাজা, কাল একটা কাগজে বিজ্ঞাপন পড়লাম। দিল্লিতে একাডেমি অব ফাইন আর্টসে একটা ছবি প্রতিযোগিতা হবে। তোকে ওখানে ছবি পাঠাতে হবে।

—দূর পাগল, আমার এত টাকা কোথায়?

—আরে টাকা ঠিক জোগাড় হয়ে যাবে।

—কত টাকা লাগবে?

—লাগবে অনেকটাই। পাঁচ হাজার টাকা ফর্ম ফিলাপে লাগবে। আর ছবির যা খরচ। সঙ্গে ছবি পাঠানোর খরচ নিজের।

—পাঁচ হাজার টাকা কোথায় পাব রে? এই বর্ষায় বাবা ভ্যানও চালাতে পারে না, দিদির টাকায় সংসার চলছে।

—আচ্ছা তুই যতটা পারিস জোগাড় কর। তারপর আমি দেখছি।

—তুই কোথায় পাবি? কাকাবাবুর দোকানে আর কত টাকা আয় হয়?

—দেখি না। চল তাড়াতাড়ি পা চালা। বৃষ্টি নামতে পারে।

সন্কেবেলায় বাবা তক্তার ওপর বসে টিভি দেখছে। মা বারান্দায় পাড়ার মহিলাদের সঙ্গে টুকটাক কথা বলছে। জামাটা দড়িতে ঝুলিয়ে দিদির পাশে বসে রাজ বলে—দিদি, একটা খবর শুনবি?

—কী রে?

—একটা ছবির প্রতিযোগিতা হবে দিল্লিতে। সরোজ ফর্ম আনিয়েছে। পাঁচ হাজার টাকা লাগবে। কিন্তু টাকাটা যে কোথায় পাই...

—দিল্লিতে ছবির প্রতিযোগিতা। দারুন ব্যাপার। আচ্ছা তোর হাতে কত আছে? কিছু নেই?

—না রে দিদি, গতবারে ছবি বিক্রির এক হাজার টাকা ছিল। তা তো মায়ের ওষুধ কিনতে লাগল।

—দাঁড়া, শ্যামদার কাছে কিছু হবে কিনা দেখি।

—শ্যামদাকে এর মধ্যে জড়াস না। যখন তাদের বিয়ে হবে তখন নেব। এখন না। আর কাগজ-পেনের ছোটো দোকানে আর কত আয় হয়?

—কবে ছবি পাঠাতে হবে?

—এই তো, ১০ই আগস্টের মধ্যে।

—বিষয় কী বল তো?

—স্বাধীনতা।

—বাঃ, ঐকে ফেল। সেবার তোর ‘ধানসিঁড়ি’ ছবিটা তো লোকের দারুন প্রশংসা কুড়িয়েছিল। সেই যে জেলেদের জীবন নিয়ে আঁকা ছবি। ভাব, ভাবতে থাক। অন্য কোনো চিন্তা করিস না। তোর দিদি আছে না!

তিন.

সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুম আসছে না রাজের চোখে। ছবির কথাই ভাবছে। রাস্তার ল্যাম্পপোস্টের আলো বিছানায় এসে পড়েছে। তক্তায় বাবা পাশ ফিরে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। দিদি আর মা মেঝের বিছানায় ঘুমিয়ে কাদা। রাজ বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে। ক্যানভাস—রঙ—তুলি নিয়ে রাস্তায় নেমে আসে। পাড়া নিঝুম। ল্যাম্পপোস্টের আলোর নিচে ক্যানভাস পাতে রাজ। সাদা ক্যানভাস কানে কানে বলে আমি তৈরি আছি তুমি এসো।

রাজ ঐকে চলেছে, ঐকে চলেছে। কখন যে রাত ভোর হয়ে যায় ও টেরই পায় না। রাত শেষ, ছবিও শেষ হয় রাজার। চোখ তুলে ছবিটা দেখে রাজ।

একজন মা, পায়ে তার শিকল। দূরে তার সন্তান রুগ্ন, ক্ষুধার্ত, ড্রেন থেকে খাবার তুলে খাচ্ছে। ড্রেনের ধারে ক্লাবে স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপিত হচ্ছে। পিছনে কিছু লোকের জটলা একটা মন্দিরের সামনে। একজন মুসলমান মহিলা তার বাচ্চাকে নিয়ে খাবার চাইছে। আর পুরোহিত তাড়িয়ে দিচ্ছে। পিছনে অস্তগামী সূর্য আর অসীম শূন্যতা।

চার.

রাজের ছবিটা প্রথম পুরস্কার পায়। বহু কষ্টে টাকা জোগাড় করেছিল কৃষ্ণা। ওর যাতায়াতের একমাত্র সম্বল সাইকেলটা ও বিক্রি করে দিয়েছিল। কিন্তু পুরস্কার পাওয়ার কথা রাজ জানতে পারেনি। তার আগেই ও মুম্বাইয়ের পথে পাড়ি দিয়েছিল। রাজ ওর ছবিগুলো বিক্রির একটা সুযোগ পায়। মুম্বাইয়ে একজন ছবি বিক্রেতা ওর ছবিগুলো কিনতে চায়। রাজ আর ফিরে আসেনি।

রাজ-কৃষ্ণা-সরোজরা স্বপ্নের জাল বোনে, কখনও কখনও স্বপ্নকে ছুঁয়ে ফেলে। কখনও বা নুড়িপাথরের মতো স্বপ্নের তোড়ে ভেসে যায়।



সনাতনের গরু

স্বপন ঘোষচৌধুরী

শহরে কাজ ছিল। কাজ করে বাড়ি ফিরতে বেশ দেরি হয়েছিল। চৈত্র মাসের কড়া রোদ্দুর, গরম হাওয়া এবং বাসে চিড়ে চ্যাপ্টা ভিড়ে পেষাই হয়ে যখন বাড়ি ফিরল তখন বেলা দুটো। একটুখানি বসে মাথায় তেল মাখতে মাখতে ঝপাং করে পুকুরে ঝাঁপ দিয়েছিল। দুপুরে খাওয়াটা অবেলায় হয়ে গেল। অবেলায় খাওয়া মানেই শরীরে একটা আলস্যভাব এসে যাওয়া। সনাতনের তা-ই হয়েছিল। খাওয়া শেষে বিছানায় গড়িয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুম ভেঙে উঠে সনাতন বেলা আন্দাজ করতে পারল না। যেদিক তাকাচ্ছে সব কেমন হলুদ হলুদ। বারান্দার বাইরে উঠোনে দেখল একটা সবুজ কাক। দেখে ওর যে কী মনে হল, বুঝতে পারল না। মনে মনে ভাবল, এ কী রে বাবা! তার পরই এক জোড়া গোলাপী রঙের শালিক পাখি দেখে বেশ চমকে উঠল। কী রকম হল! ঠিক তখনই ওর বউ হলুদ আর নীল রঙের শাড়ি পরে উঠোনে হেঁটে তার মেলে দেয়া শুকনো কাপড় তুলতে লাগল। সনাতনের সাদা জামা, গেঞ্জি, ধুতি সব হলুদ বর্ণ হয়ে

আছে দেখে সনাতন খুব ভয় পেল, যাঃ শালা, জন্ডিস্ হয়ে গেল নাকি!

বুকটা ছাঁৎ করে উঠল। দিব্যি সুস্থ শরীরটা বলা নেই কওয়া নেই বিগড়ে গেল। এখন বোশেখের শুরুতে বোরো ধান কাটা হয়ে, মাঠে যাবে কী করে! বুকের ভেতরটা ধুকধুক ধুকধুক করছে। বিষণ্ণ হয়ে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াল। বারান্দা থেকে আকাশ দেখা যাচ্ছে, একটা মেঘের হাল্কা আস্তরণ একেবারে কমলা লেবুর মত রঙ নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এমনি সময়ে বৌ বলল—পশ্চিম আকাশে সিঁদুরে মেঘ করেছে। চারপাশ হলুদ হয়ে আছে।

শুনে সনাতনের বুকের ওপর চেপে বসা এক কুইন্টাল পাথরটা ঝপ করে খসে পড়ল। বুকের ধড়াস ধড়াস ভাব কেটে গেল। সমস্ত চিন্তা দূর হয়ে গেল। খুব হাল্কা মনে হাল্কা পায়ে উঠোনে দাঁড়িয়ে খোলা সদর দরজা পার হয়ে রাস্তার ওধারে পুকুরে নেমে মুখ হাত ধুয়ে নিল।

সনাতনের বাড়ি থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে পিচের রাস্তা দিয়ে বাস, লরি গেলে দেখা যায়। গভীর রাতে গাড়ির শব্দও

পাওয়া যায়। গ্রামে ঢোকার এটাই বড় রাস্তা যার ধারে সনাতনের বাড়ি।

সনাতন যখন পুকুর ঘাট থেকে রাস্তায় উঠল তখন কানাই দত্ত গেলি গায়ে খাটো ধুতি পরে চটি ফটাস ফটাস করতে করতে বটতলার দিকে হাঁটছিল। সনাতনকে দেখে দাঁড়াল,—হ্যাঁ সনাতন শুনলুম তুমি নাকি গরুটা বেচে দেবে!

—গরু বেচব আমি! অবাক সনাতন বলল,—আমার গরুই নেই তো বেচব কী?

—সে আবার কী! বটুর চায়ের দোকানে কেষ্টর মুখে সেই রকমই শুনলুম।

—আপনি ভুল শুনেছেন, গরু বেচব না, আমি একটা গরু কিনব।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে মনে পড়েছে, গরু কেনার কথাই শুনেছিলুম।

—কার গরু, দত্ত মশাই। কথার মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন নন্দ হাজরা। বড় রাস্তার ধারে বিরাট আড়ত। ধান, চাল, আলু, তেল, খোল—সব রকমের আড়তদার। পোশাক আশাকে ভিখারি। ময়লা তেলচিটে জামা গায়ে সস্তার হাওয়াই চটি পরে বুরুশ ছাঁটা চুল সমেত মাথাটা পায়ের তালে তালে নাচাতে নাচাতে হাঁটাচলা করে। প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিয়ে হাজরা একটা জিজ্ঞাসার চিহ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

কানাই বলল,—সনাতন কিনবে।

—কেমন গরু কিনবে? জানতে চাইল হাজরা।

সনাতন বলল,—এই গরু যেমন তেমনই কিনব।

—তা তো কিনবে, কথা হচ্ছে দেশি গরু না ভাগলপুরী, বড় শিংওলা না ছোট শিং, কালো না সাদা, হলদে না কালো হলদে সাদায় ছাপ ছাপ! গরুর তো নানা প্রকারভেদ আছে!

শুনে সনাতন ঘাবড়ে গেল। বলল,—অত সব আমি আর কী করে জানব। গরু বলতে গরুই বুঝি। তবে বুড়ো গরু নেব না এটুকু বলতে পারি।

বুড়ো গরু কথাটা শুনে হাজরা খানিকটা যেন মনোক্ষুণ্ণ হল। একটা ঢোক গিলে বলল,—ঠিক বলেছো, ঠিক বলেছো!

কানাই বলল,—যদি একটা গরু কেনা হয় তাহলে একটু দেখে শুনে কেনাই ভাল। দুধ এবং বাছুর সমেত গরু হলে তো পোয়াবারো!

এমন সব কথাবার্তা শুনে সনাতন একবার কানাইকে দেখে একবার হাজরাকে দেখে।

রোদ নিভু নিভু। চারপাশ তেমনই হলুদ। এরই মধ্যে রত্ন মণ্ডল তার কালো রঙের গরুটাকে গলায় দড়ি বেঁধে ধীর পায়ে হেঁটে হেঁটে তিনজনের সামনে এসে দাঁড়াল,—ব্যাপার কী, এতজন এক সঙ্গে?

—আলোচনা হচ্ছে।—বলল কানাই।

—কী বিষয়ে?

—গরু বিষয়ক। তুমি যথাসময়ে এসে গেছ। সশরীরে এবং গাভীসহ।

—আরে গাভীসহ কি আর এমনি এমনি ঘুরছি। ব্যাটা গরু কাল থেকে বেপান্তা হয়েছিল। আজ দুপুরে মেয়ে ফোন করল জামনার খোঁয়াড় থেকে গরু বের করে ঘরে বেঁধে রেখেছে। খবর পেয়ে গেলুম এটাকে আনতে।

হাজরা খানিকটা তফাতে সরে গিয়েছিল। গরুকে ওর খুব ভয়। ছোটবেলায় ওর দাদুকে গরুতে এমন গুঁতিয়েছিল, বাঁ হাতের হাড় ভেঙে গিয়েছিল। স্মৃতিতে সেই দৃশ্য একেবারে

স্টিলের ফ্রেমে বাঁধানো আছে। তাই গরু দেখলেই গুঁতো খাবার ভয়ে দূরে সরে যায়। দূর থেকেই বলে উঠল,—বেয়াইবাড়িতে গিয়ে গরু নিশ্চয়ই ভালমন্দ সাঁটিয়েছে।

—তা ঠিক কথা। খোল চিড়ে গুড় আর ভুবি দিয়ে ফলার মেরেছে এক ডাবা। আবার বিকেল বেলা খানিক ঘাস খেয়েছে।

—ওটা জলখাবার।—বলল কানাই।

কেন কে জানে, কানাইয়ের কথা শেষ হতেই গরুটা বেশ কয়েকবার মাথা দোলাল।

কানাই বলল,—বাঃ, তোমার গরু তো বেশ বাংলা বোঝে!

—শুধু বাংলা!—হাজরা সুযোগ পেয়ে গরুর প্রশংসা শুরু করে দিল,—হিন্দিও বোঝে।

—হিন্দি আবার কোথায় শিখল?

—বিহারে ছিল, সেখানেই শিখেছে। ওর ভায়রা-ভাই তো একে মুঙ্গের থেকে কিনে এনেছিল। মোট তিনটে গরু কিনেছিল, একটা ওকে দিয়ে বাকি দুটো নিজের কাছে রেখেছে।

—বাঃ, বেশ শিক্ষিত গরু।—এবার কানাই বলে উঠল,—ওকে ইংরিজিটাও শিখিয়ে দাও।

—ও ক্বাবা, প্রচুর খরচ। তাছাড়া গরু ইংরিজি শিখে কী করবে!—বলল রত্ন।

সনাতন খুব মনোযোগ দিয়ে গরুর শিক্ষাদীক্ষার বিষয়গুলো শুনছিল। তখন হটপট করে মাটিতে চটি ঘষতে ঘষতে দুলালচন্দ্র এসে পাশে দাঁড়াল। ওর কাঁধে একটা কিটু ব্যাগ। মাথার টুপিতে রাজ্যের ধুলো জমেছে। কাঁধ পর্যন্ত লম্বা চুলের অর্ধেকটা পেছন দিকে বেরিয়ে আছে।

সনাতন, কানাই এবং হাজরা তিনজনই দুলালকে দেখল। মনে হল ট্রেনে বাসে চেপে এইমাত্র এল।

দুলাল নিজেই বলল,—ট্রেন এমন লেট করল, বাড়ি আসতে দু-ঘণ্টা দেরি হয়ে গেল। একটা লোক খামোকা চেন টেনে দিল।

দুলালের কথা শুনে কেউ কোনও উত্তর দিল না। ট্রেনে চেন টানা কোনও নতুন ব্যাপার নয়। তাছাড়া দুলাল এদের চেয়ে বয়সে অনেক ছোটো, এমন ছোকরার সঙ্গে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে গল্প করাটাও কেমন যেন স্বস্তিদায়ক নয়।

দুলাল অবশ্যি বড়দের সঙ্গে খুব বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে কথা বলে না, বরং খুব যত্ন করে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে। এবারও সেইভাবে চার জনেরই পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল।

প্রণাম গ্রহণ করার পর চারজন বেশ সম্ভ্রষ্ট হল। সনাতন বলল,—এখন কী কাজ করছো?

—যা করছিলুম, হাতের কাজ।

হাতের কাজটা কী, তা অবশ্যি খোলসা করে কোনও দিন কাউকে বলেনি। এমন কাজের কথা কাউকে বলাও যায় না। বড় বাজার থেকে শিয়লদা পর্যন্ত এম জি রোড বরাবর ট্রামে বাসে পকেট মেরে যা রোজগার হয় তাই হল ওর একমাত্র সম্বল। তবে আজকাল পকেট মারাও খুব জটিল কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কী সব প্যান্ট বেরিয়েছে, কার্গো না কী যেন নাম—প্যান্টের পেছনে দুটো পকেট, দুপাশে দুটো পকেট, বাইরের পাশে দুটো পকেট, পায়ের গোছে দুটো পকেট—পকেটে পকেটে ছয়লাপ। কোন পকেটে যে টাকা আছে খুঁজতে খুঁজতেই রাস্তা শেষ। তাছাড়া অতগুলো পকেট খুঁজতে গিয়ে একটু বেহিসাবি হলেই ধরা পড়ে যেতে হয়। আর ধরা পড়লে কী যে হয় তা আর বলতে হয় না। তাই দুলাল এখন পকেট মারা কমিয়ে দিয়ে অন্য দিকে হাত সাফাইয়ের কাজ শুরু করেছে। এতে মোটামুটি যাইহোক দু-পয়সা আসছে। বেলেঘাটার

এক বস্তুতে থেকে পাঁচটা বছর এইভাবে পার করে দিল। গ্রামের বাড়িতে বাবা-মা রয়েছে, তারা দুলালের ওপর নির্ভর করে দিন কাটায়। দুলাল কিছু কম রোজগার করে না—একটা গরুও কিনেছে বছর খানেক আগে। মাস তিনেক হল গুরুর একটা বাছুর হয়েছে। বকনা বাছুর।

গরুর আলোচনা হচ্ছে শুনে দুলাল বলল,—এই গরুটা বুঝি কিনলেন রতুকাকা?

—না বাবা, এটা অনেক দিন ধরেই আমার বাড়িতে রয়েছে।

—বাড়িতে নয়, গোয়ালে রয়েছে বলো। কানাই সংশোধন করে দিল।

দুলাল শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের মতো বলে উঠল, গরু হল গিয়ে ভগবতী। সনাতনকাকা, এবার একটা গরু কিনুন।

—ঠিক বলেছিস! দুধেল গাই আর এখন দেখতে পাইনা। ওঃ, কী গাই কী গাই, কী তার দুধ। বালতিতে দুধ দোয়া হচ্ছে, একশ গজ দূর থেকে চ্যাং চ্যাং শব্দ শোনা যাচ্ছে—সে গাই-ই বা কোথায়, দুধই বা কোথায়।

—যেমন হোক গরু একটা কেনো সনাতন। বলে হাজার বাড়ির দিকে হাঁটা দিল।
কানাই বলল,—আমিও যাই।

এমন সময় বৌ এসে দাঁড়াল,—কি গো, সন্ধে হতে চলল, বাড়ি ঢুকবে না?

দুলাল উল্টো দিকে হাঁটা দিল। রতুও গরু নিয়ে চলল। একটা প্রণাম করে বারান্দায় উঠতেই বৌ বলল,—গরু গরু করে কী অত ব্যাজর ব্যাজর করছিলে?

—একটা গরু কিনব ভাবছি।

—গরু কিনবে! বৌ প্রথম বন্ধনীর মতো বেঁকে ফের সোজা হয়ে গেল, ঘরের গরুটাকে আগে মানুষ করো দিকি। দিনদিন বখাটে মেরে যাচ্ছে। একটা গরু মানুষ করার মুরোদ নেই, আবার একটা গরু। বলে দুদাড় করে দোতলায় উঠে গেল।

সনাতন দেখল ঘরের গরুটা বারান্দায় বসে বাটিতে মুড়ি আর তিনটে শশা নিয়ে এক মনে চিবিয়ে যাচ্ছে।

শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

খণ্ডঘোষ জাগরণ

খণ্ডঘোষ, বর্ধমান

Sl. No. 109

With Best Compliments from



JAI BALAJI INDUSTRIES LTD.

Sl. No. 169

মিথ্যা বিচারের ঘেরাটোপে এক বিজ্ঞানী

শ্যামল চক্রবর্তী

মানবাধিকার যে দেশের অন্দরে বারবার অন্তঃসারশূন্য প্রমাণিত হয়েছে সে দেশের নাম আমেরিকা। ঢাকঢোল পিটিয়ে ওরা যতই মানবাধিকার রক্ষার প্রহরী হিসেবে নিজেদের চিহ্নিত করুক, প্রকৃত ইতিহাস কখনও তা বলে না। সেই ইতিহাস থেকে আমরা একটি ঘটনা তুলে ধরব।

ওয়েন হো লি একজন নিউক্লিয় পদার্থবিদ। ১৯৩৯ সালের ২১ ডিসেম্বর তিনি তাইওয়ানের নানতাও শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৬৩ সালে তিনি চেং কুং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ স্নাতক ডিগ্রি লাভ করে ১৯৬৫ সালে আমেরিকায় যান। টেক্সাস এ অ্যান্ড এম বিশ্ববিদ্যালয়ে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ স্নাতকোত্তর বিভাগে ভর্তি হন। আমেরিকার বড় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ভেতর এর স্থান চতুর্থ। দেশের বহু বড় আকারের জাতীয় প্রকল্প নিয়ে ওখানে গবেষণা হয়। বিশেষ করে ‘ক্লোনিং’ ও ‘পেট্রোলিয়াম ইঞ্জিনিয়ারিং’ গবেষণায় এই বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি খুব উঁচুতে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান বাড়িটি যে জায়গায় রয়েছে তার আয়তন বাইশ বর্গ কিলোমিটার। অত বড় জায়গা পৃথিবীর কটি বিশ্ববিদ্যালয়ের রয়েছে? ২০১৩ সালের একটা হিসেব দেখছিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ২৭০০ জন। গবেষক ৪৬৯৭ জন। এই পরিসংখ্যান থেকেও একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের মান কল্পনা করা যায়। স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় পাশ করে লি এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই ১৯৬৯ সালে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল ‘ফ্লুইড মেকানিক্স’। ১৯৭৪ সালে তিনি মার্কিন নাগরিকত্ব লাভ করেন।

বছর কয়েক সরকারি গবেষণা কেন্দ্রে কাজ করার পর ১৯৭৮ সালে লি নিউ মেক্সিকো চলে যান ও বিখ্যাত লস আলামোস ন্যাশনাল ল্যাবরেটরিতে যোগদান করেন। তখন তিনি চল্লিশ বছরে পা দিয়েছেন। স্ত্রী সিলভিয়া একই জায়গায় চাকুরি করতেন। দুই সন্তান নিয়ে বিজ্ঞানী দম্পতির গবেষণাজীবন ও সংসারজীবন ভালোই কাটছিল। লি যে বিভাগে ছিলেন সেখানে নতুন ধরনের অস্ত্রের ডিজাইন হতো। একটি অস্ত্র কতটা কার্যকর হতে পারে তা বুঝতে গেলে আগাম কিছু হিসেব নিকেশ করতে হয়। ফলিত গণিতের সহায়তা লাগে। ‘ফ্লুইড ডিনামিক্স’-এর সহায়তা লাগে। যে বিজ্ঞানীদের উপর ভার ছিল সেসব হিসেব নিকেশ করবার, ওয়েন হো লি তাঁদের একজন। কম্পিউটারের পর্দায় তিনি ‘নকল’ নানা রকমের নিউক্লিয় অস্ত্রের নমুনা তৈরি করতেন। পরীক্ষা করে দেখতেন, কী অদল বদল করলে অস্ত্র আরও বেশি শক্তিশালী হয়। এক কথায় বলা যেতে পারে, এই বিষয়ে তাঁর গবেষণা আমেরিকার কর্তাব্যক্তির প্রশংসার চোখেই দেখেছেন।

ঘুগাক্ষরেও বুঝতে পারেননি লি, তাঁর জীবনে এক বড় দুর্যোগ



ওয়েন হো লি ও কন্যা আলবার্টা লি।

ঘনিয়ে আসছে। তিনি যে বিভাগে কাজ করতেন তার নাম ছিল ‘ইউনাইটেড স্টেট ডিপার্টমেন্ট অব এনার্জি’। বিভাগের সচিব ছিলেন বিল রিচার্ডসন। রিচার্ডসন রাষ্ট্রপতি ক্লিনটনের আমলে এই পদ লাভ করেন। এক সময় তিনি রাষ্ট্রসংঘে আমেরিকার প্রতিনিধি ছিলেন। ওবামা রাষ্ট্রপতি হবার পর তাঁকে বাণিজ্য সচিবের পদ দেওয়া হয়েছিল। যখন তাঁর নামে ও ওয়েন হো লি-র নামে অপবাদ তৈরি হল, রিচার্ডসনকে তাঁর পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। এক সময় যদিও এই অপবাদের সারশূন্যতা প্রমাণিত হয়েছে, তিনি আর ওই পদে যোগ দেন নি। সরাসরি রাজনীতিতে যোগ দিয়েছেন। ২০০৩ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত রিচার্ডসন নিউ মেক্সিকো প্রদেশের গভর্নর ছিলেন। অবসর জীবন মেনে নেননি। ‘ওয়ার্ল্ড রিসোর্স ইনস্টিটিউট’, ‘ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর সায়েন্স অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট’, ‘রিফিউজি ইন্টারন্যাশনাল’ ইত্যাদি সুপরিচিত সংগঠনের পরিচালন মণ্ডলীতে রিচার্ডসন নিজেকে যুক্ত করেছেন।

লি এবং রিচার্ডসনের বিরুদ্ধে কী অভিযোগ উঠেছিল? ১৯৯৯ সালের ৬ মার্চ। ‘নিউইয়র্ক টাইমস’ পত্রিকা তাদের প্রথম পৃষ্ঠায় একটি চাঞ্চল্যকর সংবাদ প্রকাশ করে। লস অ্যালামোস গবেষণাগার থেকে একটি শক্তিশালী নিউক্লিয় অস্ত্র তৈরির গোপন খবর (অস্ত্রটির নাম ছিল ডব্লিও-৮৮) বাইরে বেরিয়ে গিয়েছে। ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (এফ বি আই) তদন্তের দায়ভার নিয়েছে। তাদের আশঙ্কা, মূল অভিযুক্ত তদন্তের খবর জেনে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে পারেন। কে তিনি? ওয়েন হো লি। একদিন তাঁকে এফ বি আই-এর কর্তারা একটি ঘরে একা ডেকে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। ইলেকট্রিক চেয়ারে বসিয়ে শক দিয়ে গোপন খবর উদ্ধারের

চেষ্টা করেন। কিন্তু কোনো ফল হয়নি।

প্রমাণের প্রয়োজন পড়ে না। ৮ মার্চ, খবর বেরোনোর দু-দিন পর, রিচার্ডসন এই বিজ্ঞানীকে চাকুরি থেকে বরখাস্ত করেন। শুধু তাই নয়, ‘নিউ ইয়র্ক টাইমস’ পত্রিকা বিজ্ঞানীর নাম গোপন রেখেছিল। রিচার্ডসন লি-কে বরখাস্ত করার পর তাঁর নাম সাংবাদিকদের জানিয়ে দেন। চারপাশে সবাই তাঁকে ‘বিশ্বাসঘাতক বিজ্ঞানী’ হিসেবে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করতে থাকে। শারীরিকভাবে নিগূহীত হবার আতঙ্কে দিন গুজরান করতে থাকেন তিনি। তাঁর বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ, নিউক্লিয়ার অস্ত্র গবেষণার খবর তিনি চীন দেশে পাচার করে দিয়েছেন।

১৯৯৯ সালের ১০ ডিসেম্বর লি গ্রেপ্তার হলেন। নির্জন কক্ষে তাঁকে বন্দি করে রাখা হল। একটানা ২৭৮ দিন বন্দিজীবন কাটিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত ২০০০ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর মার্কিন সরকার জানায়, যদি লি তাঁর ‘অপরাধ’ প্রাথমিকভাবে মেনে নেন তবে বন্দিদশা কাটতে পারে। বাইরে বেরিয়ে আইনি সহায়তা নিতে পারেন তিনি। অপরাধ মেনে নিলে আর বাকি রইল কী? লি-র বিরুদ্ধে ঊনষাটটি অভিযোগ দাখিল করা হয়েছিল। নিয়ম হল এই, যদি কম গুরুতর কয়েকটি অভিযোগ কোনো বন্দি মেনে নেন, তবে এরপর আইনি পরামর্শের অনুমতি সরকার থেকে পাওয়া যেতে পারে। লি-মামলায় ৫৯টি অভিযোগের ভেতর ৫৮টি অভিযোগ ‘সারবত্তাহীন’ প্রমাণিত হয়। একটি সামান্য অভিযোগ থেকে যায়। কী অভিযোগ? লস আলামসে তিনি নিউক্লিয়ার অস্ত্রের ‘গোপন দলিল’ ঘাঁটাঘাঁটি করেছেন। লস আলামসে কর্মরত যে-কোনো বিজ্ঞানীকেই তো এই অভিযোগে অভিযুক্ত করা চলে।

১৯৯৯ সালে ‘নিউ ইয়র্ক টাইমস’ প্রথম খবরটি বের করলেও লি-ষড়যন্ত্র বছর চার আগে থেকেই শুরু হয়েছিল। ১৯৯৫ সালে এশিয়ায় গুপ্তচরবৃত্তিতে কর্মরত একজন সি আই এ কর্মীর হাতে কেউ একজন একটি চীন দেশের সরকারের নথি তুলে দেয়। আমেরিকা ডুবোজাহাজের জন্য যে ডব্লিও-৮৮ নামের আধুনিক ফ্লিপগান্ড তৈরি করেছে, চীনদেশ ছব্ব তেমন ফ্লিপগান্ড তৈরি করতে চলেছে, নথি থেকে নাকি তেমন প্রমাণ-ই পাওয়া যাচ্ছিল। নথিটি ছিল সাত বছরের পুরনো। তবু সি আই এ এবং এফ বি আই-এর মনে হল, লস আলামস থেকে অতি গোপন খবর বেরিয়ে



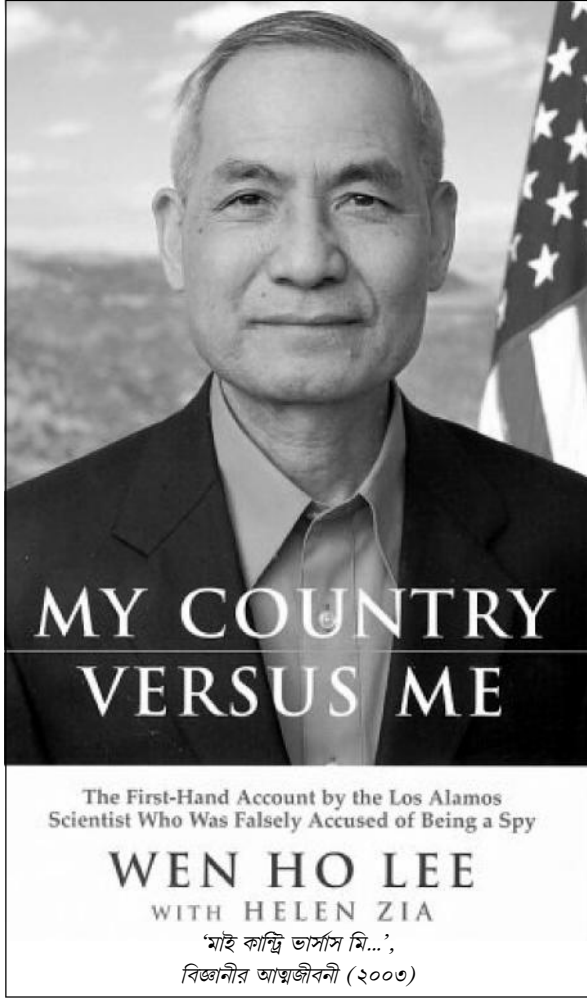
‘গুপ্তচর’-এর অভিযোগ থেকে মুক্তি পেলেন ওয়েন হো লি।

গিয়েছে। কে বার করতে পারে এই খবর? লি তাইওয়ানে জন্মেছিলেন। এখন সে জায়গা চীন দেশের দখলে। তাহলে নিশ্চয়ই ওয়েন হো লি গোপন খবর পাচার করে দিয়েছেন। কী সরল সমীকরণ! আমেরিকার নাগরিক লি। তাঁকে ‘দেশদ্রোহী’ ও ‘বিশ্বাসঘাতক’ ঘোষণা করতে এফ বি আই-এর এক মুহূর্তও লাগল না।

যাই হোক, চাকা উল্টো দিকে ঘুরতে শুরু করল। তদন্তের নামে যে নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন লি, আমেরিকার রাষ্ট্রপতি তার জন্য প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইলেন। লি ছেড়ে দেবার পাত্র ছিলেন না। তিনি সরকারের বিরুদ্ধে মামলা করেন। খবরের কাগজে মানহানিকর খবর গবেষণাগার থেকে যে বা যারা সাংবাদিকদের দিয়েছে তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি তোলেন। তিনি কয়েকজন সাংবাদিকের বিরুদ্ধে মামলা করেছিলেন। বিচারক সেই সাংবাদিকদের আদালতে হাজির থাকতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। এসব মামলায় যে প্রশ্ন বড় হয়ে দেখা দেয়, সাংবাদিকরা কি খবরের উৎস সবাইকে জানিয়ে দিতে বাধ্য? সাংবাদিকদের পক্ষ নিয়ে যে আইনবিদ লড়ছিলেন তিনি বললেন, যদি রায় সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে যায় তবে অপকর্মে জড়িত যে কোনো সরকারি চাকুরের বিষয়ে খবর বের করতে তাদের হাজার বার ভাবতে হবে।

লি একজন ‘বিশ্বাসঘাতক’, একথা প্রমাণের সামান্যতম ক্রটিও দেখায়নি এফ বি আই। ১৯৯৯ সালের ১০ এপ্রিল লি-র বাড়ি তল্লাশি করে এরা। কম্পিউটারের যাবতীয় জিনিসপত্র তুলে নিয়ে যায়। চীনা ভাষায় যত যা লেখা ছিল সব নিয়ে যায়। লি-র অফিসে যে কম্পিউটার ছিল তার সবকিছু খতিয়ে দেখতে অপরাধ দমন শাখার লোকজনদের নিয়ে আসা হয়। পাশাপাশি ফরেনসিক শাখার লোকজনরাও এসেছিলেন। তাদের সন্দেহ হয়, লি কম্পিউটার থেকে কিছু কিছু তথ্য আগেই কপি করেছেন। ওইসব নথিপত্র যা পাওয়া গিয়েছে তা আদালত জানতে চাইল। জানতে চাইল কী কী তথ্য লি কপি করেছেন। এফ বি আই-এর কর্তারা তখন উত্তরে জানান, ওসব জানিয়ে দিলে জাতীয় নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে। বিচারক জেমস পার্কার সে কথা শোনে নি। লি আদালতের কথা মেনে নিজেই অনেকগুলি কপি করে আদালতে জমা দেন। অপরাধের কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া গেল না। লি-কে বন্দিদশা থেকে মুক্তি দিতে হয়। সাধারণত মামলা-মোকদ্দমায় যা দেখা যায় না, এই মামলায় তাই দেখা গেল। বিচারক পার্কার নিজে লি-র কাছে ক্ষমা চাইলেন। রাষ্ট্রপতি বিল ক্লিন্টন ক্ষমা চাইলেন। রাষ্ট্র বিজ্ঞানীর সঙ্গে যে অন্যায় করেছে তার জন্য বিচারক রাষ্ট্রকেও তিরস্কার করেছিলেন।

২০১৪ সালে লি পাঁচাত্তর বছর বয়সে পা দিয়েছেন। না, তিনি দেশ ছেড়ে কোথাও যাননি। নিউ ম্যাক্সিকো প্রদেশেই সপরিবারে অবসর জীবন কাটাচ্ছেন। তাঁর লেখা আত্মজীবনী ২০০৩ সালে বেরিয়েছে। জীবনের সুখ দুঃখ আনন্দ, যত বাড়-ঝাপটা গিয়েছে তার বিবরণ তিনি এই বইয়ে লিখেছেন। আমেরিকার সেরা এক গবেষণাগারে জীবনের দীর্ঘ কয়েক দশক কাটিয়েছেন লি। তিনি রাঁধতে ভালোবাসেন। মাছ ধরতে ভালোবাসেন। বাগান করতে ভালোবাসেন। কেউ কেউ লিখেছেন, রোজেনবার্গ দম্পতির অন্যায়কে যে শাস্তি দিয়েছিল আমেরিকা, লি-কে তারা প্রায় তেমন শাস্তি দেবার কথা ভেবেছিল। সব মানুষ কোনো কালেই চিন্তা চেতনা বিসর্জন দিয়ে বসে থাকে না। কেউ কেউ এমন কথাও বলতে চাইলেন, তবে কি আবার ম্যাকার্থির আমল ফিরে আসছে? আত্মজীবনীতে লি খোলামেলা লিখেছেন, কেমন করে টানা কুড়ি বছর এফ বি আই তাঁকে নির্যাতন করেছে। দিন রাত তাঁর উপর



নজরদারি করেছে। তিনি যে কমিউনিস্ট ছিলেন না, সেকথা তিনি নিজেই লিখেছেন। তবু পরিব্রাণ পাননি।

লাইনাস পাউলিং, চার্লি চ্যাপলিন, অ্যালবার্ট আইনস্টাইন, রোজার রেভিল, জেমস হ্যালসেন—এঁদের একজনও কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন না। মানবিকতার বার্তা তুলে ধরতে চেয়েছিলেন আজীবন। বিস্ময়কর মেধার এই মানুষগুলি যে ভয়াবহভাবে লাঞ্চিত হয়েছেন, একথা আমরা সকলেই জানি। কারাগারের দিনগুলি তাঁর কেমন কেটেছে, কতরকম নির্মম অত্যাচারের মুখোমুখি হয়েছেন, পড়লে আমাদের চমকে যেতে হয়। তাঁর লেখা আত্মজীবনীর পুরো শিরোনাম ‘মাই কান্ট্রি ভার্সাস মী : দি ফার্স্ট হ্যান্ড অ্যাকাউন্ট বাই দি লস আলামস সায়েন্টিস্ট হু ওয়াজ ফলসলি অ্যাকিউজড অফ বিং এ স্পাই’। লি বলেছেন, আমার অপরাধ আমি চীনদেশে জন্মেছি। যে অপরাধে আমাকে শাস্তি দেওয়া হল, এ-দেশের বহু বিজ্ঞানী সমান অপরাধে অপরাধী। কিন্তু এরা দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে। মামলা জেতার পর মার্কিন সরকার ও পাঁচটি সংবাদমাধ্যম তাঁকে ১৬ লক্ষ ডলার ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হয়। সংবাদমাধ্যমগুলি হল ‘দ্য পোস্ট’, ‘নিউ ইয়র্ক টাইমস’, ‘লস এঞ্জেল্‌স টাইমস’, ‘এবিসি নিউজ’ ও ‘অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস’।

জেলখানায় ছিলেন যখন, ফলিত পদার্থবিদ্যার বই লিখতে শুরু করেছিলেন ওয়েন হো লি। সে বই ২০০৬ সালে বেরিয়েছে। অবসরের পর তাঁর কোনো একটি প্রতিষ্ঠানে অধ্যাপনার আগ্রহ

ছিল। বিজ্ঞানীর কন্যা আলবার্টা আইন নিয়ে পড়াশুনো করেছেন। তিনি সাংবাদিকদের বলেছেন, বাবা কয়েক জায়গায় পড়াবেন ভেবে দরখাস্ত করেছিলেন। কেউ কোনো উত্তর দেয়নি।

বিজ্ঞানীর উপর এমন অযাচিত আক্রমণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন কেউ কেউ। ফিলিপ মরিসনের কথা মনে পড়ছে। ম্যাসাচুসেট্‌স ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজিতে তিনি পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক ছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মানহাটন প্রকল্পে গবেষণা করেছেন। বিশ্ব শান্তি আন্দোলনের তিনি একজন অগ্রণী যোদ্ধা। আইনস্টাইন-পাউলিং-এর সুযোগ উত্তরসূরী। সবচেয়ে বড় কথা, যেখানে লি ছিলেন, সেই লস অ্যালামসে তিনিও ছিলেন। ১৯১৫ সালে মরিসনের জন্ম। তাঁর জন্মশতবর্ষ নিশ্চয়ই অনেক জায়গায় পালিত হবে।

লি-র জীবনের এই অধ্যায় নিয়ে নাটক লেখা হয়েছে। চলচ্চিত্র তৈরি হয়েছে। নাটক লিখেছেন তিনজনে মিলে। চলচ্চিত্র তৈরি করেছেন মার্কিন চলচ্চিত্রকার রে আর্থার ওয়াং। লিভারপুলে তাঁর জন্ম। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় বার্কলে থেকে ওয়াং ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ও কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে বি এস ডিগ্রি করেন। অসম্ভব মেধাবী ছাত্র ওয়াং। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রজীবনে বহু পদক পেয়েছেন। স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ওয়াং ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ এম এস করেন। স্ট্যানফোর্ডেই ডক্টরেট ডিগ্রি করেন। তিনি একজন স্বশিক্ষিত চলচ্চিত্রকার। ‘দ্য প্রোফাইল’ নামে ওয়াং বিজ্ঞানী লি-কে নিয়ে একটি ছবি করেছেন। ২০০৪ সালে তিনি একটি চলচ্চিত্র সংস্থা চালু করেন। পরিষ্কার জানান, সমাজ বদলের স্বপ্ন নিয়েই তিনি চলচ্চিত্র করবেন। তাঁর চলচ্চিত্র যেমন প্রশংসিত হয়, বিতর্কও হয় প্রচুর। নারীদের সমানাধিকারের দাবি নিয়ে তৈরি তাঁর একটি তথ্যচিত্র পুরস্কৃত হয়েছে। ওয়েন হো লি-র ঘটনা নিয়ে স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি ‘দ্য প্রোফাইল’। অসামান্য অভিনয় করেছেন লং নগুয়েন। যে-কোনো স্বাধীনতাপ্রিয় মানুষ এই ছবির প্রশংসা করতে বাধ্য হবেন।

লি-কে নিয়ে যে নাটকের কথা বলেছি আমরা, তার নাম ‘ইউ এস ভার্সাস ওয়েন হো লি’। এই নাটক যে সংস্থা প্রযোজনা করেছিল তার নাম ‘জাস্টিস ফর নিউ আমেরিকানস’। যে তিনজন নাটকটি লিখেছেন, পরিচালনা করেছেন এঁরাই। মাইকেল চেং, সিসিলিয়া চ্যাং, রোজার হো—এঁরা তিনজন।

মামলার প্রস্ফোত্তর পর্ব থেকে কিছু দৃশ্য নির্বাচন করে নাটকটির সংলাপ রচিত হয়েছে। শুরুতে এফি বি আই-এর প্রস্ফকর্তা লি-কে প্রশ্ন করছেন।

এফবিআই : খবরের কাগজের লেখাটা পড়েছেন? (হাতের খবরের কাগজটি দেখিয়ে) আজ নিউইয়র্ক টাইমস-এ বেরিয়েছে। (একটু হেসে) বোমা তৈরির জন্য চীন গোপন জিনিস চুরি করেছে।

লি : আমার মেয়ে বলেছে যে সে লেখাটা পড়েছে—

এফবিআই : আপনার পড়া উচিত। ওয়েন হো, এটা ভালো নয়। ওয়াশিংটনের পক্ষ থেকে অনেকগুলো বিষয় বলবার আছে। আপনার চাকুরিকে ঘিরে এসব বিষয় উঠে আসবে। যা উঠে আসছে...

লি : কী সে বিষয়?

এফবিআই : আপনার চাকুরি।

লি : ল্যাভে আর কাজ করতে পারব না? সে কথাই কি বলতে চাইছেন?

এফবিআই : ঠিক তাই। ল্যাভে এমন একজন আছে যে ওপুচরের কাজ করছে। আর সে অভিযোগের আঙুল আপনার



নিজের লেখা বই থেকে পড়ছেন ওয়েন হো লি। পাশে সহ-লেখিকা হেলেন জিয়া।

দিকেই।

দৃশ্য বদল হল। বিজ্ঞানীর কন্যা আলবার্টা জোরে জোরে নিউ ইয়র্ক টাইমস-এর লেখাটি পড়ছিলেন। লেখার শিরোনাম ‘লস অ্যালামসে বিশ্বাসভঙ্গ : বোমা তৈরির জন্য চীন নিউক্লিয়ার অস্ত্রের গোপন তথ্য চুরি করেছে।’ লেখার এক জায়গায় ছিল, ‘সরকারের অনুসন্ধানকারী দল একজনকে সন্দেহ করেছে, লস অ্যালামসের কম্পিউটার বিজ্ঞানী, চাইনিজ আমেরিকান।’ নাম না-ই লিখল বা। লি-র কথাই সকলের মনে হবে।

এফবিআই : আপনি বুঝতে পারছেন, সকলের চোখে আপনি একজন ‘গুপ্তচর’? খবরের কাগজটি দেখুন। আপনার নামটুকু শুধু নেই। আর সব লেখা রয়েছে।

লি : কিন্তু আমি আপনাকে বলছি, আমি কিছু করিনি... (আলবার্টা খবরের কাগজটি পড়েই চলেছে)

এফবিআই : বন্ধুদের আপনি কী বলবেন? আপনার স্ত্রী ও

পুত্রকে কী বলবেন? কলেজে আপনার পুত্র কেমন করে যাবে? যখন সে জানবে যে গুপ্তচরবৃত্তির জন্য আপনাকে ধরা হয়েছে? জানেন আপনি, গুপ্তচরবৃত্তির জন্য আমেরিকায় এ পর্যন্ত কতজন গ্রেপ্তার হয়েছেন?

লি : ওসব খবরে আমার আগ্রহ কম।

(আলবার্টা পড়েই চলেছে)

এফবিআই : রোজেনবার্গদের নাম শুনেছেন? এই একমাত্র দম্পতি যারা গুপ্তচরবৃত্তির মামলায় সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করেনি। আপনি জানেন, কী ঘটেছে তাদের? ওয়েন হো, ইলেকট্রিক চেয়ারে বসিয়ে মেরে ফেলতে হয়েছে। সারাদিন ধরে যদি অভিযোগ অস্বীকার করে যায় তবে আর কী পরিণতি হতে পারে। আপনিও কি ইতিহাসে ওদের মতো নাম লেখাতে চান? আপনিও কি সারাদিন ধরে রোজেনবার্গদের মতোই অস্বীকার করে যাবেন, যেন আপনাকে ইলেকট্রিক চেয়ারে নিয়ে যাওয়া যায়? ইতিহাস গড়তে চাইছেন? আপনার ছেলেমেয়েরা তো জেনে গিয়েছে যে আপনি একজন গুপ্তচর।

বাস্তব ঘটনাকে অনুসরণ করেই নাটকের দৃশ্যগুলি এগিয়েছে। আগে আমরা বলেছি, এই মামলার দুটো বিশেষত্ব আছে। বিচারক স্বয়ং তথাকথিত ‘গুপ্তচর’-এর কাছে ক্ষমা চেয়েছেন। বিচারকের বিন্দুমাত্র প্রয়োজন ছিল না। তবু তিনি ওই সময়ের বিচারে ঐতিহাসিক হতে চাননি। মানবিকতা যখন সামগ্রিকভাবে বিপন্ন ও জরাগ্রস্ত, ‘নিরপেক্ষ’ সেজে থাকা কাপুরষতারই তো সামিল। দ্বিতীয় যে কথা বলতে হয়, আমেরিকার পাঁচ পাঁচটি দাপুটে মাধ্যমের সাংবাদিকদের ‘অপকর্মের আর্থিক মাশুল’ গুনতে হয়েছে। সচরাচর এমনটি ঘটে না। পার্কারের রায় যে কোনো আগ্রহী পাঠক পাঠিকা চাইলেই পড়তে পারেন। আমরা চাইব, সকলের শুভবুদ্ধি জাগ্রত হোক। কিন্তু তা চাইলেই ফলপ্রসূ হয় না। তখন যেন মানুষ সংঘবদ্ধ ও প্রতিবাদী হতে পারে, লি-র ঘটনা থেকে আমরা এই শিক্ষা গ্রহণ করি।

With best compliments of

T. PANDE

CIVIL, MECHANICAL, CONTRACTOR & LABOUR SUPPLIERS

Satyajit Park, Sagarbhanga, Durgapur-11, Dist. Burdwan
Contact : 9851420895, 9614534992, 8972687823

Sl. No. 179

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর বিজ্ঞানচেতনা

অনক মণ্ডল

উনিশ শতকের শেষার্ধ্বে ও বিশ শতকের প্রথমপাদে যেসব বিজ্ঞানমনস্ক ব্যক্তিত্ব বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করে তোলার উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানের লেখালেখিতে আত্মনিয়োগ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪-১৯১৯) অন্যতম। বঙ্কিমচন্দ্রের পরে রামেন্দ্রসুন্দর যখন কলম ধরেন তখন বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যে নবযুগের সূচনা হয়। তিনি ছিলেন বিশাল মাপের বিজ্ঞান-চিন্তক, খ্যাতিমান লেখক, সমাজসেবী, দর্শন ও সাহিত্যবেত্তা, স্বদেশপ্রেমী এবং সমকালে অতি সম্মানিত প্রজ্ঞাযুক্ত রসায়নশাস্ত্র ও পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক।

১৮৮৫ সালে বি.এ. পরীক্ষায় রামেন্দ্রসুন্দরের রসায়নশাস্ত্রের খাতা দেখে সেকালের বিখ্যাত রসায়নের প্রেসিডেন্সি



কলেজের অধ্যাপক পেডলার মন্তব্য করেন—“আমি এ যাবৎ যত রসায়নের কাগজ দেখিয়াছি তন্মধ্যে ও-ই out and out the best.” ১৮৮৭ সালের এম.এ পরীক্ষায়ও রামেন্দ্রসুন্দর প্রথম স্থান অধিকার করে স্বর্ণপদক লাভ করেন। ১৮৮৮ সালের প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ ছাত্রবৃত্তির অধিকারী রামেন্দ্রসুন্দরের পরীক্ষকদের মন্তব্য ছিল, “The candidate who took up Physics and Chemistry is perhaps the best student that has yet taken up these subjects at this eximatuion.” অর্থাৎ প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ পরীক্ষায় এ-পর্যন্ত যে-সকল ছাত্র পদার্থবিদ্যায় ও রসায়নশাস্ত্র নিয়েছেন, এই ছাত্রই তাঁদের মধ্যে বোধহয় সর্বশ্রেষ্ঠ। এ কেবল মুর্শিদাবাদের কান্দির প্রত্যন্ত জেনো গ্রামের এক পিতৃহীন যুবকের মেধার স্বীকৃতি নয়, বিজ্ঞানসেবক এক প্রজ্ঞাবান মানুষের মননের বিচ্ছুরণমাত্র। রামেন্দ্রসুন্দরের বিজ্ঞান শুধু তথ্যসর্বস্ব বিজ্ঞান নয়। বিজ্ঞান ছিল তাঁর কাছে পরম আনন্দের বিষয়, উপভোগ এবং অনুশীলনের সামগ্রী।

অল্প বয়সেই গণিতশাস্ত্রে রামেন্দ্রসুন্দরের অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। সেকালে প্রথানুসারে বালককে আট বছর বয়সেই জ্যামিতি অধ্যয়ন করতে হতো। অল্পবয়স্ক বালকদের কাছে জ্যামিতিশাস্ত্র ছিল অতি বিভীষিকার বিষয়। বালক রামেন্দ্রসুন্দর দু-বছরের মধ্যেই জ্যামিতির প্রথম খণ্ডের যাবতীয় অনুশীলনী সমেত প্রতিজ্ঞাগুলির নির্ভুলভাবে সমাধান করেন এবং পাটিগণিত ও শুভঙ্করী সংক্রান্ত সকল সমস্যাগুলোর অনায়াসে মীমাংসা করেন। স্কুলজীবনে পাঠ্যবই ছাড়াও বহু বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হন

রামেন্দ্রসুন্দর। প্রথমে তিনি কাব্যচর্চা শুরু করেন। পরে নবীনচন্দ্র দত্তের ‘খগোল বিবরণ’ পড়ে বিজ্ঞানচর্চার প্রতি আগ্রহশীল হয়ে ওঠেন এবং তিনি নিবিড়ভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞানের পাঠে মনোনিবেশ করেন। উত্তরজীবনে রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞান গবেষণায় না থেকে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং সারা জীবন জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। আচার্য রামেন্দ্রসুন্দরের হাতেখড়ি হয় ‘নবজীবন’ পত্রিকায়। ২০ বছর বয়সে বি.এ. ক্লাসে পড়াকালে তাঁর প্রথম বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ ‘মহাশক্তি’ প্রকাশিত হয় (১২৯১ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যায়)। যে পত্রিকায় লিখতেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নবীনচন্দ্র দত্ত, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ মনীষীরা। ‘মহাশক্তি’

প্রবন্ধের কিছুটা অংশ—

কে বলিবে এ ব্রহ্মাণ্ড কার রচিত? কে জানে এ ব্রহ্মাণ্ড কী? এই পরিদৃশ্যমান অনন্ত জগৎ সীমাহীন, পরিধিহীন অনন্ত আকাশে অনন্তকাল ভ্রাম্যমান—কে আমাকে বলিবে উহা কী? প্রাচীন বৈদান্তিক বলেছেন, ইহা মায়া; আধুনিক বৈজ্ঞানিক বলেন, ইহা অজ্ঞেয়। বিজ্ঞান ও দর্শনের একমাত্র উত্তর আমি জানি না।

তারপর ‘নবজীবন’ পত্রিকায় তাঁর আরও কয়েকটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, যেমন ‘মহাতরঙ্গ’ (অগ্রহায়ণ, ১২৯২), ‘জড়জগতের বিকাশ’ (আষাঢ়, ১২৯৩), ‘সৃষ্টিতত্ত্ব’ (শ্রাবণ, ১২৯৩) প্রভৃতি। ‘নবজীবন’ ছাড়া ‘সাধনা’, ‘ভারতী’, ‘দাসী’, ‘সাহিত্য’, ‘মানসী’, ‘সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা’, ‘মুকুল’, ‘উপাসনা’, ‘আর্যাবর্ত’ প্রভৃতি সমকালের প্রায় সব পত্রিকাতেই তাঁর বিজ্ঞান ও সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ‘সাধনা’ সহ অন্যান্য পত্রিকায় তাঁর বিজ্ঞানভিত্তিক প্রবন্ধ নিয়ে তাঁর প্রথম গ্রন্থ ‘প্রকৃতি’ প্রকাশিত হয় ১৯০৩ বঙ্গাব্দের আশ্বিন (১৮৯৬ সালের ৭ অক্টোবর)। ‘প্রকৃতি’ গ্রন্থ যখন প্রকাশিত হয় তখন তিনি তার বিজ্ঞাপনে লেখেন—

বাংলা ভাষায় সাধারণ পাঠকের নিকট বিজ্ঞান প্রচার বোধহয় অসাধ্য সাধনের চেষ্টা। সিদ্ধিলাভের ভরসা করি না। আরও লেখেন, ‘পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের আয়াসলব্ধ বৈজ্ঞানিক সত্যগুলি মানবজাতির সাধারণ সম্পত্তি; আমাদের স্বগ্ৰহণ ভিন্ন গতান্তর নাই।

‘প্রকৃতি’তে সঙ্কলিত প্রবন্ধগুলির মধ্যে ‘সৌরজগতের উৎপত্তি’, ‘আকাশতরঙ্গ’, ‘পৃথিবীর বয়স’, ‘জ্ঞানের সীমানা’, ‘প্রকৃত সৃষ্টি’,

‘প্রকৃতির মূর্তি’, ‘ক্লীফোর্ডের কীট’, ‘প্রাচীন জ্যোতিষ’, ‘আর্যজাতি’ প্রভৃতি রচনায় আগাগোড়া বিজ্ঞানেরই কলধ্বনি শোনা যায়।

‘সৌরজগতের উৎপত্তি’ প্রবন্ধে সৌরজগতের উৎপত্তি বিষয়ে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া আছে। ‘জ্ঞানের সীমানা’ প্রবন্ধ বিজ্ঞানের বিষয় নিয়ে লিখিত হলেও তাতে দার্শনিকতার ছাপ আছে। প্রবন্ধের শেষাংশে বলেছেন—

‘জড়জগতের অস্তিত্ব’ কল্পনামাত্র। এই কল্পনা জীবনরক্ষায় একটা উপায় বা কৌশল। প্রকৃতি করাইতেছে, তাই যথানিয়ন্ত্রণ করিতেছি।

কিন্তু বৈজ্ঞানিক কোনো তথ্যকেই তিনি যুক্তি ও প্রমাণ ভিন্ন মেনে নেননি।

আমি বৈজ্ঞানিকতার স্পর্শ রাখি না; কিন্তু আমি বৈজ্ঞানিকতাজীবী বিজ্ঞানভিক্ষু। পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষালব্ধ প্রত্যক্ষ প্রমাণ ভিন্ন অন্য প্রমাণ ব্যবহারিকবিদ্যায় আমার নিকট অগ্রহা।

কিন্তু এরই সঙ্গে তিনি এমন কথাও বলেছেন—

যিনি জগতের এতগুলি আঁধার কুঠুরির মধ্যে প্রাচীর ভাঙ্গিয়া আলোকিত প্রবেশপথ বাহির করিয়াছেন, হয়তো তাঁহার কাছেই ইহার উত্তর পাইব।

‘পৃথিবীর বয়স’ প্রবন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর জীববিজ্ঞান ও ভৌতবিজ্ঞানের পরস্পরবিরোধী চেতন্যের মধ্যে সহঅবস্থানের একটি ভিত্তি দাঁড় করাতে প্রয়াসী হয়েছেন। তিন বলেছেন—

আশা করা যায় অচিরকালের মধ্যেই ভূ-বিদ্যাও জীববিদ্যার প্রতিপক্ষে দণ্ডায়মান পদার্থবিদ্যা ও জ্যোতির্বিদ্যার সহিত একটা বন্দোবস্ত করিয়া মিটমিট করিয়া ফেলিবে। আমরা তখন জননী বসুন্ধরার বয়সের তথ্য কতকটা নিঃসংশয়ে জানিতে পারিয়া আশ্বস্ত হইব।

‘ক্লীফোর্ডের কীট’ প্রবন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর ব্যাকটেরিয়ার কার্যকারিতা সম্বন্ধে তীক্ষ্ণ সরস মন্তব্য করেছেন—

প্রকৃতিমাতার বহু যত্নে লালিত ও বহু যুগের প্রয়াসে গঠিত ও পুষ্ট মানুষের এই তনুখানি এত সহজে ব্যাকটেরিয়া কর্তৃক অঙ্গরাস্ত্র বায়ুতে পরিণত হইতে দেখিয়া প্রকৃতিমাতা কাঁদেন না হাসেন বলিতে পারি না।

‘প্রকৃতির মূর্তি’ প্রবন্ধে প্রকৃতি যেভাবে প্রতীয়মান হয় তার রূপ নির্মাণের চেষ্টা করেছেন। প্রকৃতির প্রত্যক্ষময় ও ইন্দ্রিয়বোধ জগৎ সম্বন্ধে তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

‘প্রাচীন জ্যোতিষ’ নামের দুটি প্রবন্ধে তিনি জ্যোতিষ শাস্ত্রের মূল কথা বিবৃত করেছেন। প্রকৃতি গ্রন্থের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ ‘প্রলয়’। প্রবন্ধের শুরু কল্পকাহিনি দিয়ে হলেও প্রলয় সম্পর্কে তিনি বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা করেছেন। বৈজ্ঞানিক রামেন্দ্রসুন্দরের মনীষার পরিচয় পাওয়া যায় জগৎ ও জীবনের প্রতি অপারিসীম কৌতূহলে। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য যে ঐকান্তিক আগ্রহ যুগে যুগে মানুষের বস্তু সংক্রান্ত চিন্তাভাবনাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে সেই ঐতিহ্যকে স্বীকার করা যে প্রকৃত বৈজ্ঞানিকের কাজ সে সম্পর্কে কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকে না। এ প্রসঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দরের মন্তব্য স্মরণযোগ্য—

আমার বিবেচনায় যাঁহারা আধুনিক বিজ্ঞানের সহিত প্রাচীন বিজ্ঞানের এইরূপ সমন্বয় করিতে চান, তাঁহারা একটা ভুল করেন। বিজ্ঞানবিদ্যাটাই পরিবর্তনশীল; উন্নতিশীল বলিতে চাও ক্ষতি নাই। উহার সিদ্ধান্তগুলি ক্রমশ পরিবর্তিত ও পরিণত হইতেছে। বিজ্ঞান কোনোদিন একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে না; আজ যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে কাল সে সিদ্ধান্ত বদলাইয়া যাবে। ইহাতে সে লজ্জিত নহে; বরং বিজ্ঞান জানে যে, ইহাই তাহার মাহাত্ম্য। (প্রকৃতি)

‘প্রকৃতি’ গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের ১২ বছর পরে ১৩১৫

বঙ্গাব্দের ফাল্গুনে (৮ মার্চ, ১৯০৯) গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই সংস্করণে (‘হেরম্যান হলমহোলৎজ’ প্রবন্ধটি বর্জিত ও দুটি নতুন প্রবন্ধ ‘আলোকতত্ত্ব’ ও ‘পরমাণু’ প্রকাশিত হয়।

‘প্রকৃতি’ গ্রন্থের প্রকাশের সাত বছর পরে ১৩১০ বঙ্গাব্দে (১৬ মার্চ, ১৯০৪) রামেন্দ্রসুন্দরের দ্বিতীয় গ্রন্থ ‘জিজ্ঞাসা’ প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণের নিবেদনে লেখক বলেছেন—“বিবিধ মাসিকপত্রে প্রকাশিত আমার দার্শনিক প্রবন্ধগুলি এই গ্রন্থে সংকলিত হল।” ভূমিকায় রামেন্দ্রসুন্দর ‘জিজ্ঞাসা’কৈ দর্শনের গ্রন্থ হিসেবে চিহ্নিত করলেও এর বেশিরভাগ প্রবন্ধের অবয়ব বিজ্ঞান। বস্তুত বিজ্ঞান এবং দর্শন গ্রন্থটির অধিকাংশ প্রবন্ধের মধ্যে একাকার হয়ে গেছে। সত্যিকথা বলতে কী, রামেন্দ্রসুন্দর এ গ্রন্থে বিজ্ঞান এবং দর্শন—উভয় বিদ্যাকেই আশ্রয় করে জগৎরহস্যের উত্তর খুঁজেছেন। উত্তর যে তাঁর সব মিলেছে তা নয়, কিন্তু নিরন্তর তাঁর চেষ্টা চলেছে। তাঁর কাছে সত্য ছিল আপনার বা নিজের অস্তিত্ব। এর চেয়ে বড় সত্য আর নেই। ‘সত্য’ প্রবন্ধে তিনি সেকথাই বলেছেন।

আমি আছি ইহা অপেক্ষা সত্য আর নাই। যাবতীয় বিজ্ঞানের প্রথম স্বতঃসিদ্ধ এই। জীবনযাত্রার আরম্ভ এই সত্যে বিশ্বাসে। যদি কোনও সত্যকে নিরপেক্ষ ধ্রুব সত্য বলিতে হয়, তাহা এই সত্য। বস্তুতই ইহা পারমার্থিক সত্য।

রামেন্দ্রসুন্দর ‘যে আমি’-র অস্তিত্বকে পারমার্থিক সত্যরূপে গ্রহণ করেছেন, সে আমি রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ‘ছোটো আমি’, শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় ‘কাঁচা আমি’। ‘সত্য’ প্রবন্ধে ‘আমার অস্তিত্ব’ বিষয়ে সেকথা বলা হয়েছে সেই অস্তিত্বের অর্থ বোঝা যায় ‘জগতের অস্তিত্ব’ প্রবন্ধে। এই প্রবন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর বিষয়টিকে আরও ব্যাখ্যা করেছেন। জগৎকে বিশ্লেষণ করলে মোটামুটি দুটি অংশ পাওয়া যায়। এর প্রথমটি ‘আমি’ এবং দ্বিতীয় ‘আমি-ছাড়া’। ‘আমি’ শব্দটির অর্থ এখানে সেই যে অনুভব করে, চিন্তা করে, ইচ্ছা করে, অনুভূতি, চিন্তা, কামনা, ইহা যদি চেতন্যের লক্ষণ বলা যায়, তবে আমি অর্থে আমার মধ্যে যে চেতন। আমি-ছাড়া কী রইল? চেতনা আমাকে বাদ দিয়ে জগতের অবশিষ্টাংশ। সেই অর্থে বাইরের জড়জগৎ এবং আমার ভৌতিক শরীর পর্যন্ত আমার বাইরে। তাহলে ‘জগতের অস্তিত্ব বলিলে আমার অস্তিত্ব ও আমার বহিঃস্থ এই জগতের অস্তিত্ব, এই দুই বুঝিতে হইবে’।

বিজ্ঞান এবং দর্শনের এ-জাতীয় একত্বীকরণের অনেক নমুনা পাওয়া যায় রামেন্দ্রসুন্দরের রচনায়। বাংলা সাহিত্যে বিজ্ঞানও দর্শনের যে সমন্বয় রামেন্দ্রসুন্দরের রচনায় দেখা যায় তা এককথায় অভূতপূর্ব।

‘সৃষ্টি’ প্রবন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর দার্শনিক মতবাদের সঙ্গে অত্যন্ত সুন্দরভাবে বৈজ্ঞানিক মতবাদের নির্মাণ ঘটিয়েছেন। তিনি বলেছেন—

বিজ্ঞান যাহাকে প্রাকৃতিক নিয়ম বলে, যাহাকে তোমরা দর্শনের ইচ্ছার বিকাশ বলিতেছ, তাহারই দ্বারা জগতের নির্মাণ প্রণালী ও ক্রিয়া প্রণালী সংগতভাবে বুঝিবার চেষ্টা হইতেছে।... কীরূপে হইতেছে তাহার উত্তর বিজ্ঞানের নিকট মিলিতে পারে।

বিজ্ঞানচর্চায় রামেন্দ্রসুন্দরের নিষ্ঠা কখনও স্তিমিত হয়নি। সংশয় এসেছে মাঝে মাঝে, তবুও অযথার্থ জ্ঞানের সঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দরের কখনও কোনো ধরনের আপস রক্ষা হয়নি। বৈজ্ঞানিক চেতনাকে ক্ষুরধার করার জন্য তিনি যে দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করতে চেয়েছেন তা যথার্থ কিনা তার বিচারবিশ্লেষণ তিনি করেছেন কিন্তু বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা থেকে কখনও বিরত হননি। যেমন, কোষ্ঠীবিচারে কোনো বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য আছে কিনা সে সম্পর্কে রামেন্দ্রসুন্দর ‘ফলিত জ্যোতিষ’ প্রবন্ধে প্রশ্ন তুলেছেন। আমরা জানি, শোষিত,

বিপর্যস্ত ও প্রতারিত মানবমানবী কোষ্ঠীফলের যৌক্তিকতা সম্পর্কে বহু ক্ষেত্রে মানসিকভাবে দোদুল্যমান। তবে কোনো ধরনের রূঢ়তা প্রকাশ না করে তিনি যে টিপ্সনি কেটেছেন তার জ্বালা কোষ্ঠীধারীরা উপলব্ধি করবেন কিনা বলতে পারা যাবে না, তবে কোষ্ঠীবিচারীরা হাড়ে হাড়ে এই খোঁচার জ্বালা অনুভব করবেন :

বৈজ্ঞানিকরা সহস্র পরীক্ষাগারে ও মানমন্দিরে যে রীতিতে ফলাফল গণনা ও প্রকাশ করিতেছেন, সেই রীতি আশ্রয় করিতে হইবে। কেবল নোপোলিয়নের ও বিদ্যাসাগরের কোষ্ঠী বিচার করিলে অবিস্মরণীয় বিশ্বাস জন্মিবে না। চন্দ্রের আকর্ষণে গঙ্গার জোয়ার ভাটা হয়, তবে রমাকান্তের জজিয়তি কেন হইবে না, এরূপ যুক্তিতে চলিবে না।

‘জিজ্ঞাসা’ গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি সম্পর্কে যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মন্তব্য করেছেন—

তাহার ‘জিজ্ঞাসা’ প্রবন্ধগুলি পড়িলে মনে হয় তিনি প্রকৃতির বিজ্ঞান হইতে সার সংগ্রহে আনন্দ পাইতেন। তিনি যখন এই সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তখন এই বিষয়ই বৈজ্ঞানিকদের চিন্তা অধিকার করিয়াছিল। কেহ কেহ মনে করিয়াছেন বিজ্ঞান বুদ্ধি বিজ্ঞানের পরিণতি। রামেন্দ্রসুন্দরও বিজ্ঞানই দর্শনের প্রথম সোপান এবং দর্শনই বিজ্ঞানের পরিণতি। রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞান ও দর্শনের অপূর্ব সমন্বয় ঘটাইয়াছিল।

‘প্রকৃতি’ এবং ‘জিজ্ঞাসা’ রামেন্দ্রসুন্দরের জীবিত অবস্থায় প্রকাশিত গ্রন্থ। কিন্তু তাঁর অন্য দুটি বিজ্ঞানগ্রন্থ প্রকাশিত হয় তাঁর মৃত্যুর পরে। ‘বিচিত্রজগৎ’ গ্রন্থটির প্রকাশকাল ১৯২০ সাল। ‘জগৎকথা’ প্রকাশিত হয় ১৯২৬ সালে। ‘বিচিত্রজগৎ’-এর সব প্রবন্ধই পূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল ‘ভারতবর্ষ’ পত্রিকায় (১৩২১-২৫)। ‘ভারতবর্ষ’-র কিছু অংশ সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত ‘সাহিত্য’পত্রে প্রকাশিত হয়।

‘বিচিত্রজগৎ’ গ্রন্থে রামেন্দ্রসুন্দরের চিন্তার ক্রমপরিণতি লক্ষ্য করা যায়। জগৎ বিচিত্র। ‘বিজ্ঞানবিদ্যায় বাহ্যজগৎ’ নিয়ে শুরু করেছেন, যেখানে রামেন্দ্রসুন্দর বলেছেন, “Physical Science-কেই বাংলায় আমি বিজ্ঞানবিদ্যা বলিব।” এবং বিজ্ঞানবিদ্যায় আলোচ্য বাহ্যজগৎ জনসাধারণের কাছে ততটুকুই যেটা কেবল প্রত্যক্ষ বিষয়। বিজ্ঞানবিদ্যার কাজ বাহ্যজগতের বিবরণ পেশ করা। কোন জিনিসটা কেমন, এক জিনিসের সঙ্গে অন্য জিনিসের কী সম্বন্ধ, কোন ঘটনা কীভাবে ঘটে, এক ঘটনার সঙ্গে অন্য ঘটনার কী যোগ—বিজ্ঞানচিন্তা সে দিকে তাকিয়ে কাজ করে যাবে।

বিজ্ঞানবিদ্যায় বাহ্যজগতের আলোচনায় রামেন্দ্রসুন্দর দু-ধরনের জগতের কথা বপলেছেন। এক. ব্যবহারিক জগৎ; দুই. প্রাতিভাসিক জগৎ। পৃথিবীর সাধারণ মানুষ দৈনন্দিন কাজ চালাবার জন্য যে জগৎ মেনে নেয় রামেন্দ্রসুন্দর তাকেই ব্যবহারিক জগৎ বলেছেন। ব্যবহারিক জগৎ হল কোটি কোটি মানুষের প্রত্যক্ষ দৃষ্ট জগতের গড়। কিন্তু এই গড় নির্ণয় করা সহজ নয়। কিন্তু মোটামুটি যে গড় নির্ণীত হয় তাকে অবলম্বন করেই বৈজ্ঞানিক তাঁর আলোচ্য বৈজ্ঞানিক জগৎ খাড়া করেন। ব্যবহারিক জগৎ একটা তাত্ত্বিক জগৎ মাত্র। কিন্তু প্রত্যেক পদ্ধতিরই প্রাতিভাসিক জগৎ স্বতন্ত্র। অর্থাৎ পৃথিবীতে যত মানুষ প্রাতিভাসিক জগৎও তত। তাহলে যাকে ব্যবহারিক জগৎ বলা হচ্ছে তা বহু সংখ্যক প্রাতিভাসিক জগতের একটা কল্পিত গড় মাত্র। এই ব্যবহারিক জগৎ বৈজ্ঞানিকেরই মনগড়া। সে জগতে নিজস্ব অভিজ্ঞতার মূল্য নেই। স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে সাধারণ মানুষের দৃষ্ট অভিজ্ঞতা থেকেই রামেন্দ্রসুন্দর জগতের নানা বিশেষণ ব্যবহার করেছেন—প্রাতিভাসিক জগৎ, ব্যবহারিক জগৎ, বাধ্য জগৎ, জড়জগৎ, প্রাণময় জগৎ, চঞ্চলজগৎ। ‘বিচিত্র জগৎ’ গ্রন্থের বিভিন্ন প্রবন্ধে জগতের এইসব দিকগুলি নিয়ে আলোচনা করে তিনি জগৎপ্রবাহের গভীরে প্রবেশ করতে চেয়েছিলেন। তিনি দেখেছেন,

বিজ্ঞান আজ পর্যন্ত বিশ্বজগৎকে একেবারে বাঁধনে বাঁধতে পারেনি। প্রত্যেকটি জগতে বিজ্ঞানবিদ্যার ভিত্তি খুঁজতে গিয়ে তিনি দেখেছেন, সেখানে ফাঁক আছে, ফারাক আছে, স্ববিরোধী তত্ত্ব আছে। বিজ্ঞানবিদ্যার ফাঁকি ধরা পড়ে প্রতিটি জগতে।

‘বিচিত্রজগৎ’-এ ‘প্রজ্ঞার জয়’ প্রবন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর লেখেন—

ইতর জীবের হস্তে এই প্রজ্ঞাস্ত্র নাই। মানুষ ইহার উদ্ভাবন করিয়াছে। আপনার অভিজ্ঞতার সহিত বর্তমানকে ও ভবিষ্যৎকে যোগসূত্রে আবদ্ধ করিয়াছে এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ উভয় ক্ষেত্রে বুদ্ধিবৃত্তিকে পরিচালিত করিয়া অসীম সামর্থ্য লাভ করিয়াছে। এই প্রজ্ঞার অস্ত্র বিজ্ঞানময় অস্ত্র।

বিজ্ঞান-দার্শনিক রামেন্দ্রসুন্দর বলেছেন—

বৈজ্ঞানিক এই বিজ্ঞানাস্ত্র প্রয়োগ করিয়া বাধ্য জগৎ নির্মাণ করিয়াছেন এবং বাধ্য জগতের অনুশাসনে প্রত্যক্ষ জগৎকেও আপনার বশীভূত করিয়াছেন। বিজ্ঞানবিদ্যার এই জন্য এত স্পর্ধা। মানুষের কারবার প্রত্যক্ষ জগতে। প্রজ্ঞাবলে সেই প্রত্যক্ষ জগৎ মানুষের বশীভূত। প্রজ্ঞাবান মানুষ জগতের প্রভু, অতএব প্রজ্ঞারই জয়।

‘জগৎকথা’ গ্রন্থে ৭৫টি বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ সংকলিত।

গ্রন্থটির প্রস্তাবনা প্রবন্ধ ‘জড়জগৎ’-এ তিনি বলেছেন—

জড় শব্দটি আমাদের প্রাচীন দর্শনশাস্ত্র হইতে গৃহীত। সেই প্রাচীনশাস্ত্রে যাহা চেতন নহে, তাহাকেই জড় বলিত। জগতে এমন একজন কেহ আছেন, তিনিই ‘আমি’; আর যাহা কিছু আছে তিনিই অর্থাৎ সেই ‘আমি’ই আমার জ্ঞাত।

প্রাকৃতিক নিয়ম নতুন জ্ঞানকে জানতে ও জ্ঞানের সোপানে আরোহন করতে সহায়তা করে। তিনি বলেছেন—

কোন দিকে চলিতে চলিতে নতুন তথ্যের সন্ধান জানিব। সেই পথ দেখায়।...

‘জগৎকথা’য় তিনি জগৎকে দেখেছেন জড়বাদী বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি দিয়ে। তবু বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কথা এসেছে মাঝে মাঝে। তিনি বলেছেন, ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতার একটা সীমা আছে। মানুষ বুদ্ধি খাটিয়ে সে সীমাকে যতই দূরে ঠেলে নিয়ে যাক, যন্ত্র দিয়ে তাকে যতই স্বাকার্যসাধনে সমর্থ করে তুলুক, সে সীমা শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে পৌঁছাবে বলা কঠিন। ‘কাজেই বিজ্ঞান অসম্পূর্ণ; কিন্তু ইহার গতি সম্পূর্ণতার অভিমুখে; সম্পূর্ণ কখনও হইবে না, তবে সম্পূর্ণতার অভিমুখে ক্রমশ চলিতেছে এবং আশা করা যায় সে চলিবে।’ (‘পরিমাণ সমস্যা’)

প্রকৃতিবিজ্ঞানের বস্তুবাদী ঐতিহ্যকে স্বীকার করে জ্ঞানান্বেষণের কাজে অগ্রসর হতে চেয়েছেন বলেই রামেন্দ্রসুন্দরের বিজ্ঞানচেতনা সংহত, পরিচ্ছন্ন ও সৃষ্টিশীল। বৈজ্ঞানিক অন্বেষণ ব্যাপ্তি ও গভীরতা রামেন্দ্রসুন্দরকে বিশিষ্ট বিজ্ঞানীর ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। বিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের কথায় : “যাঁরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও পদ্ধতি অবলম্বন করতে শিখেছেন, তাঁদের মধ্যে সকলেই বৈজ্ঞানিক—একথা যে আমি মোটেই মনে করি না। যাঁদের মধ্যে সত্যিসত্যিই বৈজ্ঞানিক মানসিকতা জীবন্ত আমি তাঁদেরই বৈজ্ঞানিক বলতে পারি।”

তথ্যসূত্র

১. এম.এ. আজিজ মিয়া, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী: জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চা, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, কলকাতা
২. অরুণরতন ভট্টাচার্য, বাঙালির বিজ্ঞানভাবনা ও সাধনা, অরুণরতন ভট্টাচার্য, দে-জ পাবলিশিং, কলকাতা
৩. অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী: বিজ্ঞানভাবনা, বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতি, কলকাতা
৪. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (স.), রামেন্দ্র রচনাবলী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা

WITH BEST COMPLIMENTS FROM



M.B.ENGINEERING

AN ISO 9001:2008 COMPANY

OFFICE:-VIDYASAGAR ABASON.DURGAPUR-11.

WORKS1:-N.N. BOSE ROAD.DGP-11.WORKS2:-R.I.P.DGP-12.

www.mbadvancetechnologies.org ☎ - +91 9233362333

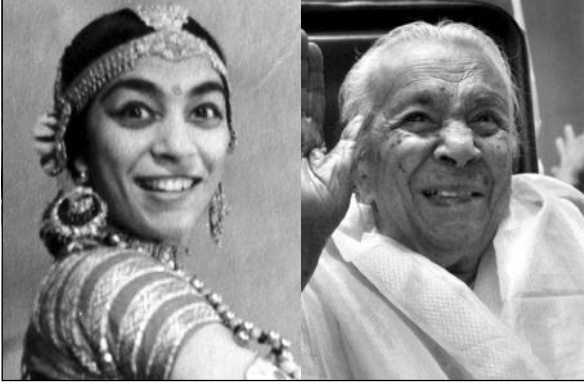
M.B.TECHNOSERVICES



M.B.MEDICALS

জোহরা সেহগল

সুধীর রায়

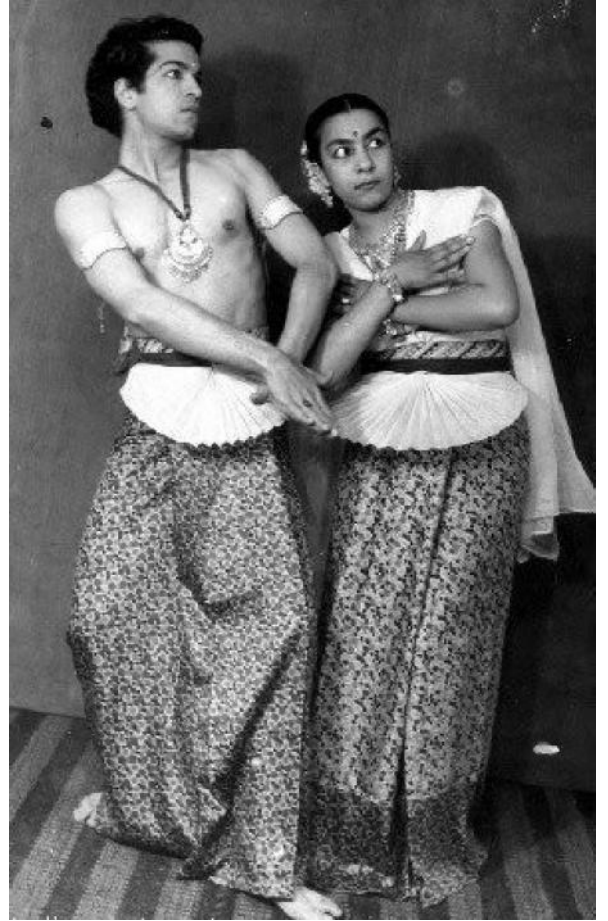


সাহেবজাদী জোহরা সেহগল ছিলেন অসাধারণ নৃত্যশিল্পী। রবীন্দ্রনাথের গান ‘তোমার নৃত্য অমিত বিত্ত ভরুক চিত্ত মম’—এই গানের মূর্ত প্রতীক ছিলেন জোহরা। উদয়শংকরের দলে জোহরা, সিমকি ও অমলাশংকর উদয়শংকরের নৃত্যের ধ্রুপদী আঙ্গিকের বিকাশে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। হাস্যে, লাস্যে ও অভিনয়কলায় জোহরা উদয়শংকরের দলের একজন সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হতেন। তিনি ভারতীয় গণনাট্য সংঘ তথা আই.পি.টি.এ.-র সঙ্গে যুক্ত হন এবং অসাধারণ চলচ্চিত্র অভিনেত্রী হিসাবে বিপুল খ্যাতি অর্জন করেন।

সম্প্রতি জোহরা সেহগল একশো দু-বছর জীবন যাপন করে (১৯১২-২০১৪) প্রয়াত হয়েছেন। তিনি রাজিলা পাঠান সম্প্রদায়ের মানুষ ছিলেন। আগে তাঁরা দেবাদুনের কাছে চাকারিয়া থাকতেন। পরে তাঁরা শাহরানপুরেই বাড়ি তৈরি করে থাকেন। তাঁর বাবা ও মা ছিলেন মমতাহউল্লা খান এবং নটিকা বেগম। তাঁদের সাতটি সন্তান ছিল—দুই ছেলে এবং পাঁচ মেয়ে। জোহরা সেহগল ছিলেন তৃতীয় সন্তান। তাঁর নাম রাখা হয় সাহেবজাদী জোহরা বেগম। যখন জোহরার এক বছরের কিছু বেশি বয়স, তখন তাঁর চোখে গ্লুকোমা ধরা পড়ল। চোখের চিকিৎসার জন্য জহুরাকে ইংল্যান্ডে নিয়ে যাওয়া হয় এবং বার্মিংহামের এক চোখের হাসপাতালে চিকিৎসা হয়। কিন্তু তিনি একটি চোখের দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেন। তিনি ছেলেবেলায় একটু টমবয় স্বভাবের ছিলেন। তিনি তখন অনায়াসে গাছে উঠতেন, যা সাধারণত সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েরা তখনকার দিনে করতেন না। জোহরা খুব অল্প বয়সে তাঁর মাকে হারান। মায়ের ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁকে ও তাঁর বোন উহরাকে লাহোরের কুইন মেরি কলেজে ভর্তি করা হয়। তখনকার দিনের প্রথা অনুযায়ী কুইন মেরি কলেজেও কঠোর পর্দাপ্রথা মেনে চলা হতো। যদি কোনো পুরুষ

বক্তা কলেজের সেমিনারে আসতেন, তাঁদের চিকের সামনে বস্তুতা করতে হতো। চিকের আড়ালে এসে মেয়েরা তাদের কথা শুনতেন।

দু-দুটি বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তী সময়ে তিনি যৌবনে পদার্পণ করলেন। তখন উপনিবেশগুলিতে স্বাধীনতার সংগ্রাম, সমানাধিকারের জন্য সংগ্রাম বাড়ছে। কুইন মেরি কলেজের ছাত্রী জোহরার স্বপ্ন ছিল তিনি অভিনেত্রী হবেন। তাই তিনি স্নাতক হবার পর ইউরোপে যাওয়ার চেষ্টা করতে লাগলেন। তাঁর এক মামা সাহেবজাদা শহিদুজ্জাফর তখন তাঁকে মোটর গাড়িতে করে ইরান, ইরাক, প্যালেস্টাইন, দামাস্কাস হয়ে আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরে জাহাজে তুলে দেন। তিনি গ্রেট ব্রিটেনে একজন অভিনেতার কাছে নাট্যচর্চার বিভিন্ন আঙ্গিক শিক্ষা করতে লাগলেন। পরে তিনি শিক্ষাকে আরও





নৃত্যশিল্পী স্বামী কামেশ্বর সোহগালের সঙ্গে

সার্থক ও পূর্ণাঙ্গ করার জন্য ড্রেসডেনে মেরি উইগম্যানের ব্যালে স্কুলে ভর্তি হলেন। তিনি নীলনয়না ছিলেন। একদিন ড্রেসডেনে উদয়শংকর ট্রুপের নাচ দেখে তিনি মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যান। তিনি সোজা গ্রিনরুমে গিয়ে উদয়শংকরের সঙ্গে দেখা করেন এবং তাঁর ট্রুপে যোগদান করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। উদয়শংকর বলেন যে জোহরা তাঁর শিক্ষা আগে সম্পূর্ণ করুন, পরে তিনি ভারতে ফিরে গিয়ে উদয়শংকরের দলে যোগ দেবেন। কিন্তু হঠাৎ উদয়শংকর জোহরাকে তাঁর সঙ্গে জাপানে যাওয়ার জন্য টেলিগ্রাম করলেন। জোহরা জাপান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইজিপ্ট এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশে উদয়শংকরের দলের সঙ্গে নৃত্য প্রদর্শন করলেন। ১৯৪০ সালে তিনি ভারতে ফিরে আসেন এবং আলমোড়ায় উদয়শংকরের সংস্কৃতি কেন্দ্রে যোগ দেন। তাঁর ভাবী স্বামী কামেশ্বর সোহগালের সঙ্গে তাঁর আলমোড়াতেই প্রথম পরিচয়। কামেশ্বর তাঁর তুলনায় ৮ বছরের ছোটো ছিলেন। তিনি একজন বৈজ্ঞানিক ও নৃত্যশিল্পী ছিলেন। চিত্রাঙ্কনেও তিনি পারদর্শী ছিলেন। কামেশ্বর রাধাস্বামী সম্প্রদায়ের মানুষ ছিলেন। তিনি জোহরাকে দেবীজ্ঞানে পূজো করতেন। পরবর্তীকালে তা প্রেমে রূপান্তরিত হয়। আত্মীয়স্বজনের তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও তাঁরা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। ১৯৪৩ সালে এই দম্পতি লাহোরে জোহরেশ নামে একটি প্রতিষ্ঠান খোলেন, যার উদ্দেশ্য ছিল নৃত্য, গীত, অভিনয় ইত্যাদি চর্চা করা। ইতিমধ্যেই তাঁর ছোটো বোন উহরা মুম্বই চলে যান এবং সেখানে পৃথ্বী থিয়েটারের শিল্পী হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। ১৯৪৫ সালে প্রধানত উহরার আগ্রহে জোহরা ও কামেশ্বর মুম্বই চলে যান। সাম্প্রদায়িকতার রাজনীতি তখন লাহোরের পরিবেশে উত্তরোত্তর বিষাক্ত করে তুলেছিল। জোহরা ও উহরার অভিভাবকদের সম্মতি না থাকলে তাঁরা কখনোই সংস্কৃতি জগতের এত উঁচুতে উঠতে পারতেন না। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য জোহরার এক দিদি হাজরা বেগমের সঙ্গে প্রখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা জেড. এ. আমেদের বিয়ে হয়। হাজরা বেগম ছিলেন উর্দু খাড়িবোলি সাহিত্যের একজন লেখিকা। ১৯৪৫ সালে মুম্বইতে এসেই জোহরা পৃথ্বী থিয়েটারে যোগ দেন। পৃথ্বী থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন পৃথ্বীরাজ কাপুর, যিনি রাজ কাপুরের পিতা ছিলেন। পরবর্তী ১৪ বছর জোহরা মুম্বইতে কাটিয়েছেন। মাসিক চারশো টাকার বিনিময়ে বিভিন্ন নারীর ভূমিকায় অভিনয় করেন। পাকিস্তান গঠিত হলে উহরা ও তাঁর স্বামী হামিদ বাট পাকিস্তানে চলে যান।

মুম্বইতে আসার পরেই তিনি ভারতীয় গণনাট্য সংঘে যোগ

দেন। এই সময় প্রধানত পি সি যোশীর উদ্যোগে ভারতে প্রগতি লেখক সংঘ এবং গণনাট্য সংঘ গড়ে ওঠে। প্রগতি লেখক সংঘ এবং ভারতীয় গণনাট্য সংঘে তখনকার দিনে দিকপাল লেখক, অভিনেতা ও চিত্রশিল্পীরা যোগ দিয়েছিলেন। তাঁরা নাৎসিবাদের বিরোধী ছিলেন এবং ধর্মনিরপেক্ষ এবং উদার সংস্কৃতিতে তাঁরা বিশ্বাস করতেন। রাহুল সাংকৃত্যায়ন, বিষ্ণু দে, শম্ভু মিত্র, তৃপ্তি মিত্র, পণ্ডিত রবিশংকর, ঋত্বিক ঘটক, ফয়েজ আমেদ ফয়েজ, শাহির লুধিয়ানভি জোস মালিহাবাদী, মগদুম মহিউদ্দিন প্রমুখ গণনাট্য সংঘের সদস্য ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। আই.পি.টি.এ.-র উদ্যোগে দুটি চলচ্চিত্র নির্মিত হয়, যে দুটি ছবিতে জোহরা অভিনয় করেন। একটি ছবি হল ‘ধরতি কে লাল’। এই ছবির কাহিনীকার ছিলেন কিশোর চন্দর। তাঁর ‘অন্নদাতা’ গল্পটিকে ভিত্তি করে ‘ধরতি কে লাল’ ছবিটি তৈরি হয়েছিল। মুনাফাখোরদের লোভের ফলে কীভাবে ৩৫ লক্ষ লোক গ্রাম থেকে শহর কলকাতায় এসে ‘একটু ফ্যান দাও, একটু ফ্যান দাও’ বলে চিৎকার করে শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়ে—এই ছিল অবিভক্ত বাংলার মহামায়াস্তরের ছবি। এই কাহিনীটিকে নাট্যরূপ দেন কে এম আব্বাস এবং বিজন ভট্টাচার্য। শম্ভু মিত্র ও তৃপ্তি মিত্র এই ছবিতে অভিনয় করেন এবং সুরারোপ করেন রবিশংকর। ইউরোপের কান চলচ্চিত্র উৎসবে এই ছবি প্রদর্শিত হয়।

জোহরার দ্বিতীয় ছবি ‘নীচা সংসার’ গোর্কির ‘লোয়ার ডেপথস’-এর অনুকরণে লেখা হয়েছিল। খাজা আমেদ আব্বাস কাহিনীটি রচনা করেন এবং চেনন আনন্দ ছবিটি পরিচালনা করেন। ১৯৫৯ সালে তাঁর স্বামী ও সহমর্মী কামেশ্বরের মৃত্যু হয়। তিনি এরপর কিছুদিনের জন্য দিল্লি আসেন এবং সঙ্গীত নাটক অ্যাকাডেমির ফেলো নির্বাচিত হন। তারপর একটা স্কলারশিপ পেয়ে তিনি ১৯৬২ সালে ইংল্যান্ড যান। ১৯৮২ সালে জোহরা মার্চেন্ট আইভরি প্রোডাকশনের ‘দ্য কোর্টেজান্স অব বোস্বে’ ছবিতে অভিনয় করে তুমুল সুখ্যাতি অর্জন করেন। তারপর তিনি ‘জুয়েলস ইন দ্য ক্রাউন’, ‘তন্দুরি নাইটস’, ‘মাই বিউটিফুল লনড্রেট’ ইত্যাদি অইভনয় করে খ্যাতির মধ্যগগনে ওঠেন।

বিগত শতাব্দীর নবম দশকে তিনি আবার ভারতে ফিরে আসেন, যখন তাঁর আশি বছরের ওপর বয়স হয়ে গেছে। তখন তিনি অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে উদয় শংকরের স্মৃতি অনুষ্ঠানগুলিতে যোগ দিতেন। কনিষ্ঠ বোন উহরার সঙ্গে ‘এক থি নানি’তে তিনি অভিনয় করেছেন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে। এই নাটকটি ইংরেজি ও উর্দু—দুই ভাষাতেই রচিত হয়েছিল। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট বম্বেতে তিনি রাজ কাপুরের সঙ্গে বাজনার তালে তালে নৃত্য পরিবেশন করেছিলেন রাজপথে। অমিতাভ বচ্চন বা ঐশ্বর্য রাই



অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গে ‘চিনি কম’ সিনেমায়



শতায়ু সোহগল।

তাকে ‘চিনি কম’ বা ‘হাম দিল দে চুকে সনম’-এ ম্লান করতে পারেননি। তিনি অভিনয় ভালোবাসতেন এবং জীবনের শেষ দিকে বিভিন্ন ছবিতে আত্মদী দাদিমার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন।

ভারত সরকার তাঁকে পদ্মশ্রী, পদ্মভূষণ, পদ্মবিভূষণ ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত করেছে। তিনি কালিদাস সম্মান পেয়েছিলেন। সঙ্গীত নাটক আকাদেমির ফেলো নির্বাচিত হয়েছিলেন। সহমতের উদ্যোগে দিল্লি লালকেল্লার সামনে তিনি সিপাহী বিদ্রোহের একশো

পাঁচাত্তরতম বার্ষিকী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু আবাসনের নিচের তলায় একটা ফ্ল্যাট চেয়েও তিনি পাননি, যখন তাঁর হাঁটুর নিচে মারণব্যাধি ক্যানসার ধরা পড়েছে। আমলাতন্ত্রের কারসাজিতে এইরকম একটা নিবেদিতপ্রাণ শিল্পীর শেষ ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি।

তিনি ফয়েজ আহমেদ ফয়েজ, শাহির লুথিয়ানভি, মগদুম মহিউদ্দীনের দীর্ঘ কবিতা অক্লেশে স্মৃতি থেকে আবৃত্তি করে শ্রোতাদের বিস্ময় উৎপাদন করতেন।

লোদী রোডে অবস্থিত শ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। অস্ত্যস্তির সময় তাঁর পুত্র অশোক, কন্যা করুণা এবং অন্যান্য নাতি নাতনিরা শেষকৃত্যে উপস্থিত ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, শীলা দীক্ষিত, জাভেদ আখতার, শাবানা আজমি, নাট্যব্যক্তিত্ব এম. কে. রায়না, প্রসার ভারতীর ডিরেক্টর জহর সরকার শেষকৃত্যে উপস্থিত হয়ে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

তথ্যসূত্র

১. সোহেল হাশমি, ‘ফ্রন্টলাইন’, ৮ অগস্ট, ২০১৪, পৃ. ১০৭-১১০
২. রত্নোত্তম সেনগুপ্তা, ‘টাইমস অব ইন্ডিয়া’, অগস্ট ৬, ২০১৪, পৃ. ৫
৩. প্রভাতাংশুবিকাশ সাহা, ‘আজকাল’, ৭ অগস্ট, ২০১৪, পৃ. ৪
৪. ‘পিপলস ডেমোক্রেসি’, জুলাই ১৪-২০, পৃ. ১১
৫. ‘সাপ্তাহিক বর্তমান’, ২ আগস্ট, ২০১৪, পৃ. ৬২

With Best Compliments of

FRIENDS CONSTRUCTION

DURGAPUR, BURDWAN

Sl. No. 127

With best compliments of



ELCON ENGINEERING

ELECTRICAL CONSTRUCTION, ELECTRICAL CONSULTANCY & TESTING

5/9, Guru Nanak Road, Durgapur-713204

Mobile : 9434388560, 9832167426

E-mail : elcon.engg@gmail.com

Sl. No. 126

With best compliments of



*Leasership
through innovation*

SRMB SRIJAN LIMITED

DURGAPUR WORKS

Sagarbhanga, Durgapur 713211, Dist. Burdwan

Phone + 91(0343) 6450788 / 645 0877

Fascimile : +91 (0343) 255 9206 / 255 9205

Sl. No. 171

অদ্বৈত মল্লবর্মণের ‘ভারতের চিঠি পাল বাককে’ স্বদেশচেতনা ও আন্তর্জাতিক ভাবনার মানবিক দলিল

সলিল ভট্টাচার্য

একথা ঠিকই যে শতবর্ষের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে কিংবা শতবর্ষ অতিক্রমের পর অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব মনীষী কিংবা সারস্বত প্রতিভার অধিকারী, লেখক - শিল্পী - সংস্কৃতি বারধারক-বাহকদের কথা আমরা মনে রাখি না। নিজের জীবদ্দশাতেই হয়তো বিস্মৃত হয়ে গেছেন; মৃত্যুর পরে কিছু স্মরণসভা হয়তো অনুষ্ঠিত হয়েছে। তারপর অনুসন্ধিসুগবেষক এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির একান্ত আপনজন ছাড়া কেউ



পাল এস বাক

তাকে মনে রাখেন না। এ-নিয়ে আপেক্ষ করে লাভ নেই। কারণ, বিস্মৃতিই কালের ধর্ম—মানবমনের গতিপ্রকৃতিও তেমনভাবেই নির্ধারিত হয়। আবার এর বিপ্রতীপ ঘটনাও মাঝে মাঝে আমাদের পোষিত ধারণাকে বদলে দেয়।

কোনো একটি সাহিত্যসভায় বিশিষ্ট সাহিত্যিক ড. সুনীল রায় (‘ধ্রুপদী’ পত্রিকার সম্পাদক) বলেছিলেন যে, ‘কালজয়ী’ কথাটা নেহাৎই ফোঁপরা। শরৎচন্দ্রকেও কালজয়ী সাহিত্যিক বলা যায় না। এ নিয়ে তুমুল তর্কবিতর্ক হয়। শরৎচন্দ্রের অবমূল্যায়নের যে প্রয়াস তার বিরুদ্ধে অনেকেই সোচ্চার হয়েছিলেন। তবু কথাটির মধ্যে আংশিক সত্যতা রয়েছে। হয়তো একটা ভাবাবেগ থেকে আমাদের বাংলা ও বিশ্বসাহিত্যের দিকপালদের নিয়ে মাতামাতি এখনও অব্যাহত। কিন্তু যে অভিনিবেশ ও সমাদরের প্রত্যাশা পাঠকের কাছে দাবি করা হয়, তার লক্ষণ এখন আর তেমন দেখা যায় না। আমাদের বইপড়ার ঝাঁক কমে আসছে, বিনোদনের যেটুকু সুযোগ এখনকার নানা কিসিমের প্রযুক্তি প্রসারিত করেছে, তাতেই আমরা হাবুডুবু খাচ্ছি। যশস্বী লেখকের কোনো রচনা চলচ্চিত্রে কিংবা টিভি সিরিয়ালে, ছোটোখাটো টেলিফিল্মে দেখানো হলে আমরা তা তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করি। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের বংশলতিকার খোঁজ করি। কিন্তু লেখক রচয়িতারা আড়ালেই থেকে যান।

এবার একজন লেখকের কথায় আসা যাক। ‘অদ্বৈত মল্লবর্মণ’। এই নামটি উচ্চারিত হলে অনেকেই ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ রচনাটির কথা হুড়মুড় করে বলতে থাকেন। কথিত উপন্যাসটি



অদ্বৈত মল্লবর্মণ

‘পদ্মানদীর মাঝি’ কিংবা সমরেশ বসুর ‘গঙ্গা’র বিষয় ও রচনামূল্যের কথাও উল্লিখিত হতে পারে। কিন্তু, অদ্বৈত মল্লবর্মণ যেভাবে রবীন্দ্রনাথের ঐকতান কবিতার কথা মনে রেখেছিলেন—‘জীবনে জীবন যোগ করা/না হলে কৃত্রিম পথে ব্যর্থ হয় গানের পশরা’, তা যেন কথিত উপন্যাসের পরতে পরতে মিশে আছে। তিনি নিজে এই ‘মালো’ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি। সেই জীবনধর্মের অভিজ্ঞতাকে তিনি উপন্যাসের মধ্যে অনবদ্য সৃষ্টিশীলতায় উজাড় করে দিয়েছেন। নির্মাণ এবং পুনর্নির্মাণের প্রক্রিয়া উপন্যাসটিকে এক আশ্চর্য মহিমা দিয়েছে।

তিতাসের স্রষ্টার ক্ষেত্রে এ বিষয়ে যতটুকু লোকপ্রিয়তা এবং সমাদর ঘটেছিল, তাঁর বাকি রচনাগুলির ক্ষেত্রে তেমনটি ঘটেনি।

কিন্তু আমাদের কাছে একটা ভিন্নতর সুযোগও সমুপস্থিত। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিদগ্ধ অধ্যাপক ও অধ্যবসায়ী গবেষক ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস অদ্বৈত মল্লবর্মণের জীবন ও সাহিত্য সম্বন্ধে যেভাবে আলোকসম্পাত করেছেন, তাতে মনস্বী পাঠক ও আলোচকরা তাঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকবেন। দে-জ পাবলিশিং নামক প্রকাশনা সংস্থার উদ্যোগে ‘অদ্বৈত মল্লবর্মণ রচনাসমগ্র’ প্রকাশিত হয়েছে। অধ্যাপক বিশ্বাস এই গ্রন্থের অন্তর্গত প্রায় সমস্ত রচনাগুলির উপর চমৎকার অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করেছেন—সংশোধন, সংযোজন, পরিমার্জনা, টীকা-টিপ্পনীর সমাহারে সুসম্পাদিত এই গ্রন্থটির মধ্যে আমরা মাত্র সাঁইত্রিশ বছর বয়সে প্রয়াত সাহিত্যসাধক, সাংবাদিক অদ্বৈত মল্লবর্মণের জীবন ও সাহিত্য সম্বন্ধে অনেকটাই জানতে পারছি। তবু সম্পাদক মহাশয় জানিয়েছেন যে এখনও সম্ভবত তাঁর অনেক লেখা

ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকতে পারে। সেগুলির প্রাপ্তি ঘটলে হয়তো অদ্বৈত মল্লবর্মণের প্রতিভার অনেক অনালোকিত দিক উদ্ঘাটিত হতে পারে। এসব কথা মনে রেখেই আমরা অদ্বৈত মল্লবর্মণের একটি বিশেষ রচনার কথা উল্লেখ করছি। রচনাটির নাম ‘ভারতের চিঠি—পার্ল বাককে’।

সাংবাদিক হিসেবে লেখক এই রচনাটির মধ্যে যেন একটি বিশেষ সময়ের ডকুমেন্টেশন চিহ্নিত করেছেন। বিশেষ করে এই রচনাটি গ্রন্থাকারে লেখকের জীবৎকালে প্রকাশিত প্রথম ও সর্বশেষ গ্রন্থ বলে শ্রীবিশ্বাস আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন। প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। পঞ্চাশের মন্বন্তর ভয়াল আকার ধারণ করেছে। এর মধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ১৯৪১-এর ২২ জুন তারিখে সোভিয়েত রাশিয়া আক্রান্ত হবার পর যুদ্ধ যে নতুন মোড় নেয়, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ যেভাবে ফ্যাসিবাদ-বিরোধী জনযুদ্ধের কথায় নতুন মাত্রা পায়, লেখক এই রচনাটির মধ্যে তারও বিষয়গত ভাবনাচিন্তার পরিবেশন করেছেন। ৪৭ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থটির ৩টি সংস্করণ আছে—চয়নিকা, বিশ্ববাণী ও বৃন্দবাক সংস্করণ। প্রথম সংস্করণের উৎসর্গপত্রে লেখক তাঁর উদ্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য একটি ছোট্ট চিঠি লিখেছিলেন। এখানেই আছে—“আজ পৌষের নবান্ন-পরবের মতো আমার প্রথম বই বেরোনোর উৎসবে সকল আগে তাই আপনাকে নেমন্তন্ন পাঠালুম।”

অদ্বৈত বোধ করি বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর জীবনকাল খুব একটা প্রসারিত হবে না। মনে মনে হয়তো উচ্চারণ করতেন—‘নীরবিন্দু দুর্বাদলে/নিত্য কি রে বলমলে?/কে না জানে অম্বুবিশ্ব অম্বুমুখে সদ্যঃপাতী?’ (‘আত্মবিলাপ’—মাইকেল মধুসূদন দত্ত)। তাই তাঁর জীবনজুড়েই মানুষের কাছে একটা বার্তা দিতে চেয়েছেন। নিজের জীবন-অভিজ্ঞতা ও স্বদেশ, সমাজ, বিশ্বের মানবিক বোধের নির্ধারিত রসায়ন জারিত হয়েছিল, সেখান থেকেই বারবার বলতে চেয়েছেন জীবনপ্রদীপে যতটুকু আলো জ্বলবে, সেটুকু যেন আমরা ব্যক্তিজীবনের সমস্ত ক্ষেত্রেই সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারি। তাই সুপ্রচুর পড়াশুনার মধ্য দিয়ে স্ব-শিক্ষিত হয়ে ওঠা, দারিদ্র্যের সঙ্গে কঠোর সংগ্রাম ও সাময়িকপত্র-সংবাদপত্রের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সুবাদে নিরন্তর লিখে যাওয়া। এর পাশাপাশি দুঃস্থ মানুষের পাশে দাঁড়ানোর ভূমিকা নিয়ে স্বোপার্জিত অর্থ অকাতরে পৌছে দেওয়া, নিজের খুৎ-পিপাসা, শরীর-স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বিগ্নহীন যাপিত জীবন তাঁর চলে যাওয়ায় ত্বরান্বিত করেছিল। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে জানুয়ারির ১ তারিখে যাঁর জন্ম, তিনি এই পৃথিবীর আলোবাতাস খুব বেশিদিন উপভোগ করতে পারেননি। ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিলের ১ তারিখে তাঁর জীবনদীপ নির্বাপিত হয়। কিন্তু এই স্বল্পস্থায়ী জীবনেই যা লিখেছেন—লেখার বিষয়বস্তু, প্রকরণ এতটাই বহুধাবিস্তৃত এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ যার তুল্যমূল্য আলোচনা করতে গেলে মহাভারত হয়ে যাবে। তাঁর প্রতিভার বিচার করার অধিকারী আমরা নই। তবু, সবদিক বিবেচনা করে আমরা তাঁকে একজন বহুপ্রজ্ঞ সাহিত্যিক (Prolific writer) হিসেবে গ্রহণ করতে পারি। তাঁর লেখার মধ্যে তৎকালিত্ব যেমন আছে, তেমনই চিরকালের মানবিক চেতনার একটা আবেদনও থেকে যায়। এই বিচারধারা অনুসরণেই আমরা তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ ‘ভারতের চিঠি, পার্ল বাককে’ নামাঙ্কিত রচনাটির পর্যালোচনা করতে পারি।

পার্ল এস বাক ছিলেন নোবেলবিজয়িনী একজন আমেরিকান লেখিকা। তিনি চিনের মানুষের জীবন ও সমাজকে নিয়ে প্রত্যক্ষ

অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অনেকগুলি গ্রন্থ লিখেছিলেন। দীর্ঘদিন তিনি নানকিং বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িয়েছেন। তবে তাঁর রচনাগুলির মধ্যে ‘দ্য গুড আর্থ’ নামক উপন্যাসটি তাঁকে বিশ্বসাহিত্যের অঙ্গনে যে জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা এনে দিয়েছিল, তা এখনও অগ্নান হয়ে আছে। পাঠক হিসেবে অদ্বৈতের সংগ্রহশালায় যে তালিকা পাওয়া যায়, তাতে বুঝতে পারি যে তিনি কেবল এ-দেশের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর লেখাই নয়, বিশ্বের দরবারে ছড়িয়ে থাকা অনেক ধরনের বই সংগ্রহ এবং পাঠে নিজেকে ঋদ্ধ ও আলোকিত করেছিলেন। পার্ল এস বাকের লেখার মধ্যে যে দরদ আর মানবিক আবেদন, তাকে তিনি সর্বজনীন বলে মনে না করলেও লেখিকার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে কুণ্ঠিত হননি। তবে কেবল শ্রদ্ধা নয়, কিছু অভিযোগ-অনুযোগও আছে। লেখাটির শুরুতেই তিনি বলেছেন—“সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার অনেক নারীই তোমার মতো পেয়েছে। তাদেরকে জানি : পড়েছি, ভালো লেগেছে। গুণগ্রাহিতা দেখিয়ে তাদের উপর বা তাদের বইয়ের উপর প্রবন্ধ লিখতেও পারি। তবু বলবো, তোমাকে যত ভালোবাসি, তাদেরকে তত বাসি না। তাদেরকে যে প্রেমসিক্ত শ্রদ্ধা দেবার কথা কখনো ভাবি না, তোমাকে তাই দিতে পারি অ-ক্লেশে।”

অন্যদের চেয়ে পার্ল এস বাককে কেন আলাদা করে নিয়েছেন, তার কারণস্বরূপ তিনি বলেছেন—“তাদের সৃষ্টি যদি মহৎ, তোমার সৃষ্টি মহত্তর। তাদের সৃষ্টি মনন-কেন্দ্রিক, ব্যক্তি বা সমাজ-কেন্দ্রিকও বলতে পারো, আর তোমার সৃষ্টি একটা মহাজাতির আত্মকেন্দ্রিক। তুমি তাদের থেকে পৃথক।”

আলোচনায় পরস্পরায় অদ্বৈত আপরাপর স্বেতাঙ্গদের তুলনায় পার্ল বাককে একটা স্বতন্ত্র মহিমায় অধ্বিত করেছেন। চিনদেশের সাধারণ মানুষের দুরবস্থায় লেখিকার মন ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল, কিন্তু এই সহমর্মিতাই মহৎ সৃষ্টির মূল কারণ হতে পারে না।

এই চিঠিতে লেখক যথেষ্ট সচেতনভাবেই যুগের রাজনীতির কথা উল্লেখ করেছেন—“তুমি কথা-শিল্পী হয়েও যুগের রাজনীতির সঙ্গে তাল রেখে চলেছ।... কিন্তু তোমার সৃষ্টি এমন একটা উৎসের মুখ খুলে দিয়েছে, যার থেকে একটা মহাজাতির প্রাণধারা উৎসারিত হচ্ছে, আজও, আগামীকালের জন্যও।” চিঠির লেখক কৃতজ্ঞচিত্তে ‘দ্য গুড আর্থ’-এর লেখিকার রচনার সঙ্গে এ-দেশের মানুষের দুরবস্থার সাদৃশ্যও তুলনা করেছেন। এ যেন ‘রাশিয়ার চিঠি’র রবীন্দ্রনাথের স্বদেশভাবনার ও সোভিয়েতের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে তুলনায় বেদনাঘন দীর্ঘশ্বাসেরই স্পন্দন! সুগভীর দেশপ্রেম! কেবল মাটি নয়, মানুষের জীবনের যে ছবি—তারই অভিজ্ঞতা ও অনুভবের মর্মস্পর্শী বিবরণ লেখকের এই চিঠির মধ্যে দেখতে পাই।

এসেছে মন্বন্তরের কথা। এসেছে বিশ্বযুদ্ধের ভয়ঙ্কর ধ্বংসলীলা এবং শোষকের নিষ্ঠুর চক্রান্তের কথা। কিন্তু তিনি মার্কিন দেশের এই লেখিকার প্রতি সমকালীন ভারতীয় জনজীবনের দুরবস্থা প্রণিধান করার আবেদন রাখছেন—“উক্ত দুই শ্রেণীর, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ, vested interest ভারতবর্ষকে কোথায় নিয়ে এসেছে তা তুমি, যদিও ভারতে বাস করনি কখনো হয়ত অনুমান করতে পারবে। এই সময়ে এখানে থাকলে তুমি একখানা নূতন ‘Good Earth’ লিখতে পারতে। সে হতো মহাচীনকে নিয়ে লেখার চেয়েও বেশী চমকপ্রদ, মর্মস্পর্শী ও মর্মদাহী কারণ, আজকার মৃত মহাভারত বিশেষ, সর্বশেষ, সর্বাধুনিক সমস্যার শাণিত আঘাতে জ্বরজ্বর। নিঃশেষে মরে যেতে পারছে না। তার উপর বিভীষণের চির-অমরতার অভিশাপ বর্তে আছে। সেটা কখনো মরবে না। শুধু ভুগবে, না পাবে ওষুধ, না পাবে পথ্য—পাবে খালি পদাঘাত আর গালিগালাজ।” কবি সুকান্ত লিখেছিলেন, “এদেশে জন্মে পদাঘাতই শুধু পেলাম/

অবাক পৃথিবী, সেলাম তোমাকে সেলাম।” সহমর্মিতার বেদনাঘন উপলব্ধি না থাকলে, স্বদেশবাসীর যন্ত্রণার কথা নিজের জীবনযন্ত্রণায় মেলাতে না পারলে অদ্বৈত মল্লবর্মণ কিংবা সুকান্তের মতো জীবনশিল্পীরা এভাবে লিখতে পারতেন না।

‘বোধন’ কবিতায় যেমন সুকান্ত ‘তেরশো সালের মধ্যবর্তীকালের (১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দ, ১৩৫০ বঙ্গাব্দ) ভয়ানক মন্বন্তরের ছবি এঁকেছিলেন, গদ্যশিল্পী অদ্বৈতর এই চিঠিতে সেই সময়কালের গা-শিউরে ওঠা বর্ণনা রয়েছে, এইভাবে—(পাঠক, ক্ষমা করবেন—একটি দীর্ঘ অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করতে হচ্ছে এই কারণে)——“পথ চলতে লক্ষ অন্নহীনের ভিড় ঠেলেতে হয়। তারা যেন তোমার ‘Good Earth’-এর চিত্রিত মানুষগুলিরই প্রতিচ্ছবি। না খেতে পেয়ে দলে দলে শহরের পথে পাড়ি দিয়েছে। কতক ঘরে কতক বেঁচে শহরে এসে উপস্থিত হয়েছে। অপেক্ষাকৃত সুস্থ মানুষের সহানুভূতি পাবার আশায় নানা রকম সুর তুলে কাতরাচ্ছে। শিল্প-কারখানাগুলিতে কাজ করে যারা যথেষ্ট বিড়ি টানবার পয়সা পাচ্ছে, তাদের মুখ-নিঃসৃত জ্বলন্ত বিড়ির শেয়াংশের জন্য কাড়াকাড়ি করে। তাদের নারীদের কাপড় নেই; সেইদিকে চোখ রেখে ওরা বিড়ির টুকরো ফেলে হাসতে হাসতে চলে যায়। অফিস-ফেরতা ক্লাস্ত বাবুদের মুখনিঃসৃত আমের আঁটি মাটি থেকে তুলে নিয়ে ওই নারীরা শীর্ণ শিশুগুলির মুখে পুরে দেয়। আমের দাম বেড়ে গেছে। আঁটি দুশ্রাপ্য। ডাস্টবিনের পচাগলা কুকুর বিড়াল ইঁদুরের মাংসের সঙ্গে মিশে আছে যে খাদ্যকণিকা, স্বর্ণ-রেণু অনুসন্ধানের অভিনিবেশ নিয়ে তাই তারা খুঁজে বের করে। সাহেব-বাড়ির চাকর ডাস্টবিনের পাশে দাঁড়িয়ে পরিত্যক্ত পচা রুটির টুকরো ছিটিয়ে দেয় কাদার উপর। তাই নিয়ে তারা কাড়াকাড়ি মারামারি করে। ধরতে না পারলে গলা ছেড়ে কান্না জুড়ে দেয়। তারপর এই করে কিছুদিনের পর সবটুকু জীবনীশক্তি নিঃশেষ হয়ে গেলে, ফুটপাথের উপরে, ব্যাফেলওয়ালের আড়ালে শুয়ে পড়ে; একটা ব্যঙ্গের হাসি রেখে মরে যায়। আরো দুঃখের বিষয়, তাদের বিকৃত দেহগুলোকে যথাসময়ে সরিয়ে নেবার মতো সভ্য নাগরিক ব্যবস্থাটুকু পর্যন্ত আমাদের নেই।”

এইসব উপাদান নিয়ে নোবেলবিজয়িনী হয়তো নব্য-মহাভারত জাতীয় থাউস মার্কা উপন্যাস লিখতে পারতেন। কিন্তু এই চিঠির লেখকের আশঙ্কা যে ভারতীয় পটভূমি নিয়ে লিখলে হয়তো তাঁর নোবেলপ্রাইজ কেড়ে নেওয়া হতো। হয়তো লেখিকার রচনায় প্ররোচনার গন্ধ খুঁজে পেয়ে বাজেয়াপ্ত হতো সেই বই। নজরুল, শরৎচন্দ্র, মন্মথ রায়ের মতো লেখক-শিল্পীদের কারাবাস কিংবা বই বাজেয়াপ্তকরণের নজির তো আছেই। লেখকের এই ধরনের আশঙ্কা তাই খুব একটা অমূলক ছিল না।

তবু, তিনি প্রশ্ন করেছেন——“তুমি ভারতের ন্যাশনালিস্টদের সম্বন্ধে সুবিচার করতে পারনি কেন?”

এরপর সত্যের অনুরোধে লেখক কিছু অপ্রিয় তিক্ত কথা উপস্থিত করেছেন। পার্ল বাক যে শ্বেতাঙ্গিনী এবং পশ্চিমি দুনিয়ায় মানুষ—সেকথা তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন। এ-দেশের বৃকে সি.এফ. অ্যাড্জু প্রমুখ মনীষীদের ভালোবাসা, উপঢৌকি থাকলেও তাঁরা পরাধীন জাতির মুক্তিসংগ্রামের ক্ষেত্রে বীরবন্তার পরিচয় দেননি। লেখিকা যেন ভুলে না যান, এইভাবে চিঠিতে বলা হয়েছে——“তুমি মার্কিন একথা তোমার ভুলে গেলে চলে না। তেমনি আমরা ভারতীয়রা ভারতবাসী, চীনারা চীনবাসী—একথাও ভুলে যাওয়া সম্ভব কি?”

ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের শোষণব্যবস্থার কায়মি স্বার্থে বারবার কেবল ভারত নয়, অন্যান্য দেশের স্বাধীনতার দাবিকে

প্রত্যাখান করেছে। চিঠিতে তাই দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা হয়েছে——“তোমাদের ভারতসচিব আমেরির কথাটা একবার শুনেছো?—Our whole policy in India, our whole policy in Egypt, stand condemned if we condemn Japan. এর সঙ্গে চার্লিল সাহেবের কথাটাও যোগ কর—আমি কি সাম্রাজ্যের দেউলিয়া-গিরিতে সরদারী করতে প্রধানমন্ত্রী হয়েছি?—ভারতের স্বাধীনতা দাবির এই জবাব!”

এ-দেশের তৎকালীন জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতের চমৎকার বিশ্লেষণ চিঠিটির ছত্রে ছত্রে বিধৃত। রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ সম্পর্কে ও লেখকের মোহমুক্ত অগ্রগামী চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। যুগ-যুগান্তর ধরে ক্ষমতার জন্য মদোন্মত্ত তথাকথিত দিগ্বিজয়ীদের চেহারাটাও তিনি স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র ‘জনযুদ্ধ’-এর টীকাকরণ কতখানি দুঃখমুক্ত হয়েছিল, সে বিষয়ে আজো যথেষ্ট বিতর্ক এবং প্রশ্নের অবকাশ আছে। লেখক এই প্রসঙ্গেই সাম্রাজ্যবাদ নাৎসীবাদের মূল উৎস যে শোষণব্যবস্থারই এক একটি ঘরানা, সে কথা তাঁর দিগদর্শন অনুসারে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন।——“সাম্রাজ্যবাদ, নাৎসীবাদ প্রভৃতি এক একটা বিরাট অগেনিজেশন জন-শোষণের যা কাজ করছে; তাদের যে অগণ্য সন্ততিসকলে দেশ ছেয়ে আছে, জন-শোষণের ক্ষেত্রে তারাও কম কাজ করছে না। পুঁজিদার, ব্যবসায়ী, কলমালিক ভূম্যধিকারী, কৃষক খাতানে জমির মালিক—মানুষের শ্রম, সম্পদ ও সুখশান্তি অপহরণে তারা কেউই কম পটু নয়। এরা প্রত্যেকেই বৃহত্তর vested interest-এর অসংখ্য খুঁটি।

... ..

প্রকৃত মানবতা ধ্বংসকারী এই ফ্যাস্কেনস্টাইনতনয়কে হত্যা করার উদ্দেশ্যে এক একদল অভিযাত্রী যুগে যুগে দুর্গম দুঃসাধ্য অভিযানে বেরিয়েছে।”

সাফল্য সহজে আসেনি। ভি. আই. লেনিনের ‘রাষ্ট্র ও বিপ্লব’, ‘সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায়’, জর্জি ডিমিট্রভের ‘শ্রমিকএক—ফ্যাসিবিরোধী দুর্গ’ কিংবা ইলিয়া এরেনবুর্গের উপন্যাস ‘প্যারীর-পতন’ ইত্যাদি গ্রন্থগুলির মধ্যে এর রাজনৈতিক কারণ ও বিষয়বস্তু বিশ্লেষিত হয়েছে। তথাপি লেখক অদ্বৈত মল্লবর্মণ সময়কালের পরিস্থিতিকে একটু আলাদাভাবে দেখেছেন——“এ যুদ্ধকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধরূপে জিইয়ে রাখার জন্য তোমরা যতই আট-ঘাট বেঁধে চল না কেন, ছিন্ন তুষারের মতো সব ভেসে যাবার আভাস তারা দেখতে পেয়েছে। তারা এ যুদ্ধকে জনযুদ্ধে পরিণত করার প্রতিটি সুযোগ কাজে লাগাবার জন্য সন্ধানী দৃষ্টি খোলা রেখেছে। কারণ এরা প্রকৃত জনযুদ্ধের মাঝে ফ্যাসিস্তবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ দু-য়েরই মৃত্যুর আভাস দেখতে পেয়ে উল্লসিত হয়ে উঠেছে। তাদের চোখে সে স্বপ্নাচ্ছবি যতই স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে, ততই তারা এ যুদ্ধে আমাদের এমন সব বজ্রদৃঢ় শ্লোগান তুলে দৃঢ় আন্তরিকতার সহিত তোমাদের যথেষ্ট সহায়তা করতে এগিয়ে এসেছে।” জনযুদ্ধের প্রসঙ্গে তখনকার এ দেশের এবং বিশ্বের কমিউনিস্ট আন্দোলনকে নানাভাবে নিন্দা ও সমালোচনা করা হলেও লেখক অদ্বৈত মল্লবর্মণ যথেষ্ট উদার, মুক্তমতির দৃষ্টিতে বিষয়টিকে দেখেছেন।

চিনের ওপর জাপ-আক্রমণের সাফাই গেয়ে সে দেশের কবি নোগুচি যে নির্লজ্জতার উগ্র-জাতীয়তাবাদের ধ্বজা উড়িয়েছিলেন এবং স্পর্ধার সঙ্গে ভারতের কবি ও মনীষী রবীন্দ্রনাথকে এই অপকর্মকে সমর্থন করতে বলেছিলেন, সে কথা অনেকেই জানা আছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কেবল খিকারই জানান নি, ‘বুদ্ধভক্তি’র

মতো কবিতায় (নবজাতক) তাঁর সূত্রী তীক্ষ্ণ শ্লেষের মনোভাবকে প্রকাশ করেছেন অনায়াস ভঙ্গিতে। অদ্বৈত লিখেছেন—“পাশ্চাত্যে নাৎসীবাদের এশিয়াটিক দোসর জাপানের বিশ্বচিন্তাজগতে দানের বিষয় কিছুই আমরা জানি না। শুধু জানি ভারতের কবি যেস্থলে সাম্রাজ্যবাদের দানবীয় হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে রাজসম্মান পদদলিত করে থাকেন, জাপানের কবি সে স্থলে সাম্রাজ্যবাদের হাতের পুতুল হয়ে মানবধ্বংসী প্রচারের কাজে আত্মসত্তা বিকিয়ে দেন।”

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্রপক্ষের ভূমিকা নিয়ে তাঁর মনে যথেষ্ট সংশয় এবং প্রশ্ন জেগেছিল। ব্রিটেন এবং আমেরিকা যতই ফ্যাসিবাদ-বিরোধী, নাৎসিবাদ-বিরোধী ভূমিকার কথা বড়াই করে বলুক না কেন, তারা সুচতুরভাবেই ‘জনযুদ্ধ’-র বিষয়টিকে কৌশলগতভাবে ব্যবহার করেছে। তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে এ-দেশের সর্বহারাদের মুক্তির জন্য যাঁরা আওয়ান, তাঁরা জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের সম্ভাবনাকে কতখানি প্রসারিত করতে পারছেন।

“প্রধানত জগতের তিনটি দেশই চিন্তাজগতে এবং রাষ্ট্রজগতে আলোড়নের সৃষ্টি করেছে। স্পেন, চীন ও রাশিয়ার কথা বলছি। ভারতবর্ষের কথা ইচ্ছা করেই বাদ দিলাম।” একথা বলার মধ্য দিয়ে তীব্র অভিমানও প্রকাশ পেয়েছে।

“বলছিলাম, ঐ তিনটি দেশেই সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা বিপন্ন

হবার উপক্রম হওয়ার নজীর নানা ক্ষেত্রে রয়েছে। স্পেনে গণতন্ত্র ভেঙে দিয়ে সেখানে ডিক্টেটরীতন্ত্র প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। রাশিয়ার সাম্যবাদী গণতন্ত্র ভেঙে দিয়ে সেখানে হিটলারী ভাবধারা প্রবেশের জন্য মরণপণ চেষ্টা করেছে। চীনে একদিকে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদী শোষণ অন্যদিকে জাপ আক্রমণ তার দেহ ও মন দুটিকেই ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছে। এই তিন দেশ সম্পর্কেই আধুনিক যুগের ব্যবসায়ী গণতন্ত্রীদের অতীতের ব্যবহার ভালো নয়।”

প্রসঙ্গক্রমে তিনি ভারতের কমিউনিস্টদের তখনকার ভূমিকাকেও প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছেন। ফ্যাসিস্ট বর্বরতা ও সাম্রাজ্যবাদের ভণ্ডামির বিরুদ্ধে বিশ্ব-কমিউনিস্ট আন্দোলনের পক্ষ থেকে অনেক বার্তা প্রকাশিত হলেও ভারতে ব্রিটিশ নীতির বিরুদ্ধে টু শব্দটিও নেই।

এসব ক্ষোভ, অভিমান সত্ত্বেও অদ্বৈত মল্লবর্মণ ছিলেন একজন মুক্তমতির সাধক এবং প্রগতিশীল চিন্তার অংশীদার। তাই তিনি ‘দ্য গুড আর্থ’-এর লেখিকার কাছে নতুন বিশ্ববিধানের সম্ভাবনাকে মানবিকতার আলোকে নতুন করে রচনা করার আহ্বান জানিয়েছেন। সমকালের দেশ ও বিশ্বের অসাধারণ বিশ্লেষণ করে লেখক ভাবিকালের জন্য উন্মুখ হয়েছেন।

With best compliments of

PRACHESTA SELF HELP GROUP

(Lic. No. 19026/06-07, Dt. 26-06-2006)

All Sorts of Civil, Construction/Mechanical Jobs, Labour & General Order Supplier

Regd. Office : B.B.D. Nagar, Sagarbhanga, P.O. Durgapur-11, Dist. Burdwan
Camp Office : Qr. No. Q-2, Sagarbhanga Colony, P.O. Durgapur-11, Dist. Burdwan
Mob. 9832749263, Ph. 0343-6453962

Sl. No. 125

মেঘনাদবধ, মধুসূদন ও রাবণ

আবদুস সামাদ

মধুসূদনের অভিন্নহৃদয় বন্ধু রাজনারায়ণ বসু ‘তিলোত্তমাসম্ভব’ (মে, ১৮৬০) পাঠ করে কবিকে তাঁর পাঠ-প্রতিক্রিয়া জানান এই ভাষায় : “Your reward is very great indeed—immortality.”

বাংলা তথা ভারতীয় ভাষায় দ্বিতীয় রহিত আলংকারিক মহাকাব্য (Literary epic) ‘মেঘনাদবধ’-এর পাঠ-প্রতিক্রিয়া বিষয়েও একই কথা লিখতে পারতেন রাজনারায়ণ। তবে যা লিখেছিলেন তার গুরুত্ব কোনো অংশেই ন্যূন নয়। ‘মেঘনাদবধ কাব্যের সমালোচনা’ শীর্ষক প্রবন্ধে সেকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যবোদ্ধা (যাঁর কাব্যরসজ্ঞতা ও পাণ্ডিত্য সম্পর্কে মধুসূদন ছিলেন সর্বাধিক শ্রদ্ধাবান) রাজনারায়ণ বসু লেখেন—

...স্বদেশে একটি মহাকবির উদয়
জাতিসাধারণের আনন্দের কারণ

বলিয়া বিবেচনা করা কর্তব্য। মাইকেল মধুসূদন দত্ত এই শ্রেণীর কবি।... বর্ণনার ছটা, ভাবের মাধুরী, করুণ রসের গাঢ়তা, উপমা ও উৎপ্রেক্ষার নির্বাচন-শক্তি ও প্রয়োগ-নৈপুণ্য অনুধাবন করিলে তাহার ‘মেঘনাদবধ’ বাঙ্গালা ভাষায় অদ্বিতীয় কাব্য বলিয়া পরিগণিত হইবে।... বহু শতাব্দী পরে যখন গ্রন্থকার এবং তাঁহার সমালোচক উভয়েই অন্তর্হিত হইবেন, তখনও মনুষ্যগণ অক্লান্ত অনুরাগের সহিত মেঘনাদ পাঠ করিবে।

কাব্যটি সম্পর্কে তৎকালে এবং কাব্যটির প্রকাশকালের (১৮৬১) সার্থশতবর্ষেও বহু আলোচনা-সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছে এবং হচ্ছে। সে-সব বিষয় এখানে অপ্রাসঙ্গিক। রাজনারায়ণ-লিখিত “বর্ণনার ছটা, ভাবের মাধুরী, করুণ রসের গাঢ়তা, উপমা ও উৎপ্রেক্ষার নির্বাচন-শক্তি ও প্রয়োগ-নৈপুণ্য” আজ বহুচর্চিত। আমরা সেদিকে যাচ্ছি না। এ কাব্যের নায়ক লঙ্কেশ্বর রাবণের দিকেই আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকবে।

তার আগে বলে নেওয়া দরকার মধুসূদন তাঁর ‘মেঘনাদবধ’ মহাকাব্যের কাহিনি সংগ্রহ করেছেন বাণ্মীকি ও কৃষ্ণিবাসের রামায়ণ থেকে—যেমন ‘তিলোত্তমাসম্ভব’-এর কাহিনি মহাভারত থেকে। তবে ‘তিলোত্তমাসম্ভব’ কাব্যে যেমন কীটসের ‘Hyperion’-এর সূচনাংশের চতুর্থ সর্গে মিলটনের ‘Paradise Lost’-এর এবং প্রায় সর্বত্রই কালিদাসের ‘কুমারসম্ভব’ কাব্যের (নামকরণে তো বটেই)



প্রভাব আছে, তেমনি ‘মেঘনাদবধ’-এও হোমারের ‘Iliad’, মিলটনের ‘Paradise Lost’, ভার্জিলের ‘Aeneid’, ট্যাসোর ‘Zerusalem Liberta’, দান্তের ‘Divine Comedy’ প্রভৃতি কাব্যের নানা উপাদান গৃহীত। কিন্তু মূল উপাখ্যানভাগটি যে রামায়ণের তা বলাই বাহুল্য। সেজন্য দেখাচ্ছি ‘মেঘনাদবধ’-এ চতুর্থ সর্গের প্রারম্ভে সীতা চরিত্রায়ণে হস্তাপর্ণ করার আগে মধুসূদন এ-বিষয়ে সাফল্যলাভের জন্য আদিকবি বাণ্মীকির চরণবন্দনা করে তাঁর আশীর্বাদ প্রার্থনা করেছেন। স্মরণীয়—

নমি আমি কবিগুরু, তব পদাস্বজে,
বাণ্মীকি! হে ভারতের শিরঃচূড়ামণি

...
গাঁথিব নূতন মালা, তুলি সযতনে
তব কাব্যোদ্যানে ফুল,....
...কৃপা প্রভু কর আকিঞ্চনে।

কিন্তু বাণ্মীকির রামায়ণানুসারী কবি ভবভূতি-ভর্তৃহরি- কালিদাস-কৃষ্ণিবাস প্রমুখের রাস্তায় তিনি হাঁটলেন না। প্রথম সর্গ সমাপ্ত করার পর বন্ধুবর রাজনারায়ণ বসুকে দীর্ঘ যে-পত্রটি তিনি লেখেন, সেখানে তাঁর কাব্যপরিকল্পনার সুস্পষ্ট আভাস আছে। সীতা চরিত্রায়ণে সাফল্যের জন্য আদিকবির অনুগমন ও কৃপা প্রার্থনার যে-দীনতা প্রকাশ পেয়েছে, কবির নিম্নোদ্ধৃত পত্রাংশে তার কিছুটা বিরুদ্ধ মনোভাবই দেখতে পাচ্ছি। জানাচ্ছেন, বাণ্মীকির নিকট থেকে যতটা সম্ভব কম ঋণ তিনি গ্রহণ করবেন। প্রাসঙ্গিক অংশটুকু তুলে দিচ্ছি—

...It is my ambition to engraft the exquisite graces of the Greek mythology on our own; in the present poem, I mean to give free scope to my inventive powers (such as they are) and to borrow as little as I can from Valmiki. Do not let this startle you. You shan't have to complain again on the un-Hindu character of the poem. I shall not borrow Greek stories but write, rather try to write, as a Greek would have done.

কিন্তু রাবণ ও রাম চরিত্রের ‘Hindu Character’ কি কবি রক্ষা করতে পেরেছেন?

রামায়ণের রাবণ চরম কুক্রিয়াসক্ত, ঘোর পাপাচারী, উদ্ধত, ক্ষমতামদমত্ত, ভয়ঙ্কর এক রাক্ষস। পরদার-অপহারক দশমাথাওয়ালা

এই পাপিষ্ঠকে বান্ধীকি ও কৃন্তিবাসী রামায়ণে সীমাহীন ঘৃণার পঙ্ককুণ্ডে নিক্ষেপ করা হয়েছে। রাম-সীতা ধর্মের এবং রাক্ষস রাবণ অধর্মের প্রতিনিধি। অর্থাৎ রাবণ রামের contrast। আর্যদের কৃষিসভাতা ও ধর্মসংস্কৃতির পরিপোষক বান্ধীকির বর্ণনায় শ্রীরামচন্দ্র ভগবান বিষ্ণুর ত্রৈতাযুগের অবতার। তাই তাঁকে যেমন সর্বপ্রযত্নে মহিমাষিত করা হয়েছে, তেমনি আর্যবৈরী অনার্য রাক্ষস লঙ্কেশ্বরের চরিত্রে যথাসাধ্য কালি ঢালা হয়েছে। বান্ধীকির রামায়ণ থেকে আখ্যানভাগ সংগ্রহ করে যাঁরা কাব্য-নাট্যাদি রচনা করেছেন—যথা কালিদাস, ভবভূতি-ভট্টহরি প্রমুখ, এবং প্রাদেশিক ভাষায় যাঁরা বান্ধীকি রামায়ণের অনুবাদ অথবা অনুবাদধর্মী কাহিনি রচনা করেছেন—যথা তামিল ভাষায় কুন্সন, আওধি উপভাষায় সন্ত তুলসীদাস এবং বাংলা ভাষায় কৃন্তিবাস, তাঁরা সকলেই আদি কবির দৃষ্টিভঙ্গি ও রসরচিতির পরিচর্যাকারী। সংস্কৃত রামায়ণ পাঠ করার যোগ্যতা সাধারণ বাঙালির ছিল না। ফলে প্রাদেশিক ভাষার রামায়ণ তাঁদের ধর্মপিপাসা ও রসতৃষ্ণা নিবারণ করে আসছে। উনিশ শতকের গোড়ায় শ্রীরামপুর মিশনের পাদ্রিদের চেষ্টায় ছাপা কৃন্তিবাসী রামায়ণ বাঙালির পক্ষে সহজলভ্য হয়। তাছাড়া যাত্রা-পাঁচালি-কথকতা প্রভৃতির মাধ্যমেও রাম-সীতার পবিত্র কাহিনি বাঙালি মানসে দৃঢ়মূল হয়ে ওঠে। অর্থাৎ কাব্যগ্রন্থ হয়ে ওঠে ধর্মগ্রন্থ এবং বিষ্ণুর অবতার শ্রীরামচন্দ্র হয়ে ওঠেন ভক্তির ভগবান। আর রাবণ হয়ে ওঠে ঘোর পাপের অতি কলঙ্কিত প্রতিমূর্তি। রামনাম পাপ বিনাশন। পবিত্র রামনামে ভবযন্ত্রণা থেকে মুক্তি ও স্বর্গলাভ। আর রাঘববৈরী, সীতাহরণকারী রাবণ পাপেরই অন্য এক নাম। রাবণকেও রামভক্ত হিসেবে উপস্থাপিত করে ড্যামেজ কন্ট্রোল করা হয়েছে বটে, কিন্তু সেটা আর ক-জনের মনে থাকে? তার রাঘববৈরী দুরাচারী রাক্ষস ইমেজটাই সর্বাতিশায়ী।

মধুসূদন জন্মেছিলেন হিন্দুর ঘরে। কাজেই রামায়ণের এই Hindu Character তাঁর রক্তের মধ্যেই ছিল—এটা ধরে নেওয়া যায়। আর রক্তের এই সংস্কার একরকম অত্যাজ্য। দিনের আকাশে তারার মতোই তা মনের গভীরে অবস্থান করে। ‘মেঘনাদবধ’-এ (১৮৬১) রাবণকে নায়ক ও রামচন্দ্রকে হিন্দু সংস্কারের বিরোধী খলনায়ক হিসেবে চিত্রিত করলেও রামচন্দ্র ও সীতার মহিমাও কাব্যটিতে অগোপন নয়। তার চেয়েও বড়ো কথা, শেষ বয়সে, মৃত্যুর সাত বছর আগে সুদূর ভার্সাই প্রবাসে যখন তিনি ‘চতুর্দশপদী কবিতাবলী’র (অগস্ট, ১৮৬৬) সনেটগুলি লিখছেন, তখন তাঁর চিত্তপটের চিত্রপটে ভেসে উঠেছে রামায়ণ, সীতাদেবী, কৃন্তিবাসের মহিমা। ‘কৃন্তিবাস’ (৭নং), ‘সীতাদেবী’ (৩০ নং), ‘সীতা-বনবাসে’ (৪৯ নং) প্রভৃতি সনেট দ্রষ্টব্য। সীতাদেবী সম্পর্কে কবির আন্তরিক শ্রদ্ধাভক্তি প্রসঙ্গে ‘মেঘনাদবধ’ কাব্যের চতুর্থ সর্গটি তো অবিস্মরণীয়। যাঁদের ধারণা মধুসূদন পিতৃপুরুষের ধর্ম পরিত্যাগ করে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন বলে হিন্দুর আরাধ্য দেবতা শ্রীরামচন্দ্রকে হয়ে ও অবজ্ঞেয় করে এঁকেছেন, তাঁরা ‘মেঘনাদবধ’ কাব্যখানা ভালো করে পড়েননি। রাবণের পাশে রাম নিষ্প্রভ সন্দেহ নেই। কিন্তু সেটা তাঁর কাহিনিরই দাবি। নায়ককে মহত্তর করতে হলে প্রতিনায়ক বা খলনায়ককে ন্তন করতেই হবে। এক্ষেত্রে কবির ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাস তথা হিন্দুধর্মের প্রতি বিরূপতা সন্ধান করা মুঢ়তা। রামায়ণ ধর্মগ্রন্থ বলে গৃহীত হতে পারে কিন্তু ‘মেঘনাদবধ’ ধর্মগ্রন্থ নয়—মহাকাব্য। একথা ভুলে গেলে কবির উপর মারাত্মক অবিচার করা হবে।

হিন্দু কলেজ (১৮১৭)-এর ছাত্র মধুসূদনের মন মানুষ হয়েছিল পাশ্চাত্য শিক্ষা-সভ্যতার আলোয়। পশ্চিমের জানালা দিয়ে তখন

চুকেছে নতুন চিন্তা-চেতনার মুক্ত আলো-বাতাস। মধুসূদন সেই নবজাগরণের ফসল। সনাতন হিন্দুধর্মে আস্থা টলছে শিক্ষিত যুবসম্প্রদায়ের। সেই সুযোগে প্রসারলাভ করেছে ব্রাহ্মধর্মমত। আবার অনেকে গ্রহণ করেছেন খ্রিস্টধর্ম। হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান ঘটিয়ে ঘরের ছেলের ঘরে ফেরাবেন যাঁরা, সেই রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের (১৮৩৬-৮৬) আবির্ভাব তখনও বেশ দূরে। তিনি দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরের পুরোহিত নিযুক্ত হয়েছেন ১৮৫৫ সালে। শিক্ষিত যুবসমাজের উপরে তাঁর প্রভাব পড়তে শুরু করেছে আরও অন্তত এক দশক পরে। স্বামী বিবেকানন্দের জন্মের (১৮৬৩) দু-বছর আগেই প্রকাশিত হয়ে গেছে ‘মেঘনাদবধ’ (১৮৬১) কাব্য। বঙ্কিমচন্দ্রের (১৮৩৮-৯৪) প্রথম বাংলা উপন্যাস ‘দুর্গেশনন্দিনী’ (১৮৬৫) ‘মেঘনাদবধ’-এর চার বছরের বয়ঃকনিষ্ঠ এবং হিন্দুধর্মের মহিমাবিষয়ক উপন্যাস ও প্রবন্ধাদির প্রকাশ শুরু হবে তারও অন্তত বছর দশেক পরে। অর্থাৎ আমাদের সামাজিক ইতিহাসে যাকে Age of Hindu Revival বলা হয়, মধুসূদন সে-যুগের পূর্ববর্তী। তিনি হিন্দুধর্মের ভাঙার সময়ের কালাপাহাড়। প্রাচীন বাংলার প্রতিস্পর্ধী Young Bengal।

কিন্তু হিন্দু ধর্মের উপরে বীতশ্রদ্ধ হয়ে যে তিনি খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, এ ধারণা শতকরা একশো ভাগ ভুল। ধর্ম নিয়ে তাঁর কোনো মাথাব্যথাই ছিল না। খ্রিস্টধর্মকে মই হিসেবে ব্যবহার করে তিনি ইংল্যান্ডে তাঁর স্বপ্নের ‘Albion’s Shore’-এ পৌঁছতে চেয়েছিলেন, কারণ তাঁর ধারণা হয়েছিল ইংল্যান্ডে যেতে না পারলে তিনি মিল্টন-শেলি-বায়রন প্রমুখের প্রতিকবি হতে পারবেন না।

ধর্মাস্ত্রির হওয়ার জন্য ১৮৪২ সালে মধুসূদন যাঁর শরণাপন্ন হয়েছিলেন তিনি রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। পাদ্রি কৃষ্ণমোহন তখন ব্রাইস্ট চার্চের সঙ্গে যুক্ত এবং অবস্থান করছেন কর্নওয়ালিশ স্কোয়ারে। একটি চিঠিতে তিনি জানিয়ে গেছেন, মধুসূদন তাঁকে খ্রিস্টধর্মের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগের কথা জানিয়েছিলেন, কিন্তু সেটা যে ছলমাত্র, কৃষ্ণমোহন তা বুঝতে পারেননি। সেই জন্য ওই চিঠিতে লেখেন, “After two or three interviews and a great deal of conversations, I was impressed with the belief that his desire of becoming a Christian was scarcely greater than his desire of a voyage to England.”

কিন্তু সত্যিটি ছিল এর বিপরীত। বিলাতযাত্রাটাই ছিল মধুসূদনের মূল উপেয়। আর খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ ছিল উপায়মাত্র। ভেবেছিলেন খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করলে তবেই তাঁর বিলেত যাওয়ার পথটা সুগম হবে।

হিন্দু কলেজের সহপাঠী গৌরদাস বসাককে লেখা কবির একটি চিঠি তার অকাটা প্রমাণ। ১৮৪২-এ রাজনারায়ণ দত্ত ধনী এক জমিদারের সুন্দরী কন্যার সঙ্গে ছেলের বিয়ে স্থির করেছিলেন। স্ত্রী পায়ের বেড়ি হয়ে যাবে ভেবে মধুসূদন আতংকিত হয়ে পড়েন। লিখছেন, “...I am to be married—dreadful thoughts! It harrows up my blood and makes my hair stand like quills on the fretful porcupine!...”

এই পত্রে তার পরেই লিখছেন, “You know my desire for leaving this country is too firmly deeprooted to be removed. The Sun may forget to rise but I cannot remove it from my heart. Depend upon it—in the course of a year or two more, I must either be in E-d [অর্থাৎ England] or cease ‘to be’ at all;—one of these must be done.”

বিলেত যাওয়ার উদ্দেশ্য যে উচ্চাকাঙ্ক্ষী মধুসূদনের মনে কতখানি দৃঢ়মূল ছিল তা এই চিঠিতে পরিষ্কার। হয় বিলেত, নয় মৃত্যু। দুটোর একটাকে তিনি বেছে নিতে চেয়েছিলেন। বুঝেছিলেন, খ্রিস্টান হয়ে গেলে কোনো হিন্দু তাঁকে আর কন্যাদান করবেন না। এই ভাবনার জায়গা থেকেই তিনি কালবিলম্ব না করে খ্রিস্ট ধর্মে ধর্মান্তরিত হন। ১৮৪৩ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি তিনি কলকাতার মিশন রো-স্থিত ওল্ড মিশন চার্চে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করলেন।

কিন্তু যে-উদ্দেশ্যে তিনি বিলেত যেতে মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন তা তখনই সম্ভব হলো না। যে-আর্চডিকন ডিয়ালিট তাঁকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা এবং ‘মাইকেল’ নাম দিয়েছিলেন, ১৮৪৪-এর ডিসেম্বর তাঁকে ইংল্যান্ডে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, পিতৃদেবের বাধায় তাঁর সঙ্গে মধুর স্বপ্নের দেশে যাওয়া সম্ভব হল না (গৌরদাস বসাককে লেখা চিঠি “...I am not going to England with Mrs. Dealtry; my father won't allow that...”)। তিনি বিলেত গেলেন খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করার প্রায় ১৯ বছর পরে, ১৮৬২ সালের ৯ জুন। তবে ইংরেজি ভাষায় কাব্যসাধনার জন্য নয়—সম্পূর্ণ ভিন্ন উদ্দেশ্যে, ব্যারিস্টারি পড়তে। ততদিনে চতুর্দশপদী কবিতাবলী ছাড়া মাতৃভাষায় তাঁর সারস্বতসাধনার পালা একরকম সমাপ্ত। নাটক-প্রহসন সহ ‘তিলোত্তমাসম্ভব’ (১৮৬০), ‘মেঘনাদবধ’ (১৮৬১), ‘ব্রজাঙ্গনা’ (১৮৬১) এবং ‘বীরঙ্গনা কাব্য’ (১৮৬২) প্রকাশিত এবং বাংলা ভাষায় তিনি তখন স্বনামধন্য ও সুপ্রতিষ্ঠিত কবি।

সে যাই হোক, ধর্মান্তরিত হলেও মধুসূদন কখনো তাঁর নবধর্মের পিছনে ছোটেননি। খ্রিস্টধর্মও তাঁর পিছু ধাওয়া করেনি। তিনি যে-জীবন যাপন করতেন, তা ছিল ধর্ম-পরায়ণতা থেকে শত যোজন দূরে। তিনি ছিলেন একমাত্র ‘Muse’-এর উপাসক, একজন ‘সেকুলার’ চিন্তাধারার মানুষ। মনে রাখতে হবে, খ্রিস্টান হলেও তিনি কোনো গির্জার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। এই কারণে তাঁর অস্ত্যেষ্টিক্রিয়া নিয়ে খ্রিস্টীয় ধর্মযাজকদের মধ্যে প্রচণ্ড বাদানুবাদ শুরু হয়েছিল। মৃত্যুর পর তাঁর মরদেহ যে পুষ্পাচ্ছাদিত অবস্থায় ২৪ ঘণ্টার বেশি সময় ধরে শায়িত ছিল, তার অন্যতম কারণ খ্রিস্টীয় সমাজের এই মতভেদ ও বাদপ্রতিবাদ।

মৃত্যুশয্যায়া মধুসূদন নিজেও জানতে পেরেছিলেন যে, তাঁর অস্ত্যেষ্টিক্রিয়া নিয়ে ধর্মযাজকেরা নানা গোলমাল পাকাচ্ছেন। কবির মৃত্যুশয্যার পাশে উপস্থিত রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে বললেন, “তুমি জীবনে কোনো গির্জার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলে না। এই কারণেই তোমার অস্ত্যেষ্টিক্রিয়া নিয়ে এত বাদানুবাদ চলছে। আমি খ্রিস্টীয় মতে তোমার নির্বিঘ্ন সংস্কারের জন্য লর্ড বিশপের অনুমতি নিয়ে আসি।”

সেকথা শুনে ব্রুদ্ধ মধুসূদন তাঁকে বলেছিলেন, “তিনি মানুষের তৈরি গির্জার সংস্রব গ্রাহ্য করেন না। “I am going to rest in my Lord! He will hide me in His best resting-place.”

অর্থাৎ অন্তিমকালে ঈশ্বরে তিনি তাঁর গভীর বিশ্বাসের কথা বলেছিলেন। মৃত্যুকালে রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহনের নিকট তিনি এ কথাও বলেছিলেন ঈশ্বর যে পাপীতাপীদের উদ্ধারের জন্য যীশুখ্রিস্টকে ধরাধামে পাঠিয়েছিলেন, এই সত্যে তাঁর সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে। কিন্তু কবির মৃত্যুকালীন এই সাক্ষ্য তাঁর সমগ্র জীবনের উপর প্রযোজ্য হতে পারে কিনা, জনৈক সুধী আলোচক এ-বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। প্রশ্নটি যথার্থ। সেকথা আরও বেশি করে মনে হয় কবির অভিন্নহৃদয় বন্ধু রাজনারায়ণ বসুর লেখা পড়লে। রাজনারায়ণ তাঁর ‘আত্মচরিত’ গ্রন্থে জানিয়ে গেছেন, কন্যাপ্রসঙ্গে মধুকে একদিন তিনি বলেন, “আমার এই সংস্কার জন্মিয়াছে যে



তোমার পরিচ্ছদ ও আহার ইংরাজের মতন হইলেও তোমার হৃদয়টা সম্পূর্ণ রূপে হিন্দু।”

তখন মধুসূদন বলেছিলেন, “তুমি ঠিক আন্দাজ করিয়াছ। আমি হিন্দু; কিন্তু একটা সমাজ ঘোঁষিয়া না থাকিলে চলে না, এই জন্য খ্রিস্টীয় সমাজ ঘোঁষিয়া আছি।”

মধুসূদনের খ্রিস্টধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে এর চেয়ে খাঁটি কথা আর হতে পারে না। আমরা বলতে চাই না যে, খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করার জন্য তিনি পরে অনুতপ্ত হয়েছিলেন। ব্যাপারটা অনেকটা দায়ে পড়ে দারগ্রহের মতো হলেও হিন্দুধর্মের প্রতি তাঁর অন্তরের শ্রদ্ধা ছিল বলে মনে করার কারণ নেই। তবে আজন্মার্জিত হিন্দু সংস্কার বিসর্জন দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। হিন্দু সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতি কবির অনুরাগ তাঁর চিঠিপত্রেরও লক্ষণীয়। হিন্দুধর্মের কুসংস্কার সম্পর্কে কবির দৃষ্টিভঙ্গি সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে ধর্মান্তরণ উপলক্ষে রচিত (৯-২-১৮৪৩) একটি কবিতায়। চারটি স্তবকে সম্পূর্ণ সেই কবিতাটির প্রথম দুটি স্তবক আমরা উদ্ধার করছি :

Long sunk in Superstition's night,
By sin and Satan driven—
I saw not,—cared not for the light
That leads the Blind to Heaven!

I sat in darkness,—Reason's eye
was shut,—was closed in me;—
I hastened to Eternity
O'er Error's dreadful Sea!

মধুসূদন খ্রিস্টান হয়েছিলেন বলে ‘মেঘনাদবধ’-এর শ্রীরামচন্দ্রের বিরুদ্ধে বিশোদ্ভাস করেছেন, তাঁকে ছোটো করে, হীন কাপুরুষ করে তুলে হিন্দুর ধর্মবিশ্বাসে অন্যায় আঘাত করেছেন, এই আশ্রয় ধারণার মুখতোড় জবাব দেওয়ার জন্যই আমাদের এত কথা বলতে হলো।

তাছাড়া রামকে কি তিনি শুধুই ভীক, রাক্ষসভীত, অদৃষ্টনির্ভর, দুর্বলচিত্ত করেই এঁকেছেন? তাঁর চরিত্রমহিমার কথাও কি কবি বলেননি? দ্বিতীয় সর্গের শেষে চিত্ররথ রামচন্দ্রকে বলেছেন, “সেই ব্যক্তিই ধন্য, যার আছে—

দেব প্রতি কৃতজ্ঞতা, দরিদ্র-পালন
ইন্দ্রিয়-দমন, ধর্মপথে সদা গতি,
নিত্য সত্য-দেবীসেবা...

—শ্রীরাম এইসব গুণের অধিকারী বলেই তো “ত্রিদিব-নিবাসী/মঙ্গল আকাঙ্ক্ষী তার; পাবনতী আপনি/হরপ্রিয়া, সুপ্রসন্ন তার প্রতি আজি।” রামচন্দ্র দেবভক্তিপরায়ণ মহাচরিত্র বলেই তো দূত চিত্ররথের মাধ্যমে তাঁর হাতে পৌঁছে যায় সেই অব্যর্থ দৈবায়ুধ, যা দিয়ে রামানুজ বধ করবেন দেবদৈত্যনরত্রাস ইন্দ্রজিৎকে।

তৃতীয় সর্গেও দেখছি রামচন্দ্রকে কবি শ্রদ্ধার আসনে বসিয়েছেন। প্রমীলার দূতী নুমুণ্ডমালিনীর সঙ্গে তাঁর কথোপকথন স্মরণীয়। তিনি প্রমীলার পতিভক্তির আন্তরিক প্রশংসা করেছেন। প্রশংসা করেছেন মেঘনাদেরও ((‘ধন্য ইন্দ্রজিৎ, ধন্য প্রমীলা সুন্দরী!’) দূতীকে আশীর্বাদ করে বলেছেন, “সুখে থাক, আশীর্বাদ করি।” প্রমীলা তাঁর নারীবাহিনী নিয়ে অবরুদ্ধ লঙ্কার প্রবেশদ্বার বাহুবলে উন্মুক্ত করে স্বামী-সন্দর্শনে যাবেন। সেকথা শুনে রামচন্দ্র বলেছেন, প্রমীলা ও তাঁর রাক্ষসীবাহিনী রামচন্দ্রের শত্রু নন—শত্রু তাঁর রাবণ। সুতরাং কেন তিনি প্রমীলার সঙ্গে শত্রুতা করবেন?

অরি মম রক্ষঃপতি; তোমরা সকলে

কুলবালা; কুলবধু; কোন্ অপরাধে

বৈরিভাব আচরিব তোমাদের সাথে?

প্রমীলা ও তাঁর বাহিনীকে তিনি সসম্মানে লঙ্কা-প্রবেশের অনুমতি দিয়েছেন—‘আনন্দে প্রবেশ লঙ্কা নিঃশঙ্ক হৃদয়ে।’ তারপর দ্বাররক্ষক হনুমানকে আদেশ দিয়েছেন প্রমীলা বাহিনীকে পথ ছেড়ে দিতে। শুধু তাই নয়, হনুমানকে এ আদেশও দিয়েছেন, ‘শিষ্ট আচরণে তুষ্ট কর বামাদলে।’ নারীজাতির প্রতি এই শ্রদ্ধা ও সম্মান কি প্রকৃত বীরের ধর্ম নয়? আরও স্মরণীয়, মেঘনাদের শব সৎকারাদির জন্য দূত সারণের মাধ্যমে রাবণ সাত দিনের যুদ্ধবিরতির অনুরোধ জানালে রামচন্দ্র তৎক্ষণাৎ সে প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন। শুধু তাই নয়, যোর শত্রু রাবণকে জানালেন সমবেদনা। সারণকে বললেন, “পরমারি মম, হে সারণ, প্রভু তব; তবু তাঁর দুঃখে/পরম দুঃখিত আমি কহিনু তোমারে।”

রামচন্দ্রের এইসব প্লাস পয়েন্টের কথা ভুলে গেলে মধুসূদনের প্রতি অবিচার করা হবে। সর্বোপরি কবির কাব্যপরিকল্পনা ও তাঁর যুগধর্মের কথা আগেই বলা হয়েছে, যা স্মরণ রাখলে কবিকে হিন্দুধর্মদ্রোহী বলার উপায় থাকে না। ভক্ত খ্রিস্টান মিল্টন (১৬০৮-৭৪) বাইবেলের কাহিনি নিয়ে লেখেন ‘Paradise Lost’ (প্রকাশকাল ১৬৬৭); যে কাব্যের অভিমুখ ‘to justify the ways of man to God’। এ কাব্যের খলনায়ক Satan, যে ঈশ্বরদ্রোহিতার জন্য স্বর্গ থেকে বিতাড়িত এবং ঈশ্বরের বিরুদ্ধে প্রতিশোধকামনা চরিতার্থ করার জন্য তাঁর প্রিয় সৃষ্টি মানুষের সর্বনাশকারী। ঈভকে সে নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণে প্ররোচিত করে এবং ঈভের প্ররোচনায় আদমও সেই নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করে সুখের স্বর্গ থেকে নির্বাসিত হয়। এহেন ঈশ্বরদ্রোহী পাপাত্মা শয়তান মিল্টনের গভীর সহানুভূতিতে অভিসিদ্ধিত। বাইবেলের খলনায়ক হয়ে উঠেছেন তাঁর মহাকাব্যের বরোণ চরিত্র। শয়তানের দুর্দমনীয় শক্তি, সাহস ও তেজস্বিতার মধ্যে কবি উপলব্ধি করেছেন মানুষের অপরাজেয় শক্তি তথা মানব-মহিমাকে। ঈশ্বরের শত্রু শয়তানের প্রতি কবির অপার মমতা ও সহানুভূতি দেখে রাজনারায়ণ বসুকে একটি চিঠিতে মধুসূদন মিল্টন সম্পর্কে লেখেন, ‘He is a Satan himself.’ অথচ ভক্ত খ্রিস্টানরা তো এই শয়তান-প্রীতির জন্য মিল্টনকে খ্রিস্টধর্মদ্রোহী বলে গাল পাড়েন না। যত দোষ মধুসূদনের বেলায়!

মধুসূদনের কাব্যপরিকল্পনায় পাশ্চাত্য কবিদের মধ্যে হোমার বাদে মিল্টনের প্রভাবই গুরুতর। তাঁর প্রভাবেই তিনি হিন্দুর পূজিত শ্রীরামচন্দ্রের শত্রু ও সীতাহরণকারী রাক্ষসরাজ রাবণকে

কাব্যনায়কের আসনে বরণ করেন। রাজনারায়ণকে লেখা অন্য একটি দীর্ঘ পত্রে তৎকৃত মিল্টন-প্রশংসা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি ওই পত্রে লিখছেন, মিল্টন ছাড়া ইংলন্ডীয় এমন একজনও কবি নেই, যিনি কালিদাস, ভার্জিল ও ট্যাসোর সমতুল্য—“I don’t think England has a single poet worthy of being named with these (কালিদাস, ভার্জিল ও ট্যাসো); her Milton is a grander being.” অবশ্য মিল্টন ‘Paradise Lost’-এর সমালোচ্য জায়গাগুলি চিহ্নিত করতেও তিনি দ্বিধা করেননি। লেখেন, “Like his own Satan, he is full of the loftiest thought but has little or nothing that may be called amiable. He elevates the mind of the readers to a most astonishing height but he never touches the heart...”

এ থেকে বোঝা যাচ্ছে, হৃদয় ছোঁয়ার অক্ষমতা সত্ত্বেও মিল্টন তাঁকে কতখানি প্রাণিত করেছিলেন। প্রসঙ্গত রাজনারায়ণকে লেখা একটি চিঠিতে কবির বক্তব্য, “I don’t think it is impossible to equal Virgil, Kalidasa and Tasso. Though glorious still they are mortal poets; Milton is divine.” মিল্টনের Bank Verse-এর আদর্শেই যে তিনি অমিত্রাক্ষর ছন্দটি গড়ে তোলেন, সে কথা কে না জানে!

শয়তানকে মিল্টন যেমন মহৎ ও বরণীয় করে এঁকেছেন, রাবণকে মধুসূদনও তেমনি রামের তুলনায় মহান ও শ্রদ্ধেয় করে তাঁকে নায়কের আসনে বসিয়েছেন। স্বাধীনতার উপাসক মিল্টনের শয়তান চরিত্রে যেমন কবির ব্যক্তিসত্তা ও যুগসত্তা কাজ করেছে, মধুসূদনের রাবণ চরিত্রেও তেমনি ত্রিংশীল ছিল তাঁর বাঁধনছোঁড়া দ্রোহচেতনা (নিজেও তিনি ‘tremendous literary rebel’ বলে অভিহিত করেন) ও নবযুগের চেতনা। সেটা হচ্ছে এই যে রাবণকে তিনি স্বাধীনচেতা একজন পরাক্রান্ত সম্রাট আর রামচন্দ্রকে তাঁর রাজ্য আক্রমণকারী বৈদেশিক শক্তি হিসেবে দেখেছেন। বিভীষণ ঘৃণ্য দেশদ্রোহী। নবজাগরণের অন্যতম দান স্বাধীনতাচেতনা ও স্বদেশপ্রেম। ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহের ঘটনাটিও এখানে স্মরণীয় যা ভারতের প্রথম মুক্তিযুদ্ধের মর্যাদা লাভ করেছে। ফলে রক্ষোবাহী রাবণ তাঁর মহাকাব্যের নায়ক আর তাঁর দেশের স্বাধীনতা হরণকারী বহিরাগত শ্রীরামচন্দ্র অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞার পাত্র।

কবি যে রাক্ষসপক্ষের পক্ষপাতী এবং শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি অবজ্ঞাপরায়ণ, সে কথা খোলাখুলি স্বীকার করতে দ্বিধা করেননি। রাজনারায়ণ বসুকে একটি চিঠিতে লিখছেন : “...People here grumble and say that the heart of the poet in Meghnad is with the Rakhasa. And that is the real truth. I despise Ram and his rabble; but the idea of Ravana elevates and kindles my imagination.”

—এখানে ‘despise’ শব্দটিকে ধর্মীয় সংস্কারের দৃষ্টিতে দেখলে ভুল হবে। রামচন্দ্রকে এখানে দেখতে হবে কাব্যের চরিত্র হিসেবে। রামচন্দ্রের প্রতি মধুসূদনের এবং বিধ দৃষ্টিভঙ্গির সর্বোত্তম ব্যাখ্যা দিয়ে গেছেন ড. সুকুমার সেন। তাঁর সুচিন্তিত বক্তব্য :

“যে সকল সমালোচক মধুসূদনের কথা I despise Ram and his rabble—ধরিয়া মনে করিয়া থাকেন যে, রামের উপর মধুসূদনের বিদ্বেষ ছিল, তাই তিনি রামকে কাব্যের নায়ক করেন নাই এবং সেই হেতু রাম চরিত্রের অবমাননা করিয়াছেন, তাঁহারা ভুল করেন।... মধুসূদন যে লিখিয়াছেন, ‘I despise Ram and his rabble’ তাহার প্রকৃত অর্থ ইহা—I despise Ram because of his rabble.”

বাস্তবিক কতকগুলো বানরসৈন্য নিয়ে রাবণের মতো একজন মহাপরাক্রান্ত স্বাধীনচেতা সম্রাটের অবমননা মধুসূদন মেনে নিতে পারেননি। অন্য একটি চিঠিতেও বন্ধুবর রাজনারায়ণকে তিনি লিখছেন, মেঘনাদবধ কাব্যের বিষয়টি সত্যিই ‘heroic’—যত নষ্টের গোড়া ওই হনুমানগুলো। “The subject is truly herioc; only the Monkeys spoil the joke.”

যেন-রাবণ দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য একে একে বীর পুত্র, পৌত্র ও দুর্ধর্ষ রাক্ষসবীরদের বলি দিচ্ছেন, অতিসমৃদ্ধ স্বর্ণলঙ্কা ছারখার হয়ে যাচ্ছে দেখেও ভেঙে পড়েননি, শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য কৃতসংকল্প, তেমন একজন পুরুষই তো মহাকাব্যের নায়ক হওয়ার যোগ্য। এই কারণেই রাবণচরিত্র তাঁর কবিকল্পনাকে উদ্ভুদ্ধ ও সমৃদ্ধ করে। মহাকাব্যের নায়কচরিত্র সম্পর্কে ‘সাহিত্যদর্শন’কার বিশ্বনাথ কবিরাজের নির্দেশ অগ্রাহ্য করে কবি একটি চিঠিতে লেখেন, “I will not allow myself to be bound by the dictat of Mr. Viswanatha of Sahitya Darpan.” বিশ্বনাথ কবিরাজের মতে মহাকাব্যের নায়ক হবে একজন দেবতা অথবা সদ্বংশজাত ধীরোদাত্ত ক্ষত্রিয়। মহাকাব্য বিষয়ে কবিরাজ মহাশয়ের নির্দেশ বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে মান্য করলেও নায়ক নির্বাচনের ক্ষেত্রে তিনি বিদ্রোহী। রামায়ণের আনখশিখরে লোমশ, বৃহৎ দত্ত-নখরবিশিষ্ট-নিষ্ঠুর নরখাদক রাক্ষস জাতির রাজা রাবণকে নায়কের কনক-আসনে অধিষ্ঠিত করলেন। দেখালেন তারাও আমাদের মতো দোষে-গুণে ভরা মানুষ। আমাদেরই মতো দেশকে ভালোবাসে, মাতা-পিতাকে ভক্তি করে; আমাদের মতোই তারা অপত্যবৎসল; তারাও আমাদের মতো শোকে দুঃখে কাঁদে আবার আনন্দ-উৎসবে মত্ত হয়। তারাও ইষ্টদেবতার পূজারী এবং বৃহৎ কর্মনিষ্ঠানে প্রবৃত্ত হওয়ার আগে ইষ্টদেবতার পূজা দিয়ে, তাঁর আশীর্বাদ প্রার্থনা করে। রণাঙ্গনে তারাও লঙ্ঘন করে না ক্ষত্রনীতি। মধুসূদন রাক্ষসপক্ষকে দেখেছেন এই মানবীয় দৃষ্টিকোণ থেকে। অন্যদিকে রাম-লক্ষণও তাঁর দৃষ্টিতে মানুষ ছাড়া অন্য কিছু নয়।

ধর্মগ্রন্থ মানুষের চেতনায় পাপ-পুণ্যের যে-মানদণ্ড গড়ে দিয়েছে তা দিয়ে রক্ষোকুলপতি রাবণের বিচার করতে গেলে ভুল হবে। Poetic justice প্রতিষ্ঠা করার জন্য কবি ‘মেঘনাদবধ’ মহাকাব্যখানি রচনা করেননি। তাঁর কাব্যনায়ক একজন মহিমাম্বিত নরপতি—শক্তি ও সম্পদের শীর্ষচূড়ায় অধিষ্ঠিত তুলনাহীন এক পুরুষ। তাঁর রাজসভার বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি লিখেছেন—

কনক-আসনে বসে দশানন বলী
হেমকূট হেমশিরে শৃঙ্গবর যথা
তেজঃপুঞ্জ; শত শত পাত্রমিত্র আদি
সভাসদ, নতভাবে বসে চারিদিকে।
ভূতলে অতুল সভা স্ফটিকে গঠিত
তাহে শোভে রত্নরাজি মানস-সরসে
সরস কমলকুল বিকশিত যথা।”...

তাঁর রাজসভার স্বর্ণছাদকে ধারণ করে আছে ‘শ্বেত রক্তনীল পীত স্তম্ভ সারি সারি’। ঝালরগুলিতে বুলছে পদ্মরাগ, মরকত, হীরা ইত্যাদি বহুমূল্য রত্ন। চারুকলাচনা সুন্দরী কিস্করীগণ দোলাচ্ছে সুচারু চামর। রত্নসিংহাসনারূঢ় দশাননের শিরে ছত্র ধারণ করে আছে ছত্রধর। “আহা./হরকোপানলে কাম যেন রে না পুড়ি/দাঁড়ান সে সভাতলে ছত্রধররূপে!” প্রথমসর্গে রাবণের রাজসভার এই বর্ণনার মধ্যে কবি তাঁর নায়কচরিত্রের অতুলনীয় মহিমাকেই ফুটিয়ে তুলেছেন।

কিন্তু এহো বাহ্য। এই প্রথম সর্গেই কবি পুত্রশোকাতুর রাবণের বেদনাকরুণ হৃদয়টিকে উন্মোচিত করেছেন। ভগ্নদুতের মুখে রামচন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত বীরপুত্র বীরকবাহুর মৃত্যুশোকে তিনি

কাতর—“বাক্যহীন পুত্রশোকে! ঝর ঝর ঝরে অবিরল অশ্রুধারা।” চোখের জলে ভিজে যাচ্ছে তাঁর বসন। বুক ঠেলে বেরিয়ে আসছে হাহাকার :

হা পুত্র, হা বীরবাহু, বীর চূড়ামণি!
কি পাপে হারানু আমি তোমা হেন ধনে?
কি পাপ হেরিয়া মোর, হে দারুণ বিধি,
হরিলি এ ধন তুই? হায় রে, কেমনে
সহি এ যাতনা আমি? কে আর রাখিবে
এ বিপুল কুলমান এ কাল সমরে!

বুকফাটা এই পুত্রশোক রাবণকে দেশকালনিরপেক্ষ পিতার সমতলে এনে দাঁড় করিয়েছে। মধুসূদনের রাবণ সীতাহরণরূপ পাপকর্মের জন্য আত্মগ্লানি ও অনুশোচনায় জর্জরিত। অলঙ্ঘ্য নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসে অমিত শক্তিদ্রব রক্ষোকুলপতি আজ হতাশায় আচ্ছন্ন। দেখতে পাচ্ছেন তাঁর সর্বনাশা পরিণাম—

হব আমি নিম্নলি সমুদ্রে
এর শরে! তা না হলে মরিত কি কভু
শূলী শঙ্কুনিভ ভাই কুন্তকর্ণ মম,
অকালে আমার দোষে? আর যোধ যত—
রাক্ষসকুল-রক্ষণ?

তা না হলে কেনই বা ঘটবে এমন অসম্ভব সংঘটন। ভিখারী রাঘবের হাতে নিহত হবে তাঁর মহাশক্তিধরপুত্র সেই বীরবাহু, ‘অমরবৃন্দ যার ভূজবলে কাতর...।’ ভগিনী সুপ্ননখার উপর অত্যাচার-অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তিনি পাবক-শিখারপিণী সীতাকে হরণ করে এনেছেন। সেই ভুলের জন্যই তাঁর ভাগ্যাকাশে আজ ঘনায়মান সর্বনাশের কালো মেঘ। তাই সুপ্ননখার উদ্দেশে তাঁর এই মর্মভেদী আক্ষেপ ও অনুশোচনা—

হায় সুপ্ননখা
কি কৃষ্ণণে দেখেছিলি তুই রে অভাগী
কাল পঞ্চবটী বনে কালকূটে ভরা
এ ভূজগে?

তাঁর নিজের দোষেই আজ স্বর্ণলঙ্কা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। পুষ্পমাল্যে সুসজ্জিত, দীপের আলোয় উজ্জ্বল নাট্যশালার মতো সুন্দর ছিল তাঁর লক্ষ্যপুরী। “কিন্তু একে একে/শুখাইছে ফুল এবে, নিভিছে দেউটি।”

বিলাপরত রাবণকে মন্ত্রী সারণ পরামর্শ দেন শোক সম্বরণ করতে। বলেন, সাধারণ মানুষের মতো এইভাবে ভেঙে-পড়া ভুবনবিখ্যাত বীর রাবণের পক্ষে শোভা পায় না। বজ্রাঘাতে পর্বতের অভভেদী চূড়া ধ্বংস হয়ে গেলেও পর্বত কাতর হয় না। তাছাড়া মায়াময় ভবমণ্ডলে দুঃখ-সুখ সবই মোহমাত্র—অজ্ঞান ব্যক্তিরাই সেই মোহের ছলনায় ছলিত হয়।

সেকথা শুনে রাবণ বলেন, তাঁরও অজানা নেই যে পার্থিব জগৎ-সংসার মায়াময়। ‘কিন্তু জেনে শুনে তবু কাঁদে এ পরাণ/অবোধ।’—এইখানেই রাবণ আমাদের মতো একজন রক্তমাংসের মানুষ, একজন পুত্রহারা পিতা, যার স্বাভাবিক শোকাবেগের কাছে হেরে যায় ভূয়োদর্শন, rationality। কে বলবে কবির এই দশানন রামায়ণের অসভ্য-বর্বর-কুক্রিয়াসক্ত রাক্ষস?

মধুসূদনের রাবণ শোকের সাগরে নিমজ্জিত হলেও শোকদুঃখজয়ী সেই মহাপরাক্রান্ত তেজস্বী পুরুষ পুনরায় বজ্রকঠিন ঋজু মেরুদণ্ড নিয়ে উঠে দাঁড়ান। পুত্রঘাতকের বিরুদ্ধে প্রতিশোধকামনায় জ্বলে ওঠেন। তাঁকে আহ্বান করে রণাঙ্গন। ভগ্নদুতের বীরত্বের কথা শুনে তিনি বলে ওঠেন—

সাবাসি দূত তোর কথা শুনি,
কোন বীর হিয়া নাহি চাহেরে পশিতে
সংগ্রামে? ডমরুধ্বনি শুনি কালফণী
কভু কি অলসভাবে নিবাসে বিবরে?

—এইখানে রাবণ সাধারণের বহু উর্ধ্ব। এইখানেই তাঁর ব্যক্তিত্ব নভস্পর্শী। এইখানে তিনি মহাকাব্যের নায়ক।

মধুসূদনের রাবণ নিষ্কলঙ্ক নন। সীতাহরণ তাঁর অনপনয় কলঙ্ক। কিন্তু মনে রাখতে হবে নারীলালসা চরিতার্থ করার জন্য তিনি সীতাকে হরণ করে আনেননি। লক্ষ্মণ কর্তৃক কর্তিত-নাসা ভগিনীর তথা রাক্ষসবংশের অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যই তাঁর বৈদেহীহরণ। জনকীকে হরণ করে তিনি অপরাধী রাম-লক্ষ্মণকে উচিত শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন।

এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, হাতের মুঠোয় পেয়েও রাবণ সীতার নারীত্বের কোনো অসম্মান করেননি। দেখেননি তাঁকে লম্পটের কামদৃষ্টিতে। পবিত্রতা ও সতীত্বের অতুলনীয় তেজস্বিতার জন্যই সীতা অগ্নিশিখারূপিণী। আরও মনে রাখবো, চতুর্থ সর্গে লঙ্কার অশোক কাননে বন্নি সীতা সরমার কাছে তাঁর অপহরণের কাহিনি আনুপূর্বিক বিবৃত করেছেন কিন্তু কোথাও রাবণের কুদৃষ্টির উল্লেখমাত্র করেননি।

সে যাই হোক, সীতাহরণ ব্যতীত অন্য কোনো পাপ মধুসূদনের কাব্যনায়ককে স্পর্শ করেনি। পক্ষান্তরে তাঁকে একদিকে কবি সমস্ত দিক থেকে মহত্বের শিখরে উন্নীত করেছেন, অপরদিকে তাঁকে নিয়তি-নির্বাতিত একজন মানুষের মতো কাঁদিয়েছেন। সেই অশ্রুধারায় তাঁর সীতাহরণের কলঙ্ক অনেকটা ধুয়েমুছে গেছে।

রাবণ রাক্ষসনৃপতি কিন্তু তিনিও দেবসেবী। ইষ্টদেবতা শিবের তিনি ভক্তিমান পূজারী। শক্তির দস্তে তিনি দেবতাকে অস্বীকার করেননি। শিব নিজেও পার্বতীকে বলেছেন (দ্বিতীয় সর্গে), ‘পরম ভকত মম নিকষানন্দন’। সেই পরম ভক্তের বিপদ তাঁকে চঞ্চল করে তুলেছে। সপ্তম সর্গে দেখছি বীরভদ্রকে তিনি দূত করে পাঠিয়েছেন ভক্তপ্রবরের কাছে। দূতের মাধ্যমে তিনি শুধু মেঘনাদের মৃত্যুসংবাদটিই পাঠালেন না—সেই সঙ্গে রাবণকে দিলেন রুদ্রতেজ। তাছাড়া ভক্ত রাবণ ইষ্টদেবের ছায়ামূর্তি দর্শনের সৌভাগ্যও লাভ করেছেন—“দেখিলা রাক্ষসনাথ দীর্ঘ জটাবলী/ভীষণ ত্রিশূল-ছায়া।” যাঁর ভক্তির টানে ভগবানকেও ভক্তের কাছে ছুটে আসতে হয়, তিনি যে কত বড় ভক্ত, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। অর্থাৎ রাবণ শুধু বাহুবলে বলীয়ান নন, ধর্ম তথা অধ্যাত্মবলেও মহাবলী।

আবার শৌর্যের দিক থেকেও তিনি তুলনাহীন। প্রিয়তম পুত্রের মৃত্যুসংবাদে মেঘনাদ-জননী রানি মন্দোদরী যখন স্বামীর পদতলে লুটিয়ে পড়ে অশ্রুর বন্যা সৃষ্টি করছেন তখনও বীর দশানন বীরের ধর্ম থেকে বিচ্যুত হননি। অশ্রুপ্লাবিতা পত্নীকে তিনি বলেছেন—

যাও ফিরি শূন্য ঘরে তুমি
রণক্ষেত্রযাত্রী আমি কেন রোধ মোরে?
বিলাপের কাল, দেবি, চিরকাল পাব!
... ... যাও ফিরি কেন নিবাইবে
এ রোষাগ্নি অশ্রুনায়ে, রানি মন্দোদরি?

রাবণ পত্নীব্রত স্বামী, স্নেহময় পিতা ও অগ্রজ, দায়বদ্ধ গৃহী, ইষ্টদেবে ভক্তিমান, দেশরতী সম্রাট, স্বদেশের স্বাধীনতা ও স্বজাতির মর্যাদারক্ষায় নিবেদিতপ্রাণ আকাশছোঁয়া এক ব্যক্তিত্ব। কিন্তু এতসব মহৎ গুণের আধার হওয়া সত্ত্বেও তিনি শোচনীয়ভাবে ধ্বংস হয়ে গেলেন। তিনি ট্রাজেডির নায়ক। ট্রাজেডির নায়ক মহোন্নত চরিত্র কিন্তু চারিত্রিক কোনো ত্রুটি (flaw) দুর্বলতা বা ভুলের জন্য ‘He falls from a position of lofty eminence.’ নিয়তি কেন বাধ্যতে। ট্রাজেডির নায়কও তেমনি নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসে সর্বনাশের অতল গহ্বরে নিষ্কিপ্ত হন। তাঁর সমস্ত ‘sufferings’-এর কারণ তাঁর ‘doings’ বা কৃতকর্ম। Error of Judgement বা ভুলের

জন্যই তাঁর পরিণাম হয়ে ওঠে শোচনীয় এবং দর্শকবৃন্দ সেই বিরাট পুরুষের ধ্বংসাত্মক পরিণতি দেখে অনুভব করেন ‘pity’ ও ‘fear’।

রাবণ মহাকাব্যের নায়ক হলেও মধুসূদন তাঁর মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন ট্রাজেডির নিয়তি-নির্বাতিত নায়কের মহিমা। তাঁর একমাত্র flaw সীতাহরণ। এর জন্য শূর্ণনখাকে দায়ী করলেও নিজের দায়িত্বও তিনি এড়িয়ে যেতে পারেন না। প্রথম সর্গ থেকেই শুরু হয়েছে তাঁর বিলাপ ‘হায়, বিধি বাম মম প্রতি’। সপ্তম সর্গেও একাধিকবার তাঁকে বলতে শুনি ‘বাম এবে রক্ষঃকুলেন্দ্রানি,/আমা দৌহা প্রতি বিধি’। কখনো বলছেন, ‘নিদারূণ বিধি... বামতম মম প্রতি’। ‘মরে পুত্র জনকের পাপে।’ তাঁর পাপেই বীরবাহুর মতো বীরপুত্রের মৃত্যু ঘটেছে; নিহত হয়েছে শূলীশভুনিভ ভাই কুম্ভকর্ণ। মেঘনাদের মতো বাসববিজয়ী বীর ‘লঙ্কার পঙ্কজ-রবি গেল অস্তাচলে’।

কাব্যরাস্ত্র থেকেই দেখছি, রাবণ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছেন অদৃষ্ট বা নিয়তি তাঁর প্রতি বিরূপ। স্মরণীয়, প্রথম সর্গে চিত্রাঙ্গদাকে তিনি বলেছেন, ‘গ্রহদোষে দোষী জনে কে নিন্দে সুন্দরী।’ আবার শেষ সর্গেও সেই একই কথা—‘বিধির বিধি কে পারে খণ্ডাতে’। ‘প্রাক্তনের গতি’ অপ্রতিরোধ্য। কর্মফল ভোগ করতেই হবে। দ্বিতীয় সর্গে শিবও ব্যথার্ত কণ্ঠে বলেছেন, রাবণ পরম ভক্ত হলেও ‘নিজ কর্মফলে মজে দুষ্টমতি’। তার পতন রোধ করা শিবেরও অসাধ্য।

রাবণের পতন সম্পূর্ণ হলো মেঘনাদের মৃত্যুতে। তাঁর কান্নায় কাব্যের আরম্ভ, আবার তাঁর কান্নাতেই কাব্যের শেষ। শুধু তিনি নন, ‘সপ্তদেবানিশি লঙ্কা কাঁদিল বিধাদে’। কবি আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তিনি বীররসের কাব্য রচনা করবেন—‘গাইব মা, বীররসে ভাসি,/মহাগীত।’ কিন্তু রাবণের শোকাশ্রু ধারায় সে সঙ্কল্প ভেঙে গেল

যে-রামচন্দ্রকে তিনি ‘ভিখারী রাঘব’ বলে চরম অবজ্ঞা করে এসেছেন, মেঘনাদের শোকপালন ও অস্ত্যেস্তিক্রিয়ার জন্য সেই রামের কাছেই ভিখারীর মতো দূত সারণের মাধ্যমে ভিক্ষা চাইলেন সাত দিনের যুদ্ধবিরতি। আর সিদ্ধুতীরে সহমরণেচ্ছু প্রমীলাসহ মেঘনাদের চিতাশয্যার পাশে দাঁড়িয়ে সর্বরিক্ত রাবণের হৃদয়ভেদী শোকার্তি—

ছিল আশা, মেঘনাদ, মুদিব অস্তিমে
এ নয়নদ্বয় আমি তোমার সম্মুখে—
সাঁপ রাজ্যভার পুত্র, তোমায়, করিব
মহাযাত্রা। কিন্তু বিধি বুঝিব কেমনে
তাঁর লীলা... বুখা আশা! পূর্বজন্মফলে...
কর্কুর গোরব রবি চির রাষ্ট্রধাসে!
সেবিনু শিবেরে আমি বহু যত্ন করি,
লভিতে কি এই ফল? কেমনে ফিরিব,—
হায় রে, কে কবে মোরে, ফিরিব কেমনে
শূন্য লঙ্কাধামে আর? কি সাঙ্ঘনা ছলে
সাঙ্ঘনিব মায়ে তব, কে কবে আমারে?...
রাবণের এই কান্নার মধ্যে কি মধুসূদনের নিজের কান্নাও মিশে

নেই? তাঁর জীবনও তো নিদারূণ আশাহত একটা দীর্ঘশ্বাসিত জীবন। রাবণের ‘ছিল আশা মেঘনাদ’ ইত্যাদি উচ্চারণ আর তাঁর নিজের বিলাপ, ‘আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিন হায় তাই ভাবি মনে’ ইত্যাদি যেন এক জায়গায় এসে মিশে গেছে। রাবণের ‘কিন্তু একে একে/শুখাইছে ফুল এবে, নিবিছে দেউটি’—এই বিলাপ আর মধুসূদনের ‘আত্মবিলাপ’ ‘দিন দিন আয়ুহীন হীনবল দিন দিন’ ইত্যাদি পাশাপাশি রাখলে বোঝা যায় রাবণের মধ্যে ভাগ্যহত মধুসূদনেরই বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাস। মিল্টন সম্পর্কে কবি যা বলেছিলেন, তাঁর সম্পর্কে সেই কথাটাই একটু ঘুরিয়ে বলা যেতে পারে—‘He is Ravana himself.’

শরৎ-সাহিত্যের বিরুদ্ধে প্রবোধকুমার সান্যালের অভিযান

অশোক দাস

আমাদের বাড়িতে একটি কাঠের সিঁদুকে কিছু পুরাতন বইপত্র ছিল, যার মধ্যে ছিল বিভিন্ন রেকর্ড কোম্পানির ক্যাটালগ, কিছু ফিল্মের গানের পুস্তিকা, যা সিনেমা আরম্ভ হওয়ার আগে সিনেমা হলে বিক্রি হতো এবং কিছু পুরনো সাময়িকপত্র। এগুলির মধ্যে ছিল ‘ভারতবর্ষ’, ‘প্রবাসী’, ‘বঙ্গবাসী’, ‘বঙ্গশ্রী’, ‘বিচিত্রা’, ‘খেয়ালী’, ‘দীপালি’, ‘ছন্দা’, ‘দুন্দুভি’, ‘সচিত্র শিশির’ এবং আরও কিছু পত্রিকার ১৯৩৫ থেকে ১৯৪২-এর বিভিন্ন সংখ্যা। আমার বাবা নিত্যানন্দ দাস রেকর্ড ও রেডিওর সাথে যুক্ত থাকা ছাড়াও এসব পত্রিকার সাথে যুক্ত ছিলেন এবং তাঁর গান ও কবিতাও প্রকাশিত হতো এসব পত্রিকাতে। আমার স্কুলজীবনে বাবার অবর্তমানে এইসব পত্রিকা পড়তে পড়তে বিষয়টি আমার নজরে পড়ে। সময়টা ছিল ১৯৫৬ সাল। দুঃখের বিষয়, অগ্নিকাণ্ডে সেই কাঠের সিঁদুকটি এবং এইসব মূল্যবান বইপত্র ভস্মীভূত হয়ে যায়। পরবর্তীকালে এসব পত্রিকা অপ্রাপ্য বলে আমার আফশোস করা ছাড়া আর কিছুই করার ছিল না। এর মধ্যে সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউটের প্রফেসর বীরেন দাশশর্মার পুরনো দিনের ফিল্ম সম্পর্কিত কিছু লেখার সাথে পরিচিত হয়ে টেলিফোনে তাঁর সাথে যোগাযোগ করি। এখনও পর্যন্ত তাঁর সাথে সাক্ষাৎ পরিচয় হয়নি। তিনি আমাকে শৈলজানন্দের ‘রায়চৌধুরী’ ফিল্মের বুকলেটটি ই-মেল-এ পাঠিয়ে আমার কৃতজ্ঞতাভাজন হলেন, কারণ ওই ফিল্মে বাবার লেখা একটি গান ব্যবহৃত হয়েছিল। আমি তাঁকে ‘খেয়ালী’ পত্রিকার বিষয়টি বলি এবং জানতে পারি যে পত্রিকাটির যে সংখ্যাগুলিতে বিতর্কের বাড় উঠেছিল, সেই সংখ্যাগুলি তাঁর সংগ্রহে আছে। তিনি বহু কষ্টে সেই সংখ্যাগুলি থেকে বিতর্কমূলক লেখাগুলি ফটোকপি করে আমার ঠিকানায় পাঠিয়েছেন। এগুলি ছাড়া আমার প্রবন্ধরচনা সম্ভব হতো না। তাই, আমি তাঁর কাছে দ্বিতীয়বার খণী হয়ে রইলাম।—লেখক

সাহিত্য অথবা ফিল্মের জগতে দুই ব্যক্তিত্বের দ্বৈরথ কোনো নতুন ঘটনা নয়। মধ্যযুগে অর্থাৎ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশকাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত প্রায় প্রতিটি কবি বা শিল্পীকেই আক্রান্ত হতে হয়েছে একাধিকবার। অনেক সময় তা ব্যক্তিগত পর্যায়ে নেমে এসেছে। মাইকেল মধুসূদন থেকে নজরুল—প্রায় প্রত্যেকেরই কবিতা বা কাব্যগ্রন্থের প্যারডি প্রকাশিত হয়েছে। মধুসূদনের ‘মেঘনাদবধ কাব্য’কে ব্যঙ্গ করে লেখা হয়েছে ‘ছুছুন্দরী বধ কাব্য’, নজরুলের ‘বিদ্রোহী’ কবিতারও প্যারডি লিখেছিলেন তাঁর বয়োজ্যেষ্ঠ মোহিতলাল মজুমদার। বঙ্কিমচন্দ্রের ‘বঙ্গদর্শন’কেও ব্যঙ্গের পাত্র হতে হয়েছিল। তবে সঙ্গীত সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ও ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং নাটক ও কবিতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের যে দ্বন্দ্ব তা এতই সূক্ষ্ম ছিল যে মধুসূদন-বঙ্কিমচন্দ্র-নজরুল যেভাবে তীব্র আক্রমণের সম্মুখীন হয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথকে সেভাবে আক্রান্ত হতে হয়নি। আবার অনেক সময় একে অপরের সমালোচনা করলেও তাঁদের মতান্তর কোনোদিন মনান্তরে পরিণত হয়নি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর পরম স্নেহভাজন এবং ভক্ত নজরুল ও শরৎচন্দ্রের সমালোচনা করলেও তাঁরা আদৌ রুষ্ট হননি। অভিমানাহত হয়তো হয়েছিলেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রতি এই দুই অনুরূপ সাহিত্যিকের বিনম্র শ্রদ্ধা অটুট ছিল।

বাংলার ছাত্রছাত্রীদের মুখপত্র ‘শ্রীহর্ষ’-তে বিংশ শতাব্দীর অন্যতম প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক প্রবোধকুমার সান্যাল (‘সান্ম্যাল’ বানান লিখতেন) শরৎ সাহিত্যের বিরূপ সমালোচনা করে একখানি পত্র লিখেছিলেন। পত্রটি সে-যুগের অন্যতম জনপ্রিয় সাপ্তাহিক ‘খেয়ালী’র সপ্তম বর্ষের ১৭ আষাঢ় ১৩৪৪ বঙ্গাব্দের ২৬তম সংখ্যায় পুনঃপ্রকাশিত হয়। ‘খেয়ালী’-র সম্পাদক এই বিশ্লেষণকে ‘অপূর্ব বিশ্লেষণ’ বলেছেন এবং প্রবোধকুমার সান্যালকেও ‘সুপ্রসিদ্ধ



কথাসাহিত্যিক’ আখ্যা দিয়েছেন এবং দুই পত্রের প্রতিবাদে শ্রীসুধীরবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক পাঠক যে পত্র লিখেছিলেন সেটিও ওই একই সংখ্যায় প্রকাশ করে অন্যান্য পাঠকের কাছে বিতর্ক আহ্বান করেছিলেন। অর্থাৎ আগুনটা একটু উসকে দিয়েছিলেন। প্রবোধকুমার সান্যালকে ‘প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক’ এবং তাঁর বিশ্লেষণকে ‘অপূর্ব বিশ্লেষণ’ বলার পেছনে কি তাহলে খেয়ালী-সম্পাদকের প্রবোধবাবুর মতামতের প্রতি প্রচলিত সমর্থন ছিল? একথা অবশ্য জোর দিয়ে বলা যায় না। কারণ, পাঠকের কলমে যা লেখা হয়, তার জন্য সম্পাদক দায়ী থাকেন না। কিন্তু এ-ও ভেবে দেখা দরকার প্রবোধকুমারের চিঠিটি ‘খেয়ালী’তে নয়, ‘শ্রীহর্ষ’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, ‘খেয়ালী’ সম্পাদক স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তা নিজেদের পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন। পত্রটি যে প্রবোধকুমার সান্যাল হঠাৎ লিখেছিলেন তা-ও নয়।

পত্রের প্রথম লাইন পড়েই বুঝতে পারা যায় যে তাঁর সম্পর্কে ‘শ্রীহর্ষ’ বা অন্য কোনো পত্রিকায় বিরূপ সমালোচনা হয়েছিল হয়তো। তারই জেরে তাঁর এই পত্রের অবতারণা। যাই হোক, পত্রটি ‘খেয়ালী’তে প্রকাশের সাথে সাথেই ভীমরুপের চাকে লোষ্ট্রনিষ্ক্ষেপ হলো এবং আরও অনেক পত্রলেখক পরপর কয়েকটি চিঠি পাঠালেন। কেউ প্রবোধকুমারকে মৃদু তিরস্কার করলেন। কেউ বা প্রচণ্ডভাবে হিংস্র আক্রমণ করলেন। কিন্তু, শরৎচন্দ্র এ-বিষয়ে একটিও উচ্চবাচ্য করলেন না। শরৎচন্দ্রের বয়স তখন ৬১ এবং প্রবোধকুমার তখন ৩২ বছরের যুবক। বলতে গেলে শরৎচন্দ্রের ছেলের বয়সী। আবার, প্রবোধকুমারের বিরুদ্ধে পত্রাঘাত হলেও তিনিও এ-বিষয়ে নির্বাক ছিলেন। প্রবোধকুমারের পত্র প্রকাশিত হওয়ার এক বৎসর পরেই অর্থাৎ ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের ১৬ জানুয়ারি শরৎচন্দ্র প্রয়াত হন। রবীন্দ্রনাথ জীবিত এবং শরৎচন্দ্রের উদ্দেশে বাংলার পাঠককুলের পক্ষে লিখেছিলেন—

যাহার অমর স্থান প্রেমের আসনে,
ক্ষতি তার ক্ষতি নয় মৃত্যুর শাসনে।
দেশের মৃত্তিকা থেকে নিল যারে হরি
দেশের হৃদয় তারে রাখিয়াছে ধরি।

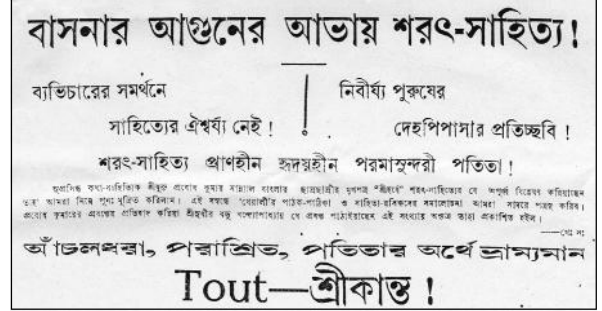
প্রবোধকুমার সান্যালের চিঠিতে কী লেখা ছিল, তা উল্লেখ করার আগে এ প্রজন্মের পাঠকদের কাছে প্রবোধকুমার যে কতবড় সাহিত্যিক ছিলেন, কেন তাঁকে ৩২ বছর বয়সেই সুপ্রসিদ্ধ বলা হয়েছে সে সম্পর্কে কিছু বলা আবশ্যিক।

প্রবোধকুমারের জন্ম ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে। তিনি প্রয়াত হন ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে। যাঁরা যাঁদের দশকে ‘দেশ’ পত্রিকার পাঠক ছিলেন, তাঁদের হয়তো স্মরণে থাকতে পারে যে ‘বনস্পতির বৈঠক’ নামে একটি ফিচার প্রতি সপ্তাহে প্রকাশিত হতো, যার লেখক ছিলেন প্রবোধকুমার সান্যাল। এই ফিচারেও তিনি বহু বিতর্কমূলক মন্তব্য করেছেন, যা অনেক পাঠকের মনঃপুত হয়নি। উপন্যাস ও ছোটগল্প ছাড়াও তিনি বিখ্যাত হয়ে আছেন ‘মহাপ্রস্থানের পথে’ এবং ‘দেবতাত্ত্বা হিমালয়’ নামে দুটি ভ্রমণ-কাহিনির জন্য। উল্লেখ করা যেতে পারে যে ‘মহাপ্রস্থানের পথে’ সুভাষচন্দ্র বসুর প্রিয় গ্রন্থ ছিল। প্রবোধকুমারের ‘হাসুবানু’ উপন্যাসটিও অনেকে পড়ে থাকবেন।

স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দেওয়ার পর কলেজে ভর্তি হওয়ার আগে যে অবসর পাওয়া যেত, সেই অবসরে আমরা প্রচুর উপন্যাস পড়তাম, তার মধ্যে ‘হাসুবানু’ উপন্যাসটির কথা আমাদের এখনো মনে আছে। উপন্যাসটির নায়িকা ‘হাসুবানু’ একজন মুসলমান যুবতী, নাম শুনেই পাঠকরা বুঝতে পারছেন। মুসলমান নারীকে নায়িকার পর্যায়ে উন্নীত করেছেন এই উদাহরণ বঙ্কিমচন্দ্রের ‘দুর্গেশনন্দিনী’ বা কাজী নজরুলের ‘ব্যথার দান’ ছাড়া এ-পার বাংলায় অন্য কোনো সাহিত্যিকের সম্মান অস্বত্ব আমার জানা নেই। এছাড়া তাঁর ‘প্রিয় বাসুদেবী’, ‘কলরব’, ‘আঁকাবঁকা’, ‘নদ ও নদী’, ‘বনহংসী’ ইত্যাদি উপন্যাসগুলিও পাঠকদের কাছে সমাদৃত হয়েছিল। দু-একটি চলচ্চিত্রায়িতও হয়েছিল। এছাড়া, তাঁর ‘নিশিদ্ভা’, ‘এলা ও জানা’, ‘অবিকল’, ‘তুচ্ছ’ এগুলিও রচনার সৌকর্যে বাংলা সাহিত্যের পাঠকদের কাছে প্রশংসা অর্জন করেছিল। রাশিয়া ভ্রমণ করে লিখেছেন ‘রাশিয়ার ডায়েরি’।

তিনি ‘স্বদেশ’ ‘বিজলী’ ইত্যাদি পত্রিকার সাথে যুক্ত ছিলেন। এক সময় তিনি ‘রবিবারের যুগান্তর’-এর সম্পাদক ছিলেন। এসব তথ্য দিয়েছেন বিশিষ্ট সাহিত্য গবেষক অগ্রজ পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়। এতৎসত্ত্বেও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে শরৎচন্দ্র যে উচ্চতায় পৌঁছেছিলেন বা সারা ভারতে যে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন

প্রবোধকুমার ঠিক ততটা জনপ্রিয়তা পাননি, যদিও জনপ্রিয়তাই রচনার সাহিত্যগুণের একমাত্র মাপকাঠি নয়। অনেক জনপ্রিয় সাহিত্যিক অপেক্ষা স্বল্পখ্যাত সাহিত্যিকের রচনার মধ্যে অসাধারণত্ব খুঁজে পাওয়া বিরল ঘটনা নয়। তবুও বলা যেতে পারে প্রবোধকুমার সেই অল্প বয়সেই শরৎচন্দ্রের মতো একজন সাহিত্যিকের সমালোচনা করার স্পর্ধা কোথা থেকে পেলেন, তা ভেবে দেখার বিষয়। এর আগে উল্লেখ করা হয়েছে যে মধুসূদন-বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ-নজরুলের যাঁরা সমালোচনা বা ব্যঙ্গ করেছেন তাঁদের অনেকেই সাহিত্যজগতে একেবারেই নিম্নশ্রেণির ব্যক্তিত্ব, তাঁদের নাম অধুনা বিস্মৃত। কিন্তু প্রবোধকুমার সান্যালকে সে দলে ফেলা যায় না। এখন কী লিখেছিলেন দেখা যাক। তাঁর আগে ‘খেয়ালী’ সম্পাদক কীভাবে ক্যাপসন দিয়েছেন দেখা যেতে পারে।



এরপর চিঠিটা শুরু হয়েছে এইভাবে :

প্রীতিভাজনেষু,

আপনাদের কথাই ঠিক। অনেক দুঃখে আবিষ্কার করেছি যে, আমি ভালো লেখক নই। বাজে বই লিখে বিজ্ঞাপনের কারসাজিতে যে কয়েকজন লেখক খ্যাতিনামা হয়েছেন, আমি তাদের মধ্যে একজন। যেহেতু কোনোকালে লেখপড়া শিখিনি সেই হেতু ভাবছি এবার মনস্তত্ত্ব মূলক উপন্যাস লিখবো। ভালো লেখক নই বটে, কিন্তু মন্দ পাঠকও নই। একথাটা জেনেছি নব্য লেখকদের মধ্যে শক্তিশালী যদি বা কেউ থাকেন, প্রতিভা একজনেরও নেই। প্রতিভা চলে ভাঙনের পথ ধরে—তার মুখে নতুন কথা, নব আদর্শ, তার হাতে বিচিত্র ভবিষ্যৎ। সেই বিচার অনুসারে মাইকেল-বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ প্রতিভা, সুরেন বাঁড়ুয়ে-গান্ধী-জওহরলাল প্রতিভা, শ্রীরামকৃষ্ণ-অরবিন্দ প্রতিভা। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের পরে আজো কোনো প্রতিভার আবির্ভাব ঘটেনি। সংশয়, বিবাদ ও বিতর্ক তাদের নিয়ে যাদের নাম talents, যারা mediocre, মধ্যমার্গী, এরা জাতির ও সভ্যতার অলঙ্কার মাত্র।

এই পর্যন্ত লিখে তিনি শরৎচন্দ্র সম্পর্কে একটি চরম অবজ্ঞাপূর্ণ মন্তব্য করেছেন, বয়সের মর্যাদাও দেননি। লিখেছেন—

শরৎ চাটুয্যে, মানে যিনি গল্প লেখেন, তিনিও এমনি একটি অলঙ্কার, বাংলা মায়ের অঞ্চলের নিধি। স্কুল কলেজের ছেলে মেয়ের প্রাইভেট আড্ডায় তাঁর অখণ্ড প্রতিষ্ঠা।

এরপর তিনি একটি মন্তব্য করেছেন, যা অনেকের কাছে self-contradictory মনে হতে পারে—

আমি শরৎচন্দ্রের অনুরাগী। তাঁকে সম্মান করি। বিনিময়ে তিনি দু’একবার আমার প্রতি স্নেহ প্রকাশ করেছেন মাত্র!... তিনি কিরণশঙ্কর রায়ের কাছে শেখেন রাজনীতি, রবীন্দ্রনাথের কাছে শেখেন সাহিত্য, কালিদাস রায়ের কাছে শেখেন বাংলা ব্যাকরণ, দিলীপকুমার রায়ের বই দাগ দিয়ে পড়ে শেখেন ইউরোপীয় ভাবধারা। সভা, সমিতিতে, রেডিওয়ে, সাময়িকপত্রে আমি কয়েকবার তাঁর প্রশস্তি

লিখেছি—কারণ আমি তাঁর ভক্ত। দুঃখের বিষয়, সেই বয়সটা আমি পার করে এসেছি, যে বয়সে ছেলেরা অতি অযোগ্য স্ত্রীলোককে দেবী বানিয়ে পায়ে অর্ঘ্য দেয়। সেই বয়সে শরৎচন্দ্রের রচনা অমৃতবৎ।

তারপর আবার একটি contradictory মন্তব্য—

শরৎচন্দ্রের সব বই আজো আমার পড়া হয়নি।

বলাই বাহুল্য বয়সে আমরা প্রবোধকুমার সান্যালের পুত্রতুল্য—তবুও ক্লাস টেন-এ পড়ার সময়ই আমি সবিনয়ে বলতে পারি যে, শরৎচন্দ্রের প্রায় সব রচনাই আমাদের পড়া হয়ে গিয়েছিল। এক একটা বই আমরা এক রাতেই গোথাসে গিলতাম। অথচ, প্রবোধকুমার শরৎচন্দ্রের ভক্ত হওয়া সত্ত্বেও একটা বয়স পার হয়েও শরৎচন্দ্রের সব বই পড়েননি কেন, বোঝা গেল না। তিনি আরও বলেছেন—

...স্ত্রীপুরুষের যৌন জীবনকে বিশ্লেষণ করাই তাঁর সাহিত্যধর্ম। যথা, পরিণীতা, দত্তা, গৃহদাহ, দেবদাস, দেনাপাওনা, চরিত্রহীন ইত্যাদি। বাসনার আগুনের আভায়ে তাঁর নায়িকার মুখ সাধারণতঃ দেখতে পাই। স্ত্রীলোকের যৌন চরিত্রচিত্রণে তাঁর লেখনীতে যেমন মধু বারে, পুরুষের চরিত্র সেই অনুপাতে উজ্জ্বল হয় না। সত্য বলতে কি তাঁর সাহিত্যে পুরুষ নেই।... তাঁর যে কোনো উপন্যাসে একই কথা, একই মানুষ, একই স্টাইল এবং একই তত্ত্ব। পুরুষের প্রতি এত বড় অসম্মান বাংলা সাহিত্যে এর আগে ঘটেনি।... পতিতাকে চরিত্রবতী করে বাজারে চালানো বালক ও বালিকা পাঠকদের কল্পনা খুশি হয়, কিন্তু সত্য প্রকাশ হয় না। পতিতার মধ্যে অনাসক্তি ও বিভিন্ন অতৃপ্তির ইতিহাস শরৎচন্দ্র জানেন না—পতিতা পেলেই তাঁকে সত্যী সাধ্বী বানানোর ইচ্ছা তাঁর জাগে।... শরৎ সাহিত্যে একটিও ‘পতিতা’ নেই, একটিও ‘চরিত্রবতী’ নেই। যারা আছে তারা স্বভাবধর্মবিরোধী ডিগবাজী খাওয়া মেয়ে, abnormal...’ ইত্যাদি।

অতঃপর তিনি শিক্ষিতা মেয়েদের প্রতি শরৎচন্দ্রের উপেক্ষার কথা বলে বলেছেন—

...যে কথাটা তিন পাতায় বলা যায়, সেই কথাটা ফেনান আঠারো ফর্মায়—দাম আড়াই টাকা—চতুর্থ সংস্করণ।... শরৎচন্দ্রের সাহিত্য অনেকটা যেন প্রাণহীন হৃদয়হীন পরমাসুন্দরী পতিতা!

...তাঁর রচনায় মেয়েরা দাঁড়ায় দু নৌকায় পা দিয়ে, পুরুষরা আশ্রয় নেয় আঁচলের ছায়ায়।

...আর বেচারি শ্রীকান্ত! ইন্দ্রনাথ যার বন্ধু, অন্নদাদিদি যার আদর্শ, অভয়া যার সঙ্গিনী, রাজলক্ষ্মী যার প্রণয়িনী—এত যার ঐশ্বর্য্য এত ছোটো কেন সে? আঁচলধরা, পরাশ্রিত, পতিতার অর্থে ভ্রাম্যমান tout-এই কি তার পরিণতি?... তার বয়স হলো জ্ঞান হলো না। অভিজ্ঞতা আহরণ করলে অভিজ্ঞানের সন্ধান পেলে না, তেরো বছরের শ্রীকান্ত, আর তেরিশ বছরের শ্রীকান্ত একই কাপুরুষ! যদি বিশ্বাস না করেন চতুর্থ পর্ব পড়ে দেখুন।

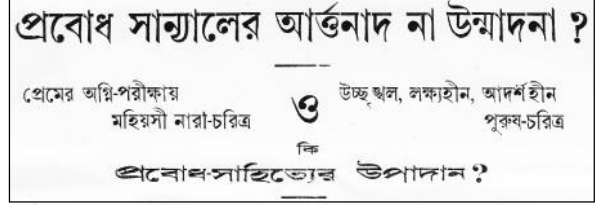
...গাম ছেড়ে তাঁর সাহিত্য সবেমাত্র শহরে এসেছে। কিন্তু গামের মেয়েকে ধরে এনে রাতারাতি টয়লেট করালে জর্জেট ধরালে সে শেষ প্রশ্নের ‘কমল’এর মতোই আজগুবি কথা বলে... একথা জানা দরকার।... শরৎ সাহিত্যে আগুন আছে, কিন্তু সে আগুন কিরণময়ীর রামা ঘরের, যুগ জীবনের হোমকুণ্ডের আগুন নয়।

প্রবোধকুমার সান্যাল।’

তিনি এই পত্রে লিখেছেন তাঁর সাহিত্যে নায়ক নায়িকার দ্বন্দ্ব হচ্ছে মিথ্যার বিপক্ষে উদারতার, পাপের বিরুদ্ধে সুবিচারের দ্বন্দ্ব। তাঁর মতে, সত্যের সাথে সত্যের দ্বন্দ্বই মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি করে। যেমন রামচন্দ্র আর সীতার আইডিয়ায় শকুন্তলা আর দুষ্যন্তের, কপালকুণ্ডলা আর নবকুমারে, নিখিলেশ আর বিমলায়। বাস্মিকি,

ব্যাসদেব, বঙ্কিমচন্দ্রের নারীরা যেমন মহীয়সী, পুরুষরাও তেমন পুরুষত্বে বলীয়ান।

‘শ্রীহর্য’ পত্রিকায় প্রকাশিত পুরো পত্রটি প্রকাশ না করে এই প্রবন্ধে কেবলমাত্র স্পর্শকাতর পংক্তিগুলি তুলে ধরা হলো। আমরা যখন কৈশোরে ‘খেয়ালী’ পত্রিকায় এই পত্রখানি পড়েছিলাম তখনই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিলাম। ‘খেয়ালী’র ওই সংখ্যাতেই সুধীরবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায় এই পত্রের চেয়েও দীর্ঘ পত্রে প্রবোধকুমার সান্যালকে আক্রমণ করলেন। খেয়ালী—সম্পাদক ক্যাপসন দিলেন—



সুধীরবাবুর আক্রমণ আরও তীব্র, আরও স্থূল। তিনি শুরু করেছেন এইভাবে :

প্রবোধকুমার যিনি গুটিকয়েক বই লিখে বিজ্ঞাপনের কারসাজিতে খ্যাতি-অখ্যাতি যাহোক কিছু অর্জন করেছেন, তিনি নিজেই অনেক দুঃখে এই গভীর সত্যটি আবিষ্কার করেছেন ও স্বীকার করেছেন যে তিনি একজন বাজে লেখক!

কিন্তু এমন যে লেখক, তাঁর এত বড় সাহসটা যে কী করে হলো ভেবে পাইনে!...

এমনি সময়ে প্রবোধ সান্যালের এ আত্মনাদ কেন? শরৎ-সাহিত্যের মূল্য! নির্দ্বার করবেন তিনি! কেন?...?

...আমি যদি বলি—প্রবোধকুমার সান্যাল প্রথম শ্রেণীর ত’ নয়ই’ দ্বিতীয়ও নয়, তৃতীয়ও নয়, একজন চতুর্থ শ্রেণীর লেখক—তাহলে তিনি বড়জোর তাঁর নাসিকা ও ঈ একটু কুণ্ঠিত করবেন এবং জন কয়েক অন্ধ স্তাবক, যাদের আঙ্গুলে গোনা যায়, মনে মনে একটু ব্যথাও হয়ত পাবেন। এর চেয়ে বেশী কিছু হবে না।

বলাই বাহুল্য সুধীরবাবুর এই উক্তির মধ্য তীব্র ক্ষোভ প্রকাশিত হয়েছে, আক্রমণটা ব্যক্তিগত পর্যায়ে চলে গেছে। এখনও পর্যন্ত তিনি প্রবোধ কুমারের সাহিত্যের কোনো সমালোচনা শুরু করেননি। পরের প্যারাগ্রাফ-এ লিখেছেন—

এই হলো আমার প্রস্তাবনা। দ্বিতীয় আমি বলতে চাই প্রবোধবাবুর অকস্মাৎ এই উন্মাদনা কেন?

অর্থাৎ তিনি প্রবোধবাবুকে উন্মাদ বলে কার্যত গালাগালিই দিলেন। এর কয়েক লাইন পর তিনি প্রবোধবাবুর কয়েকটি স্ববিরোধী উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। প্রবোধবাবু শরৎপ্রশস্তি করতে গিয়ে অন্যত্র বলেছেন—

তাঁর চরিত্রগুলি গল্পের কল্পলোক থেকে নেমে সুমুখে এসে সারল্যে ও সুন্দর ভঙ্গীতে বলে যায় শরৎচন্দ্র কোথাও তাঁদের আত্মবঞ্চনা করতে শেখাননি, শেখাননি বলেই আমাদের প্রতিদিনের দেখা, প্রত্যেকের জানা মানুষ তাঁর কলমের মুখে অপরূপ হয়ে ওঠে...

সুধীরবাবুর প্রশ্ন—

প্রতিদিনের দেখা, প্রত্যহের জানা চরিত্রগুলি তাঁর কলমের মুখে যদি সত্যই অপরূপ হয়েই ওঠে, তাহলে চরিত্রসৃষ্টির দিক দিয়ে নূতন অভিযোগ ‘এবনমালিটি’ কথাটি কি ভাষ্যকারের নূতন ভাষ্য?

প্রবোধবাবুই একদিন বলেছেন—এই মানুষটির দিকে তাকালেই আমি একটি বিস্ময় ও উল্লাস অনুভব করি, সে যে কী আনন্দ আমি তা বলতে পারিনে—বলতে পারতাম যদি তাঁর শ্রীকান্তের মতো কোমল ও মধুর আত্মপ্রকাশের ভাষা

আমার হাতে থাকতো। শিশিরম্নাত প্রভাতের জলপথ যেমন একটি একটি করে আপন পল্লবদল সূর্যের দিকে প্রসারিত করে জেগে চারিদিকে বিকীর্ণ করেছেন, তাঁর লেখা পড়তে গেলেই একটি চন্দ্রকরোজ্জ্বল নিস্তন্ধ, রাত্রির রূপ মনে ভাসতে থাকে, একটি তপস্বীর রূপ, অর্দ্ধ-নির্মীলিত চন্দ্র একটি ধ্যানমূর্তি! অদ্যকার প্রবন্ধে তাঁর মত—শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে নরনারীর শক্তি, সাহস, স্বপ্ন, আদর্শ কিছু নেই।

শরৎচন্দ্র সম্পর্কে প্রবোধকুমারের এবংবিধ উক্তিগুলি উদ্ধৃত করে সুধীরবন্ধু বলেছেন—

ঠিক এইসব মতবাদের পাশেই যদি ‘শ্রীহর্ষের’ চতুর্থ বর্ষের দ্বাদশ সংখ্যা খুলে বসে পড়তে শুরু করে দিই—তাহলে লেখককে বলতে হয়—অবিম্যভাষী, বয়স্কবালক, মিথ্যাচারী ও দাস্তিক।

এতক্ষণে বুঝতে পারলাম সান্যাল মশাই আর যাই হোন, বোকা নন, বেশ সূচকুর ও বুদ্ধিমান... ইন্সকুল কলেজের বহু ছাত্রী যে কাগজটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সেই ‘শ্রীহর্ষ’ পত্রিকাতেই তাঁর নিজের সম্বন্ধে এই বিজ্ঞাপনটি সাড়ম্বরে প্রকাশ করার কারণ কি?

গতানুগতিকতার পথ ছেড়ে দিয়ে, জরাজীর্ণ পুরাতনকে ভেঙ্গে দিয়ে চিরাগত সংস্কারের বিরুদ্ধে যে বাণী নিয়ে একদা বিংশতি বর্ষ পূর্বে একটা বিরাট বিস্ময়ের মতই শরৎচন্দ্র অতর্কিতে আবির্ভূত হয়ে বাঙলার সাহিত্য জগতে মানবতার প্রথম পুরোহিত বলে ‘রিয়্যালিজম এর সর্বপ্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ রূপদক্ষ ভাস্কর বলে’ অভিনন্দিত হলেন সেকথা প্রবোধ সান্যাল ভুলে গেলেও, বাঙলার সুধীবন্দ আজও ভোলেননি। দেহে তাঁর শক্তি বেশি থাকতে পারে, কিন্তু মস্তিষ্কের শক্তিও যে বেশি আছে একথা মেনে নিতে পারি না।

প্রবোধ সান্যালের দৃষ্টি হয়ত কিছুটা স্থূল, কিন্তু ঝাপসা, কিঞ্চিৎ অপ্রাকৃতিক এবং মনের অবস্থাও হয়তো বৃদ্ধু ও পীড়িত, তাই ছদ্মবেশী যৌবন লালসার একটা সূতীর কামনায় তিনি কিরণময়ীর রামাধরের আগুণটুকুই শুধু দেখেছেন। তা দেখুন এবং তা দেখেও তিনি নিজের মনের আগুণ তাতে চাপা দিতে পারেননি।

পরবর্তী প্যারাগ্রাফগুলিতে তিনি প্রবোধবাবুকে আরো তীব্র তীক্ষ্ণ ভাষায় আক্রমণ করেছেন, পাগল ইত্যাদি আখ্যা দিয়েছেন। অবশেষে রবীন্দ্রনাথের শরৎ সম্পর্কিত একটি কোটেশন দিয়ে পত্রটি শেষ করেছেন।

বাদানুবাদ এখানেই থেমে থাকলো না। পরবর্তী ২৭ সংখ্যায় অর্থাৎ ১৩৪৪ বঙ্গাব্দের ২৪ আষাঢ় সংখ্যায় মোহজিৎ মুখোপাধ্যায়, গোপাল ভৌমিক এবং অমরেন্দ্রনাথ দত্ত-র পরপর তিনটি চিঠি প্রকাশিত হলো। এই চিঠিগুলি অবশ্য সুধীরবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিঠির মতো দীর্ঘ নয়। মোহজিৎ মুখোপাধ্যায়ের চিঠির ক্যাপশন ছিল :

শরৎ সাহিত্যের বিরুদ্ধে অভিযান

শ্রীকান্ত ছোট, * সত্য পথের সন্ধানী।
শ্রীকান্ত কাপুরুষ *

মোহজিৎ মুখোপাধ্যায়ের এই চিঠিটিও আক্রমণাত্মক কিন্তু স্যাটায়ারে ভরা। পত্রের এক জায়গায় আছে :

...একটা কথা প্রবোধবাবু খুব সম্ভবত ভুল করে ফেলেছেন যে তিনি একজন পাঠকমাত্রও নন। যেমন সব বই সকলের পক্ষে উপযোগী নয়। ধরুন যদি ‘বেদান্ত দর্শন’ নিয়ে একজন বিড়িঅলা খুব মন দিয়ে পড়তে বসে, তাহলে এর ফলে হবে কি না সে বিষয় চেষ্টায়ে আলোচনা করতে শুরু করবে—‘সংস্কৃত dead language—বেদান্ততে যা’ কিছু ছিল সে সব তখনকার দিনের, এখন মশাই যদি পুরুত হোতে চান, তো পড়ুন কোনও

আপত্তি নেই... তা না হোলে ও কতকগুলো রাবিশ স্তূপ।’ ইত্যাকার গালাগালি দিয়ে তিনি বলতে শুরু করলেন ‘প্রবোধবাবুর প্রবন্ধের (?) আলোচনা থেকে বিরত থেকে আমি তার যুক্তির ধারার অভিব্যক্তিটা বুঝিয়ে দিতে চাই।’

অতঃপর তিনি প্রবোধবাবুর মন্তব্য ‘যেহেতু কোনোকালে লেখাপড়া শিখিনি’ এবং ‘প্রতিভা চলে ভাঙনের পথ ধরে’-এর সমালোচনা করেছেন। দ্বিতীয় মন্তব্যটির সমালোচনা করতে গিয়ে বলেছেন প্রবোধবাবুর কথা মানতে গেলে বলতে হবে বার্নার্ড শ, মিলটন বা শেক্সপীয়রের কোনো প্রতিভা ছিল না, কেননা এঁরা যথাক্রমে বারগসান, বাটলার, বাইবেল থেকে ধার করেছেন এবং শেক্সপীয়র সাধারণ মানুষের মনস্তত্ত্ব নিয়ে কারবার করেছেন।

এই সংখ্যাতেই গোপাল ভৌমিকের পত্রখানের ক্যাপসন দেওয়া হয়েছে :

শরৎ প্রতিভা বনাম প্রবোধ প্রতিভা সমালোচক প্রবোধ সান্যাল!

ক্যাপশনটি যথাযথ হয়েছে কী না সে প্রসঙ্গে প্রশ্ন উঠতে পারে। কারণ, প্রবোধকুমার সান্যালের ‘শ্রীহর্ষ’ পত্রিকায় প্রকাশিত বিতর্কিত পত্রটিতে কোথাও শরৎচন্দ্র এবং প্রবোধকুমারের সাহিত্যের তুলনামূলক আলোচনা নেই, সুধীরবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্রও এই দুই সাহিত্যিকের তুলনা দেওয়া হয়নি। প্রবোধবাবুর যুক্তিগুলি খণ্ডন করার চেষ্টা করা হয়েছে মাত্র। গোপাল ভৌমিক লিখেছেন—

খেয়ালীতে যখন এ-বিষয় নিয়ে আলোচনা উঠছে, তখন দু-একটা কথা না বলে স্থির থাকতে পারলুম না। সুধীরবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর প্রতিবাদপত্রে যেসব কথা লিখেছেন, তা সবই সত্য। প্রবোধ সান্যালের আলোচ্য প্রবন্ধটি পড়লেই বোঝা যায় যে লেখাটি নেহাৎ উদ্দেশ্যমূলক। স্পষ্ট বোঝা যায় যে শরৎচন্দ্রকে নিন্দা করার উদ্দেশ্যেই প্রবোধকুমার কোমর বেঁধে আসরে নেমেছেন।

গোপালবাবু প্রবোধ সান্যালের যুক্তিগুলিকে ‘নগ্ন’, ‘নির্লজ্জ’ ও ‘অভদ্র’ উক্তি বলেছেন। প্রসঙ্গত তিনি বুদ্ধদেব বসুর শরৎ সমালোচনার উল্লেখ করেছেন এবং তাঁর পত্র লিখেছেন যে—

‘সচিত্র সাপ্তাহিক সোম’এ বুদ্ধদেব বসু শরৎচন্দ্রের উনিশ এডিশনি বইএর উল্লেখ করে বিদ্রূপ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর লেখায় তবু একটা ভদ্রতার আবার ছিল কিন্তু ‘শরৎ ভক্ত’ প্রবোধ সান্যাল নির্লজ্জতায় তাঁকে যে ছাড়িয়ে গেলেন।

স্পষ্টত বোঝা যাচ্ছে যিনিই শরৎচন্দ্রের সমালোচনা করবেন, পত্রলেখকের মতে তিনিই নির্লজ্জ। তা তিনি প্রবোধ সান্যালই হোন, বা বুদ্ধদেব বসু-ই হোন। কিন্তু পত্রলেখক নিজে প্রবোধ সান্যালকে ‘কচি খোকা’, ‘বৃহৎ খোকা’ বলতে ইতস্তত করেননি।

তিনি আরও বলেছেন—

প্রবোধ সান্যালের প্রবন্ধটি যে ‘শরৎসাহিত্যের সমালোচনা মোটেই হয়নি, সে কথাটা বলেই আমি শেষ করবো।

কেন হয়নি, সে সম্পর্কে উল্লেখ নেই, কেবল সুবোধ সেনগুপ্ত-র বই পড়তে উপদেশ দেওয়া আছে। প্রবোধবাবুর লেখায় কোন কোন শব্দ বা শব্দবন্ধ বা বাক্য অভদ্র ও নির্লজ্জ তারও উদাহরণ নেই।

এই সংখ্যাতে প্রকাশিত অমরেন্দ্রনাথ দত্ত-র চিঠিটির সুর অন্যান্য চিঠিগুলি এমনকি প্রবোধ সান্যালের চিঠিটি থেকেও স্বতন্ত্র। সাধুভাষায় রচিত এই চিঠিটিতে তিনি যে যুক্তিগুলি উত্থাপন করেছেন তা প্রণিধানযোগ্য। তাঁর চিঠিটির ক্যাপসন দেওয়া হয়েছে :

বচনবাগীশ শ্রীকান্তের বিশ্লেষণ

প্রবোধবাবু শরৎসাহিত্য সম্পর্কে যে অভিযোগগুলি করেছেন, সে সম্পর্কে অমরেন্দ্রনাথ দত্ত-র অভিমতের অংশবিশেষ তুলে ধরা হচ্ছে :

১. প্রবোধবাবুর অভিযোগ সত্য। প্রতিভার দাবী শরৎচন্দ্র করিতে পারেন না। তাঁহার আছে talents; কিন্তু এ দু'য়ে বিস্তার তফাত। ঘসিয়া মাজিয়া প্রতিভা হয় না। রবীন্দ্রনাথ প্রতিভা, ও সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন উঠিবে না।

২. সাতিহ্যক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের খ্যাতিলাভের পর ইহাতে আজ পর্যন্ত বহু সাহিত্যিক ও রসিকজন সাময়িক পত্রাদিতে তাঁহার রচনা সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। প্রায় সকলেই একমত যে তাঁহার রচনা মনন প্রধান। লেখক হিসাবে তিনি যে আগাগোড়া Sentimental একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না।... জ্ঞানের দীপ্তি, চিন্তাশীলতা বা Intellectuality এসবের বাল্যই তাঁহার রচিত সাহিত্যে নাই।...

৩. যৌনজীবনের বিশ্লেষণকে (?) সাহিত্যধর্ম বলা হইয়াছে এ অভিযোগের তেমন কোনো হেতু নাই।... ‘চরিত্রহীন’ ও ‘শেষ প্রশ্ন’ ছাড়া আর কোথাও যৌন আকর্ষণের স্বরূপ তেমন বড় হইয়া চোখে পড়ে না।... শরৎ সাহিত্যে বাস্তবিকই সত্যিকার পুরুষ চরিত্রের অভাব পরিলক্ষিত হয়। কেবলমাত্র সুরেশ ও রমেশকেই তবু বীর্যবান পুরুষ হিসেবে দেখা যাইতে পারে।... (এস্থলে অবশ্য ‘পথের দাবী’কে বাদ দেওয়া হইতেছে)। নারীচরিত্র সৃষ্টিতে অস্বাভাবিকতা কোথাও নাই। এদের সকলকেই আমরা জানি ও চিনি। Abnormal শুধু কমল চরিত্র।

৪. শরৎসাহিত্য নাকি প্রাণহীন, হৃদয়হীন! এই উক্তি হাস্যকর। প্রাণ ও হৃদয় আছে বলিয়াই এই সাহিত্য সারা বাংলার মন আকৃষ্ট করিয়াছে।...

৫. প্রবোধবাবু সঠিকভাবেই বলিয়াছেন বাংলার বাইরে শরৎ সাহিত্যের সমাদর কখনো হইবে না।... শ্রীকান্ত সম্বন্ধে প্রবোধবাবু যে উক্তি করিয়াছেন, আপাতদৃষ্টিতে তাহাতে চমকাইয়া উঠিবার কথা। কিন্তু একবার ভাবিয়া দেখিবেন ইত্যাকার অলস ও বিফল জীবনের চরিত্র আঁকিবার সার্থকতা কোথায়?... প্রথম পর্ব শরৎচন্দ্রের অপূর্ব সৃষ্টি বটে, দ্বিতীয় পর্ব সহ্য করা চলে, কিন্তু তৃতীয় ও চতুর্থ পর্ব অচল। অতটা জের টানা উচিত হয় নাই।... তবু দোষে গুণে শরৎচন্দ্রের রচনা বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে মস্ত বড় একটা অংশ জুড়িয়া আছে, উহা বাদ দিলে বাংলা সাহিত্য কাণা হইয়া যায়।

এযাবৎ যে পত্রগুলি পাওয়া গেল তার মধ্যে এই পত্রটিই শিষ্ট ও মার্জিত। শরৎবাবুর প্রতি অন্ধ সমর্থন ও প্রবোধবাবুর প্রতি অন্ধবিরোধিতা নাই। আবার প্রবোধবাবুকে সম্পূর্ণ সমর্থন করে শরৎবাবুর প্রতি অন্ধবিদ্বেষও পরিস্ফুট হয়নি।

‘খোয়ালী’-র পরের সংখ্যা ৩১শে আষাঢ় ১৩৪৪-এ প্রকাশিত হয়। এটি সপ্তম বর্ষের ২৮তম সংখ্যা। এই সংখ্যাতাই প্রদাঘ বর্মণ, অমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায় প্রমোদকুমার বসু ও কাজী আনিসুর রহমান এই চারজন পত্রলেখকের পত্র প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম চিঠিটির ক্যাপসন :

সাহিত্যিকের মর্ত্তমান সালুনা—শরৎচন্দ্র!

স্তব্ধ লেখনী * মাইকেলের বিরুদ্ধে
শরৎচন্দ্র! * বিবোধদ্বার

এই চিঠিটি শুরু হয়েছে এইভাবে—

‘শ্রীহর্ষ’ নামক কাগজে শরৎসাহিত্য সম্বন্ধে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধের ‘খোয়ালী’র প্রদত্ত বিশ্লেষণ দেখলুম ‘অপূর্ব’। অপূর্ব এবং অভূতপূর্বও বটে। লিখেছেন জনৈক প্রবোধ সাম্যাল—মানে, যিনি সত্যি ‘ভালো লেখক নন’ এবং লেখক কিনা সন্দেহ লাগে।

প্রথমেই তাঁর আক্রমণ এবং কেন তিনি ভালো লেখক নন, কেন তাঁর রচনা রাবিশের স্তূপ, এ সম্বন্ধে তিনি কোনো যুক্তির অবতারণা না করে ‘শনিবারের চিঠি’র সম্পাদক সজনীকান্ত দাসকে একহাত নিয়ে তিনি প্রবোধ সাম্যালের Outburst-এর কারণ হিসেবে বলেছেন—

‘মহাপ্রস্থানের পথে’ নামে একখানি বই যার বর্ণনা বদ্রিনাথের পথের সঙ্গে মেলেনি, একথা ‘অবতার’-এ (হোক ছোটো কাগজ) সপ্তাহের পর সপ্তাহ থেকে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছিলেন এ পথের পথিক এক উকীল ভদ্রলোক। তবু এ বইখানা যা একটু চলল—তারপর অন্য বইগুলোর কোনোখানাই বাংলাদেশের লোক নিলে না, চিনলে না, সংস্করণে সাহায্য করলে না। এদিকে লেখকের যৌবন গেছে (সে বয়স পার হয়ে এসেছে) প্রৌঢ়ত্ব যায়—জয়ন্তী বহুদূর বাড়ি গাড়ির আশা নাই—কি করা যায়—দাও শরৎচন্দ্রকে ন ভূতো ন ভবিষ্যতি গালাগালি—গান্ধী জহরলাল সম্বন্ধে বিপদ আছে, ভাইসরয়-আনন্দবাজারকে ভয় আছে, নিরীহ শরৎচন্দ্র রোগে কাতর, বিশ্রামে উন্মুখ, স্তব্ধ লেখনী, কর তাঁকে কটুষ্কি—এ লোকটাই যশের পথে কণ্টক, চাঁদ ডুবে গেলে জেনাকীরা ভালোভাবেই জ্বলবে, লোক অনুতাপে গলবে! এর চেয়ে কেঁদে বলা ভালো ছিলো—ওগো গোপালঠাকুরের দল, তোমরা শালুক চিনলে না।

পরবর্তী প্যারাগুলিতে শরৎচন্দ্র প্রশস্তি করে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের তুলনামূলক সর্বজনগ্রাহ্যতা সম্পর্কে আলোচনা করে শ্রীকান্ত সম্পর্কে বলেন যে শরৎচন্দ্রের কৃতিত্ব সেইখানে যেখানে—

‘একটা ভবঘুরে লোফারকে তিনি রূপসম্পদশালিনী বাজারে মেয়ের কাছে পৃথিবীর লোভনীয়তম করে তুললেন এবং বলে গেলেন অনুভূতি!

...কিংবা শরৎচন্দ্র has been paid in his own coins—সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে তিনি কটু কথা বলেছেন। আর একবার মহাকবি মাইকেল সম্বন্ধে বিবোধদ্বার করেছিলেন, তখন ‘খোয়ালী’তেই প্রভাতকিরণ বসু (মানে আরেকজন লেখক যিনি Publicity খোঁজেন) তাঁকে সমঝে দেবার দৃষ্টান্ত করেছিলেন।’

মন্তব্য নিম্নপ্রয়োজন।

পরের চিঠিটি শ্রীঅমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের। চিঠিটির প্রতিটি লাইনে শ্রীযুক্ত গঙ্গোপাধ্যায়ের জ্ঞানের দীপ্তি প্রোজ্জ্বল হয়েছে। পড়বার মতো চিঠি। খোয়ালী-সম্পাদক শিরোনামে বাছল্য প্রদর্শন করেননি। ক্যাপসন আছে—‘শরৎসাহিত্যে জ্ঞানের দীপ্তি নাই!’ চিঠিটির কিছুটা অংশ উদ্ধৃত করলেই এর গতিপ্রকৃতি এবং পত্রলেখকের মানসিকতা বোঝা যাবে।

Lytton Strachey তাঁর বিখ্যাত বই ‘Eminent Victorians’ এর ভূমিকায় বলেছেন : ‘The history of the Victorian Age will never be written: we know too much about it.’ সাহিত্যের বিচারেও এই detachment-এর প্রয়োজনীয়তা আছে। যে সমালোচকেরা এই দুর্লভ গুণটির অধিকারী নন, তাঁরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে হয় উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে থাকেন—না হলে করেন যুক্তিহীন নিন্দা। Balanced criticism বাংলা সাহিত্যে এখনো আরম্ভই হয়নি। সম্প্রতি প্রবোধকুমার শরৎসাহিত্যের revaluation করতে গিয়ে যে কাণ্ডটা করে বসেছেন, তা-ই দেখেই এসব কথা মনে হচ্ছে।...

কিছুদিন পূর্বে ‘সোম’ নামক এক নতুন সাপ্তাহিক পত্রিকায় বুদ্ধদেব বসু শরৎ সাহিত্যের প্রশংসা করে দেখিয়েছিলেন যে, তাঁর (শরৎচন্দ্রের) সাহিত্য এ পর্যন্ত যতো প্রশংসা পেয়েছে—তার যোগ্য নয়; অর্থাৎ তাঁকে নিয়ে দেশের সাধারণ পাঠকেরা একটু হেঁচকি করেছে বেশি। মোটের উপর বুদ্ধদেব বসুর সেই প্রবন্ধটি আমার খারাপ লাগেনি তেমন। কারণ, তার রচনায় ছিল না উচ্ছ্বাস এবং বিদ্বেষ। তাঁর এ মত সকলকে মেনে নিতে হবে তারও কোনো মানে নাই। শরৎচন্দ্রের গোড়া ভক্তরা এতে ক্ষেপে যেতে পারেন, কিন্তু স্বীয় অভিমত অকপটে ব্যক্ত করার অধিকার বুদ্ধদেব বসুর নিশ্চয়ই আছে—কিন্তু প্রবোধকুমার এ একই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে আমাদের যার-পর-নাই নিরাশ করেছেন।... রচনাটিতে

আদৌ নেই শৃঙ্খলা, অত্যন্ত Slipshod এবং সেই কারণেই লেখাটি হয়েছে Otiose.

এরপর তিনি প্রবোধকুমারের যুক্তিগুলি মার্জিত ভাষায় খণ্ডন করেছেন। ‘স্ত্রী পুরুষের যৌন জীবনকে বিশ্লেষণ করাই শরৎচন্দ্রের সাহিত্যধর্ম’—প্রবোধকুমারের এই মতকে তিনি অস্বীকার করেছেন। তাঁর এ ধরনের মন্তব্যকে পত্রলেখক প্রলাপোক্তি বলে ধরে নিয়েছেন। বলেছেন এ এক ধরনের যুক্তিহীন ও deliberate মিথ্যাভাষণ। শরৎচন্দ্রের পুরুষচরিত্র নির্মাণ সম্পর্কে প্রবোধকুমার যে উক্তি করেছেন তা হলো ‘পণ্ডিতমশাই’-এর বৃন্দাবন, ‘গৃহদাহ’-এর মহিম, ‘পথনির্দেশ’-এর গুণী, ‘শেষ প্রশ্ন’-এর রাজেন এবং ‘বিপ্রদাস’-এর বিপ্রদাস পুরুষোচিত মর্যাদায় ও দার্ঢ্যে ভাস্বর। ‘শনিবারের চিঠি’ শরৎচন্দ্রের নিষ্ঠুর সমালোচনা করতে কোনো কার্পণ্য করেনি, তাঁরাও তাঁর যোগ্য মর্যাদা দিয়েছেন। নারীচরিত্র সৃজনে শরৎচন্দ্র সম্পর্কে শ্রীযুক্ত গঙ্গোপাধ্যায়ের বক্তব্য হলো তিনি Son of Man-এর পরিবর্তে Daughter of Women সৃষ্টি করেছেন।

শ্রীঅমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পূর্ণ চিঠিটি উদ্ধৃত করতে পারলে তা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা সাহিত্যের ছাত্রছাত্রীদের উপকারে লাগতো।

প্রমোদকুমার বসু ওই একই সংখ্যাতে একটি দীর্ঘ পত্র লিখেছেন, পত্রটির ক্যাপসন হলো :

নষ্টচন্দ্র দর্শনের দোষ শাস্তি।

এই চিঠিতেও নতুনত্ব কিছু নেই, যা অমিয়বাবু এবং অমরেন্দ্রনাথ দত্তর চিঠিতে পাওয়া যায় না। প্রমোদকুমার বসু তাঁর চিঠিতে নিজেকে নিরাসক্ত রাখতে পারেননি। অন্ধ শরৎভক্তি এবং প্রবোধ-বিরোধিতায় চিঠিটিতে যুক্তি খুব একটা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তিনি প্রবোধকুমার সান্যালকে ‘বাঙালী জাতির একজন হেড মাস্টার’ বলে ব্যঙ্গ করে তাঁর চিঠি শুরু করেছেন। পত্রটি সাধুভাষায় লিখিত। লিখেছেন—

প্রবোধবাবুর বিদ্যার দৌড় যে কতদূর জানি না, তবে তাঁহার গত যত্ন জ্ঞান যে বড় বেশী আছে মনে হইল না। তিনি লিখিয়াছেন “মাইকেল-বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ প্রতিভা। প্রতিভা শব্দটা যে স্ত্রীলিঙ্গ, কোনো মতে পুং হইতে রাজী নয়, ইহা বোধ হয় তাঁহার জানা নাই।”

এইভাবে তিনি প্রবোধবাবুর লেখার-ব্যাকরণগত ত্রুটিগুলি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। অন্যত্র তিনি লিখেছেন—

...Give yourself out as a prophet and there are fools enough in the world to believe in you. এই মহাবাক্য শ্রবণ করিয়া শরৎচন্দ্রকে গালি দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, নতুবা রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যের পর সাহিত্য যশঃপ্রার্থীর এত দুঃসাহস হইল কেন?

পত্রলেখক যথেষ্ট পড়াশোনা করে চিঠিটি লিখেছেন সন্দেহ নেই। একেবারে যে যুক্তিহীন আবেগসর্বস্ব লেখা তাও বলা চলে না।

একই সংখ্যাতে কাজী আনিসুর রহমান একখানি পত্র লিখেছেন প্রবোধকুমার সান্যালকে আক্রমণ করে। এই চিঠিটির ক্যাপসন দেওয়া হয়েছে :

সাহিত্যের বাজারে এক উৎকট মহামারী

তিনি প্রশ্ন করেছেন,

প্রবোধ সান্যালের এটা কি কোনো ব্যক্তিগত আক্রোশের ফল—মস্তিষ্ক বিকৃতির পরিণতি, না দেশবাসীর নিকট এক

অভিনব প্রক্রিয়ায় নাম কিনবার প্রচেষ্টা মাত্র?... আমাদের মনোরাজ্যে এক অদ্ভুত জাতিভেদ দেখা দিয়েছে। সাহিত্যের বাজারে এক উৎকট মহামারী উপস্থিত হয়ে যা কিছু ভাল ও স্বাস্থ্যবান সমস্তই মরণতৃপে পরিণত করেছে।

এই পত্রটিতে প্রবোধবাবুর ‘দুই আর দুই চার’ গ্রন্থটি থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে দেখিয়েছেন যে, যে প্রবোধবাবু স্বয়ং নরনারীর যৌন বিশ্লেষণে ছাত্রী ও শিক্ষকের সীমারেখা মানেননি, তিনি কী করে শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের নরনারীর জীবনে যৌনতার গন্ধ পান?

প্রবোধকুমার সান্যাল যে শক্তিশালী লেখক সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। সারা বিশ্ব ভ্রমণ করে তিনি প্রভূত অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। তাঁর লেখা ‘রাশিয়ার ডায়েরী’ গ্রন্থটিও অনেকের ভালো লাগবে। তাঁর ‘হাসুবানু’ একটি অনবদ্য সৃষ্টি। পত্রলেখকরা যেভাবে তাঁকে তুচ্ছতাচ্ছল্য করেছেন তা অনভিপ্রেত। কিন্তু তিনিও শরৎচন্দ্রকে যেভাবে আক্রমণ করেছেন, তা রুচিবিরজিত ও তাঁর মতো বিদ্বৎ লেখকের কাছে অপ্রত্যাশিত। তবে, তাঁর পত্রের প্রতিবাদে বা সমর্থনে যেসব পত্রগুলি প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলি পাঠ করলে বোঝা যায় যে ১৯৩৭ সালেও ‘খেয়ালী’ একটি আধুনিক পত্রিকায় পরিণত হয়েছিল। আজকের যুগে অনেক পত্রলেখক যেমন গভীরভাবে অধ্যয়ন না করেই নিজের মতামত জাহির করেন, ‘খেয়ালী’তে দেখা গেল যে পত্রলেখকগণ দস্তুরমতো পড়াশুনা করে প্রস্তুত হয়ে বিতর্কে অংশগ্রহণ করেছেন। এই প্রবন্ধ থেকে এ-যুগের পাঠকেরা জানতে পারবেন সেযুগের সমালোচনার ধারা কেমন ছিল, জানতে পারবেন, বাংলা গদ্য আজকের থেকে খুব পিছনে ছিল না, যদিও কোনো কোনো লেখক মাত্রাতিরিক্ত ইংরেজি শব্দ ও ইংরেজি কোটেশন ব্যবহার করতেন।

বি.এ. অনার্স পরীক্ষায় আমাদের প্রশ্ন এসেছিল : ‘দেনাপাওনা-র অলকা শরৎচন্দ্রের বিভিন্ন উপন্যাসে বিভিন্ন নামে বর্তমান’—আলোচনা কর।’ প্রশ্নটির উত্তর দিয়েছিলাম এইভাবে : শরৎচন্দ্রের নায়িকাদের নাম সব জগজ্জননীর নামাঙ্কিত—ভবানী, সিদ্ধেশ্বরী, বিন্দুবাসিনী, পার্বতী, শৈলজা, অন্নদা, মেরী, অলকা, হৈমবতী, এমনকি ছোটোগল্লের ছোটোপ্রাণ অমিনাও হজরতের জননী। শরৎচন্দ্রের নায়িকারা তাই সকলেই মাতৃকা, কন্যাকা স্বভাবের। নারীরা যেমন পুরুষের আশ্রয় গ্রহণ করে, মাতৃকা স্বভাবের নারীদের কাছে, পুরুষ তেমনি ‘জননীর কোলে শিশু লভয়ে যেমতি বিরাম’ তেমনি দু-দণ্ড শাস্তি পায়, যেমন হাজার বছর পথ হেঁটে কবি শাস্তি পেয়েছিলেন, পাখি যেমন নীড়ে ফিরে এসে শাস্তি পায়, তেমনি বনলতা সেনের পাখির নীড়ের মতো চোখদুটিতে।’ পুরুষদের হেয় করার জন্য নয়, নারীর মাতৃকাভাবকে পরিস্ফুট করার জন্যই শরৎচন্দ্রের নারীচরিত্রগুলির সৃষ্টি। পত্রলেখক অমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়ও সেই একই কথা বলেছেন : “নারীর চরিত্রায়ণে তাঁর variety নেই। তাই দু-তিনটি নারীচরিত্র ঘুরে ফিরে নানা বেশে বিভিন্ন বইয়ের ভেতর দিয়ে আমাদের কাছে এসে উপস্থিত হয়।”

পরিশেষে বলি যে শরৎ সাহিত্যের সমালোচনা করলেই শরৎবিদ্বেষী হয় না, তবে সমালোচনায় চাই detachment, যা অনেকের নেই। আমাদের এম.এ. পরীক্ষায় প্রশ্ন এসেছিল ‘শরৎচন্দ্র সমাজসমস্যামূলক কাহিনী রচনা করলেও সমাজের গভীরে প্রবেশ করতে পারেননি’—আলোচনা কর। আমি বক্তব্যের সমর্থনে উত্তর দিয়েছিলাম এবং ওই পেপারে ভালোই নম্বর পেয়েছিলাম। তবে detached থাকা সহজ নয়, অনেকেরই পারেননি, মোহিতলালের মতো সমালোচকও পারেননি।

রবীন্দ্রনাটকে নারীর স্বাতন্ত্র্যবোধ ও প্রতিবাদ

পরিমল ঘোষ

লেখক বা শিল্পীর মানস-গঠনে ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতা ও পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব লক্ষ করা যায়। রবীন্দ্রনাথের জীবনের বিভিন্ন সময়ে বিশেষ বিশেষ নারীর সংস্পর্শ বা সাহচর্য ঘটেছে, রবীন্দ্র-মানসে নারীচেতনা-গঠনে তা সহায়ক হয়েছে বলে মনে করা যায়। সমাজের নানা পারিপার্শ্বিকতা লেখক-শিল্পীদের মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। কখনও কখনও দেশজ ঐতিহ্যসূত্রে প্রচলিত কিছু প্রথা বা সংস্কারও লেখক-শিল্পীদের প্রভাবিত করে থাকে। বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথও তার ব্যতিক্রম নন। এভাবে প্রাথমিকভাবে তাঁর মানসিকতা গড়ে উঠেছে এবং নানা প্রসঙ্গে তিনি নারী সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তাঁর অভিমতের কিয়দংশ হল, প্রকৃতির ব্যবস্থায় নারীরা ‘একটা পাকা জায়গা পেয়েছে’, পুরুষরা সেটা পায়নি। নারীর প্রকৃতস্থান ঘরে, সেখানে সে ‘কল্যাণী’ ও ‘স্ত্রী’। নারী-প্রকৃতির মধ্যে রয়েছে ‘স্থিতি’। সে ‘জীবধাত্রী’ ও ‘জীবপালয়িত্রী’।

সময়ের চলমানতার সঙ্গে রবীন্দ্র-মানসিকতার বিবর্তন ঘটেছে এবং তা খুবই স্বাভাবিক। রবীন্দ্র-মানসে নারী-চেতনা গঠনে বিশেষ ভূমিকা হিসাবে আমরা উল্লেখ করতে পারি—উনিশ শতকের নবজাগরণের জীবন-রাগ, ব্যক্তিজীবনে বিচিত্র নারী-সাহচর্য এবং বিশ শতকে স্বদেশি আন্দোলনে নারীদের অংশগ্রহণের চামুচ অভিজ্ঞতা। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন অসামান্য প্রতিভাবান শিল্পী। পর্যায়ক্রমে তাঁর মনে নারীচেতনা একটি বিশিষ্ট রূপ লাভ করেছে।

রবীন্দ্রনাথ মানবদরদী লেখক। তিনি দেখেছেন, সমাজে নারীদের ওপর বয়ে চলেছে অন্যায়-অবিচার, শোষণ-শাসন ও লাঞ্ছনা-গঞ্জনা। এই সমাজে নারীর জীবনে কোনো স্বপ্ন নেই, আশা-আকাঙ্ক্ষার কোনও মূল্য নেই। সমাজে নারীদের চারপাশে রয়েছে নানা বাধার প্রাচীর। সামাজিক কুসংস্কার, অনাচার, অজ্ঞতা ও পুরুষ প্রাধান্যের প্রভাব নারীকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। কিন্তু নারীকে এভাবে পেছনে ফেলে রেখে সমাজের সার্বিক উন্নতি কখনও সম্ভব হতে পারে না। লেখক নারীদের প্রতি সহমর্মিতাহেতু নারী-জাগরণ তথা নারী-স্বাধিকারের পক্ষে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

সামাজিক বিপন্নতার বিরুদ্ধে নারীমনের প্রতিবাদ ও তার মুক্তির প্রয়াস রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন রচনায় প্রকাশ পেয়েছে। এই সব কথা মন রেখে এবার আমরা রবীন্দ্রনাটকে উল্লেখযোগ্য নারীচরিত্রের স্বাতন্ত্র্যবোধ তথা প্রতিবাদী চেতনার স্বরূপ আলোচনায় প্রয়াসী হব।

‘রাজা ও রানী’ নাটকে জালন্ধরের রানী সুমিত্রা একটি বিশিষ্ট চরিত্র। তিনি দয়াবতী, কর্তব্যপরায়ণা ও মহীয়সী রানি হিসেবে নিজেকে প্রতিপন্ন করেছেন। জালন্ধরের রাজা বিক্রমদেব পত্নীপ্রেমে আসক্ত হয়ে রাজকর্মে অবহেলা করতে থাকেন। এই সুযোগে রাজার রাজন্যবর্গ ও বিদেশি আত্মীয়-স্বজন স্বৈচ্ছাচারী হয়ে উঠেছে এবং

রাজ্য জুড়ে উপদ্রব শুরু করে দিয়েছে। কিন্তু রানী সুমিত্রা রাজ্যের এই দুর্যোগে নীরব দর্শক হয়ে থাকতে পারেননি। তাঁর বিবেকী-মন প্রতিবাদ করে উঠেছে। রাজা বিক্রমদেবকে রাজকর্মে উদ্বুদ্ধ করার বিশেষ চেষ্টা করেও তিনি ব্যর্থ হয়ে পড়েছেন।

এদিকে রাজ্যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। প্রজারা ক্ষুধায় কাতর হয়ে বিপন্ন হয়ে পড়েছে। রাজ-অমাত্যবর্গ সেদিকে সম্পূর্ণ উদাসীন। চেষ্টা করেও বিক্রমদেবের দৃষ্টি সেদিকে ফেরানো গেল না। তখন প্রজাদের দুঃখ ও বেদনা মর্ম দিয়ে অনুভব করে রানী সুমিত্রা তাদের সাহায্য দিয়ে বলেছেন—

ওরে বৎস, মাতৃহীন
নোস তোরা কেহ, আমি আছি—আমি আছি—
আমি এ রাজ্যের রানী, জননী তোদের।

স্বাতন্ত্র্যবোধে উদ্বুদ্ধ এক নারীকে এখানে সহজেই চিনে নেওয়া যায়। প্রজাদের রক্ষা করার জন্য রানী সুমিত্রা শেষবারের মতো রাজাকে অনুরোধ জানালেন। বিক্রমদেব যখন তাতেও সাড়া দিলেন না, তখন অত্যাচারী রাজন্যবর্গকে শাস্তি দেওয়ার জন্য রানী সুমিত্রা নিজেই জায়িত্ব নিলেন এবং রাজার বাল্যসখা ও পরামর্শদাতা দেবদত্তকে আদেশ দিলেন:

সৈন্য লয়ে
যাও অবিলম্বে, রক্তশোষী কীটদের
দলন করিয়া ফেলো চরণের তলে।

ন্যায়পরতা, সাহসিকতা ও প্রতিবাদী ভাবনার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

‘বিসর্জন’ নাটকে রানী গুণবতী একটি উল্লেখযোগ্য নারী চরিত্র। তিনি ত্রিপুরাধিপতি গোবিন্দমাণিক্যের রাজমহিষী। সন্তানলাভের বাসনায় তিনি ত্রিপুরেশ্বরীদেবীর কাছে ছাগবলি দিয়ে পূজা করতে উদ্যোগী হয়েছেন। এদিকে রাজা গোবিন্দমাণিক্যের আদেশে মন্দিরে তথা রাজ্যমধ্যে পশুবলি বন্ধ ঘোষিত হয়েছে। এ নিয়ে রাজা গোবিন্দমাণিক্য ও রাজপুরোহিত রঘুপতির মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে। রানী গুণবতী পূজামন্দির থেকে ফিরে আসায় তিনি অপমানবোধ করেছেন।

গুণবতী রাজাকে অনুরোধ করেছেন, রাজপুরোহিত যেন মন্দিরে তাঁর পূর্ণ অধিকার ফিরে পান। কিন্তু রাজা কর্তৃক তাঁর অনুরোধ উপেক্ষিত হয়েছে। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি নিজের অভিমত প্রকাশ করেছেন—

আর নহে প্রেমখেলা
সোহাগক্রন্দন। বুঝিয়াছি আপনার
স্থান—হয় ধূলিতলে নতশির, নয়
উর্ধ্বফণা ভূজঙ্গিনী আপনার তেজে।

রাজার বিরুদ্ধে তিনি এভাবে সোচ্চার প্রতিবাদ ঘোষণা করেছেন।

রাজাদেশ উপেক্ষা করে গুণবতী মন্দিরে পূজা পাঠালে তা ব্যর্থ হয়ে ফিরে এল। এর পরেও রানী গুণবতী দেবীর পূজার প্রয়াস চালিয়ে রাতে মশালসহ বেরিয়ে পড়লেন এবং শেষপর্যন্ত ব্যর্থ হলেন।

গুণবতীর সজীবতা ও সক্রিয়তা চরিত্রটিকে বিশিষ্টতা দান করেছে। রাজার সঙ্গে নানা বিরোধের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর চরিত্রের প্রতিবাদস্পৃহা ও স্বাধিকারবোধ সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

‘চিত্রাঙ্গদা’ নাটকে চিত্রাঙ্গদা নায়িকা। মণিপুরের এই রাজকন্যা শৈশবকাল থেকে পুরুষের মতো লালিত-পালিত হয়েছে। একদা তরুণী চিত্রাঙ্গদা মুগয়ায় গিয়ে বনমধ্যে ব্রহ্মচর্য সাধনায় রত অর্জুনকে দেখে তাঁর প্রতি তীব্র আকর্ষণ বোধ করল। তার ছদ্ম-পৌরুষের আড়াল থেকে অন্তলীন শাস্ত্র নারীপ্রাণ জেগে উঠল। মোহমুগ্ধ সে পুরুষ বেশ ত্যাগ করে নারী বেশ পরে গেল অর্জুনের কাছে আত্মসমর্পণ করার জন্য। কিন্তু তার লাভাণ্যহীন নারীরূপ অর্জুনের কাছে প্রখ্যাত হল। চিত্রাঙ্গদাও জেদ ধরল অর্জুনকে পাওয়ার জন্য।

রূপহীন চিত্রাঙ্গদা বসন্ত ও মদনের কাছে এক বছরের জন্য অপূর্ব রূপসৌন্দর্যবতী হয়ে থাকার বর লাভ করল। এবার অর্জুন চিত্রাঙ্গদার রূপসৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তার প্রেমে ধরা দিলেন। কিন্তু চিত্রাঙ্গদার প্রেমের উদ্দামতা একইভাবে চলতে পারল না। দান হিসেবে পাওয়া এই ছদ্মরূপাবরণে চিত্রাঙ্গদা এক সময় অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। বহুপ্রার্থিত এই প্রেমে তৃপ্তির মাঝেও তার নিজস্ব রূপ মেলে ধরার জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠল—

এই ছদ্মরূপিণীর চেয়ে
শ্রেষ্ঠ আমি শতগুণে। সেই আপনাকে
করিব প্রকাশ;...

এখানে চিত্রাঙ্গদার মানসিক প্রতিক্রিয়া ও স্বতন্ত্র্যবোধের প্রকাশ উজ্জ্বলভাবে পরিস্ফুট হয়েছে।

ভোগবাসনা প্রাচুর্যে আচ্ছন্ন অর্জুনের মোহ এক সময় স্তিমিত হয়ে এল। তখন তিনি চিত্রাঙ্গদার অন্তরের পরিচয় জানার জন্য ব্যর্থ হয়ে উঠলেন। এদিকে চিত্রাঙ্গদার মধ্যেও প্রকৃত নারীর জাগরণ দেখা দিয়েছে। সাহসে ও দৃঢ়তায় সে নিজের মনের কথা খুলে বলল—

আমি চিত্রাঙ্গদা।
দেবী নহি, নহি আমি সামান্য রমণী।
পূজা করি রাখিবে মাথায়, সেও আমি
নই, অবহেলা করি পুঁথিমা রাখিবে
পিছে, সেও আমি নহি!...
যদি সুখে দুঃখে মোরে কর সহচরী,
আমার পাইবে তবে পরিচয়।

এভাবে অন্তর-বাহির মিলে সমগ্র নারীরূপ নিয়ে চিত্রাঙ্গদা নিজেকে মেলে ধরল। আপন ব্যক্তিত্বে ও প্রতিবাদস্পৃহায় এ চিত্রাঙ্গদা অনন্যা।

‘মালিনী’ নাটকে মালিনী একটি প্রধান নারী-চরিত্র। মালিনী কাশীরাজের কন্যা। বৌদ্ধাচার্য কাশ্যপের উপদেশ শুনে বিশ্বের দুঃখে তার মন করুণায় ভরে উঠেছে। তার মনে এক নবধর্মের জাগরণ ঘটেছে। সে আহ্বান সংগীত শুনতে পেয়েছে—‘জগতে কাহারো আজি ডাকিছে আমাকে!’ সহজ-সরল জীবনচরণে সে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। দুঃখ-কষ্ট-ভরা বিশ্বমাঝে গিয়ে দাঁড়াবার সে অনুপ্রেরণা লাভ করেছে।

মালিনীর নবধর্মের উত্থানে সনাতন আর্থধর্মের প্রবক্তা ব্রাহ্মণগণ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে। ধর্মরক্ষার্থে ব্রাহ্মণগণ মন্দিরপ্রাঙ্গণে মিলিত হয়ে রাজার কাছে মালিনীর নির্বাসন দাবি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এমন সময় সেই শত্রুপক্ষের মাঝে তেজস্বিনী নারীরূপে এসে উপস্থিত হল মালিনী নিজেই। সে অকপটে সকলকে আহ্বান জানিয় বলেছে—

আমারে করেছ নির্বাসিতা?

তাই আজি মোর গৃহ তোমাদের ঘরে।

একথা শুনে ব্রাহ্মণগণ মালিনীকে সাধুবাদ জানিয়েছে। এর পরও রাজগৃহে মালিনী ব্রাহ্মণদের আন্তরিকভাবে বলেছে—

সকলারে এনো ডাকি
সবারে দেখিতে চাহি আমি। হেথা থাকি
রব আমি তোমাদের ঘরে পুরবাসী।

মালিনী এভাবে প্রতিপক্ষকে সহজেই জয় করে নিল। এখানে তার একটি মর্যাদাপূর্ণ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের পরিচয় প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়া ধর্মের বিরোধকে কেন্দ্র করে চলমান অবস্থার বিরুদ্ধে দাঁড়ানোতে মালিনী-চরিত্রে কিছু প্রতিবাদী ভাবনা লক্ষ করা গেছে।

‘রাজা’ নাটকে রানী সুদর্শনা নায়িকা। তার মধ্যে প্রবল রূপতৃষ্ণা বিদ্যমান, রূপের মোহে সে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। রাজার সঙ্গে তার দেখা হয় অন্ধকার ঘরে। তার মনে আকাঙ্ক্ষা জেগেছে—প্রত্যক্ষ আলোর মাঝে হাজার জিনিসের সঙ্গে মিলিয়ে সে রাজাকে দেখবে। এখানে ব্যক্তিত্ববোধের প্রকাশ ঘটেছে। বসন্ত পূর্ণিমা উৎসবে সে সুবর্ণকে ‘রাজা’ বলে ভুল করেছে, তাকে ফুল পাঠিয়েছে এবং তার দেওয়া হার সে গলায় পরেছে। রাজপ্রাসাদে আঙুন লাগলে রাজা রানীকে রক্ষা করে নিরাপদ স্থানে নিয়ে গেছেন। সে সময় রাজার রূপ (কুরূপ) দেখে সুদর্শনার অভিব্যক্তি—

ভয়ানক, সে ভয়ানক। সে আমার স্মরণ করতেও ভয় হয়।
কালো, কালো, তুমি কালো।

সুদর্শনার জীবনে রূপতৃষ্ণাই প্রবল হয়ে উঠেছে। এই রূপ-মোহ তার চরিত্রে একমুখিতা সৃষ্টি করে তাকে অনিষ্টের পথে এগিয়ে নিয়ে গেছে। এখানে তার ব্যক্তিকেন্দ্রিক স্বতন্ত্রতা প্রকাশ পেয়েছে।

পিতৃগৃহে পৌছানোর পরে সুদর্শনার দুঃখের তপস্যা শুরু হয়েছে। তারই জন্য তার পিতৃরাজ্য কান্যকুব্জ বিপন্ন হয়ে পড়েছে। সুবর্ণের ভীকৃতার পরিচয় পেয়ে তার প্রতি সুদর্শনার রূপতৃষ্ণা ও মোহ অপসৃত হয়েছে। জোর করে তৈরি করা স্বয়ংবর সভায় যাবার আগে আত্মকথনে প্রকাশিত হয়েছে তার মানসিক বিপর্যয়ের রূপ। এই আত্মবোধনের মধ্য দিয়ে সুদর্শনার পূর্ব-ধারণার বিরুদ্ধে একটি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। বলা যায় নিজের বিরুদ্ধে নিজের প্রতিবাদ।

এদিকে রাজা তাঁর অমিত পরাক্রম দ্বারা সাত রাজাকে পরাজিত করে কান্যকুব্জ রাজ্য শত্রুমুক্ত করেছেন। কিন্তু রানীর সঙ্গে দেখা না করে তিনি নিজ রাজ্যে ফিরে গেছেন। শেষ পর্যন্ত সকল অভিমান, লজ্জা ও অহংকার ত্যাগ করে রাজার সঙ্গে মিলবার জন্য তাকে পথে নামতে হয়েছে। বিক্ষত হৃদয় নিয়ে রাজার সামনে এসে সে বলেছে—

তোমাকে তেমন করে দেখবার তৃষ্ণা আমার একেবারে ঘুচে
গেছে। তুমি সুন্দর নও প্রভু, সুন্দর নও! তুমি অনুপম।

এভাবে সুদর্শনা দুঃখ-কষ্ট ও যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে নিজের বিরুদ্ধে নিজে প্রতিবাদ করেছে। আত্মমর্যাদা, মহত্ব ও স্বাতন্ত্র্যবোধে তার চরিত্র উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

‘মুক্তধারা’ নাটকে অম্বা একটি উল্লেখযোগ্য নারীচরিত্র। সে হল উত্তরকূটের জনাই গাঁয়ের এক পাগলিনী মা। রাজা রণজিতের প্ররোচনায় উত্তরকূটে মুক্তধারার বাঁধ নির্মাণের কাজে বহু প্রজার দুঃখ-কষ্ট, শ্রম ও জীবনবলির ইতিহাস নিহিত রয়েছে। অম্বার ছেলে সুমনকে এভাবে বাঁধ-নির্মাণের কাজে জোর করে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু সে আর ফিরে আসেনি। পুত্রহারা অম্বা পথে পথে তার হারানো পুত্র সুমনের নাম ধরে ডেকে খুঁজে ফিরেছে।

পথে চলতে চলতে রাজা রণজিতের সঙ্গে অম্বার দেখা হয়েছে। তিনি অম্বাকে জানিয়েছেন যে, সুমনকে খোঁজার দরকার নেই, সময় হয়েছিল তাই ভৈরব তাকে ডেকে নিয়েছেন। সন্তানহারী মা একথা

মেনে নিতে পারেনি। সোচ্চার প্রতিবাদ জানিয়ে সে রাজার কাছে প্রশ্ন তুলে ধরেছে—

ভৈরব কি কেবল ডেকেই নেন? ভৈরব কি কখনো ফিরিয়ে দেন না?

অস্বার করণ আত্নাদের মধ্যে সন্তানহারা এক অসহায় মায়ের বিপন্নতা প্রকাশ পেয়েছে। প্রকারান্তরে প্রচলিত শাসন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তার সংশয় ও প্রতিবাদ তার চরিত্রকে স্বাভাবিক দান করেছে।

‘রক্তকরবী’ নাটকে কেন্দ্রীয় চরিত্র হল নন্দিনী। নন্দিনীর মধ্যে রয়েছে প্রাণপ্রাচুর্য, আনন্দ, সৌন্দর্য ও মাধুর্য। সে রঞ্জন নামে এক দুঃসাহসী বিপ্লবী তরুণের প্রেমে মুগ্ধ। সে তার বৈপ্লবিক আদর্শে উদ্দীপিত। একদিন রঞ্জনের টানে সে যক্ষপুরীতে এসে উপস্থিত হল। তার জীবন আশা-বিশ্বাস ভরা। যক্ষপুরীর জীবনে ছিল শোষণ ও অত্যাচারের রুদ্ধশ্বাস অবস্থা। যক্ষপুরীর চিরন্তন অন্ধকারের মধ্যে নন্দিনী যেন ‘হঠাৎ আলোর ঝলকানি’। বিদ্রোহী রঞ্জন আত্মগোপনকারী। রঞ্জনের বিপ্লবী ভাবনাকে সে যক্ষপুরীর মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার দায়িত্ব বহন করে চলেছে। শোষণ ও অত্যাচার থেকে সে এখানকার মানুষদের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলেছে।

যক্ষপুরীর রাজা হচ্ছে লোভ, শোষণ ও অত্যাচারের প্রতিভূ। রাজার ভয়ে সবাই ভীত-সন্ত্রস্ত। কিন্তু নন্দিনী আদৌ ভীত নয়। সে স্পর্ধিত ভঙ্গিতে রাজার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। নন্দিনী মুক্তির দূতী। নন্দিনীর প্রাণবেগে নিষ্প্রাণ যক্ষপুরীতে জেগেছে প্রাণের সাড়া। জড়তার মধ্যে সে একটা চাঞ্চল্য এনেছে। তারই মাধ্যমে এখানকার শ্রমজীবী মানুষদের মধ্যে নবজাগরণ সৃষ্টি হয়েছে। কিশোর ফাণ্ডলাল-বিশু সবাই নবজীবন মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়েছে। অন্যদিকে সর্দার, মোড়ল, অধ্যাপক ও যক্ষরাজ তাকে দেখে আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হয়ে নন্দিনী রাজার সঙ্গে মোকাবিলা করতে মনস্থ করেছে। রাজা তাকে ভয় দেখালে সে সাহসিকতার সঙ্গে রাজাকে বলেছে—

আমার ভয় ঘুচে গেছে। অমন করে তাড়াতে পারবে না। মরি সেও ভালো, দরজা না খুলিয়ে নড়বে না... বুকের উপর দিয়ে চাকা চলে যাক, নড়বে না।

নন্দিনী চরিত্রের তেজোদীপ্ত রূপটি এখানে দৃষ্টান্তে ফুটে উঠেছে।

যড়যন্ত্র করে রঞ্জনকে ধরা হয়েছে। রাজার ঘরে শায়িত তার মৃতদেহ দেখে নন্দিনী মর্মযন্ত্রণায় হাহাকার করে উঠেছে। তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে সে রাজাকে বলেছে—

আমার সমস্ত শক্তি নিয়ে তোমার সঙ্গে আমার লড়াই।

এদিকে ফাণ্ডলাল দলবল নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে বন্দিশালায় দরজা ভাঙতে।

রঞ্জন নেই, কিন্তু তার সংগ্রামী চেতনার ‘অপরাজিত কণ্ঠস্বর’ চারিদিকে ভেসে চলেছে। রঞ্জনের মৃত্যুতে নন্দিনীই শেষপর্যন্ত বিপ্লবের পতাকা বহন করে ‘শেষ মুক্তি’-তে অগ্রসর হয়ে গেছে। এ নাটকে নন্দিনী চরিত্র যেমন সজীব তেমন বাস্তব। প্রতিবাদ-স্পৃহায় দৃষ্ট তার চরিত্রটি বাস্তববোধে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

‘নটীর পূজা’ নাটকে প্রাচীন আনুষ্ঠানিক হিন্দুধর্মের সঙ্গে নবপ্রবর্তিত বৌদ্ধধর্মের বিরোধের রূপ প্রকাশিত হয়েছে। এ নাটকে শ্রীমতী একটি বিশিষ্ট চরিত্র। সে রাজনটী। অন্তরে সে বুদ্ধের একনিষ্ঠ সেবিকা, কিন্তু বাইরে তার প্রকাশ নেই। বৌদ্ধ-স্থবিরদের নির্দেশে বুদ্ধ-পূর্ণিমায় ভগবান বুদ্ধের অশোকবেদিতে পূজার ভার পড়েছে শ্রীমতীর ওপর। এদিকে বৌদ্ধবিরোধী রাজা অজাতশত্রুর নির্দেশে বুদ্ধদেবের পূজা সেখানে নিষিদ্ধ হয়েছে। কেউ আদেশ অমান্য করলে তার শাস্তি প্রাণদণ্ড নির্দিষ্ট হয়েছে। শ্রীমতী রাজার আদেশ উপেক্ষা করে অর্থ্য সাজিয়ে পূজা দিতে গিয়ে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। হঠাৎ রাজার আদেশ এল, অশোকবেদিতে রাজনটীকে নৃত্য প্রদর্শন করতে হবে, বুদ্ধের পবিত্র আসনে করতে হবে চরণাঘাত। রানী লোকেশ্বরী শ্রীমতীকে পাপ কাজ না করে বিষপান করে আত্মহত্যা করতে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু শ্রীমতী তাতে রাজি হল না।

শ্রীমতী নটীর বহুমূল্য বসনে ও ভূষণে সজ্জিত হল। এবার সে সহজেই বেদিমূলে যাওয়ার অনুমতি পেল। সে বন্দনার ভঙ্গিতে নৃত্য শুরু করল এবং একে একে নটীর বসন-ভূষণ ছুঁড়ে ফেলতে লাগল। শেষে বেরিয়ে পড়ল তার বৌদ্ধ ভিক্ষুণীর কাষায় বস্ত্র। সে বৌদ্ধমন্ত্র উচ্চারণ করতে শুরু করল—বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি...। সঙ্গে সঙ্গে রক্ষণীর অস্ত্রাঘাতে শ্রীমতীর দেহ লুটিয়ে পড়ল, ছুটে গিয়ে লোকেশ্বরী তাকে কোল পেতে গ্রহণ করলেন। তার ভিক্ষুণীর বস্ত্র মাথায় স্পর্শ করে শ্রদ্ধা জানালেন। ক্ষুদ্র ও ব্যক্তিস্বার্থ অবহেলা করে শ্রীমতী মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছে। আনুষ্ঠানিক রাষ্ট্রনৈতিক বাধার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে শ্রীমতী যেভাবে আত্মবিসর্জন করেছে, তাতে তার চরিত্র যেমন মহৎ তেমনি স্বাভাবিকবোধে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাটকে উল্লেখযোগ্য কিছু নারী চরিত্রের আলোচনা করে আমরা তাদের স্বাভাবিকবোধ ও প্রতিবাদী চেতনার পরিচয় পেলাম। এর মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের নারী-চেতনার একটি বিশিষ্ট দিকও আমাদের কাছে প্রতিভাত হয়েছে বলে ধরে নেওয়া যায়।

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

বক্রেস্বর সিমেন্ট

বালানপুর, জামুড়িয়া, বর্ধমান

Sl. No. 165

নতুন চিঠি শারদ ২০১৪ || ২১৯

Happy Pooja Greetings From

M & B TRADERS

**GOVT. ELECTRICAL & INSTUMENTS CONTRACTOR
&
GENERAL ORDER SUPPLIERS**

Govt. Electrical Licence No. 10241

Gopinathpur, Durgapur-713219
Mobile : 9434388056, 9474698366, 9434647573
E-mail : ashokghosh_dgp@rediffmail.com

Sl. No. 174

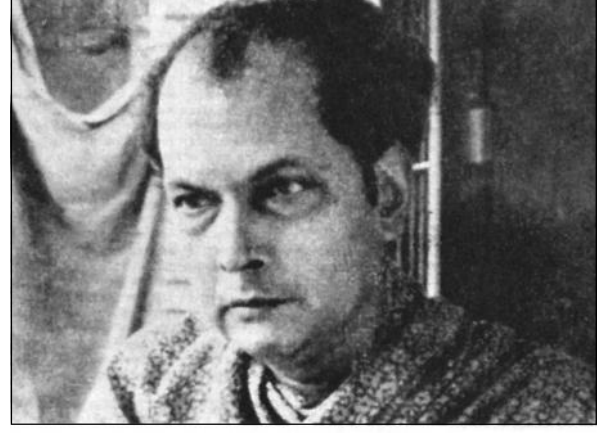
With best compliments of

SUPARNA TRADING

CONTRACTOR & EARTHMOVERS

REGD. OFFICE : 2/18, Derojio Path, SAIL Co-Operative
City Centre, Durgapur-713216, Phone : (0343) 2566021
CITY OFFICE : Urvashi Commercial Centre, 1st Floor, Unit No. 017
Bengal Ambuja Housing Dev. Ltd., City Centre, Durgapur-713216
Mobile : 93337 46254

Sl. No. 175



জীবনানন্দ, সঞ্জয় ভট্টাচার্য ও ‘পূর্বশা’

কার্তিকচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

“বেঁচে থাকাই তো বাঁচা নয়, না করলে বাঁচব না বলেই তো শত প্রতিকূলতা সহ্য করেও পূর্বশা বার করে যাচ্ছি, বেঁচে থাকার সুসম রসায়নে অনেক দুরারোগ্য অনুপান-উপকরণের জোগান চাই, বুঝবে একদিন, বয়েস বাড়লে ঠিকই বুঝবে।” —সঞ্জয় ভট্টাচার্য

একটু হলদেটে মিশানো ফর্সা চেহারা, মাঝারি হাইট, খাড়া নাক, পাতলা মুখাবয়ব, চোখে ভারি চশমা, কপালের ওপর থেকে চুলের সীমানা পিছনের দিকে সরে যাচ্ছে বলে প্রশস্ত ললাট, বলিরেখা-খচিত। সঞ্জয় ভট্টাচার্য তাঁর নন্দন-সন্তান ভূমেন্দ্র গুহর চোখে। প্রথম সাক্ষাৎকার ‘পূর্বশা’ পত্রিকার সম্পাদক কবি ও প্রাবন্ধিক সঞ্জয় ভট্টাচার্যের সঙ্গে ডাক্তারি পড়া ছোকরা ভূমেন্দ্রর সঙ্গে। ভূমেন্দ্র ‘পূর্বশা’-য় একটা কবিতা পাঠিয়েছিলেন। ছাপা হয়েছে। সেই সূত্রেই সাক্ষাৎকার। প্রথম আলাপে ধাক্কা খেতে হয়। বড় টানটান কথা—“ভালো লিখতে গেলে পড়তে হয়। দেশের ইতিহাস পূরণ শাস্ত্র সাহিত্যদর্শন—যতটা সম্ভব ভালো করে পড়ে বিদেশের জ্ঞানগরিমার সঙ্গে পাশে রেখে মিলিয়ে দেখে...।” ছোকরা ডাক্তারি পড়ে শুনে তাঁর কথা—“তা হলে তো ভালো ছেলে, পাশটাশ করে খ্যাতিমান হবে, বড়লোক হবে, অনেক টাকা আয় করবে, কবিতা লিখতে এলে কেন তবে? লিখতেই যদি হয়, গল্পটল্ল লেখার ধান্দা করো—।” উৎসাহিত করার বদলে নিরুৎসাহিত করা। সরলেন না, উল্টে ‘পূর্বশা’-র প্রফ দেখার কাজে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে লেগে গেলেন ভূমেন্দ্র। কচিৎ কখনো নিজের লেখা দেন। তাও সঞ্জয় ভট্টাচার্য বহুবার বলার পর হয়তো দু-একবার। দেখার, বোঝার পরিশ্রমী ও সংবেদনশীল চোখ ও হাত পুষ্ট হতে থাকল ভূমেন্দ্রের। কেমন করে? তাঁর একটি দীর্ঘ কবিতা ছাপা হয়েছিল ‘পূর্বশা’-য়। দাক্ষিণাত্যের এক প্রাচীন রাজমহিষীকে কেন্দ্র করেই সেটি লেখা। সম্পাদক তাঁকে বললেন, “তোমার আমার জীবনযাপনের যে একটা অখণ্ড ও মোটামুটি সর্বজনীন ইতিহাস আছে, তার কোন একটি অধ্যায়ে নারীটির প্রাসঙ্গিকতা কোথাও গুপ্ত হয়ে আছে। তুমি জান

না, তোমার বোধ জানে। তোমার কপালে অনেক দুঃখ লেখা আছে।” ‘নিজেকে জান’—এই কথাটিকে কত সাম্প্রতিক করে বললেন তিনি। বোধের অর্থ সম্ভবত ব্যক্তির ভেতরে তার প্রজাতির তো বটেই, আন্তর্প্রজাতিকে অতিক্রম করেও তার মহাজাগতিক বয়েসে রয়ে গেছে। সেই বয়েসকে ক্রমসূত্রিক উপলব্ধির মাধ্যমে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি ও চলাচলকে নতুন নতুন অভিমুখে খাটিয়ে নেবার চলমান প্রক্রিয়া যার থাকে, তার পক্ষে এই গতানুগতিক সমাজ সংসার মানিয়ে নেওয়া যেমন দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়, সমাজ সংসারও তেমনি তাকে ক্রমবর্ধমান অবাস্তব বলে প্রতিপন্ন করে। হয়তো তাই তিনি ভূমেন্দ্রর কপালে দুঃখ আছে বলেছেন, কারণ তাঁর লেখার ভেতর তিনি তাঁর এই পূর্বাণুচল টান উপলব্ধি করেছেন।

‘পূর্বশা’-র রবিবারের আড্ডা ছিল একটা বড় রকমের মেজাজি ব্যাপার। এসেছেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্তোষকুমার ঘোষ, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, অরুণ ভট্টাচার্য খুব আসতেন। সত্যপ্রিয় ঘোষ, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রমাপদ চৌধুরী, নরেশ গুহ—এঁরাও বেশ আসতেন। এঁদের অনেকেই ‘পূর্বশা’-র নিয়মিত লেখক ছিলেন। ভূমেন্দ্র সঞ্জয় ভট্টাচার্যের সাহিত্য-আলোচনা সম্পর্কে বলছেন, “...অনেক দূরের থেকে আসা দুন্দুভিধ্বনির মতো মনে হত যেন সব, কান খাড়া করে রাখতে হত, আর উনি প্রায় স্বপ্নাদিষ্টের মতো কথা বলতে থাকতেন।” তাঁর কাছেই ভূমেন্দ্র শুনেছেন সার্বে বড় বেশি তাত্ত্বিক, কামুর প্রধানত মানবিকতার মোড়কে তত্ত্ব। জেনেছেন স্টালিনবাদের প্রতিপক্ষে ট্রটস্কিবাদের অনুকূলে তাঁর পক্ষপাতিত্ব গোপন না থাকলেও গান্ধিবাদের দিকে তিনি অনেকটাই সরে গেছেন। এলিয়ট সাহেবের ‘ককটেলের পার্টি’-তে কবির বক্তব্য, মানুষ হচ্ছে পর্যায়ক্রমে বিন্যস্ত কতকগুলি ছিন্নভিন্ন ও সম্পর্কবিহীন অভিজ্ঞতার টুকরো-টাকরার

যোগফল মাত্র। তার চারপাশের অন্যান্য মানুষের কাছে তার যেমন কোনো যুক্তিসহ অস্তিত্ব নেই, তেমনি নেই তার নিজের কাছেও।

‘পূর্বাশা’-র ইতিহাস সম্পর্কে কিছু জানা দরকার। দরকার এই কারণেই যে বাংলা সাহিত্যের বিকাশে গুটিকয় বাংলা সাহিত্যপত্র অকল্পনীয় নানা প্রতিকূলতা সহ্য করেও সাহিত্য আলোচনা ও সৃষ্টিশীল লেখালেখির প্রক্রিয়াকে চালিয়ে যাবার দৃঢ়তা দেখিয়ে গেছে। ব্যক্তিগত জীবনে অনেক সম্পাদক ও প্রকাশককে টানা অভাব ও জ্বালা-যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছে। সহায়তা তাঁরা পান নি তা নয়। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে যথেষ্ট কম। সাহিত্যের পরবর্তী প্রজন্মধারাগুলি অনেক সময় পূর্ববর্তী এইসব সংস্থার অবদান থেকে শিক্ষা গ্রহণ ও তাদের যথাযথ মর্যাদা দানে শৈথিল্য দেখিয়েছে। ‘পূর্বাশা’-র কথাই আসি। ‘পূর্বাশা’ প্রতিষ্ঠানের ‘মডেল ফার্মিং’ নামে এক আদর্শপ্রণোদিত, আয়সমৃদ্ধ ও ব্যয়বহুল সংস্থা ছিল। এক সময় এ সংস্থার হাজার বিঘের ওপর জায়গা-জমি, চাষের আধুনিক যন্ত্রপাতি ও সংস্থা চালানোর জন্য অনেক মাইনে করা লোকজন ছিল। ভারত ভাগ হওয়ার আগে ও ঠিক পরে পরে সংস্থার প্রায় সবকিছুই চলে গিয়েছিল, এমনকি ব্যাক্সের সাহায্য অন্নি। তারই ধাক্কায় ‘পূর্বাশা’ সংস্থা, প্রেস ও প্রকাশনা সংস্থারও নাভিস্থান উঠতে শুরু করে। গত শতকের চল্লিশের দশকেও ‘পূর্বাশা’ থেকে জীবনানন্দের ‘মহাপৃথিবী’, সুবোধ ঘোষের ‘ফসিল’, অচিন্ত্যকুমারের ‘নীল আকাশ’, তারাক্ষরের ‘রাইকমল’-এর ইংরেজি অনুবাদ, মাণিকবাবুর ‘পদ্মানদীর মাঝি’-র ইংরেজি অনুবাদ—ইত্যাদি সব বিখ্যাত বই প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৫৫ সালে ‘মডেল ফার্মিং’ সংস্থা উঠে যায়। ‘পূর্বাশা’ মুখ খুঁড়ে পড়ে। ফলে সঞ্জয় ভট্টাচার্য মানসিক ভারসাম্য হারান। ১৯৫৫ থেকে ১৯৫৭—এই সময়টাতে ‘পূর্বাশা’ প্রেস নিলাম হয়ে যাওয়া অন্নি। ১৯৫৫ থেকে ১৯৬৯ সালের ওরা ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তিনি বারবারই মানসিক রোগাক্রান্ত (ডিপ্রেসন) হন ও তা থেকে কমবেশি সুস্থ হয়ে ওঠেন মূলত এই অকৃতদার কবি-সম্পাদকের ‘পূর্বাশা’-প্রকাশক আজীবন বন্ধু অকৃতদার সত্যপ্রসন্ন দত্তের দীর্ঘ রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রাণঢালা সেবায়। বন্ধ হয়ে যাওয়া পূর্বাশা-ও এর মধ্যে অনিয়মিত আবার বেরিয়েছে ও বন্ধও হয়ে গেছে। ভূমেন্দ্র গুহের শরীর-মনে জারিয়ে গিয়েছিলেন সঞ্জয় ভট্টাচার্য ও জীবনানন্দ। কোন প্রত্যাশাবিহীন ভক্তির ঘোরে তিনি সেই দু’জন কবির অর্জিত মহিমা ও যন্ত্রণাকে মজুরের মতো খেটে ব্যাপক মানুষের কাছে তাঁদের স্মৃতিচারণে উপস্থাপিত করেন। অধিকন্তু জীবনানন্দের প্রায় সমস্ত লেখার সংগ্রহ, কালানুক্রমিক তালিকা, ও বিশেষ করে তার প্রায় সমস্ত গদ্যলেখা প্রকাশের ক্ষেত্রে তার অবদানের ধারেকাছেও কেউ আসে না। বুদ্ধদেব বসু ও সঞ্জয় ভট্টাচার্য ছাড়া তৎকালীন ও বর্তমানের অধিকাংশ বিশিষ্ট লেখকদের নীরবতা, বিরুদ্ধতা বা নিজেদের জীবনানন্দের আলোয় আলোকিত হওয়ার জন্য ছদ্মস্তুতি পরবর্তী নন্দন-প্রজন্মদের আকর্ষণীয় আলোচনার বিষয়। ভূমেন্দ্রর অতুলনীয় সেবার তাঁরাও প্রতিদান দিয়েছেন। তিনি গত শতকের ষাটের দশকে প্রথম ওপেন হার্ট-অপারেশনটির সঙ্গে চিকিৎসক হিসেবে অন্যতম পথপ্রদর্শক হিসেবে যুক্ত ছিলেন। গবেষণা করেছেন হৃৎপিণ্ডের রোগ সংক্রান্ত বিষয় ছাড়াও লিভারের সিরোসিসপ্রতিম রোগ নিয়ে, যার গবেষণা হয়েছিল জাপানে ও ভারতের কলকাতায় সর্বপ্রথম তাঁর মাথায়। হৃৎপিণ্ড সংক্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার অনেক পদ্ধতি তিনি নতুন ব্যবহার করেন। কবি ও প্রাবন্ধিক হিসেবে তিনি বিশিষ্ট। তাঁর ভেতরে জারিত দু’জন কবি নতুন অভিমুখীনতার ক্ষেত্রে তাঁকে বারবারই সাহস জুগিয়েছে বলেই হয়ত তিনি মনে করেন।

“তাঁর ‘ধূসর পাণ্ডুলিপি’-র কবিতাগুলি গ্রহণযোগ্য হল তো ‘মহাপৃথিবী’-র কবিতাগুলি অভ্যাসের দোরগোড়ায় আটকে গেল; আবার ‘মহাপৃথিবী’-র কবিতাগুলি কথঞ্চিৎ জলচল হয়ে উঠল তো ‘সাতটি তারার তিমির’-এর কবিতাগুলি অন্তর্জাগতিক ঠেকল বলে অনেকদিনের অনুকূল পাঠকরাও হতাশ হলেন; নতুন কালের পাঠকরা এসে ‘সাতটি তারার তিমির’-কে সর্বাধিক গ্রহণীয় বলে যেইমাত্র মনে নিতে গেলেন, ‘বেলা এবেলা কালবেলা’-র অপরিচয়ের গুণপনা কাঁটার মতো বিধতে লাগল।”—ভূমেন্দ্র গুহ

“তিনিই (জীবনানন্দ) একমাত্র সার্থক কবি যিনি সমগ্র হৃদয়ের আর্তিকে তাঁর যুগের বিবর্তনের প্রেক্ষিতে অনুধাবন করেছেন, এবং সমসাময়িকের প্রত্যেকটি তরঙ্গকে তাঁর কবিতায় ছুঁয়ে যেতে দিয়েছেন; একই সঙ্গে তিনি তাঁর কবিতার পটভূমিকে বিপুল ইতিহাসের স্তরবৈচিত্র্যে প্রসারিত করেছেন।”—সঞ্জয় ভট্টাচার্য

রবিবারের এক সকাল। গণেশ এভিনিউতে ‘পূর্বাশা’-র অফিস কাম সঞ্জয় ভট্টাচার্যের ঘর। সাহিত্যের আড্ডা। আর পাঁচজনের মাঝে জীবনানন্দ বসে আছেন একটা চেয়ারে—চুপচাপ। তাঁর ওই চুপচাপ থাকার জন্যেই হোক বা অন্য কোনো কারণেই হোক, ঘরের আবহাওয়াটাও কেমন যেন থম মেরে গেছে। সঞ্জয়বাবু উৎসাহে ফুটেতে ফুটেতে উপস্থিত সকলকে শোনাচ্ছেন কীভাবে জীবনানন্দের কাব্যসিদ্ধি আন্তর্জাতিক শ্রেষ্ঠ কাব্যসার্থকতার কাছ ঘেঁষে আছে। সেই অপরিচিত, অল্পপরিচিত উপস্থিত মানুষজনের কাছে অনর্গল সেই ঘোরবাচন তো নিজের কানে শুনতে হচ্ছে জীবনানন্দকে। ক্রমাগত অস্বস্তি বাড়ছে তাঁর। এই উচ্চকিত কাব্যমহিমা বর্ণনা তো তাঁরই লেখার। পারস্পরিক কথাবার্তা, চিঠিপত্র বা লিখিত আলোচনাই তো সঙ্গত হতো সঞ্জয়বাবুর। জীবনানন্দ সেটাই ভাবছেন। কিন্তু তিনি তো এখানে এসেছেন একটা ব্যবহারিক দরকারে, সাহিত্য আলোচনা করতে নয়। তিনি তো আগেভাগেই এ-ব্যাপারে চিঠি দিয়েছিলেন। কই, সঞ্জয়বাবু বা সত্যবাবু তার উত্তরে কিছু বললেন না, কিছু করলেনও না। ব্যাপারটা সঞ্জয়বাবুকে মনে করাতো তাঁর কাব্যোন্মাদনা মুহূর্তে নিভে গেল। ভূমেন্দ্র লিখলেন, তাঁর কথায় অপরাধবোধের ছায়া পড়ল। সত্যবাবু শীঘ্র কোনো একটা সুরাহার ব্যবস্থা জীবনানন্দের বাসাবাড়িতে করে আসবে—এমন প্রতিশ্রুতিও সঞ্জয়বাবু জীবনানন্দকে দিলেন। ভূমেন্দ্র আরো লিখলেন, হয়ত ধারে কিছু টাকাপয়সা যোগাড় করে দেওয়ার অনুরোধ তিনি তাঁকে করতে পারেন। এর আগেও কয়েকবার ‘পূর্বাশা’-য় প্রবন্ধ লিখে জীবনানন্দ ধারশোধ করেছেন। কবিতা লেখার চেয়ে প্রবন্ধ লিখেই বেশি টাকা পাওয়া যাবে, তা দিয়েই ধার শোধ তাড়াতাড়ি হবে, তাই তিনি প্রবন্ধই লিখেছিলেন। যাই হোক, সেদিন অনিচ্ছাতেও সঞ্জয়বাবুর ঘরে তাঁকে পায়ের খেতে হয়েছিল। ভূমেন্দ্র বাসে করে তাঁকে বাসার স্টেপে পৌঁছে দিয়েছিলেন।

আর একদিন দুপুরবেলা। জীবনানন্দ এসে হাজির সঞ্জয়বাবুর ঘরে। চাপা উত্তেজনায় শরীর কাঁপছে। কথা জড়িয়ে যাচ্ছে। নিজেই চেয়ারে বসে পড়লেন। কপালের ঘাম ধূতির খুঁটায় মুছে কী যেন বলতে গিয়ে চুপ করে গেলেন। সঞ্জয়বাবু তাঁর মুখ চোখ দেখে তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন কোন অঘটন তাঁর ঘটছে কিনা। জীবনানন্দ হঠাৎ বলে গেলেন। আটপোরে গলায় বললেন, “না, তেমন কিছু নয়।” তা সঞ্জয়বাবু মানবেন কেন। ধাক্কাধাক্কি করে যা জানা গেল তা হচ্ছে, জরুরি কিছু টাকার দরকারে তিনি ‘দেশ’ পত্রিকা অফিসে কয়েকটা কবিতা নিয়ে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন কবিতাগুলোর

বিনিময়ে তাঁকে কিছু আগাম টাকা দেওয়া যায় কিনা। যিনি বসেছিলেন তিনি বলেছিলেন, অগ্রিম সম্মানমূল্য তাঁরা দেন না। তাছাড়া এতগুলো কবিতারও তাঁদের দরকার নেই। দু-তিনটে রেখে গেলেই হবে। যখন ছাপা হবে তখন তাঁরা টাকা পাঠিয়ে দেবেন। জীবনানন্দ বলেছিলেন, বাছাই করে তিনি কবিতাগুলো এনেছেন। পছন্দ না হলে অন্য কবিতাও পরে পাঠিয়ে দিতে পারেন। তা সে ব্যাপারেও তাঁরা অসম্মতি জানালেন। যা হোক, জীবনানন্দ তাঁদের দু-তিনটে কবিতাই দিয়ে এসেছেন। সঞ্জয়বাবু উঠলেন, জামাকাপড় পরলেন ও ভূমেন্দ্রকে জীবনানন্দের সাহচর্য দিতে বলে বেরিয়ে গেলেন। জীবনানন্দ ব্যাপারটা সঞ্জয়বাবুর কাছে তোলার জন্য যথেষ্ট বিরত হলেন ও চরম অস্বস্তি ভোগ করতে লাগলেন। ঘণ্টা দেড়-দুই পর সঞ্জয়বাবু ফিরে এলেন। তিনি বললেন, “সুরেশ মজুমদারের কাছে গিয়েছিলুম আমি শুধু এই কথাটা বলতে যে সামান্য কিছু টাকার জন্য জীবনানন্দ কিছু লেখা নিয়ে আজ এসেছিলেন আপনাদের কাছে। আপনারা নেন নি, ফেরত দিয়েছেন। তাতে জীবনানন্দ অপমানিত হন নি, তিনি মান-অপমানের উর্ধ্বে; সময় একদিন তা বলবে; অপমানিত হয়েছি আমরা সবাই, যারা সাহিত্যসেবা করি বলে ভাবি।” একথা শুনে জীবনানন্দ অসম্ভব কুণ্ঠিত হয়ে পড়লেন। তিনি বললেন, “কেন এসব করতে গেলেন বলুন তো; উনিও তো চাকরি করেন, ওঁকেও তো চাকরির কতকগুলো নিয়মকানুন মেনে চলতে হয়।” সঞ্জয়বাবু বললেন যে এমন স্পষ্টভাবে কথা না বললে তিনি নিজেকেও ক্ষমা করতে পারতেন না। তবে সুরেশ মজুমদার সেকথা বললেন না। তিনি অপ্রস্তুত হয়ে বারবার দুঃখ প্রকাশ করেছেন; কারণ তিনি ব্যাপারটা জানতেন না ও তাঁকে জানালে সেটা ঘটত না। তিনি হয়তো জীবনানন্দকে চিঠি দেবেন। জীবনানন্দের নেভা চেহারা নেভাই রইল। বললেন, তাঁর জন্যেই সঞ্জয়বাবুর সঙ্গে ‘দেশ’ কর্তৃপক্ষের সম্পর্ক খারাপ হয়ে গেল; তাছাড়া সেই প্রতিষ্ঠানের কাছে জীবনানন্দ ও সঞ্জয় ভট্টাচার্যদের যেতে হবে, কারণ তাঁদের তো লিখেই যেতে হবে। আসলে এ সবের জন্য তো তিনি আসেন নি; খুব ঠেকে পড়েছেন বলেই এসেছেন। ইতিমধ্যে সত্যবাবু জীবনানন্দের হাতে একটা খাম তুলে দিয়ে বললেন, “আপাতত চলুক, আমরা তো আছি।” জীবনানন্দ বললেন যে তিনি তাঁর লেখাগুলো ‘পূর্বশা’-র জন্য রেখে যাচ্ছেন। দরকার মতো সেগুলো সঞ্জয়বাবু কাজে লাগাবেন। সঞ্জয়বাবু বললেন, “রাখতুম, কিন্তু আজ রাখব না। এত কাণ্ড হয়ে গেল তো! আমি কবিতা চেয়ে নেব আপনার কাছে।”

১৯৪৬-এ জীবনানন্দ বরিশাল ছেড়ে চলে আসেন। ভূমেন্দ্র লিখছেন, তারপর তিনি ‘পূর্বশা’-র কার্যকর সাহচর্যের ওপর অনেকটাই নির্ভর করেছিলেন। সঞ্জয়বাবু যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন কিন্তু ‘কাজের কাজ’ কিছু করতে পারেন নি।

হুমায়ুন কবির সাহেব দেশভাগের মুখে ‘স্বরাজ’ বলে একটা দৈনিক খবরের কাগজ বের করবেন মনে করে ব্যাক্সের কাছে ধার পাওয়ার ব্যাপারে ‘পূর্বশা’-র প্রকাশক সত্যপ্রসন্ন দত্তের সহায়তা চাইলেন। তাঁর সঙ্গে ব্যাক্সের সর্বাধিনায়ক নরেন্দ্রনাথ দত্তের ভাল

সম্পর্ক থাকার জন্য ব্যাক্স বলল যে সত্যপ্রসন্নবাবু যদি কাগজটির কার্যনির্বাহক কমিটিতে থাকেন তাহলেই ধার পাওয়া যাবে। সত্যবাবু এই শর্তে রাজি হবেন বললেন যে জীবনানন্দকে সেখানে একটা চাকরি দিতে হবে। শর্ত পূরণ হয়েছিল। কাগজের রবিবারের পাতার সম্পাদক হন জীবনানন্দ। কিন্তু কাগজটাই টিকল না। ব্যাক্সের ধার শোধ করতে না পেরে উঠে গেল। খোদ ব্যাক্সেই জীবনানন্দের একটা চাকরি সত্যবাবুর চেষ্টায় হয়ে যেত। কিন্তু ওসব টাকাকড়ির হিসেবের খপ্পরে পড়তে তিনি রাজি হলেন না। কলেজের ইংরেজি পাঠ্যবই-এর নোটবুক লেখার কাজেও তিনি প্রথমে সম্মত হয়েছিলেন। কিন্তু সত্যবাবুর হাজার দৌড়ঝাঁপেও সে কাজও তিনি চেষ্টা করেও করতে পারলেন না। যোগ্যতার অভাব নয়, কারণ তিনি তো কলেজ-শিক্ষকতাই করেছেন। অভাব উৎসাহের, কারণ তিনি মনে করছেন তাতে সময়ের বর্বর অপচয় হবে।

জীবনানন্দ ট্রামের ধাক্কায় গুরুতর আহত। ভূমেন্দ্র বলছেন, “তিনি (সঞ্জয় ভট্টাচার্য) আমাকে জীবনানন্দের সেবা-শুশ্রূষার জন্য ডাক্তারি-পড়া ছাত্রদের একটা দল বানাতে বলেছেন; তাঁর চিকিৎসার সুব্যবস্থার জন্য সজনীকান্তকে ধরে বিধানচন্দ্রে পৌঁছে যাবার রাস্তায় আমাদের খাটিয়েছেন; জীবনানন্দকে হাসপাতালে দেখতে গিয়েছেন ক্লেট্‌জ, কিন্তু গণেশ এভিনিউর বাড়িতে মেঝেয় মাদুর পেতে শয্যা গ্রহণ করেছেন বা কাঠের মূর্তির মতো খাড়া হয়ে ঠায় বসে থেকেছেন—সত্যবাবু হাসপাতাল থেকে ফিরে এসে জীবনানন্দ সম্পর্কে নিজ অভিজ্ঞতাজাত খবর রোজ সকালে তাঁকে পৌঁছে দিয়েছেন, কিন্তু তাতে তিনি তৃপ্ত হননি। চেয়েছেন, আমি যেন গিয়ে টাটকা খবরটা রোজ তাঁকে আমার বাখ্যাসহ দিয়ে আসি, সকালে এবং বিকেলে দুইবেলা।” দু’একবার যা জীবনানন্দকে দেখতে গিয়েছিলেন, সে ক্ষেত্রেও শক্ত করে ভূমেন্দ্রের হাত ধরে গেছেন। জীবনানন্দের শ্মশানযাত্রার পথেও বিধ্বস্ত তাঁকে নিয়ে যেতে হয়েছে বলে ভূমেন্দ্র শেষযাত্রায় জীবনানন্দকে কাঁধ দেয়ার সুযোগ পাননি।

জীবনানন্দ ও সঞ্জয় ভট্টাচার্যের এই দুর্লভ আত্মীয়তার উৎস কারণ তুলে ধরতে পূর্বে আমরা জীবনানন্দ সম্পর্কে সঞ্জয় ভট্টাচার্যের সার কথা তুলে ধরেছি। এবার জীবনানন্দ কী বলেছেন তা আমরা দেখব—“বনলতা সেন-এর পরবর্তী কাব্যে আমি তাঁর (বুদ্ধদেব বসু) পৃথিবীর অপরিচিত, আমার নিজেরও পৃথিবীর বাইরে চলে গেছি বলে মনে করেন তিনি। ‘নিরুজ্জ’ ও ‘পূর্বশা’-র সম্পাদক সঞ্জয় ভট্টাচার্য মনে করেন আমার শেষের দিকের কবিতায় আমার পারিপার্শ্বিক চেতনা প্রৌঢ় পরিণতি লাভ করেছে। এ পারিপার্শ্বিক অবশ্য সমাজ ও ইতিহাসকে নিয়ে।” ১৯৫২ সালের কাছাকাছি সময়ে তিনি সঞ্জয় ভট্টাচার্যকে লেখেন—“...আমার মনে হয় আমাদের দেশে আপনিই একমাত্র খাঁটি ভাবুক ও সমালোচক যিনি ধূসর পাণ্ডুলিপি থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত আমার সমস্ত কাব্যের দোষগুণ ঠিক ভাবে বুঝতে পারেন; আপনার হাতে কবিতাগুলো ছেড়ে দিয়ে আমি খুব আশ্বস্ত বোধ করি।”

কৃতজ্ঞতা : জীবনানন্দ, সঞ্জয় ভট্টাচার্য এবং—ভূমেন্দ্র গুহ

With best compliments of

GULSON CONSTRUCTION

CIVIL, REFRACTORY, MECHANICAL & GENERAL ORDER SUPPLIERS

In Front of Hindustan Refractories
Sagarbhanga (Near 112 No. Rail Gate)
Durgapur-11, Dist. Burdwan

Sl. No. 176

With best compliments of

LUTHRA FORKLIFT

Sl. No. 178

প্রাক্ সার্থশতবর্ষে জ্ঞানসাধক নগেন্দ্রনাথ বসু

(১৮৬৬-১৯৩৮)

রঙ্গনকান্তি জানা



ইংরেজি ১৯২৮ সালের শীতকালে কলকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগ দিতে আসেন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী (১৮৬৯-১৯৪৮)। এই সময় এক শীতের রাতে উত্তর কোলকাতার বিশ্বকোষ লেনে এক ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করার অভিপ্রায়ে উপস্থিত হন তিনি। সেই ব্যক্তি ছিলেন গান্ধীজির কাছে একেবারেই অপরিচিত। যদিও ঐ ব্যক্তির কর্মক্ষমতা ও পাণ্ডিত্যের কিছু নিদর্শন সম্পর্কে তাঁর সম্যক পরিচিতি ঘটেছিল। ঐ সাক্ষাতের ঠিক একবছর পর গান্ধীজি ১৯২৯ সালের ১০ জানুয়ারি তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত *Young India*-তে লেখেন—“I was thankful for this pilgrimage, which I should never have missed. As I was talking to him I could not but recall Doctor Murray’s labours on his great work... nations are made of such giants.” যাঁর সম্পর্কে গান্ধীজি এই কথাগুলি লেখেন, তিনি আর কেউ নন বিশ্বকোষ হিন্দী সংস্করণ প্রকাশের মূল সারথী নগেন্দ্রনাথ বসু, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব (১৮৬৬-১৯৩৮ খ্রি.)।

নগেন্দ্রনাথ কলকাতার এক বর্ধিষু ও ধনী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা নীলরতন ও মা পবিত্রকুমারী। নীলরতনের দুই পুত্র ও এক কন্যা। যেদিন নগেন্দ্রনাথের জন্ম হয় সেইদিন পিতামহী তারিণী দেবী হাজার টাকা দান করেছিলেন। তিনি ছিলেন কলকাতার সেই কালের ধনী রামদুলাল সরকারের তৃতীয়া কন্যা। নগেন্দ্রনাথের

অল্পপ্রাশনে ব্যয় হয়েছিল তখনকার দিনে ষোল হাজার টাকা। তবে ধনী পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও তাঁর শৈশব ও কৈশোর জীবন বেশ আর্থিক কষ্টের মধ্য দিয়ে কাটে। অর্থনৈতিক দুরবস্থায় প্রথাগত শিক্ষায় বেশি দূর এগোতে পারেননি নগেন্দ্রনাথ। মেট্রোপলিটন ইন্সটিটিউশনের থার্ড ক্লাস অবধি পড়াশোনা। নগেন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে কাব্যচর্চায় মনোনিবেশ করেন। সমসাময়িক পত্রপত্রিকায় যথাক্রমে ‘কল্পনা’ (১২৮৭ বঙ্গাব্দ), ‘নব্যভারত’ (১২৯০ বঙ্গাব্দ), ‘নবজীবন’ (১২৯১ বঙ্গাব্দ), ‘প্রচার’ (১২৯১ বঙ্গাব্দ), ‘দীপিকা’ (১২৯৪ বঙ্গাব্দ), ‘সাহিত্য’ (১২৯৭ বঙ্গাব্দ) ইত্যাদিতে তাঁর সাহিত্যকর্ম প্রকাশ হতে থাকে। তবে প্রথাগত বিদ্যাশিক্ষা বন্ধ হয়ে গেলেও নগেন্দ্রনাথ নিজের ইচ্ছামতো বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে থাকেন। যখন চৌদ্দ বছর বয়েস তখন সাহিত্যসাধনার গুরু হিসাবে সান্নিধ্য পেয়েছিলেন কবি নন্দলাল সরকারকে। তাঁর সাহিত্যচর্চার অপর সঙ্গী ছিলেন ব্যোমকেশ মুস্তোফী। কাব্য ও নাটকের প্রতি আকর্ষণ তাঁর ছিল লেখক হিসাবে আত্মপ্রকাশের প্রথমাবস্থা থেকেই। তাঁর প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস ‘অক্ষিচাঁদ’ ‘তপস্বিনী’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সমকালীন ‘তপস্বিনী’ ও ‘ভারত’ পত্রিকায় তাঁর বেশ কয়েকটি নাটকও প্রকাশিত হয়—যথাক্রমে ‘কর্ণবীর’-এর কিছু অংশ (ম্যাকবেথের অনুবাদ), ‘পার্শ্বনাথ’, ‘শঙ্করাচার্য হরিরাচ’, ‘লাউসেন’ ইত্যাদি। যেখানে পরিবার-পরিজনসহ ভাড়া থাকতেন তার সামনেই ছিল বেঙ্গল থিয়েটার। তাই স্বাভাবিক কারণেই নাটক ও নাট্যাভিনয় বিষয়ে তাঁর আকর্ষণ বাড়তে থাকে। উপরোক্ত নাটকের কয়েকটি অভিনয়েরও ব্যবস্থা হয়। কিন্তু তিনি উপলব্ধি করেন নাটক লিখে পরিবারের শোচনীয় আর্থিক অবস্থার সামাল দেওয়া সম্ভব নয়। মাতামহের চেষ্টায় রেলি ব্রাদার্স-এর গুদামে নগেন্দ্রনাথ চাকরি পেলেন, কিন্তু ভালো না লাগায় অল্প কয়েকদিন পর সে কাজও ছেড়ে দেন। নগেন্দ্রনাথ মাসিক বারো টাকা মাইনেতে গৃহশিক্ষকতার কাজ শুরু করেন। পাশাপাশি নিজে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে শিক্ষকের অধীনে পাঠ গ্রহণও আরম্ভ করেন। নাটক লেখায় নগেন্দ্রনাথ তেমন সফলতা লাভ করেননি। একটি দুটি নাটক মঞ্চস্থ হয়েছিল মাত্র। এসময়ে নাট্যকার ও অভিনেতা অমৃতলাল বসু-র (১৮৫৩-১৯২৯) সুপরামর্শে নগেন্দ্রনাথ নাটক লেখায় ক্ষান্তি দিয়ে, ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধ লেখায় মনোনিবেশ করেন। তাঁর প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত হতো, যথাক্রমে—‘জন্মভূমি’, ‘সাহিত্য কল্পকল্প’, ‘সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা’, ‘সমীরণ’, ‘পন্থা’, ‘ঐতিহাসিক চিত্র’, ‘বঙ্গদর্শন’, ‘কায়স্থ পত্রিকা’, ‘বঙ্গভাষা’, ‘পুণ্য’, ‘বানী’, ‘ভাণ্ডার’, ‘উপাসনা’, ‘জাহ্নবী’, ‘সাহিত্য উদ্বোধন’, ‘ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন’, ‘ব্রহ্মবিদ্যা’, ‘বিজয়া’, ‘সাহিত্য সংবাদ’, ‘রংপুর সাহিত্য পরিষৎ’, ‘হিন্দু পত্রিকা’,

‘পরিচারিকা’, ‘প্রবর্তক’, ‘সুবর্ণ-বণিক সমাচার’, ‘পঞ্চপুষ্প’, ‘ভারতবর্ষ’ ইত্যাদিতে।

১৮৮৩ সাল নাগাদ নগেন্দ্রনাথ ‘শব্দেন্দু মহাকোষ’ নামে একটি বৃহৎ কোষগ্রন্থ সংকলনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তখন তাঁর বয়স সতেরো বছর। তাঁর কথায়—“শব্দেন্দু মহাকোষের তিনটি স্তম্ভ। প্রথম স্তম্ভে ইংরেজি শব্দ, তাহার ইংরেজি ও বাংলা অর্থ, প্রধান প্রধান ইংরেজি গ্রন্থ হইতে তাহার প্রমাণ প্রয়োগ এবং যে যে ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক ও দার্শনিক শব্দের বিস্তৃত পরিচয় আবশ্যিক, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ; দ্বিতীয় স্তম্ভে অকারাদি বর্ণানুক্রমে বৈদিক, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক সকল প্রধান শব্দের বাঙ্গালা ভাষায় বিবরণ; এবং তৃতীয় স্তম্ভে অকারাদি বর্ণানুক্রমে বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও যে সকল বিভিন্ন ভাষার শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় প্রচলিত হইয়াছে, সেই শব্দের ব্যুৎপত্তি, অর্থ, প্রমাণ প্রয়োগ এবং পর্যায় শব্দ বিস্তৃতভাবে সংকলিত হইয়াছে।” ১৮৮৪ সালে এই মহাকোষ গ্রন্থের মালিকানা নিয়ে আইনি জটিলতায় কাজ বন্ধ হয়ে যায়। এই সময় রাখাকান্ত দেব প্রণীত ‘শব্দকল্পদ্রুম’ নাগরি লিপিতে প্রকাশের প্রয়াস করেন বরদাচরণ মিত্র ও হরিচরণ বসু। পূর্ববর্তী সংস্করণে বাদ যাওয়া শব্দগুলির সংগ্রহ ও সংকলনের জন্য নগেন্দ্রনাথকে মাসিক পঁচিশ টাকা মাইনেতে বহাল করা হল। এই কাজের সূত্রে নগেন্দ্রনাথ বহরমপুরে এলেন। এখানে রামদাস সেনের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে কাজের সময় স্থানীয় বিশিষ্ট শিক্ষিতজনের সাথে আলাপ আলোচনায় জানতে পারলেন—এ সময়ে বিশেষভাবে চাহিদা আছে ‘বিশ্বকোষ’-এর। যার সত্ত্বর পুনঃপ্রকাশের প্রয়োজন। যে কাজটি রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় (১২৫০-১৩১৬ বঙ্গাব্দ) এবং বিখ্যাত লেখক ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৭-১৯১৯ খ্রি.) শুরু করেছিলেন। যুবক নগেন্দ্রনাথ, রঙ্গলাল ও ত্রৈলোক্যনাথ দু-ভাইকে তাঁর পরিকল্পনা জানিয়ে তাঁদের আশ্বস্ত করেন এবং ‘বিশ্বকোষ’-এর স্বত্ব কিনে নেন। দীর্ঘ সাতাশ বছরে (১২৯১-১৩১৮ বঙ্গাব্দ) নগেন্দ্রনাথ দ্বিতীয় খণ্ডের একশ সতের পৃষ্ঠা থেকে বাইশ খণ্ডে প্রকাশ করলেন। বিশ্বকোষের সর্বজনীন চাহিদার উক্ত কোষগ্রন্থটির হিন্দী সংস্করণ পঁচিশ খণ্ডে প্রকাশ করেন। (১৩২০-১৩৩৮ বঙ্গাব্দ) হিন্দী সংস্করণ প্রকাশের কাজে তাঁকে সহায়তা করেন তাঁর পুত্র বিশ্বনাথ ও বেশ কিছু হিন্দিভাষী পণ্ডিত। তাঁর জীবৎকালেই বাংলা বিশ্বকোষের দ্বিতীয় সংস্করণের কাজ শুরু হয়। ১৩৪২-১৩৪৫ বঙ্গাব্দের মধ্যে চারটি খণ্ড প্রকাশিত হয়। তাঁর জীবনের একটা বড় কাজ বিশ্বকোষের প্রকাশ।

বিশ্বকোষ-এর জন্য প্রবন্ধ রচনার জন্য তাঁর ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব বিবিধ বিষয়ে নিবিড় অধ্যয়ন, ফলশ্রুতিস্বরূপ বেশ কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থের রচনা করেন : বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (১৩০৫ বঙ্গাব্দ) প্রথমভাগ, ব্রাহ্মণ কাণ্ড চার খণ্ড, কায়স্থদের পাঁচখণ্ড ও বৈশ্যদের প্রথম খণ্ডের প্রথম অংশ। ময়ূরভঞ্জের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ থাকার সময় লেখা *The Archaeological Survey of Mayurbhanja Vol-I* (1911) কায়স্থের বর্ণ নির্ণয় (১৯০১ খ্রি.), যশোর ইতিহাস শাখার সভাপতির ভাষণ (১৯১৬ খ্রি.), *The Modern Buddhism and its Followers in Orissa* (1911), ভারতীয় লিপি তত্ত্ব—হিন্দিতে (১৯১৪ খ্রি.), *The Short History of the Indian Kayasthas* (1915), *The Social History of Kamrupa*, 3 Vols (1922-33)। সম্পাদনা করেন—বিজয় পণ্ডিতের ‘মহাভারত’, ২ খণ্ড (১৮৯৯); পীতাম্বর দাসের ‘রসমঞ্জরী’ (১৩০৬ ব.), নরহরি চক্রবর্তীর ‘ব্রজ পরিক্রমা’ (১৩২২ ব.), কবি জয়ানন্দের ‘শ্রীশ্রী চৈতন্যমঙ্গল’ (১৩১২ ব.), রাজা জয়নারায়ণ ঘোষালের ‘কাশী পরিক্রমা’ (১৩১৩ ব.), রামাই পণ্ডিতের ‘পুণ্য পুরাণ’ (১৩১৪ ব.), বিজয়রামের ‘তীর্থমঙ্গল’ (১৩২২ ব.), যদুনাথ

সর্বাধিকারীর ‘তীর্থ ভ্রমণ’ (১৩২২ ব.), ‘বর্ধমানের ইতিকথা—প্রাচীন ও আধুনিক’, যার অন্যান্য লেখক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখালরাজ রায়; অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী (১৯১৫ খ্রি.)। এছাড়া সম্পাদনা করেন ব্রহ্মাণ্ড পুরাণম্ (অসমাপ্ত) (১২৯৮-১৩০৯ ব.), কৃষ্ণনন্দ ব্যাসদেব—সঙ্গীত রাগকল্পদ্রুম, তিন খণ্ড (১৯১৬)।

সমকালীন বঙ্গদেশের ভারত বিদ্যাচর্চার দুই অগ্রণী প্রতিষ্ঠান এশিয়াটিক সোসাইটি (১৯৮৪ খ্রি.) এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ (১৮৯৪ খ্রি.)-এর সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিলেন। গবেষণামূলক কাজের দৌলতে সোসাইটির গবেষণা পত্রিকায় তাঁর শিলালিপি বিষয়ক লেখাগুলি প্রকাশিত হতে থাকে। অন্যদিকে এইসময় তিনি সাহিত্য পরিষৎ-এর একজন নির্ভরযোগ্য সংগঠক সদস্য হিসাবে পরিচিত ছিলেন। এই সংস্থার পত্রিকায় শুধুমাত্র নিজের গবেষণামূলক প্রবন্ধ নয়, পত্রিকার সম্পাদক ও পত্রিকাধ্যক্ষ হিসাবেও কাজ করেছিলেন। তিনি পরিষৎ-এর সহসভাপতি নির্বাচিত হন ১৩৩০-১৩৩১ বঙ্গাব্দে। ‘কায়স্থ’ পত্রিকাও এই সময় কিছুদিন সম্পাদনা করেছিলেন। এশিয়াটিক সোসাইটির সাধারণ সদস্য হন (১৮৯৪ খ্রি.), এবং ঐ প্রতিষ্ঠানের ফিলোলজিকাল কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন (১৮৯৭ খ্রি.)। কেন্দ্রীয় টেক্সট বুক কমিটির সদস্য হন ১৮৯৭ খ্রি। নগেন্দ্রনাথ বীরভূম অনুসন্ধান সমিতি-র স্থায়ী সভাপতি পদে নির্বাচিত হন (১৯১৪ খ্রি.)।

আমৃত্যু সাহিত্যসেবা ও ইতিহাস-প্রত্নতত্ত্বচর্চার ফলস্বরূপ সম্মান ও খ্যাতিপ্রাপ্তির সংখ্যাও কম নয়। হিন্দি ভাষায় বিশ্বকোষ প্রকাশের জন্য ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে ভারতবর্ষ মহামণ্ডলের পক্ষ থেকে কাশীতে আয়োজিত সভায় ‘শব্দরত্নাকর’ উপাধি লাভ করেন। নবদ্বীপের পণ্ডিতসমাজ ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে ‘তত্ত্বচিন্তামণি’ উপাধি প্রদান করে। ১৩১৮ বঙ্গাব্দে বিশ্বকোষ রচনার জন্য কলকাতার গুণীজনদের পক্ষ থেকে তিনি ‘সিদ্ধান্তবারিধি’ উপাধি লাভ করেন। ১৩১২ বঙ্গাব্দে রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ-এর প্রতিষ্ঠাদিবসে নগেন্দ্রনাথ ‘প্রাচ্যবিদ্যা মহার্ণব’ উপাধিতে ভূষিত হন। তাঁর আজীবন গবেষণামূলক কাজের জন্য তৎকালীন ইংরেজ সরকার তাঁকে ‘রায়সাহেব’ উপাধিতে ভূষিত করে।

দীর্ঘ বাহান্তর বছরের জীবনে এই জ্ঞানপিপাসু গবেষক মানুষটির জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ হল প্রথমে বাংলা ভাষায় বিশ্বকোষের প্রকাশ, যা সমকালীন শিক্ষিত সমাজে বিশেষভাবে আদৃত হয়েছিল, যার দরুন নগেন্দ্রনাথ তাঁর সার্থশত বর্ষেও সমানভাবে প্রসঙ্গিক আছেন এবং বোধ করি ভবিষ্যতেও থাকবেন। এই বিশ্বকোষের কাজটি থেকে তাঁর আরও একটি গবেষণামূলক কাজের সূত্রপাত হয়, সেটি হল—বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস রচনা। কাজটির সফলতা নিয়ে পক্ষে ও বিপক্ষে অনেক তর্ক-বিতর্ক থাকলেও, একাগ্র অধ্যবসায় ও নিবিড় অনুসন্ধানে যে সামাজিক ইতিহাসকে তিনি লিপিবদ্ধ করে যান, তা এককথায় অনবদ্য এবং আজও প্রাসঙ্গিক।

তথ্যসূত্র

১. প্রবীর মুখোপাধ্যায় (সম্পাদক) ‘নগেন্দ্রনাথ বসু, আমার জীবন কথা’, কলকাতা, ২০১০।
২. প্রবোধচন্দ্র সেন, *বাংলার ইতিহাস সাধনা*, কলকাতা, ১৯৯২ (পুনঃ মুদ্রণ)।
৩. অশোক উপাধ্যায়, *বাংলা সাময়িকপত্রে প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাসচর্চা পাথিকৃত্য প্রবন্ধপঞ্জি*, কলকাতা, ২০০১।
৪. চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘নগেন্দ্রনাথ বসু (১৮৬৬-১৯৩৮) বিশ্বভারতী পত্রিকা, কলকাতা বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ।
৫. শ্যামলী সুর, *ইতিহাস চিন্তার সূচনা ও জাতীয়তাবাদের উন্মেষ*, বাংলা ১৮৭০-১৯১২, কলকাতা, ২০০২।

‘আমার জীবন’ : রাসসুন্দরী দাসী

কল্যাণী ভট্টাচার্য

আশাপূর্ণা দেবী তাঁর ‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’ উপন্যাসে সত্যবতীর গল্প লিখতে গিয়ে লিখেছিলেন—“আজকের বাংলাদেশের বকুল পারুলদের পিছনে রয়েছে অনেক বছরের সংগ্রামের ইতিহাস; বকুল পারুলদের মা, দিদিমা, পিতামহী আর প্রপিতামহীদের সংগ্রামের ইতিহাস। তাঁরা সংখ্যায় অজস্র, তারা অনেকের মধ্যে মাত্র এক একজন। তারা একলা এগিয়েছে খানা ডোবা ডিঙিয়ে...”

এই একলা এগিয়ে যাওয়া একজনকে নিয়েই আজকের আলোচনা। ফিরে দেখা অতীতকে, ফিরে দেখা রাসসুন্দরী ও তাঁর সৃষ্টি ‘আমার জীবন’-কে।

আজ থেকে দেড়শো বছরেরও আগে ‘আমার জীবন’ নামে একটি আত্মকথা প্রকাশিত হয়েছিল, রচয়িতা রাসসুন্দরী দাসী। ১৮৭৫ সালে এই বইটি ছাপা হয়েছিল রামরত্না মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে। রাসসুন্দরীর নিজের ভাষায়—“আমার যখন ৬০ বৎসর বয়ঃক্রম সেই সময় আমার জীবনবৃত্তান্ত যৎকিঞ্চিৎ লেখা হইয়াছিল।” দ্বিতীয় সংস্করণ প্রসঙ্গে লেখিকা উল্লেখ করেছেন, তাঁর ৮৮ বছর বয়সে এই গ্রন্থটি আবার প্রকাশিত হয়। “আমার শরীরের অবস্থা, মনের ভাব কোন সময় কী প্রকার ছিল এবং কোন অবস্থায় কত দিবস গত হইয়াছে সমুদয় আমার স্মরণ নাই। যৎকিঞ্চিৎ যাহা আমার মনে আছে তাহাই লিখিতেছি।” তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল রাসসুন্দরীর মৃত্যুর পর তাঁর পৌত্র সরসীলাল সরকারের উদ্যোগে।

যে যুগে এই গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় সেকালে আত্মজীবনী লেখার রীতি আমাদের দেশে ছিল না, বিশেষত মেয়েদের লেখা। মেয়েদের জীবনে তো তখন নিজের বলে কিছু ছিল না। সবই তো পরের জন্য। মেয়েদের বিয়ে হত খুব অল্প বয়সে। বিয়ের পরে স্বামী ও সংসারের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দেওয়াই ছিল তাদের একমাত্র কাজ।

তীর্থ ভ্রমণে নাই প্রয়োজন

যদি থাকে স্বামীপদে মন।

সেইসময় জন্মেও কেমন করে রাসসুন্দরীর মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল এই আত্মবোধ? কেমন করেই বা জেগে উঠল আত্মজীবনী রচনার আকাঙ্ক্ষাও কোন আত্মপরিচয়কে তিনি খুঁজছিলেন? কী বলতে চাইছিলেন? —সে এক গল্পকথা। এই আত্মকথার নাম দিলেন তিনি ‘আমার জীবন’। মেয়েদের আমিত্বের বিসর্জন যেকালে সমাজের দস্তুর সেকালে ‘আমার জীবন’-কে ফিরে দেখার মধ্যে যে আমিত্বের উপস্থিতি তা এক অনন্য দৃষ্টান্ত। লিঙ্গবৈষম্যের কারণে সেকালে মেয়েদের আমিত্বকে বিসর্জন করতে হত। রাসসুন্দরী তা না করে নিজের কথা পাঠককে শোনাতে চেয়েছেন আর সে কারণেই শুধু লেখা নয় বইটিকে ছাপিয়ে নিজের বার্তা পাঠকের কাছে পৌঁছে

দিয়েছেন।

ইংরেজি ১৮০৯ সালে পাবনা জেলার পোতাজিয়া গ্রামে রাসসুন্দরীর জন্ম হয়। আত্মজীবনীতে তিনি লিখেছেন, “১২১৬ সালের চৈত্র মাসে আমার জন্ম হয়।” তাঁর বাবার নাম পদ্মলোচন রায়। তাঁর চার বছর বয়সে বাবার মৃত্যু হয়। তাঁর মা এক কাকা ও পিসির কথা আত্মজীবনীতে উল্লেখ রয়েছে। কাকিমার কোনো উল্লেখ নেই। তাঁরা তিন ভাই বোন। “আমার দুই বৎসরের বড় এক ভাই আর দুই বৎসরের ছোট এক ভাই, ইহার মধ্যে আমি।” তাঁকে দেখতে কেমন ছিল সে সম্পর্কে তিনি নিজেই বর্ণনা দিয়েছেন,

বর্ণটি ছিল মম অত্যন্ত উজ্জ্বল

উপযুক্ত তারি ছিল গঠন সকল

সেই পরিমাণে ছিল হস্তপদগুলি

বলিত সকলে মোরে সোনার পুতুলী।

তাঁর পৌত্রী সরলাবালা সরকারও লিখেছেন, রাসসুন্দরী ছিলেন পরমা সুন্দরী।

ছেলেবেলায় তাঁর দিন কেটেছে সঙ্গীসাথীদের সঙ্গে খেলাধুলা করে। বড় হচ্ছিলেন মায়ের আদরে। মার পরে তার অগাধ বিশ্বাস। বন্ধুদের কাছে মার খেয়ে কান্না তাঁর স্বভাবজাত আর ছেলেধরার ভয় তাঁর মজ্জাগত। সেকালের দিনে সমাজের মধ্যে একটা চোরা স্রোতের মতো ছেলেধরার ভয় ছিল।

রাসসুন্দরীদের বাড়িতে একটি বাংলা স্কুল ছিল। সেখানে একজন মেমসাহেব ছেলেদের লেখাপড়া করাতেন। ভাবলে অবাক লাগে পোতাজিয়া গ্রামের মত পল্লিগ্রামে একজন মেমসাহেবের উপস্থিতি। লেখাপড়া শেখানোর জন্য নয়, খেলার সঙ্গিনীদের কাছে লাঞ্চিত না হয়ে সময় কাটানোর জন্য রাসসুন্দরীকে ওই পাঠশালায় পাঠানো হত। কালো একটি ঘাগরা পরে একখানা উড়ানি গায়ে দিয়ে তিনি কাকার সঙ্গে সেই মেমসাহেবের স্কুলে গিয়ে বসে থাকতেন। সেই স্কুলে ছেলেদের পড়া শুনে শুনে তাঁর বিদ্যালয়ের প্রথম পাঠ শুরু হয়েছিল। সেকালে পড়াশুনা শেখানোর পদ্ধতির পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর লেখায় : “তখন ছেলেরা ক খ চৌত্রিশ অক্ষর মাটিতে লিখিত পরে এক নড়ি হাতে লইয়া ঐ সকল লেখা উচ্চৈঃস্বরে পড়িত। আমি সকল সময়ই থাকিতাম। আমি মনে মনে ঐ সকল পড়াই শিখিতাম। সেকালে পারসি পড়ার প্রাদুর্ভাব ছিল। আমি মনে মনে তাহাও খানিক শিখিতাম।” প্রত্যক্ষভাবে ছাত্রী না হয়েও পরোক্ষে তাঁর বিদ্যাভ্যাস শুরু হল। দু-বছর তিনি পাঠশালায় গিয়েছিলেন। তারপরে তাদের বাড়িতে আগুন লাগে, অন্য ঘরের সঙ্গে পাঠশালাটিও পুড়ে যায়, ফলে পাঠশালাটি উঠে যায়। শেষ হল তার শিক্ষার পালা।

কিন্তু শেষ হয়েও শেষ হয় না। অনেক পরে আবার সেই পুরনো প্রেম দেখা দিল নতুন ভাবে। তখন তাঁর বিয়ে হয়ে গিয়েছে,

অনেকদিন। “অনন্তর আমার মনে বাসনা প্রবল হইয়া উঠিল যে আমি একান্তভাবে লেখাপড়া শিখিয়া পুঁথি পড়িব।” লেখাপড়া শেখার অদম্য ইচ্ছা থেকেই তাঁর স্বপ্ন দেখা তিনি যেন চৈতন্যভাগবত পাঠ করছেন। স্বপ্ন ভেঙে যাবার পর, “আমার শরীর মন এককালে আনন্দরসে পরিপূর্ণ হইল। আমি জাগিয়াও চোখ বুজিয়া বারবার ঐ স্বপ্নের কথা মনে করিতে লাগিলাম আর আমার জ্ঞান হইতে লাগিল আমি যেন কত অমূল্য রত্নই প্রাপ্ত হইলাম।” একদিন হঠাৎই সুযোগ হল। তাঁর স্বামী চৈতন্যভাগবতের একখানি পুঁথি তাঁর বড়ছেলেকে সাবধানে রেখে দিতে বললেন। রাসসুন্দরীর সামনে এলো আকাঙ্ক্ষিত সুযোগ। তিনি পুঁথিটি থেকে একটি পাতা লুকিয়ে রাখালেন, রান্নাঘরে চেলাকাঠের তলায়। একই সঙ্গে লুকিয়ে রাখলেন বড়ছেলে যে তালপাতায় লিখত তার একটি পাতাও। মনের মধ্যে ভেসে বেড়ায় সেই পাঠশালার শেখা চৌত্রিশ অক্ষর, ফলা, বানান, সেই পড়তে শেখা। তাঁর সামনে চৈতন্যভাগবতের পাতা। শুধুমাত্র নিজের আগ্রহ আর বুদ্ধিকে সম্বল করে তিনি পড়তে শিখলেন। “আমি অনেক দিবসে, অনেক পরিশ্রম, অনেক যত্নে এবং অনেক কষ্ট করিয়া চৈতন্যভাগবত পুস্তকখানি গোপনীয় পড়িতে শিখিলাম। ঐ বাটীতে যে কিছু পুস্তক ছিল ক্রমে ক্রমে আমি সকল পড়িলাম।” চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত, আঠার পর্ব জৈমিনী ভারত, গোবিন্দ লীলামৃত, বিদগ্ধমাধব, প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা, বাল্মীকীপুরাণ সবই তিনি পড়ে ফেললেন।

পড়তে তো শিখলেন এবার লিখতে শেখার পালা। তিনি বোঝেন লিখতে না জানলে ‘জিতাক্ষর’ হওয়া দুঃসাধ্য। তিনি যে ‘জিতাক্ষর’ শব্দটি প্রয়োগ করেছেন তা খুবই আশ্চর্যজনক এবং তাৎপর্যপূর্ণ। এরকম একটি অপ্রচলিত শব্দকে তিনি গ্রহণ করে বোঝাতে চেয়েছেন ‘জিতাক্ষর’ হওয়ার জন্য তাকে কী অপরিসীম সংগ্রাম করতে হয়েছে। লিখতে শেখা সম্পর্কে তাঁর উক্তি : “পরমেশ্বরের ইচ্ছায় দৈবাৎ এক দিবস আমার সপ্তম পুত্র কিশোরীলাল বলিল, মা আমরা যে পত্র লিখি তাহার উত্তর পাই না কেন? আমি বলিলাম, আমি পড়তে পারি এজন্য তোমাদের পত্র পড়িয়া থাকি, আমি তো লিখিতে জানিনা সেজন্য উত্তর দেওয়া হয় না... তখন সে বলিল পত্রের উত্তর দিতেই হইবে, এই বলিয়া কাগজ কলম, দোয়াত, দোয়াত কালি সমুদয় সংগ্রহ করিয়া আমাকে দিয়া সে কলিকাতায় পড়িতে চলিল, আমি বড় বিপদে পড়িলাম। কেমন করিয়াই বা লিখিব?” সুযোগ এল। রাসসুন্দরী স্বামীর চিকিৎসা উপলক্ষে পঞ্চম পুত্র দ্বারকানাথের বাসাতে গেলেন। সেখানে কাজের চাপ কম। এই সময়েই তাঁর লেখাকে আয়ত্তে আনা।

রাসসুন্দরীর জীবৎকাল প্রায় শতাব্দী ব্যাপী। তাঁর জন্মকালে রামমোহন তখনও কলকাতায় আসেননি। বিদ্যাসাগর তো এলেন আরো পরে। মেয়েদের বইয়ের জগতে প্রবেশের দ্বার রুদ্ধ। মেয়েরা লেখাপড়া শিখলে বিধবা হবে এই লোকবিশ্বাস সমাজজীবনের রন্ধে রন্ধে। জন্মমূহূর্তে মঙ্গলশঙ্খ বাজিয়ে মেয়েদের অভ্যর্থনা করা হয় না। সতীদাহ, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহের ফলে মেয়েরা নিপীড়িত। কুলরক্ষায় বলিপ্রদত্ত কুলীনকন্যার নীরব আত্মদান বাংলার ঘরে ঘরে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ জুড়ে বুদ্ধিজীবীরা যে সমস্ত সংস্কার আন্দোলনে রতী হলেন তার সিংহভাগ জুড়েই মেয়েরা। সতীদাহ বন্ধ হল, বিধবাবিবাহ আইন প্রবর্তিত হল। বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ নিয়ে যেমন আলোচনা শুরু হল, অপরদিকে নারীশিক্ষাও শুরু হল। শুধু গৃহের চার দেওয়ালের মধ্যে নয়, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার দ্বারাও উন্মুক্ত হল—প্রতিষ্ঠিত হল বেথুন স্কুল—নারীর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রথম উল্লেখযোগ্য সোপান। রাসসুন্দরী এইসব কিছুর সাক্ষী। রামদিয়ার গৃহবদ্ধ জীবনে বিদ্যাকে আয়ত্ত করার জন্য কী অপরিসীম

কষ্টই না করতে হয়েছে। জীবনের প্রথমে দেখা ও পরবর্তীকালে দেখা নারীশিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে তিনি তুলনামূলক আলোচনা করেছেন : “তখন মেয়েছেলেকে লেখাপড়া শিখাইত না... তখনকার লোক বলিত বুঝি কলিকাল উপস্থিত হইয়াছে দেখিতে পাই। এখন বুঝি মেয়েছেলেও পুরুষের কাজ করিবেন... এখন মাগের নামডাক, মিনসে জড়ভরত, আমাদের কালে এত আমোদ ছিল না। এখন মেয়েরাজার (রানী ভিক্টোরিয়া) কাল হইয়াছে, দিনে দিনে আর কত দেখিব?” মেয়ে বলে লেখাপড়া করতে পারেন নি এটা ছিল তাঁর খুব আক্ষেপের বিষয়। আবার পরবর্তীকালে জীবনসায়াকে পৌঁছে মেয়েদের সমাজজীবনে পরিবর্তিত অবস্থা দেখে তাঁর সানন্দ উক্তি : “এখন মেয়েছেলেদিগের কি সুন্দর কপাল। এখন মেয়ে জন্মিলে অনেকেই বিদ্যাশিক্ষার চেষ্টা করেন।” সেকালের মেয়েদের অবস্থার কথা ভেবে তিনি বেদনা বোধ করছেন, বলেছেন : “তখন আমাদের দেশে সকল আচার ব্যবহারই মন্দ ছিলনা, কিন্তু এই বিষয়টি ভারি মন্দ ছিল; সকলেই মেয়েদের বিদ্যা বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তখনকার মেয়েছেলেগুলো নিতান্ত হতভাগা প্রকৃত পশুর মধ্যে গণ্য হইবেক।” নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে তাঁর এই উপলব্ধি। তিনি অদৃষ্টকে বারবার দোষারোপ করেছেন, কিন্তু অদৃষ্টের কাছে আত্মসমর্পণ করেননি। যে-যুগে মেয়েদের হাতে কাগজ কলম ওঠা নিষিদ্ধ ছিল, সেই সময়েও অদম্য আগ্রহে তিনি পড়তে ও লিখতে শিখেছেন। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মেয়েদের অবস্থা দেখে তিনি খুশি হয়ে বলেছেন যে এখন মেয়েদের অবস্থা দেখে মন খুশিতে ভরে ওঠে।

যেকালে ৮/৯ বছর বয়সে বিয়ে হওয়া রেওয়াজ, সেই সময়ে রাসসুন্দরীর বিয়ে হয়েছিল বারো বছর বয়সে। সেকালের দিনে বারো বছরের মেয়ের বিয়ে সম্পর্কে ধারণা না থাকা একটু অস্বাভাবিক বলে মনে হয়। তিনি নিজেই বলেছেন, “সবলোকেই বলিত যে সকলের বিবাহ হইয়া থাকে, কিন্তু বিবাহের বিবরণ কি তাহা আমি বিশেষ কিছুই জানিতাম না। বিবাহ হয় এইমাত্র জানি।” নিজের বিয়ের কথা শুনে তার মনে খুব আনন্দ হয়েছিল কিন্তু পতিগৃহে যাত্রার সময় অশ্রু আর বাঁধ মানে না। বালিকাবধুর ছিন্নমূল হয়ে পিতৃগৃহ থেকে শ্বশুরালয়ে যাত্রার মর্মস্বন্দ বদনার কথা তার লেখনীতে ধরা পড়েছে। কিন্তু শুধুই কি বেদনা? উপমা প্রয়োগের মাধ্যমে সমাজের এই বিধানকে তিনি তির্যক আক্রমণও করেছেন। পতিগৃহে যাওয়ার বর্ণনা প্রসঙ্গে তার উক্তি, “যখন দুর্গোৎসব কি শ্যামাপূজায় পাঁঠা বলি দিতে লইয়া যায় পাঁঠা যেমন প্রাণের আশা ত্যাগ করিয়া মা মা বলিয়া ডাকিতে থাকে আমার মনের অবস্থাও তদ্রূপ হইয়াছিল।” একটি মেয়ে যখন আশৈশব পালিত নিজ গৃহ ছেড়ে পতিগৃহে যাত্রা করে সেই বালিকার করুণ কান্না পরিণত রাসসুন্দরীর কাছে বলির পাঁঠার আত্মনাদের মতই মনে হয় : “এখনও মনে পড়ে সেই সবদিন/পিজুরে পাখি বন্দী জলে বন্দী মীন। লোকে আমোদ করিয়া পাখি পিজুরে বদ্ধ করিয়া রাখিয়া থাকে, আমার যেন সেই দশা ঘটিয়াছে। আমি ঐ পিজুরে এ জন্মের মত বন্দী হইলাম। আমার জীবদ্দশায় আর মুক্তি নাই।” প্রাত্যহিক জীবনে তিনি হয়তো সুখ পান কিন্তু এই জীবন তাঁর কাছে কষ্টকৃত নয়। শ্বশুর বাড়ির যে সংসারে তিনি এসেছিলেন সেখানে তিনি অসুখী নন কিন্তু গতানুগতিকতায় আবদ্ধ, অভ্যাসের দাসত্ব তাঁর কাছে বন্দী জীবনের মতো। তাঁর সৌন্দর্যপিপাসু মন শিল্পসৃষ্টি করে আনন্দ পায়—“পাতর কাটিয়া ক্ষীরের ছাঁচ তৈরি করার জন্য সঞ্চ বানাইতাম, পা দিয়া ছিকা বানাইতাম। মাটি দিয়া পুতুল, ঠাকুর, মুদি, সাপ, বাঘ, শিয়াল, কুকুর, বিড়াল, মানুষ, গরু এবং পক্ষী ইত্যাদি যাহা দেখিতাম, তাহাই বানাইতাম।” যে মন অক্ষরের জগতে প্রবেশ

করতে চায় সে তো শুধু রান্না, খাওয়া, স্বামীকে তোষণ, পুত্র-কন্যাকে পালনের মধ্য দিয়ে তৃপ্ত হতে পারে না, তাই এ জীবনের বিরুদ্ধে তাঁর নীরব প্রতিবাদ মাঝে মাঝেই ঘুরে ফিরে আসে। তাঁর আত্নদান ধ্বনিত হয়।

অথচ তাঁর শ্বশুরবাড়ি অথবা শাশুড়ি সম্পর্কে কোনো অভিযোগ নেই। সেকালে বহু সংসারেই শাশুড়ি-বউ-এর সম্পর্ক ভাল থাকত না। ঠাকুর বাড়ির মতো বিখ্যাত পরিবারও এর ব্যতিক্রম ছিল না। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর স্মৃতিকথা থেকে জানা যায় যে বাড়ির দাসীদের কাছে শোনা কথার ওপর ভিত্তি করে শাশুড়ি জ্ঞানদানন্দিনীকে বকতেন। এ কথাটি সত্যেন্দ্রনাথেরও অজানা ছিল না। লন্ডন থেকে লেখা এক চিঠিতে তিনি জানতে চেয়েছিলেন, “মা কি এখনও তোমার সঙ্গে এক এক সময় কথা টথা কন না, আগেকার মত পৃথকই থাকেন।”

রাসসুন্দরীর শাশুড়ি সদ্যবিবাহিতা বালিকা রাসসুন্দরীকে কোলে টেনে নিয়েছিলেন পরম স্নেহে—“তাহার সেই কোল যেন আমার মায়ের কোলের মত বোধ হইতে লাগিল... আমার বাপের বাড়িতে সকলে আমাকে যে প্রকার স্নেহ ও যত্ন করিতেন এখানে তাহার অধিক স্নেহ যত্ন হইতে লাগিল। আমার শাশুড়ী ঠাকুরাণী আমাকে খেলার জন্য কত প্রকার জিনিস আনিয়া দিতেন।” শ্বশুরগৃহে তাঁর আদরের কোনো ক্রটি ছিল না—“পুত্র, কন্যা, দাস-দাসী অনুগত প্রজা, কুটুম্ব স্বজন, মান-সম্মত, আমোদ-আহ্লাদ প্রভৃতি সম্পর্কে লোকের যাহা ঘটতে পারে জগদীশ্বরের প্রভাবে আমার তাহা এক প্রকার মন্দ ছিল না।” তাঁর তিনজন নন্দ ছিল। সকলেই তাঁকে খুব ভালোবাসতেন।

সবই ভালো কিন্তু তবু মন মানেনা, কিসের যেন অভাব অনুভব করেন. এই অভাবই কি জীবনানন্দের সেই বিখ্যাত ‘বিপন্ন বিস্ময়’ যা সব কিছু মধ্যও ক্লাস্ত করে। তা না হলে নিজেকে কেন পোষা পাখি মনে হয় (“তাহাদের নিকট থাকিতে থাকিতে তাহাদের পোষাপাখি হইয়া তাহাদেরই শরণাগত হইলাম।”) আগেই বলেছি, এ জীবন তাঁর কাছে জালে আবদ্ধ মাছের মতো, খাঁচায় বন্দি পাখির মতো। মুক্ত বিহঙ্গের মতো আকাশে ওড়া অথবা অগাধ জলে সাঁতার কাটার স্বাধীনতা তাঁর নেই। স্বাধীনতা নেই বলেই মায়ের মৃত্যুসময়ে তিনি পিতৃগৃহে যেতে পারেন নি: “আমার মা মৃত্যুকালে আমাকে দেখিবার জন্য কতপ্রকার খেদ করিয়াছিলেন, আহা! আমি মাকে দেখিবার জন্য কতপ্রকার চেষ্টা পাইয়াছিলাম কিন্তু আমার দূরদৃষ্ট হেতু কোন ক্রমেই যাওয়া ঘটয়া উঠে নাই।” শ্বশুরবাড়িতে সাংসারিক কাজে অসুবিধা হবে বলে তাঁকে কোনো সময়েই পিতৃগৃহে পাঠানো হত না। যদি বা পাঠানো হত, দু-চার দিনের মধ্যেই তাঁকে ফিরে আসতে হত। বিয়ের পরে তিনমাস শ্বশুরবাড়িতে ছিলেন, তারপর তাঁর কাকা এসে তাঁকে নিয়ে যান। বিয়ের একবছর পরে তিনি শ্বশুরালয়ে ঘর করতে আসেন।

আজকের দিনে পিতৃতন্ত্র অথবা প্যাট্রিয়ার্কি শব্দটি বহুল প্রচলিত। রাসসুন্দরীর সময়ে নারীবাদের অনুযায়ে ব্যবহৃত এই শব্দটি ছিল ভাবনারও বাইরে। শব্দটি না থাকলেও পিতৃতন্ত্র ছিলনা এমন তো নয়। সেই সেকালেও নারী-পুরুষের অসাম্য রাসসুন্দরীর চোখে ধরা পড়েছে সেই অসাম্যের দেখা তিনি পেয়েছেন জীবনচর্যার বহুক্ষেত্রে, বিশেষ করে শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে—“সেকালে মেয়েছেলে দিগের স্বাধীনতা মোটেই ছিল না। নিজের ক্ষমতায় কোন কর্মই করিতে পারা যাইত না। সম্পূর্ণরূপে পরাধীন হইয়া কালযাপন করিতে হইত।” কবিতায়ও তিনি একই ভাবনা প্রকাশ করেছেন—“আমি নারী পরাধীন/তাহে পুনঃশক্তিহীন।” এই পরাধীন শক্তিহীন নারীর আত্মকণ্ঠ শোনা যায়—“আমি যদি পুত্র

হইতাম, আর মার আসন্ন কালের সংবাদ পাইতাম, তবে আমি যেখানে থাকিতাম, পাখীর মত উড়িয়া যাইতাম, কি করিব আমি পিঞ্জরদ্ধ বিহঙ্গ।”

মেয়েদের নানারূপ। পিতৃগৃহে কন্যারূপ, বিয়ের পরে প্রথম জীবনে বধূরূপ, তারপর সংসারে গৃহিণীরূপ এবং সর্বশেষে সন্তানের মা—এই তার পরিচয়। জীবনের পর্বে পর্বে এই রূপান্তর রাসসুন্দরী লক্ষ করেছেন। শাশুড়ির মৃত্যুর পর “আমার নতুনবো নামটি পর্যন্ত পরিবর্তিত হইল... কেহ বলিত মা, কেহ বলিত বউ, কেহ বলিত বউঠাকুরাণী, কেহ বলিত বাবুরমা, কেহ বলিত কর্তাঠাকুরাণী।” আর জীবনের অন্তিম পর্বে তিনি শুধুই মা—“আমার নাম মা, আমার পিত্রালয়ে যে নাম ছিল তাহা ত’ অনেক কাল লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এখন বিপিনবিহারী সরকার, দ্বারকানাথ সরকার, কিশোরীলাল সরকার, প্রতাপচন্দ্র আর কন্যা শ্যামাসুন্দরী—আমি ইহাদিগের মা। এখানে আমি সকলেরই মা।”

কেমন কাটত রাসসুন্দরীর সংসারজীবন? বারো বছর বয়সে বিয়ে হওয়ার পরে প্রথমে তিনি ছিলেন নতুন বউ। সংসারের কোনো কাজ তাঁকে করতে হতো না। শাশুড়ি দৃষ্টিহীন হলে শাশুড়ির সেবা সংসারের সব দায়িত্ব পড়ল তাঁর মাথার ওপর। বাড়িতে মদনগোপাল নামে বিগ্রহ আছেন, তার সেবার জন্য অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত করতে হয়। বাড়িতে অতিথি পথিক এলে তাদের জন্য বাড়ি থেকে সিঁধা পাঠাতে হয়। অনেক লোকের জন্য প্রতিদিন রান্না করতে হয়। ২৫/২৬ জন চাকর-চাকরাণী প্রত্যেক দিন ভাত খেতো। ফলে দুবেলাই রান্না করতে হতো। তাঁর স্বামী একমাত্র সন্তান তাই তার কোনো ভাসুর দেওর ছিল না। চাকরাণীদের মধ্যে একজন শুধু ঘরের কাজ করত, বাকি সবাই বাইরের কাজ করত। রাসসুন্দরীকে একাই সব কাজ করতে হত।

১৮ বছর বয়সে তিনি প্রথম সন্তানের মা হন। তার পরে ২৮, ৩০, ৩২, ৩৪, ৩৭, ৩৯ ও ৪১ বছরে ক্রমাগত সন্তানের জন্ম দিতে থাকেন। ১৮ বছরে প্রথম ও ৪১ বছরে সর্বকনিষ্ঠ সন্তানটির জন্ম হয়। “ঐ ২৩ বছর আমার যে কি প্রকার অবস্থায় গত হইয়াছে তাহা পরমেশ্বরের জানিতেন।” সংসারের সব কাজ করা, সন্তানদের পালন করা, গৃহদেবতার সেবার আয়োজন করা। সারাদিন শুধু কাজ। এক একদিন সন্ধ্যায় দশ/বারো সের চালের ভাত রান্না করতে হত। সন্তানরা ছোটো থাকাকালীন অনেক সময় তাঁর নিজের খাওয়ার অবসর হত না। বুঝতে অসুবিধা হয় না একটি সচ্ছল ধনী পরিবারের সর্বময় কত্রী হলেও নারীর পক্ষে তার কাঁধ থেকে পিতৃতন্ত্রের ভূতকে নামানো যায় না।

উনিশ শতকে মেয়েদের জীবন একটা বাঁধা ছকে চলত। দাম্পত্যের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ছিল না। মেয়েরা ঘর-গৃহস্থালীর কাজে করবেন, সন্তানপালন করবেন, স্বামীর কথা শুনে চলবেন—এভাবেই তাদের দিন কাটত। রাসসুন্দরীও তার ব্যতিক্রম নন। রাসসুন্দরীর স্বামীর নাম সীতানাথ সরকার। আত্মকথার প্রথম সংস্করণে তিনি স্বামী সম্পর্কে বিশেষ কিছুই বলেন নি। দ্বিতীয় সংস্করণে তিনি স্বামী সম্পর্কে কিছু কথা বলেছেন। স্বামীকে তিনি ‘বেশ লোক’ বলেছেন, তবে তিনি যে দেশাচার মেনে চলতেন তাও উল্লেখ করেছেন। দেশাচার মেনে না চলা যে খুব কঠিন ব্যাপার সেটাও রাসসুন্দরী বুঝতেন। তিনি লিখেছেন, মাথা নীচু করে পুরুষের সামনে দাঁড়িয়ে থাকলে সমাজ তাকে লক্ষ্মী মেয়ে বলে। রাসসুন্দরী সেই লক্ষ্মী মেয়েই ছিলেন। তাঁর স্বামী অনেক রাতে কাছারি থেকে ঘরে ফিরতেন। রাসসুন্দরী ভাত নিয়ে বসে থাকতেন। বাচ্চাদের কান্নায় ঘুম ভেঙে গেলে তাঁর স্বামী রেগে যেতেন, অথচ সাংসারিক কাজের জন্য রাসসুন্দরীর যে খাওয়াই হয়নি সে খবরও

তিনি রাখতেন না। রাসসুন্দরী শুধু স্বামীকেই সমীহ করতেন না, কর্তার ঘোড়া জয়হরিও তাঁর সমীহের পাত্র ছিল। শুধু কর্তা নয়, কর্তার ঘোড়ার সামনে যাওয়াও লজ্জার বিষয়।

একবার রাসসুন্দরী খুব অসুস্থ হয়েছিলেন। সেকালের প্রথা মতো তাকে ঘরের বাইরে বের করা হল। তিনি কিন্তু সব কথা শুনতে পাচ্ছিলেন। “বাটার কর্তাটি দ্বারে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘মোলো না কি?’” তবে তাঁর চোখ থেকে দরদর করে জল পড়ছিল। স্বামী সম্পর্কে তাঁর সুস্পষ্ট অভিমত—“তিনি অতি উত্তম লোক ছিলেন, তেমন একটি লোক বড় দেখা যায় না।” তিনি হস্তপুষ্ট ছিলেন। তাঁকে দেখলেই কর্তা বলে মনে হত। তিনি খুব দয়ালু এবং দাতা ছিলেন। তিনি খেতে বসলে যদি কেউ এসে বলত তার খাওয়া হয়নি তবে যতক্ষণ তাকে খেতে না দেওয়া হত তিনি খেতেন না। তিনি মামলা মোকদ্দমা খুব ভালোবাসতেন। সব সময়েই বিশ-পঁচিশটা মোকদ্দমা লেগে থাকত। অধিকাংশ মামলাতেই তিনি জয়ী হতেন। তাঁর ছিল দোদুলপ্রতাপ এবং গলার স্বর ছিল খুব ভারী। যখন কারোর ওপর বিরুদ্ধ প্রকাশ করতেন তখন গ্রামস্থ সকল লোকের কম্পিত কলেবর হত। একবার স্বামীর অনুপস্থিতিতে রাসসুন্দরী একটি মামলা নিষ্পত্তি করেছিলেন। ভীকু স্বভাবের রাসসুন্দরী স্বামীর রাগের ভয়ে কাতর হয়ে পড়লেও স্বামী কিন্তু ফিরে এসে তাঁর ওপর কোনো রাগই করেননি। রাসসুন্দরী বিশেষ করে উল্লেখ না করলেও মনে হয়, সে যুগের মানদণ্ডে এক পত্নীতে তুষ্ট, খুব সম্ভবত জমিদারসুলভ অন্যান্য আনুষঙ্গিক দোষমুক্ত তাঁর স্বামী মানুষ হিসেবে ভালোই ছিলেন। সে যুগে স্বামীকে ‘দেবতা’ বলে মেনে চলতে শিক্ষা দেওয়া হতো। রাসসুন্দরীর লেখায়, আশ্চর্যের কথা পতিভক্তির চিহ্নমাত্র নেই, বরং এক চাপা কৌতুকমিশ্রিত শ্রদ্ধার ভাব লক্ষ করা যায়; রয়েছে এক ধরনের নির্লিপ্ততাও—“বস্তুত কর্তা বিশেষ বড়লোক ছিলেন। তিনি অনেক সংকার্য করিয়া ইহলোক হইতে অবসৃত হন”... “আমার শিরে স্বর্ণমুকুট ছিল। কিন্তু এককাল পরে সেই স্বর্ণমুকুটটি খসিয়া পড়িল।” এখানে স্বামীর মৃত্যুশোকের থেকেও বিধবা নারীর সামাজিক মর্যাদা খাটো হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটি বড় হয়ে উঠেছে। তাঁর স্বরচিত কবিতায়ও তারই প্রকাশ : ‘শত পুত্রবতী যদি পতিহীনা হয়/তথাপি তাহারে লোকে অভাগিনী কয়।’

স্বামীর মৃত্যুশোক ছাড়াও একাধিক পুত্রকন্যার মৃত্যুশোকেও রাসসুন্দরী ভেঙে পড়েননি। একবার মাত্র মৃত্যুশোকেই তাকে উতলা হতে দেখা যায়। এখানে আশ্বেশব লালিত তাঁর প্রগাঢ় ঈশ্বরবিশ্বাস তাঁকে সাহায্য করেছে এবং মনে হয় বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সে বিশ্বাস আরও প্রবল হয়েছে। তাঁর লেখা প্রতিটি অধ্যায়ের শুরুই ঈশ্বরস্তুতি দিয়ে। তাঁর পৌত্রী সরলাবালা সরকার তাঁর স্মৃতিচারণায় (আমার ঠাকুরমা) লিখেছেন : “সমস্ত রাত্রি ঠাকুরমা বৃকের উপর মালা রাখিয়া বিছানায় শুইয়া মালা জপ করিতেন। আমি তাহার পাশে শুইয়া আছি, যখন জাগিয়াছি, দেখিয়াছি ঠাকুরমার ঠোট মুদু মুদু নড়িতেছে, ধীরে ধীরে মালা সরাইতেছেন।”

এই প্রবল ও অবিচল ঈশ্বরভক্তির জন্যই রাসসুন্দরী মৃত্যুজনিত শোকতাপের মতই তার নারীজীবনের যাবতীয় তিক্ত অভিজ্ঞতাকেও ঈশ্বরের অলঙ্ঘনীয় বিধান বলে নিজেকে সান্ত্বনা দিতে চেয়েছেন, সমাজ-নির্দিষ্ট নারীর সব কর্তব্য নীরবে পালন করে গেছেন, কিন্তু

মন থেকে মেনে নিতে পারেন নি, একটু কৌতুক করেই যেন, তাঁর ঈশ্বরকে যাত্রাদলের অধিকারীর সঙ্গে তুলনা করে বারবার তাঁকে “হে অধিকারী মহাশয়” বলে সম্বোধন করেছেন। আবার কবিতার ভাষায় অনুযোগের সুরে বলেছেন, “সাপ হয়ে কামড়াও, ওঝা হয়ে ঝাড়/হাকিম হয়ে হুকুম দাও, পেয়াদা হয়ে মার।”

আসলে কান পাতলে, ‘আমার জীবন’-এর বহিঃপাঠের অন্তরালে একটি ধারাবাহিক প্রতিবাদের সুর শুনতে ভুল হয় না। এই আড়ালটুকু সেদিনের পরিপ্রেক্ষিতে হয়তো অনিবার্য ছিল। মনে হয় অনেক কথা তিনি শেষ পর্যন্ত বলতে চেয়েও বলেননি। তবু যেটুকু বলেছেন তাই বা কম কী? সে যুগে এরকম আত্মজীবনী কোনো নারী লিখেছেন যার নাম ‘আমার জীবন’? তাঁর নিজের জীবন তাঁর নিজস্ব নারীসত্তা সম্বন্ধে তাঁর বলিষ্ঠ সচেতনতা আমাদের চমকে দেয়। পিতৃপরিবার ও বিবাহসম্পর্কিত পরিবারের বাইরে সবার উপরে তাঁর যে একটি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত নাম পরিচয় আছে এবং সেটি তাঁর নিজের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ তা বোঝাতে তিনি ভোলেননি। ‘আমার জীবন’-এর প্রতিটি অধ্যায়ের শুরুতে তাঁর রচিত কবিতার শেষে ভগিতা হিসেবে তাঁর রাসসুন্দরী নামটি পাঠকের দৃষ্টি এড়ায় না। তাঁর নিজের জন্ম তারিখ, তাঁর সম্ভান-সম্ভতির জন্ম সাল তাঁর নিখুঁতভাবে জানা। তাঁর নারী-পরিচয়ের সামাজিক সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে তিনি পূর্ণমাত্রায় সচেতন। তাঁর জীবন যে আদৌ তুচ্ছ নয়, তাঁরও যে কিছু বলার আছে, সমাজের কাছে তা জানাবার উদ্দেশ্যেই তাঁর কলম ধরা, সে যুগে তাঁর লেখা কতজন পড়েছিলেন, তাদের প্রতিক্রিয়াই বা কী ছিল জানা নেই, কিন্তু বইটির পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় একটি সংস্করণ বেরিয়েছিল আর তার ভূমিকা লিখেছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৮৮ বছর বয়স্ক এক মফস্বল গ্রামবাসিনীর লেখার অকুণ্ঠ প্রশংসা তিনি করেছেন। কিন্তু তাঁর চোখে রাসসুন্দরীর নারীজীবনের নিজস্ব দুঃখকষ্ট নয়, রাসসুন্দরীর প্রবল ধর্মভাবই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। সে যুগে এটাই হয়তো স্বাভাবিক ছিল। আজকের দিনে মানবীবিদ্যার সামান্যতম আগ্রহী পাঠকের কাছে প্রবল ধর্মীয় খোল-করতালের ধ্বনি ছাপিয়ে একটি নারীর নীরব কান্না শব্দময় হয়ে উঠেছে।

সহায়ক গ্রন্থ

১. রাসসুন্দরী দাসী, আমার জীবন, বারিদবরণ ঘোষ (স.), ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট ইন্ডিয়া, ২০১০
২. চিত্রা দেব, অস্তঃপুরের আত্মকথা, পঞ্চম মুদ্রণ, ১৯৮৪, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৩. শতাব্দী সাহিত্য পরিক্রমা, অলক রায় (স.), অব্যয় লিটারারি সোসাইটি, ২০১৩
৪. তনিকা সরকার, ওয়ার্ডস টু উইল, দ্য মেকিং অব এ মডার্ন অটোবায়োগ্রাফি, জুবান, নিউদিল্লি, ২০১৩
৫. ‘রাসসুন্দরীর জীবন’, এনাস্কী চট্টোপাধ্যায়, চতুর্দশ, ৭ সেপ্টেম্বর ২০১০
৬. ‘আমার ঠাকুরমা’, রচনা সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, সরলাবালা সরকার, চিত্রা দেব (স.) প্রথম সংস্করণ ১৯৮৯
৭. রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা, আশ্বিন-অগ্রহায়ণ, ১৪০২
৮. হারানো অতীত, সরলাবালা সরকার, বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৩৬০

কবি চন্দ্রাবতী ও তাঁর রামায়ণ

পম্পা দাস কান্ত

‘Chandraboti composed a Ramayana which told only the story of Sita and critiqued Rama from a women’s point of view’—Nabaneeta Dev Sen

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের আঙিনায় তখন পুরুষের একাধিপত্য। মনসামঙ্গলের প্রখ্যাত কবি দ্বিজ বংশীদাসের বিদূষী কন্যা চন্দ্রাবতী, মায়ের নাম সুলোচনা। পিতার নির্দেশে অনুবাদ করতে বসেও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভঙ্গিমা, নিজস্ব ভাষায় নির্মাণ করলেন সে যুগের একটি ব্যতিক্রমী রচনা। শোড়শ শতাব্দীতে কবি চন্দ্রাবতীর প্রধান সৃষ্টি রামায়ণ মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে একক ঘোষণায় উজ্জ্বল। চন্দ্রাবতীর রামায়ণকে পালাবদ্ধ গীত বলা যায়। পূর্ববঙ্গের অধিবাসী চন্দ্রকুমার দে পল্লীনারীদের কণ্ঠ থেকেই এই পালাগান সংগ্রহ করেছিলেন। চন্দ্রাবতী-রামায়ণের কলেবর অন্যান্য রামায়ণের তুলনায় অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত বলেই, সীমিত বলেই গ্রামের মহিলাদের কণ্ঠে এটি গাওয়া সম্ভবপর ছিল। ১৩২০ বঙ্গাব্দের ‘সৌরভ’ পত্রিকার পঞ্চম খণ্ডে (পৃ. ১৪০) লেখা আছে—

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষে পূর্ববঙ্গে ময়মনসিংহের ফুলেশ্বরী নদীর তীরে রামকথার করুণ রসের মধুর তান তুলিয়া ধরিয়াছিলেন কবি চন্দ্রাবতী। শোনা যায়, কবি চন্দ্রাবতীর রামায়ণখানি ময়মনসিংহের মহিলাদের সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত গান গাইবার প্রধান উপজীব্য ছিল।

ময়মনসিংহ অঞ্চলে মহিলাদের মুখে মুখে এখনও চন্দ্রাবতী-রামায়ণের অংশেবিশেষ গাওয়া হয়। বিশেষ করে বিয়ের সময়, যখন মহিলারা বরের জন্য স্নানের জল আনতে চান অথবা বাসরঘরে বর-কনের কড়ি খেলার সময় চন্দ্রাবতীর রামায়ণ গান গাওয়া হয়।

বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম রামায়ণটি ছিল পঞ্চদশ শতকের কবি পণ্ডিত কৃষ্ণিবাস ওঝা বিরচিত ‘শ্রীরামপাঁচালি’। প্রায় সমসাময়িক হলেও চন্দ্রাবতী তাঁর রামায়ণে কৃষ্ণিবাসী রামায়ণের বেশিরভাগ কাহিনিই বর্জন করেছেন। কৃষ্ণিবাসী রামায়ণের বিষয়বৈচিত্র্য আর ব্যাপ্তি (কলেবরগত) এই রামায়ণে পাওয়া যায় না। এদিকে, কৃষ্ণিবাসকেও কিন্তু বাস্কিকির রামায়ণের বাংলা-অনুবাদক বলা যায় না। তিনি বাংলা রামায়ণের প্রথম রূপকার। প্রথমত, তিনি একজন পুরুষ। তাই সেই পুরুষের চোখ দিয়েই রামায়ণকে দেখেছেন, ভেবেছেন, লিখেছেন। তাঁর রামায়ণে সমসাময়িক প্রকৃত বাঙালি জীবনের প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। চন্দ্রাবতীও বাঙালি ব্রাহ্মণকন্যা। তিনিও মধ্যযুগীয় বাঙালির জীবনকেই দেখেছেন—কিন্তু একজন নারীর চোখ দিয়ে, একজন বার্থ প্রেমিকার চোখ দিয়ে। দ্বিতীয়ত এবং মুখ্যত কৃষ্ণিবাসী রামায়ণে মূল উপজীব্য বিষয় হয়ে উঠেছে ‘রাম’, সেখানে চন্দ্রাবতীর রামায়ণের মূল সুরটি কিন্তু বাঁধা রয়েছে ‘সীতা’র

দৈনন্দিনতায়। হয়তো কবি চন্দ্রাবতী আসলে রামায়ণ নয়, রচনা করতে চেয়েছিলেন ‘সীতায়ন’।

ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব কবি চন্দ্রাবতীর জীবনবৃত্ত পাঠকের সামনে উঠে এসেছে গীতিকা ও জনশ্রুতির হাত ধরে। চন্দ্রাবতীর গুণমুগ্ধ গ্রামীণ কবি নয়ানচাঁদ ঘোষ তাঁর গাথাকাব্য ‘চন্দ্রাবতী’-তে কবির সম্পূর্ণ জীবনকাহিনি তুলে ধরেছিলেন। ব্রাহ্মণকন্যা চন্দ্রাবতীর বাসস্থান ছিল ময়মনসিংহ জেলার ‘চম্পা নাগেশ্বর’ গ্রামে। কবির বাল্যসখা জয়ানন্দও ব্রাহ্মণ। বাল্যজীবনেই তাঁরা পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হন। তাঁদের প্রণয়কথার রোমান্টিক বর্ণনা রয়েছে গাথাকাব্যটিতে। জয়ানন্দ পত্র লেখেন প্রেয়সীকে—

তোমার গাথা মালা লইয়া কন্যা কান্দিলো বিরলে।
পুষ্পবন অন্ধকারে তুমি চল্য গেলে।।

... ..
তুমি যদি লেখ পত্র আশায় দেও ভর।
যোগল পদে লইয়া থাকবাম তোমার কিঙ্কর।।

একসময় জয়ানন্দ-চন্দ্রাবতী প্রণয়ের শেষ পরিণতি হিসেবে বিবাহের সিদ্ধান্ত নেন। পিতা দ্বিজ বংশীদাসের সম্মতিতেই বিয়ের দিন ঠিক হয়, প্রস্তুতিও চলতে থাকে। এমন সময় প্রায় বিনা মেঘে বজ্রপাত। জয়ানন্দ আশমানি নামে এক মুসলমান সুন্দরী কন্যার রূপে মুগ্ধ হলেন। এখানেও সেই চিঠি লেখালেখির পর্ব। এখন আর জয়ানন্দ আশমানিকে ছাড়া বাঁচবেন না। এদিকে চন্দ্রাবতী তো কিছুই জানেন না। বৈশাখ মাসে শুভদিনে বিয়ের লগ্ন। বিয়ের ঢোলের শব্দ আশমানির কানে যেতেই সে তো কাজীর কাছে হাজির জয়ানন্দের চিঠি নিয়ে। কাজীর বিচারে পেয়াদা এসে জয়ানন্দকে ধরে এনে ধর্মান্তরিত করে। তারপর বিয়ে—

জয়ানন্দের সঙ্গে হইল আশমানির বিয়া।
জয়ানন্দ হইয়া গেল জয়নাল মিয়া।।

ভাবীকালের কবি চন্দ্রাবতী, নারী চন্দ্রাবতী পাথর হয়ে গেলেন। ধীরে ধীরে জীবনপ্রবাহ বাঁক নিল অন্যদিকে। পিতার অনুমতিক্রমে শিবের আরাধনা আর বিদ্যাচর্চায় মগ্ন হলেন। মন্দির থেকে বাসগৃহ—এই হলো তাঁর চলার পথ। পিতার নির্দেশেই শুরু হলো রামায়ণ রচনা। বাংলার প্রথম মহিলা কবির রামায়ণ চর্চা।

এভাবে তিনটে বছর কেটে গেল। এক বৈশাখে জয়ানন্দ ফিরে আসে—ভুল কৃতর্মের স্বীকারোক্তিতে ভরা এক পত্র পাঠায় চন্দ্রাবতীকে। সে জানে এ ভুলের ক্ষমা হয় না, তবু সে ক্ষমাপ্রার্থী। শুধু একবারের জন্য সে চন্দ্রার দর্শন চায়। একটু চোখের দেখা দেখেই সে চিরকালের জন্য বিদায় নেবে। চন্দ্রাবতী এ চিঠি বারবার পড়ে, সাময়িক দুর্বলতায় বাবাকে চিঠি দেখায়, অনুমতি চায়। কিন্তু যার জন্য বেঁচে থাকতেই মৃত্যু হল কন্যার, তাকে কীভাবে মেনে নেবেন সেই নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। পিতার অসম্মতি জানিয়ে চন্দ্রাবতী

চিঠি পাঠায় জয়ানন্দকে, নিজেকে মগ্ন করে দেবতার আরাধনায়। জয়ানন্দ অস্থির, অপ্রকৃতিস্থপ্রায়। আশমানির পরিবার তাকে দিনরাত সতর্ক পাহারায় রাখে। একদিন শ্রাবণরাতে জয়ানন্দ আবার আসে চন্দ্রাবতীর মন্দিরদ্বারে।—

দ্বার খোল দ্বার খোল চন্দ্রা ধরি তোর পাও।
এই জনমের মত চন্দ্রা একবার শেষ দেখা দেও।
চন্দ্রা, ধরি তোমার পাও।।

ঝড়বাদলের রাতে জয়ানন্দের কোনো কথাই চন্দ্রাবতীর কানে পৌঁছয় না। নিরুপায় জয়ানন্দ দরজার উপরেই চিঠি লিখে চিরদিনের জন্য বিদায় নিল। ভোরবেলায় সে চিঠি দেখে চন্দ্রাবতীর চোখ ভেসে যায় জলে। কলসি নিয়ে স্নান-তর্পণের জন্য নদীর ঘাটে যেতেই তার চোখে পড়ে সেই মর্মাস্তিক দৃশ্য—

একেলা জলের ঘাটে কন্যা সঙ্গে নাইত কেহ।
জলের উপর দেখে ভাসে জয়ানন্দের দেহ।।

জনশ্রুতিতে মেলে এরপর শোকে দুগ্ধে জর্জরিত বিরহী চন্দ্রাবতী আর বেশিদিন জীবিত ছিলেন না। ধারণা করা যায়, হয়তো জয়ানন্দের আত্মহত্যার আগেই চন্দ্রাবতী ‘রামায়ণ’ রচনা করে গেছেন। আর, যে মুন্সিয়ানার সঙ্গে তিনি তাঁর নিজের জীবনের ট্রাজিক অনুবন্ধ মিলিয়ে দিয়েছেন তাঁর রচিত রামায়ণে, নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণায় প্রায় অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় সেই সার্থক মিশ্রণ সম্ভব হতো না।

অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সেনের মতে, পূর্ব-ময়মনসিংহের উন্নত সাহিত্যচর্চার মূলে একটি রাষ্ট্রনৈতিক কারণ অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে এই এলাকা গুপ্ত-সম্রাটদের অধীন ছিল। তারপর এই প্রদেশটি গুপ্ত-শাসন থেকে স্বতন্ত্র হয়ে প্রাগজ্যোতিষপুরের অন্তর্গত হয়। কামরূপের শাসনে এই দেশটি এক সময়ে হিন্দুধর্মের একটি প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে। প্রাগজ্যোতিষপুরের প্রভাব ও মুসলমান-বিজয়ের অন্তর্বর্তী দুই-তিন শতাব্দী ধরে অপর একটি রাষ্ট্রীয় মহাশক্তি পূর্ব-ময়মনসিংহ দেশটিকে গ্রাস করতে চেয়েছিল। কিন্তু এই সেনবংশীয় রাজারা পশ্চিম-ময়মনসিংহ অধিকার করলেও নদী-নালা-খাল-বিল সমৃদ্ধ পূর্বপ্রদেশটি কিছুতেই আয়ত্ত করতে পারেনি। তাই, পূর্ব-ময়মনসিংহ চিরকালই সেনবংশ প্রতিষ্ঠিত নব ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও কৌলীন্য থেকে নিজের স্বাতন্ত্র্যকে রক্ষা করতে পেরেছিল। পূর্ব-ময়মনসিংহের হিন্দুধর্ম ছিল উদার, এখানে বৌদ্ধ কর্মবাদ ও হিন্দু নিষ্ঠার এক অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটেছিল। এই হিন্দুধর্মে বঙ্গাল সেন প্রবর্তিত ‘গৌরীদাস’, আচার-বিচারের চুলচেরা হিসাব, অস্পৃশ্যতা ও ভক্তিবাদের আতিশয্য ছিল না। শ্রীসেন বলেছেন—

পূর্ব-ময়মনসিংহের সাহিত্য বঙ্গদেশের অপরাপর স্থানের মতো নহে। এখানে শাস্ত্রের অনুশাসন বাঙালীর ঘরগুলিকে এতটা আঁটাআঁটি করিয়া বাঁধে নাই। এখানে পাষণচাপা অত্যাচারের ফলে প্রেমে বিদ্রোহবাদের সৃষ্টি নাই। এখানে ঘরের জিনিষকে শিকল দিয়া ঘরে বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা দেখা যায় নাই এবং রমণীদের জন্য পিঁজরা তৈরি হয় না।^১

এহেন প্রদেশের সন্তান চন্দ্রাবতী যে দয়িতের বিরহে কেঁদেকেটে জীবনটাকে জলাঞ্জলি না দিয়ে পিতার নির্দেশে ‘রামায়ণ’ রচনা করবেন—এতে আশ্চর্যের কিছু নেই।

নারীরা মহাকাব্যে আসে কর্ম হয়ে, কর্তা হয়ে নয়। ‘কর্তার ইচ্ছেই কর্ম’, অতএব যে-কোনো মহাকাব্যে নারীর ভূমিকা পরোক্ষ, প্রত্যক্ষ নয়। মহাকাব্যের ঐতিহ্য অনুযায়ী কোনো বীরগাথা শুরু হয় নায়কের অতি-প্রাকৃত জন্মদৃশ্য দিয়ে। আমাদের পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় সেটাই ছিল কাহিনির গড়ন। চন্দ্রাবতী কিন্তু তাঁর

মহাকাব্যে সীতার জন্মকাহিনি দিয়ে তাঁর রামায়ণ আরম্ভ করেছেন। প্রচলিত প্রথা ভেঙেছেন প্রথমেই। এই আখ্যানে যেহেতু দেখানো হয়েছে যে সীতার জন্ম শুধুমাত্র রাবণবংশ ধ্বংসের কারণে, তাই তাঁর জন্মকথাই তো প্রথমে থাকবে। এই সীতার শৈশব, কৈশোর, যৌবন ইত্যাদি বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গেই তো কাহিনি বিস্তারের প্রয়োজনে অন্যান্য চরিত্রের আবির্ভাব হবে। তাই রামের জন্মও এখানে সীতারই প্রয়োজনে। বলা যায়, রাবণবধের কাহিনি বিস্তারের প্রয়োজনে। অতএব, রাম এখানে প্রথম থেকেই গৌণ।

সংক্ষিপ্ত আকারের তিনটি খণ্ডে সীমায়িত চন্দ্রাবতীর রামায়ণের মূল সুরটি যে তারে বাঁধা সে তারটি যেন প্রথম থেকেই গাইছে—‘আজিকে যে রাজাধিরাজ কাল সে ভিক্ষা চায়’—অর্থ, ঐশ্বর্য, ক্ষমতা—সব জাগতিক সুখলাভই জীবনের মূল উদ্দেশ্য হতে পারে না। জীবনের মূলধন অন্য কিছু, অন্যতর কিছু। এমন একটি শুভবোধই এই রামায়ণের আবহ। প্রথম খণ্ডে সীতার অতি-প্রাকৃত জন্মকথা দিয়ে মহাকাব্যের সূচনা। দ্বিতীয় খণ্ডটিতে ‘সীতার বারোমাসি’-তে বর্ণিত হয়েছে তাঁর শৈশব, বিবাহ, বনবাস, রাক্ষসগৃহে বন্দিজীবন এবং সীতা-উদ্ধার। সবশেষে তৃতীয় খণ্ডের বর্ণনায় সীতার অন্তঃসত্ত্বা অবস্থা, নির্বাসন, বনের মাঝে সন্তানদের জন্ম, সন্তানদের মাঝে সীতার অবমাননা। সবশেষে বসুন্ধরার গর্ভে সীতার পুনঃপ্রবেশ ও কাব্যের পরিসমাপ্তি।

প্রথম খণ্ডে মোট আটটি অনুচ্ছেদ। প্রথম ছয়টি মন্দোদরীর জটিল প্রসব কাহিনি ও সীতার জন্মকথা বর্ণিত। ব্রহ্মার বরে বলীমান হয়ে রাক্ষসকুলজাত রাবণ ত্রিভুবন অস্থির করে তুলেছিলেন, দেবতা-বিনাশের উদ্দেশ্যে তিনি একটি পাত্রের মধ্যে মুণি-ঋষিদের বুকের রক্ত সংগ্রহ করে রেখেছিলেন। ব্রহ্মরক্তপান তো বিষপানের সমান। এদিকে রাবণ স্বর্গ থেকে দেবকন্যাদের অপহরণ করে লক্ষ্মায় এনে রেখেছেন। তাঁর প্রেমলীলায় রানি মন্দোদরী ভীষণ অপমানিত। উপেক্ষিতা মহিষী সেই যন্ত্রণায় পাত্র থেকে তপস্বীদের রক্ত পান করলেন মৃত্যুবরণ করবেন বলে। কিন্তু তা তো হল না। পরিবর্তে তিনি একটি ডিম্ব প্রসব করলেন।

গণংকারের ঘোষণা—‘এই ডিম্ব থেকে জন্ম নেবে এক কন্যা, সেই হবে সমগ্র রাক্ষসকুলের ধ্বংসের কারণ।’ রাবণ তো ডিমটিকে ভেঙেই ফেলবেন—কিন্তু মন্দোদরী বাধা দিলেন, মায়ের প্রাণ তো! রাবণ নিরুপায় হয়ে সোনার কৌটোয় ভরে ডিমটি সাগরে ভাসিয়ে দিলেন। বঙ্গোপসাগরের ঢেউয়ে ভেসে ভেসে সোনার কৌটো অবশেষে জনকরাজার দেশে এসে পৌঁছল। অতি দরিদ্র, কিন্তু সচ্চরিত্রের জেলে মাধব সেটি পেয়ে স্ত্রী সতীর হাতে তুলে দেয়। ধার্মিক দম্পতি অলৌকিকভাবে পাওয়া সেই কৌটোকে পূজো করতে থাকে। ডিমের ভিতরে গুপ্ত সীতা-রূপিণী মা লক্ষ্মীর কুপায় দরিদ্র দ্বীবরের অর্থাভাব ঘুচে যায়। একদিন লক্ষ্মীদেবী সতাকে স্বপ্নে নির্দেশ দেন ডিমটিকে জনকরাজার মহিষীর হাতে অর্পণ করার জন্য। দৈবনির্দেশ পালন করে সতা রানিকে একটিমাত্র অনুরোধ করেন যে, জন্মের পর কন্যার নাম যেন তাঁরই নামের সঙ্গে মিলিয়ে ‘সীতা’ রাখা হয়। যথাসময়ে ডিম থেকে জন্ম হয় সীতার।

স্বর্গে মর্ত্যে জয় জয় গো, সুর-নরগণে।

ইহল লক্ষ্মীর জন্ম গো মিথিলা ভবনে।।

সতার নামেতে কন্যার নাম রাখে গো, সীতা।

চন্দ্রাবতী কহে গো, কন্যা ভুবন বন্দিতা।।

সপ্তম পরিচ্ছেদে কবি ঘোষণা করেছেন রামের জন্মসূচনা—অতিসংক্ষেপে। অষ্টম পরিচ্ছেদে রয়েছে দশরথের পুত্রকন্যাদের জন্মকথা।

কৌশল্যা রাখিল নাম গো, কান্দালের ধন।
দশরথ নাম রাখে গো, অযোধ্যাভূষণ।

...
...
...
ধ্যানেতে জানিয়া বশিষ্ঠ গো ঋষি তপোবন।
রামচন্দ্র নাম রাখে গো জাইন্যা নারায়ণ।।

অত্যন্ত মুঙ্গিয়ানার সঙ্গে রামের প্রকৃত পরিচয়টি উদ্ঘাটন করেছেন চন্দ্রাবতী। কোনোরকম পূর্বকথার প্রয়োজন নেই। গাথাকাব্যের শ্রোতা এটুকু জেনেই তো তৃপ্ত যে রাম হলেন নারায়ণ, সীতা হলেন লক্ষ্মী। কাজকর্মের ফাঁকে রামকথা—সম্পর্কের তত্ত্ববিশ্লেষণে নয়। ক্লাইম্যাক্সের শুরু কিন্তু রামের জন্মলগ্ন থেকেই।

দিনে দিনে বাড়ে কইন্যা গো, যেমন বক্ষফলা।
বাইছ্যা গুইছ্যা কুকুয়া নাম গো, মস্থরা রাখিলা।।
লক্ষ্মীর অধিষ্ঠানে আইস্যা গো অলক্ষ্মী জনমিল।
অমৃত ফলের তিতাবীজের গো, ফল যে ফলিল।।

চন্দ্রাবতীর উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি এই কুকুয়া চরিত্রটি। এখানে নামের মধ্যেই দু-বার ‘কু’ শব্দটি ইঙ্গিতবহনকারী। সীতারূপী লক্ষ্মীর পাশে ‘কনট্রাস্ট’ তৈরি করে দিয়েছেন কবি কুকুয়ারূপী অলক্ষ্মীকে রেখে। অতিলোভে অমৃতফল পেয়েও তৃপ্ত হননি কৈকেয়ী—তেতোবীজটিও ভক্ষণ করেন—তারই ফলস্বরূপ এই কুকুয়ার জন্ম।

দ্বিতীয় খণ্ডে কথক পরিবর্তন ঘটেছে এবং মূল আখ্যানের মধ্যে যেন একটি গৌণ আখ্যান দেখা দিয়েছে। সীতা স্বয়ং এবার কথক। লঙ্কাকাণ্ডের পর অযোধ্যায় ফিরে এসে শ্রীরামচন্দ্র রাজা হয়েছেন, সীতা রাজ্যের পাটরানি। একদিন রাজপ্রাসাদের অন্দরমহলে সখী পরিবৃত্তা হয়ে সীতা বসে আছেন। সখীরা তাঁকে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সম্পর্কে নানা প্রশ্ন করেছেন। লঙ্কা-প্রত্যাগত সীতা সহজ সচ্ছন্দ ভঙ্গিতে বলে চলেছেন তাঁর শৈশব, বিবাহ, রামের সঙ্গে দাম্পত্য কথা, বনবাস ও লঙ্কায় অপহৃত অবস্থার দিনগুলির কথা। প্রায় সম্পূর্ণ রামায়ণ, বালকাণ্ড থেকে যুদ্ধকাণ্ড পর্যন্ত, এইখানে বারমাস্যার ছন্দে ধরা পড়ে আছে। বর্তমানে সীতা ও তাঁর সখীরা রয়েছেন উত্তরকাণ্ডে, সেখান থেকে সবটাই সীতার বয়ানে ফ্ল্যাশব্যাকে উপস্থাপিত। এই খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে মেয়েদের নিজস্ব বৃত্তের মধ্যে একান্ত আলাপচারিতায় উঠে এসেছে পুরুষশাসিত সমাজের বঞ্চনার কথা, অনুশাসনের কথা, এমনকি সোহাগের কথাও। সূচনাতেই কবি জানিয়ে রেখেছেন যে রাম এক অবিসংবাদী চরিত্র, যদিও তাঁর গুণরাজির বিশদ বিবরণে তিনি যাননি—যেহেতু তাঁর মূল উদ্দেশ্য সীতার জীবনের কথা বলা, অনুভবের ছবি আঁকা। পূর্ববর্তী রামায়ণগুলিতে (পুরুষরচিত) ‘রাম’ চরিত্রে দেবত্ব আরোপ করা হয়েছিল, সীতা সাক্ষাৎ কমলা হলেও তাঁর দৈবক্ষমতাকে দু-একটি ক্ষেত্র ছাড়া বিশেষভাবে প্রকাশ করা হয়নি, সেখানে সীতা যেন অনেকটাই রামের ছায়াসঙ্গিনী। কিন্তু চন্দ্রাবতীর রামায়ণে সীতাই অনেক বেশি ঐশীশক্তি সম্পন্ন। প্রত্যক্ষভাবে না হলেও, তিনিই বুঝি ভাগ্য নিয়ন্ত্রক। প্রতিটি ঘটনার সূচনায় সীতা স্বপ্ন দেখছেন এরপর কী ঘটবে আর সেটা ঘটেও যাচ্ছে। তাঁর নারীচরিত্রের কমনীয়তা বজায় রাখতে গিয়ে সরাসরি দৈববাণী করার চেয়ে তাঁকে স্বপ্নবলে বলীয়ান করে তোলাই শ্রেয়—সীতা অনেকটাই ক্ষমতাশালিনী, কিন্তু তাও দেখো তাঁর কত দুঃখ! এমনটা না হলে সীতাই বা সমাজে খেয়ে পরে বেঁচে থাকবেন কী করে? রামায়ণের মূল কাহিনি তো অধিকাংশ পাঠক-শ্রোতারই জানা—তাই ছোটো ছোটো আঁচড়েই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার ছবি এঁকে দিয়েছেন চন্দ্রাবতী। রাজ্যবিলাসের আড়ম্বর নয়, তিনি স্পর্শ করতে

চেয়েছেন সীতার যন্ত্রণার কেন্দ্রবিন্দুকে প্রায় ছোটো গল্পেরই ধাঁচে, উপন্যাসের ঘনঘটায় নয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের শিরোনাম—‘সীতার বারোমাসি’। এই পর্বে সীতার কথনেই তাঁর সুখের দিন, তাঁর দুখের রাতের ছবি আঁকা হয়েছে। নারী আর প্রকৃতির মধ্য অদ্ভুত এক সখ্য—তাই ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই নারীর মনেও বিভিন্ন আলোড়ন, উত্তেজনা, আবেগ। সবকিছুই যেন পরিবর্তনশীল। সীতার আরণ্যক জীবনের সুখদুঃখ, ভালোমন্দ—সবই যেন আবর্তিত হয়েছে প্রকৃতির সাজ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই। সীতার বনবাসের চোন্দো বছরের ঘটনা বিবৃত হয়েছে এই পরিচ্ছেদে। গ্রীষ্মকালে পথকষ্ট পেয়েছেন সীতা, তাঁর সব ক্লান্তি ভুলিয়ে, ব্যথায় প্রলেপ দিয়ে সুস্থ করে তুলছেন রাম-লক্ষ্মণ—দুই ভাই। রাম এখানে সীতার অনুরাগের রঙে মাখা এক পবিত্র চরিত্র। তাঁর চাঁদমুখটি দেখে সীতার সুখনিদ্রা আসে। সেই রাম যখন সোনার হরিণ ধরতে যান, তাঁর বিপদের আশঙ্কায় সীতা উৎকণ্ঠিত। সীতা লক্ষ্মণকে ভরসনা করে রামকে খুঁজতে পাঠাচ্ছেন, লক্ষ্মণ দ্বিধাগ্রস্ত—এমন কোনো ঘটনার কথাই এখানে উল্লেখ করেননি কবি। সীতা রামের জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে লক্ষ্মণকে তাড়াতাড়ি রামের কাছে যেতে বলেছেন, স্বাভাবিকভাবেই, একবারই। লক্ষ্মণ কোনো গুণ্ডিও কাটেননি। ঘটনা পরম্পরা এখানে অত্যন্ত সাধারণ ছন্দে দ্রুত গতিতে এগিয়েছে। রাবণের সীতাহরণের পরে জটায়ু চরিত্রটিও এই রামায়ণে অনুপস্থিত। বর্ষাকাল আসে। প্রকৃতির কান্না আর সীতার চোখের জল মিলেমিশে একাকার। বিরহকাতর দুঃখময় জীবনের পরিসমাপ্তি চান তিনি—

বিষ খাই জলে ডুবি গো আমি বুঝিতে না পারি।

সাস্থ্যনা করিয়া রাখে গো এক সরমা সুন্দরী।।

—এইটুকু কথাত্তেই সরমার চরিত্রটি কবি বুঝিয়ে দিলেন। প্রয়োজন নেই তাঁকে বিভীষণের স্ত্রী হিসেবে পরিচিত করানোর। নিজ গুণেই সরমা প্রিয় হয়ে উঠবেন পাঠক-শ্রোতার কাছে। বেশিরভাগ সময় সীতা কিন্তু সুখের স্বপ্নই দেখছেন। কোনো অঘটনের কথা আগে থেকে জানতে পারছেন না। পারলে রাবণ তাঁকে হরণ করলেন কী করে? আসলে সীতার মতো নির্মল চিন্তার মানুষ কীভাবে স্বপ্নতেও মন্দ ঘটাবেন—তাঁর সব চিন্তা রামকে ঘিরে। শ্রীকৃষ্ণের রাখার মতো তিনি রামকে নিয়েই সম্পৃক্ত। সীতা রাষ্ট্রনীতি বোঝেন না, দৈবনির্ভর জানেন না, কে কীসের লোভে বা কার অভিশাপে কোন্ কাজ করছে সেসব খবর তো তাঁর জানার কথা নয়। তিনি শুধু বিশ্বাস করেন ফুলের মতো এমন একটি মেয়েকে উদ্ধার করতে সবাই ব্যাকুল। পৌষ মাসে যুদ্ধের দামামা বাজলে একেবারে ঘরের মেয়েটির মতো আটপোরে ভাষায় সীতার দুশ্চিন্তা—

রণে হাইরা স্বর্গের ইন্দ্র গো যার কাটে ঘোড়ার ঘাস

হেন রাবণের সঙ্গে রণ গো, মনে লাগে তরাস।।

অবশেষে—

চৈত্র মাসেতে সীতার দুঃখ হইল দূর।

ময়মনসিংহগীতিকায় ‘বারমাস্য’ বা ‘বারোমাসি’ একটি প্রচলিত ধারা। তাই হয়তো একান্ত নারী-জীবন-গান বলেই কবি চন্দ্রাবতীও এই আঙ্গিকটি গ্রহণ করেছিলেন।

তৃতীয় খণ্ডে মোট নয়টি পরিচ্ছেদ। মূল রামায়ণের মতো সীতাকে অগ্নিপরীক্ষায় পাশ করে অযোধ্যায় ফিরতে হয়নি। এখানে দেখা যায় রাম-সীতা সুখে সংসার করছেন—পাশাও খেলছেন সখীদল পরিবৃত্ত হয়ে। এই খণ্ডে আবার কথকরূপে ফিরে এসেছেন চন্দ্রাবতী। এই পর্বের প্রথম পরিচ্ছেদে সীতা তো আবার সেই পুণ্য তপোবনে যাবার বাসনা প্রকাশ করলেন। এইখানেই সীতা নিজের সর্বনাশটি ডেকে আনলেন—

চন্দ্রাবতী কয় দৈব গো না যায় খণ্ডানি।

কি বর মাগিলা হায় গো তুমি জনকনন্দিনী।।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে শুরু হয় কুকুয়ার কার্যকলাপ। মন্তুরার ট্রেনিং-এ সে বড় হয়েছে। তার সবকিছুতেই ‘কু’। কুকুয়া সীতাকে বাধ্য করেছে হাতপাখার উপর রাবণের ছবি আঁকতে। তারপর ক্লান্ত সীতা ঘুমোলে তাঁর বকের উপর পাখাটি রেখে ছুটে গিয়ে রামকে ডেকে এনে সে দৃশ্য দেখায়। কুকুয়া বিবাহিতা—কিন্তু এমন মহিলাকে কি আর শ্বশুরবাড়িতে ঠাই দেয়! অতএব বাপের বাড়ি। এমন ননদের সঙ্গে ঘর করতে হয়েছে কতজনের—এদের ফেলাও যায়নি, গেলাও যায়নি। তৃতীয় পরিচ্ছেদেও দাপিয়ে বেড়িয়েছে চন্দ্রাবতী-রামায়ণের মুখ্য খলচরিত্র এই ‘কুকুয়া’।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ থেকে রচনার বৈশিষ্ট্য একটু অন্যরকম লাগে। শুরুতেই গায়নদের ‘ধূয়া’ পাওয়া যাচ্ছে—“সরযু, বইয়া চল ধীরে” অথবা “নিশি না হইও ভোর/রামের ঘরণী সীতার না ভাইঙ্গ ঘুমঘোর” ইত্যাদি। তাছাড়া এই পর্বেই একটি পুরুষ চরিত্র সর্বপ্রথম আবির্ভূত হয়েছেন সরাসরি—তিনি লক্ষ্মণ। নবনীতা দেব সেন জানিয়েছেন—

অকস্মাৎ টেক্সটের এই যে চারিত্রিক তফাৎ দেখা যাচ্ছে, আমার মনে হয়, তার কারণ তৃতীয় অধ্যায়ের একটা বৃহৎ অংশ (চতুর্থ থেকে নবম অনুচ্ছেদ) প্রবর্তিত হয়েছে পুরুষ গায়নদের দরুণ।... স্পষ্টত রামায়ণটি পূর্ববঙ্গের চারণদের সকলেরই সাধারণ সম্পত্তি হয়ে উঠেছিল এবং গীত হতো স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে। মিশ্র শ্রোতৃবর্গের কাছে।^১

তাছাড়া এই খণ্ডের শেষ দুই অনুচ্ছেদের আগে কেনই বা একসঙ্গে এতজন পুরুষ চরিত্রের অনুপ্রবেশ ঘটল—পুরুষতান্ত্রিক মূল্যবোধ রক্ষার খাতিরে, নাকি রামের অতি-মানবীয় গুণমালা বর্ণনা করতে? এই পরিচ্ছেদের আগে পর্যন্ত দেখা গেছে চন্দ্রাবতী প্রায়শই টেক্সটের মধ্যে ঢুকে পড়ে স্বয়ং সীতাকে প্রত্যক্ষ সহানুভূতি জানিয়েছেন, রামকে স্পষ্ট ভৎসনা করেছেন, সহানুভূতি জানিয়েছেন অযোধ্যাবাসীদেরও। কিন্তু চতুর্থ থেকে নবম অর্থাৎ শেষ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত কবিকে তেমন ভূমিকায় দেখতে পাচ্ছি না। এই পর্বটুকুতে তিনি যেন সবটাই ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন। একেবারে শেষ দুই পংক্তিতে যেন কোনোরকমে নিজের উপস্থিতি জানান দিয়েছেন। হনুমান যখন রামকে অভিযোগ জানাচ্ছেন—

দুষ্ট লোকের কথা শুনিয়া গো কি কাম করিলা।

জন্মের মতন রাম গো সীতারে হারাইলা।।

সেখানে চন্দ্রাবতী যেন ভাগ্যবিড়ম্বনায় বিধ্বস্ত এক অসহায় নারী—

চন্দ্রাবতী কাইন্দ্যা কয়গো কাহারও দোষ নাই।

কর্মফল সুখদুঃখ গো বিধাতা গোসাঁই।।

শেষ পরিচ্ছেদে স্পষ্ট পিতৃতান্ত্রিক স্বর শোনা যায়, যেখানে লবকুশ এবং হনুমানের বীরত্বের বর্ণনা রয়েছে এবং বশিষ্ঠ এবং বাল্মীকি মুনি তাদের পূর্ণ ব্রাহ্মণ্য গরিমায় আবির্ভূত হয়েছেন। পুরুষ গায়নদের রচিত বলে এককথায় ঘোষণা করে দিতে না পারলেও দেখে শুনে মনে হয় যে-কোনো কারণেই হোক—প্রথম থেকে তৃতীয় খণ্ডের তৃতীয় অনুচ্ছেদ পর্যন্ত চন্দ্রাবতী যে মেজাজ নিয়ে কলমচারিতা করেছেন, সেই মেজাজটুকু পরবর্তী অংশে হারিয়ে গেছে। এমনটাও কি হতে পারে না যে এই অংশটুকু লেখার আগেই তিনি জয়ানন্দের মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাই, শেষ অংশে গিয়ে তিনি অনেক বেশি ‘ট্র্যাডিশনাল’ রামায়ণের বাচনশৈলীর দিকে ঝুঁকে পড়লেন কোনো রকমে গল্প শেষ করার জন্য। আর শেষ পরিণতিতে নিজের জীবনের করুণ পরিসমাপ্তির দীর্ঘশ্বাসটুকুই সীতার পরিণতিতে মিশিয়ে দিয়ে বিধাতার কাছে পরাজয় স্বীকার করে নিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদে ঘটেছে লক্ষ্মণের সাহায্য রামের সীতা বিসর্জন। পঞ্চম পরিচ্ছেদে লক্ষ্মণ যখন ক্ষমা চেয়ে বিদায় নিচ্ছেন—সীতার কোনো উত্তেজনা নেই, অনুনয়-বিনয় নেই। তাঁর মনে হয়েছে স্বর্ণলঙ্কার লক্ষ লক্ষ নারীর অভিশাপেই তাঁর এই পরিণতি। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে লবকুশের জন্ম হয় বাল্মীকির আশ্রয়ে, তাদের হাতে-খড়িও হল। সপ্তম পরিচ্ছেদে অশ্বমেধ যজ্ঞের জন্য পাটরানি সীতাকে প্রয়োজন। কিন্তু রাম তো এককথায় সীতাকে পাশে এনে বসাবেন না। অতএব, সীতাকে অগ্নিপরীক্ষা দিতে হবে। একটি বিষয়ে কিন্তু চন্দ্রাবতী রামকে একটু উচ্চ আসনে বসিয়েছেন। তিনি কিন্তু পূর্বসূরীদের মতো সীতার দুবার অগ্নিপরীক্ষা করাননি। প্রথমবার তো অযোধ্যাবাসীদের জন্য নয়, মূলত নিজের জন্যই অগ্নিপরীক্ষা করিয়েছেন রামায়ণের রাম। কিন্তু চন্দ্রাবতীর সংক্ষিপ্তকরণের জন্যই হোক বা রাম-চরিত্রের দোলাচলকে প্রকাশ না করার জন্যই হোক, রামকে দিয়ে একটিমাত্র অগ্নিপরীক্ষাই করালেন। এই পরীক্ষার পিছনে রাজ্যবাসীর সন্দেহ নিরসনের যুক্তিটুকু অন্তত রয়েছে। অর্থাৎ, এই একটি বিষয়ে অন্তত চন্দ্রাবতীর রামকে অনেক সহজে চিনে নেওয়া যায়। আসলে, মহাকাব্য-সুলভ জটিলতাকে তিনি সচেতনভাবেই পরিহার করেছেন যথাসম্ভব। শেষ পরিচ্ছেদে দেখা যায় সীতার জন্য অগ্নিকুণ্ডে তো কেউ অগ্নিসংযোগ করতে রাজি নয়। অর্থাৎ, রাজ্যবাসীর মধ্যে মানবধর্ম তখনো কিছুটা বজায় ছিল, রামচন্দ্রের চরিত্রে যা লোপ পেয়েছিল পুরোপুরি; এতই তাঁর লোভ ক্যারিশমার প্রতি। তাছাড়া অযোধ্যাবাসীর মনে তো পাপ-পুণ্যের ভয়টাও আছে। নারীর অসম্মান চেয়ে চেয়ে দেখতে, মজা লুটতে তো ভালোই লাগে। তারা তো জানে যে সীতার মতো সতীলক্ষ্মীকে আগুনে পোড়ানো মহাপাপ। অতএব, কুকুয়া এগিয়ে আসে মহোৎসাহে। এর ফলস্বরূপ মাথার চুল, মুখ সব পুড়ে গেল তার। কুকুয়ার জ্বলুনি কমাতে সেই সীতাকেই হাত বোলাতে হল। সভায় সাধুজনেরা বললেন, যে নারী হাত দিয়ে আগুন নেভাতে পারে তার আর অগ্নিপরীক্ষার প্রয়োজন নেই। কিন্তু দুষ্টজনেরা কী হবে, তারা কেন থামবে এত অল্পতেই। তাদের মতে, রাজারাজড়ার ঘর বলেই এমন কলঙ্কে চাপা দেবার চেষ্টা। রামরাজ্যে তো একটি আঙুলও রাজপরিবারের দিকে উঠলে চলবে না। একটি প্রজাকেও, একটি পশুপাখিকেও অসুখী দেখতে চান না রাম। অতএব, রাম নিজের হাতেই চিতায় অগ্নিসংযোগ করলেন। সীতা করুণ চোখে সন্তানদের দিকে একবার তাকিয়ে অগ্নিদেবকে প্রণাম করে কুণ্ডে প্রবেশ করলেন। আর থাকতে পারেন মাতা বসুমতী? চন্দ্রাবতীর সীতাকে ধরিত্রীকে আহ্বান করতে হয়নি। চিতা ফাটিয়ে তিনি নিজেই উঠে এলেন। বললেন—

সুখে থাক রাজা রাম গো রাইজ প্রজা লয়্যা।

আমার কন্যা সীতারে আমি গো লয়্যা যাই চলিয়া।।

সমগ্র তৃতীয় খণ্ডের ঘটনা-পরম্পরা দেখে, কুকুয়ার পরিণতি দেখে শেষ পর্যন্ত অংশটি চন্দ্রাবতী রচিত বলেই মনে হয়। শেষাংশটুকু হয়তো জয়ানন্দের মৃত্যুর পরেই লেখা হয়েছিল।

‘চন্দ্রাবতী রামায়ণ’-এর অদ্ভুত সাদৃশ্য লক্ষ করা যায় দক্ষিণী ‘জৈন রামায়ণ’ এবং ‘অদ্ভুত রামায়ণ’-এর সঙ্গে। সীতার জন্মকথার সূত্রটি তিনি অদ্ভুত রামায়ণ থেকেই নিয়েছেন। স্তন্যপায়ী জীবের এই ডিম প্রসব করা, তারপর আবার সেই ডিম ফুটে মানুষের বাচ্চা জন্মানো—এই জিনিস তো রূপকথায় পড়া। ফ্যান্টাসির এই ব্যবহার দেখে মনে হয়, সমাজে দৈনন্দিন বৈচিত্র্যহীনতার মধ্যে এই ধরনের ফ্যান্টাসি সকলেই উপভোগ করতেন—তাই এভাবে সীতার জন্মের প্রস্তাবনা। এই রামায়ণে কাহিনি ও ভাষায় লোকগীতির ছন্দ,

ব্রতকথার প্রভাবও সুস্পষ্ট। চন্দ্রাবতীর অন্যান্য রচনার সঙ্গে এর কাব্যশৈলীরও পার্থক্য আছে। এটি অনেক বেশি ‘মৌখিক’ গুণসম্পন্ন ও পণ্ডিতদের মতে দুর্বল রচনা। কিন্তু পরের মুখে ঝাল না থেয়ে এই ছোট্ট রামায়ণটি নিজে বারবার পড়লে এতটুকুও দুর্বলতা খুঁজে পাওয়া যায় না। আসলে নারীর রচিত এই রামায়ণে স্বয়ং রামকেই দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে। সীতার প্রসঙ্গ ছাড়া তিনি তেমনভাবে স্বমহিমায় উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারেননি। এই আখ্যানের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সীতার জীবনেরই গল্প বলা হয়েছে। এটি রাম-কথার আড়ালে সম্পূর্ণত একটি সীতা-কথা। তাই পুরুষ-প্রধান পণ্ডিতমহলে এটিকে দূরে সরিয়ে রাখাই স্বাভাবিক।

দশরথের তিন মহিষী অমৃতফল ভক্ষণ করেছেন, দশরথের চার পুত্রের জন্ম হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই চন্দ্রাবতী তাদের জন্মের হিসেবনিকেশ নিয়ে মাথা ঘামাননি। বরং ফলের তেতো বীজটি খেয়ে কৈকেয়ী যে হীনবুদ্ধির পরিচয় দিলেন এবং মূল ‘ভিলেন’ কুকুয়ার কীভাবে জন্ম হল, সেটিকে বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করেছেন। এই চরিত্রটি কৃতিবাসে একেবারেই অনুপস্থিত। অথচ চন্দ্রাবতী বিখ্যাত বাঙালি অগ্রজ কবির আনুগত্য প্রকাশ না করে অন্য জায়গা থেকে কাহিনির উপাদান সংগ্রহ করে গল্পের বুনাট অন্য সূতায় বাঁধা শুরু করলেন। মনন ও লেখনী দুর্বল হলে এমন ঘটনা ঘটতে কি! প্রসঙ্গত বলা যায়, সীতার বারোমাসির মতো এমন মঙ্গলকাব্যিক উপাদান কিন্তু কৃতিবাসের রামায়ণে কল্পনাও করা যায় না। কারণ, সেটি যে রামের জয়গাথা, সীতার দুঃখটুকুও তো পুরুষের বয়ানেই সেখানে উচ্চারিত হবে। নারীর কণ্ঠে তাঁরই সুখদুঃখের কথা যেমন খুশি গাওয়া হবে আর পুরুষ কথক সেটি promote করবেন অথবা পুরুষ শ্রোতার সেটি গালে হাত দিয়ে শুনবেন—তাও কি হয়? অতএব, কবি চন্দ্রাবতীর এই বিষয়টি এইভাবে উপস্থাপন করা—এটাই তো অত্যন্ত আধুনিক, বিশেষত মধ্য যুগের সেই পটভূমিকায় দাঁড়িয়ে।

চন্দ্রাবতীর-রামায়ণে নারী চরিত্রগুলি অনেক বেশি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে পুরুষ-চরিত্রের তুলনায়, যা তাঁর পূর্বসূরী পুরুষ রচয়িতাদের ক্ষেত্রে দেখা যায়নি। বিশেষত, রূপকথার আঙ্গিকে তৈরি মাধব জেলে আর তার স্ত্রী সতার প্রসঙ্গ। এই দাম্পত্য কিন্তু প্রক্ষিপ্ত মনে হয়নি। বলা যায় রাবণ-মন্দোদরীর পৌরাণিক দাম্পত্য মাধব-সতার লৌকিক দাম্পত্যের কাছে পরাজয় স্বীকার করেছে। মনে হয় দাম্পত্যসুখ থেকে বঞ্চিত চন্দ্রাবতী খুবই অনুভূতিপ্রবণ হয়ে পড়েছিলেন দাম্পত্য সম্পর্কে ঘিরে। তাই এমন একটি contrast সৃষ্টি করে এক morality প্রতিষ্ঠা করেছেন— ‘অর্থই সব সুখের মূল উৎস নয়’। চন্দ্রাবতীর রাম কৃতিবাসের রামের তুলনায় অনেক বেশি সন্দেহপরায়ণ, অনেক বেশি চরিত্রগতভাবে হীন। সম্পূর্ণভাবেই তিনি ভগিনী কুকুয়া-চালিত। তাই সীতার পাতাল প্রবেশের পর সঙ্গত কারণেই কৃতিবাসের মতো রামের কোনো বিলাপকে চন্দ্রাবতী যুক্ত করেননি। চন্দ্রাবতী এক্ষেত্রে নিজেই রামকে ভর্ৎসনা করেছেন। আসলে, চন্দ্রাবতীর রাম ঠিক মহাকাব্যের চরিত্র হয়ে উঠতে পারেননি, কবি হয়তো সেভাবে চরিত্রটিকে আঁকার চেষ্টাও করেননি। তাই এই রাম ভীষণভাবে একমাত্রিক। কুকুয়া চরিত্রটি কবির একটি সম্পূর্ণ মৌলিক সৃজন। এটিও একটি লৌকিক চরিত্র, পৌরাণিক নয়। আসলে, চন্দ্রাবতীর জীবনে জয়ানন্দ যদি একটু বলিষ্ঠ চরিত্রের হতেন, চন্দ্রাবতীকে বলতে পারতেন তাঁর নতুন সঙ্গী নির্বাচনের কথা। পারেননি, তিনি শুধু নিয়তিচালিত হয়ে ভেসে গেছেন। কোনো আত্মসংযমই তাঁর ছিল না। এমনটা না হলে বোধ হয় চন্দ্রাবতীও তাঁর রামায়ণের রামকে আরেকটু সাহসী, বলিষ্ঠ করে তুলতে পারতেন। চন্দ্রাবতীর জয়ানন্দ জীবনের দ্বিতীয়ার্ধে

মানসিকভাবে একেবারে ভেঙে পড়েন। কিন্তু চন্দ্রাবতীর রামায়ণের শেষে রামের সে বিকারটুকুও নেই, একে স্থিতধী বলব না উদাসীন বলব! আসলে, এটা চন্দ্রাবতীরই ‘রাম’ চরিত্র সম্পর্কে চরম উদাসীন্যের প্রকাশ। সীতা চলে গেছেন, তারপর রাম কী করলেন, কাঁদলেন না হাসলেন তাতে তাঁর বা তাঁর সীতার আর কী প্রয়োজন। এর পরেও কি চন্দ্রাবতীকে বলিষ্ঠ নারীবাদী চিন্তক বলে অভিহিত করলে ভুল করা হবে? চন্দ্রাবতী নিজে বিধির বিধানকে এড়াতে পারেননি। তাই যেন সীতার পাশে থেকে বারবার উপলব্ধি করেছেন যে সীতাও দৈবনির্ধারিত নিয়তিকে অস্বীকার করতে পারবেন না। তাই পাঠকদেরও সময়ে সময়ে সেটিই জানিয়ে গেছেন। নিজেও মধ্যে ঢুকে পড়েছেন—ভর্ৎসনা করেছেন রামকে। ব্যক্তিজীবনে কবি নিশ্চয়ই জয়ানন্দকে মনে মনে এভাবেই ভর্ৎসনা করেছিলেন। জয়ানন্দও যে বিবেকশূন্য হয়ে এই বিদুষী কন্যাটির প্রতি চরম অবিচার করেছিলেন। এইভাবেই চন্দ্রাবতী আর সীতা এবং জয়ানন্দ আর রঘুনন্দন পাশাপাশি চলতে থাকেন এই কাব্যে। এখানে তিনটি দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যেই কবি তাঁর নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা আর চাওয়া-পাওয়াকে নিপুণভাবে মিলিয়ে দিয়েছেন। নিজেই নিজের রচনার বিশ্লেষণ করেছেন, কখনো কখনো হিসেবে, কখনো সমালোচক হিসেবে। এই চরিত্রগুলির মধ্যে নারী-পুরুষ সকলেরই দোষগুণ খুব স্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন। বাল্মীকি, মাধব, হনুমানকে বর্ণনা করেছেন সৎ বলিষ্ঠ পুরুষচরিত্র হিসেবে, তেমনি রাবণ আর রাম দু-জনকেই প্রায় একই শ্রেণিভুক্ত করে তিনি সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। রাবণ তো বটেই, রামও তাঁর কাছে আদর্শ পুরুষ চরিত্র হয়ে উঠতে পারেননি—ঠিক যেমন ব্যক্তিগত জীবনে জয়ানন্দ। সামগ্রিকভাবে দেখতে গেলে সম্পূর্ণ কাব্যটিতেই জয়ানন্দ-চন্দ্রাবতীর পারস্পরিক সম্পর্কের প্রতিফলন ঘটেছে—কোথাও স্পষ্ট, কোথাও অস্পষ্ট।

তবে, কেউ যদি ভাবেন প্রেমে আঘাত পেয়ে চোখের জলে ভাসতে ভাসতে কবি চন্দ্রাবতী নিজের জীবনবৃত্তে ঘুরপাক খেতে খেতেই রামায়ণের মতো একটি মহাকাব্য লিখে ফেলার চেষ্টা করেছেন, তাঁদের সিদ্ধান্ত অত্যন্ত ভুল। জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত, অভিজ্ঞতা আবছাভাবে তাঁর রচনায় ছাপ ফেলেছে ঠিকই। কিন্তু কোনোভাবেই তাঁর কাব্যের মূল চরিত্রের কোনো স্থলন হয়নি। স্বাভাবিকভাবেই অনেকেরই মনে হতে পারে তিনি শুধুই একজন নারীবাদী সাহিত্যিক। অবশ্য তাঁর পূর্বসূরীদের মতোই তাঁরও সীতা চরিত্রের কোনো ত্রুটি চোখে পড়েনি। কিন্তু কুকুয়া চরিত্রটি থেকেই বোঝা যায় যে চন্দ্রাবতী একজন নারীকে প্রধান ভিলেন হিসেবে দেখিয়ে বলতে চেয়েছেন—নারী নিজেও অপর নারীর শত্রু হতে পারে। তাঁর বাস্তবজীবনের আশমানির তুলনায় অনেক বেশি ক্ষতিকর হয়ে উঠেছে তাঁর কল্পনায় সৃষ্ট চরিত্র রামায়ণের কুকুয়া। এমন বলিষ্ঠতা যে মহিলা সাহিত্যিক দেখাতে পেরেছিলেন এতদিন আগে, তাঁর সৃষ্টিকে দীর্ঘদিন দুর্বল বলে পাশে সরিয়ে রাখাটা বাংলা সাহিত্যজগতেরই দুর্বলতা। ভাবতে অবাক লাগে যে মধ্যযুগের ওই প্রস্তুতিহীন পর্বে চন্দ্রাবতী কীভাবে বাংলার প্রথম মহিলা কবি হিসেবে নিজেকে এমন গভীর সাহিত্যচর্চায় নিয়োজিত করলেন।

শ্রীমতী নবনীতা দেব সেন দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাঁর কথায়—

যেন পূর্বাচ্ছেই বলে রেখেছেন চন্দ্রাবতী বাংলার দুই শ্রেষ্ঠ কবি মধুসূদন দত্ত ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মনের কথা।^৭

কারণ, চন্দ্রাবতী অশোককাননে সরমাকে সীতার একমাত্র সখী বলে উল্লেখ করেছেন, যে বিষয়টি ‘মেঘনাদবধ কাব্য’-তে বিস্তৃতি লাভ করেছিল। আর দ্বিতীয়টি হলো, চন্দ্রাবতীর সীতা লক্ষ্মণকে

মিনতি করে বলেছিলেন—

পতিরে জানাইও আমার গো শতকোটি প্রণাম।

উর্মিলার দুঃখ তুমি গো কইর সমাধান।।

এই একই বিষয়ের উপর রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত প্রবন্ধ ‘কাব্যের উপেক্ষিতা’। তাই দেখা যাচ্ছে রাম-কথার সমস্ত পুরুষ রচয়িতা লক্ষ্মণ-পত্নী উর্মিলাকে উপেক্ষা করলেও ষোড়শ শতকের বাংলার নারী বিবৃতিকারের কলমে এই ঘটনার ব্যতিক্রম ঘটেছিল।

চন্দ্রাবতী ব্যক্তিজীবনে জয়ানন্দের কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে শিবের আরাধনা আর কাব্যচর্চার পথ বেছে নিয়ে জীবনে স্থৈর্য লাভ করেছিলেন। এর মধ্য দিয়েই একটা আলোর রেখা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, নারীকে যদি বঞ্চনাকে সম্বল করেই বেঁচে থাকতে হয়, সে যদি একান্ত নিজস্ব একটি জগৎ তৈরি করতে না পারে, তখনি তার জীবনে ব্যর্থতার অন্ধকার নেমে আসে। এখানেই আসে স্বনির্ভরতার প্রশ্ন—শুধুমাত্র অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা নয়, জাগতিক স্বনির্ভরতা, সব অর্থেই স্বনির্ভরতা। চন্দ্রাবতী এইটুকু পেরেছিলেন বলেই মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যেও তিনি স্বমহিমায় উজ্জ্বল—সে তাঁর প্রচার হোক বা না হোক। পুরুষতন্ত্রের ধারক ও বাহকরা যদি তাঁর টেক্সটের কণ্টরোধ করেও থাকেন অতীতে, ভবিষ্যৎ একদিন তাঁকে খুঁজে বার করবেই।

বিশেষ ঋণস্বীকার :

ড. রমেনকুমার সর, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

সূত্র নির্দেশ :

১. সেন, দীনেশচন্দ্র, *পূর্ববঙ্গ গীতিকা*, প্রথম খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি, ২০০৯, পৃ. ১২৬

২. দেব সেন, নবনীতা, ‘নারীর মহাকাব্য : রামায়ণ কথার পুনঃকথন : চন্দ্রাবতীর রামায়ণ’, রামায়ণ চর্চা : ভারতে বহির্ভারতে, *কোরক সংকলন*, জানুয়ারি, ২০১০, পৃ. ২৬৩
৩. দেব সেন, নবনীতা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬৬

তথ্যসূত্র

১. Lady Sings the Blues: When Women Retell the Ramayana, Nabaneeta Dev Sen
উৎস : <http://www.ninapaleg.com/Sitayana/Manushi>
২. কোয়েল চক্রবর্তী, *চন্দ্রাবতীর জীবন ও রামায়ণ*, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটর্স, কলকাতা, ২০০৯
৩. রামায়ণ চর্চা: ভারতে ও বহির্ভারতে, *কোরক সংকলন*, জানুয়ারি, ২০১০
৪. পূর্ববঙ্গগীতিকা, ১ (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্রে), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৯
৫. পূর্ববঙ্গগীতিকা, ২ (তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড একত্রে), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৯
৬. ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক, *প্রাচীন পূর্ববঙ্গগীতিকা* (প্রথম খণ্ড), ফার্মা কে. এল.এম., কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৭০
৭. বরুণকুমার চক্রবর্তী, *চন্দ্রাবতী রামায়ণ প্রসঙ্গ: লৌকিক সংস্কৃতির প্রেক্ষিতে লোকশ্রুতি*, ২০০৬
৮. শামসুজ্জামান খান, *চন্দ্রকুমার দে অগ্রস্থিত রচনা* (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড), বাংলা একাডেমি, ঢাকা
৯. বিষয় : *কুণ্ডিবাসী রামায়ণ*, দশদিশি, কলকাতা, এপ্রিল, ২০১১
১০. সাপ্তাহিক ‘দেশ’ পত্রিকা, ১৮ ফেব্রুয়ারি ও ৪ মার্চ, ২০০২

With best compliments of

JAI SHREE TIMBERS

MILL

Amrasota More, Suri Road
P.O. Searsole Rajbari-713358
Phone : 0341-2444002
e-mail : jaishreetimebers@rediffmail.com

RESI

18/1, N.S.B. Road
P.O. Raniganj (W.B.)
Phone : 0341-2449707
Fax : 0341-2444019

Sl. No. 128

With best compliments of

Central Kajora Colliery
Employees Co-Operative
Credit Society Ltd.

Naresh Singh
Secretary

Sl. No. 97

শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

তিরুপতি কোল্ড স্টোরেজ

কাড়ালঘাট, জামালপুর, বর্ধমান

আলু সংরক্ষণের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

Sl. No. 91

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

প্রফুল্ল কোল্ড স্টোর

চকদীঘি, বর্ধমান

Sl. No. 71

With best compliments of

J. KUNDU

Denha, P.S. Memari, Dist. Burdwan

Sl. No. 73

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

পাটুলী গ্রাম পঞ্চায়েত

(পূর্বস্থলী ২নং পঞ্চায়েত সমিতি-র অধীন)
গ্রাম ও পোঃ—পাটুলী, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪৫৩) ২৪৮২৩৮

আমাদের আবেদন

১. জাপানিজ এনসেফেলাইটিস রোগ প্রতিরোধ সম্পর্কে সচেতন থাকুন। ২. পরিবেশ পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন রাখুন। ৩. সরকারি পরিষেবায় সুলভে শৌচাগার বানান। ৪. নিজ নিজ এলাকার প্রত্যেক সংসদগণ প্রতি সংসদ সভায় হাজির হোন। ৫. দলমত নির্বিশেষে এলাকার উন্নয়নমূলক কাজে মতামত প্রদান করুন। ১০০ দিনের কাজের মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও আর্থসামাজিক পরিবর্তন ঘটেছে। ৬. বনসৃজন করুন। ৭. সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখুন।

নয়ন হালদার
উপপ্রধান

সুভাষচন্দ্র দাস
প্রধান

Sl. No. 84

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

গোপগন্তার ইউনিয়ন কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচারাল ক্রেডিট সোসাইটি লি.

গন্তার, বর্ধমান II রেজি. নং ৪০ তাং : ১২-০২-১৯৪৯

সোসাইটির কার্য সমূহ

আমানত : সেভিংস, ২. মেয়াদি, ৩. পৌনঃপুণিক II ঋণদান : ১. স্বল্পমেয়াদি, ২. মধ্যমেয়াদি, ৩. বন্ধকী, ৪. ব্যবসায়ী, ৫. সাইকেল/মোটর সাইকেল, ৬. পিতল-কাঁসা বন্ধকী, ৭. স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী। ব্যবসা : ১. সমস্ত প্রকার রাসায়নিক সার, ২. খইল, ৩. কীটনাশক, ৪. উচ্চফলনশীল আলু এবং ধানবীজ, ৫. গানি ব্যাগ, ৬. স্বল্প ভাড়া ট্রাক্টর এবং ৪৭টি সাবমার্সিবল কৃষকের সেবায় নিয়োজিত, ৭. অ্যারিজ ডিস্ট্রিবিউটর। সততা, নিরাপত্তা ও দ্রুত পরিষেবাই আমাদের একমাত্র মূলধন। আসুন আমরা এক সাথে এগোই এবং সমবায় আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাই।

Sl. No. 75

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

দেউলিয়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

দেউলিয়া, আঝাপুর, থানা-মেমারি, বর্ধমান

রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ঔষধ বিক্রেতা।
ব্যাঙ্ক পরিষেবাও আছে।

সেখ আব্দুল আজিজ
সভাপতি

আব্দুল আলিম মণ্ডল
সম্পাদক

আব্দুল মজিদ মল্লিক
ম্যানেজার

Sl. No. 77

শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

তিরুপতি কোন্ড স্টোরেজ প্রাইভেট লিমিটেড

বিষ্ণুপুর, রসুলপুর, বর্ধমান

Sl. No. 76

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

কেনা সমবায়
কৃষি উন্নয়ন সমিতি লি.

আসুন।
সমবায় আন্দোলনকে আমরা এগিয়ে নিয়ে যাই।

শ্যামাপদ ক্ষেত্রপাল সভাপতি
মোহিতকুমার যশ সম্পাদক
স্বপনকুমার মল্লিক ম্যানেজার

Sl. No. 79

With best compliments of

Magra Brick Field & Co.

Vill. : Denha Magra
P.O. Ghosh, Dist. Burdwan

Sl. No. 80

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

মেড়তলা গ্রাম পঞ্চায়েত

পূর্বস্থলী, বর্ধমান

Sl. No. 81

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

অত্র সমিতির মাধ্যমে কৃষকদের কৃষি ঋণ (কে.সি.সি.), স্বয়ম্ভর
গোষ্ঠী ঋণ, পাওয়ার টিলার ঋণ এবং সার, বন্ধকী ঋণ দেওয়া হয়।
ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে সুদের ছাড় দেওয়া হয়।

পূর্বস্থলী সমবায় কৃষি
উন্নয়ন সমিতি লি.

পোঃ পূর্বস্থলী, জেলা : বর্ধমান

অজিতকুমার গুহ সভাপতি
প্রশান্ত কুণ্ডু সম্পাদক
দুর্গাদাস গুহ ম্যানেজার

Sl. No. 83

With best compliments of

SANKAR-MAHADEB NURSERY

**Accredited by National Horticulture Board (NHB)
Ministry of Agriculture, Govt. of India**

Purbasthali Rail Station (South Railgate)
G-mail : sankarmahadebnursery@gmail.com

শঙ্কর-মহাদেব নার্সারি

প্রোঃ শংকর দত্ত

পূর্বস্থলী রেলস্টেশন (দক্ষিণ রেলগেট), পূর্বস্থলী, বর্ধমান
মো. ৮৯৭২১১৩৮২৪, ৯৪৩৩২৬১০৭২, ৯৭৩৪২৫০০২৮

Sl. No. 85

With best compliments of

M/s. Sk. Nur Alam

GOVT. CONTRACTOR & ORDER SUPPLIERS

Khemta, Dist. Burdwan
Mob. 9434576265

Sl. No. 86

With best compliments of

Madhabpur Naba Kajora Colliery Employees Co-Operative Credit Society Ltd.

Regd. No. 367, dt. 26-04-77

Naba Kajora Colliery, Kajora Gram
Burdwan

Sl. No. 8

With best compliments of

**Sk. Kismat
&
Amiya Gosh**

M/s. Modern Bearing Agency

40, Strand Road, 1st floor, Room No. 40
Kolkata-700 001

Sl. No. 4

With best compliments of

**Suvankar Rice &
General Mills Pvt. Ltd.**

Bhirsin More, Budbud, Burdwan

Sl. No. 144

With best compliments of

SREE BISHNU RICE MILL

Mankar, Burdwan

Contact for
SILKY SORTEX FINE RICE
(Export Quality)
M : 8629992188, 9153343945

Sl. No. 143

শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

সতু হার্ডওয়্যার
গেঁড়াই, বর্ধমান

প্রযত্নে : সেখ আব্দুল লালন

Sl. No. 141

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

মহারানী এন্টারপ্রাইজ

প্রোঃ সেখ কবির হোসেন (দোলন)

ইট বালি, পাথর, সিমেন্ট, মাটি ও রাবিস
অতি সুলভে অর্ডার সাপ্লাই করা হয়।

কৃষ্ণপুর (কৃষ্ণপুর হাইস্কুলের নিকট), বর্ধমান
যোগাযোগ

৯৩৩২৬৩৩৪১৩, ৯৮৩২২৩৬৫৯৪, ৯৮৩২২৬২০৫৫

Sl. No. 188

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

সারা ভারত কৃষকসভা ইছাপুর অঞ্চল কমিটি

(লাউদোহা থানা কমিটি)

Sl. No. 182

With best compliments of

DHCPL

Sl. No. 184

*Heartiest Greetings of Saradiya
from*

RENUKA FURNITURE & SAW MILL

Prop. Anil Kumar Dalui

Divan Khat, Ply-woods, Steel Almari, Sofa Set,
Kurl-on Mattress & All Wooden Furniture prdocuts
SEASONED & SIZE TIMBER PRODUCT

Aamtala, Golapbag More, Saraitikar Road
Burdwan-713104, Contact : 0342-2657605 (O)
9434133134 (Anil Dalui), 9932494929 (Abhijit)
9732297222 (Subhajit)

Sl. No. 187

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

নির্মাণের জন্য উৎকৃষ্ট ইট
সংগ্রহ করুন

মা ইটভাটা

মীরহাট, বৈদ্যপুর, বর্ধমান, যোগাযোগ : ৯৪৭৪০২৩৩৮২

Sl. No. 53

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

উৎকৃষ্ট ইট দিয়ে গড়ুন আপনার স্বপ্নের ইমারত

শান্তি ব্রিকস্ ফিল্ড

চৌবেড়িয়া, বর্ধমান

Sl. No. 68

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

আপনার স্বপ্নের ইমারত গড়তে
দামোদার ইটভাটার পগমিল
ইট ব্যবহার করুন

দামোদর ব্রিকস্ ফিল্ড

শম্ভুপুর, চক্ষণজাদী, বর্ধমান
ফোন : ৮০০১৭৬৯১৫০, ৯৭৩২১৬১২০৬

Sl. No. 72

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

কালেখাঁতলা-২ গ্রাম পঞ্চায়েত

পূর্বস্থলী-২, জেলা : বর্ধমান

Sl. No. 82

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

সাহেবগঞ্জ-২ গ্রাম পঞ্চায়েত

ওরগ্রাম, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪৫২) ২৬২২৩৭
ভাতাড় পঞ্চায়েত সমিতি

মানুষের সেবায় আমরা বদ্ধপরিকর।

সাতকড়ি মাজি
উপ-প্রধান

রহিমা বেগম
প্রধান

Sl. No. 30

With best compliments of

Satyam Smelters Pvt. Ltd.

Jamuria Industrial Estate
P.O. Ikrah, Jamuria, Burdwan

Sl. No. 42

শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

খণ্ডঘোষ জাগরণ

খণ্ডঘোষ, বর্ধমান

Sl. No. 109

With best compliments of

Paruldanga Samabay
Krishi Unnayan
Samity Ltd.

Regd. No. 40 Dt. 18-06-26/24/3/64
Vill. Paruldanga, P.O. Nasaratpur, Dist. Burdwan

Gopal Chandra Ghosh
Secretary

Hamjar Sk.
Chairman

Ajoy Kr. Ghosh
Manager

Sl. No. 161

With best compliments of

A
Well Wisher

Fagupur, Burdwan

Sl. No. 134

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

মাধুপুর ছাতনী সমবায়
কৃষি উন্নয়ন সমিতি লি.

রেজি. নং : ৬৫ কেটি তারিখ : ২৬-৩-৬৪
পূর্বস্থলী-২, ছাতনী, বর্ধমান

বিগত পঞ্চাশ বছর যাবৎ
এলাকার মানুষের সেবায় নিয়োজিত

কৃষ্ণকমল দত্ত
ম্যানেজার

Sl. No. 37

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

নিমদহ-জামালপুর সমবায়
কৃষি উন্নয়ন সমিতি লি.

গ্রাম : নিমদহ, পোঃ বেলেরহাট
পূর্বস্থলী ২নং, বর্ধমান

দীর্ঘ ৫৪ বৎসর এলাকার মানুষের সেবায় নিয়োজিত

দিলীপকুমার দাস
সম্পাদক

বিধান রায়
সভাপতি

কুমারকান্তি চক্রবর্তী
ম্যানেজার

Sl. No. 38

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

চিত্ত গড়াই

গোবিন্দপুর, পাণ্ডুবেশ্বর, বর্ধমান

Sl. No. 183

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

শশীনাড়া
এস.কে.ইউ.এস. লি.

শশীনাড়া, বর্ধমান

এখানে ব্যাঙ্ক পরিষেবা, কৃষিক্ষেত্র,
গ্যাস পরিষেবা, কৃষি ক্রেডিট কার্ডের ব্যবস্থা আছে।

কাজের সময়
সকাল ৭ থেকে ১২টা ।। বিকাল ৩টা থেকে ৫ টা

তাপস ব্যানার্জী
সভাপতি

দেবপ্রসাদ গুহ
সম্পাদক

Sl. No. 181

With best compliments of

M.R. ENTERPRISE

CIVIL, MECHANICAL AND ELECTRICAL CONTRACTOR

HEAD OFFICE : 14/2, Secondary Road, A-Zone, Durgapur-713204, Burdwan

BRANCH OFFICE : 12/27, Secondary Road, A-Zone, Durgapur-713204, Burdwan

Tele Fax : (0343) 2575762, E-mail : mr.enterprise1402@gmail.com, mr_enterprise08@rediffmail.com

Sl. No. 185

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

জামনা গ্রাম পঞ্চায়েত

মহেশ্বর পঞ্চায়েত সমিতি

পোঃ জামনা, থানা : মহেশ্বর, জেলা : বর্ধমান-৭১৩৪২২

প্রতিটি পরিবারে শৌচাগার নির্মাণ করা।

প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করতে সামাজিক বনসৃজন প্রতিটি

গ্রামের রাস্তাঘাটকে ব্যবহারযোগ্য করে তোলা।

০+ সকল শিশুকে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে পাঠানো সুনিশ্চিত করা।

৫+ সকল শিশুকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠানো সুনিশ্চিত করা।

সকল শিশুকে ইম্যুনাইজেশন প্রকল্পের আওতাভুক্ত করা।

জন্ম ও মৃত্যুর পরে নিবন্ধকরণের কাজ সুনিশ্চিত করা।

আফজর সেখ
উপপ্রধান

রেখারানি ঘোষ
প্রধান

Sl. No. 28

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

কালেশ্বর এস.কে.ইউ.এস. লি.

রেজি. নং : ৫৪ তাং : ১৪-০৪-৩০

পোঃ কুচুট, জেলা বর্ধমান, ফোন : ৯৪৩৪২১৭০৬১

আমাদের ব্যবসা

ব্যাঙ্কিং, SB, TD RD, KVP TP সার্টিফিকেট বন্ধক রেখে

ঋণ দান, সার, কীটনাশক ও বন্ধকী ব্যবসা। এছাড়াও ১৮টি

মিনির সাহায্যে জল সরবরাহ করা হয় পাইপলাইনের

মাধ্যমে।

অশোককুমার মণ্ডল
সভাপতি

সুনীলকুমার নন্দী
সহসভাপতি

বিপিন রায় চৌধুরী
সম্পাদক

Sl. No. 29

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

মানকর গ্রাম পঞ্চায়েত

গলসী-১ পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত

ডাকঘর : মানকর, থানা : বুদ্ধবুদ, জেলা : বর্ধমান

ফোন : (০৩৪৩) ২৫১৭৩০৯

সকলের জন্য গ্রামপঞ্চায়েতের অঙ্গীকার

১. সকলের জন্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সুনিশ্চিত করা। ২. গ্রাম পঞ্চায়েতকে স্বশক্তিকরণ। ৩. পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রেখে ধারাবাহিক উন্নয়ন। ৪. স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতার সাথে দপ্তর পরিচালনা করা। ৫. পর্যাপ্ত পরিশ্রুত পানীয় জলের সুব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা। ৬. মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান সুনিশ্চিত প্রকল্পের মধ্য দিয়ে শ্রমদিবস সৃষ্টি ও সামাজিক সম্পদ সৃষ্টি। ৭. নির্মল ভারত অভিযান প্রকল্পে প্রত্যেক বাড়িতে শৌচাগার নির্মাণে অঙ্গীকারবদ্ধ।

নীলেশ্বর গোস্বামী
উপপ্রধান

শুক্রা ভট্টাচার্য
প্রধান

Sl. No. 190

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

সবার আশিষে

প্রাঃ সেখ তাজউদ্দিন

এখানে সিমেন্টের খুঁটি, পায়খানার পাট,
ইট, বালি, পাথর, কারী পাওয়া যায়।

মোবাইল : 9332054972- 9832185411
তিরেঙ্গে মোড়, গলসী, বর্ধমান

Sl. No. 146

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

তপনকুমার দে

গুসকরা, বর্ধমান

Sl. No. 192

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

মহাশক্তি কোন্ড স্টোরেজ
প্রাইভেট লিমিটেড

চকদীঘি, জামালপুর, বর্ধমান

আলু সংরক্ষণের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

Sl. No. 70

With best compliments of

**BABA KALURAY
HEEMGHAR (P.) LTD.**

Regd. Office

Burdwan Road, Tarakeswar, Hooghly
Ph : 03212-276323

Cold Storage

Vill. P.O. Jaragram, Dist. Burdwan
Phone : (03213) 258556

Sl. No. 69

With best compliments of

**M/S. MODERN
CONSTRUCTION**

**MES ENLISTED CONTRACTOR &
GENERAL ORDER SUPPLIER**

Vill. & P.O. Kota, Dist. Burdwan
Phone : 9153355890, 9434236094
E-mail : asitkoley66@gmail.com

Sl. No. 191

শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

পঞ্চায়েতের মাধ্যমে উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করতে
সকলের সাহায্য কামনা করি

এড়াল গ্রাম পঞ্চায়েত

উজ্জ্বল পাল
প্রধান

Sl. No. 88

শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

পঞ্চায়েতের মাধ্যমে গ্রামোন্নয়নকে অব্যাহত রাখতে
সকলের সহযোগিতা কামনা করি

গোপগস্তার-১ গ্রাম পঞ্চায়েত

মুদিরাম কোঁড়া
উপপ্রধান

শম্পা ক্ষেত্রপাল
প্রধান

Sl. No. 74

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

পরিতৃপ্তির শেষ কথা
ফ্রেন্ডস ক্যাটারার
আমাদের কোনো শাখা নেই

ধাত্রীগ্রাম, বর্ধমান
যোগাযোগ : ৯০৯৩৬০৯০৪৮, ৯৪৩৪৫৭৬৪২৯

Sl. No. 63

With best compliments of

URVASHI CINEMA

P.O. Dhatrigram, Dist. Burdwan
Mob. 9564620586

Sl. No. 60

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

ভারতীয় জীবন বীমা নিগমের
অভিজ্ঞ ও বিশ্বস্ত এজেন্ট

কৃষ্ণচন্দ্র ঢাল

কালনা শাখা (Agent Code : 01305-471)
গ্রাম : দুর্গাপুর, পোঃ নান্দাই, বর্ধমান

আপনার কষ্টার্জিত টাকা
নিশ্চিন্তে LIC-তে জমা রাখুন

Sl. No. 64

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

**কুবাজপুর সমবায়
কৃষি উন্নয়ন সমিতি লি.**

গ্রাম ও পোঃ কুবাজপুর, বর্ধমান
রেজিস্ট্রেশন নং : ৩৪১২ তাং ২০-০৮-৬৯

আমাদের পরিষেবা সমূহ
রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের পাইকারি ও খুচরা বিক্রয়
ইফকো কর্তৃক অধিকৃত 'ওয়ার হাউস' প্রাপ্ত
সমস্তরকম ব্যাঙ্কিং পরিষেবা
স্বল্প সুদে কৃষকদের কৃষিক্ষণ প্রদান
এন.এস.সি/কে.ভি.পি. জমা রেখে ঋণ প্রদান

পার্থ মজুমদার
স্পেশাল অফিসার

শাহাজামাল মণ্ডল
সর্বোচ্চ বেতনপ্রাপ্ত কর্মচারী

Sl. No. 67

With best compliments of

Chandan Chakraborty

Agent : **LICI**, Branch No. 1
G. T. Road, Asansol, Dist. Burdwan

Residence
S.B. Garai Road, Barafkal More, Asansol

Sl. No. 93

With best compliments of

**ROAD WAY & ROOF
CO-OPERATIVE LABOUR
CONTRACT & CONSTRUCTION
SOCIETY LTD.**

Regd. No. 3 K.T. 1986-87
Vill. Pearinagar, P.O. Dhatrigram, Dist. Burdwan
Mobile : 9434669867

Sl. No. 58

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

**কালনা-২ সিএডিপি ফার্মাস সার্ভিস
কো-অপারেটিভ সোসাইটি লি.**

রেজি. নং ১৩ কাটোয়া তাং ২৭.০৭.১৯৭৬
গ্রাম : পাতিলপাড়া, পোঃ বৈদ্যপুর
জেলা : বর্ধমান-৭১৩১২২, ফোন : ০৩৪৫৪-২৪৫২৩১

সমিতির উল্লেখযোগ্য পরিষেবাগুলি হল

১. তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রায় ৩০০০ জন কৃষকদের কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে স্বল্প সুদে কৃষিক্ষণ প্রদান করা হয়। ২. তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েতের ২০০০ একর জমিতে ১০০টি মিনি ডিপের মাধ্যমে, কম জলকরে কৃষিতে জলসেচ প্রদান করা হয়। ৩. উন্নত মানের উচ্চফলনশীল, সংশোধিত ধানবীজ, আলুবীজ, ডাল ও সরিষা বীজ এলাকার সকল চাষিদের কম দামে সরবরাহ করা হয়। ৪. সঠিক দামে চাষের সকল প্রকার রাসায়নিক, জৈব সার ও কীটনাশক সরবরাহ করা হয়। ৫. ভাস্টিহিল ডাল মিলে মুগ, মুসুর, কলাই, মটর ছোলার ডাল ভাঙানো হয়, ৬. সমিতির নিজস্ব কোল্ড স্টোরে আলু সংরক্ষণ করা হয়। ৭. বস্ত্র সামগ্রী বিপণনের মাধ্যমে সকল মানুষদের সহায়তা করা হয়। ৮. অ্যান্ডুলেস পরিষেবা প্রদান করা হয়। ৯. বন্ধকী ঋণের মাধ্যমে অভাবি মানুষদের সহায়তা করা হয়। ১০. প্রায় ৩০০টি স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে ঋণদান করে ২৫০০-৩০০০ জন ব্যক্তির কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রদান। ১১. এছাড়াও অধিক সুদে সমিতির সদর অফিস ও দুটি শাখায় (বড়ধামাস ও আখাদহ) ব্যাঙ্কিং পরিষেবা প্রদান করা হয়।

Sl. No. 55

With best compliments of

ASIF ENTERPRISE

CONTRACTOR & GENERAL ORDER SUPPLIER

Vill. Moslembad, P.O. Atghoria,
Dist. Burdwan-713405
Mob. 9093607104, 9002805143

Prop. KENAR ALI SK.

Sl. No. 57

With best compliments of

M/s Sukumar Chakraborty & Co.

Prop. Janardan Chakraborty

CIVIL, MECH. & GENERAL ORDER SUPPLIERS,
IISCO STEEL PLANT, EASTERN RAIL

Radhanagar Road, Asansol-713325, Mob.
9434253403

Sl. No. 50

With best compliments of

Mukherjee Consturction Co.

**Govt. Civil, Structural, Mechanical
Contractor & General Order Supplier**

Kalajharia Road, Satyajit Nagar, Asansol-713304

Phone : (0341) 2283396

Mob. 9434237165, 9734777842

Fax : +91341 2283396

E-mail : mccasansol@gmail.com

Sl. No. 51

With best compliments of

BANERJEE ENTERPRISE

Established under SSI Unit, Govt. of WB &
Registered in SAIL-ISP, Burnpur
Mob. 9474540470, 9233379749, 9474909193

**Typical Fabriation & Erection of Structural,
Mechanical, Alliance & EOT Crane, Civil ESP,
Hydraulic, Gas, Oxygen & S.S. Pipeline Works &
General Order Supplier**

WORKSHOP

Vill. Kuilapur (Maji Para), Purushottampur
P.O. Suryanagar, Burnpur-713361 (WB)

HEAD OFFICE

Beni Madhab Nagar, 58, S.B. Garai Road
Asansol-713301, E-mail : be.isp@rediffmail.com

Sl. No. 52

With best compliments of

M/s. Apareash Dey

**GOVT. CONTRACTOR &
GENERAL ORDER SUPPLIERS**

Monteswar, Burdwan
Mob. 9434576538

Sl. No. 41

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

কুলুট সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

গ্রাম ও পোঃ কুলুট, ব্লক : মন্তেশ্বর, বর্ধমান
রেজি. নং : ৬১৫, তাং : ১২-০৮-১৯২০

সমিতির অফিস সমূহ

প্রধান অফিস : গ্রাম ও পোঃ কুলুট, ফোন ০৩৪২-২৭৫০৫৫১
শাখা অফিস (ব্যাকিং) : কুসুমগ্রাম সুপার মার্কেট, দ্বিতল, ফোন
০৩৪২-২৭৫০৫৯৫ ।। শাখা অফিস (সার ও কীটনাশক) : চুয়াডাঙ্গা,
পোঃ পুটশুড়ি, ফোন : ০৩৪২-২৭৫৫৩৯৬

কার্যাবলী : ১. সভ্যদের কে.সি.সি./এম.টি. ঋণদান, ২. গ্রাহকদের
জন্য ব্যাকিং পরিষেবা (সেভিংস, রেকারিং, টাইম), ৩. ন্যায্য মূল্যে
খুচরা সার ও কীটনাশক বিক্রয়, ৪. ৪৮টি সাবমার্সিবল পাম্প দ্বারা
এলাকায় কৃষিকাচ জলসেচ, ৫. ট্রাক্টর ও পাওয়ার টিলার-এর
মাধ্যমে কৃষি ও অন্যান্য কাজে সহায়তা করা, ৬. আর্থিক দিক থেকে
পিছিয়ে পড়া মানুষদের নিয়ে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী গঠনের মাধ্যমে আর্থিক
সহায়তা প্রদান

সমবায় আন্দোলনকে জেরদার করতে আসুন সকলে মিলে অগ্রসর হই।

সেখ মহম্মদ আলি সেখ সরিফউদ্দিন আহম্মদ হবিবুর রহমান মণ্ডল
সভাপতি সম্পাদক ম্যানেজার

Sl. No. 40

শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

শারদীয়া, দেওয়ালি ও ইদুজ্জোহা
উৎসবের দিনগুলিতে পশ্চিমবঙ্গের চিরাচরিত
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখুন

তপন কুমার যশ

ভাতাড় বাজার, বর্ধমান

Sl. No. 39

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

প্রতি বছরের ন্যায় এবারও ‘নতুন চিঠি’ নতুন
ভাবনায় প্রকাশ হবে এবং বর্ধমান জেলার
গণআন্দোলনকে নতুন দিশা দেখাতে পারবে।

বনফুল সামন্ত

ভাতাড় বাজার, বর্ধমান

Sl. No. 43

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

সাহেবগঞ্জ-২ গ্রাম পঞ্চায়েত পাঠাগার

স্থাপিত : ১৯৭৮ : গ্রাম ও পোঃ ওড়গ্রাম, বর্ধমান

কত নগর, কত শহর উল্লঙ্ঘন করিয়া মানবের কণ্ঠে
আসিয়া পৌঁছিয়াছে। কত শত বৎসরে প্রাপ্ত হইতে শুধু
এই স্বর আসিতেছে। এসো, এখানে এসো এখানে
আলোকের জন্ম। সঙ্গীত গান হইতেছে।—রবীন্দ্রনাথ

গ্রন্থাগারে আসুন।। বই পড়ুন।। বই পড়ুন

গ্রন্থাগার হল জনগণের বিশ্ববিদ্যালয়

ননীগোপাল রায় সুকান্দ ভট্টাচার্য কাজী গোলাম মোবিন
সভাপতি সম্পাদক গ্রন্থাগারিক

Sl. No. 44

With best compliments of

A
Well Wisher

Sl. No. 48

শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

মেসার্স এস. কে. ট্রেডার্স
নলকূপ যন্ত্রাংশ বিক্রেতা

তিনকোনিয়া, বর্ধমান

Sl. No. 31

With best compliments of

TANGAIL BASAK TANTUBAY
SAMABAY SAMITY
DHATRIGRAM LTD.

P.O. Dhatrigram, Dist. Burdwan

Our Showroom

TANGAIL EMPORIUM

1. Chakradanga Road, Uttarpara
2. 179-A B.B. Sen Road, Baharampur
3. Chakdighi More, Memari

Sl. No. 59

শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

মা তারা ইট ভাটা

গ্রাম : সুলন্টু, পারুলিয়া, বর্ধমান-৭১৩৫১৩

ট্রেডমার্ক : **M.B. Co.**

সবকিছু বারবার বাড়ি কিন্তু একবার

উৎকৃষ্ট মানের

M.B. Co. ইট ব্যবহার করুন।

সততাই আমাদের মূলধন।

Sl. No. 33

With best compliments of

Kunjabeehari Steel Pvt. Ltd.

Shekpur, Jamuria, Burdwan

Sl. No. 193

With best compliments of

Bhagwati Sponge Pvt. Ltd.

Vill. & P.O. Ikrah, Jamuria, Burdwan-713362

Sl. No. 162

With best compliments of

A
Well-Wisher
(DOWEL)

Sl. No. 186

With best compliments of

Raoshan Sheikh

GENERAL CONTRACTOR & ORDER SUPPLIERS

Town & P.O. Guskara, Dist. Burdwan
Mob. 9434835663

Sl. No. 139

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

উর্মিলা সিলেকশন্

শীততাপ নিয়ন্ত্রিত

অভিজাত বস্ত্র প্রতিষ্ঠান

সমস্ত স্কুলের ড্রেস পাওয়া যায়

রামতারণ গড়াই রোড (চৌমাথা), গুসকরা, বর্ধমান
যোগাযোগ : ৯০০২২৮৭৬৫৫

Sl. No. 140

এসো আলোর পথযাত্রী চূর্ণ করতে আঁধার
কাশে শেফালিকায় পূর্ণ আজ শারদ সন্তার।

অভিনন্দন সহ

নৃপতি নাথ ও জয়ন্ত ভাদুড়ি

আসানসোল

Sl. No. 142

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

নিউ কুন্তলিকা স্টেশনার্স

স্কুল, কলেজ, অফিস পথগায়েতের লিখন, শিক্ষণ সামগ্রী,
রেজিস্টার, ফর্ম ইত্যাদি পাইকারি ও খুচরা বিক্রয়

বি. সি. রোড, দত্ত সেন্টার, প্রথম রো, বর্ধমান

Sl. No. 3

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

ভালকি গ্রাম পথগায়েত

আউশগ্রাম-২ পথগায়েত সমিতির অন্তর্গত
অমরারগড়, বর্ধমান

Sl. No. 1

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

দে পেপার অ্যান্ড
প্রেজেন্টেশন সেন্টার

এখানে যাবতীয় স্কুল, অফিস সামগ্রী এবং
উপহার পাইকারী ও খুচরা ন্যায্যমূল্যে পাওয়া যায়

প্রোঃ শ্রীশঙ্করপ্রসাদ দে অ্যান্ড ব্রাদার্স

সাতগেছিয়া, কালনা রোড, বর্ধমান
মোবাইল : ৯৩৩৩১৫৫০৮৮, ফোন : (০৩৪২) ২৭০০৬০৫

Sl. No. 13

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

বিক্রমপুর কোল্ড স্টোরেজ

বোহার, বর্ধমান

এখানে আলুর বীজ গ্যারান্টি সহকারে সংরক্ষণ করা হয়।

Sl. No. 10

With best compliments of

ASOKE KUNDU

Sl. No. 12

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

পিপলন সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লি.

রেজি. নং : ১৪ কে.টি. তাং : ২৯-০৩-৬৩

কৃতকার্যসমূহ

কৃষাণ ক্রেডিট কার্ড, মধ্যমেয়াদী নগদ ঋণ দান, চেক ভাঙানো সহ সমস্ত রকম ব্যাঙ্কিং পরিষেবা প্রদান। সমস্ত রকম রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ঔষধ বিক্রয়। প্রায় ৯০টি স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী গঠন ও সামাজিক ও আর্থিক উন্নয়নে সামিল হওয়া।

হাজু ঘোষ
সভাপতি

কার্তিক হাজরা
সম্পাদক

গোপাল দত্ত
ম্যানেজার

Sl. No. 14

With best compliments of

Pandaveswar Area Office Employees Co-operative Credit Society Ltd.

Shyamal Chatterjee
Secretary

M.S. Banerjee
Chairman

Sl. No. 15

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

কনক পেপার সেন্টার

প্রোঃ সুরেন্দ্রনাথ সাঁই

এক্সারসাইজ খাতা, জাবদাখাতা, সুপার ডে, রেজিস্টার,
বাঁধাই খাতা, হোলসেল এবং রিটেল বিক্রয় হয়।

কুসুমগ্রাম সুপার মার্কেট (রুম নং ১০৩), বর্ধমান

Sl. No. 18

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

শ্রমিক স্বার্থে সমবায় আন্দোলন দীর্ঘজীবী হোক

ডালুরবাঁধ কোলিয়ারি এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড

রেজি. নং : ১৪ কে.টি. তাং : ২৯-০৩-৬৩

কীর্তানন্দ কুমার
সভাপতি

সুকুমার মিশ্র
সম্পাদক

Sl. No. 16

With best compliments of

M/s. APEX EARTHMOVERS

5/6, College Road
P.O. Raniganj, Burdwan

Sl. No. 22

With best compliments of

BHOLANATH JEWELLERS

Prop. : Baban Dey

Pandaveswar, Burdwan, PIN : 713346
Mob. 9434476681
E-mail : bholanathjewellers@gmail.com

Sl. No. 21

With best compliments of

Burdwan Spun Pipe Industries

Manufacturer of
RCC SPUN PIPE
COLLARS & S PIGOT TYPE
NP2 / NP3 / NP4

Natun Pally, P.O. & Dist. Burdwan
Ph : 0342-2544640, Fax : 2662232

Office & Factory
Vill. P.O. Hossainpur, Maldanga, Burdwan
Phone : 2324644

Sl. No. 19

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

রায়না থানা কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং সোসাইটি লি.

রেজি. নং : ২৫৩৭/৬০ || শ্যামসুন্দর, বর্ধমান
ফোন : (০৩৪৫১) ২৬০২৩৭

সমস্ত রকম রাসায়নিক সার, জৈব খইল, কীটনাশক ঔষধ, কৃষি
যন্ত্রপাতি ও উন্নত মানের বীজ বিক্রয়ের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান ও
কেরোসিন তেলের বিগ ডিলার।

স্বপন ঘোষ
সভাপতি

নাসের আলি মল্লিক
সম্পাদক

জগন্নাথ ঘটক
ম্যানেজার

Sl. No. 2

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

খান্দরা কোলিয়ারি এমপ্লয়িজ
কো-অপারেটিভ
ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড

রেজি. নং ৪৭৭ তাং : ১০-০৪-১৯৭৯

Sl. No. 5

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

খাস কাজেরা কোলিয়ারি এমপ্লয়িজ
কো-অপারেটিভ
ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড

কাজেরা গ্রাম, বর্ধমান

Sl. No. 9

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

দেনুড় গ্রাম পঞ্চায়েত

পোঃ দেনুড়, (মস্তেশ্বর পঞ্চায়েত সমিতি) বর্ধমান-৭১৩১৪৫

দূরভাষ : ০৩৪২-২৭৫৫৪৬৫

আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েত জনগণের সেবায় সদাই নিয়োজিত। মানবোন্নয়নের লক্ষ্যে অবিচল।
জনস্বাস্থ্য, শ্রমদিবস সৃষ্টি, জলনিকাশি, সামাজিক বনসৃজন ও রাস্তাঘাট নির্মাণকে পাথেয় করে এগিয়ে
চলেছি। সকলের সহযোগিতা আমাদের কাম্য।

গাছ লাগান। পরিবেশ বাঁচান।
শৌচালয় বানান, দূষণমুক্ত হোন।

রসিদ মণ্ডল
সচিব

মোসাই মুর্মু
নির্বাহী সহায়ক

কৃষ্ণা ঘোষ
উপপ্রধান

বিধান মাজি
প্রধান

Sl. No. 23

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

বাঘাসন গ্রাম পঞ্চায়েত

মন্তেশ্বর পঞ্চায়েত সমিতির অধীন
মালাডাঙ্গা, বর্ধমান, ফোন : ০৩৪২-২৭৫০৫৮৭

সুনীল মণ্ডল বাসুদেব দুর্লভ কাবলু মণ্ডল টুম্পা মণ্ডল
নির্বাহী সহায়ক সচিব উপ-প্রধান প্রধান

Sl. No. 24

Heartiest Greetings of Saradiya
from

Subhendu Roy

GOVT. CONTRACTOR
&
ORDER SUPPLIERS

Monteswar, Burdwan

Sl. No. 120

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

বুদবুদ সমবায় কৃষি উন্নয়ন উন্নয়ন সমিতি লি.

রেজি. নং. ৩৬৬, তাং : ২৬-৪-৭৭
বুদবুদচিটি (শুকডাল মোড়), বুদবুদ, বর্ধমান

সমিতির মাধ্যমে সেভিংস, আর.ডি., এফ.ডি., টি.ডি. ইত্যাদিতে
ধারাবাহিকভাবে আমানত সংগ্রহে অধিক সুদ দেওয়া হয়।
কে.সি.সি.-র মাধ্যমে কৃষিঋণ ও মধ্যমেয়াদি ঋণে কৃষি সরঞ্জাম
দেওয়া হয়। কৃষি বিকাশপত্র ও সমিতির স্থায়ী আমানতের
উপর ৭৫ শতাংশ ঋণ দেওয়া হয়। স্বয়ংস্বত্ব গোষ্ঠীদের বিভিন্ন
প্রকল্পে ঋণ প্রদান করা হয়।

আশিস মুখার্জী
সভাপতি

সুনীলকুমার ঘোষ
সম্পাদক

Sl. No. 145

Saradiya Greetings from

DAWN HARDWARE & MOTORS

Maldanga (Memari Road), Burdwan

Prop. SABYASACHI DAN, Mob. 9641129367

Authorised dealer : Jaysawal Pipe & Palifoam Tank
Dealer : KSB Pump
N.B. Paddy Thresher is available here.

kindly step in our Hardware Stores to avail the opportunity
of Super Quality Goods and Commodities. We have our
age old good will and tradition to keep up satisfaction for
our customers.

Sl. No. 25

শারদীয়ার পুণ্য লগ্নে সকলকে শুভেচ্ছা জানাই

করন্দা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি

গ্রাম ও পোঃ করন্দা, বর্ধমান

- কৃষকদের স্বল্প সুদে স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদান করা হয়।
- গণবন্টন ব্যবস্থার সমস্ত দ্রব্য সরকারি মূল্যে সরবরাহ করা হয়।
- কৃষকদের সুবিধার্থে সমস্ত ধরনের রাসায়নিক সার সরবরাহ করা হয়।

শরদিন্দু কোঙার
ম্যানেজার

Sl. No. 26

শারদীয়ার পুণ্য লগ্নে সকলকে শুভেচ্ছা জানাই

কাটসিহি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি

রেজি. নং : ২৭৬৬ তাং : ২৫-০১-৬১

গ্রাম ও পোঃ কাটসিহি, বর্ধমান

- কৃষকদের স্বল্প সুদে মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদান করা হয়।
- কৃষকদের সুবিধার্থে সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট চালু আছে।

কমলাকান্ত সাঁই
ম্যানেজার

Sl. No. 27

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

সামডি গ্রাম পঞ্চায়েত

যোগেন মাহাতো
উপপ্রধান

বীনা দে
প্রধান

Sl. No. 132

Heartiest Greetings of Saradiya
from

Daudar Rahaman

GOVT. CONTRACTOR
&
ORDER SUPPLIERS

Kaigram, Burdwan

Sl. No. 121

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

সালানপুর গ্রাম পঞ্চায়েত

রূপেশ বাউরি
উপপ্রধান

মমতা বাউরি
প্রধান

Sl. No. 131

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

আল-আমীন ডায়াগনস্টিক সেন্টার

প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরি

এস.টি.কে.কে. রোড, কালনা, বর্ধমান
যোগাযোগ : ৯১৫৩১৭৬৬৫৫, ৯৪৩৪৬৬৭৭১৬

আই.ভি.পি. ও সব রকমে এক্স-রে করা হয়।
রক্ত, মল, মুত্র, কফ পরীক্ষা এবং কালচার করা হয়।

ই.সি.জি. আলট্রাসোনোগ্রাফি

Sl. No. 130

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

হামুনপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি

এখানে সকল প্রকার ব্যাকিং ব্যবস্থা আছে। সার,
খইল কীটনাশক ন্যায্যমূল্যে বিক্রয় হয়। সর্বোপরি
মিনিডিপের মাধ্যমে এলাকার চাষিদের আর্থিক
উন্নতি সাধিত হয়েছে।

জনগণের স্বার্থ সমবায়ের স্বার্থ।

দীনবন্ধু হালদার
ম্যানেজার

Sl. No. 11

শারদীয়া ও ইদুজ্জাহায়
প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

ইউনাইটেড অ্যাথোটেক প্রাইভেট লিমিটেড

গলসি, বর্ধমান
ফোন : (০৩৪২) ২৪৫১৩৫০, ২৪৫১৩৫১

Sl. No. 166

With best compliments of

MALAKAR ENTERPRISE

CIVIL, MECHANICAL CONTRACTOR AND GENERAL ORDER SUPPLIER

D-25/S, Sagarbhanga Colony, Durgapur-713211, Burdwan
Contact : 9474444867

Sl. No. 167

With best compliments of

Ratan Dutta

ASSOCIATED ENGINEERS

MECHANICAL CONTRACTOR & GENERAL ORDER SUPPLIER

Specialist in
Tool Room, Gear, Penion Shaft & Maintenance Works
Sagarbhanga Colony, Durgapur-713211, Dist. Burdwan
Phone : 9932244082, 8001762157

Sl. No. 173

With best compliments of

Gramkalna Tangail Tantubay Samabay Samity Ltd.

Regd. No. 12KT., Dt. 03.03.75

Manufacturers of

DACCAI & TANGAIL SAREES

Vill. Gramkalna, P.O. Dhatrigran, Dist. Burdwan, Ph : (03454) 270865

Sl. No. 61

With best compliments of

AJOY SAHA

GENERAL CONTRACTOR & ORDER SUPPLIER

Vill. Pearinagar, P.O. Dhatrigran
Burdwan, PIN : 713405

Sl. No. 62

With best compliments of

GOBINDAPUR SEPHALI MEMORIAL POLYTECHNIC

[Approved by AICTE, Govt. of India & Affiliated to WBSCTE]
[An ISO 9001:2008 Certified Institute]

Vill. Gobindapur (Near Guskara), P.O. Keleti, Dist. Burdwan

OFFERS

**3-years Diploma Course in Engineering
BRANCHES**

**CIVIL ELECTRICAL • MECHANICAL • ELECTRONICS & TELECOM.
• COMPUTER SCIENCE & TECH.**

Contact No. 03452-250560, 250220

Admission Cell : 8900329343 / 9647608366, 8640967103
website ; www.gsmppolytechnic.com

A UNIT OF GOBINDAPUR SEPHALI SAMAJ SEBA SAMITY

Sl. No. 135

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

দুর্গামাতা কোন্ড স্টোরেজ

কমলনগর, গুসকরা, বর্ধমান

আলু সংরক্ষণের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

Sl. No. 138

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

আউসগ্রাম ব্লক-২ কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং সোসাইটি লি.

অভিরামপুর, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪৫২) ২৪৫২৪৭

এলাকার সকল শ্রেণির মানুষের হিতার্থে ও কৃষির
উন্নয়নে এই সমিতি নিরলস প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে।
সমবায়কে আরও উন্নত ও মজবুত করতে আপনাদের
সহযোগিতা কামনা করি।

সুরেন্দ্রনাথ হেমব্রম
সভাপতি

সুনীলকুমার মণ্ডল
সম্পাদক

Sl. No. 137

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

আউসগ্রাম-২ ব্লক ল্যাম্পস্ লিমিটেড

আদিবাসী সমাজের স্বনির্ভরতায় নিয়োজিত

Sl. No. 136

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

মা তারা সাপ্লায়ার্স

প্রোঃ সুশোভন সাহা

ইট, বালি, পাথর, সিমেন্ট, রড,
অ্যাজবেস্টস ইত্যাদি পাওয়া যায়

তালিত গোট (শঙ্করী রাইস মিলের বিপরীতে)
তালিত, বর্ধমান-৭১৩১৪১

যোগাযোগ

৯৯৩২৫৯৩৭৩১, ৯৮০০৯২৬৩৯৫
৭৫০১১২৮৯৭৬, ৯০৪৬৩৫৮৫৯৫

Sl. No. 111

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

গোলকুণ্ডা-ফুলবেড়িয়া
গ্রাম পঞ্চায়েত

ছোটন বাড়ি
উপপ্রধান

শিল্পী চ্যাটার্জি
প্রধান

Sl. No. 110

With best compliments of

ROY TUBE-WELL

A HOUSE OF PIPE, PIPE FITTINGS &
GENERAL ORDER SUPPLIER

Authorised Dealer
SMR Pipes Fitting, Utkarsh Bangal PVC & GI Pipes

Maldanga Bus Stand
Katwa Road, Burdwan
Ph : 2752415 (R), Mobile : 9732112464

Sl. No. 20

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

রবীন্দ্রনাথ গড়াং

কালাড়া বাজার, জামালপুর, বর্ধমান

Sl. No. 119

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

অশোক নন্দী

শুড়েকালনা, জামালপুর, বর্ধমান

Sl. No. 118

With best compliments of

SIDDHANT REAL ESTATE

Reg. Office : Ganapati Enclave (Gr. floor)
Shantinagar Main Road, Burnpur, P.S. Hirapur
Dist. Burdwan (West Bengal)-713325
Ph. (0341-2230001 (Office)

Sl. No. 106

With best compliments of

MANDAL ENTERPRISE

CIVIL CONTRACTOR & GENERAL ORDER SUPPLIER

Prop. BIKAS MONDAL
Sitarampur Station Road
Sitarampur, Burdwan

Sl. No. 104

With best compliments of

AMC EMPLOYEES' CO-OPERATIVE CREDIT SOCIETY LTD.

Burnpur, Burdwan

Sl. No. 105

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

আলু সংরক্ষণের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

চণ্ডীমাতা হিমঘর প্রা. লি.

আবাপুর, জামালপুর, বর্ধমান

Sl. No. 117

With best compliments of

MAA BHABANI
MINI RICE MILL

BEST QUALITY
Perboiling Rice Products

250 K.W. Gasification of Rice Husk
Pulversed 250 M.S. Rice Husk Ash Base

Vill. Panchsimul, P.O. Keotara (Jhapandanga)
Dist. Burdwan, PIN : 713166
Ph : (03451) 279-023/610 (Mill) 279361 (Resi)
Mob. 9434021272

Sl. No. 116

With best compliments of

Sethia Jain & Co. (P.) Ltd.

Debipur, Memari, Dist. Burdwan
Phone : (0342) 2263270

Sl. No. 113

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

আপনার জমির মাটিকে দূষণ মুক্ত করে

এ.টি.সি. গোল্ড

কেঁচো সার

মাটি এবং মানুষ নিয়ে আমাদের পৃথিবী। মাটিতেই তৈরি হয় কৃষি ও শিল্প। আর ভারতের শতকরা ৭৫ শতাংশ মানুষ কৃষির উপর নির্ভরশীল। তাই সেই মাটিকে রক্ষা করে উৎপাদনকে বাড়ানোর লক্ষ্যে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে এবং উৎপাদন খরচকে কমিয়ে নিয়ে আসতে হবে। তাই প্রয়োগ করতে হবে কৃষকের চিরাচরিত উপকারী বন্ধু কেঁচো সার এ.টি.সি. গোল্ড।

সরকারিভাবে পরীক্ষিত

অ্যাবডস্ অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ

মাধবপুর, বর্ধমান

যোগাযোগ : ০৩২১৩-২৫৮২১৯, ৯৭৩২৮০২২৬৪,
৯৭৪৮৭৪২৮৩৫, ৯১৫৩৫৪২৪৫৩

Sl. No. 92

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন



Sl. No. 158

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

চাকতেতুল সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমবায় সমিতি লি.

রেজি. নং : ২৫০৩ তাং : ২২-৫-৫৯

ফোন : ০৩৪৩-২৬৪৪৫১৩

আমাদের পরিষেবা
সমিতির মাধ্যমে SHG, MCC, MT Loan, Banking,
Fertilizer Business, Paddy Purchase করা হয়।

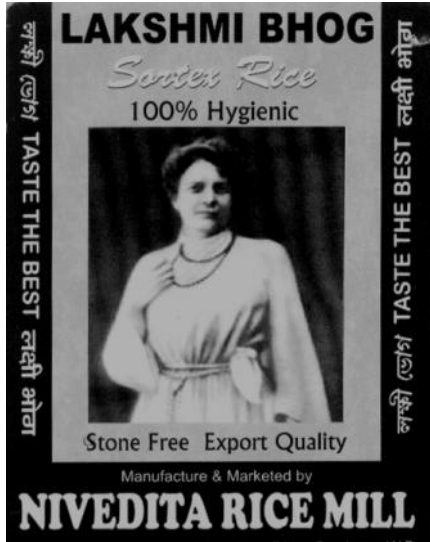
সত্যদুলাল হাজরা
সম্পাদক

শিশু চরণ মেটে
ম্যানেজার

ভৈরব রুইদাস
সভাপতি

Sl. No. 147

With best compliments of



Ph : (Office) 0342-2664248, 2664389
Fax : 0342-2560386
Factory : 0342-2454250, 2454760
Mob : 9434003339, 9434188670, 9434015583

Sl. No. 154

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

সুবর্ণ রাইস মিল

খেতুড়া, গলসী, বর্ধমান

ফোন : ০৩৪২-২৪৫১৩২৬, ২৪৫১৩২৭

উৎকৃষ্ট মানের মুড়ির চাল বিক্রয়ের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

Sl. No. 149

With best compliments of

G. S. SIDDIQUIE

CONTRACTORS & LABOUR SUPPLIERS

SURESH COMPANY

Station Road, Durgapur-1

Sl. No. 207

With best compliments of



Astha Rice Mill (P) Ltd.

Village & P.O. Paraj, Dist. Burdwan-713403

CONTACT

FACTORY : (0342) 2454777

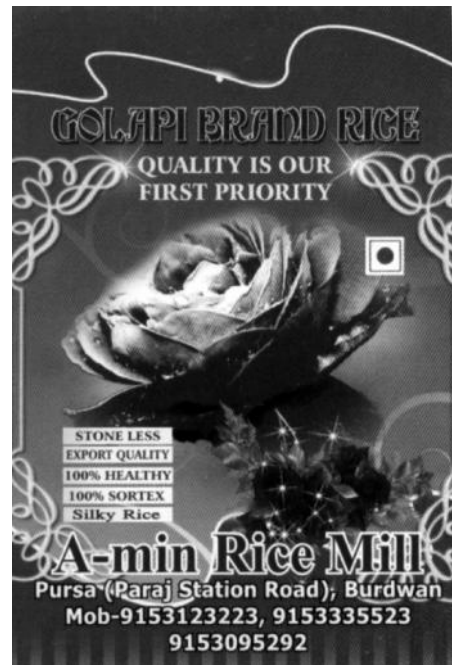
SALES: 9800515456, 9434198271

9153001144, 9732009513

www.astharicemill2010@rediffmail.com

Sl. No. 150

With best compliments of



Sl. No. 157

With best compliments of



Saradamayee Rice Mill

Factory : 0342-2454228, 2454220
Mob. 9434003431

Sl. No. 155

With best compliments of



M/s Rakona Rice Mill

NH-2 (G.T. Road)
Rakona, Jharul, Galsi, Burdwan
Contact
Mill : 0342-2454569
Production : 9434100215, 9434108122
Sales : 9434225267, 9475375814, 9232380323

Sl. No. 145

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন



নূপুর রাইস মিল

পারাজ, গলসী, বর্ধমান
ফোন : ৯১২৬০৪৭২১৭

Sl. No. 160

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন



LALBABA RICE

ভরা হাঁড়ি গিমির সোনার কপাল
ভাত খাবে ছেলেপুলে লালবাবা চাল

পারাজ, গলসী, বর্ধমান-৭১৩০৪৩, প.ব.
কাস্টমার কেয়ার : ৯৯৩৩৩৪৬১১৭

Sl. No. 156

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

মেনকা সুইটস্

পুলিশলাইন বাজার, বর্ধমান

প্রোঃ নেপালচন্দ্র ঘোষ

উৎসবে-পার্বণে ও যে-কোনো অনুষ্ঠানে

সুস্বাদু মিষ্টান্নের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

Sl. No. 129

With best compliments of

JMD ENGINEERING

FABRICATOR AND MECHANICAL ENGINEERS

Specialist in

Castings, Machining jobs etc.

Office : BK-32 'Shyamali', Rabindrapally (B-Block)
Durgapur-713201, Ph. 255 3590

Durgapur Works : RIP Industrial Estate
Durgapur-713212

Howrah Works : P-292/1, Baneras Road,
Belghachia, Howrah-711108

Sl. No. 206

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

গলসী ব্লক যুব কম্পিউটার সেন্টার

পশ্চিমবঙ্গ সরকার, যুব কল্যাণ বিভাগ

প্রশিক্ষণ কেন্দ্র : সন্তোষ শপিং সেন্টারের পাশে

গলসী, জেলা : বর্ধমান-৭১৩৪০৬

ফোন : ৯৭৩৪২৪৪৬৬২, ৯৪৭৬৪৯৪৬০৪

(০৩৪২)২৪৫১৪৩৩

Sl. No. 148

With best compliments of



Paraj Trading Mini Rice Mill

NH-2 (G.T. Road), Paraj More, Galsi, Burdwan
Contact : (0342) 2454560 / 360 (Fact.)
(0342) 2664248 / 389 (Bdn. Office)

Sales : 9434008380, 9933390095, 9332298287

Sl. No. 151

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

দেবীপুর গ্রাম পঞ্চায়েত

দেবীপুর, মেমারি, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২২৬৩২২১

জনস্বাস্থ্য, সর্বাশিক্ষা, ১০০ দিনের কাজ সহ সমস্ত সরকারি
কর্মসূচির সফল রূপায়ণে আমরা এগিয়ে চলেছি।

ছোবানী হেমরম
উপপ্রধান

মঙ্গল মাণ্ডি
প্রধান

Sl. No. 203

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

সমবায় আন্দোলন দীর্ঘজীবী হোক।
সমবায় হোক গরিবের হাতিয়ার।

**কমলনগর
এস.কে.ইউ.এস. লিমিটেড**

মাজিদা, বর্ধমান

ছোবানী হেমরম
উপপ্রধান

মঙ্গল মাণ্ডি
প্রধান

Sl. No. 36

দেশবন্ধু পাওয়ার লুম

সুলুন্টু, পূর্বস্থলী, বর্ধমান

Sl. No. 206